প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন
বিসিএস লিখিত পরীক্ষা (এনিমেল হাসবেন্ড্রি ও ভেটেরিনারি সায়েন্স)
প্রাণিসম্পদ ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতি পরীক্ষা (৩য় পত্র)
এর সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে রচিত

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল

প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন

(তৃতীয় সংস্করণ)

☞ প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন

☞ বিসিএস লিখিত পরীক্ষা (এনিমেল হাজবেন্ড্রি ও ভেটেরিনারি সায়েন্স)

☞ ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা (৩য় পত্র)

এর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রচিত

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল

সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন

প্রকাশকাল:
প্রথম সংস্করণ, জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ / জৈষ্ঠ্য ১৪২২ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ / অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ / আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কপিরাইট:
লেখক কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।
লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই পুস্তক বা ইহার অংশ বিশেষ
হুবহু অথবা কোনরুপ রদবদল বা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ ও প্রচার
করা গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুযায়ী অবৈধ ও দন্ডনীয়।

কম্পিউটার কম্পোজ:
রিফা-রাফিদ কম্পিউটার, গ-১৫৯/২ স্কুল রোড, ওয়ারলেছগেট, মহাখালী, ঢাকা।

প্রকাশনায়:
বাংলা প্রকাশন, উত্তর সাথালিয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯২২৩-৭

প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন

(তৃতীয় সংস্করণ)

☞ প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন
☞ বিসিএস লিখিত পরীক্ষা (এনিমেল হাজবেন্ড্রি ও ভেটেরিনারি সায়েন্স)
☞ ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা (৩য় পত্র)

এর সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে রচিত

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
ডিভিএম, এমএস, পিএইচডি

এওয়ার্ড
'বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার'- ডিভিএম পরীক্ষা ১৯৯৫
'বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণ পদক'- এমএস পরীক্ষা ১৯৯৯

ফেলোশীপ
ইউএসডিএ রিসার্চ ফেলো (বাকৃবি)- ২০০৯ সাল
ইউরোপিয়ান পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো (বেলজিয়াম)- ২০১৩ সাল

পেশাজীবি সংগঠনে অংশগ্রহণ
কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন নেটওয়ার্ক (**BAEN**)

জার্নাল রিভিউয়ার
ট্রপিক্যাল এনিমেল হেলথ এন্ড প্রোডাকশন

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী
মা ও বাবা কে।

লেখক

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৩ সালে গাইবান্ধা জেলাধীন সাঘাটা উপজেলার ৩নং সাঘাটা ইউনিয়নের সাথালিয়া গ্রামের লতিফ মওলানা বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মরহুম আবদুল লতিফ আকন্দ ও মরহুমা আলেয়া বেগমের ছোট ছেলে। ড. কামাল মুন্সিরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষা জীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে সাঘাটা পাইলট বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই কৃতিত্বের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে একই বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে ১৯৯১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৫ সালে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ থেকে প্রথম শ্রেণী লাভ করে কৃতিত্বের সাথে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (DVM) ডিগ্রী অর্জন করেন। ডিভিএম চূড়ান্ত ফলাফলে প্রথম স্থান অর্জনের জন্য মেধার স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার' লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৯৯ সালে রিপ্রোডাকটিভ মাইক্রোবায়োলজিতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে মাস্টার অব সায়েন্স (MS) ডিগ্রী অর্জন করেন। এমএস চূড়ান্ত ফলাফলে ডিস্টিংশনের জন্য অসাধারণ মেধার স্বীকৃতি হিসেবে 'বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণ পদক' লাভ করেন। ড. কামাল বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারে ১৯৯৯ সালে গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে সর্বপ্রথম কর্মজীবন শুরু করে গাইবান্ধার বিভিন্ন উপজেলায় প্রায় ১০ বৎসর 'ভেটেরিনারি সার্জন' হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে 'উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা' পদে পদোন্নতি পান। একই বছর ২০০৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি ও অবস্টেট্রিক্স বিভাগে USDA (United States Department of Agriculture) গ্রান্ট নম্বর বিজি-এআরএস-১২১ এর অর্থায়নে গবাদিপশুর প্রজনন বিষয়ে গবেষণার অনুবৃত্তিক্রমে ডক্টর অব ফিলোসফি (PhD) ডিগ্রী অর্জন করেন। তার পিএইচডি গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে এবং 15th AAAP Animal Science Congress Scholarship নিয়ে ২০১১ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি কৃতিত্বের সাথে উপস্থাপন করেন। উক্ত গবেষণার ফলাফল পর্যায়ক্রমে Asian Journal of Animal Science, Journal of Applied Animal Research এবং Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences এ পূর্ণদৈর্ঘ্য আর্টিকেল হিসেবে প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে বেলজিয়াম সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইউরোপিয়ান BOF স্কলারশিপ নিয়ে বেলজিয়ামের Ghent University তে দুই বছর ব্যাপী গবাদিপশুর প্রজননে মেটাবোলিক প্রগ্রামিং বিষয়ে পোষ্ট-ডক্টরাল গবেষণা সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। তাহার পোষ্ট-ডক্টরাল গবেষণার ফলাফল বেলজিয়াম, জার্মানি, ও তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপে তিনি কৃতিত্বের সাথে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে উক্ত পোষ্ট-ডক্টরাল গবেষণালব্দ ফলাফল আমেরিকা থেকে প্রকাশিত Journal of Dairy Science এবং ইউরোপ থেকে প্রকাশিত Animal এবং Reproduction in Domestic Animals নামক আন্তর্জাতিক জার্নালে পূর্ণদৈর্ঘ্য আর্টিকেল হিসেবে প্রকাশ পায়। তাহার এমএস, পিএইচডি ও পোষ্ট-ডক্টরাল গবেষণা এবং রিভিউসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালে সর্বমোট প্রায় চল্লিশটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ড. কামাল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে 'জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা' পদে থেকে মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগর স্থাপন প্রকল্পে প্রেষণে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ ২১ বছরের কর্মজীবনে তিনি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত থেকে দেশে বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তাহার স্ত্রী কৃষিবিদ ডাঃ নাছরিন পারভীন বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি আল্লাহর আশীর্বাদে রিফা তাসফিয়া ও বাসরাতুল রাফিদ নামের দুই সন্তানের জনক।

তারিখ: সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

লেখক, প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন
প্রকল্প পরিচালক

অবতারণিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার যার অশেষ অনুগ্রহে ‘প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন’ শীর্ষক এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হল। প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাণিসম্পদের ওপর এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইয়ের প্রধান আকর্ষণ হল, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের প্রাণিসম্পদের উপর প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন সহজলভ্য পুস্তক ও গবেষণাপত্রের সারাংশের সমন্বয় সাধন করে দেশোপযোগী করে রচিত হয়েছে। সেই সাথে প্রতিটি পুস্তক ও গবেষণাপত্রের পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া ভেটেরিনারি সায়েন্স ও এনিমেল হাসবেন্ড্রি বিষয়ের বিসিএস লিখিত পরীক্ষা এবং প্রাণিসম্পদ ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় ৩য় পত্রের সিলেবাস অনুযায়ী প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন বিষয়কে পৃথকভাবে সংযোজন করা হয়েছে। বইটির ১৫ থেকে ১৭তম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সিলেবাস ও প্রশ্ন দেখে নিয়ে এই বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পড়লে প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। উপরন্ত প্রতিটি বিষয়কে বাংলা ভাষায় সরল ও সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে সারণি ও চিত্র সংযোজিত হয়েছে। তাই প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, ভেটেরিনারি সায়েন্স ও এনিমেল হাসবেন্ড্রি বিষয়ের বিসিএস লিখিত পরীক্ষা এবং ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় ৩য় পত্রের সহায়ক হিসেবে এই বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব ও অবদান বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের পরিধি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যথাযথ ডকুমেন্টেশনের অভাবে এ সমস্ত কর্মকান্ডের অনেক তথ্যই হারিয়ে যায়। তাই একটি বই লেখার মাধ্যমে এ সমস্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য আশা করে আসছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় প্রাণিসম্পদের মূল্যবান তথ্য সম্বলিত জুন ২০১৫ তে প্রথম প্রকাশিত ‘প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন’ বইয়ের এই বর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সংস্থার জন্য খুবই সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিভন্ন দপ্তর ও উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য কাজ। তারপরও একটি তথ্যবহুল ও দৃষ্টিনন্দন বই প্রকাশের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবে নিখুঁতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তিতে প্রতিকূল অবস্থার কারণে তথ্যের অপূর্ণতা বা প্রেসের অসাবধানতার কারণে কিছু কিছু অপূর্ণতা এই সংস্করণেও হয়তো রয়ে গেছে। এ ধরণের অনাকাংখিত ত্রুটির জন্য আমি সর্বস্তরের পাঠকের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। এ ধরণের ত্রুটি যদি কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় তবে লেখকের ই-মেইলে mostofa.kamal.phd@gmail.com জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতে এ দিকগুলোর প্রতি নজর রাখা হবে।

পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভকামনা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তার সহযোগীতার ফলে ‘প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন’ এই বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এতে যারা সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাছাড়া এই বইটির প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বইটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হলে পরবর্তীতে প্রযুক্তিগত কলেবর আরও বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হবো।

তারিখ: সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল
লেখক ও প্রকল্প পরিচালক

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
১.০	**প্রাণিসম্পদ ও আমরা**	**১৭-৫৩**
১.১	উপক্রমণিকা	১৭
১.২	প্রাণিসম্পদ বা লাইভস্টক কি?	১৮
১.২.১	জুলজিক্যাল শ্রেণী বিন্যাস	১৯
১.২.২	বিভিন্ন প্রাণির জুলজিক্যাল নাম	১৯
১.২.৩	সরকারি খামার ও চিড়িয়াখানাসমূহ	১৯
১.৩	প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব	২০
১.৩.১	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান	২২
১.৩.২	দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে পশুপাখির গুরুত্ব	২৩
১.৩.৩	খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় পশুপাখির অবদান	২৪
১.৩.৪	কৃষি কাজে গবাদিপশুর গুরুত্ব	২৭
১.৩.৫	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুপাখির গুরুত্ব	২৮
১.৪	বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষা ও কর্মকাঠামো	৩০
১.৪.১	ভেটেরিনারি সায়েন্স	৩০
১.৪.২	পশু পালন ও পশু বিজ্ঞান	৩১
১.৪.৩	বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার ক্রমবিকাশ	৩২
১.৪.৪	ভেটেরিনারি বনাম এনিমেল হাজবেন্ড্রি শিক্ষা	৩৪
১.৪.৫	কর্মক্ষেত্র হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান	৩৪
১.৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত ক্রমবিকাশ	৩৬
১.৬	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অতীত পদক্ষেপ, বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ ভাবনা	৪০
১.৭	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান: আফকা এবং ওআইই	৪৪
১.৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম	৪৫
১.৮.১	গাবদিপশু ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৪৬
১.৮.২	মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণায়তন	৪৯
১.৮.৩	প্রাণিসম্পদে গবেষণা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ	৫০
১.৮.৪	ঢাকা ও রংপুরে চিড়িয়াখানা স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক্রম	৫১
১.৮.৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ	৫১
১.৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমস্যা	৫২
২.০	**গবাদিপশুর খামার স্থাপন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর**	**৫৪-৯৫**
২.১	খামার স্থাপনের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা	৫৪
২.১.১	বাংলাদেশে গবাদিপশুর বর্তমান অবস্থা	৫৪
২.১.২	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা	৫৫
২.১.৩	গবাদিপশু উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার	৫৭
২.১.৪	ভারতীয় গরুর প্রবেশ বন্ধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অধিক খামার স্থাপনের সম্ভাবনা	৬১
২.২	চাষাবাদে পশুশক্তির অপ্রতুলতা ও যন্ত্রায়ন প্রসঙ্গ	৬৩
২.৩	গাভীর খামার স্থাপন	৬৭

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
২.৩.১	গাভী পালনের বিবেচ্য বিষয়	৬৭
২.৩.২	দশটি গাভীর দুগ্ধ খামার প্রকল্পে আয়-ব্যয়ের নমুনা	৬৮
২.৩.৩	দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা	৭০
২.৩.৪	দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কার্যাবলী	৭২
২.৪	গরু মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপন	৭২
২.৪.১	প্যাকেজ প্রযুক্তি হিসেবে গরু মোটাতাজাকরণ	৭২
২.৪.২	পঞ্চাশটি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে আয়-ব্যয়ের নমুনা	৭৫
২.৪.৩	গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গ এবং আমাদের করণীয়	৭৭
২.৫	গবাদিপশুর খামারে নথি সংরক্ষণ	৮২
২.৬	প্রযুক্তি হস্তান্তরের কলাকৌশল	৮৩
২.৬.১	ভাল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ	৮৩
২.৬.২	প্রযুক্তি হস্তান্তরের লাগসই পদ্ধতি	৮৪
২.৬.৩	একজন সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮৬
২.৬.৪	একজন সম্প্রসারণ কর্মীর কাঙ্খিত গুণাবলী	৮৭
২.৭	আধুনিক সম্প্রসারণের কলাকৌশল এবং সম্প্রসারণ ও গবেষণার সমন্বয়	৮৭
২.৭.১	সম্প্রসারণ কর্মী ও খামারির ফলপ্রসু যোগাযোগ	৮৮
২.৭.২	সম্প্রসারণ কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ	৮৯
২.৮	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা	৯২
২.৮.১	সমন্বিত খামারের অঙ্গসমূহ	৯২
২.৮.২	সমন্বয় ধাপসমূহ	৯৩
২.৮.৩	সমন্বিত খামারের শর্তাবলী, সুবিধা ও অসুবিধা	৯৩
২.৮.৪	হাঁসের সাথে মাছের চাষ	৯৫
৩.০	**গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্র ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা**	**৯৬-১১৯**
৩.১	রোমন্থক পশুর হজম ও শোষণ	৯৬
৩.২	গবাদিপশুর খাদ্য	৯৭
৩.২.১	গবাদিপশুর খাদ্য সামগ্রীর শ্রেণীবিভাগ	৯৭
৩.২.২	গবাদিপশুর খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত	৯৮
৩.২.৩	রসদ বা রেশন এবং আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য	৯৯
৩.২.৪	গবাদিপশুর খাদ্যের পুষ্টিমান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়	১০০
৩.২.৫	উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন কলাকৌশল	১০২
৩.২.৬	খড়ভিত্তিক রসদে লাভজনক মাংস ও দুধ উৎপাদন	১০৩
৩.২.৭	ইউরিয়া দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ	১০৩
৩.৩	বাংলাদেশে পশুপুষ্টির বর্তমান পরিস্থিতি	১০৬
৩.৪	বাংলাদেশে মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে পশুপুষ্টি সংকট	১০৭
৩.৫	গবাদিপশুর খাদ্য উৎপদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ	১১০
৩.৬	গবাদিপশুর উপাদন বাড়াতে পশুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির বিকল্প নাই	১১১

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
৩.৭	গবাদিপশুর খাদ্য সংকট নিরসনে বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ	১১৩
৩.৮	অপ্রচলিত খাদ্যসমূহের কার্যকর ব্যবহার	১১৫
৩.৯	সবুজ ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি	১১৭
৩.৯.১	সাইলেজ ও সাইলো কি?	১১৮
৩.৯.২	সাইলেজ তৈরীর নীতি ও সাইলো পিটের বৈশিষ্ট্য	১১৮
৩.৯.৩	সাইলেজ তৈরির সুবিধাসমূহ এবং অসুবিধাসমূহ	১১৯
৪.০	**গবাদিপশুর বাসস্থান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**	**১২০-১৩৭**
৪.১	গবাদিপশুর বাসস্থান	১২০
৪.১.১	গবাদিপশুর বাসগৃহের স্থান নির্বাচন	১২০
৪.১.২	গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণীবিন্যাস	১২০
৪.১.৩	গাভী ও বাছুরের বাসস্থান	১২২
৪.১.৪	ডেইরি ফার্মের বিভিন্ন নির্মাণমূলক গঠন	১২২
৪.২	পশুর বাসস্থানে ব্যবহৃত রুটিন পদ্ধতি	১২৪
৪.২.১	পশু সনাক্তকরণ	১২৪
৪.২.২	পশুর বয়স নির্ণয়	১২৬
৪.২.৩	পশুর দৈহিক ওজন নির্ণয়	১২৯
৪.৩	স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদনে আধুনিক জবাইখানা	১৩১
৪.৩.১	সিটি করপোরেশনে গবাদিপশুর আদর্শ জবাইখানা স্থাপন	১৩১
৪.৩.২	জেলা ও উপজেলা সদরে গবাদিপশুর আদর্শ জবাইখানা স্থাপন	১৩২
৪.৪	প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৩২
৪.৪.১	প্রাণিসম্পদ রক্ষায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী	১৩৩
৪.৪.১.১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক করণীয়	১৩৩
৪.৪.১.২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক করণীয়	১৩৪
৪.৪.২	বন্যাপরবর্তী সময়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য করণীয়	১৩৫
৪.৪.৩	দুর্যোগ থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষার জন্য সুপারিশসমূহ	১৩৭
৫.০	**গবাদিপশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন**	**১৩৮-১৭১**
৫.১	গবাদিপশুর প্রজনন	১৩৮
৫.১.১	গাভীর জনন তন্ত্র	১৩৮
৫.১.২	যৌবনারম্ভ ও জনন প্রক্রিয়ায় হরমোনের ভূমিকা	১৪০
৫.১.৩	ইস্ট্রাস চক্রে হরমোনের ভূমিকা	১৪০
৫.১.৪	প্রজনন পদ্ধতি	১৪১
৫.১.৫	প্রজনন সমস্যাসমূহ	১৪৪
৫.২	বাংলাদেশের গবাদিপশুর জাত পরিচিতি	১৪৬
৫.৩	গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন	১৪৭
৫.৩.১	কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা	১৪৭
৫.৩.২	গভীর হিমায়িত সিমেন মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালী	১৪৮

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
৫.৩.৩	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের বর্তমান পদ্ধতি	১৪৯
৫.৩.৪	কৃত্রিম প্রজনন ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ	১৫০
৫.৪	গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন	১৫০
৫.৪.১	গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পটভূমি	১৫০
৫.৪.২	গবাদিপশুর প্রজনন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	১৫৫
৫.৪.৩	জাত উন্নয়নে দেশে ব্রিডিং প্রোগ্রাম ও তার ফলাফল	১৫৬
৫.৫	কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়নে করণীয়	১৬০
৫.৫.১	গবাদিপশুর আন্তঃপ্রজনন রোধে সণাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ	১৬০
৫.৫.২	কৃত্রিম প্রজননে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার চালুকরণ	১৬১
৫.৫.৩	দেশী ও বন্য গরুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	১৬২
৫.৬	কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প	১৬৩
৫.৭	মোয়েট, ষ্টিল বার্থ, ফ্রি মার্টিন ও ইপিষ্টেসিস	১৬৬
৫.৮	গাভীর বাচ্চা উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	১৬৮
৫.৯	গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	১৭০
৬.০	**গবাদিপশুর রোগব্যাধির চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ**	**১৭২-১৯৭**
৬.১	সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ	১৭২
৬.২	গবাদিপশুর রোগব্যাধি	১৭৩
৬.২.১	গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি	১৭৩
৬.২.২	গবাদিপশু হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরুপ রোগ	১৭৪
৬.৩	রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা	১৭৫
৬.৩.১	পোস্ট-মর্টেম বা মৃতদেহ পরীক্ষা	১৭৫
৬.৩.২	বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসার প্রেক্ষাপট	১৭৭
৬.৩.৩	শ্বাস তন্ত্রের রোগের চিকিৎসার মূলনীতি	১৭৯
৬.৪	গবাদিপশুর তড়কা রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা	১৮০
৬.৫	গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ ও তার দমন ব্যবস্থা	১৮২
৬.৬	গবাদিপশুর জলাতঙ্ক রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা	১৮৪
৬.৭	গবাদিপশুর অন্যান্য রোগসমূহ ও তাদের প্রতিকার	১৮৫
৬.৮	গবাদিপশুর সাধারণ পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার	১৮৭
৬.৮.১	পরজীবিবিদ্যা ও পরজীবির শ্রেণীবিভাগ	১৮৭
৬.৮.২	পরজীবীর সংক্রমণ পদ্ধতি ও প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ	১৮৯
৬.৮.৩	গবাদিপশুর পরজীবিজনিত প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ	১৯০
৬.৮.৪	পাতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ	১৯০
৬.৮.৫	ফিতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ	১৯৪
৬.৮.৬	গবাদিপশুর পরজীবিজনিত রোগ দমন কৌশল	১৯৫
৬.৯	গবাদিপশুর ত্বকের রোগসমূহ	১৯৬

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
৭.০	**পশুপাখির সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা**	**১৯৮-২১৭**
৭.১	এপিডেমিওলজিক্যাল পদ্ধতি	১৯৮
৭.২	পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	১৯৯
৭.২.১	পশুপাখির রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব	১৯৯
৭.২.২	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকারভেদ	১৯৯
৭.২.৩	অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি	২০০
৭.২.৪	অনির্দিষ্ট ইমিউনিটি	২০১
৭.২.৫	সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি	২০৩
৭.৩	পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও দমনের মৌলিক উপায়সমূহ	২০৪
৭.৪	জৈবনিরাপত্তা কি এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়?	২০৬
৭.৫	পশুপাখির রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার	২০৯
৭.৫.১	টিকার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পরিবহণ ও সংরক্ষণ	২০৯
৭.৫.২	পশুপাখির টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী	২১২
৭.৫.৩	গবাদিপশুর টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি	২১২
৭.৫.৪	টিকা প্রদানের পরও কেন রোগ হয়?	২১৩
৭.৬	সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সমূহ	২১৪
৭.৭	প্রাণিরোগ ব্যবস্থাপনায় সার্ভিল্যান্স কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন	২১৫
৮.০	**ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন**	**২১৮-২৩৯**
৮.১	ছাগল ও ভেড়ার জাত	২১৮
৮.২	বাংলাদেশে ছাগল পালনের গুরুত্ব	২১৯
৮.৩	বাংলাদেশে ছাগল পালনের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান	২২১
৮.৪	বাংলাদেশে ছাগল প্রতিপালনের সম্ভাবনা	২২৩
৮.৫	ছাগল উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ	২২৪
৮.৬	ছাগলের গুণগত মানোন্নয়নে প্রজনন ব্যবস্থাপনা	২২৫
৮.৬.১	প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছাগলের প্রচলিত প্রজনন ব্যবস্থা	২২৫
৮.৬.২	ছাগলের গুণগত মানোন্নয়নে নীতিমালা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগ	২২৫
৮.৬.৩	সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনায় যা করণীয়	২২৬
৮.৭	ভেড়া পালনের সুবিধা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব	২২৬
৮.৮	বাংলাদেশে ভেড়া উৎপাদনে সমস্যা ও করণীয়	২২৮
৮.৯	বাংলাদেশে ভেড়া পালনের সম্ভাবনা	২২৯
৮.১০	ভেড়ার প্রজনন পরিকল্পনা	২৩০
৮.১১	ছাগল ও ভেড়ার গুরুত্বপূর্ণ রোগব্যাধি	২৩৩
৮.১১.১	ছাগল ও ভেড়ার গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধি	২৩৩
৮.১১.২	ছাগল ও ভেড়ার ভ্যাকসিনেশন সিডিউল	২৩৪
৮.১১.৩	ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ	২৩৪
৮.১২	ইন্টেনসিভ পদ্ধতির ১০০ টি ছাগলের বাণিজ্যিক খামারে আয়-ব্যয়ের নমুনা	২৩৮

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
৯.০	**হাঁস-মুরগি পালন**	**২৪০-২৭৬**
৯.১	পোল্ট্রির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	২৪০
৯.২	পোল্ট্রি পালনের গুরুত্ব	২৪১
৯.৩	পোল্ট্রির জাত পরিচিতি	২৪২
৯.৪	বাংলাদেশে পোল্ট্রি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইতিহাস	২৪৪
৯.৫	বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা	২৪৫
৯.৬	বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশ	২৪৬
৯.৭	পোল্ট্রির সাধারণ রোগব্যাধি	২৪৯
৯.৭.১	পোল্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ রোগব্যাধি ও তার ক্ষতিকর প্রভাব	২৪৯
৯.৭.২	পোল্ট্রিতে রোগজীবাণুর বিস্তার	২৫১
৯.৭.৩	পোল্ট্রিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ	২৫২
৯.৭.৪	পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়কে ও রোগব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়	২৫৩
৯.৭.৫	হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি ও তা সফল করার উপায়	২৫৫
৯.৭.৬	টিকা প্রয়োগের পরেও হাঁস-মুরগির রোগ হয় কেন?	২৫৭
৯.৮	হাঁসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের পরিচিতি	২৫৯
৯.৯	হাঁসের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি	২৬০
৯.১০	বার্ড ফ্লু'র প্রাদুর্ভাব এবং করণীয় ব্যবস্থাদি	২৬০
৯.১১	মুরগির রাণীক্ষেত রোগ এবং প্রতিকার	২৬৪
৯.১২	মুরগির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রোগের পরিচিতি	২৬৬
৯.১৩	ঠোকরাঠুকরি বা ক্যানিবালিজম এবং অপুষ্টিজনিত রোগসমূহ	২৬৭
৯.১৪	বাণিজ্যিক মুরগি পালনের প্রস্তুতি	২৬৯
৯.১৫	বাণিজ্যিক লেয়ার খামার স্থাপনে আয়-ব্যয়ের নমুনা হিসাব	২৭২
৯.১৬	প্রতি ৮ সপ্তাহে ২০০০ ব্রয়লার উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের নমুনা	২৭৪
৯.১৭	খামারের রেকর্ড পত্র ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন	২৭৫
১০.০	**জীববৈচিত্র্য ও আমাদের প্রাণিসম্পদ**	**২৭৭-২৯৫**
১০.১	জলবায়ুর পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	২৭৭
১০.১.১	জীবপ্রজাতির সমৃদ্ধি	২৭৮
১০.১.২	জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য	২৭৮
১০.১.৩	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি	২৭৯
১০.১.৪	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের করণীয়	২৮০
১০.২	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	২৮১
১০.২.১	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব	২৮১
১০.২.২	বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	২৮১
১০.৩	হাতিঃ এক বিশাল প্রাণী	২৮২
১০.৪	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কুমীর খামারের গুরুত্ব	২৮৩
১০.৫	বাঘঃ সুন্দরবনের বিপন্ন পাহাড়াদার	২৮৪

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
১০.৬	হরিণঃ অতি সুন্দর প্রাণী	২৮৫
১০.৬.১	বাংলাদেশের বন্য প্রাণী হরিণ	২৮৫
১০.৬.২	অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় হরিণ পালন	২৮৬
১০.৬.৩	বসতবাড়ীতে হরিণ পালন ও পরিচর্যা	২৮৬
১০.৬.৪	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হরিণ পালনের প্রতিবন্ধকতা	২৮৬
১০.৬.৫	হরিণ সংরক্ষণে প্রয়োজন গণ সচেতনতা	২৮৭
১০.৭	কোয়েল পালনঃ বাংলাদেশে একটি লাভজনক ব্যবসা	২৮৮
১০.৭.১	বাংলাদেশে কোয়েলের জাত এবং প্রধান প্রধান এলাকা	২৮৯
১০.৭.২	কোয়েল ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়	২৮৯
১০.৮	এভিয়ারি শিল্প দারিদ্রতা বিমোচনে অনন্য সম্ভাবনা	২৯১
১০.৮.১	পাখি পালনের ইতিহাস	২৯২
১০.৮.২	পোষা পাখি পালনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	২৯৩
১১.০	**গবাদিপশু ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা**	**২৯৬-৩৪০**
১১.১	ডেইরি টেকনোলজি	২৯৬
১১.১.১	দুধের উপাদান	২৯৬
১১.১.২	দুধের উপাদান প্রভাবীকরণ	২৯৭
১১.১.৩	গাভীর দুধ দোহন পদ্ধতি	২৯৭
১১.১.৪	বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি	২৯৮
১১.১.৫	দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি	২৯৯
১১.২	বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা	২৯৯
১১.২.১	বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের অবস্থা	৩০০
১১.২.২	বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সমস্যা	৩০১
১১.২.৩	বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সম্ভাবনা	৩০৪
১১.২.৪	দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের করণীয়	৩০৫
১১.৩	দুধ বাজারজাতকরণ পদ্ধতি	৩০৬
১১.৩.১	বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলেসমূহের উৎপত্তি	৩০৭
১১.৩.২	বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধ বাজারজাতকরণের প্রেক্ষাপট	৩০৭
১১.৪	বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন	৩০৮
১১.৪.১	মাংসের পুষ্টি	৩০৮
১১.৪.২	বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা	৩১০
১১.৫	গবাদিপশুর বহিরাবরণ	৩১০
১১.৫.১	ত্বকের কার্যাবলী ও গঠন	৩১০
১১.৫.২	চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণ	৩১২
১১.৫.৩	চামড়ার কিউরিং	৩১৬
১১.৫.৪	চামড়া বাজারজাতকরণ	৩১৯
১১.৫.৫	চামড়ার বিভিন্ন ক্রটি	৩২১

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
১১.৬	চামড়া শিল্পের সমস্যা এবং ভাল চামড়া উৎপাদনে করণীয়	৩২৫
১১.৭	কোরবানীর পশু নির্বাচন, জবাই, চামড়া ছাড়ানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়	৩২৬
১১.৮	ডিম ও ডিমজাত দ্রব্য	৩৩২
১১.৮.১	ডিমের গঠন ও খাদ্যমান	৩৩২
১১.৮.২	ডিমের বিশেষ পুষ্টি	৩৩৫
১১.৮.৩	ডিম সংরক্ষণ	৩৩৭
১১.৮.৪	ডিম বাজারজাতকরণ	৩৩৮
১২.০	**প্রাণিসম্পদ উপজাত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	**৩৪১-৩৬০**
১২.১	গবাদিপশু ও পোল্ট্রির বিভিন্ন উপজাত	৩৪১
১২.২	গবাদিপশুর মলমূত্র সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার	৩৪২
১২.২.১	বায়োগ্যাস কি? এবং বায়োগ্যাস কেন?	৩৪২
১২.২.২	বাংলাদেশে বায়োগ্যাসের সম্ভাবনা	৩৪৩
১২.২.৩	বায়োগ্যাসের ব্যবহার ও সুবিধা	৩৪৪
১২.২.৪	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ কৌশল	৩৪৫
১২.২.৫	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালুকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	৩৪৬
১২.৩	গবাদিপশুর রক্তের ব্যবহার	৩৪৬
১২.৪	গবাদিপশুর হাড়, খুর ও শিংয়ের ব্যবহার	৩৪৯
১২.৫	উল, পশম ও পালকের ব্যবহার	৩৫২
১২.৬	নাড়িভুঁড়ির ব্যবহার	৩৫৪
১২.৭	বিভিন্ন গ্রন্থির ব্যবহার	৩৫৬
১২.৮	মৃত পোল্ট্রি ও বিভিন্ন বর্জ্যের ব্যবহার	৩৫৮
১৩.০	**প্রকল্প ব্যবস্থাপনা**	**৩৬১-৩৮৪**
১৩.১	প্রকল্প, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি	৩৬১
১৩.১.১	প্রকল্প ও কর্মসূচির সংজ্ঞা ও পার্থক্য	৩৬১
১৩.১.২	বাংলাদেশে প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ	৩৬১
১৩.১.৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য	৩৬৩
১৩.২	প্রকল্প চক্র	৩৬৩
১৩.২.১	প্রকল্প চিহ্নিতকরণ	৩৬৩
১৩.২.২	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রকল্প প্রণয়ন	৩৬৪
১৩.২.৩	প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ	৩৬৪
১৩.২.৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান	৩৬৫
১৩.২.৫	প্রকল্প পরিবীক্ষণ	৩৬৬
১৩.২.৬	প্রকল্প মূল্যায়ন	৩৬৬
১৩.৩	প্রকল্পের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের নির্দেশিকা	৩৬৭
১৩.৩.১	নীট বর্তমান মূল্য বা Net Present Value	৩৬৮
১৩.৩.২	সুবিধা-খরচের অনুপাত বা Benefit-Cost Ratio	৩৬৯

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
১৩.৩.৩	অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতকরা হার বা Internal Rate of Return	৩৬৯
১৩.৩.৪	Z শ্রেণীর প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের কৌশল	৩৭০
১৩.৪	প্রকল্প নেটওয়ার্ক	৩৭০
১৩.৪.১	পার্ট বা PERT এর নীতি ও ব্যবহার	৩৭০
১৩.৪.২	সংকটজনক পথ পদ্ধতি বা Critical Path Method	৩৭১
১৩.৪.৩	তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা MIS	৩৭১
১৩.৪.৪	প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা PMIS	৩৭১
১৩.৫	প্রকল্প সারপত্র	৩৭১
১৩.৫.১	প্রকল্প সারপত্র তৈরি এবং আকারভেদে তা অনুমোদনের ধাপ	৩৭২
১৩.৫.২	প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা কি এবং কেন?	৩৭৩
১৩.৫.৩	একটি ক, খ ও গ শ্রেণীর প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা	৩৭৪
১৩.৫.৪	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জটিলতম সমস্যার ওপর প্রকল্প সারপত্রের নমুনা	৩৭৫
১৩.৬	বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৭৮
১৩.৬.১	বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট	৩৭৮
১৩.৬.২	পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার উপাদান ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ	৩৭৯
১৩.৬.৩	বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৩৮০
১৩.৬.৪	বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা	৩৮৪
১৩.৬.৫	বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার উপায়	৩৮৪
১৪.০	**প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা**	**৩৮৫-৪৭৮**
১৪.১	পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রাণিসম্পদ	৩৮৫
১৪.১.১	কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব	৩৮৫
১৪.১.২	ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পশুপাখির অধিকার	৩৮৭
১৪.২	প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও নীতিমালা	৩৮৯
১৪.২.১	The Cruelty to Animals Act, 1920	৩৮৯
১৪.২.২	Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962	৪০০
১৪.২.৩	The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982	৪০৪
১৪.২.৪	পশুরোগ আইন, ২০০৫ এবং পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮	৪১১
১৪.২.৫	বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫	৪২৬
১৪.২.৬	National Livestock Development Policy, 2007	৪৩০
১৪.২.৭	জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮	৪৫৬
১৪.২.৮	মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০	৪৬৪
১৪.২.৯	পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১	৪৬৯
১৪.২.১০	পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩	৪৭৪
১৪.৩	কোড অব ভেটেরিনারি ইথিক্স	৪৭৭
১৫.০	**সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার সিলেবাস এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্র**	**৪৮৩-৫০৮**
১৫.১ হতে ১৫.৫	বিসিএস লিখিত পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ের (৩য় পত্র) সিলেবাস	৪৮৩

অধ্যায়	বিষয়	পাতা নং
অধ্যায়সমূহ	**এই বইয়ের অধ্যায়ভিত্তিক সাজানো সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষাসমূহের প্রাণিসম্পদ বিষয়ের (৩য় পত্র) প্রশ্নপত্র**	৪৯০
অধ্যায়-১	প্রাণিসম্পদ ও আমরা	৪৯০
অধ্যায়-২	গবাদিপশুর খামার স্থাপন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	৪৯১
অধ্যায়-৩	গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্র ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৪৯৩
অধ্যায়-৪	গবাদিপশুর বাসস্থান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪৯৪
অধ্যায়-৫	গবাদিপশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন	৪৯৫
অধ্যায়-৬	গবাদিপশুর রোগব্যাধির চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ	৪৯৬
অধ্যায়-৭	পশুপাখির সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	৪৯৮
অধ্যায়-৮	ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন	৫০০
অধ্যায়-৯	হাঁস-মুরগি পালন	৫০১
অধ্যায়-১০	জীববৈচিত্র্য ও আমাদের প্রাণিসম্পদ	৫০৪
অধ্যায়-১১	গবাদিপশু ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা	৫০৪
অধ্যায়-১২	গবাদিপশু ও পোল্ট্রি উপজাত	৫০৫
অধ্যায়-১৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৫০৫
অধ্যায়-১৪	প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা	৫০৮
	বছরভিত্তিক (১৯৮৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত) সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়ের (৩য় পত্র) বিগত প্রশ্নপত্র	**৫০৯-৫২৫**
	ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে আগষ্ট ২০১৩	৫০৯
	আগষ্ট ২০১১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১০	৫১৮
	আগষ্ট ২০০৯ থেকে আগষ্ট ২০০৭	৫২০
	ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৬	৫২৩
	আগষ্ট ২০০৫ থেকে আগষ্ট ২০০৪	৫২৫
	ফেব্রুয়ারি ২০০৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০২	৫২৭
	আগষ্ট ২০০১ এবং ফেব্রুয়ারি ২০০১	৫২৯
	আগষ্ট ২০০০ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮	৫৩০
	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ এবং আগষ্ট ১৯৯৬	৫৩১
	ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩	৫৩২
	আগষ্ট ১৯৯২ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৯২	৫৩৩
	আগষ্ট ১৯৮৮ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮	৫৩৪
	পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সসমূহ	**৫৩৬-৫৫০**
	বাংলা নিবন্ধ ও বইসমূহ	৫৩৬
	English Articles and Books	৫৩৮
	লেখকের অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ	৫৪৬

অধ্যায় ১
প্রাণিসম্পদ ও আমরা

১.১ উপক্রমণিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ যেখানে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ লোকের জীবিকা কৃষি। এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা তাই দেশের কৃষির অগ্রগতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রাণিসম্পদ কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুধু প্রাণিজাত খাদ্য যেমন- দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে এই অংশীদারিত্ব সীমাবদ্ধ করলে প্রাণিসম্পদের অবদানকে অবমূল্যায়ন করা হবে। দেশের জনগোষ্ঠির শতকরা ২০ ভাগ লোকের সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থান হয় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৭৩ শতাংশ। জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। চাষাবাদে পশুশক্তি, জ্বালানি, জৈব সার উৎপাদন, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হলে জিডিপি-তে এই অবদান শতকরা ১৫ ভাগের অধিক হবে। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুজাত দ্রব্য যেমন চামড়া, পশম, পালক, হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশে প্রাণিসম্পদ খাত বরাবরই দারুনভাবে অবহেলিত ছিল। ষাটের দশকে এদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পশ্চিম পাকিস্তানী চিন্তাধারার প্রভাব প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে এদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটতে থাকলেও জাতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের অভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। কৃষি উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে কেবলমাত্র খাদ্য শস্যকে কেন্দ্র করে কৃষির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার ফলে কৃষিতে সঠিক সাফল্য অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচন দুটোই অতীতে ব্যহত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সুস্থ জীবনের জন্য মানুষের যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই প্রাণিজ প্রোটিনে বিদ্যমান। প্রাণিজ প্রোটিন মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাই সুস্থ-সবল জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সুস্থ সবল জনগোষ্ঠির ওপর। গত দুই দশকে মানুষের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য ডিম, দুধ ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে অনেকাংশে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদন হয় বর্তমান লোক সংখ্যার তুলনায় তা অনেক কম। কারণ যে হারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই অনুপাতে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমিষের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এদেশে ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা ৬৭ ভাগ। এদের আয়ের উৎস, আত্মকর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে না পারলে কেবল শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অবহেলিত প্রাণিসম্পদ খাতের মৌলিক সমস্যাবলীর প্রতি কিছুটা দৃষ্টি প্রদান করা হয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এই সময়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে স্থিতিশীল করতে কিছু অবকাঠামো সৃষ্টিসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয়। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতির আলোকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে ক্ষুধা, অপুষ্টি, বেকারত্ব ও দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদের বহুমুখী অবদান ক্রমশই অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে পরিব্যাপ্তি লাভ করতে শুরু করে। এই খাতকে আরো লাভজনক করার উদ্দেশ্যে চিরাচরিত পদ্ধতির খামার ব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনা

নিবিড় ও সমন্বিত পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটানো হয়। প্রাণিসম্পদ খাতে সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে উন্নয়ন ভিত্তিক ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ব্যাপকতা লাভ করে। এই কর্মসূচির অধীনে দুঃস্থ ও নিঃস্ব মহিলাদের উন্নত হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যাম ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার যুবক ও মহিলাগণ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। এ সময়ে দুগ্ধ খামারগুলোতে ভর্তুকি প্রদান ও বিনা শুল্কে বিদেশ থেকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য আমদানির সুযোগ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যাংক ও বেসরকারি সংস্থা সমূহ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকারে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা প্রবর্তন করে। এর ফলে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে উল্লেযোগ্য সংখ্যক দুগ্ধ ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপিত হয়। তাছাড়াও দুগ্ধ খামারগুলোতে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের গাভী আমদানির জন্য পরিবহন ভর্তূকি সুবিধা প্রদান করার ফলে দেশে ডেইরি খামার সম্প্রসারণে আরও একটি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগ ও কার্যক্রম স্পষ্টতই রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রতিফলনের ইঙ্গিত বহন করে। উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল গাভীর উৎপাদন এবং উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ফলে বেসরকারি বিনিয়োগ বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন এবং দেশে দুঃস্থ বেকার ও মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্যাকেজ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্যাকেজ কর্মসূচিতে ছাগল পালন, বকনা পালন, গাভী পালন, মিনি হ্যাচারি স্থাপন, মুরগি পালন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপদান কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এই যুগসন্ধিক্ষণে ভেটেরিনারি চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের অভাব, মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীর স্বল্পতা, ঔষধ সংকট, প্রতিষেধক টিকার দুষ্প্রাপ্যতা ও উচ্চমূল্য, পশুপাখির খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণের অভাব ও উচ্চমূল্য এবং খাদ্যে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রমকে সচল রাখার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিকে বিবেচনার দাবী রাখে। তাছাড়া প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে স্থিতিশীল করতে বিশেষ ক্ষেত্রে যে সব নীতিমালার প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী নয় বা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, যেমন- Cruelty to Animals Act, Veterinary Practitioners Ordinance, পশুরোগ আইন, পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি। তাছাড়া মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বতন্ত্র ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যমান সমস্যাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা হলে এ দেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন আরো সহজ, ত্বরান্বিত ও গতিশীল হবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরো সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হবে।

১.২ প্রাণিসম্পদ বা লাইভস্টক কি?

আদিকাল থেকেই বিভিন্ন প্রাণী মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে আসছে। তখন মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনে পশু শিকার করত। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে। আর তখন নিজেদের প্রয়োজনে পশুকে পোষ মানিয়ে লালন পালন শুরু হয়। বন্য পশুকে গৃহে পোষ মানিয়ে লালন পালন করা থেকেই পশু পালনের উৎপত্তি। তাই, যে সকল পোষা পশু মানুষের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং উপকার লাভ করা যায় তাদের প্রাণিসম্পদ বা লাইভস্টক (livestock) বলা হয়। যেমন- ঘোড়া, গবাদিপশু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি। অনেকে পোষা গৃহপালিত পশু ও পোল্ট্রিকে লাইভস্টক বলে থাকে। প্রাণির পাকস্থলির প্রকৃতি ও রোমন্থনের উপর ভিত্তি করে পশুকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) রোমন্থক (Ruminants)ঃ গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, জিরাফ, হরিণ, উট ইত্যাদি।
খ) অ-রোমন্থক (Non-ruminants): হাতি, গন্ডার, ঘোড়া, জেব্রা, গাধা, শুকুর, কুকুর, বিড়াল, বানর ইত্যাদি।

১.২.১ গৃহপালিত পশুর জুলজিক্যাল শ্রেণী বিন্যাস (Zoological classification of domestic animals)

কিংডম (Kingdom)	- এনিমালিয়া (Animalia)	- গোত্র (Family)	- সুইড (Suide)
পর্ব (Phylum)	- কর্ডেটা (Chordata)	- গণ (Genus)	- সাস (Sus)
শ্রেণী (Class)	- ম্যামেলিয়া (Mammalia)	- প্রজাতি (Species)	- সাস স্ক্রোফা (Sus scrofa)
বর্গ (Order)	- আর্টিওড্যাকটাইলা (Artiodactyla)		- সাস ভিট্টাটাস (Sus vittatus)
গোত্র (Family)	- বোভিডি (Bovidae)		- সাস ডমেস্টিক (Sus domestic)
গণ (Genus)	- বস (Bos)	- গোত্র (Family)	- ক্যামেলিডি (Cammelidae)
প্রজাতি (দেশী গরু)	- বস ইন্ডিকাস (Bos indicus)	- গণ (Genus)	- ক্যামেলাস (Camelus)
(বিদেশী গরু)	- বস টরাস (Bos taurus)	- প্রজাতি (এশিয়ান হাতি)	- ক্যামেলাস ব্যাকট্রিয়নাস (C. bactrionus)
গণ (Genus)	- ক্যাপরা (Capra)	- গোত্র (Family)	- ইকুয়িডি (Equidae)
প্রজাতি (ছাগল)	- ক্যাপরা হিরকাস (Capra hircus)	- গণ (Genus)	- ইকুয়াস (Equus)
গণ (Genus)	- ওভিস (Ovis)	প্রজাতি- (ঘোড়া)	ইকুয়াস ক্যাবালাস (Equus caballus)
প্রজাতি (মেষ)	- ওভিস এরিজ (Ovis aries)	(গাধা)	ইকুয়াস অ্যাসিনাস (Equus asinus)

১.২.২ বিভিন্ন প্রাণির জুলজিক্যাল নাম

ক) গৃহপালিত পশুপাখি

১) মানুষ	- Homo sapiens sapiens	৯) কুকুর	- Canis lupus familiaris
২) দেশী গরু	- Bos indicus	১০) বিড়াল	- Felis lunensis
৩)বিদেশী গরু	- Bos taurus	১১) শূকর	- Sus scrofa domestica
৪) মহিষ	- Bos bubalis	১২) উট	- Camelus ferus
৫) ঘোড়া	- Equus caballus	১৩) মুরগি	- Gallus gallus domesticus
৬) গাধা	- Equus asinus	১৪) টার্কি	- Meleagridis gallopava
৭) ছাগল	- Capra hircus	১৫) হাঁস	- Anas hoschas domesticus
৮) মেষ	- Ovis aries	১৬) কবুতর	- Columba livia

খ) বন্য ও চিড়িয়াখানার পশুপাখি

১) বানর	- Macaca mulatta	৬) অজগর	- Python molurus
২) বাঘ	- Panthera tigris	৭) গোখরা	- Naja hannal
৩) শিয়াল	- Canis aureus	৮) কুমির	- Crocodilus porosus
৪) বন্য গরু	- Bos gaurus	৯) চিতা হরিণ	- Axis axis
৫) গয়াল	- Bos frontalis	১০)মায়া হরিণ	- Muntiacus muntjak

১.২.৩ সরকারি খামার ও চিড়িয়াখানাসমূহ

ক) বাংলাদেশে সরকারি গবাদিপশুর খামার

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা
রাজশাহী দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, রাজাবাড়িহাট, রাজশাহী
জেলা দুগ্ধ খামার, টিলাগড়, সিলেট
ছাগল উন্নয়ন ও পাঁঠা পালন কেন্দ্র, রাজাবাড়িহাট, রাজশাহী
ছাগল প্রতিপালন কেন্দ্র, ঝিনাইদহ
বগুড়া দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, বগুড়া
দুগ্ধ ও গবাদি জাত উন্নয়ন খামার, ফরিদপুর
মহিষ প্রজনন খামার, বাগেরহাট, খুলনা
ছাগল উন্নয়ন খামার, সাভার, ঢাকা
ছাগল উন্নয়ন ও পাঁঠা পালন কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা
চট্রগ্রাম দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, চট্রগ্রাম
বরিশাল দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, বরিশাল

খ) বাংলাদেশে সরকারি হাঁস-মুরগির খামার: বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৩৭টি হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে হাঁস-মুরগি উন্নয়নের জন্য দরিদ্র জনসাধারণ ও খামারিদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে প্রজনন মোরগসহ উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও বাচ্চা তোলার ডিম এসব খামার থেকে বিতরণ করা হয়। যে সকল জেলা বা স্থানে 'সরকারি হাঁস-মুরগির খামার' রয়েছে তাদের নাম দেয়া হল।

মিরপুর, ঢাকা	তেজগাঁও, ঢাকা	টাঙ্গাইল	কিশোরগঞ্জ	চাপাইনবাবগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ
মাদারিপুর	ফরিদপুর	রাজবাড়ী	কুড়িগ্রাম	মানিকগঞ্জ	সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম
কুমিল্লা	দিনাজপুর	সিলেট	রাঙ্গামাটি	জামালপুর	পাহাড়তলী, চট্রগ্রাম
পাবনা	সিরাজগঞ্জ	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	চুয়াডাঙ্গা	রাজাবাড়ীহাট,
বগুড়া	যশোহর	কুষ্টিয়া	বরিশাল	গোপালগঞ্জ	রাজশাহী
দৌলতপুর	পটুয়াখালী	সাতক্ষীরা	কুষ্টিয়া	জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	সোনাপুর, নোয়াখালী

গ) বাংলাদেশে সরকারি চিড়িয়াখানা: সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন ঢাকার মিরপুরে 'বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা' এবং উত্তরবঙ্গের রংপুরে 'রংপুর চিড়িয়াখানা' চালু আছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থার অধীনে দেশে বেশ কয়েকটি চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্ক চালু আছে।

১.৩ প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব

পৃথিবীতে বহু ধরণের পশুপাখি রয়েছে। এসব পশুপাখির মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে মানুষ যেগুলোকে স্থায়ীভাবে লালন-পালন করে এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায় তাদের গৃহপালিত প্রাণী (domestic animal) বলে। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি বিশেষভাবে পরিচিত। মানুষ কবে থেকে পশুপাখিকে পোষ মানিয়ে আসছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে ইতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, গৃহপালিত পশুপাখির আদি বাস ছিল জঙ্গলে। আদি মানুষও পশুপাখির সঙ্গে জঙ্গলে বাস করত। তখনকার দিনে মানুষ অন্ন-বস্ত্রের জন্য পশুপাখির উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা মাংস ভক্ষণ করে ক্ষুধা মেটাতো, চামড়া পরিধান করে শীত ও লজ্জা নিবারণ করত। হিংস্র জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য চামড়ার তাবু ব্যবহার করত। যখন প্রস্তর যুগ এলো এবং মানুষ ঘর-বাড়ি তৈরি করা শিখল, তখন জঙ্গল থেকে পশুপাখি শিকার করে বাড়িতে আনতে লাগল। এতে তাদেরকে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হতে হতো। যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়বৃষ্টি, সব মৌসুমে শিকার না পাওয়া, জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি। এসব অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মানুষ জঙ্গল থেকে জীবন্ত পশুপাখি ধরে বাড়িতে এনে বেধে রাখতো এবং এদেরকে পালন করতো। এভাবেই শুরু হয়েছিল বাড়িতে পশুপাখি পালন। মধ্যযুগেও কৃষি, পরিবহণ এবং খাদ্য উৎপাদনে পশুপাখিরর অবদান প্রধান ছিল। বর্তমান শিল্প বিপ্লবের যুগে কৃষি, শিল্প, খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৃহপালিত পশুপাখি অবদান রাখছে।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায়, আদিকাল থেকেই বিভিন্ন পশুপাখি মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে আসছে। বন্য পশুপাখিকে গৃহে পোষ মানিয়ে লালন পালন করা থেকেই পশুপাখি পালনের উৎপত্তি। যে সকল পোষা পশুপাখি মানুষের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং উপকার লাভ করা যায় তাদেরকে প্রাণিসম্পদ বা livestock বলা হয়। বাংলাদেশে মানুষ যেসব প্রাণিসম্পদ পালন করছে তাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ও মুরগি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রাণিসম্পদ আমাদের জীবনে নিম্নোক্তরুপে অবদান রাখে।

- **খাদ্যের উৎস:** প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস প্রধানত দুধ, মাংস, ডিম যার সিংহভাগ আসে প্রাণিসম্পদ থেকে। প্রাণিজ উৎসের খাদ্য শুধু প্রোটিনই নয় বরং এসব খাদ্য সুপাচ্য ও প্রায় সকল মানুষের নিকট অত্যন্ত রুচিকর ও সুস্বাদু।
- **শক্তির উৎস:** বিভিন্ন কাজে মানুষ গৃহপালিত গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, উট ও কুকুর ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আধুনিক যুগে মানুষ ও জন্তুর পরিবর্তে যন্ত্রের প্রবর্তন হলেও আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থা

প্রধানত গো-শক্তির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষ ছাড়াও গ্রামীণ পরিবহন, ফসল মাড়াই, ঘানি টানা ইত্যাদি কাজেও ব্যাপকভাবে গরু, মহিষ ও ঘোড়া ব্যবহার করা হয়।

○ **পোষাক-পরিচ্ছদের উৎস:** পশুর চামড়া, লোম, পশম ও মোহের (mohair) মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পোষাক ও জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়। পশুর চামড়া থেকে জুতা, সেন্ডল, সুটকেস, বেল্ট ও অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয়। পশম থেকে বিভিন্ন ধরণের কম্বল তৈরি হয়। এছাড়া ঠান্ডা দেশের উপযোগী গরম পোষাক তৈরিতে কোমল লোমবিশিষ্ট পশুচর্ম (fur) ব্যবহার হয়।

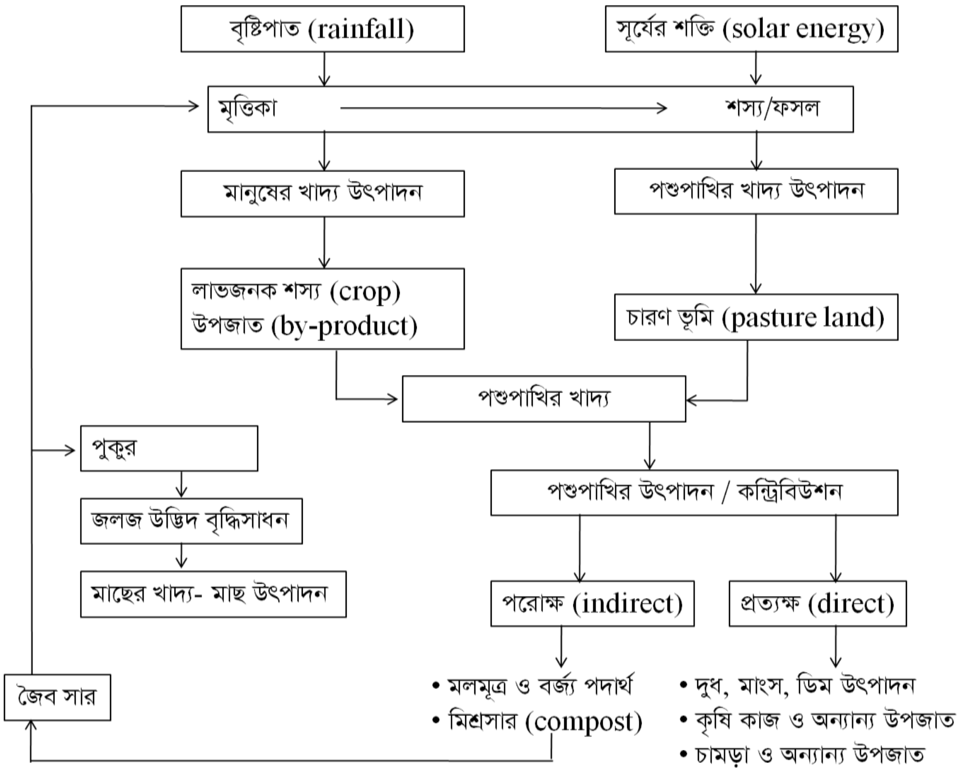

চিত্র ১.১ঃ প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব। এই চিত্রটি 'পশু পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা' বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০১)।

○ **শ্রান্তি বিনোদনের উৎস:** গৃহপালিত পশু বিশেষ করে ঘোড়া, কুকুর ও বিড়াল চিত্ত-বিনোদনে ব্যবহার হয়। ঘোড়ার দৌড়বাজি (race), মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ষাঁড়ের দৌড়বাজি ইত্যাদি মানুষের কতিপয় শ্রান্তি বিনোদন। অনেক মানুষ আবার পোষা কুকুর, বিড়াল ও কতিপয় ফ্যান্সি পাখি পালন করে আনন্দ পায়।

○ **পশুপাখি অখাদ্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রুপান্তর করে:** পশুপাখির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খাদ্য মানুষের খাবারের উপযোগী নয়। যেমন- খড়, ঘাস, কৃষি উপজাত ভূষি, কুড়া ইত্যাদি। এছাড়া পশুপাখিকে কিছু দানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় তাও নিম্নমানের। অপরদিকে এসব পশুখাদ্য রুপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন হয় মাংস, দুধ ও পশম।

○ **জৈব সারের উৎস:** মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষা ও শস্যের ফলন বৃদ্ধিতে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। পশুপাখির খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ উর্বরতামান মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

- **জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার:** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গোবর শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। এতে জ্বালানি কাঠের উপর চাপ কমে গাছ নিধন হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকতে সাহায্য করছে।
- **অন্যান্য ব্যবহার:**
  - ✓ অস্থি (bone)- বোতাম, আঠা (glue) তৈরিতে এবং পশুপাখির খাদ্য হিসেবে অস্থি ব্যবহার হয়।
  - ✓ চর্বি (fats)- খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়া পশুপাখির চর্বি রাসায়নিক পদার্থ, মলম, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ও সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।
  - ✓ গ্রন্থি (glands)- গ্রন্থির নিষ্কাশন ঔষধ তৈরি ও ফুড অ্যাডেটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়।
  - ✓ অন্ত্র ও পাকস্থলী- কুকুর, বিড়াল, শিয়াল, চিল, কাক, শকুন ইত্যাদি প্রাণির খাদ্য।
  - ✓ গবেষণাগারের পশুপাখি (laboratory animals)- মাইস, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণী গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়।
  - ✓ কতিপয় পশুপাখি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ মেরে ও খেয়ে সাহায্য করে।
- **ইন্টিগ্রেটেড খামারের আয়ে পশুর অবদান**
  - ✓ চাষকৃত ফসল বা ঘাসকে পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদনে রুপান্তরিত করা।
  - ✓ চাষের অযোগ্য এলাকার ঘাস বা অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জঙ্গল পশুর চারণের মাধ্যমে পরিস্কার রাখা যায়।
  - ✓ মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী শস্যের উপজাত পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পশুর উৎপাদন (মূল্যবান আমিষে রুপান্তরিত) বৃদ্ধি করা হয়।
  - ✓ পশু শিল্পে সারা বছর সমভাবে শ্রমিকের কাজের সংস্থান হয়।

সারণি ১.১ঃ বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান*

ক্রমিক	পশুপাখি	সংখ্যা (লক্ষ)
১	গরু	২৩৯.৩৫
২	মহিষ	১৪.৭৮
৩	ছাগল	২৫৯.৩১
৪	ভেড়া	৩৪.০১
৫	হাঁস	৫৪০.১৬
৬	মুরগি	২৭৫১.৮৩

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ বছরের তথ্য।

১.৩.১ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং এখানে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর খাদ্যের মূল উৎস হিসেবেই শুধু নয় বরং কৃষি কাজের জন্যও এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম লোক দেশের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। এদের জন্য কাজ দরকার। দেশের আবাদি জমির পরমিাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২১ একর। এর সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এজন্য দরকার অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রাণিসম্পদ বিরাট ভূমিকা রাখছে। আমাদের দেশে এই প্রাণিসম্পদ দুধ, মাংস, ডিম, চামড়া, জ্বালানি, জৈব সার, ভারবহন কাজে শ্রম ইত্যাদি দিয়ে নিম্নোক্তরুপে দেশে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- দেশের প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা প্রায় ১.৭৩ ভাগ যোগান দেয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ বছরের তথ্য)। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে জিডিপি নির্ণয়ের সময় প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদিত খাদ্য ছাড়াও কৃষি খাতে ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে অনেক অবদানকে টাকায় রুপান্তরিত করার সহজ উপায় না পেয়ে এই উপখাতের প্রকৃত অবাদন অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে যা নিতান্তই

দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। কর্ষণ শক্তি, গ্রামীণ পরিবহন, শস্য মাড়াই, ঘানি টানা, জৈব সার ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত গোবর প্রভৃতির সঠিক আর্থিক মূল্যায়ন হলে দেখা যাবে জাতীয় উৎপাদনে প্রাণিসম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ। জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান না বাড়লেও এ খাতের ভলিউম বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,৬৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।

- দেশের জনসমষ্টির ২০% সার্বক্ষনিক এবং ৫০% খন্ডকালীন পশুপাখি পালনে কর্মরত। গ্রামীণ জনসাধারণের এই বিরাট অংশ বিশেষ করে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস হল দুধ, মাংস, ডিম, হাল, ইত্যাদি বিক্রয়লধ অর্থ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।
- যদিও বর্তমানে কৃষি কাজে যান্ত্রিকীকরণ বাড়ছে তথাপি চাষাবাদে পশুশক্তির অবদান এখনও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে হাল চাষের জন্য কর্ষণ শক্তি ও গ্রামীণ পরিবহনের প্রায় ৫০% ভাগ যোগান দেয় দেশের গো-মহিষ। বছরে প্রায় ২২ মিলিয়ন টন শুকনো গোবর জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করে থাকি (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)।
- আমাদের রপ্তানি আয়ে প্রাণিসম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গবাদিপশুর চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য প্রাণিসম্পদজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির মাধ্যমে ৪১৩৩.৫২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়েছে (Export Promotion Beuro, 2012-13 Summation data) যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭.৮২ ভাগ।

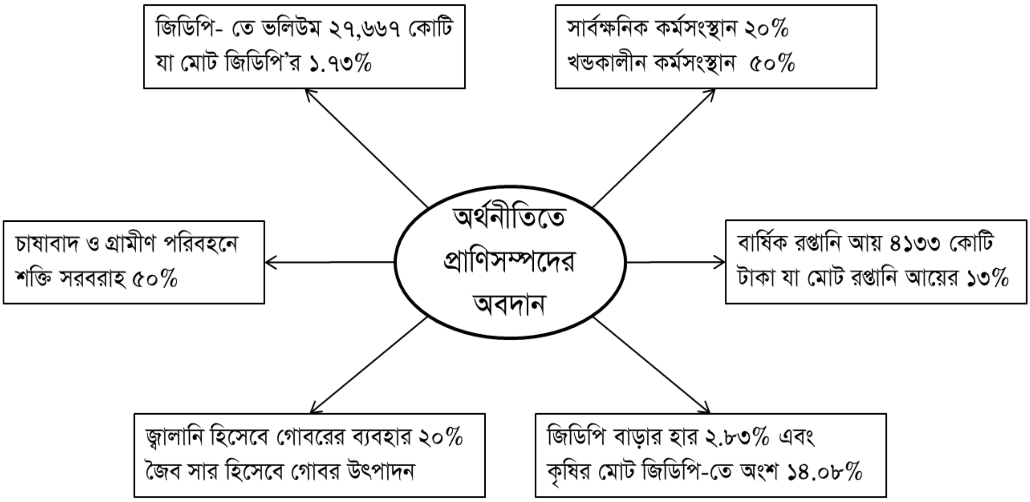

চিত্র ১.২ঃ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান।

১.৩.২ দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে পশুপাখির গুরুত্ব

পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর মানুষকে প্রথম কর্মসংস্থানের সন্ধান দিয়েছিল পশুপাখি। তারপর পর্যায়ক্রমে বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে পশুপাখিকে কেন্দ্র করে মানুষ নিজেই বিভিন্নমুখী আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এবং প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা মেটানো ছাড়াও প্রয়োজনোতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের পথ দেখিয়ে দারিদ্র দূরীকরণে যুগে যুগে ভূমিকা পালন করে এসেছে। বর্বর যুগে মানুষ পশুর সঙ্গে একসাথে বাস করত। পশুর মাংস ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করত এবং চামড়া পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করত। তাই তারা পশু শিকার করার জন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। শিকার করার জন্য নানা রকমের যন্ত্র বানাতো। এভাবে মানব জাতির প্রথম আত্মকর্মসংস্থানের উদ্ভব হয়েছিল যাকে শিকার করা বলে। সেকালে

যারা শিকার ধরতে পারত তাদের খাওয়া-পরার চাহিদা মিটে যেত, ফলে তাদের আর অভাব থাকত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশুপাখি প্রাচীনকালেও মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে প্রথম স্থানে ছিল। মানুষ যখন কিছুটা সভ্য হল, আবাসস্থল গড়ে তুললো। গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি পালন করতে শুরু করল। মাঠে পশু চরানোর জন্য রাখাল নিয়োগ করল। এমনিভাবে রাখালি পেশার উদ্ভব হলো। পরবর্তীকালে সময়ের সাথে সাথে কৃষি, পরিবহণ, খাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি কাজে পশুর ব্যবহার আরও বিস্তার লাভ করল। পশুপাখি কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরণের পেশার উদ্ভব হল। এদের মধ্যে দুধ বিক্রির পেশা যারা বেছে নিলো তাদের গোয়ালা, পশুর গাড়ি চালকদের গাড়োয়ান, গরু দিয়ে ঘানি থেকে তেল উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কলু, আর ফসল ফলানো যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হল তারা কৃষক বলে সমাজে পরিচিত হল। এরপর এলো বিজ্ঞান ও শিল্প যুগ। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে পশুপাখির ভূমিকা আরও ব্যাপক হল। শিল্পোন্নত দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রাণিসম্পদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাটালো। ফলে তারা প্রয়োজনোতিরিক্ত দুধ-মাংস-ডিম উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করতে লাগল। অন্যদিকে, পশুপাখির উপজাত দ্রব্য, যেমন- চামড়া, পশম, পালক, চর্বি, হাড়, রক্ত, খুর, শিং থেকে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল। বর্তমান বিশ্বে তারা ধনী দেশ বলে গণ্য হচ্ছে। বর্তমানে সেসব দেশের বড় বড় খামার ও উপজাত দ্রব্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত বহু লোক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে ব্যক্তি, দেশ ও জাতির আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

এদেশের আবহাওয়া পশুপাখি পালনের জন্য উপযুক্ত। দারিদ্র দুরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানে ছাগলের স্থান প্রথম। ছাগল পালন করতে শ্রম কম লাগে। খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা খরচ কম। দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বছরে দু'বারে মোট ৪-৮ টি বাচ্চা প্রসব করে। এ জাতের ছাগলের মাংস ও চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা। তাই বেশি মূল্যে বিক্রি করা যায়। তাছাড়া একটি পরিবারে দু'টি গাভী থাকলে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতায় কষ্ট পেতে হয় না। আমাদের দেশে আগে হাঁস-মুরগি সাধারণত গৃহস্থের বাড়িতে পালন করতে দেখা যেত। গৃহস্থ বাড়ির উঠানে আর আনাচে কানাচে পরিত্যক্ত শস্য কণা, উচ্ছিষ্ট খাবার, পোকা মাকড়, কঁচি ঘাস ইত্যাদি খেয়ে হাঁস-মুরগি বছরে যে ডিম দিতো গৃহস্থের তাই ছিল বেশ লাভজনক। ক্রমশঃ মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে হাঁস-মুরগি গৃহস্থের উঠানেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলোনা-তা জায়গা করে নিলো সুপরিকল্পিত খামারে, শহরের পাকা বাড়ির বারান্দায় বা এক চিলতে উঠানের কোণে কিম্বা ছাদে। হাঁস-মুরগি পালন এখন কর্মসংস্থান, আয় ও পুষ্টির উৎস। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি পালন করতে দেখা যায়। কিন্তু এখনও বহু জায়গায় সনাতন পদ্ধতিতে পশুপাখি পালন করা হচ্ছে। সেজন্য পশুপাখি আমাদের বড় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র ও বেকার। সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পশুপাখি পালন করলে খুব সহজে কর্মসংস্থানের উপায় হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে। তাছাড়া আমাদের দেশে প্রতিদিন অসংখ্য পশুপাখি জবাই হয়। কোরবানির সময়ের কথা বলাই বাহুল্য। এসব জবাইকৃত পশুপাখির উপজাত দ্রব্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার জন্য বিপুল বেকার জনগোষ্ঠিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লাগানো যেতে পারে। ইতোমধ্যে পশুপাখির উপজাত দ্রব্যভিত্তিক বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এদেশে গড়ে উঠেছে। ফলে ব্যক্তির আত্মর্কসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণের সাথে সাথে আমাদের দেশও ঐশ্বর্যশালী হবে।

১.৩.৩ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় পশুপাখির অবদান

জনগণের সুস্বাস্থ্য হচ্ছে একটি দেশের সম্পদ। সব সময়ে সব মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পছন্দমত পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকার নাম খাদ্য নিরাপত্তা। খাদ্য নিরাপত্তার সংজ্ঞানুযায়ী তখনই খাদ্য নিরাপত্তা বিরাজমান যখন সবার কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সবসময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ এবং পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অধিক মাত্রায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা- বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কৃষি, বন ও মৎস্য সম্পদের ওপর বিরুপ

প্রতিক্রিয়া পড়ছে এবং খাদ্য উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেশের ৫০% পরিবার বছরের কোন না কোন সময় খাদ্য সংকটে থাকে, ২৫% পরিবার নিয়মিতভাবে সারা বছর খাদ্য সংকটে থাকে, ১৫% পরিবার সব সময় পরবর্তী বেলার খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকে এবং ৭% মানুষ কখনই ৩ বেলা খেতে পায় না। বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবে এদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। বেঁচে থাকা শিশুর অর্ধেকের বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। ছোট বাচ্চারা অপুষ্টিজনিত নানাবিধ রোগে ক্রমাগতভাবে ভোগে এবং তাদের দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত শ্লথ হয় ও বুদ্ধি এবং মননের বিকাশ ঘটে না। এ সমস্তই ভবিষৎ প্রজন্ম তথা সমগ্র জাতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, শৈশবে আমিষ ও বিপাকীয় শক্তির ঘাটতি বেশি হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে শিশুদের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে গঠিত হয় না এবং পরবর্তীতে ঘাটতি পূরণ হলেও মস্তিষ্কের এ ক্ষতি আর পূরণ হয় না। ফলে তাদের মেধা অবিকশিত থেকে যায়। অপুষ্টির কারণে বাড়ন্ত ও বয়স্ক ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ফলে মানুষ অলস ও কর্মহীন হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ট হয় না, চিন্তা শক্তি লোপ পায়, ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হয়, উচ্ছৃঙ্খল ও অদৃষ্টবাদী হয় এবং নৈতিকতা বর্জিত কাজে লিপ্ত হয়। জাতীয় উন্নয়নে এটা এক বিরাট বাধা। জনগোষ্ঠির ওপর পুষ্টিহীনতার প্রভাব নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত হল-

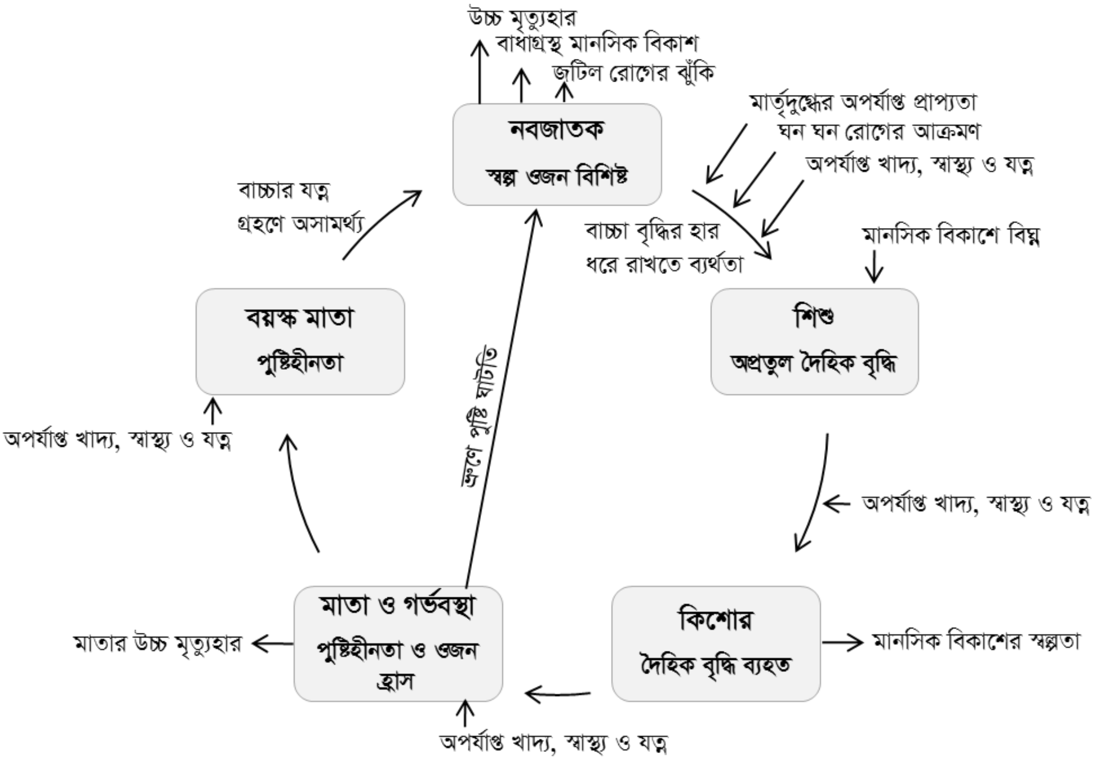

চিত্র ১.৩ঃ মানব জীবনে পুষ্টিহীনতার বিরুপ প্রতিক্রিয়া। United Nations Administrative Committee on Coordination কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত চিত্রটি এখানে বাংলায় রপান্তর করা হয়েছে (SCN 2000)।

আমাদের জাতীয় খাদ্য নীতিতে (২০০৬) খাদ্য নিরাপত্তায় চিহ্নিত তিনটি নিয়ামক হল- খাদ্যের লভ্যতা (availability of food), খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষমতা (access to food) এবং খাদ্যের জৈবিক ব্যবহার (utilization of food)। সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে সব কয়টি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পারিক নির্ভরতা বিদ্যমান

থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব বিষয়ের মধ্যে সুষম ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। খাদ্য নিরাপত্তার উপরোক্ত তিনটি নিয়ামক বিবেচনায় নিয়ে বৃটেনের প্রভাবশালী সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তৈরি 'দ্য গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১২' বা বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা তালিকা-২০১২ তে বিশ্বের ১০৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। উক্ত তালিকা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে মানুষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য দৈনন্দিন আমিষের চাহিদা ১ গ্রাম। একজন বয়স্ক বাংলাদেশীর গড় ওজন ৫৫ হতে ৬০ কেজি হলে তার জন্য দৈনিক আমিষের চাহিদা হবে ৫৫ থেকে ৬০ গ্রাম। প্রাণিজ আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ আমিষে মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডের উপস্থিতি কম থাকে। তাই পুষ্টিবিদগণ দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী মোট আমিষের কমপক্ষে ৩০-৫০% প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরামর্শ দেন। বিশেষ করে প্রসূতি মা ও শিশুদের খাদ্যের অর্ধেক আমিষ প্রাণিজ উৎস থেকে হওয়া বাঞ্ছণীয়। উন্নত বিশ্বে জনপ্রতি আমিষের মোট চাহিদার ৭০% প্রাণিজ আমিষ থেকে সরবরাহ করা হয় অথচ বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১০-১২%। উদ্ভিজ আমিষের তুলনায় প্রাণিজ আমিষের জৈবমূল্য বেশি এবং প্রাণিজ আমিষে সকল বয়সের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডগুলো বিদ্যমান থাকে। আর এই প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হল দুধ, ডিম ও মাংস যেগুলো গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে সহজেই পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী দৈনিক ২৫০ মিলি দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস এবং বছরে ১০৪ টি (দৈনিক ১৬ গ্রাম) ডিম থেকে প্রাপ্ত প্রাণিজ আমিষের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮-৪০ গ্রাম। কয়েকটি খাদ্যের আমিষের জৈবমান সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সারণি ১.২ঃ কয়েকটি খাদ্যের আমিষের জৈবমান (biological value)।*

ক্রমিক	খাদ্যের নাম	জৈবমান (%)
১	মানুষের দুধ	৯৬
২	গরুর দুধ	৮৯
৩	ডিম	৯৫
৪	মাছ	৯০
৫	মাংস	৮১
৬	চাল	৬৮
৭	গম	৬৩
৮	আলু	৭৩
৯	মশুর ডাল	৫৫
১০	মুগ ডাল	৬০
১১	ছোলা	৭৫
১২	সয়াবিন	৭৬

*ড. মামুনুর রশিদ এর বই থেকে নেয়া হয়েছে (রশিদ ২০০৩)।

সুস্থ জীবনের জন্য মানুষের যে পুষ্টি উপাদানগুলো অপরিহার্য তার বেশির ভাগই প্রাণিজ প্রোটিনে বিদ্যমান। প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হচ্ছে- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি। প্রাণিজ প্রোটিন মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ভর করে সুস্থ সবল জনগোষ্ঠির ওপর। তাই সুস্থ-সবল জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ। গত দুই দশকে মানুষের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য মুরগীর ডিম এবং গরুর দুধ ও মাংসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে অনেকাংশে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ ডিম ও দুধ উপাদন হয় বর্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় তা অনেক কম। কারণ যে হারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই অনুপাতে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবে ডিম, দুধ ও মাংসের পরিমাণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমিষের ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে।

১.৩.৪ কৃষি কাজে গবাদিপশুর গুরুত্ব

পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিকাজে পশুশক্তির ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে কৃষির সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজে গবাদিপশুর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। কারণ, এদেশে পশুশক্তিকে একেবারে বাদ দিয়ে যান্ত্রিক চাষের প্রচলন করতে অরো সময় লাগবে। এক তথ্য থেকে জানা যায়, আমাদের দেশে হালচাষ, গাড়ি টানা ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত শক্তি এবং গোবর, চনা ইত্যাদির দাম ধরলে প্রাণিসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ১৫% অবদান রাখে। ফসল উৎপাদন করার জন্য যেসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে পশুশক্তির ব্যবহার হয়ে আসছে সেগুলো হল-

জমিতে হালচাষ: সাধারণত ষাঁড় বা মহিষ দিয়ে হালচাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। আগেকার দিনে যখন কলের লাঙ্গল ছিল না তখন হালচাষ সম্পূর্ণভাবে গবাদিপশুর উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে জমি চাষ করার জন্য ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গল আবিস্কার হয়েছে। কিন্তু খন্ড খন্ড জমিতে ট্রাক্টর চালানো যায় না। ব্যক্তি মালিকানাধীনে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খন্ড খন্ড জমির সৃষ্টি হয়। এসব জমিতে ট্রাক্টরের পরিবর্তে গবাদিপশু চালিত লাঙ্গলের ব্যবহার হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যেমন- ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে এখন পর্যন্ত ট্রাক্টর অপেক্ষা গবাদিপশু চালিত লাঙ্গলের প্রচলন বেশি। আমাদের দেশে ১০.৮২ মিলিয়ন হালের গরু আছে। গবেষণা থেকে জানা যায়, একটি মহিষ প্রত্যহ ৫ ঘন্টা কাজ করলে ৫২০ মেগাওয়াট শক্তি ব্যয় হয় এবং কোন বিরতি ছাড়াই একটানা কয়েক ঘন্টা কাজ করতে পারে। একজোড়া বলদ দৈনিক এক একর জমির এক-তৃতীয়াংশ চাষ করতে পারে। হালের পশুর সংখ্যার অভাব মাত্র ৭.৮৫% হলেও মোট কর্ষণ শক্তির অভাব প্রয়োজনের তুলনায় ৪০.৮%। কারণ, প্রতিটি পশুর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ০.২৫ হর্স পাওয়ার থেকে কমে ০.১৭ হর্স পাওয়ারে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য ও প্রজননের জন্য উন্নতমানের ষাঁড়ের অভাবই এর প্রকৃত কারণ। পশু থেকে কতটুকু শক্তি পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর। যথা-

- পশুর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, দেহের গঠন, ওজন ও জাত।
- পশুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য। জলবায়ু, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা।
- জোয়াল ও মইয়ের আকার, ওজন ও শারীরিক গঠন ইত্যাদি।

পশুচালিত পরিবহন: কৃষির সঙ্গে পরিবহন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বীজ, যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি মাঠে আনা-নেয়া, ফসল বাড়িতে ও বাজারে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতির জন্য পরিবহনের প্রয়োজন। এসব কাজের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ির প্রচলন আছে। উন্নয়নশীল দেশে যেসব অঞ্চলে পাকা রাস্তা নেই সেখানকার মানুষ পশুচালিত পরিবহনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকা আরব দেশগুলোতে পশুচালিত পরিবহনের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মহিষ ও গরুর গাড়ি প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। কৃষির বিভিন্ন কাজে কৃষক প্রধানত এসব গাড়ি ব্যবহার করে-

- বেশির ভাগ গ্রামে পাকা রাস্তা নেই।
- দরিদ্র কৃষক বেশি মূল্যে মোটরযান ভাড়া করতে পারেন না।
- ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে পশুচালিত পরিবহন চালানো যায়।

জমিতে গোবর সারের ব্যবহার: বাংলাদেশের কৃষিজমি দিন দিন অনুর্বর হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক মাত্রা ও অনুপাতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। কৃষিজমির উর্বরাশক্তি ফিরে পেতে হলে গবাদিপশুর গোবর সার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ সার একদিকে যেমন মাটির সার্বিক অবস্থা উন্নত করে অন্যদিকে অধিক ফসল ঘরে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কৃষি উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। গোবর কিছুদিন মাটির গর্তে রাখলে পচে উত্তম সারে রুপান্তরিত হয়। এটা কালো রঙের ও মাটির মতো নরম। এ সার আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে আমাদের দেশের গোবরে শতকরা ১.৪-২.০ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৯-১.০ ভাগ ফসফরাস এবং ০.৭-০.৮ ভাগ পটাশিয়াম থাকে। এক টন গোবরের শুষ্ক পদার্থে গড়ে ১৭০ কেজি জৈব পদার্থ, ৪.৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১.৯ কেজি ফসফরাস ও ১.৫ কেজি পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এদেশের

গোমূত্রে ০.০৪-০.৯% নাইট্রোজেন, ০.১৩-০.৪% পটাশিয়াম, ০.০২-০.১৩% ফসফরাস থাকে। তবে গবাদিপশুর গোবর ও মূত্রের রাসায়নিক গঠন অবশ্যই খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ মিলিয়ন টন কাচা বা ২২ মিলিয়ন টন শুকনো গোবর উৎপন্ন হয় যা বর্তমানের রাসায়নিক সারের ১০%।

কম্পোষ্ট বা আবর্জনা সার: গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট খড়কুটা থেকে কম্পেষ্ট সার তৈরি করা যায়। কম্পোষ্ট অর্থ মোটামুটি অপচনশীল ও দুর্গন্ধহীন জৈব পদার্থ যা বায়ুর উপস্থিতিতে উত্তাপ সৃষ্টির মাধ্যমে এক বা একাধিক জৈব পদার্থের মিশ্রণ পচনের পর উৎপন্ন হয়। কম্পোষ্ট (compost) ল্যাটিন শব্দ। গরু-বাছুরের উচ্ছিষ্ট খাবারের সঙ্গে আগাছা, কচুরিপানা, শস্যের অবশিষ্টাংশ মিশ্রিত করে কয়েকটি স্তরে সাজিয়ে পচানো হয়। কম্পোষ্ট সার জমিতে আদর্শ জৈব পদার্থ যোগ করে। শাক-সবজি ও ফলের চারা জন্মানোর জন্যেই এ সার বীজতলায় ব্যবহার করা অপরিহার্য।

জ্বালানি কাজে শুকনো গোবরের ব্যবহার: শুকনো গোবর আমাদের গ্রাম বাংলার কৃষকের ঘরে উত্তম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এদেশের গরীব কৃষক সম্প্রদায় নিতান্ত অভাবী। কেরোসিন কিংবা কাঠ কেনার মতো সঙ্গতি তাদের নেই। অথচ কৃষকে বাড়িতে কৃষির আনুসঙ্গিক কাজ, যেমন- ধান সিদ্ধ, মুড়ি বা খই ভাজা প্রভৃতিতে প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন। সাধারণত শুকনো গোবর, গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে তারা জ্বালানির কাজ চালায়। এছাড়াও গরুর গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে এবং অবশিষ্ট গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কৃষির অন্যান্য কাজে পশুর গুরুত্ব: মাঠে ফসল উৎপাদন ছাড়াও কৃষির সঙ্গে জড়িত আরও বিভিন্ন ধরণের কাজ আছে, যেমন- শস্য নিড়ানি, ধান মাড়াই, শস্য ভাঙ্গানো ইত্যাদি। এগুলোতেও পশুর ব্যবহার হয়ে থাকে।

- শস্য নিড়ানি: শস্যক্ষেতের আগাছা পরিস্কার না করলে শস্যের ক্ষতি হয়। এজন্য কাঠ দিয়ে লম্বা চিরুনির মতো যন্ত্র তৈরি করা হয়। দেশীয় ভাষায় এটিকে মারাকাচি বলে। মই ও লাঙ্গলের মতোই মারাকাচিও গরু দিয়ে টানা হয়। তাতে আগাছা উঠে আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই সে আগাছা রৌদ্রে শুকিয়ে যায় ও মাঠ আগাছামুক্ত হয়।
- ধান মাড়াই: ধান মাড়াই কাজে একত্রে অনেকগুলো গরু ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাঠে ধানগাছগুলো হাত দিয়ে ছাড়িয়ে ধান গাছের বিছানা তৈরি করা হয়। বিছানো ধানের মাঝখানে একটি গরু রাখা হয়। ঐ গরুটি সঙ্গে আরও গরু সারিবদ্ধভাবে বেঁধে ছড়ানো ধানের উপর ঘোরানো হয়। মাঝখানের গরুটি ওদের সাথে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে এবং সবগুলো গরুকে চক্রাকারে ঘুরতে সাহায্য করে। গরুর পা দিয়ে দলিত মতিত হয়ে গাছ থেকে ধান আলাদা হয়ে আসে।
- আখ মাড়াই: আমাদের দেশের বহু কৃষক আখ চাষ করেন। আখ থেকে গুড়ও উৎপাদন করেন, বিশেষ করে, যেসব এলাকায় চিনির কল নেই। আখ থেকে রস বের করার পদ্ধতিকে আখ মাড়াই বলে। আখ মাড়াইয়ের কাজে গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়।
- ঘানি টানা: এদেশের কৃষকদের মধ্যে কলু নামে এক সম্প্রদায় আছে যারা তেলবীজ থেকে তেল উৎপাদন করেন। সরিষা, তিল বা নারিকেল থেকে তেল উৎপাদন করার জন্য ঘানি টানার কাজে গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়।

১.৩.৫ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুপাখির গুরুত্ব

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পশুপাখির বেশ গুরুত্ব রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপাখি পালন করে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি অংশ বিদেশে রপ্তানি করছে। এভাবে তারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। যে দেশ যত বেশি আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে বিশ্ববাজার থেকে সে দেশ তত বেশি মুদ্রা অর্জন করতে পারছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দুধ, মাংস, ডিম ও উপজাত দ্রব্য থেকে তৈরি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এশিয়ার মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া মাংস ও দুধ মধ্যপাচ্যে রপ্তানি করছে। পশুপাখি থেকে উৎপাদিত নিম্নলিখিত রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে তা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। যথা-

- সংরক্ষিত দুধ, মাংস ও ডিম।

- ভেড়ার পশম থেকে উত্তম শীতবস্ত্র তৈরি হয়। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভেড়ার পশম থেকে উত্তম কাপড় তৈরি করে যা পৃথিবীর সর্বত্রই রপ্তানি হয়। তবে আমাদের দেশের ভেড়ার পশম নিম্নমানের হওয়ায় এ থেকে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয় না। তবে ভেড়াসহ অন্যান্য গবাদিপশুর চুল থেকে ব্রাশ, বস্ত্র, কৃত্রিম চুল প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- পশুর চামড়া থেকে ভেনেটি ব্যাগ, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, খেলনা, সৌখিন দ্রব্য ছাড়াও অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হয়।
- শিং, খুর ও হাড় থেকে জিলাটিন, আঠা, গহনা, চিরুনি, বোতাম, ছাতা ও ছুরির বাট, হাড়ের গুড়া থেকে সার প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
- পশুপাখির রক্তে খনিজ পদার্থ, হরমোন ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান থাকে। এসব রক্ত সংগ্রহ করে শুকিয়ে মানুষ ও পশুর খাদ্য তৈরি করা যায়। রক্ত থেকে কোলাজেন তৈরি করা হয়।
- গবাদিপশুর ক্ষুদ্রান্ত থেকে সার্জিক্যাল সুতা, টেনিস র‌্যাকেট স্ট্রিং, মিউজিক্যাল স্ট্রিং প্রভৃতি তেরি হয়।
- গবাদিপশুর দাঁত দিয়ে বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি তৈরি করা যায়।
- পশুপাখির চর্বি থেকে মোমবাতি, গ্লিসারিন, সাবান, লুব্রিক্যাটিং তেল, সিনথেটিক রাবার ও প্লাস্টিক তৈরি হয়।
- গবাদিপশুর অগ্নাশয় (pancreas) থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় এবং এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (adrenal gland) থেকে ঔষধ তৈরি হয়।

প্রাণিসম্পদ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে?

গৃহপালিত পশুপাখি থেকে প্রাপ্ত দুধ, মাংস ও ডিম এবং উপজাত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত ব্যবহার্য দ্রব্য বিশ্ববাজারে বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ বিদেশে চামড়া রপ্তানি করছে। চামড়া উৎপাদনের ৮১% ওয়েট ব্লু (wet blue) বিদেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ শুধু চামড়া থেকেই প্রতিবছর ৫০০ মিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় বিশটির মতো হাড় গুড়া করার কারখানা রয়েছে যা থেকে বছরে প্রায় ৫১১৫ টন পশুর হাড় উৎপাদিত হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিদেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর কারণগুলো সংক্ষেপে এখানে দেয়া হয়েছে। যথা-

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারের নীতি প্রণয়নে মন্থর গতি ও স্বল্প বিনিয়োগ।
- পশুপাখির খাদ্যের অভাব ও দারিদ্রতার কারণে অনেক সময় পশুপাখি পালনের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যায়।
- বাস্তবমুখী গবেষণার অভাব, গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে নানা ধরণের বাধা, যেমন- অর্থাভাব, উৎসাহের অভাব, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থার অভাব।
- প্রাণিসম্পদ ও প্রাণিজাত দ্রব্যের সঠিক মূল্যমান নির্ধারণ না করায় পশুপাখি ব্যবসায়ীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি।
- বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণিসম্পদের উপজাত দ্রব্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চারণভূমি কমে গেছে এবং প্রাণিসম্পদ উপজাত দ্রব্য ব্যবহারের উপর গবেষণার অভাব।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের গৃহপালিত পশুপাখি অন্যতম সম্ভাবনাময় সম্পদ। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে প্রাণিসম্পদভিত্তিক বিভিন্নমুখী কর্মে নিয়োগ করে শস্য উপজাত থেকে সহজেই পর্যাপ্ত পরিমাণ গো-খাদ্য উৎপাদনসহ উন্নত মানসম্পন্ন ও দামে সস্তা প্রাণিসম্পদজাত রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া সম্ভব। কারণ, আমাদের বিপুল জনশক্তি ও পশুপাখি পালনের অনুকুল পরিবেশ আছে। এখন শুধু প্রয়োজন এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ।

- গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার প্রচুর চাহিদা। কাজেই এর উৎপাদন বাড়িয়ে অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের 'বেঙ্গল মিট' কারখানা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাংস রপ্তানি করে আসছে। মাংস থেকে উৎপাদিত খাদ্য ও সংরক্ষিত মাংস রপ্তানি করা যায়। তাছাড়া দুধ ও ডিমের উৎপাদন বাড়িয়ে তা থেকে দুগ্ধজাত ও ডিমজাত খাদ্যদ্রব্য, যেমন- মিষ্টি, সন্দেশ, পুডিং, কেক, বিস্কুট, চকোলেট তৈরি করে রপ্তানি করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন- খেলনা, গহনা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা যায়। এসব কাজে এদেশের কুমার, স্বর্ণকার, কাঠ মিস্ত্রি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক নিয়োজিত করলে সুন্দর ও নতুন ধরণের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। কারণ এরা এসব কাজে সুনিপুণ ও দক্ষ কারিগর।
- মহিলা ও বেকার ব্যক্তিদের দিয়ে কুটির শিল্প কাজ, যেমন- ভেড়ার পশম থেকে কার্পেট, মোটা কম্বল প্রভৃতি তৈরিতে লাগানো যায়। তাছাড়া দেশের ভেড়ার জাত উন্নয়ন করে উত্তম পশম উৎপাদন করা যেতে পারে যা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

১.৪ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষা ও কর্মকাঠামো

সৃষ্টির উষালগ্ন সেই আদিকাল হতে আদিম বনবাসী ও গুহাবাসী মানুষ সভ্যতার আলো দেখেছিল পশুপাখির হাত ধরে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে (যেমন-যাতায়াত, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক নির্ভরতা, খাদ্যের নির্ভরতা, সৌন্দর্য্য চর্চা, একাকীত্বের বন্ধু, পাহারাদারি, অব্যর্থ গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদি) পশুপাখি তথা প্রাণিসম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ কৃষিপ্রধান এদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। মেধাসম্পন্ন জাতি তৈরিতে এর অবদান সবার ওপরে। দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রাণিসম্পদ উপখাতটি শস্য উপখাতের মত গুরুত্ব পায়নি। তাই শস্যের মত এর প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। ফলে বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রাণিসম্পদ যথাযথ অবদান রাখতে পারেনি। অথচ দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সম্ভাবনা এই উপখাতে বেশি এবং সহজসাধ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠির সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি। প্রাণিসম্পদে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে সহজেই সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র দূরীকরণে প্রাণিসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রয়োজন প্রাণিসম্পদে দক্ষ পেশাজীবি। প্রাণিসম্পদ পেশাজীবিরা বিভিন্ন গবেষণা, বিভিন্ন প্রাণির নতুন জাত উদ্ভাবন ও জাত উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন- দুগ্ধ উৎপাদন, ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত পেশাজীবিদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিগত দুই দশকে অন্যান্য প্রায়োগিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। যদিও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি সরকারি কর্মকাঠামোর তেমন পরিবর্তন হয়নি, তবুও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার এই অগ্রযাত্রা দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যাপক অবদান রাখছে। তাই দেশের সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষা ও কর্মকাঠামো এখানে তুলে ধরা হল।

১.৪.১ ভেটেরিনারি সায়েন্স

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী ভেটেরিনারি এর সংজ্ঞা হল, 'বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সমন্বয়ে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানের যে শাখায় প্রধানত গৃহপালিত পশুর এনাটমি, ফিজিওলজি ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রজনন, খাওয়ানো ও স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থায় ম্যানেজমেন্ট, রোগ ও আঘাতের প্যাথলজি ও চিকিৎসা, ইন্টারকমিউনিক্যাবল রোগব্যাধির বিষয়ে মানুষের সাথে পশুর সম্পর্ক এবং তাদের মাংস ও উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানদান বিষয়ই ভেটেরিনারি সায়েন্স (Veterinary Science)।' ভেটেরিনারির সংজ্ঞার্থ থেকে ভেটেরিনারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রধানত চার পর্যায়ে

ভাগ করা যায়। যথা- ১) পশু বিজ্ঞান, ২) ভেটেরিনারি প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স, ৩) ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স এবং ৪) ভেটেরিনারি প্রিভেন্টিভ সায়েন্স।

১। পশু বিজ্ঞান (Animal science): বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে যত্ন ও ব্যবস্থাপনা, প্রজনন, পশু ও পশুজাত দ্রব্যের বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জ্ঞানদান বিষয়ই পশু বিজ্ঞান।

২। ভেটেরিনারি প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স (Vterinary pre-clinical science): প্রি (Pre) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Prae' শব্দ থেকে উৎপত্তি যার অর্থ পূর্বে (before)। তাই সামগ্রিকভাবে প্রি-ক্লিনিক্যাল টার্মের অর্থ ক্লিনিক্যাল এর পূর্বে। অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল বিষয়ের পূর্বে বা ক্লিনিক্যাল বিষয়ে জ্ঞানলাভের পূর্বে বা ক্লিনিক্যাল বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে বোঝার জন্য পূর্বে যে সব বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয় সেসব বিষয় সমন্বয়কে প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বলা হয়। যেমন- ভেটেরিনারি এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যারাসাইটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ইমিউনোলজি, প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি, টকসিকোলজি ইত্যাদি। তাই প্রি-ক্লিনিক্যাল সায়েন্সকে ক্লিনিক্যাল সায়েন্স এর পূর্বে-আবশ্যক (pre-requisite) বলা হয়।

৩। ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স (Veterinary clinical science): ক্লিনিক্যাল (clincal) শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ক্লিন' (`kline') থেকে উৎপত্তি যার অর্থ বিছানা (`bed')। ভেটেরিনারি বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যবহারিক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত পশুর চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ভেটেরিনারি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বলা হয়। যেমন- মেডিসিন, অবস্টেট্রিক্স ও গাইনিকোলজি, সার্জারি ইত্যাদি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

৪। ভেটেরিনারি প্রিভেন্টিভ সায়েন্স (Veterinary preventive science): ভেটেরিনারি মেডিসিন বিষয়ের যে শাখায় পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানদান করা হয় তাকে প্রিভেনটিভ মেডিসিন বলা হয়। যেমন- রোগের এপিডেমিওলজিক্যাল জ্ঞান এবং টিকা (vaccine) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যে সব রোগ পশুপাখি হতে মানুষে সংক্রমিত হয় (zoonotic diseases) সে সব রোগ প্রতিরোধের জন্য ভেটেরিনারি প্রিভেন্টিভ মেডিসিন ও পাবলিক হেল্‌থ বিষয়ে জ্ঞানদান করা হয়।

১.৪.২ পশু পালন ও পশু বিজ্ঞান

কৃষি বিজ্ঞানের যে শাখায় খামারে পালন উপযোগী গৃহপালিত পশুর খাদ্য ব্যবস্থা, বাসস্থান, যত্ন, প্রজনন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাকে পশু পালন (Animal husbandry) বলে। আর, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে পশুর প্রজনন, খাদ্য, যত্ন ও ব্যবস্থাপনা এবং পশু ও পশুজাত দ্রব্যের বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জ্ঞান দান বিষয়ই পশু বিজ্ঞান (Animal science)। সাধারণভাবে পশু পালন ও পশু বিজ্ঞান একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে গৃহপালিত পশুর যত্ন, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন পশু পালন ও পশু বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হলেও দুইটি নামকরণে একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পশু পালনের ভিত্তি সাধারণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণিত পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরদিকে পশু বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত ও পরীক্ষণ কার্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টি পশু পুষ্টির একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন- পশুর দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উৎপাদনের জন্য পশু পালক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পশু খাদ্য নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু আধুনিক পশু বিজ্ঞানী গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা পশুর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উৎপাদনের জন্য সঠিক মাত্রার প্রয়োজনীয় ভিটামিন, প্রোটিন ও অন্যান্য খাদ্য তালিকা নির্বাচন করেন যাতে স্বল্প খরচে পশু থেকে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায় (Salisbury and Sainbury 1979)। তাই বলা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে পশুর প্রজনন, খাওয়ানো, যত্ন ও ব্যবস্থাপনা এবং পশু ও পশুজাত দ্রব্যের বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জ্ঞানদান বিষয়ই পশু বিজ্ঞান (Ensminger 1969)।

১.৪.৩ বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ভেটেরিনারি মেডিকেল পেশা পৃথিবীব্যাপি স্বীকৃত একটি উত্তম নির্ভরযোগ্য পেশা। এ পেশা পশুপাখি, পশুপাখির মালিক (পালক), লোকসমাজ এবং পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাথে সম্পর্কিত। ভেটেরিনারি পেশা আদিকাল থেকে আরম্ভ হলেও এ পেশার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রথম ভেটেরিনারি স্কুল স্থাপিত হয় ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের লিয়নে (Lyon) এবং দ্বিতীয় ভেটেরিনারি স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের নিকট আলফোর্টে (Alfort)। ফ্রান্সের অনুকরণে বৃটেনে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে রয়াল ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয় (Kendall 1988)। এরপর পৃথিবীর প্রায় সবদেশে ভেটেরিনারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এমনকি ভারতে বেশ কয়েকটি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের গোড়াপত্তন। বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজটিতে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের (GVSc) ব্যবস্থা ছিল।

পাক ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কোন ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের ১ নভেম্বর পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কুমিল্লায় ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি (DVMS) কোর্স চালু করা হয়। ১৯৫১ সালে কলেজটি কুমিল্লা থেকে ঢাকার তেজগাঁও স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে ৫ বছর মেয়াদী লাইসেন্সিয়েন্ট ভেটেরিনারি সার্জন (LVS) কোর্স চালু করা হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালে তেজগাঁও থেকে এ কলেজটি ময়মনসিংহে স্থানান্তর করে নতুন নামকরণ হয় ইস্ট পাকিস্তান ভেটেরিনারি কলেজ (EPVC)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত EPVC কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব ভেটেরিনারি সায়েন্স এন্ড এনিমেল হাজবেন্ড্রী (BSc Vet Sci and AH) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে ময়মনসিংহে তদানিন্তন ইষ্ট পাকিস্তান ভেটেরিনারি কলেজ ক্যাম্পাসে স্থাপিত হয় এবং ভেটেরিনারি কলেজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অঙ্গীভূত হয়। এই সময় সমন্বিত ভেটেরিনারি ও এনিমেল হাজবেন্ড্রী শিক্ষা কোর্সকে বিভক্ত করত মাধ্যমিক স্কুল পাশের পর ৬ বছর মেয়াদী ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (DVM) এবং ৫ বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব এনিমেল হাজবেন্ড্রি (BSc AH) নামক দুইটি স্বতন্ত্র ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে উভয় ডিগ্রী কোর্সের (DVM এবং BSc AH) মেয়াদ ৬ ও ৫ বছরের পরিবর্তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের পর ৪ বছর করা হয়। উভয় কোর্সের সমতা আনার পর ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে অন্যান্য টেকনিক্যাল ডিগ্রিধারীদের (চিকিৎসক, প্রকৌশলী) সাথে চাকরি ক্ষেত্রে বেতন ও পদ মর্যাদার সমতা প্রদান করা হয়। সময়ের বিবর্তনে দেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও খামার স্থাপন কর্মকান্ডকে আরও জোরদার ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় লাগসই প্রযুক্তিসহ দক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের। এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট ও চট্ট্রগ্রামে ২টি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশের পর ১ বছরের ইন্টারনীশীপ সহ ৫ বছর মেয়াদী DVM ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। তখনকার সিলেট ও চট্ট্রগ্রাম ভেটেরিনারি কলেজ দু'টি বর্তমানে যথাক্রমে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্ট্রগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সিলেট ও চট্ট্রগ্রামের পর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অপর দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দিনাজপুর এবং বরিশালে আরও দু'টি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে যা বর্তমানে যথাক্রমে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি হিসেবে অধিভূক্ত। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সম্প্রতি ঝিনাইদহে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সিরাজগঞ্জে আরও একটি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভেটেরিনারি শিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানে ১ বছরের ইন্টারনীশীপ সহ ৫ বছর মেয়াদী DVM ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুরস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভেটেরিনারি ফ্যাকাল্টি চালু করে DVM ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কম্বাইন্ড ডিগ্রী হিসেবে বিএসসি ভেট সায়েন্স ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি ডিগ্রী প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১ সাল থেকে) এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২০১৩

সাল থেকে) DVM ডিগ্রীর পাশাপাশি পৃথক অনুষদের মাধ্যমে BSc AH ডিগ্রিও প্রদান করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, DVM এবং BSc AH পাশ করার পর দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Microbiology, Biochemistry, Pathology, Animal Nutrition, Public Health সহ আরো অনেক সাবজেক্টে MS এবং PhD করার সুযোগ আছে।

প্রাণিসম্পদ বিষয়ে গ্রাজুয়েশনের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার নিয়ন্ত্রানাধীন সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের জন্য ইন-সার্ভিস ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা প্রাণিসম্পদ সহকারী (ULA), ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিসট্যান্ট (VFA) এবং ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার সহ সমমানের ষ্টাফগণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাণাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উক্ত ডিপ্লোমা কোর্সে অংশগ্রহণ করছেন। তবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমানে 'ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি)' স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার মাধ্যমে দেশে ৫টি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে গাইবান্ধার আইএলএসটি তে ৪ বছর মেয়াদের (এসএসসি পাশের পর) ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়েছে। স্থাপিতব্য অপর ৪ টি ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকল্প মেয়াদে পর্যায়ক্রমে ৪ বছর মেয়াদী প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ডিগ্রী প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিষয়ে 'সার্টিফিকেট ইন লাইভষ্টক এন্ড পোল্ট্রি (CLP)' নামক ৬ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করে থাকে। উপরন্তু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবকদেরকে প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিআরডিবি, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং সমবায় অধিদপ্তর তাদের সুফলভোগীদেরকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। স্বল্প মেয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়ে কেউ কেউ খামার স্থাপন করেন, আবার কেউ কেউ গ্রামে পশুপাখির পল্লী চিকিৎসক কাজ করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বল্প মেয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়ে পল্লী চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার বিষয়টি আইনানুগ নয়।

সারণি ১.৩ঃ বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ক্রমিক	ডিগ্রী/কোর্স	প্রতিষ্ঠানের নাম
১	গ্রাজুয়েশন (ডিভিএম/বিএসসি এএইচ) সহ এমএস ও পিএইচডি	• ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। • ফ্যাকাল্টি অব এনিমেল হাজবেন্ড্রি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। • ফ্যাকাল্টি অব এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী (বরিশাল)।
২	গ্রাজুয়েশন (ডিভিএম) সহ এমএস ও পিএইচডি	• ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। • ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন, চট্রগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম। • ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্স, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। • ডিপার্টমেন্ট অব এনিমেল হাজবেন্ড্রি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। • ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি মেডিসিন এন্ড এনিমেল সায়েন্স, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। • ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, ঝিনাইদহ (শুধু গ্রাজুয়েশন)। • সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ (নির্মাণাধীন)।
৩	গ্রাজুয়েশন (বিএসসি ভেট সায়েন্স এন্ড এএইচ) সহ এমএস	• ফ্যাকাল্টি অব এনিমেল সায়েন্স এন্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৪	প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা (ইন-সার্ভিস)	• প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এলটিআই), গাইবান্ধা। • ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ভিটিআই), ময়মনসিংহ। • ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ভিটিআই), চুয়াডাংগা।
৫	প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা	গাইবান্ধা, নেত্রকোনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গোপালগঞ্জ ও খুলনায় নির্মাণাধীন পাঁচটি 'ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএলএসটি)'।
৬	সার্টিফিকেট ইন লাইভষ্টক এন্ড পোল্ট্রি (সিএলপি)	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (সারাদেশের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের মাধ্যমে)।
৭	স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ	সারাদেশে জেলা-উপজেলার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিআরডিবি, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং সমবায় অধিদপ্তর।

১.৪.৪ ভেটেরিনারি বনাম এনিমেল হাজবেন্ড্রি শিক্ষা

ভেটেরিনারি সায়েন্স আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষয় যেখানে পশুপাখি ও বন্য প্রাণির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জাত উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পড়ানো হয়ে থাকে। অতপর এদেশের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল হতে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়ে পশুপাখির চিকিৎসাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের যাবতীয় কাজ করে থাকেন। প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর, রাজশাহী, গাজীপুর এবং ঢাকার শেরেবাংলায় ভেটেরিনারিতে গ্রাজুয়েশন সহ উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ঝিনাইদহে একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং সিরাজগঞ্জে আরো একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ কোর্স কারিকুলামসহ DVM ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সাবসেক্টরকে শক্তিশালী করা। তবে সরকার প্রাণিসম্পদ সাব-সেক্টরের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হলেও অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রত্যাশিত সফলতা আসেনি। এর মূল কারণ হচ্ছে, ১৯৬২ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদকে ভেঙ্গে দুটি অনুষদের (ভেটেরিনারি সায়েন্স অনুষদ ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি অনুষদ) জন্ম। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একই অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারি এবং এনিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েটরা একে অন্যের চিরপ্রতিপক্ষ, যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বাধার মূল কারণ। প্রায় ৫৩ বছর ধরে কাদা ছোড়াছুড়ি চলছে। একই দেশে একই কাজের জন্য দুই ধরণের গ্রাজুয়েট তৈরিতে একদিকে সরকারের শত শত কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষক বা খামারিরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিএসসি এএইচ ডিগ্রীটি এককভাবে অকার্যকর হলেও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো এ ধরণের গ্রাজুয়েট তৈরি করছে। ভেটেরিনারি পেশার শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসন ও মাঠপর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে দুটি প্রতিপক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু দ্বন্দই সৃষ্টি করা হয়নি, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, গবেষণা ও কর্মক্ষেত্রকে কলুষিত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আমার বিবেচনায় এ সমস্যার সমাধানের দুটি পথ আছে। প্রথমটি হচ্ছে বিভক্ত দুটি অনুষদকে একত্রিত করে প্রাণিসম্পদে একীভূত ডিগ্রী চালু করা। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে সফলতার নজির স্থাপন করেছে। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে এটি প্রায় অসম্ভব যেহেতু এক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানে (যেখানে দুই ধরণের ডিগ্রী চালু আছে) দুটি ডীনের পদ কমে যাবে! দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে প্রাণিসম্পদের দুই ধরণের গ্রাজুয়েটের (ভেটেরিনারি এবং এনিমেল হাজবেন্ড্রি) পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে চলা।

১.৪.৫ কর্মক্ষেত্র হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান

সরকারি চাকরিতে বিসিএস প্রাণিসম্পদ একটি অন্যতম বড় ক্যাডার, যেখানে প্রায় দেড় হাজার প্রাণিসম্পদ পেশাজীবি ভেটেরিনারিয়ান এবং এনিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েট কর্মরত আছেন। তবে প্রাণিসম্পদ বিভাগের কার্যক্রমকে অদ্যাবধি প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমুখী পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। উন্নয়ন প্রযুক্তির স্বল্পতা, প্রযুক্তি হস্তান্তরের অপর্যাপ্ততা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্যই শস্য উপখাতের পাশাপাশি এ উপখাতটি প্রত্যাশিত সফলতা দেখাতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক উপজেলায় একজন করে ভেটেরিনারি সার্জন আছেন; যিনি সার্বক্ষণিকভাবে পশুপাখির চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত থাকেন। তার পক্ষে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণের জন্য কাজ করা সম্ভব হয়

না। অন্যদিকে উন্নীত পদের উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশাসনিক কাজসহ সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে ব্যস্ত থাকেন। এতে কৃষক/খামারিরা কাংখিত সেবা পাচ্ছে না। ফলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। একমাত্র সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্যই স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৪ বছরেও এখাতটি প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের আকার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় দেশে দক্ষ বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছে না। কেননা প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে (যেমন- উৎপাদন, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা ইত্যাদি) ধারাবাহিকভাবে কাজ করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের কোন সুযোগ নেই। ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা প্রাণিসম্পদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না। তাই তারা তাদের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনতে উৎসাহ বোধ করছেন; যা আমাদের জন্য মোটেও কাংখিত নয়। তাছাড়া প্রাণিসম্পদ বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে মাত্র তিন জন মাঠকর্মী রয়েছে। তাদের কাজ অনেকটা প্রাণিসম্পদের রোগ প্রতিরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উন্নয়ন প্রযুক্তির সাথে তাদের তেমন পরিচিতি নেই। তাই তারা দিন দিন খামারিদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কেননা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। প্রকাশ থাকে যে, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে প্রতি ইউনিয়নে, এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে মাঠকর্মী রয়েছে। যারা খুব সহজেই উন্নয়ন প্রযুক্তি/স্বাস্থ্য বার্তা/জন্ম নিয়ন্ত্রণ বার্তা এবং উপকরণ কৃষক/খামারি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে প্রাণিসম্পদ বিভাগে উপজেলা হতে কৃষক/খামারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন/সম্প্রসারণের বিশেষ করে প্রযুক্তি হস্তান্তরে তেমন কোন সাংগঠনিক কাঠামো নেই। তাই এখাতটি প্রত্যাশিত সফলতা দেখাতে পারছে না। এজন্য প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অন্ততঃ প্রতি ইউনিয়নে একজন করে ভেটেরিনারি সার্জন এবং একজন করে সম্প্রসারণ/উন্নয়নকর্মীর পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গড়ে প্রায় সাতশ ভেটেরিনারিয়ান এবং প্রায় দুইশ এনিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েট পাস করে বের হলেও সরকারি চাকরিতে পদের বৃদ্ধি ঘটেনি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকাঠামোতে প্রাণিসম্পদ পেশাজীবিদের জন্য পদ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়নের কথা কয়েক বছর যাবৎ শোনা গেলেও তা আসলে লুকোচুরি খেলছে। এই লুকোচুরির পেছনেও রয়েছে অধিদপ্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে কমর্রত ভেটেরিনারি এবং এনিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েটদের চিরপ্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান। বিসিএস লাইভস্টক এসোসিয়েশন এক্ষেত্রে কার্যকর সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও তাদের দৃশ্যমান সাফল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেহেতু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে (যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মহীন) প্রাণিসম্পদ উপখাতকে কোন মতেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই; সংগত কারণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই উপখাত সংশ্লিষ্ট সবাই বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসবেন বলে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ছাড়াও প্রাণিসম্পদ পেশাজীবিদের জন্য দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে Bangla, English, Physics, Mathematics, Social Science ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী গ্রাজুয়েশন করেন তাদের থেকে চাকরির বাজারে প্রাণিসম্পদ পেশাজীবিদের কদর এবং বেতন অনেক বেশি। দেশের বাইরে যেমন- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, ফিনল্যান্ড, আমেরিকা সহ উন্নত দেশগুলোতে গবেষণা ও সম্মানজনক চাকুরির সুযোগ অন্যান্য পেশার চেয়ে বেশি। তাছাড়া ভেটেরিনারি সায়েন্সে গ্রাজুয়েটগণ পশুপাখির ডাক্তারি পেশায় আত্মকর্মসংস্থান করতে পারেন। বিভিন্ন পোষা প্রাণী যেমন- বিড়াল, কুকুর, বিভিন্ন জাতের পাখির চিকিৎসা করেও এই পেশায় উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়া যায়। প্রাণিসম্পদ পেশাজীবিগণ অন্যান্য যেসব চাকরি করতে পারেন তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল-

- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কোর যার নাম RVFC (Remount Veterinary and Farm Core)। সেখানে ভেটেরিনারিয়ানগণ সরাসরি লেফটেনেন্ট হিসেবে যোগদান করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভেটেরিনারিয়ানগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের শিকার। কেননা MBBS ডিগ্রীধারীগণ সেখানে সরাসরি ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগদান করে থাকেন।

- ভেটেরিনারি সায়েন্স বা এনিমেল হাজবেন্ড্রিতে গ্রাজুয়েশনের পর এসকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশাও বেছে নেয়া যায়।
- প্রাণিসম্পদে গ্রাজুয়েটগণ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- BLRI, ICDDRB, LRI, FRI গুলোতে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাছাড়া Farm Business, Laboratory, Vaccine এ কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন চিড়িয়াখানায়, সাফারি পার্কে, সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক হিসেবে চাকরির সুযোগ আছে।
- বিভিন্ন livestock product company যেমন- ice cream, juice, butter, candy, cola, milk and meat industry তে কাজ করার অপার সুযোগ আছে। বিভিন্ন কোম্পানী যেমন- Pran, Milk Vita, Arong, Aftab, RD Milk, Bengal Meat ইত্যাদি কোম্পানিতে প্রাণিসম্পদ গ্রাজুয়েটগণ আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির সুযোগ পেয়ে থাকেন।
- দেশের বিভিন্ন feed mill, hatchery তে আকর্ষণীয় বেতনের চাকুরির সুযোগ আছে, যেমন- Kazi farms, Aftab, Paragoan, Nourish, Anchor Feeds, Dhaka Hatchary, Eggs and Hens, Rafid, Universal, Goalanda, Denim ইত্যাদি।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ও পাবলিকেশনে চাকরির সুযোগ আছে। তাছাড়া বিভিন্ন Media যেমন Animal Planet, Discovery, National Geography তে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির সুযোগ আছে।
- Quarantine এর নিমিত্তে আমদানি রপ্তানি প্রতিষ্ঠানে Animal Product, Fish Product ইত্যাদি আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের গ্রাজুয়েটদের চাকরির সুযোগ আছে। প্রথম শ্রেণির পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পাঁচ তারা হোটেল গুলোতে Meat Inspector, Public Health Officer হিসেবে চাকরির সুযোগ আছে।
- আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ঔষধ কোম্পানি গুলোতে প্রাণিসম্পদ গ্রাজুয়েট তথা ভেটেরিনারিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট পদ আছে। এসব কোম্পানির এনিমেল হেলথ্ ডিভিশনে Technical Officer, Area Manager, Technical Support Officer, Consultant হিসেবে নিশ্চিত সুযোগ আছে।

পরিশেষে বলা যায় ক্যারিয়ার গঠনে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণ এবং এ পেশায় আত্মনিয়োগ করা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত। এতে একদিকে যেমন আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় তেমনি দেশবাসীর পুষ্টি উন্নয়ন তথা সামগ্রিক অগ্রগতিতে অবদান রাখা যায়।

১.৫ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত ক্রমবিকাশ

পাক ভারত স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সম্পর্কিত 'পশুপালন বিভাগ' কৃষি অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পরিচালিত হতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পরে উক্ত পশুপালন বিভাগের সদর দপ্তর কুমিল্লা জেলা শহরের ক্ষেত্রী বিল্ডিং-এ স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ৩১ অক্টোবর ১৯৪৮ ইং তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক পশুপালন বিভাগকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করে বেসামরিক ভেটেরিনারি সার্ভিস অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পুনর্গঠিত পশু পালন বিভাগের নামকরণ করা হয় Directorate of Animal Husbandry, East Pakistan. এই সময় পশুপালন বিভাগের কর্মসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রোগ প্রতিরোধ ও রোগ দমনসহ পশুপাখি উন্নয়নের সকল প্রকার দায়িত্ব Assistant Veterinary Surgeon এর উপর ন্যাস্ত করা হয়। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়নের বিষয়টিও নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও জোরদার ও সুশৃংখল করার বিষয়েও ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রচলিত ডিলারের মাধ্যমে ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থার জটিলতা ও অনিয়ম রোধ করার জন্য ডিলারশীপ প্রথা বাতিল করা হয় এবং পশুপালন বিভাগ থেকে সারা দেশে জেলা ভিত্তিক চাহিদানুসারে ঔষধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ভেটেরিনারি মেডিক্যাল স্টোর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কুমিল্লা থেকে সদর দপ্তর ঢাকায় নিমতলীস্থ 'সাইন্স ভিলাতে' স্থানান্তরিত হয়।

১৯৬০ সালে পশুপালন বিভাগ আবার পুনর্গঠিত করে এর সদর দপ্তর কুমিল্লা থেকে ঢাকার নিমতলীস্থ 'সাইন্স ভিলা' তে স্থানান্তর করা হয়। এসময় পশুপালন বিভাগের অবকাঠামোগত সংস্কার ও পেশাগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও ভেটেরিনারি সার্ভিসের মান উন্নয়ন এবং লোকবল বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বিকভাবে পরিবর্তন আনা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে পশুপালন বিভাগে নতুন নামকরণ হয় Directorate of Livestock Services. এসময়ে পশুপাখির সার্বিক উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট ওয়ার্কিং এরিয়া চিহ্নিত করা হয়। নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এ সময়ে নবগঠিত পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে থানা পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদাসহ পূর্ব পাকিস্তান হায়ার লাইভষ্টক সার্ভিসের (EPHLS) অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্য দিকে জেলা ও সমপর্যায়ে কর্মকর্তাগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় পূর্ব পাকিস্তান এনিমেল হাজবেন্ড্রী সার্ভিসের (EPLS) অন্তর্ভূক্ত ছিল। পশুসম্পদ বিভাগের পুনর্বিন্যাসের ফলে থানাতে দুইজন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। একজন থানা সহকারী পশুপালন কর্মকর্তা যার মূল কাজ ছিল পশুপাখির সার্বিক উন্নয়ন ও মহামারী জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ। অন্যজন থানা সহকারী ভেটেরিনারি সার্জন। তিনি পশুপাখির চিকিৎসা ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের দায়িত্বে থাকতেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালে সদর দপ্তর ঢাকার নিমতলীস্থ 'সাইন্স ভিলা' হতে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসের পূর্বে শুধুমাত্র মহকুমা তদুর্ধ্ব পদগুলোতে সংক্ষিপ্ত ৩ মাসের পিজিটি সমাপ্তির পর পদোন্নতি প্রাপ্ত ডিপ্লোমাধারী এবং ভেটেরিনারি ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিধান চালু করা হয়। এই সময়ে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ সাব অর্ডিনেট লইভষ্টক সার্ভিসের (আপার) অন্তর্গত ছিল। অন্যদিকে ডিপ্লোমাধারী কর্মর্কাগণ পূর্বের ন্যায় নিম্নতর এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী সার্ভিসের অন্তর্ভূক্ত থাকে। ১৯৬৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের পদ ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদ মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

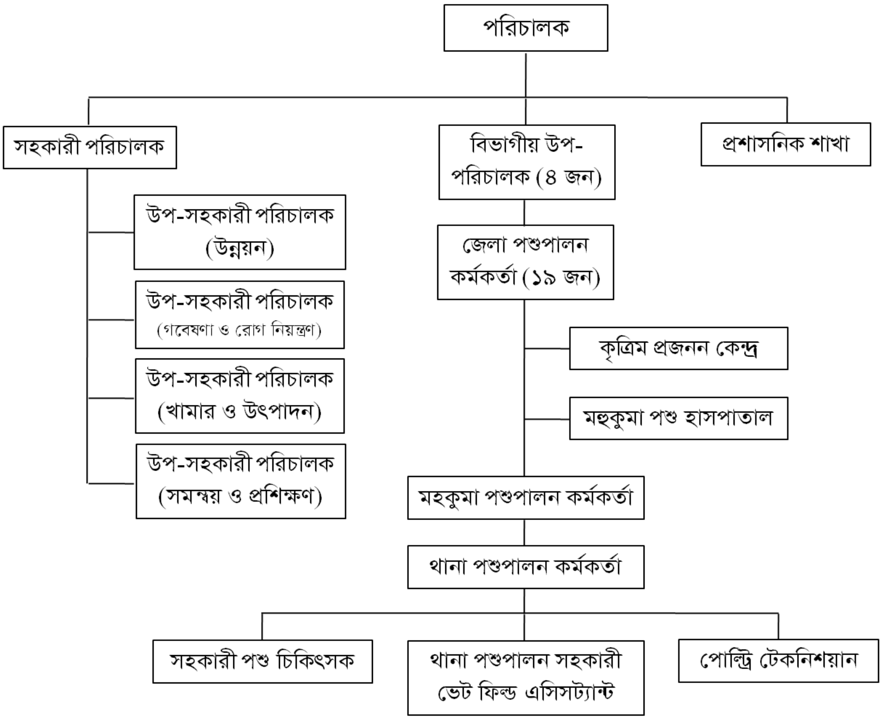

চিত্র ১.৪ঃ পাকিস্তান আমলে অধিদপ্তরের কর্মকাঠামো। এই চিত্রটি 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ: ক্রমবিকাশ ও কার্যক্রম' বই থেকে নেয়া হয়েছে (ডিএলএস ১৯৯৮)।

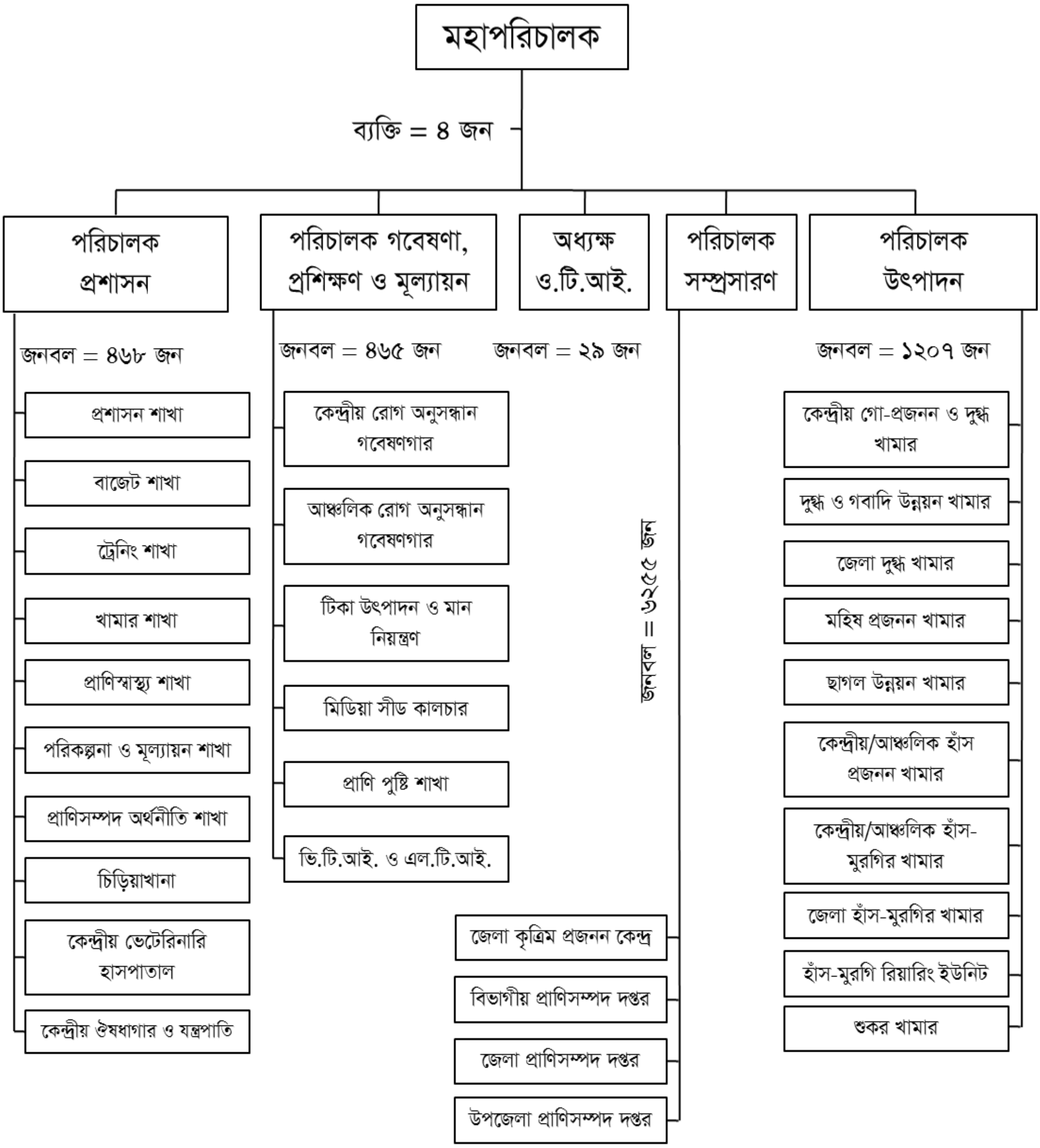

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সর্বমোট জনবল = ৮৪২৬ জন

চিত্র ১.৫ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান কর্মকাঠামো। এই চিত্রটি 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশঃ ক্রমবিকাশ ও কার্যক্রম' বই থেকে নেয়া হয়েছে (ডিএলএস ১৯৯৮)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সদর দপ্তরটি পুনরায় ১০৫/১০৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এবং তৎপরবর্তীতে আলাউদ্দিন রোডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে মহকুমা ও থানা পর্যায় পর্যন্ত নিয়োজিত ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাদের পদ ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে ১ম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। এতে মহকুমাগুলিকে জেলায় রুপান্তর করা হয়। থানাগুলিকে জন প্রতিনিধির (চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ) অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য বিভাগের মত তৎকালীন পশুসম্পদ বিভাগের থানা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপজেলা পরিষদে প্রেষণে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার কমিটির (এনাম কমিটি) রিপোর্টের ভিত্তিতে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং এর ফলে (ক) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), (খ) অতিরিক্ত পরিচালক (সম্প্রসারণ), (গ) অতিরিক্ত পরিচালক (উৎপাদন) ও (ঘ) অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন) পদ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে সদর দপ্তরটি সর্বশেষে ১৯৮৪ সালে ফার্মগেটে অবস্থিত কৃষি খামার সড়কে অধিদপ্তরের জন্য নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২-৯৩ সালে জনাব মান্নান কমিটির সুপারিশে পরিচালক পদটি মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত পরিচালকের পদগুলো পরিচালক পদে রুপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৫ সালে থানা পর্যায়ের পদ উন্নীত করাসহ পরস্পর বদলিযোগ্য ১৯১টি জেলার সমপর্যায় ও ৪৭টি উপ-পরিচালক সমপর্যায়ের পদ হতে যথাক্রমে মাত্র ৬৪ ও ১৩টি পদকে উচ্চতর বেতন স্কেলে উন্নীত করা হয়। এভাবে কালের পরিক্রমায় পশুপালন বিভাগ তথা পশুসম্পদ অধিদপ্তর আজ 'প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নে সারা দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রয়েছে বহুবিধ স্থাপনা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ষাটের দশকে Central Cattle Breeding Station (CCBS) নামে সাভারে একটি দুগ্ধ খামার স্থাপিত হয়। সেখান হতে প্রধানত প্রজননের জন্য ষাঁড় উৎপাদন বিতরণ ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্রগ্রাম এবং তারও পরে বরিশালে আরো ৫টি দুগ্ধ খামার স্থাপিত হয় এবং আশির দশকে বাগেরহাট জেলায় একটি মহিষ উন্নয়ন খামার স্থাপিত হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের অবদান রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে কৃত্রিম প্রজনন কাজের উন্নয়নের সাভার সিসিবিএস মূল কেন্দ্র সহ পুরাতন জেলাগুলিতে প্রতিটিতে ১টি করে সর্বমোট ২২টি কেন্দ্র ও প্রতিটি উপজেলায় ১টি উপকেন্দ্র ও একাধিক পয়েন্টের (সরকারি কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী) মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণ ও চিকিৎসা সেবা দেয়ার নিমিত্ত প্রতিটি বিভাগে একটি করে বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অফিস, প্রতিটি জেলায় ১টি করে জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, ১টি করে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও একাধিক উপকেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রসারণ ও চিকিৎসা সেবা কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা, টিকা উৎপাদন ও রোগ নির্ণয়ের জন্য লাইভষ্টক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (LRI) মহাখালী, ঢাকা কেন্দ্রীয় রোগ নির্ণয় ল্যাবরেটরি, ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকাসহ কুমিল্লা, বরিশাল, মানিকগঞ্জ, ফেনী, জয়পুরহাট ও সিরাজগঞ্জ-এর ফিল্ড ডিজিজ ইনভেষ্টিগেশন ল্যারেটেরি (এফডিআইএল) এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ঢাকার সাভারে রয়েছে অফিসার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (ওটিআই), গাইবান্ধায় লাইভষ্টক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (এলটিআই) এবং চুয়াডাঙ্গা ও ময়মনসিংহে রয়েছে ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (ভিটিআই)। হাঁস-মুরগি উন্নয়নে বর্তমানে দেশের ১৪টি আঞ্চলিক ও জেলা মুরগি খামার, ১৬টি বাচ্চা পালনকারী খামার, ২টি ডিম উৎপাদনকারী খামার, ৮টি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ৫টি হাঁস রিয়ারিং ইউনিট এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ছাগল উন্নয়নে দেশে বর্তমানে ৫টি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কর্মকান্ড চালান হচ্ছে। অন্যদিকে চিত্তবিনোদন ও বন্যপ্রাণী গবেষণার জন্য অধিদপ্তরের অধীন ঢাকা চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানা পরিচালিত হচ্ছে এবং গবাদিপশুর সুষম খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য সাভারে একটি খাদ্য উৎপাদন কারখানা পরিচালিত হচ্ছে। ইহা ছাড়া দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন আরো বেশ কিছু উন্নয়ন প্রসঙ্গের মাধ্যমে বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১.৬ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অতীত পদক্ষেপ, বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

এই উপমহাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের ঐতিহাসিক মুহুর্তগুলো আজ স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যেতে বসেছে। London Court of Directorate এর অনুমোদনক্রমে ১৭৯৫ সালে ভারতের পুষার নামক স্থানে খামার স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণিসেবার যাত্রা শুরু। ১৮০৮ সালে Mr. William Morr Greft কে বেসামরিক পর্যায়ে ভেটেরিনারি চিকিৎসক হিসেবে ভারতে নিয়োগ করা হয়। তিনি ভারতবর্ষে পেশাদার ভেটেরিনারি চিকিৎসক। তাঁর প্রচেষ্টায় পশুর রোগ নির্ণয়, প্রতিকার, জাত উন্নয়ন এবং খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার অনেকটা উন্নয়ন ঘটে। ১৯৮২ সালে Mr. JHB Hallen এর প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পুনাতে সামরিক ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও মুক্তশ্বরে ইমপেরিয়াল ব্যাকটেরিওলজি ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়। এই সময়ে ইমপেরিয়াল ল্যাবরেটরিতে রিন্ডারপেস্ট, হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, ব্লাক কোয়াটার রোগের কার্যকরী টিকা আবিষ্কৃত হয়। জার্মানির প্রখ্যাত জীবাণু বিজ্ঞানী বিশেষ করে Anthrax রোগের জীবাণু ও টিকা আবিষ্কারক Mr. C Koach ইমপেরিয়াল ল্যাবরেটরির সাফল্যের কথা অবহিত হয়ে ১৮৯৭ সালে গবেষণাগারটি পরিদর্শন করেন এবং এর উন্নয়নে কিছুকাল কাজ করেন। মিঃ হেলেন সামরিক বাহিনীর পশু চিকিৎসার পাশাপাশি বেসামরিক জনসাধারণের গৃহপালিত পশুপাখির চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে ১৮৯৩ সালে Civil Veterinary Department প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগটি মূলত পশুপাখির সংক্রামক রোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধান দিতো। তৎকালীন ভারতবর্ষের ভাইসরয় Lord Linlithgow-র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৮ সালে দিল্লীতে প্রথম All India Cattle Show নামে গবাদিপশু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তিনি এই প্রদর্শনীতে প্রাণিসম্পদের বিকাশ ও চিকৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে সিভিল ভেটেরিনারি বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নিত করে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরে ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক পশু চিকিৎসা বিভাগকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে Department of Livestock Services বা পশুসম্পদ অধিদপ্তর নামে পুনর্গঠিত করা হয় (এ বিভাগই ২০১০ সাল থেকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নামে পরিচিত)। ১৯৬০ সালে অত্র বিভাগের অবকাঠামোগত সংস্কার ও পেশাগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও ভেটেরিনারি সার্ভিসের মান উন্নয়ন ও লোকবল বৃদ্ধির ব্যাপারে সার্বিকভাবে পরিবর্তন আনা হয়। এসময়ে পশুপাখির সার্বিক উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ওয়ার্কিং এরিয়া চিহ্নিত করে নিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ২. পশুপাখির চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ ৩. ভেটেরিনারি সার্ভিস, শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদির উন্নয়ন ৪. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন ৫. জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন খামার স্থাপন ৬. গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ৭. পশু পুষ্টির উন্নয়ন ৮. চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী জরীপ ৯. প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ ১০. প্রাণিসম্পদ সেবা সম্প্রসারণ ১১. পশুপাখির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রতিপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরুপণ।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ উপখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব ও অবদান বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ধারা ও পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দিতে পশুপাখি প্রতিপালনের উপযোগিতা পরিবর্তিত হয়েছে অনেকখানি। সেই সাথে উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন প্রযুক্তি ও প্রতিপালন কলাকৌশল ও পশুপাখি পালনের প্রেক্ষিত। আজ পারিবারিক গন্ডি পেরিয়ে প্রাণিসম্পদ শিল্পায়নের রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাণিসম্পদ উপখাতের এ বিকাশ জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারের পাশাপাশি গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতায়নে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ষাটের শতকের দায়িত্বের সহিত যুক্ত হয়েছে ১২. মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৩. দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান ১৪. উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি ১৫. বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উন্নয়ন। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি, ব্যক্তি উদ্যোগ ও নন গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়নে এককভাবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পশুপাখির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রতিপালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরুপন আজও করতে পারেনি। তবে পরিসংখ্যানগত ভিন্নতা সত্ত্বেও মোটামুটি ২৩.৭৮ মিলিয়ন গরু, ১.৪৭ মিলিয়ন মহিষ, ২৫.৭৬ মিলিয়ন ছাগল, ৩.৩৩ মিলিয়ন ভেড়া, ২৬৮.৩৯ মিলিয়ন মোরগ-মুরগী ও ৫২.২৪ মিলিয়ন হাঁস বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতিবছর ১৪৬.৯১ লক্ষ মে. টন দুধ, ৭০.৫২ লক্ষ মে. টন মাংস ও ১৬৭৪.৪০ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদন বর্তমান চাহিদার যথাক্রমে ৪৯.৫ ভাগ, ৮৭.২ ভাগ ও ৭১.১ ভাগ মাত্র (২০১৫-১৬ বছরের তথ্য)। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় শস্যজাত খাদ্যে দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টির দিক দিয়ে দেশ এখনও চরম দুরাবস্থায় রয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য জনশক্তি অপুষ্টিতে ভুগছে। যার অধিকাংশই নারী ও শিশু। এদেশের গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টির কারণেই মৃত্যুর সংখ্যা বেশি এবং শিশুদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায় দেশে মাথাপিছু চাহিদা অনুযায়ী আমিষ বিশেষ করে দুধ, মাংস ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় বলা যায়, জনশক্তির কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিভিত্তিক জাতি গঠনে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়াও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান একাধিক বিশেষ করে পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান, জমি চাষ, গ্রামীণ পরিবহন, জৈব সার উৎপাদন, গ্রামীণ জ্বালানি সরবরাহ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। একমাত্র চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করে (১৭০ মিলিয়ন ঘনফুট) বছরে আয় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। দুধ ডিম, মাংস, মাংসজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন শিল্পে বিশ্বের উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের মত ভর্তুকী প্রদান করে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পের টিকে থাকার জন্য সরকারি আনুকূল্য একান্ত প্রয়োজন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একক সরকারি বিভাগ হিসেবে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও পাখির সার্বিক উন্নয়ন ও এদের রোগ-বালাইয়ের নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য কাজ করে থাকে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাস্তব চহিদার সাথে মিল রেখে টিকা উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যে সকল রোগের জন্য ১০০ ভাগ টিকা প্রদান প্রয়োজন তা শতভাগ টিকা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশে এফএমডি ও তড়কা রোগে প্রতিবছর প্রায় হাজার কোটি টাকার গবাদিপশু মারা যায় বা আর্থিক ক্ষতি গুণতে হয় জনসাধারণকে। একই সাথে টিকা উৎপাদনে কৌশলগত গবেষণা অব্যাহত রাখা উচিত। টিকা উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুল চেইন নিয়ন্ত্রণ টিকার কার্যকারিতার জন্য জরুরি। দেশের প্রয়োজন অনুসারে এবং রোগভেদে টিকা উৎপাদন কম। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত টিকাসমূহের মূল্য যুক্তি সংগত হলেও আমদানিকৃত টিকার মূল্য অত্যাধিক। যা উৎপাদিত পণ্যের খরচ বৃদ্ধি করে থাকে। বাংলাদেশে গবাদিপশু ও পাখির উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি, বিশেষ করে প্রতিবছর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক ডিগ্রীধারী পেশাজীবি পাশ করে বের হলেও বছরে ১০০ জনকেও কাজে লাগানো হয় না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ডিগ্রীধারী পেশাজীবী তৈরিতে স্বাবলম্বী-প্লাস হলেও মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য দক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরিতে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। দুটি ভিটিআই ও দুটি এলটিআই এ নিয়মিত ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে দক্ষ মানবসম্পদ গঠে তোলার সুযোগ কাজে লাগানো হয় নাই।

পশুপাখি পালনের প্রেক্ষিত অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। ষাটের দশক থেকে আশিক দশক পর্যন্ত ৯৫ ভাগ জমি গরু মহিষ দিয়ে চাষবাস করা হতো। বর্তমানে ৫ ভাগ জমিও গরু-মহিষ দিয়ে চাষবাস করা হয় না। এক সময় গ্রামীণ পরিবহনের ৫০ ভাগ ছিল গরু-মহিষ নির্ভর। পশুচালিত গ্রামীণ পরিবহন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এখন গরু-মহিষ পালন হচ্ছে আর্থিক উন্নয়নের অবলম্বন হিসেবে। পশুপাখি পালনের সাথে যুক্ত হয়েছে অতি বিত্তবান থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত অতি দরিদ্র গোষ্ঠীর অনেকেই। তবে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তা এগিয়ে এলেও গবাদিপশু পালনে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। মূলত চারণভূমি তথা ঘাসের অভাব ও গো-খাদ্যের অধিক মূল্য অন্যদিকে মধ্যস্বত্বভোগী বিপণন ব্যবস্থার দরুন প্রকৃত উৎপাদক দাম না পেয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। দেশের প্রায় ২০ ভাগ লোক সার্বক্ষণিক পশুপাখি পালনের সাথে যুক্ত। এছাড়াও প্রায় ২৫ ভাগ লোক খন্ডকালীন পশুপাখি পালন, বিপণন ব্যবস্থা, পশুজাত পণ্য বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত। এ কারণেই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা হয়ে উঠছে আরও গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে পরিবর্তিত পরিবেশ ও প্রতিপালন কলাকৌশল পরিবর্তন হওয়ায় পশুপাখি থেকে রোগজীবাণু সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই ও কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ

আজ সময়ের দাবি। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, সোয়াইন ফ্লু, নিপা, রেবিস, এফএমডি ও Anthrax সহ সকল জুনোটিক রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এগুলি কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, এগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও কঠিন নয়। কিন্তু একাধিক সংস্থা নির্ভর হওয়ায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রাতারাতি এগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণে পশুপাখিকে টিকা প্রদান, ভেজালমুক্ত খাদ্য প্রদান, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগ ও জীবাণুমুক্ত পশুপাখি খাদ্য পণ্য ব্যবহারের নিশ্চয়তা সর্বোপরি জনসাধারণের সচেতনেতা বৃদ্ধি ছাড়া পশুপাখি বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

পশুপাখিজাত পণ্য বিক্রি ও বিপণন করতে হলে উন্নত দেশের মত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এক্রিডেশন সার্টিফিকেট ছাড়া বিক্রি ও বিপণন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকেই বুঝায়। বড় বড় শহরে জীবন্ত পশুপাখি পরিবহন নিষিদ্ধ ব্যতীত পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন শহর থেকে দূরে আধুনিক পশুপখি জবাই কেন্দ্র স্থাপন। পশুপাখি জবাই কেন্দ্র স্থাপিত হলে রোগজীবাণু মুক্ত মাংসের নিশ্চয়তা প্রদানসহ পশুবর্জ্য ও চামড়া প্রসেসিং কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশগত ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। এর ফলে মাংস প্রসেসিং এর সাথে যারা যুক্ত তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, অন্যদিকে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে পরিবহনের সময় পশুপাখিকে খাদ্য প্রদান না করায় ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় মাংসের গুণগত মান নষ্ট হয়। তাছাড়া নানাবিধ রোগজীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, উদ্যোক্তা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে ভোক্তা জীবাণুমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত মাংস পেতে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা স্থানীয় সরকার এর আওতাধীন। জীবাণুমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত মাংস সরবরাহের নিশ্চয়তা এই সকল সংস্থার দায়িত্ব হলেও কোন পৌরসভা আধুনিক পশুপাখি জবাই কেন্দ্র স্থাপন বা ভেটেরিনারিয়ান নিয়োগ দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ঢাকাসহ সকল সিটি করপোরেশনে আশির দশকে স্বাতন্ত্র্য ভেটেরিনারি বিভাগকে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে একত্রিত করে সেকশনে পরিণত করা হয়েছে। অথচ স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের পরিধির তুলনায় সিটি করপোরেশনে ভেটেরিনারি বিভাগের ব্যাপক কাজ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক আধিপত্য বিস্তারে তা সংকুচিত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে পশু হাসপাতালে একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি পশু হাসপাতালে আগত পশুপাখির চিকিৎসা দেবেন না পৌরসভার দায়িত্ব পালন করবেন। সিটি ও পৌর কর্তৃপক্ষ পশুর মালিক থেকে যথাযথ ফি নিয়ে থাকেন। যদিও সেনেটারী ইন্সপেক্টরের কাজ নয়, তথাপি তারাই পরীক্ষা ছাড়াই সিল দিয়ে থাকে। গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংসপণ্য পেতে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অঞ্চল ভিত্তিক পতিত ফাঁকা স্থানে গবাদিপশুর ও মুরগির জন্য আলাদা মাংস প্রসেসিং জোন হিসেবে আধুনিক পশুপাখি জবাই কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণে আর্থিক ও পরিবেশের উন্নয়ন, জীবাণুমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত মাংস, মাংসজাত পণ্য ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সেপটি মার্জিন সম্পন্ন ঔষধ, হরমোন, প্রিমিক্স তৈরি, আমদানি ও রপ্তানির জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ঔষধ প্রশাসন থেকে ভেটেরিনারি বিভাগ আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে ভেটেরিনারি ঔষধ প্রশাসন স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজন ও চাহিদা মাফিক ঔষধ উৎপাদন ও ভেটেরিনারি ঔষধের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। অন্যদিকে ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে। পশু চিকিৎসায় ব্যথানাশক ডাইক্লোফেন ব্যবহারে বাংলার শকুন বিলুপ্ত প্রায়। অথচ পশু চিকিৎসায় ব্যাথানাশক হিসেবে বিকল্প একাধিক ঔষধ রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শকুন বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। শকুন রক্ষার স্বার্থে ব্যাথানাশক ডাইক্লোফেন মানুষ ও পশু চিকিৎসায় ব্যবহার একইসাথে স্বল্প সময়ে বন্ধ করা প্রয়োজন। যথাযথ কর্তৃপক্ষ যত তড়িৎ ব্যবস্থা নেবেন ততই মঙ্গল আমাদের জন্য, শকুনের জন্য তো বটেই।

পশুস্বাস্থ্য সেবা, উপকরণ সরবরাহ, জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল, পশুজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি, সম্প্রসারণ কার্যক্রম, গবেষণা, টিকা উৎপাদন, পুষ্টি উন্নয়ন, জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃত্রিম প্রজনন, চিড়িয়াখানার উন্নয়ন, পাবলিক হেল্থ কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এর মত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিচালনার পূর্বশর্ত হলো প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অবকাঠামোগত ব্যাপক সংস্কার। এই সকল সেবা জনগণের দ্বারে

পৌঁছাতে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন ভেটেরিনারিয়ান ও তিন জন দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে প্রাণিসম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলসহ আধুনিক পশু হাসপাতাল ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে রোগজীবাণু, সংক্রামক ব্যাধি চিহ্নিতকরণ ও আধুনিক ভেটেরিনারি চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। বড় বড় শহরে পেট এনিমেল পালন দিন দিন বাড়ছে। এদের মাধ্যমে জুনোটিক ডিজিস যাতে না ছড়ায় সে জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও একই সাথে গড়ে তুলতে হবে। রেবিস একটি মারাত্মক জুনোটিক রোগ হলেও এর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল। প্রতিবছর কুকুর বিড়ালের কামড়ে অনেক গবাদিপশু ও মানুষের মৃত্যু হলেও আধুনিক টিকা উৎপাদনের কোন উদ্যোগ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কিংবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গ্রহণ করছে না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গরু, কুকুর ও বিড়ালের জন্য অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য মাত্রার প্রি-এক্সপোজার টিকা তৈরি করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরও মানুষ ও পশুর জন্য নগণ্য মাত্রার পোস্ট এক্সপোজার টিকা তৈরি করে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর টিকা প্রাচীন পদ্ধতির হওয়ায় অনেকেই ব্যবহার করেন না। তাই আধুনিক রেবিস প্রি-এক্সপোজার টিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যদিকে মানুষের জন্য আমদানিকৃত পোষ্ট-এক্সপোজার টিকা গবাদিপশুতেও ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য আমদানিকৃত টিকা গবাদিপশুতে কাজ করে না। ফলে গবাদিপশুর রেবিস হয়ে থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় রোগ দেখা দেয়ার পর ব্যস্ত না হয়ে আগাম সমস্যার মোকাবেলা করাটাই পেশাজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। Anthrax গবাদিপশুর জন্য মরণ ব্যাধি হলেও মানুষের জন্য মরণ ব্যাধি নয়। গবাদিপশুতে টিকা প্রদান করে শতভাগ গবাদিপশুকে রক্ষা করা সম্ভব। অন্যদিকে মানুষ সচেতন হলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নাই বলেই চলে এবং পেনিসিলিনের মত এন্টিবায়োটিক এ-চিকিৎসায় শতভাগ কার্যকর ও নিরাময়যোগ্য। মিডিয়াকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। মিডিয়ার মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণকে সচেতন করা তোলা। কোন অবস্থাতেই আতংকিত করা নয়। এর সাথে দেশের মাংস ও চামড়া শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দুটি শিল্প জড়িত থাকার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

গবাদিপশু ও হাস-মুরগির উৎপাদন বাড়াতে জাত উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দেশীয় জিন ট্রেট এর উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে গবেষণা ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্ধারণ প্রয়োজন। আমাদের দেশি জাতের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা কম হলেও এদের মাংস ও ডিমের স্বাদ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও চামড়ার উন্নতমানের জিন ট্রেট বজায় রেখে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আরেক পূর্বশর্ত সঠিক কর্মকর্তাকে সঠিক জায়গায় নিয়োগ দেয়া। তাই যুগের চহিদা ও কাজের ধরণ অনুসারে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে, টিকা উৎপাদন ও গবেষণাগার, পশু হাসপাতাল, পশুজাত পণ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভিটিআই সমূহে বিশেষভাবে দক্ষদেরকে পদায়ন করা উচিত। দেশের স্বার্থ এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দানে ক্যাডার সার্ভিসে অবিলম্বে বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতিযোগ্য পদ সৃষ্টি করা ছাড়া শুধু দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে দিলে সাফল্য আসবে না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা শিথিল করে পেশাজীবীদের কাজের পরিবেশ ব্যতীত কখনও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন হবে না। বিশ্বের ও প্রতিবেশী দেশসমূহের উদাহরণ গ্রহণ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক চিন্তা চেতনা পরিহার করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সচিবালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে পেশাজীবীদের স্বচ্ছভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করাও জরুরি। সফল প্রযুক্তি হস্তান্তরে জনসংযোগের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কৃষি বিভাগের ন্যায় তথ্য দপ্তর থাকা প্রয়োজন। বর্তমান তথ্য দপ্তরে মৎস্য অধিদপ্তর সংযুক্ত থাকায় তা তথ্য ও বার্তা প্রদানে সময়ের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে কারিগরি সাপোর্টসহ জনসচেনেতা সৃষ্টি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে কার্যকর তথ্য সার্ভিস থাকা উচিত। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক গবেষণার পয়োজনীয় ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেশের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে গবেষণার কাজে এগুতে পারেনি। ডিগ্রী ভেদে কর্মকর্তার মাঝে রেষারেষিও এই প্রতিষ্ঠানের গতিহীনতার জন্য দায়ী। গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করতে একটি কমিশন গঠনের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠানটিতে বিভাগ বিভাজনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের ঐতিহ্য গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে প্রগৈতিহাসিক কাল থেকেই বিদ্যমান। উন্নয়ন সাধনের জন্য মানুষের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন ও আর্থিক ক্ষমতায়ন একবিংশ শতাব্দীর বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় জাতিগতভাবে আমাদের অন্যতম পূর্বশর্ত। এই শতাব্দীতে আমাদের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ খাদ্য শস্যে স্বনির্ভরতার মত আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগে প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। বর্তমান সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এক যুগান্তরী ও অনন্য সাধারণ কর্মসূচি 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্প চালু করছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়কে লিডিং সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হলে অধিকতর সাফল্য আসবে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবন এবং আমলাতান্ত্রিক কৌশল থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা ও সঠিক সিদ্ধান্তই পারে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

১.৭ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান: আফকা বা APHCA এবং ওআইই বা OIE

আফকা বা APHCA

আফকা বা APHCA হল Animal Production and Health Commission for Asia and the Pacific এর সংক্ষিপ্ত রুপ। এটি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র খামারি যারা কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল ব্যবহার হতে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিসেম্বর ১৯৭৫ ইং হতে সক্রিয়ভাবে APHCA তার কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতিসংঘ ও এর যে সকল সদস্য দেশ ৫০ ডিগ্রী উত্তর ও ৫০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৬০ ডিগ্রী পূর্ব ও ১৩০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, তারা APHCA এর সদস্য হতে পারে। মোট ১৩ টি দেশ FAO এর এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করার মাধ্যমে APHCA এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়েছে। দেশগুলো হল- অষ্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, মরিশাস, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড। ১৯৮১ সালে পাপুয়া নিউগিনি APHCA তে যোগ দেয় এবং ১৯৮৬ সালে মরিশাস তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলো APHCA এর কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করছে এবং এর সদস্য হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। APHCA এর কার্যনির্বাহী কমিটি কমিশন দ্বারা অনুমোদিত সকল কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। APHCA এর কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নবর্নিত সদস্য নিয়ে গঠিত-

- চেয়ারম্যান
- ভাইস-চেয়ারম্যান
- তিনজন সদস্য যারা এক বছরের জন্য নির্বাচিত
- বিগত কমিটির চেয়ারম্যান (ex-officio)
- FAO Regional Office এর Regional Animal Production and Health Officer হলেন APHCA এর সেক্রেটারি।

APHCA এর উদ্দেশ্যগুলো হল-

- সাধারণভাবে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; এবং বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ পালন ও প্রাণিস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড এবং গবেষণা কর্মসূচী ত্বরান্বিত করা।
- সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দ্বিপাক্ষিক সুবিধার ভিত্তিতে আঞ্চলিক প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি ও জাতীয় প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি হাতে নেওয়া।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা।
- প্রাণিসম্পদের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র খামারি ও গ্রামীণ অধিবাসীদের পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

APHCA এর প্রধান কাজগুলো হল-

- উন্নততর প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের নিমিত্তে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতা, সমন্বয় এবং তথ্য বিনিময় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।
- প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ, নির্ণয় এবং সার্ভেইল্যান্স কর্মসূচিতে সহযোগিতা করা।
- বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যথাযথ কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকান্ডে সহযোগিতা করা।
- জাতিসংঘ এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হতে APHCA এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা চাওয়া।
- ক্ষুদ্র খামারিদের আয়বর্ধন ও উদ্যোক্তা শ্রেণীর উন্নয়নের নিমিত্তে উপরোল্লিখিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

ওআইই বা Office International des Epizooties (OIE):

ওআইই বা Office International des Epizooties (OIE) হল পশুরোগ ও পশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ সংস্থা যা World Organization for Animal Health নামেও পরিচিত। এই সংস্থাটি WHO এর মত একটি স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এটি একটি আন্তঃসরকার (intergovernmental) সংস্থা যা ১৯২৪ সালের ২৫ শে জানুয়ারি ২৮ টি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইই এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল-

- বিশ্বব্যাপী পশুরোগ ও জুনোসিস (zoonosis) পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- ভেটেরিনারি সায়েন্টিফিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিতরণ করা।
- পশুরোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রদান এবং পশুরোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংহতি ত্বরান্বিত করা।
- WTO-SPS Agreement এর অধীনে পশু ও পশুজাত পণ্যের হেল্‌থ ষ্ট্যান্ডার্ড তৈরি ও প্রকাশনার মাধ্যমে পশু ও পশুজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্যানিটারি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- পশু ও পশুজাত পণ্যের স্যানিটারি আইন তৈরির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্যানিটারি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- জাতীয় পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিসের রিসোর্স ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন।
- প্রাণিজ উৎস হতে প্রাপ্ত খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাণির কল্যাণ (animal welfare) ত্বরান্বিত করা।

OIE কর্তৃক নির্ধারিত মানসমূহ (standards) কে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক স্যানিটারি আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রেফারেন্স মান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর Agreement on Application for Sanitary and Phytosanitary Measures এ WTO এর সদস্য দেশসমূহকে OIE এর সদস্য হওয়ার যোগ্য। বর্তমানে OIE এর সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ১৬৭ টি। বাংলাদেশ OIE এর স্থায়ী সদস্য দেশ। OIE এর সদর দপ্তর প্যারিসে অবস্থিত। OIE এর বিভন্ন আঞ্চলিক আফসের মাধ্যমে এর কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। মানব ও পশুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সারা বিশ্বে ওআইই এর অনেকগুলো সহযোগী কেন্দ্র রয়েছে। OIE এর মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্যারিসে এর সচিবালয়/সদর দপ্তর পরিচালিত হয়।

১.৮ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবেই কৃষি সভ্যতা ও কৃষি অর্থনীতির উত্তরাধিকারী। এদেশের কৃষি ব্যবস্থায় প্রাণিসম্পদ অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে প্রাণিসম্পদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস, কবুতর অন্তর্ভূক্ত। উপজাতীয় এবং পাহাড়ী অঞ্চলে শুকর পালন করতে দেখা যায়। প্রাণিসম্পদ হতে আমরা দুধ, মাংস, চামড়া, জ্বালানি, জৈব সার ও শ্রম শক্তি পেয়ে থাকি। সব মিলিয়ে জাতীয় উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের অবদান অপরিসীম। স্বাধীনতার পর বিগত বছরগুলোতে দেশে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে

দরিদ্রের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১.৫০ মিলিয়ন কর্মক্ষম লোক দেশের অর্থনীতিতে যোগ হচ্ছে। এদের জন্য কাজ দরকার। দেশের আবাদি জমির পমিাণ মাথাপিছু মাত্র ০.২১ একর। এর সম্প্রসারণও সম্ভব নয়। এজন্য দরকার অল্প জায়গায় অধিক উৎপাদন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রাণিসম্পদ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়নের আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সহজভাবে গ্রামীণ মানুষের কাছে হস্তান্তর করা যায়। পশুপাখি উন্নয়নের আধুনিক প্রযুক্তি যথা বিভিন্ন রোগজনিত মৃত্যুর হার রোধ ও উন্নত প্রজনন ব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্যের ব্যবহার, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগিতা চিহ্নিতকরণ, উপকরণ সরবরাহ এবং উন্নত লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরে কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী সম্প্রসারণ ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। দেশের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মোট সংখ্যার প্রায় সিংহভাগ গ্রামীণ এলাকায়। তাই গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উন্নয়নের আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি উপজেলায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির গড় সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৪ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক পশুপাখির উন্নয়নের আধুনিক প্রযুক্তি যথা বিভিন্ন রোগজনিত মৃত্যুহার রোধ ও উন্নত প্রজনন ব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্যের ব্যবহার, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগীতা চিহ্নিতকরণ, উপকরণ সরবরাহ এবং উন্নত লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরে কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত। অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কর্মসূচির মূল লক্ষ্যগুলো হল-

- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন ও গুণগতমান বৃদ্ধি।
- প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- হালচাষ ও গ্রামীণ পরিবহন কাজে পশুশক্তির ঘাটতি পূরণ।
- জৈব সার হিসেবে গোবর ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- চামড়ার গুণগতমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি। জ্বালানি কাজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কর্মসূচির প্রচলন।
- গ্রামীণ এলাকায় পশুপাখি প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল চাষীদের পশুপাখি পালন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।

১.৮.১ গাবদিপশু ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দুরীকরণ, প্রাণিজ পুষ্টি সরবরাহ ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য দেশের আগ্রহী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিশেষকরে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল ও ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও খামার সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গাবদিপশু ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন সম্পর্কিত সম্প্রসারণ ও সেবা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হল-

জরিপ: সঠিক পরিসংখ্যান সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের পূর্বশর্ত। দেশে গবাদিপশু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদির এলাকা ভিত্তিক তেমন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। ১৯৬০, ১৯৭৩, ১৯৭৭ ও ১৯৮৩ সনে কৃষি শুমারীর মাধ্যমে পশুপাখির পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান ছিল নমুনা জরিপের মাধ্যমে। প্রাণিসম্পদ বিভাগের বর্তমান অবকাঠামোর সাহায্যে সুষ্ঠু জরিপ করা সম্ভব নয়। তবুও প্রাপ্ত সরকারি পরিসংখ্যান এবং সেই সঙ্গে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এলাকা ভিত্তিক পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয়।

চিকিৎসা সেবা প্রদান: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিটি উপজেলায় ভেটেরিনারি সার্জনের দায়িত্বে ভেটেরিনারি চিকিৎসালয় এবং গড়ে তিনটি করে কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালিত হয় যেখানে একজন করে ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিসট্যান্ট (ভিএফএ) পশুপাখির স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন। দেশে আধুনিক পশু চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা সদরে একটি করে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত হাসপাতাল গুলিতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি খামারিদের পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এসব

স্থাপনার মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ৫৬৪.৪৫ লক্ষ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১২-১৩ বছরের তথ্য)।

রোগ অনুসন্ধান, প্যাথলজিক্যাল নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরীক্ষা: পশুপাখির রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রতিটি উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় সুবিধাদি বিদ্যমান। এছাড়াও দেশের ৬৪ টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে মিনি ল্যাবরেটরি এবং সমগ্র দেশে মোট ৮টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র রয়েছে। উপরন্তু ঢাকায় আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান ল্যাবরেটরি রয়েছে। রোগাক্রান্ত পশুপাখি হতে বিভিন্ন প্রকার নমুনা সংগ্রহ করে রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার সমূহে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা: পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে গবাদিপশুকে রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গাবদিপশু ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগের টিকা উৎপাদন করে। এ সমস্ত টিকা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। গাবদিপশু ও হাঁস-মুরগির এসব টিকা প্রদানের ফলে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পশুপাখি সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং দেশের শত শত কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ১৭১২.৬৮ লক্ষ মাত্রা টিকা বিতরণ করা হয়েছে, যা পশুপাখিতে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১২-১৩ বছরের তথ্য)। তাছাড়া ট্রান্স-বাউন্ডারী রোগ নিয়ন্ত্রণে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশের স্থল, নৌ ও বিমানবন্দর সমূহে ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্প একটি ক্রমবর্ধনশীল খাত। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের কারণে এই শিল্পের উন্নয়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে এরোগ নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ও সেইসাথে দারিদ্র হ্রাসকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য কৃষকদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস করার জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ১০.০৮ লক্ষ জন বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১২-১৩ বছরের তথ্য)। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম, পশুখাদ্য ব্যবস্থাপনা, পশুবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং ভ্যালু এডিশনের নিমিত্তে উদ্দ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

সম্প্রসারণ কর্মী সৃষ্টি: প্রাণিসম্পদ বিভাগে সম্প্রসারণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নেই। তাই গ্রাম পর্যায়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবক ভূমিহীন কৃষক ও দুঃস্থ মহিলাদের মধ্য থেকে সম্প্রসারণ কর্মী তৈরি করা হয়। ফলে এসমস্ত ব্যক্তি একদিকে অধিদপ্তরের বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে, অন্যদিকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান ও পালন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের পথ সুগম করছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তর: আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি সমূহ জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বিভিন্নমুখী কর্মসূচি রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন ও মাঠ সহকারীগণ কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার স্থাপন, ছাগল-ভেড়ার খামার স্থাপন, পারিবারিক পর্যায়ে উন্নত জাতের পশুপাখি পালন, বিভিন্ন প্রকার প্রাণিজাত দ্রব্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের কারিগরি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করেন। এ সকল কার্যক্রম তদারকির জন্য জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ দপ্তর রয়েছে।

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়ন: গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল কাঠামো দিয়েই অন্যান্য সেবার পাশাপাশি গবাদিপশুর কৌলিক গঠন উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মোট ১০৭৯ টি সরকারি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ৩৪.৪৩ লক্ষ মাত্রা অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের সিমেন উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত সিমেন ব্যবহার করে সারাদেশে ২৯.৬০ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভীকে ৩,১২৩ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের (স্বেচ্ছাসেবী পরিচালিত পয়েন্টসহ) মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১২-১৩ বছরের তথ্য)। মাংস উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বীফ ব্রীড ষাঁড়ের সিমেন আমদানি করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তাছাড়া দেশে মহিষের জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান আছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে দেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

হাঁস-মুরগির উন্নত জাত সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ: মোট ৩৫ টি সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে গ্রামীণ পরিবেশে পালনের উপযোগী উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির ডিম, বাচ্চা এবং মোরগ ও হাঁসা তৈরি করে সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের স্বল্প আয়ের গরীব ও দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এভাবে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদেরকে লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতজাতের হাঁস-মুরগি পালন, টিকা প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলীতে সম্পৃক্ত করে তাদের আংশিক কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে। এ ধরণের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলে একদিকে ব্যক্তি পর্যায়ে হাঁস-মুরগির খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে দেশে হাঁস-মুরগির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশুপাখির পুষ্টি উন্নয়ন: পশুপাখির জাত ও গুণগতমান উন্নয়নের পূর্বশর্ত খাদ্য। তাই দেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য ঘাটতি মিটানোর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে গবাদিপশুর সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যর্থ হবে তাই খামারিদের অপ্রচলিত ফডার শস্য ও ভূট্রা চাষে উদ্বুদ্ধ করা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। উপরন্তু উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রাঙ্গনে উন্নত ঘাস চাষ নার্সারি তৈরি করা হয়েছে। এই সমস্ত ক্যাম্পাস নার্সারি থেকে কৃষকদের মাঝে ঘসের কাটিং ও বীজ সরবরাহ করে উন্নত ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ঢাকাতে পশুপুষ্টি গবেষণাগার ও বিভিন্ন জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল গবেষণাগারে পশুখাদ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পশুপাখির খাদ্যের ষ্ট্যান্ডার্ড রক্ষার জন্য BSTI-এর মাধ্যমে খাদ্যের একটি ষ্ট্যান্ডার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার, টক্সিকোলজি গবেষণাগার ও সিডিআইএল এর মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্যসমূহের মাননিয়ন্ত্রণের আধুনিক পরীক্ষা নিয়মিত সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মৎস্য ও পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ পাশ হয়েছে যা পশুখাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন: জনগণের কাছে প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সেবা পৌঁছে দেওয়া ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে পর্যাপ্ত ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েট তৈরির ব্যবস্থা করছে। তাছাড়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাভারে রয়েছে অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ওটিআই) এবং অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য দুইটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) ও একটি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এলটিআই) রয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারি ও বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি কার্যক্রম: জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিদপ্তরের একটি ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি শাখা রয়েছে। শাখাটি জুনোটিক রোগের বিস্তার রোধে গণ-সচেতনতা সৃষ্টিসহ পোষা প্রাণির টিকাদান, রোগাক্রান্ত প্রাণী সণাক্তকরণ ও সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও

মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য নিশ্চয়তা বিষয়ক কার্যক্রম (food safety and food security) বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে ঢাকায় চারটি সহ সারাদেশে নয়টি Live Bird Market উন্নয়ন করা হয়েছে।

চিড়িয়াখানা কার্যক্রম: অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও রংপুরে একটি করে চিড়য়াখানা রয়েছে। জনসাধারনের নির্মল চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা করছে এই চিড়িয়াখানাগুলো। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির দুর্লভ ও বিরল পশুপাখি পালন, সংরক্ষণ ও প্রজননের মাধ্যমে এদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়। এ সকল চিড়িয়াখানা পরিদর্শন ফি আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে প্রাণিসম্পদকেন্দ্রিক কর্মসূচিতে বেকার জনগোষ্ঠিকে উপজাত দ্রব্য সংগ্রহের কাজে লাগানো যেতে পারে। উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছাড়াও এগুলো থেকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ কোর্সও চালু করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রাণিসম্পদভিত্তিক বহু কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। অবশেষে বলা যায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে যা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১.৮.২ মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণায়তন

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বেশ কিছু কার্যক্রম চালু আছে। জনগণের কাছে প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সেবা পৌঁছে দেওয়া ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। কলেজ, প্রশিক্ষণায়তন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে-এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

গ্রাজুয়েট তৈরি: বর্তমানে চালু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ভেটেরিনারি ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি গ্রাজুয়েটের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঝিনাইদহ এবং সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করে পর্যাপ্ত গ্রাজুয়েট তৈরির ব্যবস্থা নিচ্ছে। পূর্ণাঙ্গভাবে কলেজগুলো চালু হলে বর্তমানে ভেটেরিনারি গ্রাজুয়েটের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ: বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুন নতুন টেকসই ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ। ভেটেরিনারি ও পশুপালন বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তির পর প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানীগণ সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করেন। চাকুরিতে প্রবেশের পর অফিস ব্যবস্থাপনা, চাকুরির শর্ত, নিয়ম শৃংখলা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভাগীয় কাজের সম্প্রসারণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে তাদের কোন ধারণা থাকে না। গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে ভূমিকা রাখে না। কেবলমাত্র সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই এই সকল সদ্য পাশ করা নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহরিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার সাভারে প্রতিষ্ঠা করা হয় অফিসার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (ওটিআই)। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ছাড়াও এ ইনষ্টিটিউট অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভাগীয় সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য এদেশ থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

কর্মচারী প্রশিক্ষণ: মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীগণ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পাশ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাদের পেশাগত কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে না। চাকুরীতে প্রবেশের পর এক বছর মেয়াদী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাংগায় দু'টি ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণালয় এবং গাইবান্ধায় একটি প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণালয় চালু আছে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণালয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক

প্রশিক্ষণ ছাড়াও নিয়মিত কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সিলেট প্রাণিসম্পদ প্রশিক্ষণালয়টি বিগত ১৯৯৬ সালে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একত্রিভূত হয়ে যায়।

ইউএলডিসি: বিভাগীয় প্রশিক্ষণালয় ছাড়াও ইউএলডিসি'র আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকদেরকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পালন ব্যবস্থাপনাসহ কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়াও সমাজের দুঃস্থ মহিলাদের সর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস সৃষ্টিতে অধিদপ্তরে রয়েছে বহুমুখী কর্মসূচি। এই জন্য মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, পুঁজি সরবরাহে সহজ শর্তে, ক্ষেত্র বিশেষে বিনা সুদে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা প্রদান করে তাদের হাঁস-মুরগি ও ছাগল-ভেড়া পালন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়।

১.৮.৩ প্রাণিসম্পদে গবেষণা কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ

পাক ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর পশুপাখির ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণার জন্য কুমিল্লাতে স্থাপিত হয় এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং পোল্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তখন থেকেই তড়কা, গলাফুলা, বাদলা ও মুরগির কলেরা রোগের টিকা উৎপাদন শুরু হয়। সমসাময়িক সময়ে ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং বরিশাল, রাজশাহী, চট্রগ্রাম এবং যশোরে রিন্ডারপেষ্ট ও রাণীক্ষেত রোগ দমনের জন্য তরল বিন্ডারপেষ্ট ও রাণীক্ষেত ভ্যাকসিন তৈরি করা হতো। এই সময়ে পরজীবী বিষয়ক রোগের গবেষণা কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করার জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ অনুসন্ধান, জলাতংক ও ক্ষুরা রোগের টিকা উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন, পশু পুষ্টি ইত্যাদি শাখা নিয়ে মহাখালীতে ৭ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় 'প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান'। ১৯৬৩-৬৪ সনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মাধ্যমে ৩ জন বিদেশি বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারি বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট উন্নয়নের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আসেন। তারা রেবিস, রিন্ডারপেষ্ট, ফাইল পক্স, রাণীক্ষেত রোগের ভ্যাকসিন ইত্যাদির উপর কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার পরজীবিঘটিত রোগের উপর গবেষণা করেন। ফ্রিজ ড্রাইড ভ্যাকসিন তৈরি এবং এ বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, গবেষণাগারের আধুনিকীকরণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা ছিল তাদের কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ। এই সময় থেকে বিভিন্ন ফ্রিজ ড্রাইড ভ্যাকসিন উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৭৯ সালে দেশের হাঁস-মুরগির ভ্যাকসিন তালিকায় ডাক প্লেগ ভ্যাকসিন সংযোজিত হয়। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায়, টিকা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত টিকার মান উন্নয়নে অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। উৎপাদিত টিকা সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ১টি এবং বৃহত্তর জেলাসমূহে ১টি করে মোট ২২ টি হিমায়িত ষ্টোর রুম স্থাপন করা হয়। এই সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তার অধীনস্থ বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে পুনঃর্গঠন করা হয়। বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১০টি টিকা উৎপাদন শাখা (এনথ্রাক্স, বাদলা, গলাফুলা, ফাউল কলেরা, রাণীক্ষেত, ফাউল পক্স, ডাক প্লেগ, জিটিভি, ক্ষুরারোগ ও রেবিস) এবং কুমিল্লাস্থ টিকা উৎপাদন গবেষণাগারে এনথ্রাক্স, বাদলা, গলাফুলা, ফাউল কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা উৎপাদিত হয়। এই প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে একজন পরিচালক এবং প্রতি শাখাতে একজন করে মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, একজন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দুইজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শাখার গবেষণা ও টিকা উৎপাদন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। এছাড়াও ভ্যাকসিন কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা, মিডিয়া ও সীড কালচার শাখা ও এ্যানিমেল রিয়ারিং শাখাসমূহের সাপোর্ট সার্ভিস ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

জনস্বাস্থের জন্য জুনোটিক রোগসমূহ মারাত্বক হুমকি স্বরুপ। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ শাখা স্থাপন করা হয়। শাখাটি জলাতংক রোগ দমন, গবাদিপশুতে টিউবারকুলিন টেস্টের মাধ্যমে যক্ষা রোগ নির্ণয়, স্বাস্থ্য সম্মত মাংস উৎপদন নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচারপত্র ও বুকলেট তৈরিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রোগ অনুসন্ধান ও রোগ নির্ণয়ের জন্য কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার ছাড়াও বর্তমানে ফেনী, বরিশাল, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও সিলেটে আঞ্চলিক রোগ

অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকাস্থ ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোডে অবস্থিত টক্সিকোলজি, প্যাথলজি, এক্টোপ্যারাসাইট ও এন্ডোপ্যারাসাইট শাখা দেশব্যাপী রোগ নির্ণয় ও রোগ জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রাণিপুষ্টি শাখা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সদর দপ্তর সংলগ্ন নবনির্মিত পশুপুষ্টি ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

১.৮.৪ ঢাকা ও রংপুরে চিড়িয়াখানা স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক্রম

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় সরকারি পর্যায়ে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। ঢাকা তৎকালীন প্রদেশের রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোন চিড়িয়াখানা ছিল না। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা হাইকোর্ট প্রঙ্গনে সীমিতভাবে চিত্রা হরিণ, বানর ইত্যাদিসহ কয়েকটি প্রজাতির বন্যপ্রাণী নিয়ে চিড়িয়াখানার যাত্রা শুরু হয়। দেশের মূল্যবান বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার মিরপুর এলাকায় ১৯৬০ সালে ২১৪ একর জমিতে চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠাকল্পে স্থান নির্বাচন করা হয়। ১৯৬১ সালে চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৬৪ সালে জমি হুকুম দখলের পর পরই চিড়িয়াখানা উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়। ঐ সময়ে হাইকোর্ট সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার চিড়িয়াখানায় সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী গুলোকে নবনির্মিত মিরপুরস্থ ঢাকা চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। একই সাথে মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণিদের বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি এবং দেশ-বিদেশ থেকে প্রাণী সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৩ শে জুন সর্বপ্রথম ঢাকা চিড়িয়াখানা আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। বর্তমানে ঢাকা চিড়িয়াখানাটি ‘বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা’ নামকরণ করা হয়েছে। এই বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা হতে দেশে এবং বহির্বিশ্বে সময়ে সময়ে মূল্যবান ও বিরল প্রজাতির পশুপাখি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বন্যপ্রাণী প্রতিপালনে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের নিকট চিড়িয়াখানা থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রাণী বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলা সদরে পৌর এলাকায় মনোরম ও উন্নত যোগাযোগ পরিবেশে ১৯৯১ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে আরও একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়। উভয় চিড়িয়াখানা পরিদর্শন ফি আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে। চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপ-

- দুর্লভ ও বিরল প্রজাতির পশুপাখি পালন, সংরক্ষণ ও প্রজননের মাধ্যমে এদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।
- জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন প্রাণির পরিচিতি তুলে ধরা এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গবেষণার কাজে সহায়তা করা।

১.৮.৫ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ দেশের প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন, সরকারি হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার আধুনিকীকরণ এবং সর্বোপরি উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের নাম দেওয়া হল।

- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
- ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনী টেষ্ট প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
- ইনষ্টিটিউট অব লাইভষ্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প

- টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প
- মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প
- ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
- প্রাণিসম্পদ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
- হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
- প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়)
- মানসম্মত প্রাণিজাত খাদ্য ও খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।
- ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)
- ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)
- বাংলাদেশে ভেটেরিনারি সার্ভিসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং সম্ভাব্য নতুন সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রকল্প (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট)।

১.৯ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমস্যা

বাংলাদেশের কৃষকগণ নতুন কলাকৌশল বা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে খুবই পশ্চাদপদ। প্রাণিসম্পদের নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এখন পর্যন্ত শতকরা ২৫-৩০ ভাগ কৃষকের মাঝে সীমাবদ্ধ। অবশ্য কালাকৌশল গ্রহণে অপারগতার জন্য কৃষকরাই যে সবসময় দায়ী তা ঠিক নয়। এমন অবস্থাও হয় যার কারণে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের পক্ষে প্রযুক্তি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা মূলত ৫ প্রকারের। যথা- ক) ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা, খ) অবস্থানগত প্রতিবন্ধকতা, গ) সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতা, ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং ঙ) ঐতিহ্যগত প্রতিবন্ধকতা। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল।

(ক) ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা

- শিক্ষার অভাব: বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক নিরক্ষর। জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক কিছুই তাদের বোধশক্তির বাহিরে। প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই পুস্তক, সাময়িকী, লিফলেট এসব তারা পড়তে পারে না। শিক্ষার অভাবে তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গিসহ সামগ্রিক আচরণ নিম্নস্তরের। এর ফলে স্বভাবতই তারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহী হয় না।
- কারিগরি জ্ঞানের অভাব: অনেক সময় কৃষকদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলেও তারা প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির কারিগরি দিকগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ এমন কিছু কিছু প্রযুক্তি আছে যেগুলো কারিগরি দিক থেকে বেশ জটিল, যেমন- ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি। সেগুলো লব্ধ করে তা ব্যবহার করার জ্ঞান বাংলাদেশের অনেক কৃষকেরই নেই। ফলে তারা সেসব প্রযুক্তি গ্রহণে বিলম্ব করে বা আদৌ গ্রহণ করে না।

(খ) অবস্থানগত প্রতিবন্ধকতা

- পুঁজির অভাব: উন্নত প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ ব্যয়বহুল বিধায় এগুলো প্রাণিসম্পদ খামারির ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। ফলে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে তারা অপারগ হয়।
- ক্ষুদ্রাকৃতির খামার: বাংলাদেশের কৃষকদের প্রাণিসম্পদ খামার ক্ষুদ্র আকারের। অপরদিকে উন্নত প্রযুক্তি বৃহৎ আকারের জন্যই বেশি প্রযোজ্য হয়। ফলে ক্ষুদ্র খামারে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কাংখিত ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই খামারিগণ এই সব প্রযুক্তি গ্রহণ হতে নিজেকে বিরত রাখে।
- যোগাযোগের অপ্রতুলতা: প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর নিজস্ব কোন অফিস বা সরকারি আবাসস্থল না থাকায় খামারিগণ প্রয়োজনে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে খামারিগণ নতুন প্রযুক্তির সার্বিক সুফল সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত হতে পারে না। ফলে তারা নতুন কলাকৌশল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় না।
- লাগসই প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা: প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে যেসব প্রযুক্তি খামারিদের ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত হয় সেগুলো অনেক সময় খামারিদের যথাযথ উপযোগী হয় না। অনেক প্রযুক্তিই খামারিদের আর্থসামাজিক ও খামার ব্যবস্থায় উপযুক্ত ও যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় না, তাই খামারিরা তা প্রত্যাখান করে। তাছাড়া বাংলাদেশে বন্য, খরা ও

অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যেগের উপযোগী কলাকৌশল আবিস্কৃত না হওয়ার কারণে অনেক সময় নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের সমস্যা মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়।

- প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব: প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব হলে কলাকৌশলের বিস্তার স্তিমিত হয়ে পড়ে। কৃষকদের প্রযুক্তি গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরবরাহকারী সংস্থা সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে না পারলে তাদের সে ইচ্ছা থাকে না।

(গ) সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতা

- সম্প্রসারণ কর্মীর অপ্রতুলতা: প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রযুক্তির প্রচার ও শিক্ষা সাধারণত সম্প্রসারণ কর্মীদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। খামারিদের নতুন কলাকৌশল শিক্ষা দেয়ার মত প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই তাদের অপ্রতুলতার কারণে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কাজ ব্যহত হয়ে থাকে।
- সম্প্রসারণ কর্মীর সুযোগ সুবিধার অভাব: সম্প্রসারণ কর্মীর নিজস্ব কোন অফিস নেই, সরকারি বাসস্থান নেই, খামারিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি সরকারি সাইকেল পর্যন্ত নেই। তাদের প্রায়শঃই নিজ কর্ম এলাকা থেকে অনেক দূরে শহরে বাস করে সম্প্রসারণ কাজ করতে হয়। কারণ কর্ম এলাকার গ্রাম অঞ্চলের ভাড়া বাড়ি পাওয়া যায় না। এসব কারণে সম্প্রসারণ কর্মী খুব কম সময়ই খামারিদের কাছে নতুন প্রযুক্তি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পায়। এতে করে প্রযুক্তি হস্তান্তর ব্যহত হয়।
- সৎ কর্মীর অভাব: বাংলাদেশে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার মত কর্মীর যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। কর্মীরা অনেক সময় কাজে ফাঁকি দেয় ও খামারিদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে থাকে। ফলে কৃষক ভাইয়েরা তাদের বিশ্বাস করতে পারে না এবং ফলশ্রুতিতে তার নিকট থেকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয় না।

(ঘ) সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

- সমাজে প্রভাবশালীদের দৌরাত: সম্প্রসারণ কর্মী যে সমাজে কাজ করেন, সে সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি, ধরন ইত্যাদি নানাভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরে বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে। কেননা সমাজে যারা প্রভাবশালী লোক তারা যদি প্রযুক্তি বিস্তারের বিপক্ষে কাজ করে তাহলে প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
- বিভিন্ন দলে গ্রামবাসীর বিভক্তি: মত দ্বৈততার কারণে অনেক সময় একটি গ্রাম দুইটি দলে বিভক্ত হয়। একটি দল যখন কোন প্রযুক্তি গ্রহণ করে, অন্য দলটি তখন তার বিরোধিতা করে এবং বিপক্ষকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালায়। এভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(ঙ) ঐতিহ্যগত প্রতিবন্ধকতা

- স্বকৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস: গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত সমাজের অনেক লোকেরই বিশ্বাস যে তাদের অনুসৃত পদ্ধতিই ঠিক। নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা হল 'এসব পদ্ধতি অন্যদের পক্ষে ভাল হতে পারে, তবে আমাদের জন্যে মোটেই ভাল নয়'। তাদের এই ধারণা তাদেরকে প্রযুক্তির প্রতি উদাসীন করে তোলে। ফলে প্রযুক্তির বিস্তার বিঘ্নিত হয়।
- অহংকার ও আভিজাত্য: কৃষকদের অহংকার ও আভিজাত্যবোধ প্রযুক্তি গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। সাধারণত কিছু শিক্ষিত ও ধনী খামারিদের মনে এরুপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সমাজের অন্যান্যরা তাকে নিচু মনে করবে। তাই একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় তারা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য: প্রকৃতিক নিয়মে চলিত ধারাকে কৃত্রিম উপায়ে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক এলাকাতেই ধর্মীয় রোষালনে পড়ে। কারণ অনেক সময় ধর্মীয় কুসংস্কারে দোহায় দিয়ে সাধারণ কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা হয়। ইহাও নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা।

অধ্যায় ২

গবাদিপশুর খামার স্থাপন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর

২.১ খামার স্থাপনের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

২.১.১ বাংলাদেশে গবাদিপশুর বর্তমান অবস্থা

পৃথিবীতে বহু ধরণের পশু রয়েছে। এসব পশুর মধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে মানুষ যেগুলোকে স্থায়ীভাবে লালন পালন করে এবং বংশবৃদ্ধি ঘটায় তাদের গৃহপালিত পশু (domestic animal) বলে। আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বিশেষভাবে পরিচিত। গৃহপালিত পশু থেকে দুধ, মাংস ছাড়াও নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য, যেমন- শিং, খুর, চামড়া, পশম, চর্বি, রক্ত, দাঁত, হাড়, নড়িভূড়ি পাওয়া যায়। দুধ ও মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপজাত দ্রব্য থেকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া কৃষির সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজে গবাদিপশুর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। তবে মাঠে ফসল উৎপাদনে গবাদিপশুর অবদান সবচেয়ে বেশি। কারণ, এদেশে পশুশক্তিকে একেবারে বাদ দিয়ে যান্ত্রিক চাষের প্রচলন করতে অরও সময় লাগবে। তাই আমাদের জীবনে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব অপরিসীম এবং একটি বিরাট সম্পদ। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারলে আমাদের বর্তমান জাতীয় প্রকট সমস্যাসমূহ, যেমন- দারিদ্রতা, বেকার সমস্যা ও আমিষের অভাব ইত্যাদি সমাধান করা সম্ভব হবে।

সারণি ২.১ঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে গরু-মহিষের পরিসংখ্যান।

ক্রমিক	বছর	গরু (লক্ষ সংখ্যা)	মহিষ (লক্ষ সংখ্যা)	মোট (লক্ষ সংখ্যা)
১	২০০৪-০৫	২২৬.৭০	১১.১০	২৩৭.৮০
২	২০০৫-০৬	২২৮.০০	১১.৬০	২৩৯.৬০
৩	২০০৬-০৭	২২৮.৭০	১২.১০	২৪০.৮০
৪	২০০৭-০৮	২২৯.০০	১২.৬০	২৪১.৬০
৫	২০০৮-০৯	২২৯.৭৬	১৩.০৪	২৪২.৮০
৬	২০০৯-১০	২৩০.৫১	১৩.৪৯	২৪৪.০০
৭	২০১০-১১	২৩১.২১	১৩.৯৪	২৪৫.১৫
৮	২০১১-১২	২৩১.৯৫	১৪.৪৩	২৪৬.৩৮
৯	২০১২-১৩	২৩৩.৪১	১৪.৫০	২৪৭.৯১
১০	২০১৩-১৪	২৩৪.৮৮	১৪.৫৭	২৪৯.৪৫
১১	২০১৩-১৪	২৩৬.৩৬	১৪.৬৪	২৫১.০০
১২	২০১৩-১৪	২৩৭.৮৫	১৪.৭১	২৫২.৫৬

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় সব বাড়িতেই গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালন করা হয়। এদের মধ্যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছাড়া অন্য কোন পশুর জাতই উন্নত নয়। অতীতে সনাতন পদ্ধতিতে দেশের মানুষ এসব গবাদিপশু পালন করত। তথাপি তখনকার দিনে এভাবেই বাংলাদেশের দুধ ও মাংসের চাহিদা মিটতো। এর প্রধান কারণ তখন গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কম থাকায় পর্যাপ্ত পশুখাদ্যের যোগান সম্ভব ছিল। লোকসংখ্যা কম থাকায় চাহিদা কম ছিল এবং পর্যাপ্ত চারণভূমি পাওয়া যেত। তাছাড়া শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গৃহপালিত পশুর জন্য ঘাস উৎপাদন করা হতো এবং পর্যাপ্ত পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য পশু থেকে বেশি উৎপাদন পাওয়া যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে সে অবস্থা আর নেই। স্ফীত জনসংখ্যার জন্য প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ ও মাংসের চাহিদা মেটানো দুরুহ হয়ে পড়েছে। দেশী জাতের গবাদিপশুর মাংস ও দুধ দিয়ে বর্তমান চাহিদা মেটানো সম্ভব না। ফলে গবাদিপশু পালনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়িয়ে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নসহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে। দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা গত

বছরগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন হাজার হাজার গবাদিপশুর খামার গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি এসব খামার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে পারলে এদেশের প্রাণিসম্পদ অদূর ভবিষ্যতে আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

২.১.২ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ মূলত কৃষি প্রধান দেশ। গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান এবং পুকুর ভরা মাছ এই ছিল প্রাচীন বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য। ৬০ এর দশকের 'সবুজ বিপ্লব' এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক জৈব কৃষির পরিবর্তে সরকারি পৃষ্ঠপোষকায় রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার, উফসী জাতের বীজ, সেচ ব্যবস্থা, ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এদেশেও খাদ্যশস্য উপাদনের উচ্চাভিলাসী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য শস্যের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে উক্ত রাসায়নিক কৃষিকে আরও জোরদার করা হয়। নব্বই এর দশকের গোড়া থেকে আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের উৎস এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে কতিপয় সরকারি সিদ্ধান্ত, বেসরকারি খাতে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটায়। নীরবে সংগঠিত হয় এক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের। বিশ্বব্যাপী ইতোমধ্যে রাসায়নিক কৃষির পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সম্মত জৈব কৃষি ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে আইপিএম অর্থাৎ সমন্বিত বালাই নাশক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি, মেধা, উৎপাদন ক্ষমতা, আয়ের উৎস, কর্মসংস্থান, পুনঃউৎপাদনশীল জৈব কৃষি এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ একটি অমিত সম্ভাবনার খাত। প্রাণিসম্পদ দারিদ্র হ্রাস, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন সহ টেকসই উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। দেশে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৫২ লক্ষ গরু ও মহিষ, ২ কোটি ৯১ লক্ষ ছাগল ও ভেড়া এবং ৩২ কোটি ৬ লক্ষ হাঁস-মুরগি রয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য)। গ্রামীণ মহিলা, অশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার, যুবক যুবতী মিলে দেশের প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ আজ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন পালনে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। দুধ, মাংস ও চামড়া জাতীয় পণ্যের ছোট-বড় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হিসাব করলে আরও ব্যাপক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান এই প্রাণিসম্পদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ অনুযায়ী এ খাতের অবদান ১.৭৩% হলেও প্রাণিসম্পদের বহুমাত্রিক অবদান বিবেচনা করলে জিডিপি-তে প্রাণিসম্পদের অবদান ১৫% ছাড়িয়ে যেত। গ্রামীণ পরিবহন, জ্বালানি, জমিচাষ ও জৈব সার সরবরাহ বরে প্রাণিসম্পদ আমাদের বিপন্ন পরিবেশের সুরক্ষা করে চলেছে। তাছাড়া চিড়িয়াখানা সমূহের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা, গবেষণা, বিনোদন, বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ কার্যক্রমের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি ল্যাবরেটরিতে পশুপাখির প্রয়োজনীয় টিকা তৈরি ও গবেষণায় অসাধারণ ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি কোরবানীর ঈদে পশুর চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে এদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে।

ভবিষ্যত সম্ভাবনা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ যেখানে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দুধের চাহিদার মাত্র ৪৩.৪% এবং মাংসের চাহিদার মাত্র ৬৭.১% বর্তমানে আমরা পূরণ করতে পারি। অর্থাৎ এই শিল্পের

বিকাশের জন্য দেশে দুধ, মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান যা অন্য অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। প্রাণিসম্পদের বহুল সম্ভাবনার বিশেষ দিকগুলো হল-

- ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মিটানো এবং প্রাণিজ খাদ্যের পুষ্টির গুণগত উৎকর্ষতা।
- মানুষের খাবারের অনুপযোগী ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য উপকরণ থেকে মানুষের জন্য অত্যন্ত উঁচুমানের প্রাণিজ প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদি তৈরির বিশেষ পারদর্শিতা।
- মাটির উর্বরতা ও পানি ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং কর্ষণ শক্তি ও গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক শক্তির বিকল্প ব্যবহার।

বর্তমানে উন্নত বিশ্বে জৈব কৃষির ব্যাপারে যে সকল সহায়ক জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে সেগুলির প্রয়োগ করে অদূর ভবিষ্যতে আমরা রাসায়নিক কৃষির উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমশঃ জৈব কৃষির ভিত্তি সুদৃঢ় করা দরকার। এই প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে দেশে ছোট বড় গবাদিপশুর খামারের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার এবং হাঁস-মুরগির খামার লক্ষাধিক। এ সমস্ত খামারের বর্জ্য এবং সেই সাথে ছোট বড় শহর এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নিত্যদিনের বর্জ্যকে লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতমানের জৈব সার উৎপাদন করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এ ধরণের উদ্যোগ আমাদের বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করবে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং দেশে স্বাস্থ্যসম্মত জৈব কৃষির প্রবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রাণিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে এদেশের মানুষের করণীয়

বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন লোক বাস করে। আর প্রতি একরে প্রায় ১.০৫ টি গবাদিপশু রয়েছে। এই হিসেবে দেশের ব্যবহারযোগ্য জমির তুলনায় পশুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। অবশ্য এসব পশুর অধিকাংশ দেশি জাতের। স্বাভাবিক কারণেই এদের উৎপাদন ক্ষমতা কম। আবার প্রতি বছর নানা রোগের প্রকোপে বহু পশু মারা পড়ে। এতে এক দিকে কৃষি জমিতে চাষাবাদের জন্য যেমন বলদের অভাব দেখা দিচ্ছে তেমনি অন্যদিকে প্রানিজ প্রোটিনের তীব্র অভাব ঘটছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের দুধ ও মাংসের চাহিদার মাত্র যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৫ এবং ৮৭.২ ভাগ উৎপাদিত হয় (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তথ্য)। প্রাণিজ প্রোটিনের বিপুল ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভূগছে। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রাণিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পালন করতে হবে। যথা-

- গৃহপালিত পশুপাখি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পালন করি দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বাড়াতে হবে।
- পশুপাখি থেকে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য বৈজ্ঞানিকভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হবে।
- উন্নত খাদ্য ও প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল পশুপাখির সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শহর অভিমুখী না হয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পশুপাখির খামার গড়তে হবে।
- প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য হবে এদেশের পরিবেশ অনুযায়ী সীমিত সম্পদের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে পশুপাখি পালনে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন। বিদেশী কাঠামোকে হুবহু অনুসরণ না করে পথ নির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পশুপাখি পালন বিষয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সম্প্রসারণে সরকারকে আরও তৎপর হতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্নমূখী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পশুপাখি এবং এগুলো থেকে উৎপাদিত দ্রব্য এবং উপজাত দ্রব্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে সুব্যবস্থা করতে হবে।
- বিত্তহীন ও ভূমিহীন লোকের জন্য ঋণের ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।
- গবেষণার জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও গবেষণা সম্পর্কিত সকল বাধা দূরীকরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। গবেষণার ফলাফল সঠিকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের বিপুল জনশক্তি বিজ্ঞানভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ লালনপালন করতে পারলেই পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশও একদিন ধনী হয়ে উঠতে পারবে।

২.১.৩ গবাদিপশু উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশে পশুপাখির ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি। বিশ্বে একর প্রতি গরুর ঘনত্ব ০.৯১ ও এশিয়ায় ০.৯৫ টির তুলনায় বাংলাদেশে ২.৯২ টি। কিন্তু দেশে গবাদিশুর ঘনত্ব বেশি হলেও এদের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। বিশ্বের গাভীপিছু বার্ষিক গড় দুধ উৎপাদন যেখানে ২১৯০ কেজি, এশিয়ায় ১২২০ কেজি, এমনকি ভারতে ১০১৪ কেজি, সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৭০৬ কেজি। কম উৎপাদনের মূল কারণই হল ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান না করলে প্রাণির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য এ সমস্যা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিহ্নিত করা উচিত।

উন্নত জাত: খামারের জন্য দরকার উন্নত জাতের গরু যারা বেশি দুধ বা মাংস দিবে ও বেশি মুনাফা অর্জন করা যাবে। বর্তমানে সংকর জাতের কিছু গবাদিপশু উৎপন্ন হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এজন্য গবাদিপশুর প্রজেনী টেস্টিং এর মাধ্যমে প্রোভেন বুলের বীর্য দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করে ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তির ব্যবহার করে উন্নতমানের গবাদিপশু তৈরি করতে হবে। গরুর জাত উন্নয়নের জন্য ওপেন নিউক্লিয়াস ব্রিডিং সিস্টেম (ONBS) মডেলের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩৪ লক্ষ শংকর জাতের গরু রয়েছে। এদের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ২৫ লিটার এর অধিক দুধ উৎপাদনকারী ১৫০ টি গাভী সংগ্রহ করে প্রজেনি পরীক্ষিত ষাঁড়ের মাধ্যমে ব্রাদার, সিষ্টার, ক্রস পদ্ধতিতে বাংলাদেশী ফ্রিজিয়ান হিসেবে নামকরণের জন্য গরুর জাত সৃষ্টি প্রক্রিয়া এখন থেকে শুরু করতে হবে।

গবাদিপশুর প্রজনন: খামার ব্যবস্থাপনার জন্য শর্ত হল অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশু। কিন্তু এ অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশুর প্রাপ্যতা নির্ভর করে ভাল প্রজনন ব্যবস্থাপনার উপর। ভাল ষাঁড়ের অপর্যাপ্ততা এবং কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে সঠিক রেকর্ড না থাকার কারণে আন্তঃপ্রজনন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে গবাদিপশুর প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ছে। গবাদিপশুর প্রজননের জন্য পর্যাপ্ত উন্নত জাতের ষাঁড় তৈরি করতে হবে ও সারাদেশে উন্নত কৃত্রিম প্রজননের সুব্যবস্থা করতে হবে। সঠিকভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পশুখাদ্য সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যসমূহ: আমাদের দেশে জনসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কমে যাচ্ছে জমির পরিমাণ। পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য এ স্বল্প পরিমাণ জমিও ব্যবহার হচ্ছে না, হচ্ছে মানুষের খাদ্য তৈরিতে। ফলে পশুখাদ্য সমস্যা দিন দিন বিরাট আকার ধারণ করছে। অথচ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষ অনায়াসে দুধ, মাংস ইত্যাদি পেতে পারে এবং রোজগারের ব্যবস্থাও করতে পারে। সবুজ ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পতিত জমি, দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে নতুন জেগে উঠা চরে, পাহাড়ের ঢালু এলাকায়, উপকূলীয় বাঁধে, জমির আইলে, অলাভজনক শস্যক্ষেতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ প্রবর্তন করতে হবে। বনায়ন কর্মসূচির সঙ্গে ঘাস চাষের সমন্বয় করে ফডার ঘাস লাগানোর জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। কৃষি উপজাত ধান ও গমের খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশীয় লাগসই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প খরচে দেশীয় সম্পদ থেকে যে সহজে পশুর খাবার চাহিদা পূরণ করা যায় এবং গবাদিপশুকে বিভিন্ন খাবার খাওয়ানোর ফলে যে কৃষক বৃহৎ অর্থে উপকৃত হতে পারে সে সংক্রান্ত জ্ঞান দানের জন্য গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার করতে হবে।

গবাদিপশুর বাসস্থান: পশুপালন এবং খামার ব্যবস্থাপনায় কৃষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় পশুর জন্য কেমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যেটা পশুর জন্য আরামদায়ক ও পছন্দনীয় হবে সেটা তারা বোঝে না ও অপরিকল্পিতভাবে বাসস্থান তৈরি করে। আবার তাদের পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে নিজের থাকার ঘরের পাশেই পশুকে রাখে। ফলে সঠিক ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না। খামারিরা যেন স্বল্প ব্যয়ে গবাদিপশুর জন্য আরামদায়ক ও পছন্দনীয়, রোগমুক্ত বাসস্থান তৈরি করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বেসরকারি অন্য প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারে।

কৃষকের পুঁজি: বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তাদের 'নুন আনতে পানতা ফুরায়'। এমতাবস্থায় খামার ব্যবস্থাপনার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কৃষকদের খামার ব্যবস্থাপনার জন্য যে পুঁজি দরকার তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। খামারিদের জন্য স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও যন্ত্রপাতি: খামার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন হল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি থাকার কারণে খামারে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ব্যাহত হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থাপনা। তাছাড়া সঠিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র দরকার সেগুলোর অভাব রয়েছে যথেষ্ট। আবার কৃষকরা পুঁজির অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে না। এজন্য খামার এলাকায় যেন বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকে সেদিকে সরকারের পাশাপাশি জনগণকে ভূমিকা রাখতে হবে। খামারিদের জন্য আধুনিক জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি সহজেই স্বল্পমূল্যে কেনার নিশ্চয়তা বিধান করা। এক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা রাখতে পারে।

অসম বাজার ব্যবস্থা ও প্রতিকার: আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থার উপর সরকারের বা কোন কর্তৃপক্ষের কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে একই পণ্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। যেমন- দুধ কোন জায়গায় ৩০ টাকা আবার কোথাও ৮০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে কৃষকরা প্রাপ্য মুনাফা অর্জন করতে পারছে না, যা নতুন খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও নিম্নমান সম্পন্ন গুঁড়ো দুধের অবাধ আমদানি এবং দেশে উৎপাদিত দুধ অন্যান্য প্রাণিসম্পদ জাত পণ্যের সুপরিকল্পিত এবং উপযুক্ত বিপণন পরিবেশের অনুপস্থিতি ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা সৃষ্টি করছে। সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে খামারিদের ন্যায্য মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কর্তৃক 'মার্কেট পলিসি' গঠন করতে হবে।

পশুজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন: বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দুগ্ধ খামার ও মুরগির খামারকে লাভজনকভাবে টিকে থাকতে হলে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। প্রাণিসম্পদ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যকে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবেশের সুযোগ সহ ইহাকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃত দিতে হবে। দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি দ্রব্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করার একটি সুষ্ঠু বাজার অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। চামড়া শিল্পের উন্নয়ন কল্পে গবাদিপশুর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

প্রতিকূল আবহাওয়া ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা: বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূল অবস্থা যেমন খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত ঠান্ডা, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করে। খামারিদের প্রতিকূল আবহাওয়ার সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তেমন জ্ঞান না থাকায় প্রতি বছর অনেক গবাদিপশু মারা যাচ্ছে। দূর্যোগ মুহূর্তে খামারিদের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা হ্রাস করার লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র, আপদকালীন ঔষধ, টিকাবীজ, পশুখাদ্য মজুদের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া এ সময় খামারি ও পরামর্শকের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং করণীয় দিকগুলো ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।

রোগব্যাধি: প্রতি বছর গবাদিপশু বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে। ফলে কৃষক বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রোগব্যাধি ও খামারের জৈবনিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় কৃষকদের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রোগব্যাধিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারিদের বিভিন্ন রোগের কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করতে হবে। খামারের জৈবনিরাপত্তার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান দান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিষেধক টিকা ও ঔষধ: চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়া বেশি উত্তম। কিন্তু রোগের প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত টিকা বীজের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়াও যে টিকা বীজ দেশে তৈরি হয় তা খামারিদের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সে টিকা বীজ দিয়ে কোন কাজই হয় না। আবার বিদেশ থেকে যে সব টিকা বীজ বিভিন্ন কোম্পানি নিয়ে আসে সেসবের উচ্চ মূল্যের কারণে কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তাছাড়া বিভিন্ন

রোগব্যধির জন্য যে বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয় তা গুণগত সম্পন্ন নয় এবং সহজেই সঠিক মূল্যে পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে কৃষকরা বিভিন্ন রোগের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য খামারিদের প্রয়োজন অনুসারে গুণগত মানসম্পন্ন টিকাবীজ ও ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কিভাবে টিকা বীজের মান ঠিক রাখা যায়, প্রয়োগ বিধি, সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে হবে। সরকার কর্তৃক টিকাবীজ ও ঔষধের দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে।

পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণ কার্যসমূহ: দেশের প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি আধুনিক পশুরোগ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। রোগ অনুসন্ধান সার্ভিস আধুনিকীকরণসহ প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন এবং উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল সমূহে অবকাঠামো সম্প্রসারণ করে রোগ নির্ণয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কৃষকের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে পশুস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। পশুপাখির চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াকে সহজকরণ ও মান নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি পৃথক Veterinary Drugs Administration Division সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। পশুরোগ আইন ২০০৫, পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫ এবং পশুখাদ্য আইন ২০১০ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে পশুরোগ বিস্তার রোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

কারিগরি জ্ঞান: গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র ও বেকার মানুষ পশুপালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন কৌশল, সঠিক যত্ন ও ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই দমন ও অধিক লাভবান হওয়ার উপায় ও কৌশল সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। এদের কোন প্রকার কারিগরি জ্ঞান নেই। ফলে তারা সঠিকভাবে খামার ব্যবস্থাপনা করতে পারছে না। এজন্য দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নশ্রেণী থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পশুপালন এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কৃষি শিক্ষা প্রণয়ন করতে হবে ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিভিন্ন এনজিও যেমন ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

পরামর্শক: কৃষকরা কোন সমস্যায় পড়লে সে সম্পর্কে পরামর্শ নেয়ার জন্য তেমন পরামর্শক নেই। ফলে কৃষক তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে না ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদবিদ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি জনসাধারণকে প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য তথা দেশের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং মনোবল গড়ে তুলতে হবে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি: পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক খাদ্য সমৃদ্ধ হাওর অঞ্চলে হাঁস চাষের জন্য বিশেষ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষ প্রতিপালনের প্রাধান্য হেতু মহিষের জাত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কার্যক্রম: বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আরও আধুনিক ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা ও উন্নত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এ পর্যায়ে ফলিত ও লাগসই গবেষণার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শস্য, শাক-সবজি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষের সমন্বয়ে বহুমুখী খামারের আদর্শ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অনুপ্রবেশকারী নতুন নতুন রোগের কারণ, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে। আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ করে উপজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পশুখাদ্য উৎপাদনে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন এর নিমিত্তে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম: প্রাণিসম্পদের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসার এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে নিয়োজিত পেশাজীবিদের মাঝে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাম্প্রতিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে পেশাবিদদেরকে অবহিত করার জন্য নিয়মিত

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মানবশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিভাগীয় সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে intensive স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদানের জন্য বৃত্তি পদ্ধতি চালু করতে হবে। অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের আওতায় দেশের সমস্ত ট্রেনিং সেন্টারকে নিয়ে আরও আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সার্ভিস কাঠামো পূনঃর্বিন্যাস ও সমন্বয় সাধন: জেলা ও বিভাগীয় সমমর্যাদা ভুক্ত পদগুলোকে প্রশাসন ক্যাডারসহ অন্যান্য ক্যাডারের ন্যয় উচ্চতর স্কেলে উন্নীত করে ক্যাডার বৈষম্য দূর করে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত পেশাবিদদের হতাশা দূর করতে হবে। উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত সার্ভিস কাঠামো পূনঃর্বিন্যাস কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

সারণি ২.২: গবাদিপশু উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার।

ক্রমিক	চিহ্নিত সমস্যাবলী	সুপারিশসমূহ
১	ব্যক্তি খাতের পক্ষ হতে ডেইরি শিল্পের উন্নয়নের জন্যে অবিরাম চাপ সৃষ্টিকারী সংগঠনের অভাব।	জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে ডেইরি শিল্প মালিক সমিতি গঠন।
২	ডেইরি উন্নয়ন বিষয়ক নিয়ন্ত্রণকারী কতৃপক্ষ না থাকা।	প্রাণিসম্পদ নীতি সমন্বয় ও পর্যালোচনার জন্যে একটি লাইভস্টক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা এ খাতের দ্রুত উন্নতি ও কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে।
৩	দুগ্ধ উৎপাদন এলাকা সমূহে দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অভাব।	ব্যক্তিখাত ও সমবায় ব্যবস্থায় দুগ্ধ উৎপাদন এলাকাসমূহে দুগ্ধ হিমায়িতকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন।
৪	অবাধ চোরাচালানের মাধ্যমে আনীত রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ এবং নিম্নজাতের গবাদিপশু।	স্থল, নৌ ও বিমান বন্দর সমূহে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫	সারাদেশে উন্নত জাতের গবাদিপশুর অপ্রতুলতা ও গো-প্রজনন নীতি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা।	গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে 'গো-প্রজনন নীতি' সঠিকভাবে বাস্তবায়নসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।
৬	অপর্যাপ্ত, সেকেলে ও নিম্নমানের প্রজনন ব্যবস্থা।	প্রজনন ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও পরীক্ষাগার স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে।
৭	প্রাণিসম্পদের জন্য বীমার ব্যবস্থা নেই।	সর্বনিম্ন প্রিমিয়ামে গবাদিপ্রাণির বীমার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।
৮	ডেইরি পণ্য, খাদ্য, ভিটামিনস, ও খাদ্য সম্পুরকসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব।	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যাদি, তাজা খাদ্য, ভিটামিনস ও খাদ্য সম্পুরকের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দেশে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপিত হতে হবে।
৯	পশুবর্জ্যের উপযোগী রুপান্তর ব্যবস্থার অভাব।	পৌরসভাসমূহকে জবাইখানা স্থাপন করে পশুবর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে সংগৃহীত বর্জ্য রুপান্তর কারখানায় পাঠিয়ে উপযোগী পণ্যে রুপান্তরিত করতে হবে যেমন প্রোটিন কনসেনট্রেট, মিট ও বোন মিল ইত্যাদি।
১০	ডেইরি খামারে বিদ্যুতের অযৌক্তিক দাম।	ডেইরি শিল্পের বিদ্যুৎ হার কৃষিভিত্তিক ধাপে নামিয়ে আনতে হবে।
১১	বাৎসরিক প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন।	বাৎসরিক প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় ভিত্তিতে আয়োজন করে তাতে উন্নত গবাদিপশু, যন্ত্রপাতি, পশুজাত পণ্য ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।
১২	গবাদিপশুর খাদ্য সংকট, পুষ্টি ও খাদ্যের নিম্নমান এবং উচ্চমুল্য পক্ষান্তরে গ্রামে দুধের নিম্নমুল্য। পশুপুষ্টির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য শস্য রোপন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।	গবাদিপশুর খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নয়নে 'পশুখাদ্য আইন' পূর্ণঙ্গ বাস্তবায়ন, সারাদেশে উন্নত জাতের ফডার চাষ এবং দুইটি মূল কৃষি পণ্যের মধ্যবর্তী সময়ে পশুখাদ্যের উপযোগী অন্য কৃষিপণ্য চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক্রমিক	চিহ্নিত সমস্যাবলী	সুপারিশসমূহ
১৩	গ্রামীণ এলাকায় সেকেলে ও অপর্যাপ্ত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধে আধুনিকায়ন নিশ্চিত করতে হবে ।
১৪	ঔষধ ও টিকার অপর্যাপ্ততা, নিম্নকার্যকারিতা এবং ক্ষেত্রভেদে উচ্চমূল্য।	ঔষধ ও টিকার গুণগতমান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা করতে হবে।
১৫	পশুজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থার অভাব এবং নিম্নমানের গুঁড়োদুধ আমদানি।	পশুজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে মিল্কভিটার মতা আরো বেসরকারি সমবায় প্রতিষ্ঠান ও বিপণন সংস্থার প্রসারসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৬	গুঁড়ো দুধের অবারিত আমদানি।	উচ্চ শুল্কমূল্য নির্ধারণ করে গুঁড়োদুধ আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ।
১৭	নীড-বেজড প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বিষয়ক গবেষণাগারের অপ্রতুলতা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে অদক্ষতা, সমন্বয়হীনতা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরে জটিলতা।	দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আরো জোর দেয়া দরকার। টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সফল হস্তান্তরের জন্য গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মী, খামারি ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
১৮	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও খামার শিল্পের উন্নয়নমুখী যুগোপযোগী সম্প্রসারণ নীতিমালার অভাব এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধিসহ সম্প্রসারণ সেবার মানোন্নয়ন ও এখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছাতে হবে।
১৯	জৈব কৃষি বাস্তবায়নে মহল বিশেষের অনীহা ও জনসচেনতার অভাব।	জৈব কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
২০	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সফল সমন্বয়ের অভাব।	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নিবেদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সফল সমন্বয়ের উদ্যোগ নিতে হবে।
২১	পশুরোগ, সঙ্গনিরোধ, পশুখাদ্য ও পশুজবাই আইন বাস্তবায়নের অভাব এবং স্বতন্ত্র ঔষধ প্রশাসনের অনুপস্থিতি।	আন্তর্জাতিক বাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পশুজাত পণ্যের বহুমুখীকরণসহ এতদসংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। সেইসাথে স্বতন্ত্র ঔষধ প্রশাসন গঠন করতে হবে।
২২	গবাদিপশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত ঋণ ব্যবস্থার অভাব, পুঁজি সরবরাহে জটিলতা ও উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।	সরকারিভাবে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ভর্তুকি ও অনুদান প্রদানের পাশাপাশি খামার উন্নয়ন ও স্থাপনে ব্যাংক ঋণ সহজীকরণসহ সুদের হার কমাতে হবে।
২৩	প্রাণিসম্পদ উপখাতের যথাযথ ডাটাবেজ ও তথ্য প্রবাহের অভাব।	সঠিক ডাটাবেজ ও তথ্য প্রবাহের জন্য প্রাণিসম্পদ শুমারি বাস্তবায়ন করাসহ আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর আশু সমাধান হলে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আমিষের ঘাটতি পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান এবং জৈব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণে অনন্য অবদান রাখতে পারবে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করার এখনই সময়। অবিলম্বে প্রাণিসম্পদ উপখাতকে থ্রাষ্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করে প্রাণিসম্পদ উপখাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ খাত হিসেবে রুপান্তর করার মাধ্যমে আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য ও কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

২.১.৪ ভারতীয় গরুর প্রবেশ বন্ধের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অধিক খামার স্থাপনের সম্ভাবনা

আমাদের দেশে বর্তমানে ২.৩ কোটি গরু আছে। অধিক চাহিদা থাকায় প্রতি বছর প্রায় ২৫ লক্ষ গরু ভারত, মিয়ানমার, ভূটান এবং নেপাল হতে বৈধ ও অবৈধ পথে দেশে আসে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রক্রিয়াজাত মাংসের বাজার কয়েক মিলিয়ন ডলারের। তবে এই মাংসের পুরোটা বাংলাদেশের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয় না; বেশির ভাগ রপ্তানি হয় উপসাগরীয় দেশগুলোতে। ভারত থেকে আসা গরুর সাথে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রোগের জীবাণু দেশে প্রবেশ

করে, যা আমাদের দেশের গবাদিপশুকে ও মানুষকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলে। গবেষণায় দেখা যায় ভারত এবং বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় একই সময়ে এবং একই গোত্রের জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। এছাড়া এনথ্রাক্সসহ প্রায়ই নতুন নতুন বিভিন্ন রোগের জীবাণু এ সকল আমদানকৃত পশু হতে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এ সকল অসুস্থ পশুর চিকিৎসার ব্যয়ভার ও যে সকল রোগের জীবাণু দেশে প্রবেশ করে তা নিয়ন্ত্রণে যে ক্ষতি হয় আমরা কখনই তা ভেবে দেখি না। তবে সম্প্রতি ভারত সরকার পথে বাংলাদেশে গরুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করেছে। তারই প্রেক্ষিতে এই লেখা-

ভারতীয় গরু বাংলাদেশে প্রবেশের বিভিন্ন দিক নিম্নে বর্ণনা করা হল-

- একটি গরু গড়ে ১৫-২০ বছর বাঁচে। সাধারণত গরু মারা যাওয়ার প্রায় পাঁচ বছর আগেই তা থেকে দুধ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে গরু আসা বন্ধ হলে দুধ দেয় না এমন সোয়া কোটি গরুর পেছনে ভারতের প্রতিপালন ব্যয় হবে বার্ষিক ৩১ হাজার কোটি রুপি। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় কারণে স্বাভাবিকভাবে গরু মারা না যাওয়া পর্যন্ত তারা পুষে থাকেন। খরচের মধ্যে আছে খামার ব্যবস্থাপনা, খামারের কর্মীদের বেতন, পশুর খাবার ইত্যাদি। আবার, খামারের জমি ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রাথমিক বিনিয়োগ ধরলে এই ব্যয় আরও বেড়ে যাবে।
- ভারতীয় গরু গুলি প্রধানত ভারতের পশ্চিম বা দক্ষিণের রাজ্যগুলি হতে আমদানি করা হয়। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের ফলে পশুগুলি খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শুধু হাড়গুলি দেখা যায়। এ কারণে এ গরুগুলিতে অনেকে বোল্ডার গরু বলে থাকে। বাজারে ভারতীয় গরুর মূল্য তুলনামূলকভাবে কম।
- ভারত একটি বড় দেশ এর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশু বাংলাদেশে আসে। কেবল বাংলাদেশেই গরুর চাহিদা থাকায় ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে গরুর প্রবাহ থাকে। ফলে ভারতের ভিভিন্ন অঞ্চলের গবাদিপশুর জানা অজানা রোগগুলি বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছে এবং আমাদের এ রোগ নিয়ন্ত্রণ, পশুর চিকিৎসা এবং আমাদের পশুর মৃত্যুর কারণে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। য কখনই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না।
- আমাদের পশু খামারিরা বিগত বছর গুলিতে পশুর স্বাভাবিক মূল্য পেত না। কারণ চাহিদার সময় প্রচুর ভারতীয় পশু দেশে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করত এবং পশুর মূল্য অনেক কমে যেত, ফলে খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হত।
- কম মূল্যে গরুর মাংস পাওয়া যেত বলে দেশে গবাদিপশুর আধুনিক খামারসহ মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপিত হয় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে খামারিরা 'গরু মোটাতাজাকরণ' এবং ডেইরি খামার স্থাপন করছে। এ খামারগুলি ভারতীয় পশুর প্রবেশের কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- দেশের পোল্ট্রি শিল্পের কাংখিত বিকাশ এ সকল ভারতীয় পশুর কারণে বাধাগ্রস্ত হত। ভারতীয় গরু আমদানি না থাকলে মুরগির মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের ব্রয়লার খামারিরা উপকৃত হবে।
- ভারতীয় গরুর আমদানি বন্ধ হলে গরুর মাংসের চাহিদা পূরণে মাংসের জন্য পশু পালন বৃদ্ধি পাবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিফ (beef) এবং ডেইরি (dairy) খামার স্থাপিত হবে। দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে ফলে দেশ ত্যাগ করার প্রবণতাও কমে আসবে।
- দেশের বিনিয়োগকারীরা বিফ, ডেইরি এবং পোল্ট্রি খাতে বিনিয়োগের উৎসাহ পাবে এবং বিনিয়োগ লাভজনক ও নিরাপদ মনে করবে।
- পশু রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে। রোগ নিয়ন্ত্রণ খাতে ব্যয় কমে আসবে। খামারিরা পশু পালনে উৎসাহিত হবে।

ভারতীয় গরু আমদানি বন্ধে বাংলাদেশের কি কি উপকার হবে-

- দেশে গবাদিপশুর রোগ সংক্রমণ বিশেষ করে ক্ষুরারোগ ও এনথ্রাক্সসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কম হবে।
- ভারত থেকে রোগ জীবাণুর প্রবেশ বন্ধ হলে (চোরাচালানকৃত গরুর মাধ্যমে) গবাদিপশুর রোগ নিয়ন্ত্রণ আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে।
- খামারির পশু পালন ব্যয় কম হবে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবে। বিফ ও ডেইরি শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
- ছোট ছোট গবাদিপশুর খামারিরা উপকৃত হবে। খামারিরা পণ্যের মূল্য পাবে।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অভাবের কারণে দেশ ত্যাগ কমে আসবে। এর জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার আর্থিক সহযোগীতা এবং সরকারি কারিগরি সহযোগীতা প্রয়োজন হবে।

- গবাদিপশুর খামারের সাথে সাথে পোল্ট্রি খামারিরাও উপকৃত হবে।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে বিদেশে গরুর মাংসের রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে। রপ্তানি মুখী শিল্পের বিকাশ হবে।
- দেশের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে। সীমান্ত হত্যা কমে যাবে কারণ বিএসএফ এর হাতে নিহত প্রায় সকলেই গরু ব্যবসায়ী।
- দেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

ভারতীয় গরু আমদানি বন্ধের ফলে আমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে-

- দেশে গরুর মাংসের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তবে কিছুদিনের মধ্যে তা সহনীয় হয়ে যাবে।
- গরুর ব্যবসা যেমন ভারতীয় গরু আমদানিকারক, পরিবহন শ্রমিক, লালন পালনকারী ইত্যাদির ব্যবসা কমে যাবে। সিমান্তের গরুর হাটগুলির কার্যক্রম বন্ধ হতে পারে। যদিও দেশী গরু সেখানে বিক্রি হবে।
- গরু জবাই কিছুটা কম হবে এবং চামড়ার যোগান বা সরবরাহ কমতে পারে।
- গরুর ভাল দাম পাওয়ার আশায় খামারিরা গবাদিপশুর খামার স্থাপন করবে। কিন্তু দেখা যাবে হয়ত হঠাৎ করেই ভারত সিদ্ধান্ত বদল করে পুনরায় গরু প্রবেশের সুযোগ করে দিবে, এতে গরুর দাম পড়ে যাবে এবং খামারিরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
- সিমান্তের অপর পারে গরু জবাই করে এ পারে মাংস পাচার করার কাজ বেড়ে যেতে পারে। অসুস্থ্য সংক্রামক রোগ আক্রান্ত অথবা মৃত গরুর মাংসও সিমান্ত এলাকায় বিক্রি হতে পারে। এর ফলে দেশের ওই সকল এলাকায় গবাদিপশুর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে।
- সিমান্ত এলাকায় মানুষ আরো ঝুঁকি নিয়ে (দাম বেশি পাওয়ার কারণে) গরু চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ পাবে।
- বাংলাদেশে ডেইরি ও মাংসের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এ দেশে বিদেশীদের বিনিয়োগের নামে দেশী শিল্পের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হতে পারে।
- দেশে আস্তে আস্তে মাংসের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মাংস আমদানির সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, জনসংখ্যার ভারে এবং বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে দিন দিন জমি সংকুচিত হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে খাদ্য নিরাপত্তা দিন দিন হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। দেশে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত গবেষণা করে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার চেষ্টা করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গবাদিপশুর মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে বাছুরের মৃত্যুর হার প্রায় ৩০ শতাংশ এবং বড় গরুর মৃত্যুর হার প্রায় ৫ শতাংশ। এ হার গুলি যথাক্রমে ৫ ও ২ শতাংশ নামিয়ে আনা সম্ভব। একই সাথে দেশের পার্বত্য অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে গবাদিপশু খামার স্থাপন করে এ পরিস্থিতি দ্রুতই মোকাবেলা করা সম্ভব। ভারত যে কারণেই বাংলাদেশে গরু প্রবেশ বন্ধ করুক না কেন, একজন প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানী হিসেবে আমি এ বিষয়টিকে আমাদের জন্য আশির্বাদ বলেই মনে করি। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই গরুর মাংসের ঘাটতি পূরণ করতে পারব। অদুর ভবিষ্যতে একই সাথে এ ব্যবস্থা আমাদের নিজস্ব গবাদিপশুর ও পোল্ট্রি শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে সহায়ক হবে।

২.২ চাষাবাদে পশুশক্তির অপ্রতুলতা ও যন্ত্রায়ন প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের কৃষি নীতির মূল উদ্দেশ্য হল খাদ্য শস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। আবাদযোগ্য অব্যবহৃত কোন জমি না থাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচ, সার ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে ফসল নিবিড়তা ও একর পতি ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। এতদঞ্চল কৃষিতে পশুশক্তির ব্যবহারকারী সবচেয়ে পুরাতন অঞ্চলগুলির একটি। নানাবিধ কারণে এখনও এখানে চাষাবাদ, ফসল মাড়াই ও পরিবহণ কাজে প্রধাণত পশুশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশে পশুশক্তির অপ্রতুলতার কথা সরকারিভাবে বলা হচ্ছে কিন্তু অপ্রতুলতার ধরণ ও পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়নি। তাছাড়া পশুশক্তির অপ্রতুলতাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিয়োজত 'সার-বীজ-

জলসেচ’ প্রযুক্তির সাফল্যের অন্তরায় হিসেবেও পরিগণিত করা হয়নি। শুধুমাত্র খসড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্যাটিকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এই বলে... (পশুশক্তি ও প্রোটিনের) স্বল্পতার কারণ হল জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি, পশুখাদ্যের অপর্যাপ্ততা, গত ৩০ বছর ধরে পশুপাখি খাতের প্রতি অবহেলা। এ অবস্থা চলতে থাকলে পশুশক্তির অভাবে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং বিপুল জনগোষ্ঠর জন্য অপুষ্টি এক বিরাট সমস্যা হিসেবে বিরাজ করবে। কাজেই খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুপাখির উন্নয়ন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রেক্ষাপট

কৃষিক্ষেত্রে বর্ধিত হারে ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বলে। অল্প শ্রম, অল্প সময়, অল্প ব্যয় ও অধিক দক্ষতার সাথে খামারে কাজ করতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষি উন্নয়নে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে ‘খামার যান্ত্রিকীকরণ কমিটি’ দেশে ভূমি কর্ষণ, সেচ ও শস্য সংরক্ষণ এ তিন বিষয়ে বিশেষভাবে যান্ত্রিকীকরণের সুপারিশ করে। সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আবহাওয়া, কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তমানে এখানে আংশিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়েছে (Rahman et al. 2011, Quayum and Ali 2012)। যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি আমাদের আবহাওয়ায় মানানসই এবং ফসল উৎপাদনে একান্তই প্রয়োজন সেগুলো দিয়ে বর্তমানে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই সাথে হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মৎস্য খামারে তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও ব্যবহার হচ্ছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, জমির খন্ড-বিখন্ডতা, প্রশস্ত রাস্তা ঘাটের অভাব এবং কৃষকের সকল ধরণের উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় এদেশে পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব নাও হতে পারে। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেসব দেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ শুধু শ্রম শক্তির লাঘবই করেনি বরং ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে তার ফলন ও গুণাগুণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। সে তুলনায় বাংলাদেশ এখনও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় রয়ে গেছে। জনসংখ্যার ক্রম বৃদ্ধির ফলে ফসলের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে। তাই এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

বাংলাদেশে বছরে তিনবার জমি চাষের ব্যস্ত সময় লক্ষ্য করা যায়। যথা- মার্চের প্রথম সপ্তাহ হতে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ, জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহ হতে আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহ এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত। দেশে বর্তমানে চাষের বলদের অভাব শতকরা ৪০ ভাগ এবং উপরোক্ত ব্যস্ত সময়ে এ অভাব দাঁড়ায় ৭০ ভাগে। গরুর ভাল জাত, খাদ্য ও চিকিৎসার অভাব, চারণভূমির অভাব এবং বিভিন্ন সময়ের বন্যায় গবাদিপশুর মৃত্যুর ফলে কৃষিক্ষেত্রে পশুশক্তির অভাব বেড়েই চলছে। তাছাড়া যে সকল কৃষকের চাষের বলদ আছে তারা দু’ফসলের মধ্যবর্তী এত কম সময়ে তড়িঘড়ি করে সঠিকভাবে জমি চাষ করতে পারেনা। ফলে ফসলের ফলনও ভাল হয়না। এসব কারণে দেশে পাওয়ার টিলারের চাহিদা বেড়েই চলছে। পাওয়ার টিলার ব্যবহারের ফলে ব্যস্ত সময়ে জমি চাষ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছেনা বরং অল্প সময়ে কৃষক বেশি গভীরতায় জমি চাষ করে বেশি ফলন পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বীজ বর্ধন খামার ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটে এবং কিছু সংখ্যক ধনী কৃষক তাদের খামারে বিভিন্ন অশ্বশক্তির ট্রাক্টর পাউয়ার ব্যবহার করছে এবং দিন দিন এদের ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তাছাড়া আউশ ও বোরো ধান কাটার পর বৃষ্টি হলে অনেক সময় মাড়াই কাজের বিঘ্ন ঘটে। পদচালিত মাড়াই যন্ত্র (paddle thresher) এক্ষেত্রে বেশ গুরত্ব পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ মাড়াই যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। যেখানে আগে গরু দিয়ে মাড়াই কাজ করা হতো, গরু কমে যাওয়ায় এসব কাজ এখন পদচালিত মাড়াই যন্ত্রে সাহায্যে করা হয়। ধান, সরিষা ও মশলা যেগুলো ঢেঁকি কিংবা ঘানির সাহায্যে ভাঙ্গানো হতো এখন এসব কাজ মেশিনের সাহায্যে করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এখন এসব মিল চালু হয়েছে।

হালচাষে গাভীর ব্যবহার পশুশক্তির অপর্যাপ্ততার নির্দেশক

বর্তমানে প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হালচাষে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মোট হালের গুরুর শতকরা ৩০ ভাগ হল গাভী। অথচ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে বাচ্চা দিতে অক্ষম অল্পসংখ্যক গাভী এতদঞ্চলের মুসলমান চাষীরা হালচাষে ব্যবহার করত। ধর্মীয় কারণে হিন্দুরা গাভী দিয়ে হালচাষ করে না। সাম্প্রতিককালে হালচাষে গাভীর ব্যাপক ব্যবহার দেশে পশুশক্তির অপর্যাপ্তার একটি নির্দেশক বা লক্ষণ।

- অতীতের মত যথেষ্ট হালের বলদ থাকলে হালচাষে গাভীর ব্যবহার হতো না;
- গাভী হালে ব্যবহারের ফলে বাচ্চা দেয়ার হার ক্রমাগত কমে গেছে ফলে শক্তির জন্য আরো বেশি করে গাভীর ব্যবহার হচ্ছে;
- হাল চাষের ফলে গাভীর দুধ দেয়ার ক্ষমতাও কমে গেছে ফলে গ্রাম এলাকায় দুধ খাওয়ার পরিমাণও কমে গেছে এবং পুষ্টি মান কমে গেছে। অপরদিকে শহর এলাকায় দুধের চাহিদা মিটানো হচ্ছে আমদানি করে।

হালচাষে গাভী ব্যবহার বৃদ্ধির কারণ

গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে জন্ম হার, রোগব্যাধিতে মৃত্যু ও মাংসের জন্য জবাইর হারের ওপর। ১৯৪৭ সালের আগে এতদঞ্চলে চিকিৎসার সুবিধার অভাবে রোগব্যাধিতে গরুর মৃত্যুর হার ছিল বেশি। মুসলমান প্রধান বলে এতদঞ্চলে মাংসের জন্য, বিশেষভাবে কোরবানি উপলক্ষ্যে, বহুসংখ্যক গরু জবাই হতো। ফলে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কম। তবে ঘাটতি পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা থেকে হালের গরু আমদানি করা হতো। ওসব প্রদেশ হিন্দু প্রধান বলে গরু জবাইর হার ছিল খুব কম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ওসব প্রদেশ থেকে গরুর সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সরকারিভাবে ভারত থেকে গরু আমদানির কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অবশ্য অল্প সংখ্যক গরু অবৈধভাবে আমদানি হয়ে থাকে। যাই হোক, দীর্ঘদিনের সরবরাহ সূত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের কৃষকরা হলের গরুর ঘাটতি পূরণের জন্য ক্রমান্বয়ে দুধের গাভীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার ফলশ্রুতিতে খামার ক্রমাগত ক্ষুদ্রায়তন হতে থাকায় হালচাষে গাভীর ব্যবহার আরো বেড়ে যায়। ক্ষুদ্র কৃষকরা হালচাষে গাভী ব্যবহার করে কারণ তাদের প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম বলে কম শক্তিসম্পন্ন গাভী তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। উপরন্তু বলদের তুলনায় হালের গাভীর দাম কম বলে স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন ক্ষুদ্র কৃষকরা গাভী ব্যবহার করে।

গাভী হালচাষে ব্যবহারের প্রতিফল

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন ও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের জন্য গরু জবাইর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এসব গরুর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হল গাভী। দুধের গাভী একবার হালচাষে শুরু হওয়ার পর এক শনিচক্রের সৃষ্টি হয়। হালচাষের ফলে ক্রমাগত বেশি সংখ্যক গাভীর বাচ্চা দান ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং গরুর সামগ্রিক জন্ম হার কমে যায়। এর ফলে হালের বলদের সংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায় এবং ক্রমাগত বেশি সংখ্যক গাভী দিয়ে সে অভাব পূরণ করা হয়। কিছুকাল আগেও গ্রামের অধিকাংশ লোক নিজের পোষা গরুর দুধ পান করত ফলে তাদের খাদ্যের সামগ্রিক পুষ্টিমান মোটামুটি উন্নত ছিল। এখন গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক জমি ও গরুহীন, জমি আছে এমন অনেকেরই গরু নেই, গরু আছে এমন অনেকেই গাভী দিয়ে হালচাষ করে। ফলে গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর এখন আর দুধ পান করার ক্ষমতা ও সুযোগ নেই। শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে তাদের হারাতে হচ্ছে প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ ফলে তাদের খাদ্যের পুষ্টিমান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। অপরদিকে শহর এলাকায় দুধের চাহিদা মেটানো হচ্ছে মূলত আমাদনি করে। ক্রমবর্ধমান যে দুধের বাজারের সুবিধা পাওয়া উচিত ছিল এ দেশের কৃষকদের তা এখন বিদেশীদের করায়ত্ত। হালচাষে গাভী ব্যবহার রোধ করতে না পরলে এসব অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

সার্বিক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে কৃষি প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থায় হালচাষে প্রয়াজনীয় শক্তির যথেষ্ট অপর্যাপ্ততা রয়েছে। জলসেচের সাহায্যে ফসল নিবিড়তা বাড়াতে গেলে শক্তির সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠবে যদি পশুশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি এবং/অথবা চাহিদা কমানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া না হয়। উন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষকাজ ক্রমাগত বিশেষিত ও যন্ত্রনির্ভর হয়েছে, মানুষ ও পশুশক্তির ব্যবহার ত্রমশঃ কমেছে। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার ও সেবামূলক খাতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে সরাসরি নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ও অনুপাত দুটোই ক্রমশঃ কমেছে ফলে যন্ত্রনির্ভরতা আরো বেড়েছে। তবে পশু আরো বহুদিন এখানে কৃষি শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে বহাল থাকবে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শীঘ্র এরকম সংস্কার হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম বিধায় এখানে চাহিদা/সরবরাহের দিকগুলোই বিবেচনা করা হল।

- পশুশক্তি সরবরাহের দিক থেকে প্রকৃত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে দুধ বা বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হালচাষে গাভীর ব্যবহার কমানোর প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। শক্তির প্রাপ্যতা বা সরবরাহ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর- হালের গরুর সংখ্যা, তাদের গুণগত মান (আকার-আয়তন, স্বাস্থ্য) এবং শক্তিকে প্রকৃত কাজে রুপান্তরে দক্ষতা। জনসংখ্যার চাপে পরিবার ও খামার বিভাজন ও ক্ষুদ্রায়তন হওয়ার প্রক্রিয়া আরও অনেকদিন চলবে এবং এরা যথাসাধ্য হালের গরু রাখতে চেষ্টা করবে ফলে অদূর ভবিষ্যতে সার্বিকভাবে হালের গরুর সংখ্যা কমার সম্ভাবনা কম। কাজেই মূল দৃষ্টি দিতে হবে খাদ্য, প্রজনন, রোগব্যাধি দমন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যমান গরুর গুণগত মানোন্নয়নে। দীর্ঘদিন পশুপাখি খাতের প্রতি অবহেলার কারণে এখন উল্লিখিত কাজগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ যথেষ্টে বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যেই ফসলের উচ্ছিষ্ট বিশেষভাবে ধানের খড়ের পাচ্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কিছু গবেষণায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। এ জাতীয় গবেষণায় আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং দেশের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় ফসল ও পশুপাখির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা মনে রেখে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত।
- পশুশক্তির চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা কমানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ের সম্ভাব্যতা বিচার করা যেতে পারে: (ক) শূন্য অথবা স্বল্পতম কর্ষণ (খ) কর্ষণের আগে জলসেচ। তৃতীয় যে বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করা দরকার তা হল উপযুক্ত ফসলচক্র ও ফসলবিন্যাসের মাধ্যমে জো মৌসুমে শক্তির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনা। অপেক্ষাকৃত বড় চাষীরা এ পদ্ধতি কিছুটা কাজে লাগায়। বর্তমানে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কিত যে সব গবেষণা প্রকল্প আছে তাতে পশুশক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- পশুশক্তির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য আরও সেরা পদক্ষেপ নেয়া যায় তা হল এক পশুর হাল চালু করা , লাঙ্গল ও জোয়ালের গঠনাকৃতির উন্নতি করে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশে একমাত্র সিলেট জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিন থেকে এক মহিষের হাল চালু আছে। সিলেটের বাইরে যেসব অঞ্চলে মহিষ আছে সেখানে এ পদ্ধতি প্রচলনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত যদিও এর ফলে সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হবে না কারণ দেশে হালচাষে ব্যবহৃত গরু ও মহিষের শতকরা ২-৩ ভাগের মতো হল মহিষ।
- দেশে নানা গঠনাকৃতির লাঙ্গল-জোয়াল ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব গঠনাকৃতি স্থানীয়ভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। তদুপরি কোন কোন গঠনাকৃতি অন্যগুলি চেয়ে কার্যকর শক্তি রুপান্তরে অধিক দক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। এধরণের অপেক্ষাকৃত দক্ষ গঠনাকৃতির লাঙ্গল জোয়াল খুঁজে বের করে গুলোর দক্ষতা আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। এসব গঠনাকৃতির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন গঠনাকৃতির তৈরি করা যেতে পারে। এরকম আরো গবেষণা যত তাড়াতাড়ি যত বেশি হয় ততই মঙ্গল।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বড় সুবিধা এই যে অল্প সময়ে, কম শ্রমিক দিয়ে, দক্ষতার সাথে, কম খরচে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সম্ভাব্য বেকারত্ব। দেশের অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক কৃষি শিল্পে নিয়োজিত। দেশে কৃষি ক্ষেত্রে পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণ হলে অধিকাংশ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলদেশে আংশিক যান্ত্রিকীকরণই শ্রেয়। দেশের পরিবেশের কথা বিবেচনা করে দেশীয় প্রযুক্তি দিয়ে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি কৃষি ক্ষেত্রে বেশি লাগসই হবে বলে বিবেচিত। তাই কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করাসহ এর খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২.৩ গাভীর খামার স্থাপন

২.৩.১ গাভী পালনের বিবেচ্য বিষয়

গাভীর জাত: নিজস্ব পছন্দ, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে গাভীর জাত নির্বাচন করতে হবে। এলাকার জনগণের চাহিদা ও বাজার দর বিবেচনা করতে হবে, সাধারণত যে গাভী বেশি দুধ দেয় ও পরিবেশের সাথে উপযোগী তাদের পালন করতে হবে।

গাভী প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা: প্রতিটি গাভীর নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণের একটি নিম্নতম সীমারেখা থাকা উচিত। কোন গাভীর উৎপাদনের ক্ষমতা সীমারেখার নিচে নেমে গেলে তাকে বাদ দিতে হবে। প্রতিটি গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পালনকারীকে সজাগ দৃষ্টি রেখে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

গাভীর সংখ্যা: পালনকারীর মূলধন, সুযোগ-সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করেই গাভীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে। এ সংখ্যা কোনভাবেই নির্দিষ্ট সংখ্যার কম বা বেশি হবে না। কারণ গাভীর সংখ্যা বাড়ালেই যে সংখ্যানুপাতে আয় বাড়বে তা ঠিক নয়।

গাভীর শারীরিক অবস্থা: গাভীর শারীরিক অবস্থার উপর উৎপাদন নির্ভর করে। গাভী পালনে অবশ্যই গাভীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

গাভীর খাদ্য: খাদ্যের গুণগত মান, ধরন এবং পছন্দ-অপছন্দ ও কোন প্রকারের গাভীকে কখন কিভাবে কতটুকু খাদ্য দিতে হবে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। গাভীকে জীবন ধারণ ও উৎপাদনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

খাদ্য সরবরাহ: গাভী পালনে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা হল প্রধান সমস্যা। গাভীর জন্য কাঁচা ও শুকানো ঘাস, খড় ও বিচালী, ডাল জাতীয় শস্য, গম, ভুট্টা প্রভৃতি নিজস্ব খামারেই উৎপাদন করার ব্যবস্থা রাখা ভাল। দানাদার খাদ্য মৌসুমের সময় ক্রয় করে সংরক্ষণ করে রাখা ভাল।

নতুন গাভীর আমদানি: পালনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ছাঁটাই করা গাভীর জায়গায় উন্নতমানের গাভী আমদানি করতে হবে। গাভীর নিজস্ব উৎপাদন কমে যাওয়া, স্বাস্থ্যহানী, রোগাক্রান্ত গাভী ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত গাভী ছাঁটাই করতে হবে।

বিনিয়োগ: গাভী পালনের জন্য ঘর-বাড়ি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। এগুলো ক্রয় করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, এর ফলে শ্রম খরচ ও সময় বাঁচবে কিনা, অনায়াসে কাজ করা সম্ভবপর কিনা, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুধের গুণাগুণ বৃদ্ধি পাবে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করার পর বিনিয়োগ বাড়ানো যেতে পারে।

বাজার পরিস্থিতি: গাভী পালনে এলাকার লোকজনের চাহিদা, ক্রয় ক্ষমতা, বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মালামাল আনা-নেয়ার জন্য রাস্তা-ঘাট, যানবাহন আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

ব্যবস্থাপনা: গাভী পালনে ২৪ ঘন্টার কখন কিভাবে গাভীকে খাওয়াতে হবে, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে ও উৎপাদনের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে। প্রজনন বিধিসম্মত হচ্ছে কিনা, কি পদ্ধতিতে খামারকে রোগমুক্ত রাখা যায়, উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বিতরণ হচ্ছে কিনা, বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঠিকমত জমা হচ্ছে কিনা, পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে।

দ্রব্যের উৎপাদন: গাভী পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল উৎকৃষ্ট মানের দধু , দুগ্ধ জাত দ্রব্য, মাংস ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করা। উৎকৃষ্টমানের দুধ পাওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত হল দোহন কাজে নিয়োজিত গোয়ালা, ব্যবহারকৃত পাত্র ও যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। দ্বিতীয় শর্ত দুধে জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস করা। ৩য় শর্ত অপ্রীতিকর স্বাদ বা গন্ধমুক্ত হওয়া। ৪র্থ শর্ত রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যবান গাভী ও পরিচর্যাকারী। গাভীর ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে মাঝে মাঝে শোধন করতে হবে, যাতে কোন প্রকার মহামারী লাগতে না পারে। এদিকগুলো বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে।

নথিপত্রের ব্যবহার: গাভী পালনে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করার জন্য উপযুক্ত নথি রাখতে হবে। দৈনন্দিন নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করলে খামারের সঠিক চিত্র একনজরে দেখা যায় ও সেভাবে কাজ করা যায়। আয়-ব্যয় নির্ভর করে নথিপত্র বিবেচনা করে কাজ করার উপর।

গাভীর বংশবৃদ্ধি: সুস্থ, সবল ও দোষমুক্ত গাভী সাধারণত প্রতি বছরই একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদনক্ষম গাভী পালন করতে হবে ও লাভবান হওয়া যাবে।

শুরুর সময়: কোন সময় থেকে গাভী পালন শুরু করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে ও গাভীকে প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করা যাবে তা বিবেচনা করতে হবে।

মালিকের নৈপুণ্য: দক্ষতার সাথে কর্মচারী পরিচালনার উপরই সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। গাভী পালন সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করার তিনটি মূলমন্ত্র ১ম পালনের যাবতীয় কাজের একটি নিখুঁত খসড়া বানানো। ২য় বিভিন্ন শাখার কাজ কর্ম সঠিকভাবে বন্টন করা ও ৩য় ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখাশুনা করা এবং সময়মতো উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া।

খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান: গাভীর খামার স্থাপনে খামারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিকমত না করলে খামার লাভজনক কি অলাভজনক তা বুঝা যাবে না। তাই লাভজনকভাবে খামার করতে হলে আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখতে হবে। খামারের আয় হতে ব্যয় বাদ দিলে যা থাকবে সেটা হবে লাভ। খামারের ব্যয়কে দু'ভাবে ভাগ করা যায়; যথা- স্থায়ী ব্যয় ও আবর্তক ব্যয়।

খামারের স্থায়ী ব্যয়: খামার স্থাপনের জমি, ঘড়-বাড়ি নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ সংযোগ স্থাপন। যন্ত্রপাতি ও গাভী ক্রয় ইত্যাদি খাতে যে টাকা ব্যয় হয়, তাকে স্থায়ী ব্যয় বলে। স্থায়ী ব্যয়কে মূলধন ব্যয়ও বলা হয়। গরু ক্রয় বাবদ ব্যয়কে কেউ কেউ আবর্তক ব্যয়ের মধ্যে ধরে থাকেন। তবে এ ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয় হিসাবে বা মূলধন বিনিয়োগ হিসাবে ধরাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

খামারের আবর্তক ব্যয়: খামার পরিচালনায় দৈনিক যে ব্যয় হয় তাকে আবর্তক ব্যয় বলা হয়। একে দৈনন্দিন ব্যয়ও বলা হয়। গরুর খাদ্য, ঔষধ-পত্র টিকা, গরুর ব্যবহৃত সরঞ্জমাদি, খামারের প্রশাসনিক ব্যয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিল ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হয়, সেগুলো আবর্তক ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়। খামার স্থাপনের পূর্বে খামারের প্রকল্প প্রণয়নের সময় খামারের আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে খামারের লাভ লোকসান নির্ণয় করা যায়। খামারে গাভীর সংখ্যা, গাভীর জাত, দুধ উৎপাদন, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ওপর লাভ-লোকসান নির্ভর করে। খামারের জন্য উন্নত সংকর জাতের অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভী সংগ্রহ করতে হবে। খামারের ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে হবে। গাভীর সংখ্যা ১০ ও তদূর্ধে হলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খামার পরিচালনা করা যায়।

২.৩.২ দশটি গাভীর দুগ্ধ খামার প্রকল্পে আয়-ব্যয়ের নমুনা

১. প্রকল্পের নাম: কাঠুর ডেইরি কমপ্লেক্স
২. উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা: আবুল হোসেন, পিতা- আলহাজ্ব কলিম উদ্দিন, গ্রাম- কাঠুর, উপজেলা- ফুলছড়ি, জেলা- গাইবান্ধা।
৩. প্রকল্পের অবস্থান: গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন উদাখালী ইউনিয়নের কাঠুর মৌজায় যাহার জেএল নং- ২৩, খতিয়ান নং- ১০৮৭, দাগ নং- ১৪৩৫ এবং জমির পরিমাণ- ০.৯০ একর।
৪. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য: (ক) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
(খ) দুধ, মাংস ও চামড়া উৎপাদনের সৃষ্টি।
(গ) পারিবারিকভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।
৫. প্রকল্পের মালিকানা: ব্যক্তি মালিকানা।
৬. অবকাঠামোগত অবস্থান: ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ উঁচু জায়গা ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়।
৭. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: পাঁচ বছর।

৮. প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ: প্রয়োজনীয় মূলধন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের স্থানীয় শাখা হইতে ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজস্ব জমিতে বিনিয়োগ করা হবে।

সারণি ২.৩: দশটি গাভীর খামার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গবাদিপশু, সংখ্যা, দৈহিক ওজন এবং গড় দুধ উৎপাদন।

পশুর ধরন	পশুর সংখ্যা	গড় দৈহিক ওজন (কেজি)	গড় দুধ উৎপাদন (কেজি)
দুধালো গাভী	৬	৩০০	৮
দুধবিহীন গাভী	৪	৩০০	-
বকনা	৪	১৫০	-
বাছুর	৬	৭৫	-

(ক) প্রয়োজনীয় গৃহায়ন: প্রতিটি দুধালো গাভীর জন্য ৫০ বর্গফুট, দুধবিহীন ও বকনার জন্য ৪০ বর্গফুট এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য ৩০ বর্গফুট হিসেবে আধুনিক পদ্ধতির একক আদর্শ গোশালায় মোট ৮০০ বর্গফুট ঘরের প্রয়োজন। পাকা খাদ্য ও পানির পাত্র এবং ইটের মেঝে ও তারজালি-টিনের বেড়াসহ দোচালা টিনের ঘর নির্মাণে প্রতি বর্গফুট ১৬০ টাকা হিসেবে ৮০০ বর্গফুট ঘর তৈরি বাবদ মোট খরচ ১,২৮,০০০ টাকা।

(খ) বাছুরসহ ৬টি সংকর জাতের গাভী যার প্রতিটির মূল্য ৮০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ৪,৮০,০০০ টাকা।

(গ) দুধবিহীন ৪টি সংকর জাতের গাভী যার প্রতিটির মূল্য ৬০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ২,৪০,০০০ টাকা।

(ঘ) সংকর জাতের ৪টি বকনা যার প্রতিটির মূল্য ৪০,০০০ টাকা হিসেবে মোট খরচ ১,৬০,০০০ টাকা।

(ঙ) খামার ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামাদিসহ বিবিধ মোট খরচ ৪২,০০০ টাকা।

সুতরাং খামারে সর্বমোট মূলধন বিনিয়োগ হবে (প্রয়োজনীয় গৃহায়ন ১,২৮,০০০ টাকা + বাছুরসহ ৬টি সংকর জাতের গাভী ৪,৮০,০০০ টাকা + দুধবিহীন ৪টি সংকর জাতের গাভী ২,৪০,০০০ টাকা + সংকর জাতের ৪টি বকনা ১,৬০,০০০ টাকা + খামার ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামাদি ৪২,০০০ টাকা) ১০,৫০,০০০ টাকা।

৯। বাৎসরিক আবর্তক খরচ:

(ক) খাদ্য খরচ: গরুর ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য ওজনের শতকরা ৫ ভাগ সরস আঁশ জাতীয় খাদ্য (কাঁচা ঘাস), শতকরা ১ ভাগ শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (খড়) ও শতকরা ১ ভাগ দানাদার জাতীয় খাদ্যের দরকার হয়। উপরন্তু, দৈনিক ৮ লিটার দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভীর অতিরিক্ত ১ কেজি দানাদার খাদ্যের দরকার। সে মোতাবেক পাঁচটি গাভীর খামারে বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খরচ উল্লেখ করা হল-

সারণি ২.৪ঃ পাঁচটি গাভীর খামারে বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও খরচ।

খাদ্যের ধরন	বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা (কেজি)					প্রতি কেজির মূল্য (টাকা)	বার্ষিক খরচ (টাকা)	মন্তব্য
	দুধালো গাভী	দুধবিহীন গাভী	বকনা	বাছুর	মোট			
সরস আঁশ জাতীয় খাদ্য	৩২,৮৫০	২১,৯০০	১০,৯৫০	৫,৪৭৫	৭১,১৭৫	০.৫০	৩৫,৫৮৭.৫০	এখানে সরস আঁশ জাতীয় খাদ্যের শুধু উৎপাদন খরচ ধরা হয়েছে।
শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য	৬,৫৭০	৪,৩৮০	২,১৯০	১,০৯৫	১৪,২৩৫	১.৫০	২১,৩৫২.৫০	
দানাদার জাতীয় খাদ্য	৬,৫৭০	৪,৩৮০	২,১৯০	১,০৯৫	১৪,২৩৫	২৫.০০	৩,৫৫,৮৭৫	
সর্বমোট =							৪,১২,৮১৫	

(খ) খামার ব্যবস্থাপনায় বিবিধ সরবরাহসহ স্বাস্থ্যবিধি ও প্রজনন কাজে বার্ষিক সর্বমোট খরচ ৫০,০০০ টাকা।

সুতরাং দশটি গাভীর খামারে বার্ষিক আবর্তক খরচ সর্বমোট (খাদ্য খরচ ৪,১২,৮১৫ টাকা + খামার ব্যবস্থাপনা ৫০,০০০ টাকা) ৪,৬২,৮১৫ টাকা যাহা খামারের বার্ষিক আয় হতে মেটানো হবে।

১০। বাৎসরিক আয়:
(ক) দুধ বিক্রি- প্রতিটি গাভীতে দৈনিক গড়ে ৮ লিটার দুধ উৎপাদন হলে ৩০০ দিনে ৬টি হতে, প্রতি লিটার ৫০ টাকা হিসেবে মোট বাৎসরিক আয় ৭,২০,০০০ টাকা।
(খ) গোবর বিক্রি- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজন ৬ কেজি গোবর উৎপন্ন করলে খামারের ৩,৯০০ কেজি দৈহিক ওজন বৎসরে প্রায় ৮৫.৪ টন গোবর উৎপন্ন করবে। গোবর ৫০০ টাকা টন হিসেবে বাৎসরিক মোট আয় ৪২,৭০০ টাকা।
(গ) বাছুর বিক্রি- প্রতি বছর এক বছর-বয়সী ৬টি বাছুর গড়ে ২৫,০০০ টাকা করে বিক্রি করে বাৎসরিক মোট আয় ১,৫০,০০০ টাকা।
সুতরাং দুগ্ধ খামার হতে বার্ষিক আয় হবে (দুধ বিক্রি ৭,২০,০০০ টাকা + গোবর বিক্রি ৪২,৭০০ টাকা + বাছুর বিক্রি ১,৫০,০০০ টাকা) সর্বমোট ৯,১২,৭০০ টাকা।

১১। বাৎসরিক মুনাফা: বার্ষিক সর্বমোট আয় ৯,১২,৭০০ টাকা হতে বার্ষিক আবর্তক খরচ ৪,৬২,৮১৫ টাকা বাদ দিলে বার্ষিক নীট মুনাফা থাকবে ৪,৪৯,৮৮৫ টাকা।

১২। ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান:

সারণি ২.৫ঃ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান।

বৎসর	ঋণের পরিমান	বার্ষিক সুদ	মোট	বার্ষিক নীট আয়	বার্ষিক পরিশোধ			বার্ষিক উদ্বৃত্ত নীট আয়
					মূল	সুদ	মোট	
প্রথম	১০৫০০০০	১০৫০০০	১১৫৫০০০	৪,৪৯,৮৮৫	২,১০,০০০	১০৫০০০	৩,১৫,০০০	১,৩৪,৮৮৫
দ্বিতীয়	৮,৪০,০০০	৮৪,০০০	২,৬৪,০০০	৪,৪৯,৮৮৫	২,১০,০০০	৮৪,০০০	২,৯৪,০০০	১,৫৫,৮৮৫
তৃতীয়	৬,৩০,০০০	৬৩,০০০	১,৯৮,০০০	৪,৪৯,৮৮৫	২,১০,০০০	৬৩,০০০	২,৭৩,০০০	১,৭৬,৮৮৫
চতুর্থ	৪,২০,০০০	৪২,০০০	১,৩২,০০০	৪,৪৯,৮৮৫	২,১০,০০০	৪২,০০০	২,৫২,০০০	১,৯৭,৮৮৫
পঞ্চম	২,১০,০০০	২১,০০০	৬৬,০০০	৪,৪৯,৮৮৫	২,১০,০০০	২১,০০০	২,৩১,০০০	২,১৮,৮৮৫
ষষ্ঠ	-	-	-	৪,৪৯,৮৮৫	-	-	-	৪,৪৯,৮৮৫

এখানে সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ ধরা হয়েছে।

১৩। মতামত: উদ্যেক্তা ৫ বছরে প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের পর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প চালু রাখবেন এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মাসিক প্রায় ৩৭,৫০০ টাকা নীট আয় (যেহেতু বার্ষিক নীট আয় ৪,৪৯,৮৮৫ টাকা) করে স্বাবলম্বী হবেন। যে ১০টি গাভী, ৪টি বকনা ও ৬টি বাছুর দিয়ে খামার শুরু করা হয়েছিলো ৫ বছর পর সেগুলো খামারের মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে মৃত্যুহার ধরা হয়নি এবং খাদ্য ও দুধসহ অন্যান্য পণ্যের দাম স্থিতাবস্থায় ধরা হয়েছে। [বিশেষ দ্রষ্টব্য: খামারে আয়-ব্যয়ের এই হিসাব ২০১০ সালের গড় বাজার দর অনুযায়ী প্রণীত; স্থান ও কাল ভেদে এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তনশীল।]

২.৩.৩ দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা

লাভজনক ডেইরি খামার গড়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। তবে সুস্থসবল পশু পালন ও পর্যাপ্ত উৎপাদন করে ডেইরি খামারকে লাভজনক করা যায়। এজন্য প্রয়োজন নিয়মিত সতর্কতা, রোগ সম্পর্কে জ্ঞান এবং পরিশ্রম। প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা (cleaning and sanitation): উপযুক্ত বা সুষ্ঠু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার মাধ্যমে ডেইরি ফার্মে স্বাস্থ্যবান পশু পালন করা যায়। পশুর মলমূত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করে গর্তে রাখা প্রয়োজন। পশুর খাদ্যে ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালভাবে পরিষ্কার করা প্রয়াজন। প্রসূতি স্টলে বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। বাচ্চা প্রসবের পর সমস্ত খড় কুটা, খাদ্য ও মলমূত্র পরিষ্কার করে নির্বীজক পদার্থ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক করে সুষ্ঠু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। দূষণের উৎস (source of contamination): ডেইরি ফার্মে দর্শনার্থী রোগের জীবাণুর বাহক হিসেবে ভুমিকা রয়েছে। তবে ফার্মের কর্মচারী যারা খামারে কাজ করে তাদের জুতা বা বুট ফার্মের গেটে পরিষ্কার করে ও জীবাণুনাশক পদার্থে চুবিয়ে প্রবেশ করা প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি দূষণের মাধ্যমে খামারে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। এক খামার থেকে অন্য খামারে বন্য পাখি, ইঁদুর, কুকুর ইত্যাদি প্রাণির মাধ্যমে রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে।

৩। নতুন পশু ক্রয় (buying animals for replacement): ডেইরি খামারে বহির থেকে পশু ক্রয় করে সরাসরি খামারে পশুর সাথে পালন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ব্রুসেলোসিস, যক্ষা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগমুক্ত ভেটেরিনারিয়ানের সার্টিফিকেটযুক্ত পশু ক্রয় করে কমপক্ষে ৩০ দিন পৃথক রেখে এবং পুনরায় পরীক্ষা করে খামারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। গাভীর ক্ষেত্রে ম্যাস্টাইটিস, জরায়ু প্রদাহ ইত্যাদি ক্রয়ের পূর্বে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। গাভীর ওলান ও প্রতিটি বাঁট গরম, শক্ত ক্ষত বা সংক্রমণ আছে কিনা পালপেশন করে বুঝা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর ক্ষেত্রে দুধের নমুনা গবেষণাগারে ব্যাকট্রিওলজিক্যাল পরীক্ষা করা যায়। নতুন ষাঁড় ক্রয় করলে রিপ্রডাকটিভ ডিজিজ বিশেষ করে ট্রাইট্রাইকোমোনিয়াসিস আছে কিনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৪। গ্রুমিং ও ক্লিপিং (grooming and clipping): পরিষ্কার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে প্রত্যহ গ্রুমিং ও ক্লিপিং করা প্রয়োজন। পশুকে নিয়মিত গ্রুমিং করলে বহিঃপরজীবীর আক্রমণ হতে পারেনা এবং দুধ পরিষ্কারভাবে দোহন করা যায়।

৫। ব্যায়াম (exercise): গো-শালায় বেঁধে পালনকৃত গাভীকে প্রত্যহ ঘরের বাহিরে নিয়ে কয়েক ঘন্টা ব্যায়াম করানো প্রয়াজন। ব্যায়াম করার ফলে একদিকে রুচি বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে গরম হওয়া পশুকে সহজে সনাক্ত করা যায়।

৬। ক্ষুরের পরিপাটিকরণ (hoof trimming): ব্যায়ামবিহীন অবস্থায় গাভী পালন করলে ক্ষুরে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। অতিরিক্ত বর্ধিত ক্ষুর কেটে দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বাটালি, হাতুড়ি, কাঠের মোটা উখা, ষাড়াশি, ছুরি এবং ২৫-৩০ফুট লম্বা ও ০.৫ ইঞ্চি মোটা দড়ি।

৭। শিং কর্তন (dehorning): গরুর শিং কর্তন করলে গরু শান্ত স্বভাবের হয় এবং খাদ্য ও পানির পাত্রে গুতাগুতি করতে পারে না। অনেক খামার মালিক খাঁটি জাতের গরুর শিং কর্তনে আগ্রহী নয়। যেমন- আয়ারশিয়ারস জাতের গরুর সুন্দর শিং থাকে যা জাতের বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং শিংযুক্ত গরুর মূল্য উপযুক্ত হয়। খামার বা পালে পালনকৃত সকল পশুর শিং কর্তন করে দেয়ায় উত্তম। রাসায়নিক পদার্থ, ইলেকট্রিক আয়রোন, ক্লিপারস ও করাত ইত্যাদির সাহায্যে ডি-হর্নিং করা হয়।

৮। খামারের মাছি দমন (fly control in ith farm): ডেইরি খামারে মাছির অংশ বিস্তারের জন্য অনেক উপযোগী স্থান থাকে। যেমন- মলমূত্রের স্তুপ, নর্দমাহীন জায়গা, সাইলেজ ঘাসের গাদা, ময়লাযুক্ত খাবার ও পানির পাত্র, যে কোন পচা জৈব পদার্থযুক্ত স্থান ইত্যাদি। মাছি প্রজননের সকল স্থান সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। পাইেরিথ্রিন (০.১%) স্প্রে ব্যবহার করে মাছি দমন করা যায়।

৯। গরুর অসুস্থতা পরীক্ষা (checking cattle for illness): গাভীর যে সকল লক্ষণের উপস্থিতি পরীক্ষা করে অসুস্থতা নিরুপন করা যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল- দুধ উৎপাদন হ্রাস (drop in milk production), রোমন্থকহীন অবস্থা (no rumination), অমসৃণ লোম (rough hair coat), দেহের তাপবৃদ্ধি (elevation in body temperature), ক্ষুধামন্দা (loss of appetite), চোখে নিরানন্দভাব (dullness in the eyes) এবং শুষ্ক মুখবন্ধনী (dry muzzle)।

১০। ভেটেরিনারিয়ানকে কখন ডাকবেন (when to call veterinarian): ডেইরি খামারে পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা করার দক্ষতা খামার মালিক বা ম্যানেজারের অর্জন করতে হবে। প্রধানত যে সকল কারণে ভেটেরিনারিয়ান ডাকা প্রয়োজন তা এখানে উল্লেখ করা হল- সংক্রমক রোগ দেখা দিলে, মিল্ক ফিভার হলে, গাভী খাওয়া বন্ধ করলে, কষ্টদায়ক বা অস্বাভাবিক বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে, তীব্র আঘাত বা ক্ষত হলে, গাভীর গর্ভবস্থা নির্ণয় ও প্রজনন সমস্যা পরীক্ষার জন্য গর্ভফুল আটকিয়ে গেলে।

২.৩.৪ দুগ্ধ খামারের দৈনন্দিন কার্যাবলী

গাভীর খামারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর তার প্রকৃত মুনাফা নির্ভর করে। খামারের ম্যানেজার যাদি ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামার পরিচালনা করেন তবে এর উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শ্রমিকদের কাজের বন্টন, গাভী ও বাচ্চার প্রয়োজন মাফিক খাদ্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে যদি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে খামার পরিচালনা করা হয় তবে সেক্ষেত্রে উৎপাদন হারও বেড়ে যায়। এছাড়া খামারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে খামার লাভজনক করে গড়ে তোলা উচিত। দুগ্ধ খামারের সফলতার জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। খামারের ব্যবস্থাপক এ কাজগুলোর তত্ত্বাবধান করে থাকেন। দুগ্ধ খামারে প্রতিদিন যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলো নিচের সারণিতে দেখানো হল-

সারণি ২.৬ঃ দুগ্ধ খামারে প্রতিদিন করণীয় কাজ।

সময়	করণীয় কাজ
ভোর ৪.০০-৪.৩০ টা	দুধ দোহন করার ঘর এবং দুগ্ধবতী গাভীগুলোকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
ভোর ৪.৩০-৫.৩০ টা	দুধ দোহন শুরু করতে হবে এবং দৈনিক গাভীর যতটুকু দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন তার অর্ধেক পরিমাণ দোহনের সময় গাভীকে খেতে দিতে হবে।
সকাল ৫.৩০-৬.৩০ টা	বিক্রয়ের জন্য কাঁচা দুধ সরবরাহ করতে হবে।
সকাল ৬.৩০-৭.০০ টা	গাভীগুলোকে শেডে পাঠাতে হবে ও খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজের সাথে খামারের শ্রমিকবৃন্দ মাঠে ঘাস সংগ্রহ শুরু করবেন।
সকাল ৭.০০-১১.০০ টা	গাভীগুলো খোলা মাঠে ঘুরে বেড়াবে যাতে করে কিছুটা ব্যায়াম হয় এবং সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন-ডি সংশ্লেষণ করতে পারে। অন্যান্য ব্যবস্থাপনা, যেমন- চিহ্নিতকরণ, বাছুরের ডিহর্নিং, ভ্যাকসিনেশন, সাইলেজ ও হে তৈরিকরণ ইত্যাদি কাজ এ সময়ে করতে হবে।
সকাল ১১.০০-১২.০০ টা	এ সময়ের মধ্যে সাইলেজ এবং হে তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। গাভীগুলোকে মিল্কিং বার্নে পুনরায় নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর দুধালো গাভী ছাড়া অন্যান্য প্রাণিদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এসময় অবশ্য সকল প্রাণিকে আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে।
বিকাল ২.৩০-৩.০০ টা	দুধালো গাভীসহ অন্যান্য গাভীর বাসস্থান এসময়ের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।
বিকাল ৩.০০-৪.০০ টা	এসময় দুধ দোহন করতে হবে এবং অবশিষ্ট দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। অতপর বাছুরের খাবার সরবরাহ করতে হবে।
বিকাল ৪.০০-৪.৩০ টা	এসময় সকল প্রাণিদের আঁশ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পিকআপ ভ্যানের সাহায্যে গ্রাহকদের নিকট তরল দুধ পৌঁছে দিতে হবে এবং খালি পাত্র সংগ্রহ করতে হবে।
সন্ধ্যা ৬.০০ টা	খামারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
সন্ধ্যা ৭.০০- ভোর ৩.০০ টা	নৈশ প্রহরী দায়িত্ব পালন করবে।

ম্যানেজার রাত্রিবেলা খামার ত্যাগ করার প্রাক্কালে যেসব গাভী বাচ্চা প্রসব করতে পারে তাদের সংখ্যা অবশ্যই নৈশ প্রহরীকে অবগত করে যেতে হবে। সেই সাথে ক্যাশে রক্ষিত টাকার পরিমাণও জানিয়ে যেতে হবে। ম্যানেজারের যদি রাতে খামার পরিদর্শন করার ইচ্ছা থাকে তবে তা নৈশ প্রহরীকে বলে যেতে হবে যাতে করে পূর্ব অনুমতিসাপেক্ষে ম্যানেজার অনায়াসে খামারে প্রবেশ করতে পারে।

২.৪ গরু মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপন

২.৪.১ প্যাকেজ প্রযুক্তি হিসেবে গরু মোটাতাজাকরণ

অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য অল্প দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যহীন কৃশকায় গরুকে হৃষ্টপুষ্ট গরুতে রুপান্তরিত করাকে ‘গরু মোটাতাজাকরণ’ বলা হয়। বাংলাদেশের দেশী জাতের গরু উন্নত সংকর জাতের গরু অপেক্ষা আকারে ছোট। তাই দেশী জাতের গরু অপেক্ষা সংকর জাতের গরু থেকে অধিক মাংস পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশের অধিকাংশ গবাদিপশুর হাড্ডিসার অবস্থা। সুতরাং ‘গরু মোটাতাজাকরণ’ পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের গরু হাড্ডিসার হওয়ার কারণ -

- গো-খাদ্যের অভাব। এদেশে পশুর চারণভূমি না থাকায় খাদ্যাভাবে পশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।
- এদেশের পশু বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত। বিশেষ করে আমাদের দেশে অধিকাংশ গবাদি পশু কৃমি রোগে আক্রান্ত। ফলে পশু যতটুকু খাদ্য খেতে পাচ্ছে তার একটি বিরাট অংশ কৃমি খেয়ে ফেলছে। তাই এদেশের অধিকাংশ পশুর হাড্ডিসার অবস্থা।
- পশু মালিকের বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশু পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব।

গরু মোটাতাজাকরনের উদ্দেশ্যঃ

- স্বাস্থ্যহীন কৃশকায় গরুকে হৃষ্টপুষ্ট গরুতে রুপান্তরিত করা।
- স্বল্প মূলধন খাটিয়ে অধিক লাভসহ মূলধন ফেরত পাওয়া।
- দেশের বেকার জনগোষ্ঠি ও যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- অল্প সময়ে গরুকে মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বাজারজাত করা।
- গরু মোটাতাজা করে স্বল্প সময়ে দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করা।

গরু মোটাতাজাকরণের সঠিক নিয়মাবলী

পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং এর ফলে গরুর ওজন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু অনেকেই গরুর ওজন দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের ফিড এডিটিভস, হরমোন, স্টেরয়েডস্, এন্টিবায়োটিক ও মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ ব্যবহার করে থাকেন (Chowdhury et al. 2009, Islam et al. 2012)। বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফিড এডিটিভস, হরমোন, স্টেরয়েডস্, এন্টিবায়োটিক, মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ ইত্যাদি সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ভাল ফলাফল পাওয়া গেলেও লক্ষ্য করা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খামারিরা বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই নিজের পছন্দমত এসমস্ত ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি ঔষধ বা ইনজেকশন প্রদানের মাত্রাও নিজেরাই ঠিক করে থাকেন। ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি হরমোন, স্টেরয়েডস্ ইত্যাদি উৎপাদন করেন নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা বা রোগের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু খামারিরা এর ক্ষতিকর দিকসমূহ না জেনে বা বিবেচনা না করেই গরু মোটাতাজাকরণের জন্য তা ব্যবহার করে থাকেন। এজাতীয় ঔষধ সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন উপকার পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি যথেচ্ছা ব্যবহার করলে এর প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই ক্ষতিকর প্রভাব শুধু যে গরুতেই পড়ে তা নয় বরং মানুষ বা জনস্বাস্থ্যের উপরও পড়ে। বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে স্টেরয়েড ব্যবহার না করে সাধারণত ৩-৪ মাসে গরু মোটাতাজা করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে গরু বিক্রি করার পূর্বের ছয় সপ্তাহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে হয়। কারণ এ সময়ে যে কোন ধরণের অব্যবস্থাপনা গরুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।

গরু নির্বাচন: মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে পশু নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। মোটাতাজাকরণের জন্য নির্বাচিত পশু সুস্থ ও সবল হতে হয়। যদিও কোরবানীর ঈদে দেশী গরুর কদর বেশি থাকে। তারপরও কোরবানীতে বড় ও সুন্দর গরুর চাহিদা থাকায় গরু মোটাতাজাকরণ খামারিরা বেশি গুরুত্ব দেন উন্নত জাতের গরুর দিকে। আমাদের দেশে মাংসের জন্য গরুর বিশেষ কোন জাত বা বীফ ব্রীড ছিল না। তবে বর্তমান সরকার বিদেশ থেকে মাংসল জাতের ব্রাহমান জাতের ষাঁড়ের বীজ আমাদানি করে কয়েকটি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন করিয়ে সংকর জাতের মাংসল গরু তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যায় কয়েক বছরের মধ্যে মাংসল জাতের গরু পাওয়া যাবে। তবে বীফ ব্রীড না থাকলেও এদেশের রেড সিন্ধি, শাহিওয়াল ও ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের এঁড়ে বাছুর মোটাতাজাকরণের জন্য বেশ ভাল। গরু নির্বাচনে এর বয়সও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে ২.৫-৩ বছরের গরু নির্বাচন করা ভাল। এঁড়ে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধির হার বকনা বাছুরের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। তবে বাছুরের বুক চওড়া ও ভরাট, পেট চ্যাপ্টা ও বুকের সাথে সমান্তরাল, মাথা ছোট ও কপাল প্রশস্থ, চোখ উজ্জ্বল ও ভেজা ভেজা, পা খাটো প্রকৃতির ও হাড়ের জোড়াগুলো স্ফীত, পাঁজর প্রশস্ত, বিস্তৃত এবং

শিরদাঁড়া সোজা হলে ভাল হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল- পশু ত্রুটিমুক্ত কিনা। তার জন্য পশুর মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে তার শিং ভাঙ্গা কিনা, কান কাটা কিনা, চামড়ায় কোথাও ক্ষত আছে কিনা, পা ভাঙ্গা কিনা, লেজ ভাল কিনা, ইত্যাদি নিখুঁতভাবে দেখে মোটাতাজা করার জন্য পশু নির্বাচন করতে হয়।

পশুকে কৃমিমুক্তকরণ ও টিকা প্রয়োগ: বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং প্রচলিত লালন পালন পদ্ধতির কারণে প্রায় ১০০% গরু কোন না কোন কৃমিতে আক্রান্ত। তাই মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই পশুকে কৃমিমুক্ত করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুর মালিকগণ গরু ক্রয় করার পরই নিজেই পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অথবা নিকটস্থ পশুপাখির ঔষধ বিক্রয়কারী দোকান বা ভেটেরিনারি চিকিৎসালয় থেকে কৃমিনাশক ঔষধ সংগ্রহ করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা ভাল। কৃমিকে ধ্বংস করতে সাধারণত ব্রড স্পেকট্রাম গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করতে হয় যা পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ও গোল কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে। বিভিন্ন কোম্পানি ভিন্ন ভিন্ন বাণিজ্যিক নামে এসব ব্রড স্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক ঔষধ বাজারজাত করে থাকে। কৃমিনাশের জন্য ইনজেকশনও রয়েছে যা বিভিন্ন কোম্পানী বাজারজাত করে থাকে। এসব কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করার পর পশুর খাদ্যের প্রতি রুচি বেড়ে যায় এবং এর জন্য যা খাবার খায় তাই শরীর গঠনে ও ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে ও পশুর স্বাস্থ্য ভাল হতে থাকে। এছাড়া গরুকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এনথ্রাক্স বা তড়কা এবং ক্ষুরা রোগের হাত হতে রক্ষার জন্য টিকা প্রদান করতে হয়। তবে অনেক এলাকায় গলাফোলা ও বাদলা রোগের টিকাও প্রদান করতে হয়।

সুষম খাদ্য সরবরাহ: মোটাতাজাকরণে গরুকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করার কোন বিকল্প নেই। তাই গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সুবিধাজনক সময় হচ্ছে বর্ষা এবং শরৎকাল যখন প্রচুর পরিমাণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত ঘাস ছাড়াও গরুকে পর্যাপ্ত দানাদার খাবার দিতে হয় এবং সাথে খড়কে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সরবরাহ করতে হয়। এক্ষেত্রে খড়ের সাথে চিটাগুড় ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করলে খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়। গবাদিপশুর এসব খাবারের সাথে পরিমাণমত ইউরিয়া মিশিয়ে খাওয়ালে খাদ্যের পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, যে সকল পশু জাবর কাটে শুধুমাত্র তারাই ইউরিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। ইউরিয়া পশুর পেটের ভেতর বিশ্লেষিত হয়ে নাইট্রোজেন মুক্ত করে যা পরে মাইক্রোবিয়াল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নাইট্রোজেন। ইউরিয়ায় শতকরা ৪৬.৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তাই ইউরিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অধিক পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, যার ফলে গরু দ্রুত মোটাতাজা হয়। এভাবে মোটাতাজা করা গরুর মাংস স্বাস্থ্যসম্মত। পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহের পাশাপাশি পশুর মালিকগণ ঔষধ প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁরা স্থানীয় পশুপাখির ঔষধ বিক্রয়ের দোকানদার, মাঠকর্মী, ভেটেরিনারি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরন করে থাকেন। সাধারণত মোটাতাজাকরণে যেসব ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা হল-

- ফিড এডিটিভস যেমন প্রোবায়োটিকস, এনজাইম, এমাইনো এসিড, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স, ইউরিয়া ইত্যাদি। সাধারণত গরুকে যেসব খাবার দেয়া হয় তাতে অনেক ভিটামিন ও মিনারেল থাকে। তারপরও অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন ব্যবহার করা যায়। এর ফলে ভিটামিন ও খনিজ লবণের ঘাটতি মিটিয়ে পশুর খাবার শরীরে কাজে লাগে এবং পশম খুব চকচকে হয়। তাছাড়া ক্যালসিয়াম জাতীয় ঔষধে পশু খুব শক্তিশালী হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গরুকে ক্যালসিয়াম ইনজেকশন প্রয়োগের পরিবর্তে ওরাল ক্যালসিয়ামও খাওয়ানো হয়। গরু মোটাতাজাকরণে এসব ফিড এডিটিভস ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ।
- মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ যেমন বিউটাফসফেন, টলডিমফস ইত্যাদি। অতি দ্রুত গরুর শরীরে মাংস বৃদ্ধির জন্য ভিটামিনের পাশাপাশি টনিক জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। যদিও এসব ঔষধের মূল্য একটু বেশি তবে কার্যকারিতা অত্যন্ত চমৎকার। উল্লিখিত ঔষধ প্রয়োগে পশুর ওজন দ্রুত বাড়ে, পশু দেখতে চক্চকে ও রোগমুক্ত থাকে। এসব ঔষধ ব্যবহারের ফলে গরুর মাংসের গুণগত মানের কোন ক্ষতি হয় না বা মাংস খাওয়ার ফলে মানুষের দেহে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না। বরং সুস্থ পশুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় অধিক নিরাপদ।

- এন্টিবায়োটিক: মনেনসিন, এম্পিসিলিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, ডাইহাইড্রোস্ট্রেপটোমাইসিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি।
- স্টেরয়েড হরমোন যেমন ডেক্সামেথাসন, ডাইইথাইলস্টিলব্রেল, হেক্সট্রল, জেরানল ইত্যাদি। আমরা জানি স্টেরয়েড এক ধরণের জরুরি জীবন রক্ষাকারী ঔষধ। গরু মোটাতাজাকরণে এর ব্যবহার একটি বড় সমস্যা। আমার জানা মতে খুব কম খামারিই এ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। তবে সমস্যা তৈরি করছেন এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী, যাঁরা গরুকে দ্রুত মোটাতাজাকরণের জন্য এই সকল স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। দ্রুত গরুকে মোটাতাজাকরণের জন্য যেসব বাণিজ্যিক স্টেরয়েড ইনজেকশন ব্যবহার করা হয় তা হল ডেক্সাভেট, ডেক্সাকট, ডেকাসন, ওরাডেক্স, প্রিক্সোনল-এস, প্রেডনিভেট, প্রেডনিসলন ইত্যাদি। আবার পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে ডেক্সামেথাজন বা ডেকাসন বা ওরাডেক্সন স্টেরয়েড জাতীয় সস্তা কতকগুলো ট্যাবলেট আসে। গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড হরমোনের ব্যবহার সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

২.৪.২ পঞ্চাশটি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে আয়-ব্যয়ের নমুনা

১। প্রকল্পের নাম: ভান্ডারী ফ্যাটেনিং ফার্ম স্থাপন প্রকল্প

২। উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা: তৌফিকুর রহমান; পিতা- মৃত মতিয়ার রহমান; গ্রাম- কাটনারপাড়া; উপজেলা- বগুড়া সদর, জেলা- বগুড়া।

৩। প্রকল্পের অবস্থান: বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন কাটনারপড়াস্থ ভান্ডারী সিটি সংলগ্ন।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) আত্মকর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
(খ) মাংস উৎপাদন ও পুষ্টি উন্নয়ন।
(গ) বায়োগ্যাস উৎপাদন ও পরিবেশ উন্নয়ন।
(ঘ) জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান সৃষ্টি।

৫। প্রকল্পের মালিকানা: প্রকল্পভূক্ত জমি নিজস্ব মালিকানাধীন।

৬। অবকাঠামোগত অবস্থান: প্রস্তাবিত প্রকল্পটির জমি বগুড়া শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। জায়গাটি উঁচু, বন্যামুক্ত, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ফার্মে নিয়েজিত ব্যক্তি ছাড়াও ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজড্ প্রতিষ্ঠানে কর্মমুখী অনেক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: অবকাঠামো নির্মাণ (১ বছর) পর হতে ৫ বছর (ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত)।

৮। প্রকল্পের অর্থায়ন ও প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ: প্রকল্পভূক্ত জমি উদ্যেক্তার নিজস্ব সম্পত্তি। প্রয়োজনীয় মূলধন (স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় ও চলতি/আবর্তক ব্যয়) ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা ব্যাংক হতে ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে উক্ত জমিতে বিনিয়োগ করা হবে অর্থাৎ উদ্যোক্তার নিজস্ব এক একর জমির উপর প্রস্তাবিত গরু মোটাতাজাকরণ খামার স্থাপন করা হবে। উদ্যোক্তা নিজে খামারের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯। স্থায়ী খরচ:

(ক) গরুর ঘর নির্মাণ: প্রতি বর্গফুট ১৭৫ টাকা হিসেবে ২,০০০ বর্গফুট (৪০ বর্গফুট হিসেবে ৫০টি গরুর জন্য) আকারের ১টি পাকা মেঝে টিনের চালা ঘরের মূল্য = ৩,৫০,০০০ টাকা।

(খ) অফিস কক্ষ কাম গুদাম ঘর নির্মাণ: প্রতি বর্গফুট ১৫০ টাকা হিসেবে ৬০০ বর্গফুটের ১টি পাকা মেঝে টিনশেড ঘরের মোট নির্মাণ খরচ = ৯০,০০০ টাকা।

(গ) খামারের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য স্থাপনা বাবদ সর্বমোট খরচ = ২,৫০,০০০ টাকা।

- যন্ত্রপাতি (খাবার পাত্র, পানির পাত্র, বালতি, কোদাল ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ মোট খরচ = ২৫,০০০ টাকা।
- আসবাব পত্র (চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট, র‍্যাক, ইত্যাদি) ক্রয় বাবদ মোট খরচ = ১,০০,০০০ টাকা।

- পাম্প হাউজসহ পানির পাম্প স্থাপন বাবদ মোট খরচ = ৫০,০০০ টাকা।
- বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ বাবদ মোট খরচ = ২৫,০০০ টাকা।
- গোবর সংরক্ষণাগার কাম বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ বাবদ মোট খরচ = ৬০,০০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট স্থায়ী খরচ = (গরুর ঘর নির্মাণ ৩,৫০,০০০ টাকা + অফিস কক্ষ কাম গুদাম ঘর নির্মাণ ৯০,০০০ টাকা + যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য স্থাপনা ২,৫০,০০০ টাকা) = ৭,০০,০০০ টাকা।

১০। আবর্তক বা চলতি খরচ (৪ মাস চক্র):
(ক) গরু ক্রয়: প্রতিটি ৩০-৩৬ মাসের গরু ৩০,০০০ টাকা হিসেবে ৫০টি গরুর ক্রয় মূল্য = ১৫,০০,০০০ টাকা।
(খ) দানাদার খাদ্য: প্রতিটি গরুর জন্য দৈনিক ২ কেজি দানাদার খাবার ধরে ৫০ গরুর জন্য গড়ে ১০০ দিনের খাদ্য বাবদ মোট খরচ (মিশ্রিত প্রতি কেজি ২৫ টাকা ধরে) = ২,৫০,০০০ টাকা।
(গ) শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (খড়): প্রতিটি গরুর জন্য দৈনিক ১০ কেজি শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য ধরে ৫০টি গরুর জন্য গড়ে ১০০ দিনের খাদ্য বাবদ মোট খরচ (প্রতি কেজি ১.৫০ টাকা ধরে) = ৭৫,০০০ টাকা।
(ঘ) কাঁচা ঘাস: প্রতিটি গরুর জন্য দৈনিক ১০ কেজি কাঁচা ঘাস জাতীয় খাবার ধরে ৫০টি গরুর জন্য গড়ে ১০০ দিনের খাদ্য বাবদ মোট খরচ (প্রতি কেজি ০.৫০ টাকা উৎপাদন খরচ ধরে) = ২৫,০০০ টাকা।
(ঙ) জনশক্তি বাবদ খরচ: সর্বমোট ২,৬০,০০০ টাকা।

- একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের মাসিক ৩০,০০০ টাকা (পার্ট টাইম) হিসেবে ৪ মাসে ব্যয় = ৬০,০০০ টাকা।
- মোট ১০ জন শ্রমিকের জনপ্রতি মাসিক ৫,০০০ টাকা হিসেবে ৪ মাসে ব্যয় = ২,০০,০০০ টাকা।

(চ) বিদ্যুৎ খরচ: বায়োগ্যাস ব্যবহারের পরও প্রতি ৪ মাসে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ = ২০,০০০ টাকা।
(ছ) রোগ ব্যবস্থাপনা: রোগ প্রতিষেধক, পরিবহন, চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও অন্যান্য মোট খরচ (প্রতি ৪ মাসে) ১,০০,০০০ টাকা।
(জ) বিবিধ খরচ: উপরোল্লিখিত খরচ বাদে প্রতি ৪ মাসে বিবিধ ব্যয় = ৭০,০০০ টাকা।

অতএব, আবর্তক বা চলতি খরচ (৪ মাস চক্র) = (গরু ক্রয় ১৫,০০,০০০ টাকা + দানাদার খাদ্য ২,৫০,০০০ টাকা + শুষ্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য ৭৫,০০০ টাকা + কাঁচা ঘাস ২৫,০০০ টাকা + জনশক্তি বাবদ খরচ ২,৬০,০০০ টাকা + বিদ্যুৎ খরচ ২০,০০০ টাকা + রোগ ব্যবস্থাপনা ১,০০,০০০ টাকা + বিবিধ খরচ ৫০,০০০ টাকা) = সর্বমোট ২৩,০০,০০০ টাকা।

১১। খামারের উৎপাদন ও আয় (৪ মাস চক্র):
(ক) প্রতিটি মোটাতাজাকৃত গরু ৫০,০০০/= দরে বিক্রি করে ৫০টি গরু হতে মোট আয় = ২৫,০০,০০০ টাকা।
(খ) বায়োগ্যাস রেসিডিউ জৈব সার হিসেবে বিক্রি করে আয় = ৫০,০০০ টাকা।
অতএব, সর্বমোট আবর্তক আয় = (২৫,০০,০০০ + ৫০,০০০) = ২৫,৫০,০০০ টাকা।

১২। মুনাফা বা নীট আয়:
অবকাঠামো নির্মণে স্থায়ীভাবে ৮,০০,০০০ টাকা ব্যয় করার পরে প্রতি ৪ মাসে ৫০০টি গরু মোটাতাজা করতে মোট (আবর্তক ব্যয়/চলতি খরচ) ২৩,০০,০০০ টাকা ব্যয় করে খামারে উৎপাদন ও আয় হবে ২৫,৫০,০০০ টাকা।
অতএব, প্রতি ৪ মাস চক্রে মুনাফা বা নীট আয় = ৩০,০০,০০০-২৫,৫০,০০০ = ৪,৫০,০০০ টাকা।
অতএব, সর্বমোট বার্ষিক মুনাফা বা নীট আয় বৎসরে ৩ ব্যাচ ধরে (৪,৫০,০০০×৩) = ১৩,৫০,০০০ টাকা।

১৩। ব্যাংক ঋণ ও সুদ পরিশোধের খতিয়ান:

সারণি ২.৭ঃ ব্যাংক ঋণ ও সুদ পরিশোধের খতিয়ান।

বছর	ঋণের পরিমান	বার্ষিক সুদ	বার্ষিক নীট আয়	বার্ষিক পরিশোধ			মালিকের বার্ষিক উদ্বৃত্ত নীট আয়
				মূল	সুদ	মোট	
প্রথম	৩০,০০,০০০	৩,০০,০০০	১৩,৫০,০০০	৬,০০,০০০	৩,০০,০০০	৯,০০,০০০	৩,৫০,০০০
দ্বিতীয়	২৪,০০,০০০	২,৪০,০০০	১৩,৫০,০০০	৬,০০,০০০	২,৪০,০০০	৮,৪০,০০০	৫,১০,০০০
তৃতীয়	১৮,০০,০০০	১,৮০,০০০	১৩,৫০,০০০	৬,০০,০০০	১,৮০,০০০	৭,৮০,০০০	৫,৭০,০০০
চতুর্থ	১২,০০,০০০	১,২০,০০০	১৩,৫০,০০০	৬,০০,০০০	১,২০,০০০	৭,২০,০০০	৬,৩০,০০০
পঞ্চম	৬,০০,০০০	৬০,০০০	১৩,৫০,০০০	৬,০০,০০০	৬০,০০০	৬,৬০,০০০	৬,৯০,০০০
ষষ্ঠ	--	--	১৩,৫০,০০০	--	--	--	১৩,৫০,০০০

এখানে সুদের হার ১০% ধরা হয়েছে।

১৪। মতামত: উদ্যোক্তা ৫ বছরে প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের পর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প চালু রাখবেন এবং আত্মকর্মস্থানের মাধ্যমে বার্ষিক ১৩,৫০,০০০ টাকা (মাসিক হিসেবে ১,১২,৫০০ টাকা) নীট আয় করে স্বাবলম্বী হবেন। এখানে উলেখ্য যে, গবাদিপশুর মৃত্যুহার ধরা হয়নি এবং খামারের প্রয়োজনীয় ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্থিতাস্থায় ধরা হয়েছে। [বিশেষ দ্রষ্টব্য: খামারে আয়-ব্যয়ের এই হিসাব ২০১০ সালের গড় বাজার দর অনুযায়ী প্রণীত; স্থান ও কাল ভেদে এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তনশীল।]

২.৪.৩ গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গ এবং আমাদের করণীয়

গরু মোটাতাজাকরণ বলতে যা বুঝায় তা হল বাড়ন্ত এঁড়ে গরুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩-৪ মাস) উন্নত ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষ ধরণের খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে ওই গরুর শরীরে অধিক পরিমাণ মাংস ও চর্বি বৃদ্ধি করে অধিক লাভে বাজারে বিক্রয় করা। গরু মোটাতাজাকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং প্রাণিজ কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অধিক মাংস উৎপাদনের জন্য বিশ্বের সকল দেশেই বীফ ফ্যাটেনিং করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে গরু মোটাতাজাকরণ একটি জনপ্রিয় ও লাভজনক প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে মূলত কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে এই কর্মযজ্ঞটি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কোরবানীর ঈদের ৩-৪ মাস আগে থেকে অর্থাৎ রোজার মাস থেকেই শুরু হয় গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া। সারাদেশে অসংখ্য খামারিরা অধিক লাভের আশায় এই সময়ে তাদের কোরবানী উপযোগী গরুগুলোকে মাংসল আর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মোটাতাজা করছেন। সাধারণত সারা দেশের ব্যাপারীরা হাজার হাজার কোরবানীর গরু নিয়ে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য ঈদের কয়েকদিন আগে থেকেই ঢাকাসহ অন্যান্য শহরমুখী হন। ফলে পশুর হাটগুলো বেশ জমে ওঠে। তখন প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকায় কোরবানীর গরু মোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টগুলোর মুল বক্তব্যে ঘুরেফিরে আসে স্টেরয়েড হরমোনের অপব্যবহার। বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে ডেক্সামেথাসন নামের স্টেরয়েডের কথাই শোনা যায় বেশি। সেই সূত্রে পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে স্টেরয়েড যেন একটি আতঙ্ক, একটি ভীতির নাম। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবার পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে জনমনে যেন কোন ধরণের আশঙ্কার সৃষ্টি না হয় সেজন্য কোরবানীর গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ ও স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় বিষয়াদি এই লেখনীতে তুলে ধরা হল। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায় প্রতি বছর কোরবানী উপলক্ষে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা বাণিজ্য থাকে যার সিংহ ভাগই দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর ঘাম ঝরানো শ্রমের ফসল। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা জরুরি যাতে কোন মহল অহেতুক আতংক ছড়িয়ে কোনরূপ ফায়দা লুটতে না পারে।

স্টেরয়েড কি?

অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে স্টেরয়েড এক ধরণের হরমোন যা গবাদিপশু সহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণিতে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন জটিল শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। রাসায়নিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী বহু ধরণের স্টেরয়েড হরমোন আছে। তবে মোটা দাগে স্টেরয়েড হরমোনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর একটি হল এনাবলিক-এন্ড্রোজেনিক স্টেরয়েড (এএএস) হরমোন যা জটিল চিকিৎসা কাজে ব্যবহার হয়। এদের অপব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেসন (এফডিএ) ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক এ ধরণের স্টেরয়েড হরমোন ফুড এনিমেল বা দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণিতে ব্যবহার সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ। তবে এএএস গ্রুপেরই একটি সিনথেটিক হরমোন হল 'ট্রেনবোলন' যা গরু মোটাতাজাকরণে ব্যবহৃত হয়। এটি শুধুমাত্র ভেটেরিনারি চিকিৎসকের প্রেশক্রিপসান ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা হয়। গরু জবাইয়ের সর্বোচ্চ দুই মাস পূর্বে সাধারণত ইনজেকশন বা কানের চামড়ার নিচে ইমপ্ল্যান্ট আকারে এটি ব্যবহার করা হয়। মুখে খাওয়ালে এর কোন কার্যকারিতা নেই বরং লিভার ড্যামেজ হয়ে প্রাণির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ট্রেনবোলন মূলত শরীরে নাইট্রোজেনের সংশ্লেষ ঘটিয়ে প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে মাংসপেশী বৃদ্ধি করে। এটি একটি জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি বিধায় বাংলাদেশ বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গরু মোটাতাজা করার জন্য ট্রেনবলন ব্যবহার হয় না। তবে এএএস হরমোন দিয়ে কখনও যাতে গরু মোটাতাজা করা না হয় সে ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সঠিক তথ্য বিশ্লেষণ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন এখনই।

গবাদিপশু এবং আমাদের শরীরে আরেক ধরণের স্টেরয়েড হরমোন তৈরি হয় যা করটিকোস্টেরয়েড নামে পরিচিত। করটিকোস্টেরয়েড কিডনির ওপরে অবস্থিত এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে তৈরি হয় ও সরাসরি রক্তে মিশে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজ সম্পাদন করে। এছাড়াও এটি স্ট্রেস রেসপন্স বা ধকল সামলানো যেমন ধস্তাধস্তি জনিত ধকল বা একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহন জনিত ধকল প্রতিরোধ, ব্যথানাশ ও পানিশূন্যতা রোধ, অনাহার জনিত বিষক্রিয়া যেমন কিটোসিসের চিকিৎসা ও ক্যান্সারের সহচিকিৎসা ছাড়াও আরো বহুবিধ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। করটিকোস্টেরয়েডকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাইফ সেভিং হরমোনও বলা হয়। গরু মোটাতাজাকরণে বহুল অলোচিত ডেক্সামেথাসন হরমোন কোরটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের একটি সিনথেটিক হরমোন। এটি প্রাকৃতিক হরমোনের চেয়ে প্রায় বিশগুণ শক্তিশালী বিধায় স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার বেশ কার্যকরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এটি অতীব জরুরি ঔষধ হিসেবে তালিকাভুক্ত। প্রাণী ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় এটি নিরাপদ বিধায় ফুড এনিমেল অর্থাৎ দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী প্রাণির চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। করটিকোস্টেরয়েড গ্রুপের হরমোনের হাফ লাইফ বা অর্ধায়ু অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, করটিসল এক ধরণের করটিকোস্টেরয়েড যার অর্ধায়ু মাত্র ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট। অন্যদিকে ডেক্সামেথাসনের অর্ধায়ু প্রায় ৩৬ ঘণ্টা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ'র নির্দেশনা অনুযায়ী ডেক্সামেথাসনের উইথড্রয়াল পিরিয়ড শূন্য। অর্থাৎ কোন প্রাণিতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার করলে ওই প্রাণির মাংস বা দুধ খাওয়ার জন্য কোন অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গরু জবাইয়ের পূর্ব মুহূর্তেও ধস্তাধস্তির কারণে এড্রেনাল গ্ল্যান্ড হতে প্রচুর পরিমাণে করটিকোস্টেরয়েড নির্গত হয়। নির্গত এসব করটিকোস্টেরয়েড সাথে সাথে রক্তে মিশে যায়। যেহেতু এটি শরীরে কোথাও জমা থাকেনা এবং আমরা রক্ত খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিনা তাই এতে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। তবে মোটাতাজাকরণ কালীন সময়ে মূলত যেসব গরু দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় সেসব গরুতে কিছু মেডিকেল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন প্রাণিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য উভয় বিচারে জবাইপূর্ব ঐসব গরুতে ডেক্সামেথাসন ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে- যেমন পরিবহনকালীন সময়ে পানিশূন্যতা রোধ, পরিবহনজনিত ব্যথা ও ধকল নিরাময়, অনাহারের পর অতিরিক্ত দানাদার খাদ্যের দ্বারা সৃষ্ট বিষক্রিয়া হতে কোরবানীর গরুকে মুক্ত রাখা অত্যন্ত জরুরি। ডেক্সামেথাসনের এই ব্যবহার মোটাতাজাকরণ সম্পর্কিত নয় এটি চিকিৎসা সম্পর্কিত। তবে পরিবহনকালীন যে কোন অবস্থারই সৃষ্টি হোক না কেন, ডেক্সামেথাসন একটি প্রেসক্রিপসন ড্রাগ এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ব্যতীত এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করা উচিত নয়। এর অপব্যবহার বহুবিধ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ ও সতর্কতা প্রয়োজন।

স্টেরয়েড হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে চিকিৎসার জন্য স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার দোষের নয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের ফার্মেসিগুলোতে গিয়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই যে কেউ এসব স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ কিনতে পারেন। ফলে অবৈধ উপায়েও স্টেরয়েড ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে শতকরা কত ভাগ গরুতে এর ব্যবহার হচ্ছে তার কোন পরিসংখ্যান জানা নেই। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষকরাও অধিক লাভের আশায় গরু মোটাতাজা করতে অনেক উচ্চমাত্রায় দীর্ঘদিন স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহার করছেন। মানুষের বেলায় যেমন দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে দীর্ঘমেয়াদি পারিপার্শ্বিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তেমনি পশুর ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা থেকেই যায়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে গরুর শরীরে চর্বি জমে। ফলে গরুর দেহের আকার বেড়ে যায় কিন্তু তুলনামূলক ওজন হ্রাস পায়। উক্ত গরুর স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম দুর্বল হয়ে যায় এবং উক্ত পশুকে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে অসুস্থ মনে হয়। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে পশুর অতিরিক্ত তৃষ্ণা পায় এবং প্রশ্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে কোষে পানির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দৃশ্যত গরুকে মোটা দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সকল গরুর মাংসের পরিমাণ বেশি হলেও তার গুণগতমান অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে স্টেরয়েড হরমোনের কারণে গরু ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগতে থাকে। দীর্ঘদিন উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড ঔষধ ব্যবহার করা হলে তা শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত হবার আগেই জবাই করা হলে মাংসের মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে চলে যায়। এই জাতীয় গরুর মাংস যদি মানুষ নিয়মিত গ্রহণ করে, তাহলে মানুষের শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধমনী চিকন হয়ে হৃদরোগ এমনকি ব্রেন স্ট্রোকও হতে পারে। এ সকল হরমোন এতটাই মারাত্মক যে মাংস রান্না করার পরও তা নষ্ট হয় না। ফলে তা মানুষের শরীরে গিয়ে অনাকাঙ্খিত বৃদ্ধি, কিডনি ও লিভারসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব, মেয়েদের অল্প সময়ে পরিপক্কতা এবং শিশুদের অল্প বয়সে মুটিয়ে যাওয়া ইত্যাদির অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এ সকল স্টেরয়েড হরমোন। স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা পশুর মাংস হয়তো দুই-এক দিন খেলে কিছু হবে না। কিন্তু নিয়মিত খেলে, কিংবা অভ্যাসে পরিণত হলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমরা লক্ষ্য করি, কোরবানির ঈদে বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ে। বেশি বেশি মাংস খেয়ে পেটের পীড়াসহ হৃদরোগে আক্রান্ত এমনকি স্ট্রোক হয়ে প্রচুর রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে ঈদের সময় হাসপাতালে অধিক রোগী ভর্তির সাথে কোরবানীর পশুতে স্টেরয়েড হরমোন ব্যবহারের সম্পর্ক নেই। এটা মূলত উক্ত সময়ে অধিক পরিমান মাংস গ্রহণের কারণে হয়ে থাকে। যাইহোক মাংসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ স্টেরয়েড ঔষধ মানুষের দেহে আসলে যে সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে সেগুলো হল ক) যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, খ) রক্তে কোলেস্টরল বৃদ্ধি, গ) ত্বকে ব্রণ জাতীয় ক্ষত সৃষ্টি, ঘ) টাক পড়ে যাওয়া, ঙ) রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব, চ) মহিলাদের দেহে পুরুষালী লক্ষণ প্রকাশ, ছ) দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, জ) পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির স্ফীতি, ঝ) রক্ত চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, ঞ) বৃক্কের সমস্যা, ট) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, ঠ) পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়া এবং ড) দেহের হরমোনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া।

আইনগত দিক

বাংলাদেশের বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে গবাদিপশুতে স্টেরয়েড প্রয়োগের সুযোগ নেই। 'মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০' (২০১০ সালের ২ নং আইন) ১৪ নং ধারা অনুযায়ী পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি এই বিধান লঙ্ঘন করেন তবে উক্ত আইনের ২০ নং ধারা অনুযায়ী সেই ব্যক্তি অনুরুপ অপরাধের জন্য এক বছরের কারাদন্ড, বা অনূর্ধ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। তাছাড়া 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) এর ১৪ নং ধারার বিধি মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী পশু পরিবহন ও বিপণন করতে হবে। উক্ত আইনের ২১(গ) নং ধারার বিধান মোতাবেক কারকাস, কারকাসের অংশ, মাংস প্রভৃতিতে জীবাণু, ভারী ধাতব বস্তু, বিষাক্ত বস্তু, হরমোন, প্রিজারভেটিভ

ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা থাকতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন প্রথমবার লঙ্ঘন করেন তবে তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদন্ড অথবা অনুর্ধ্ব ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। উপর্যুক্ত আইনদ্বয় ছাড়াও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) প্রণয়ন করেছে। এই আইনের ৩০ নং ধারা মোতাবেক নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমান কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশু বা মৎস্য-রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন, এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ-পত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় দন্ডনীয় অপরাধ। প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দন্ড হল অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

আমাদের করণীয়

গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে সীমিত সময়ে অধিক মাংস উৎপাদন বর্তমানে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কিন্তু অনেকেই গরুর দ্রুত বৃদ্ধি করার জন্য পরিমিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের ফিড এডিটিভস, মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ ও স্টেরয়েডস্ ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফিড এডিটিভস এবং মেটাবলিক স্টিমুলেন্টস্ সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ভাল ফলাফল পাওয়া গেলেও লক্ষ্য করা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খামারিরা বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই নিজের পছন্দমত এসমস্ত ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি ঔষধ প্রদানের মাত্রাও নিজেরাই ঠিক করে থাকেন। নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা বা রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি স্টেরয়েডস্ উৎপাদন করেন। কিন্তু খামারিরা এর ক্ষতিকর দিকসমূহ না জেনে বা বিবেচনা না করেই গরু মোটাতাজাকরণের জন্য তা ব্যবহার করে থাকেন। এজাতীয় ঔষধ সঠিক মাত্রায় সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন উপকার পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি যথেচ্ছা ব্যবহার করলে এর প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই ক্ষতিকর প্রভাব শুধু যে গরুতেই পড়ে তা নয় বরং মানুষ বা জনস্বাস্থ্যের উপরও পড়ে। তাছাড়া বাংলাদেশে কতিপয় সমস্যার কারণে বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ পেশাটি শিল্প হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। এসকল বিষয়ে আমাদের করণীয় বিষয়াদি নিম্নে আলোচনা করা হল।

- বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন তার চাহিদা মেটানোর জন্য খামারিদেরকে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীরা গরু মোটাতাজাকরণের কলা-কৌশল সম্প্রসারিত করছেন। তবে মোটাতাজাকরণের জন্য ভাল জাতের গরুর অভাব রয়েছে। যদিও সরকার খুব সীমিত পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে আমেরিকা থেকে ব্রাহমান জাতের ষাঁড়ের বীজ আমদানি করে দেশীয় জাতের গাভীকে প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাত তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে, কিন্তু সে ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া পশুখাদ্য, ঔষধ ও প্রতিষেধকের অত্যধিক মূল্য এই উদীয়মান শিল্পকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই কৃষি খাতের ন্যায় এ শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে পশুখাদ্য, ঔষধ ও ভ্যাকসিনের ওপর ভর্তুকি দিতে হবে। দেশে চাহিদা থাকায় প্রতিনিয়ত চোরাচালান পথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমার থেকে যে গরু আসছে তা অনেক ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত থাকায় তা দেশের প্রাণিসম্পদকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করছে। ফলে দেশীয় মোটাতাজাকরণ প্রকল্প ধ্বংস হতে চলেছে। সরকার যদি বৈধভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পশু আমদানিসহ 'বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫' (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) প্রয়োগ করে তবে এ সমস্যার সমাধান হবে।

- ভেজাল খাবারে দেশ ভরে গেছে এ কথা যেমন সত্য তেমনি খাঁটি খাবার যে নেই তাও অসত্য নয়। বর্তমানে বিষাক্ত ও খাঁটি দু'ই মিলিয়ে চলছে আমাদের দেশ। বিপাকে পড়তে হচ্ছে উৎপাদনকারী ও ক্রেতাদের। মাঝখানে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামত পকেট ভরে নিচ্ছে। বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার ও খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী নীতিমালা ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় কোনটি ভেজাল আর কোনটি খাঁটি তা পার্থক্য করা কঠিন। যেহেতু গবাদিপশুতে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ মাংসের গুণাগুণ নষ্ট করে দেয় এবং মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, তাই মোটাতাজা করার জন্য গরুতে স্টেরয়েডের ব্যবহার মোটেই কাম্য নয়। বিষয়টি কঠোর হস্তে দমনের জন্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে দ্রুত 'পশু জবাই ও মাংস নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' (২০১১ সনের ১৬ নং আইন) বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক কসাইখানার ব্যবস্থা করে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পশু ও মাংস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে এ শিল্প বাংলাদেশে একটি সম্ভবনাময় খাত হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

- পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে মোটাতাজা করণের গরুতে ইনজেকশন বা ঔষধ প্রয়োগ মানেই তা স্টেরয়েড ব্যবহার নয়। ব্যবহৃত ঔষধ হতে পারে কৃমিনাশক, ফিড এডিটিভ বা মেটাবোলিক স্টিমুলেন্টস। তবে তা স্টেরয়েডও হতে পারে। কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই সাংবাদিক ভাইরা ঢালাওভাবে প্রচার শুরু করছেন যে মোটাতাজা বা ফ্যাটেনিং গরুকে বিষাক্ত ঔষধ বা স্টেরয়েড খাওয়ানোর মাধ্যমে মোটাতাজা করা হচ্ছে। এদের মাংস মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই কোরবানীর ঈদের পূর্বে সংবাদপত্র ও মিডিয়া যে ভাবে তথ্য বিভ্রাট মূলক খবর ছড়ায় তাতে যে সব খামারি একবুক আশা নিয়ে গরু লালন পালন করেন তাদের সেই আশার গুড়ে বালি দেয়া হয় কিনা এটা অনুধাবন করার সময় এখনই। হ্যাঁ স্টেরয়েড ব্যবহার করা গরুর মাংস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন হুমকি তেমনি সুস্থ সবল ও স্বাস্থ্যবান গরুর মাংস বা প্রোটিন মানুষের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ। তাই হুট করে না জেনে শুনে তথ্য বিভ্রাট ঘটালে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও ধনী ব্যক্তিবর্গ কোরবানী দিতে অনীহা প্রকাশ করবেন পাশাপাশি এদেশের মানুষ প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগবে।

- অসুস্থ পশুপাখি চিকিৎসার পাশাপাশি ভেটেরিনারিয়ানদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল ঔষধের অবশিষ্টাংশমুক্ত প্রাণিজ খাদ্য যেমন দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন নিশ্চিত করা। এছাড়াও তাদের দায়িত্ব হল এ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি খামারি ও গ্রাম্য চিকিৎসকদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করা যাতে তাদের অপচিকিৎসার ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে না পড়ে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়সমূহ, পরিবেশবিদ, ফার্মাসিস্ট এবং দেশের সকল বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এ ব্যাপারে একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে জরুরি। এক্ষেত্রে সকল ভেটেরিনারিয়ানদের যে বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন তা হল- ক) রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান; খ) সঠিক রোগ নিরূপণ করে যথাযথ ঔষধ প্রয়োগ; গ) প্রয়োজনে পশুপাখির রোগ নির্ণয় কেন্দ্র/ল্যাবরেটরির সহায়তা গ্রহণ; ঘ) ঔষধের প্রত্যাহারকাল সম্বন্ধে গ্রাম্য ডাক্তার ও খামারিদেরকে সঠিক জ্ঞানদান; ঙ) ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রাম্য ডাক্তার ও খামারিদেরকে ধারণা দেয়া; চ) প্রাণিজ খাদ্যে ঔষধের অবশিষ্টাংশ সঞ্চিত হওয়া ও জনস্বাস্থ্যের ওপর এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে মত বিনিময়।

- গত বছর সরকার তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পশুর হাটগুলো তদারকি করে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ প্রয়োগে মোটা পশু চিহ্নিত করতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি একটি ভাল উদ্যোগ। আশাকরি এ বছরও উদ্যোগটি অব্যাহত থাকবে। ডাক্তাররা যে রকম দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড গ্রহণকারী রোগী দেখেই চিনতে পারেন, ঠিক সেরকম অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি চিকিৎসকরাও এ ধরণের স্টেরয়েড খাওয়ানো পশু দেখেই শনাক্ত করতে পারবেন। অনৈতিকভাবে স্টেরয়েড বা হরমোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া উচিত, এমনকি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপসংহার: কোরবানির ঈদ মুসলমানদের জন্য অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। কোরবানির ঈদে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশ্বজুড়ে সাধারণত গৃহপালিত পশু কোরবানি দেওয়া হয়। কোরবানীর অর্থ হল-ত্যাগ। তাই যে যত ভাল ও দামী পশু কোরবানী দিতে পারে সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্যলাভ করে এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। ইসলামের বিধান মতে কোরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ, সবল রোগমুক্ত। আর স্টেরয়েডে মোটাতাজা করা গরু কখনই সুস্থ নয়। এসব গরুর চঞ্চলতা কম এবং নড়াচড়া কম করে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কোরবানীর ঈদ প্রায় আগত। তাই ইতোমধ্যে মুসলিম ভাইরা কোরবানীর বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করছে। তবে এটা বলা যায়, মোটাতাজা গরু কোরবানীর জন্য আতঙ্ক নয় বরং অধিক নিরাপদ। কোরবানীর জন্য মোটাতাজা গরু অবশ্যই ক্রয় করা যাবে, কারণ এসব গরুর মাংসের গুণাগুণ রুগ্ন ও চিকিৎসাবিহীন গরুর চেয়ে অনেক ভাল। তাছাড়া মোটাতাজাকরণ গরু রোগমুক্ত হওয়ায় যেসব রোগ পশু থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় তা হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। তাই সংবাদপত্রের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিশ্চিন্তে এসব গরু কোরবানীর জন্য নির্বাচন করা যাবে এবং মাংস নিঃসন্দেহে খাওয়া যাবে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই। নতুবা গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প শিল্প হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। সেই সাথে জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন ২০০৫, মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ এবং নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটেরিনারি কাউন্সিল কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২.৫ গবাদিপশুর খামারে নথি সংরক্ষণ

একটি ডেইরি ফার্মে সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে পর্যাপ্ত রেকর্ড রাখার উপর। সংক্ষিপ্ত, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিমার্জিত ও সুন্দরভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করাকে নথি সংরক্ষণ বলা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায় নথি সংরক্ষণ করা হয় এবং দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য উৎপাদক খামারও ব্যতিক্রমধর্মী নয়। নথি সংরক্ষণ একটি হালকা বা টুকিটাকি বিষয় হতে পারে। কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যবস্থাপনায় কোথায় অসুবিধা বা গলদ, কোন খাতে অপব্যয় হচ্ছে, কোন পদ্ধতি ব্যয় সাপেক্ষ প্রভৃতি জানা সম্ভব হয় না, যদি সঠিক নথি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকে। সাধারণত স্থায়ী শিটযুক্ত বই, নোট বই অথবা ফাইলে নিম্নোক্ত রেকর্ড রাখা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত নথিগুলো খামারের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন-

প্রাণিসম্পদ নথি: ডেইরি খামারে মোট গবাদি পশুর সংখ্যা, জাতের বিবরণ, বয়স এবং এদের পুরো ইতিহাস জানার জন্য নথি রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ নথি পুরোপুরি ও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে খামার পরিচালনা করা ব্যবস্থাপকের পক্ষে সহজতর ও ভবিষ্যত প্রাক্কলন তৈরিতেও সহায়ক।

প্রজনন নথি: গবাদিপশুর খামারের জন্য প্রজনন নথি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ একটি গাভীর সারা জীবনের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে এর বাচ্চা দানের সংখ্যার উপর, আর বাচ্চা প্রসবের সংখ্যা নির্ভর করে উপযুক্ত লালন পালন ও সঠিক প্রজনন তথ্যের উপর। এছাড়া প্রজনন নথিতে কোন জাতের ষাঁড় দিয়ে পাল দেওয়া হয়েছে, পাল দেওয়া ব্যক্তির নাম ও তারিখ উল্লেখ থাকে।

বাচ্চা নথি: বাচ্চার জন্ম তারিখ, শারিরীক অবস্থা, লিঙ্গ, জন্ম ওজন, গাভী ও ষাঁড়ের কানের নম্বর এবং চিহ্নিত করণ নম্বর সবকিছুই এ নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

দুগ্ধ নথি: গাভীর দৈনন্দিন দুধ উৎপাদন ক্ষমতা সঠিকভাবে জানার জন্য দুগ্ধ নথি সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ খামারের আয় ব্যয়, উন্নতি-অবনতি প্রধানত নির্ভর করে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদনের উপর, গড় দুধ উৎপাদনের উপর নয়।

দুধের বিতরণ নথি: খামারে উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্য গ্রাহকদের নিকট বিশ্বস্ততার সহিত পৌঁছে দেয়া ও দ্রব্যের আয়-ব্যয়ের সঠিক ইঙ্গিত এ নথি হতে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক নথি: একটি গাভীর জন্য মাসিক খাদ্য খরচ কত এবং দুধ হতে কত পাওয়া যাবে তা এ নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে।

খাদ্য নথি: বছরের বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহীত খাদ্য সামগ্রীর সঠিক পরিমাণ ও মূল্য এবং দৈনিক পশু যে খাদ্য খায় তার প্রত্যেকটি খাদ্যের পরিমাণ খাদ্য নথিতে লিপিবদ্ধ থাকে। এছাড়া দানা খাদ্যের মিশ্রণ ও আঁশযুক্ত খাদ্য গো-খাদ্যের পরিমাণ যা খাওয়ানো হয় তাও নথিতে রাখা হয়।

শ্রমিক হাজিরা নথি: খামারের শ্রমিকদের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও ছুটির পূর্ণ বিবরণ এই নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

জন্ম রেকর্ড: প্রতিটি বাছুরের জন্মের রেকর্ড একটি স্থায়ী রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ডে গাভীর নম্বর, বাচ্চার জন্ম তারিখ, ষাঁড়ের নম্বর, লিঙ্গ, বাছুরের নম্বর, জাত ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

স্বাস্থ্য রেকর্ড: নিয়ন্ত্রিত প্রজনন প্রোগ্রামের জন্য যেমন স্বাস্থ্য রেকর্ড প্রয়োজন তেমনি সঠিকভাবে উৎপাদন নিরুপণের জন্য স্বাস্থ্য রেকর্ড প্রয়োজন। কমপক্ষে প্রত্যেকটি পশুর স্বাস্থ্য রেকর্ড থাকা প্রয়োজন; যথা- বাছুরের টিকা দেয়ার রেকর্ড, ম্যাস্টাইটিস রোগের রেকর্ড, ব্রুসেলোসিস ও যক্ষা টেস্টের রেকর্ড এবং যে কোন জটিল রোগ বা আঘাতের রেকর্ড। রোগে বা অন্য কোন কারণে খামারের পশু মারা গেলে বা পশু বিক্রয় করলে এই নথিতে লিপিবদ্ধ রাখা হয়।

উৎপাদন রেকর্ড: প্রতিটি গাভীর উৎপাদন তথ্য রেকর্ড করা প্রয়োজন। কারণ এক বছরের উৎপাদন রেকর্ড থেকে প্রতিটি গাভীর দুধ উৎপাদন, বাটার ফ্যাট পারসেন্ট ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়। নিম্নমানের উৎপাদনশীল গাভীকে ছাটাই করে নতুন উচ্চ উৎপাদনশীল গাভী প্রতিস্থাপন করা যায়। উচ্চ উৎপাদনশীল রেকর্ডযুক্ত গাভীর বিক্রয় মূল্য উচ্চ হয়।

খাদ্যের রেকর্ড: বিভিন্ন বয়স ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে খাদ্য তালিকা তৈরি করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন খাদ্যের পরিমাণ ও খাদ্যের মূল্যের উপর ডেইরি ফার্মের ব্যবসায় লাভ-লোকসান নির্ভর করে। সে কারণে পশুর খাদ্যের তালিকা ও মূল্যের রেকর্ড থাকা প্রয়োজন।

অন্যান্য নথি: আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নথি, গবাদিপশু জবেহ নথি, আনুষাঙ্গিক মজুদ বহি, কৃষি যন্ত্রপাতি নথি, বীজ মজুদ নথি, ওভারসিয়ার ডায়রি, মলমূত্র জমা ও বিক্রয় সংক্রান্ত নথি, চিঠিপত্র আদান প্রদান নথি ইত্যাদি।

২.৬ প্রযুক্তি হস্তান্তরের কলাকৌশল

২.৬.১ ভাল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও প্রাণিসম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ

প্রযুক্তি শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট যুক্তি প্রয়োগ বা শিল্প প্রভৃতিতে প্রয়োগ করার কৌশল। একটি ভাল প্রযুক্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন।

- সবসময় পাওয়া যায়: প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম এর দাম যত কম হবে এটি ততো বেশি মানুষে কর্তৃক ব্যবহৃত হবে;
- দীর্ঘদিন টিকে থাকে: বেশি মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলে ভাল প্রযুক্তি দীর্ঘদিন টিকে থাকে;
- মানুষের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে: ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটার যেমন অন্য কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি ভাল প্রযুক্তি মানুষে মানুষে বন্ধন তৈরি করে।
- প্রমিত হয়: সকল অবস্থায় একটি ভাল প্রযুক্তির ব্যবহারযোগ্যতা থাকে।
- সহজ ব্যবহার: কোন বিশেষ নির্দেশনা ছাড়াই যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তা বেশি মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়;
- মডুলার হয়: অনেক প্রচেষ্টা ছাড়াই একটি ভাল প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী ভিন্ন কনফিগারেশনে সাজানোর ব্যাবস্থা থাকে।

বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত ৪০ টি উন্নত প্রযুক্তি এবং ১৯ টি উন্নয়ন প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৮)। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উল্লেখ করা হল-

গবাদিপশু উৎপাদন প্রযুক্তি:	হাঁস-মুরগি উৎপাদন প্রযুক্তি:	গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উন্নয়ন প্যাকেজ:
ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক সংরক্ষণ প্রযুক্তি বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ গো-খাদ্য হিসেবে চিটাগুড়ের ব্যবহার গো-খাদ্য হিসেবে কলাগাছের সংরক্ষণ ভুট্টা খড়ের সংরক্ষণ ও ব্যবহার ELISA ভিত্তিক ক্ষুরারোগ নির্ণয় পদ্ধতি পিপিআর রোগের সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা	দেশী মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত চিক ব্রুডার খামারে মুরগির জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা মাইকোপ্লাজমা রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন সালমোনেলোসিস রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন সালমোনেলা ভ্যাকসিন	গরু মোটাতাজাকরণ সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উৎপাদন স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন মুরগির রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ মুরগির গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ

২.৬.২ প্রযুক্তি হস্তান্তরের লাগসই পদ্ধতি

অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উন্নয়ন (পিটিডি) পদ্ধতি হচ্ছে স্থানীয় খামারি এবং সম্প্রসারণ কর্মী বা গবেষকের মধ্যকার সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের সমষ্টিগত পদ্ধতি যা খামারের ক্ষেত্রে খামারির পছন্দমত কাজের ভিতর থেকে নতুন কৌশলের উদ্ভাবন অথবা উক্ত কাজের সাথে নতুন কৌশলের সংযোজন ঘটায়। পিটিডি পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগণের বর্তমান কৃষিভিত্তিক বিরাজমান সমস্যার সমাধান বের করা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নিয়ম বা পদ্ধতি তৈরি করা যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুযোগের সৃষ্টি করে। অতএব, পিটিডি হল খামারির চলমান উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন এবং আগ্রহ বা সচেতনতা তৈরির একটি বাস্তবসম্মত অনুশীলন। পিটিডি পদ্ধতির নীতিমালাসমূহ হল-

- খামারিদের সম্পদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়া।
- চাহিদা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- খামারির জন্য সহজ পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়া।
- খামারির নিজের মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ রক্ষা করা।
- সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে পিটিডি'র বাস্তবায়ন স্থায়ী করা।

পিটিডি প্রক্রিয়ার ৭টি ধাপ

(১) স্থানীয় জনগণের সাথে সম্পর্ক ও বিশ্বাস স্থাপন করা: প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্থানীয় মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা। এখানে সম্প্রসারণ কর্মী বা সহায়তাকারীকে কোন পরিচিত বা সম্মানিত ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচয় পর্বের কাজটি করা ভাল। তবে পরিচিতির সময় সহায়তাকারীর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণের বা খামারিদের দায়িত্ব-কর্তব্য পরিস্কার হওয়া উচিত। এই ধাপটি করা যেতে পারে নিম্নের প্রক্রিয়ায়-

- সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত ও আলাপ-আলোচনায় কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- পরস্পরকে সম্মান দিয়ে একজনকে আরেকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
- পরিচিত হওয়ার সময় বা আগে সহায়তাকারী সংশ্লিষ্ট এলাকার মৌলিক এবং বর্তমান তথ্যাবলী যেমন- জনসংখ্যা, জমি, জলবায়ু, পশুপাখি ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

(২) সমস্যাবলী সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ক্রম নির্বাচন করা: এই পর্যায়ে আলাপ আলোচনা হতে পারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যেমন- প্রধান সমস্যা, উক্ত সমস্যার প্রভাব, সমস্যার সাধারণ কারণগুলি ইত্যাদি। কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে-

- সমস্যাগুলি কি কি? প্রধান সমস্যা কি?

- সমস্যা সম্পর্কিত বর্তমান জ্ঞান কি?
- সমাধানের ক্রম কি? অর্থাৎ কোনটি আগে করা দরকার?
- সমাধানের জন্য কাজগুলো কি কি? এবং সমাধানের ফলে প্রভাবগুলি কি কি? ইত্যাদি।

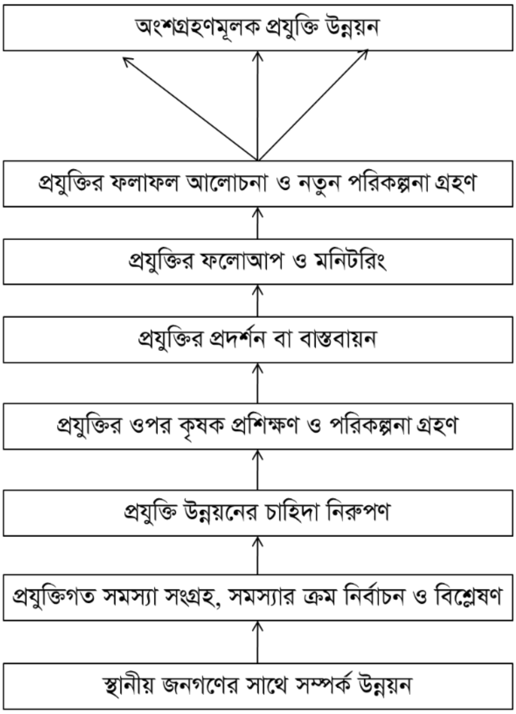

চিত্র ২.১ঃ অংশগ্রহণমূলক প্রযুক্তি উন্নয়ন পদ্ধতির ধাপসমূহ

(৩) চাহিদা নিরুপণ: পিটিডি কোন নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ কাজ নয়, বরং খামারিদের সুযোগ সুবিধা, জীবন জীবিকা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব পূর্ণাঙ্গ কর্ম প্রচেষ্টা যা ব্যবহারকারীদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে পারে। এই ধাপে সহায়তাকারী- খামারিদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দলীয় কাজের ভিত্তিতে করতে পারেন। তাহলে, উপরোল্লিখিত কাজগুলি সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে করলে সঠিক সমস্যা সমাধান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী দলীয় আলোচনা পিআরএ-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। মনে রাখা দরকার যে, চাহিদার মধ্যে প্রযুক্তিগত ও সাধারণ চাহিদা সর্বোপরি সামাধানযোগ্য চাহিদাগুলি যেন আসে। চাহিদাগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো এবং প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চাহিদার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৪) প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ: খামারিদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সম্পদ ও পছন্দের ভিত্তিতে খামার করার পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।

(৫) প্রযুক্তি প্রদর্শন: খামারিদেরকে স্বাধীনভাবে তার সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে প্রযুক্তি প্রদর্শনে ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে খামারি, সম্প্রসারণ কর্মী বা গবেষকদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ হবে।

(৬) ফলোআপ ও মনিটরিং: এক্ষেত্রে খামারি/সম্প্রসারণ কর্মী/এনজিও কর্মীদের পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক ফলোআপ ও মনিটরিং হবে। এই সময় প্রযুক্তিগত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা যায়।

(৭) ফলাফল আলোচনা ও নতুন পরিকল্পনা: পিটিডি'র শেষ পর্যায়ে (প্রযুক্তি বাস্তবায়ন শেষে তার ফলাফল পাওয়ার পর) পর খামারি তার কমিউনিটির দলীয় সদস্য বা সদস্যার সাথে পিটিডি'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো পদ্ধতি, এর শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও ফলাফল আলোচনা করেন। এতে পিটিডি'র ভাল-মন্দ দিক, ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসমূহ বেরিয়ে আসে। পরবর্তীতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রযুক্তিটির সম্প্রসারণ হতে থাকে।

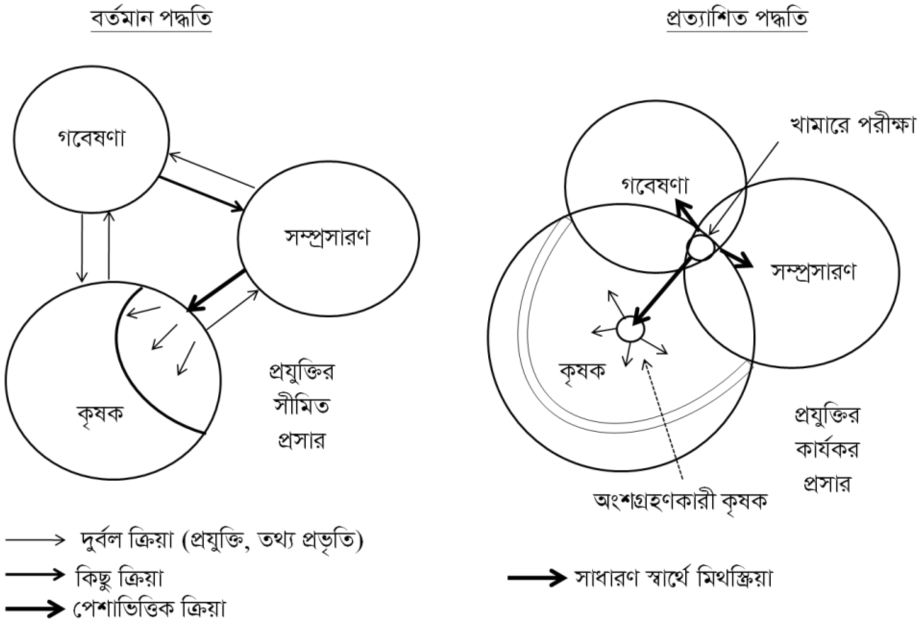

চিত্র ২.২ঃ খামারভিত্তিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কার্যকর পদ্ধতি। এখানে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির সাথে প্রত্যাশিত পদ্ধতির তুলনা করা হয়েছে (Simaraks, 1994)।

পিটিডি একটি সফল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কৌশল। পিটিডি গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খামারিদের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে। এই পদ্ধতি শুধু দরিদ্র খামারিদের তুলে আনতে সাহায্য করে না; অধিক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের আয় বাড়ায় ও উৎসাহ যোগায়। পিটিডি পদ্ধতি গ্রামবাসীদের মধ্যে কমিউনিটি সম্প্রসারণ কর্মী সৃষ্টি করে। উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে অন্যান্য খামারিদের উৎপাদন এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে। এভাবে একজন সম্প্রসারণ কর্মী তার অভিজ্ঞতা খামারিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে তা টেকসই হয়।

২.৬.৩ একজন সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে খামারিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় যা প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে বিরাজমান সমস্যা বুঝতে ও তার সমাধান করতে খামারিকে সহায়তা করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা অর্জন করা যা তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি দান করে। একজন সম্প্রসারণ কর্মী তার এলাকার খামারিদের বসতবাড়ি বা খামারে আধুনিক প্রাণিসম্পদ উৎপাদন নিশ্চিত করেন ও

উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্য সেবা বা উপকরণ জনগণের নিকট পৌছে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একজন সম্প্রসারণ কর্মী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে খামারিদের সহায়তা দিয়ে থাকেন।

- খামারিদের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনামূলক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় বের করতে উদ্বুদ্ধকরণ। বিভিন্ন পন্থার সন্ধান দেয়া এবং প্রতিটি বিকল্পের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে ধারণা দেয়া, যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।
- খামারিদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজের দক্ষতা উন্নয়ন। তাছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্বন্ধে খামারিদের আগ্রহী করে তোলা। একজন সম্প্রসারণ কর্মী এলাকার মধ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রাম সংগঠন, বিভিন্ন সমস্যা কেন্দ্রিক বিষয়ের উন্নয়ন/প্রতিষ্ঠা/পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসেবে কাজ করতে পারেন।
- একজন সম্প্রসারণ কর্মী নিজ খামারের উৎপাদন প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে নিজের ও পার্শ্ববর্তী কমিউনিটিতে নিজেই তার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবেন। তিনি খামারিদের নিকট থেকে যৌক্তিক বা ন্যায্য পারিশ্রমিক নিবেন যা দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন।
- একজন সম্প্রসারণ কর্মী তার সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মী বা কর্মকর্তা, বিভাগ, এনজিও'র সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে গ্রামের উন্নয়নের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ, খাদ্য ও জীবন জীবিকার নিরাপত্তা এবং গ্রাম ও কমিউনিটি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন তথ্য খামারিদের মধ্যে সরবরাহ করবেন। সম্প্রসারণ কর্মী একদিকে যেমন নিজের কর্মসংস্থান বা পেশা প্রতিষ্ঠা করবেন, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট অফিস/বিভাগ/এনজিও'র মধ্যে 'সংযোগ স্থাপনকারী' হিসেবে কাজ করবেন।
- সম্প্রসারণ কর্মী রুটিনমাফিক নিজ নিজ গ্রাম বা কমিউনিটির বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কার্যক্রম ফলোআপ করবেন। মাঠকর্মী ও উপজেলা লাইন ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগযোগ রেখে তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি খামার পর্যায়ে সরবরাহ ও বিনিময় করবেন। নির্ধারিত রিপোর্টিং ফর্ম পূরণ করে অফিসে জমা দেয়াও একজন সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্ব যার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

২.৬.৪ একজন সম্প্রসারণ কর্মীর কাঙ্খিত গুণাবলী

সম্প্রসারণ কর্মে নিয়োজিত কর্মীকে সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। ফলে মানবিক দিক থেকে একজন সম্প্রসারণ কর্মী সাধারণ মানুষের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকেন। কাঙ্খিত গুণাবলী সম্প্রসারণ কর্মীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, ফলে প্রত্যাশিত উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত হয়। সম্প্রসারণ কর্মীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণ নিম্নে দেয়া হল।

- সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া এবং কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া। নিজে জেনে অন্যকে জানানোর মনোভাব থাকা।
- হতাশামুক্ত থাকা ও যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মনোভাব থাকা।
- সমাজে প্রচলিত ভাল প্রথা অনুসরণ করা। নিজের দোষ স্বীকার করার মানষিকতা থাকা।
- নিসংকোচে খোলামেলা আলোচনা করা। বেশি শোনা কম বলার মানষিকতা থাকা।
- দুস্থ, নিঃস্ব অসহায়, বঞ্চিত, অবহেলা ও শোষিতের পক্ষে কাজ করার মনোভাব থাকা।
- কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকা। স্পষ্টবাদী ও মিষ্টভাষী হওয়া ও সৃজনশীল হওয়া।
- উন্নয়নমূলক কাজে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখার মনোভাব থাকা। আপোষকামীতা ইত্যাদি।

২.৭ আধুনিক সম্প্রসারণের কলাকৌশল এবং সম্প্রসারণ ও গবেষণার সমন্বয়

বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির বিশ্ব। নিত্য নতুন প্রযুক্তি, উপকরণ, সেবা ইত্যাদির উদ্ভাবন এখন খুবই সাধারণ ঘটনা। আর এসবের ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনামূলক কম বিনিয়োগে উৎকৃষ্টমানের পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতামূলক বিপণনের মাধ্যমে বাজারে প্রবেশ এখন একটি সর্বজনীন বিষয়। দেশের পশুপাখি পালনকারীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্বন্ধে ধারণা দেয়া, তাদেরকে বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির ভিতর থেকে সঠিক পদ্ধতিটি বেছে নিয়ে সহায়তা করা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর কাজ। একজন সম্প্রসারণ কর্মীকে তুলনা করা যায় আলোটিকা হাতে অগ্রবর্তী পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে।

সম্প্রসারণ কর্মী সাধারণভাবে কৃষকের সহায়তায় পাশাপাশি সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নেও কাজ করে থাকে। তবে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে তিনটি পক্ষ থাকে।

- কৃষক
- সম্প্রসারণ ও
- গবেষণা

মূলত গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন বা কৃষকদের সমস্যাবলী সমাধানের উপায় বের করা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ। সম্প্রসারণ বিভাগের কাজ হল দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তির যথাযোগ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা পুনরায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছে সমাধানের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া। এক্ষেত্রে সফল যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রতিনিয়ত কোন না কোন যোগাযোগের মাধ্যমে নিজের মতামত অন্যের কাছে প্রেরণ করতে হয়। তার জন্য আলাদা কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সম্প্রসারণ কার্যে এক বা একাধিক বিশেষ বার্তা বা তথ্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী বা পেশার মানুষের কাছে পৌছানোর কাজটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা একটি জটিল বিষয়। তাই সঠিক এবং সফল যোগাযোগের জন্য যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি পর্যায়ে উন্নতমানের দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োজন। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে পাঁচটি উপাদান রয়েছে। যেমন- (১) যোগাযোগকারী বা সম্প্রসারণ কর্মী, (২) বার্তা, (৩) মাধ্যম, (৪) গ্রহীতা বা কৃষক এবং (৫) উদ্দেশ্য।

২.৭.১ সম্প্রসারণ কর্মী ও খামারির ফলপ্রসু যোগাযোগ

একজন যোগাযোগকারী বা সম্প্রসারণকর্মীর সফল যোগাযোগের জন্য বেশ কিছু দক্ষতা বা প্রস্তুতির দরকার। যেমন- যে তথ্যটি যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে যে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা, ভাল উপস্থাপন দক্ষতা, স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা, উপযুক্ত মাধ্যম ব্যবহারের দক্ষতা, খামারির মনস্বত্ব বিষয়ে সচেতনতা ইত্যাদি। যে প্রযুক্তি বা বিষয়টি যোগাযোগের মাধ্যমে খামারির কাছে পৌঁছে দিতে হবে সেটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে প্রস্তুত করা দরকার। প্রযুক্তি বা বিষয় হতে হবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত খামারির চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সম্পূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ। বিষয় প্রেরণের জন্যে সুবিধাজনক মাধ্যমে নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাধ্যম হতে পারে আন্তব্যক্তিক বা গণমাধ্যম। সম্প্রসারণ কর্মী প্রত্যক্ষভাবে সুবিধাভোগী খামারির সাথে যোগাযোগ করেন সেটাই আন্তব্যক্তিক মাধ্যম। এ মাধ্যমেরও বিভিন্ন প্রস্তুতি আছে, যেমন- বক্তৃতা, দলগত আলোচনা, প্রদর্শনী ইত্যাদি। গণমাধ্যমের মধ্যে আছে লিফলেট, পোষ্টার, বেতার, টেলিফোন, পত্রিকা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক মাধ্যম বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। যেমন প্রশ্নোত্তর, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি। খামারি বা তথ্য যার কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে তিনিই হচ্ছেন এ প্রক্রিয়ায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই সফল বার্তা প্রেরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। যখন বিশেষ কোন খামারি দলকে শ্রোতা হিসেবে নির্বাচন করা হয় তখন যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার তা হল-

- দলের সদস্যরা বয়স বা শিক্ষার দিক দিয়ে একই শ্রেণীর হওয়া উত্তম। তাছাড়া সদস্যরা একই জাতীয় স্বার্থের ধারক হওয়া উচিত। যেমন ক্রেতা ও বিক্রেতার দুটি ভিন্ন স্বার্থের ধারক। এই দুই শ্রেণীর সদস্য একই সাথে থাকা ঠিক নয়।
- খামারির মনোযোগ, ধৈর্য ও আগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। তার ভীতি বা সংকোচ দূর করতে হবে যেন তিনি নিঃসংকোচভাবে সব কথা বলতে পারেন।

স্বার্থক যোগাযোগ (effective communication) হল বক্তা ও শ্রোতার সমঝোতার ক্ষেত্রে একটা ফলপ্রসু পদক্ষেপ। অর্থাৎ বক্তা যে তথ্য শ্রোতার কাছে পৌছাতে চাচ্ছেন, শ্রোতার তা সঠিকভাবে বুঝতে পারা। যে কোন সার্থক যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে দুটো দিক রয়েছে (১) বিষয়বস্তুগত ও (২) সম্পর্কগত। আলোচনার সময় আমরা বক্তার বক্তব্যই শুধু শুনি না, সেই সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিধিও লক্ষ্য করে থাকি। আর আমরা যদি সম্পর্কের সূত্রগুলো নিয়েই ভাবতে থাকি তাহলে কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু হারিয়ে ফেলি। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তখনই সার্থক হয় যখন

বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুগত ও সম্পর্কগত উভয় দিকই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত যে কোন পদ্ধতিকে কার্যকর করতে হলে অন্যদের সাথে সমমানসিকতা পোষণ করার কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হবে। এই ঝুঁকিটুকু নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে যদি একজন সম্প্রসারণ কর্মী প্রস্তুত না থাকে তবে প্রত্যক্ষ ও ফলপ্রসু যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে বোঝা যায় যোগাযোগ স্বার্থক এবং ফলপ্রসু হয়েছে কিনা।

দ্বিমুখী যোগাযোগ: যখন সম্প্রসারণ কর্মী কেবল বক্তব্য প্রদান করেই তার দায়িত্ব শেষ করবে না, বরং খামারিদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, সেটাই দ্বিমুখী যোগাযোগ। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রধান কৌশলসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দ্বিমুখী যোগাযোগ। কোন বক্তব্য উপস্থাপন না করেও সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে ভাব বিনিময় অধিক ফলপ্রসু হতে পারে। স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে একজন সম্প্রসারণ কর্মী অনেক অবান্তর প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

শ্রবণে সক্রিয়তা: সক্রিয় শ্রবণ উৎসাহিত করা উচিৎ কেননা তাতে সহজেই অনেক অস্পষ্টতা দূর হতে পারে। সক্রিয় শ্রবণ পদ্ধতির মাধ্যমে খামারির মধ্যে অনুভূতির যে প্রতিফলন ঘটে তার মাধ্যমেই বিষয়বস্তু ও ভাব বিন্যাস সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে কিনা, তা যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যায়। আলোচনা তখনই সার্থক বলে ধরা হবে যখন খামারি একজন সম্প্রসারণ কর্মীর বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনে বিষয়বস্তু, ভাব ও অর্থ বিশ্লেষণ করে।

ফিড ব্যাক: প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় প্রয়োজনীয় মাধ্যম হল ফিড ব্যাক বা খামারির প্রতিক্রিয়া ও চাহিদা পূরণ। আলোচনায় খামারির শারীরিক উপস্থিতিই যথেষ্ট নয় বরং খামারি কর্তৃক সম্প্রসারণ কর্মীর বক্তব্যের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত করাও আবশ্যক। ফিড ব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্প্রসারণ কর্মীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু খামারির লব্ধ ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা তা ধরা পড়ে। বক্তব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্প্রসারণ কর্মীর মনে যদি পরিস্কার ধারণা না থাকে তাহলে সঠিক ফিডব্যাক সম্ভব হয় না। এজন্যে যে কোন উপস্থাপনার আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকা খুবই জরুরি।

স্বতস্ফুর্ততা: বিষয়বস্তুর সাথে অনেক প্রশ্নের সম্পর্ক বা অবস্থান জানা না থাকার ফলে সম্প্রসারণ কর্মী জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, অথচ এরকমটি হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়। তাই কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হবার সময় তার উৎস সম্পর্কে সচেতন থেকে সম্প্রসারণ কর্মী কর্তৃক পূর্ণ পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। সম্প্রসারণ কর্মীকে খেয়াল রাখতে হয় যে খামারিরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার বক্তব্যকে গ্রহণ করছে কিনা।

সরাসরি উপস্থাপনা: কোন রকম অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ছাড়াই মূল বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন স্বার্থক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান শর্ত। বক্তব্য যদি অপ্রাসঙ্গিক, খামারির চাহিদার তুলনায় অতি নিম্নমানের বা অধিক জটিল মনে হয় তাহলে খামারির স্বতঃস্ফুর্ততা বিঘ্নিত হয়।

পারস্পরিক ভাব বিনিময়: ফলপ্রসু ও সার্থক যোগাযোগ এর শেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল পারস্পরিক ভাব বিনিময়। যে কোন ধরণের যোগাযোগই হল একটা বিনিময় প্রক্রিয়া, কেননা যোগাযোগ করতে হলেই আমরা পরস্পরের মতামত, বিশ্বাস, চিন্তা, ভাবনা, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য, স্বার্থ, সিদ্ধান্ত, সক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে ভাব বিনিময় করে থাকি।

২.৭.২ সম্প্রসারণ কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ

উদ্বুদ্ধকরণ বা মটিভেশান মানে কাউকে কাজ করতে উৎসাহ দেয়া। অন্য ভাষায় সর্বাধিক কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সজীব করে তোলা। কিছু কিছু সম্প্রসারণ কর্মী নিজেরাই উদ্বুদ্ধ থাকে। তারা দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী এবং নিজেকে পরিচালিত করতে সক্ষম। আবার কিছু কর্মী তাদের কাজে অতটা উদ্বুদ্ধ নয়। তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে এবং তারা ভালভাবে কর্ম সম্পাদন করে না। একজন তদারককারী কর্মকর্তার কর্তব্য হচ্ছে দ্বিতীয় দলের কর্মীদের কাজকর্মের উৎকর্ষতা সাধনে উদ্বুদ্ধ করা। একজন উদ্বুদ্ধ কর্মী কাজটিকে নিজের দায়িত্ব বিবেচনা করে নিজেই তা সম্পাদনে আগ্রহ দেখায়। সে ইতিবাচক মনোভাব দেখায়, কঠোর পরিশ্রম করে এবং বিশ্বাস করে যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া একজন উদ্বুদ্ধ কর্মী

তার তদারককারী, সহকর্মী এবং অন্যান্যদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। সে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তাবায়ন ও মূল্যায়নে নিজ থেকেই অংশগ্রহণ করে। একজন সম্প্রসারণ কর্মীকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিবাচক মনোভাব: ইতিবাচক মনোভাব হচ্ছে এক ধরণের অন্তর্নিহিত উদ্বুদ্ধকরণ। ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী একজন মানুষ আশাবাদী। কাজটি যতই দুঃসাধ্য হোক না কেন সে তা সম্পাদন করতে চেষ্টা করে। ইতিবাচক মনোভাব থেকেই ইতিবাচক কর্ম, এবং ইতিবাচক কর্ম থেকে সাফল্য আসে। একজন তদারককারী কর্মকর্তার তার নিজের এবং কর্মীদের কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা প্রয়োজন। তদারককারীর যদি তার কাজ, সংস্থা ও এলাকার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকে, তাহলে তার তত্ত্বাবধানে কর্মরত কর্মীদের মধ্যেও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। এমনকি নেতিবাচক মনোভাবের অধিকারী কর্মীটিও অধিকতর ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী হতে পারে। অবশ্য মনোভাব সবসময় দ্রুত পরিবর্তন হবে, এমন আশা করা যায় না। কখনও কখনও তা ধীরে ধীরে গঠিত হয়। সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে কয়েক মাস বা বছর লেগে যেতে পারে। তদারককারী হিসেবে নিজেকে এবং অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করতে যেয়ে নিজের যে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে মাঝে মাঝে হয়তো এতে চিড় ধরতে পারে। অধিকতর ইতিবাচক চিন্তা ও কর্ম দ্বারা এর মোকাবেলা করতে হবে। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে নিজের ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা।

কর্মীদের সাথে বোঝাপড়া: উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি বোঝাপড়ার উপর নির্ভরশীল। কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে একজন তদারককারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই প্রথমে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। বোঝাপড়ার ফলে কর্মীরা তাদের প্রশিক্ষণ, তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণকারী নীতি ও আইন কানুন এবং কাজের পরিবেশের সাথে পরিচিত হবে। প্রতিটি কর্মীর মনোভাব, মেধা, লক্ষ্য, পছন্দ এবং অপছন্দ জানার জন্য সময় ব্যয় হবে। একজন কর্মীর কর্মের লক্ষ্য ও ব্যক্তিগত লক্ষ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য জানতে পারলে তার আচরণ এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তার আচরণ কেমন হতে পারে তা ভালভাবেই আঁচ করা যায়। একজন সমর্থ যুবকের কথাই ধরা যাক যিনি মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়েছেন। তার কাজের মানের অবনতি ঘটছে। তিনি কারণে-অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন এবং কারো সাথে ভালভাবে মিশতে পারছেন না। কর্মীদের তদারককারী হিসেবে তার আচরণ পরিবর্তনের জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে আগে জানতে হবে কেন তিনি মাদকদ্রব্য সেবন করছেন। মনে রাখতে হবে তার আচরণ তার বিবেচনায় সঙ্গত এবং যথার্থ অন্যের জন্য তা যতই ধ্বংসকারী এবং অযৌক্তিক মনে হোক না কেন। এই ধরণের কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রথম পদক্ষেপ হল তার অবস্থা জানতে চেষ্টা করা। কেননা কোন কর্মীকে উদ্বুদ্ধকরণের প্রথম পদক্ষেপ হল তার সম্পর্কে জানা। তার সমস্যাকে চিহ্নিত করে সহমর্মিতার সাথে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করা।

বিশ্বাস সৃষ্টি: বোঝাপড়া থেকে বিশ্বাসের সৃষ্টি। একজন কর্মীর আস্থা অর্জন করতে না পারলে তাকে উদ্বুদ্ধ করা দুঃসাধ্য হয়। আস্থা অর্জনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তদারককারী কর্মকর্তা হিসেবে শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য কিছু পথ নির্দেশনা আছে। বিশ্বাস জন্মাতে হলে কর্মীদের সাথে মেলামেশা ও সমান আচরণ করতে হয়। সমভাবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিয়ম কানুন বলবৎ করা দরকার। কারো মনে যেন এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। দ্বিমুখী যোগাযোগ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক কর্মীদের মতামত দিতে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার পূর্বক কর্মীদের সাথে তথ্যের অংশভাগী হতে হয় এবং তাদের ধারণা ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। যদি তদারককারী কর্মকর্তারা তাদের কর্মীদের বিশ্বাস করে তাহলে তারাও তদারককারীদেরকে বিশ্বাস করবে।

ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন: কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে নিজে উদ্বুদ্ধ হওয়া। তদারককারী কর্মকর্তা কর্মীদের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ। সুতরাং ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা দরকার। নিজে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অপরকে অনুসরণ করতে বলাই ভাল। যখন প্রয়োজন তখনই সাহায্য কর্মীদের সাহায্য নিতে হয় এবং যখন তদারককারীর কোন ভুল হয় তখন তা স্বীকার করা উচিত। এই রকম অনুশীলনে কর্মীরাও উৎসাহিত হয়। যদি তদারককরী নিজে ভাল কাজ দ্বারা ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারা যায় তাহলে কর্মীদের কাছ থেকেও ভাল কাজ প্রত্যাশা করা যায়।

ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা: কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করার আগে তার সাথে অবশ্যই বন্ধু ভাবাপন্ন হতে হয় এবং খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে হয়। কর্মীদের মনোভাব এবং লক্ষ্য বোঝার চেষ্টা করা দরকার। অযথা কর্মীদের সমালোচনা করা উচিত নয়। কথাবার্তায় হাস্য কৌতুক বজায় রাখা দরকার কারণ হাস্য কৌতুক সম্পর্ক স্থাপনের সহায়তা করে। ক্রোধ থেকে দূরে থাকাই ভাল। ক্রোধ সব সময়ই পরিস্থিতিরি অবনতি ঘটায়।

যে কর্মী যেখানে ভাল কাজ করে তাকে সেখানে নিয়োজিত করা: একজন কর্মীকে জানার পর তার দক্ষতা ও দুর্বলতা ধরা যায়। তাকে সেই জায়গায় নিয়োজিত করা দরকার যেখানে সে ভাল কাজ করতে পারে। একজন কর্মী তখনই তার কাজে সাফল্য লাভ করে এবং উদ্বুদ্ধ হয় যদি সেই কাজে তার আগ্রহ ও দক্ষতা থকে।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার কর: কর্মীদের অংশগ্রহণে উৎসাহ দেয়া এবং কর্মে জড়িত করা তাদের ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মীরা জানতে চায় যে তাদের সংস্থায় কি ঘটছে। তাদের সাথে তথ্য বিনিময় করা দরকার। তাই দ্বি-মুখী যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে মতামত জানা দরকার। কর্মীরা ভাল কিছু সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা উচিত। কোন কোন পরিস্থিতিতে এবং কিছু কিছু কর্মীর সাথে তদারককারীর কর্তৃত্বমূলক আচরণ করতে হতে পারে। তবুও অধিকাংশ সময়ে তদারককারীর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত কারণ কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণের এটা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

কর্মীদের পরিচালন, উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান: কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হলে তদারককারীরকে অবশ্যই নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের পথ নির্দেশ, উৎসাহ ও সমর্থন দিতে হয়। এখানে পথ মানে কর্মীদের নিজেদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাহায্য করা। পথ নির্দেশের অপর অর্থ হল কর্মীদের কাছ থেকে তদারককারী কি চান তা জানানো। মানুষ অপরে কি প্রত্যাশা করে সে অনুযায়ী কাজ করতে চায়। অতএব কর্মীদের জ্ঞান থাকা চাই তদারককারী তাদের কাছ থেকে কি ধরণের আচরণ চান। কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সকল কর্মীর পথ নির্দেশ পাওয়া উচিত। কারো কারো ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে পথ নির্দেশের প্রয়োজন রয়েছে। সমস্যার প্রকৃতি নির্বিশেষে কর্মীদের সহায়তা এবং সাহস যোগানই হল উৎসাহ প্রদান। সমর্থন মানে হল কর্মীদের জন্য সন্তোষজনক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর মধ্যে রয়েছে কর্মী ও সম্পদ। সমর্থনের আরও অর্থ হল সংস্থার সাথে কর্মীকে সহায়তা দেয়া। তদারককারী কর্মীদের সমর্থন করতে সক্ষম কারণ কর্মীদের চেয়ে তদারককারীর ক্ষমতা বেশি।

ভাল কাজের প্রতিদান: কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণে ভাল উপায় হচ্ছে ভাল কাজের প্রশংসা করা। প্রশংসা করা উদ্বুদ্ধকরণের একটি শক্তিশালী কৌশল। কর্মী যে কাজটি করছে তার তারিফ করতে দ্বিধা করা উচিত না কারণ সবাই চায় যে তার কাজটি প্রশংসা অর্জন করুক। বছর শেষে কর্মীর মূল্যায়ন হবে সে অপেক্ষায় না থেকে তখনই তার তারিফ করুন। যে কর্মী ভাল কাজ করে তাকে মাঝে মধ্যেই এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রশংসা করা উচিত। প্রশংসা যখন অন্য কর্মীর সামনে করা হয় তখন এটা বিশেষভাবে কার্যকর হয় কারণ এটা কর্মীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং নেতৃত্বের বিস্তৃতি ঘটায়। প্রশংসা ছাড়াও ভাল কাজের প্রতিদানের মধ্যে থাকতে পারে বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি এবং উচ্চুর পর্যায়ে নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ।

দলীয় চেতনা সৃষ্টি: কর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ হয় যদি তারা অনুভব করে যে তারা একটি দলের অংশ। অতএব কর্মীরা যেন বুঝতে পারে যে তারা একটি দলের অংশ এবং দলের সাফল্যের জন্য তাদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। তারা যেন আরো অনুভব করে যে সেবা প্রদান প্রকল্পের সকল কর্মীরই দায়িত্ব। তাই দলীয় চেতনা সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত সভার ব্যবস্থা করা উচিত।

নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা: সার্বক্ষণিক শিক্ষা কর্মসূচি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। অধিকাংশ মানুষই একই প্রণালীতে এক কাজ বার বার করে আনন্দ পায়না। তাদের বৈচিত্র্য প্রয়োজন। অনেক কর্মী নতুন দক্ষতা শেখা বা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের চ্যালেঞ্জ নিতে আনন্দ পায়। তাই তদারককারীর সার্বক্ষণিক শিক্ষা যেন কর্মীর বর্তমান দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যখন কোন কর্মী কোন নতুন কাজ সম্পাদন

করতে পারে তখন তাকে সে দায়িত্ব দেয়া ভাল। সার্বক্ষণিক শিক্ষা তদারককারীর কাজকে যথেষ্ট সহজ করে দেয় এবং কর্মীদের ভালভাবে কাজ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।

কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, লক্ষ্য এবং কর্ম অভ্যাসের ভিন্নতা রয়েছে। ফলে একজনকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাবে অন্যকে সেভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তদারককারী হিসেবে প্রতিটি কর্মীর উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন প্রণালী বাছাই করতে হয়। অভিজ্ঞতাই বলে দেয় কোন পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল কাজ দেয়। মোদ্দা কথা, উদ্বুদ্ধ হওয়া কর্মী তাদের কাজ ভালভাবে সম্পাদন করে। উদ্বুদ্ধ হওয়া কর্মী নিজেই নিজেকে পরিচালিত করে। উদ্বুদ্ধ নহে এমন কর্মীদের পরিচালিত করতে হয়, তারা নিজেরা পরিচালিত হয় না। তাই যে সব কর্মী নিজেরা পরিচালিত হয় তাদের তদারক করা অতি সহজ।

২.৮ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা

কোন একটি ফার্মিং সিস্টেমের তত্ত্বাবধানে দু ইবা ততোধিক ফার্মকে সমন্বিত করাকে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (Integrated farming system) বলে। এটা দুই ধরণের; একটা হচ্ছে Horizontal integration এবং আরেকটা হচ্ছে Vertical integration. আনুভূমিক ইন্ট্রিগ্রেশনে একটা সাব ইউনিট আরেকটা সাব ইউনিটের উপর নির্ভরশীল নয় তবে একটি অপরটি দ্বারা উপকৃত হয়। উলম্ব ইন্ট্রিগ্রেশনে সাব ইউনিটগুলো একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল যেমন- ব্রয়লার রিয়ারিং ইউনিট (broiler rearing unit) ও ফিড মিল। ডাক কাম ফিশ এবং রাজহাঁস বনাম হর্টিকালচার হচ্ছে আনুভূমিক ইন্ট্রিগ্রেশনের উদাহরণ। পুকুরে মাছ ও হাঁসের একত্রে চাষ প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। এক্ষেত্রে পুকুরের উপর হাঁসের ঘর করা যেতে পারে। হাঁস খাবার সময় তার খাওয়ার কিছু অংশ নষ্ট করে আবার হাঁসের মল পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু মাছ যারা হাঁসের মল সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। হাঁস তার খাবারের এক তৃতীয়াংশ মল হিসেবে ত্যাগ করে। হাঁসের মলে নাইট্রোজেন থাকে ৭০%, ফসফরাস থাকে ৬০%, পটাশিয়াম থাকে ৪০%। এই সার পানিতে মিশে জুপ্লাংক্টন বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জুপ্লাংক্টন মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। DM basis, এই জুপ্লাংক্টনে ৬০% ক্রুড প্রোটিন থাকে। তাই পরোক্ষভাবে মাছ হাঁসের মল থেকে প্রোটিন পেয়ে থাকে। একই জমিতে হাঁস ও মাছ চাষ করলে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায় এবং মাছ, মাংস, ডিম পওয়া যায়।

২.৮.১ সমন্বিত খামারের অঙ্গসমূহ

একটি সমন্বিত খামার ঐ খামারে পরিচালিত সকল পণ্যের প্রত্যক্ষ কাজকর্ম নিয়ে গঠিত। অনেকগুলো একই ধরণের পণ্যকে একত্রে অঙ্গ বলে। অনেকে এই অঙ্গসমূহকে উপ-ব্যবস্থা (sub-system) বলে থাকেন। কেননা প্রতিটির অধীন আবার অনেকগুলো পণ্য (enterprise) থাকে (যেমন- গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, মাছ, ফসল, গাছপালা ইত্যাদি) যেগুলো একত্রে একটি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বাংলাদেশে সমন্বিত খামার ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থা (sub-system) বা অঙ্গগুলো (component) হল- ফসল, পশুপাখি, মৎস্য, কৃষিবন ও বসতবাড়ী। সমন্বিত খামারের ভিত্তি হল বসতবাড়ী উপ-ব্যবস্থা। বসতবাড়ি ছাড়া সমন্বিত খামার গড়ে উঠতে পারো না। যদিও গ্রামে সমন্বিত খামার বিদ্যমান তথাপি এর চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার খুব উন্নত নয়। ফলে উৎপাদন ও আয় আশানুরুপ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পশুপাখি, মৎস্য, শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গোবর, হাঁস/মুরগির বিষ্ঠা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, খৈল, কূড়া, ভূষি ইত্যাদি দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বহলাংশে বাড়ানো সম্ভব। নিম্নে বাংলাদেশে স্বল্প আয় ও সম্পদের প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের সমন্বিত খামারের উদাহরণ দেয়া হল-

- গবাদিপশু-মাছ
- হাঁস/মুরগি-মাছ
- গবাদিপশু-মাছ-হাঁস/মুরগি
- গবাদিপশু-মাছ-শাক-সবজি
- হাঁস/মুরগি-মাছ-শাক-সবজি
- গবাদিপশু-মাছ-গাছ/লতাপাতা
- হাঁস/মুরগি-মাছ-গাছ/লতাপাতা
- ধান-মাছ-গবাদিপশু
- ধান-মাছ-হাঁস/মুরগি
- ছাগল-গাছ-লতাপাতা

২.৮.২ সমন্বয় ধাপসমূহ

প্রতিটি উপ-ব্যবস্থা আবার বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন ব্যবস্থায় আলাদা। প্রতিটি উপ-ব্যবস্থায় বহুবিধ পণ্য (enterprise) রয়েছে সেসবের অবস্থান ও গুণ কমবেশি উপ-ব্যবস্থার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। একটি উপ-ব্যবস্থা বা অঙ্গের পণ্যের সাথে অন্য উপ-ব্যবস্থা বা অঙ্গের পণ্যের নির্ভরশীলতা অথবা প্রতিযোগীতামূলক বিভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। এধরণের সম্পর্ককে আন্তঃসম্পর্ক বলে, যার সমষ্টিগত প্রভাবে সমন্বিত খামার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। উদ্যোগী কৃষক, শিক্ষিত বেকার যুবক, ক্ষুদ্র বা বড় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তা নিজ ভূমি, পুজি ও শমিক ব্যবহারের সামর্থ অনুসারে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে যে কোন ধরণের সমন্বিত খামার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে উপযুক্ত কৃষি পরিবেশ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সুবিধাদি বিবেচনায় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। একটি গবাদিপশু ভিত্তিক সমন্বিত খামার যেখানে গরু-মহিষ, বাছুর, ফসল, সবজি, মাছ ও হাঁস-মুরগি থাকবে সেটি কিভাবে ধাপে সমন্বয় করা যায় তা এখানে দেখানো হল।

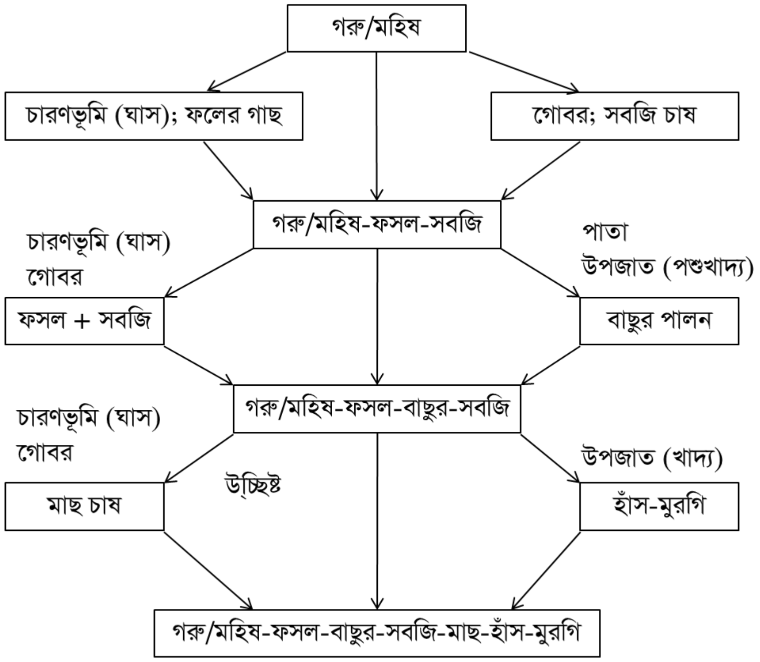

চিত্র ২.৩ঃ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি ও ফসল সমন্বিত খামারের ধাপসমূহ

২.৮.৩ সমন্বিত খামারের শর্তাবলী, সুবিধা ও অসুবিধা

কৃষি পরিবেশ অনুকূল থাকলেও সমন্বিত খামার গড়ে তুলতে হলে বিভিন্ন সম্পদ ও প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়। সম্পদ ও প্রযুক্তির এই প্রয়োজনীয়তাকে সমন্বিত খামারের শর্তাবলী বলা হয়। এই শর্তাবলী বিভিন্ন প্রকার সমন্বিত খামারে বিভিন্নতর হয়ে থাকে। সমন্বিত খামারের পাঁচটি শর্তাবলী হচ্ছে নিম্নরুপ-

- ভূমি (land)- জমি ও বসতবাড়ী ছাড়া খামার কল্পনা করা যায় না।
- পুঁজি (capital)- টাকা ছাড়া সার, বীজ, পশু, পাখি, পোনা ইত্যাদি পাওয়া যায় না।
- শ্রমিক (labour)- পারিবারিক ও ভাড়াকরা শ্রমিক এই দুটোই প্রয়োজন হয়।
- প্রযুক্তি/ব্যবস্থাপনা (technology/management)- কৃষির বিভিন্ন প্রযুক্তি ও সেসব প্রয়োগ করা।
- উৎপাদন সময় (production time)- গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি, মাছ, ফসল ইত্যাদি উৎপাদনের নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ আছে।

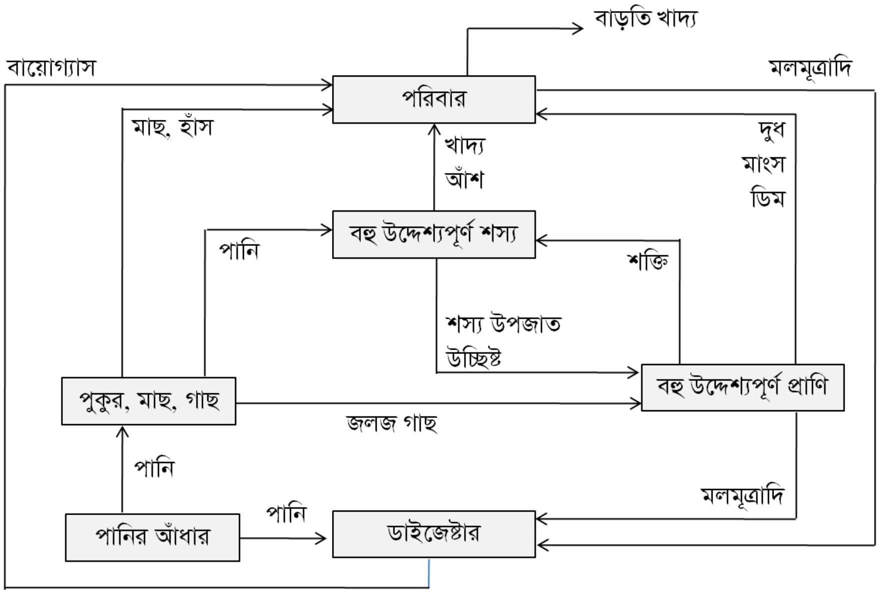

চিত্র ২.৪ঃ সমন্বিত পদ্ধতিতে পরিবার ও খামার সম্পর্কের প্রবাহ চিত্র। এই চিত্রটি নিয়েলসেন এবং প্রেসটন রচিত বই থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে (Nielsen and Preston, 1981)।

সমন্বিত খামারের সুবিধাসমূহ

বাংলাদেশের একটি সাধারণ গ্রামে অতি সাধারণ খামার হচ্ছে পশুপাখি, ফসল, মৎস্য ও কৃষিবন- এই চারটি অঙ্গে সমন্বিত সমাহার। এরুপ খামার হয় সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময়, উৎপাদনে স্থিতিশীল এবং পরিবেশে টেকসই (ILRI 1999)। এরুপ খামারের সুবিধাসমূহ নিম্নরুপ-

- প্রায় সারা বছরই উৎপাদন হয়ে থাকে। পারিবারিক ও মজুরি শ্রম দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায়।
- এক অঙ্গের (বা ফসলের) উৎপাদন পরবর্তী পরিবেশ অন্য অঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে।
- উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় করে এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে খাদ্যাভাব মিটানো যায়।
- মানুষের প্রয়োজনীয় বহু প্রকার খাদ্য একই খামার হতে পাওয়া যায়।
- পশুপাখির মলমূত্র, ফসলের উচ্ছিষ্ট/অবশিষ্ট, মাছের আঁশ, উচ্ছিষ্ট, গাছের পাতা ইত্যাদি পচিয়ে জৈব সার রুপে ব্যবহার করা যায়। পশু চাষাবাদে, মাড়াই কাজে, গাড়ী ও ঘানি টানায় সহায়তা করে।
- ফসলের খড়, কুঁড়া, খৈল, ফলের খোসা প্রভৃতি পশুপাখি ও মাছের খাদ্য রুপে ব্যবহার করা যায়।
- বিভিন্ন ফসলের গাছ, অবশিষ্টাংশ, গাছের ডাল, শাখা-প্রশাখা জ্বালানি রুপে ব্যবহার করা যায়।
- স্বল্প জমি ও অল্প পুঁজিতে খামারে উৎপাদন শুরু করা যায়।
- বিভন্ন বর্জ্য, উচ্ছিষ্ট, অবশিষ্টাংশ প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে পরিবেশ দূষণ কমে।

সমন্বিত খামারের অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশে সমন্বিত খামারের সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন-

- সমন্বিত খামার ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হয়। এজন্য দুই/তিন বছর সময় লাগে।
- কৃষি সমন্বয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণাসহ জৈবসার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হয়।
- অধিকাংশ উপকরণ খামারেই উৎপাদিত হয়, তাই এসবের ব্যবহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

- একজনকে পশুপাখি, ফসল, মৎস্য এবং কৃষিবন এই চার প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় দক্ষতা অর্জন করতে হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে ক্ষেতের ফসল, পশুপাখি ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কৌশলী উদ্যোগ নিতে হয়।
- সমন্বিত খামারে বিভিন্ন প্রকার উচ্ছিষ্ট বা বর্জ্য উৎপাদিত হয়। সেসব সঠিক ব্যবহার বা সংরক্ষণ না করলে খামার পরিবেশ দূষিত হয়।

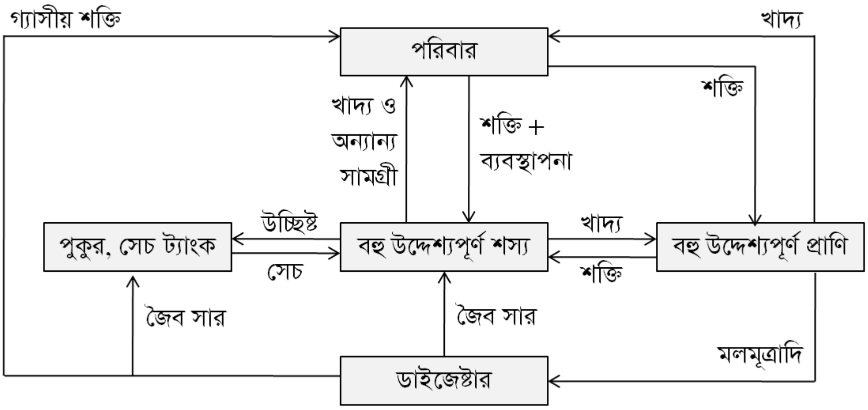

চিত্র ২.৫ঃ সমন্বিত খামারে শস্য-প্রাণিসম্পদ-শক্তির মডল। এই চিত্রটি নিয়েলসেন এবং প্রেসটন রচিত বই থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে (Nielsen and Preston, 1981)।

২.৮.৪ হাঁসের সাথে মাছের চাষ

মাছের সাথে হাঁস চাষ অত্যন্ত সফল প্রযুক্তি। এই পদ্ধতিতে মাছের জন্য কোন সম্পূরক খাদ্য না দিয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক খাদ্য দিয়ে হাঁসের ডিম পাওয়া যায়। দেশের চাষযোগ্য জমি প্রায় সবটুকুই ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে। অপর দিকে সারা দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ডোবা-নালা, পুকুর-দীঘি এবং রাস্তার পাশে অনেক পতিত জমি। এসব জলাশয়ে, পতিত জমিতে একত্রে মাছের সাথে হাঁস চাষ করে অতি সহজে নিজেদের আমিষ খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করে বাড়তি কিছু আয় সম্ভব। হাঁসের সাথে মাছ চাষে দুটি কৌশল অবলম্বন করা যায়। যথা- (১) পুকুর বা জলাশয়ে মাছ ও হাঁসের একত্রে চাষ এবং (২) পুকুর বা জলাশয় সংলগ্ন জমিতে হাঁস চাষ (শুধু মাত্র বর্ষাকালে)।

পুকুরে বা জলাশয়ে মাছ ও হাঁসের একত্রে চাষে যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হল-

- পুকুরের উপর ঘর তৈরি করলে হাঁস পালনের জন্য আলাদা কোন জায়গার প্রয়োজন হয় না। হাঁসের বিষ্ঠা একটি উৎকৃষ্ট সার। এক্ষেত্রে মাছ উৎপাদনের জন্য তেমন কোন সার ও খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।
- মাছের পুকুরে হাঁস সাতার কাটলে পানি আলোড়িত হয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় যা মাছের জন্য অপরিহার্য। হাঁস চরলে মাছ দৌড়াদৌড়ি করার ফলে শারীরিক কসরত হয় ও মাছ দ্রুত বড় হয়।
- হাঁস ডুব দিয়ে পানির তলা থেকে শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য খাদ্য অন্বেষণের সময় কাঁদার মধ্যে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস অবমুক্ত করে আসে এবং তাতে মাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পরিকল্পিতভাবে ধান ও মাছের সাথে জলাশয় সংলগ্ন জমিতে হাঁস চাষে যে সমস্ত অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় তা হলো-

- বর্ষাকালে ধানের জমিতে মাছের সাথে হাঁস চাষ করলে ডিম, মাছ ও ধানের ফলন বেশি হয়। ক্ষেতে হাঁস চরার সময় ধান গাছের গোড়ায় জন্মানো শেওলা, আগাছা ও পানা সমূহ খেয়ে ফেলে, ফলে জমিতে নিড়ানি দেয়ার প্রয়োজন হয় না।
- ধান গাছের যাবতীয় পোকা হাঁসে খেয়ে ফেলে, ফলে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হয় না। হাঁস চরার সময় ধান গাছের গোড়ার মাটি আগলা হয়, ফলে গাছের খাদ্য গ্রহণ সহজ হয় এবং ফলন ভাল হয়।

গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্র ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

৩.১ রোমন্থক পশুর হজম ও শোষণ

রোমন্থক পশুর হজম (digestion) হয় মূলতঃ রুমেন ও রেটিকুলামে জীবাণুর সহায়তায় (microbial digestion) রোমন্থক পশুর শর্করা জাতীয় খাদ্য হল ঘাস। উদ্ভিদ কোষে থাকে সেলুলোজ যা পশুর পাকান্ত্রের কোন এনজাইম হজম করতে পারেনা। তাই তৃণভোজী পশুর পাকস্থলীর জীবাণু সেলুলেজেস (cellulases) এনজাইম সৃষ্টি করে যা সহজেই উদ্ভিদের টিস্যুকে (cellulose, hemicellulose, lignin) ভেঙ্গে (fermented) ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিড (VFA) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করে। সাধারণত ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিডে এসিটিক এসিড (acetic acid 60-70%), প্রোপায়োনিক এসিড (propionic acid 15-20%) ও বিউটারিক এসিড (buteric acid 10-15%) থাকে। উল্লেখ্য, প্রোপায়োনিক এসিড থেকে গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। এছাড়া শর্করা ফারমেনটেশনের কারণে প্রধানত শতকরা ৬০ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ৩০-৪০ ভাগ মিথেন (CH_4) গ্যাস সৃষ্টি হয়। অবশ্য কিছু নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনও থাকে।

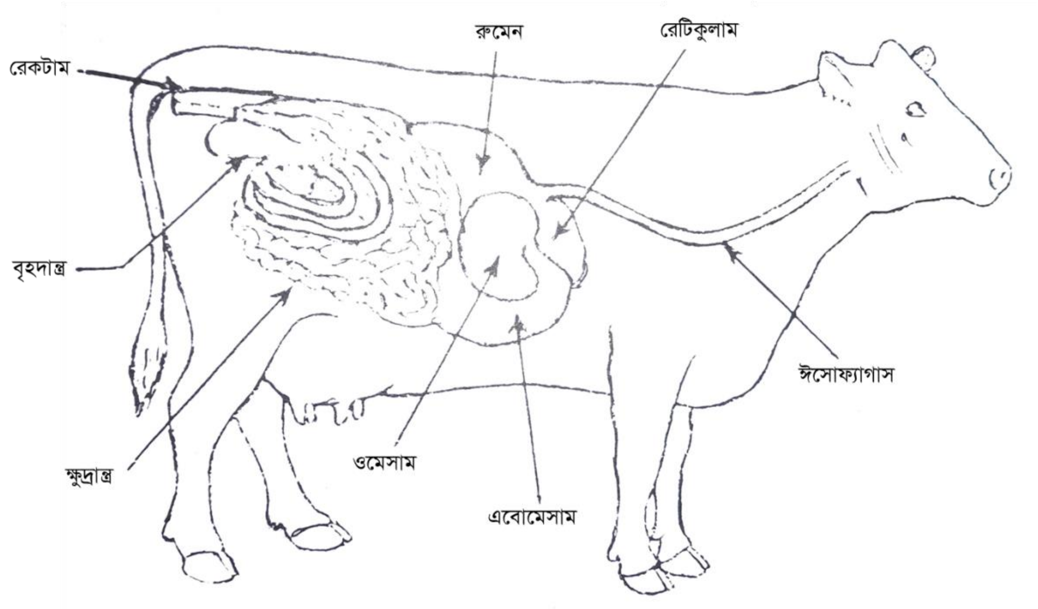

চিত্র ৩.১ঃ রোমন্থক পশুর (গাভী) পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম এবং অবস্থান।

প্রোটিনযুক্ত খাদ্য রুমেনের জীবাণুর মাধ্যমে হাইড্রোলাইসিস হয়ে এমিনো এসিড সৃষ্টি করে। পরে এমিনো এসিড ভেঙ্গে এমোনিয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড শর্ট চেইন ফ্যাটি এসিড সৃষ্টি হয়। কতিপয় এমোনিয়া বা এমিনো এসিড নতুন জীবাণুর কোষ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। লিপিড জাতীয় খাদ্যও রুমেনের জীবাণুর মাধ্যমে হাইড্রোলাইস্‌ড হয়ে গ্লিসারোল ও ফ্যাটি এসিডে রুপান্তরিত হয়। গ্লিসারোল পরে ফারমেন্টেড হয়ে প্রোপায়োনিক এসিডে এবং তা থেকে গ্লুকোজে পরিণত হয়। রুমেনের জীবাণু কোষ প্রয়োজনীয় ভিটামিন প্রস্তুত করে। তবে খাদ্যে কোবাল্টের অভাবে ভিটামিন বি$_{১২}$ এর অভাব হয়। রুমেনে তৈরি ভোলাটাইল ফ্যাটি এসিড রুমেনের প্রাচীরের মাধ্যমে শোষিত হয়। ল্যাকটিক এসিড, এমোনিয়া, ক্লোরাইড, সোডিয়ম ও পটাসিয়াম ইত্যাদি রুমেন ও রেটিকুলামের মিউকোসা দিয়ে দেহে শোষিত হয়। রুমেন ও রেটিকুলামের জীবাণু প্রথমে আম্লিক এবোমেসামে মরে গিয়ে এবোমেসাম ও অন্ত্রে হজম হয়। অবশ্য অন্ত্রের প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমসহ অন্যান্য এনজাইমের সহায়তায় জীবাণু হজম ও পরে অন্ত্রে শোষিত হয়।

৩.২ গবাদিপশুর খাদ্য

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যে সব দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে খাদ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পশু যে খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করে সেসব খাদ্যকে পশুখাদ্য বলা হয়। অর্থাৎ দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও উৎপাদনের জন্য পশু যে সকল স্বাভাবিক উপাদান বা বস্তু খায় তাদের পশুখাদ্য বা খাদ্য উপাদান (feed stuff) বলে। বিভিন্ন পশুর দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পশুখাদ্য নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-

- স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (maintenance): পশুর দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য।
- দৈহিক বৃদ্ধিসাধন (growth): বাড়ন্ত পশুর সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।
- বাচ্চা উৎপাদন (reproduction): পশু সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব তথা পশুর উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।
- দুধ উৎপাদন (milk production): পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর পশুখাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার পরিমাণ ও মান নির্ভর করে।
- প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা (daily work): পশুর কাজের ধরণ ও পরিশ্রমের উপর পশুখাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাৎ পশুশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে।
- মাংস ও উল উৎপাদন (meat and wool production): পশুর মাংস ও উল প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎকৃষ্টমানের মাংস ও উলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম পশুখাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছয় প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে। যথা- (ক) পানি, (খ) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, (গ) আমিষ বা প্রোটিন, (ঘ) চর্বি বা স্নেহ পদার্থ, (ঙ) খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস এবং (চ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।

৩.২.১ গবাদিপশুর খাদ্য সামগ্রীর শ্রেণীবিভাগ

পশুখাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পশুখাদ্য সামগ্রীকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- আশঁ জাতীয় খাদ্য এবং দানাদার খাদ্য। তবে অনেকে এডিটিভস-কে আলাদা একটি ভাগ হিসেবে দেখেন। তাই গবাদিপশুর খাদ্যকে নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা হল।

(১) আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য: যেসব পশুখাদ্যে উচ্চমাত্রায় তন্তু বা আঁশ এবং নিম্নমাত্রায় মোট হজমী উপাদান (TDN) থাকে তাদের আঁশ জাতীয় খাদ্য বলে। আঁশ জাতীয় খাদ্যে কম হজমী (less digestible) দ্রব্য বেশি থাকে এবং শক্তিকারক খাদ্য উপাদান খুব অল্প মাত্রায় থাকে। খড়, কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা গুল্ম ইত্যাদি। আর্দ্রতার পরিমাণে উপর ভিত্তি করে এই জাতীয় খাদ্য আবার দুই ধরণের হতে পারে। যেমন-

- শুস্ক আঁশ জাতীয় খাদ্য (roughages): এই জাতীয় খাদ্যে ১০-১৫% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- ধানের খড়, গমের খড়, শুষ্ক ঘাস বা হে, ডাল জাতীয় গাছের ভুষি ইত্যাদি।
- রসালো আঁশ জাতীয় খাদ্য: এই জাতীয় খাদ্যে ৬০-৯০% ভাগ জলীয় পদার্থ বা পানি থাকে। যেমন- বিভিন্ন প্রকার কাঁচা ঘাস, সাইলেজ, ফড়ার জাতীয় গাছের পাতা, মিষ্টি আলু, মুলা, গাজর, পাতাকপি ইত্যাদি।

(২) ঘনীভূত বা দানাদার জাতীয় খাদ্য (concentrates): যেসব খাদ্য বা খাদ্য মিশ্রণে উচ্চ মাত্রায় নাইট্রোজেনযুক্ত এক্সট্রাক্ট এবং মোট সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান (TDN) থাকে এবং নিম্ন মাত্রায় ক্রুড প্রোটিন (fibre) থাকে তাকে ঘনীভূত বা দানাদার খাদ্য বলে। তাই ঘনীভূত বা দানাদার জাতীয় খাদ্য বা খাদ্য মিশ্রণ সাধারণত সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ। এগুলো সাধারণত কম আঁশযুক্ত ও শুস্ক হয়। প্রধানত আমিষ এবং শর্করা জাতীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য

ব্যবহার করা হয়। যেমন- চাউলের কূড়া, গমের ভূষি, খৈল, ডালের খোসা ইত্যাদি। এই জাতীয় খাদ্য আবার দুই ধরণের হতে পারে। যেমন-

- এনার্জি সমৃদ্ধ ঘনীভূত খাদ্যঃ শস্যদানা, কৃষি শিল্পের উপজাত, লালিগুড় ইত্যাদি।
- প্রোটিন সমৃদ্ধ ঘনীভূত খাদ্যঃ উদ্ভিদ প্রোটিন, প্রাণিজাত প্রোটিন ইত্যাদি।

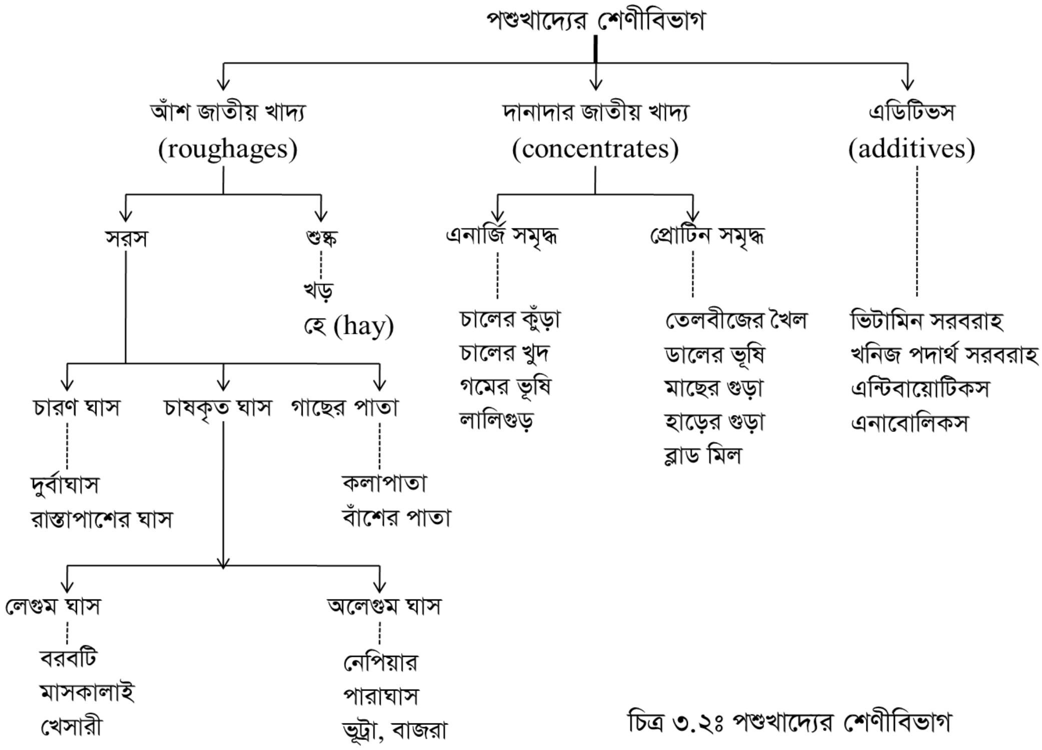

চিত্র ৩.২ঃ পশুখাদ্যের শেণীবিভাগ

(৩) এডিটিভস (additives)ঃ পশুখাদ্যকে সুষম ও পরিপূর্ণ করার জন্য এডিটিভস হিসেবে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, এন্টিবায়োটিকস এবং এনাবোলিকস মিশিয়ে খাওয়ানো হয়।

৩.২.২ গবাদিপশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত

গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর, পরিমিত দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য। আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সবুজ ঘাস গবাদিপশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, প্রজনন ক্ষমতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ গবাদিপশুর ঘরে খাদ্যশস্যের উপজাত খাইয়ে পালন করা হয়। এসমস্ত পশুখাদ্যের প্রধান উৎস আঁশযুক্ত খাদ্য খড় এবং শস্য উপজাত। কৃষকের প্রধান উদ্দেশ্য জমিতে জন্মানো সামান্য আগাছা, ফসলের উপজাত, শুকনা খড় ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে বিনা খরচে গবাদিপশু পালন করা। দুর্যোগ ও আপদকালীন সময়ের জন্য কোন কোন কৃষক বাড়ীর পার্শ্বে পতিত জমিতে অথবা অন্য কোন খাদ্যশস্যের সাথে অথবা দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু কালাই জাতীয় ঘাসের আবাদ করে থাকে। গবাদিপশুর খাদ্য যেভাবেই সরবরাহ করা হোক না কেন, সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করা উচিত-

- খাদ্যে পশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সূমহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে।
- যে সকল উপকরণ স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য, সস্তায় খাদ্য তৈরির জন্য সেসব উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ।
- খাদ্য অবশ্যই সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য হতে হবে। বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে খাদ্য তৈরি করা উচিৎ।

- খাদ্য টাটকা হতে হবে। তাছাড়া ময়লা, ছাতাপড়া, দুর্গন্ধ ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে।
- দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। খনিজ পদার্থের অভাবে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দুগ্ধদান কাল শেষে গাভী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর উদর পূর্তি হয়। খাদ্যের আয়তন বেশি হওয়া লাগবে।
- গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাস অত্যাবশ্যক। কাঁচা ঘাসে পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ আছে, তাছাড়া সহজে হজম হয়।
- খাদ্য উপাদান হঠাৎ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, প্রয়োজনে ধীরে ধীরে দিনে দিনে করতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। যেমন- ছোলা, খেসারি, মাসকলাই, ভুট্টা, গম, খৈল ইত্যাদি মিশ্রণের পূর্বে ভেঙ্গে নিতে হবে। তবে সুষমভাবে মিশানো যাবে এবং সহজে হজম হবে।
- ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন- খড়, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে পশুকে খাওয়াতে হবে। এতে যেমন অপচয় কম হবে তেমনি পশুর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমে সহায়ক হবে।
- খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে হবে।

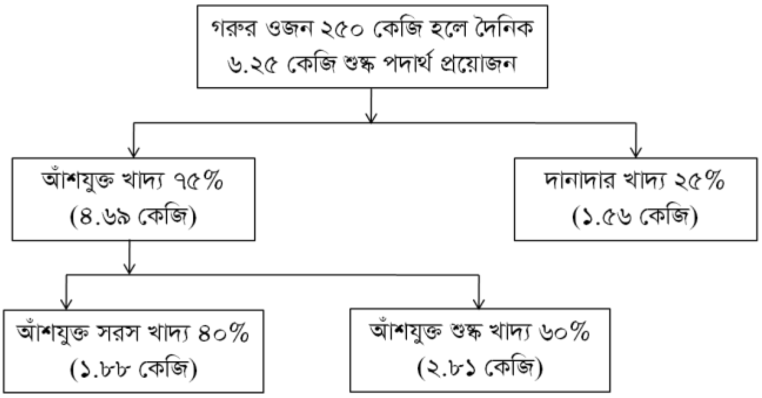

চিত্র ৩.৩ঃ গবাদিপশুর সুষম খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের আনুপাতিক হার। সাধারণভাবে বলা যায়, গবাদিপশুর খাদ্য উপাদান এই চিত্রে বর্ণিত অনুপাতে মিশ্রিত বা সরবরাহ করা হলে তা সাধারণত সুষম হয়ে থাকে।

৩.২.৩ রসদ বা রেশন এবং আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য

গবাদিপশুকে দৈনিক অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্য সমষ্টি খেতে দেয়া হয় তাকে রসদ বা রেশন (ration) বলে। দৈনিক চাহিদা ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে পশু খাদ্যকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় (Sastry and Thomas 1976)।

১। সুষম খাদ্য (Balanced ration)ঃ যেসব খাদ্য পশু দেহের দৈনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টিকর উপাদান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি পশুর জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ সুষম খাদ্যের অভাব হলে পশু তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর উপাদান পায়না ফলে তার দেহ গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

২। স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য (Maintenacne ration)ঃ পশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরবৃত্ত (physiology) বিষয়ক কার্যাবলী যথা- শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তি যোগান দেয় যে খাদ্য তাকে স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য বলে।

৩। উৎপাদক খাদ্য (Productive ration): পশু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি তার উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আবার উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণের উপর খাদ্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন, গর্ভবর্তী গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বাড়ন, বাচ্চা পশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং পশুর লাঙ্গল ও গাড়ি টানা, ভারবহন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরণের সুনির্দিষ্ট বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। সুতরাং পশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী খাদ্য ছাড়াও পশুর উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাকে উৎপাদক খাদ্য বলে।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্যঃ

- রেশন অবশ্যই সুষম হতে হবে।
- খাদ্য সহজপাচ্য হওয়া প্রয়োজন।
- খাদ্য রেচকগুণ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়
- সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা হতে হবে।
- খাদ্য রুচিকর সুস্বাদু হতে হবে।
- খাদ্যে সুঘ্রানে দুধ উৎপাদনে সহায়ক হয়।
- খাদ্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সমন্বয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩.২.৪ গবাদিপশুর খাদ্যের পুষ্টিমান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

গবাদিপশুর অবদান বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গবাদিপশুর উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও বিভিন্ন প্রকার খামার স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন ও নতুন কর্মসংস্থানের জন্য পশু পালনের গুরুত্ব এখন সর্বমহলে স্বীকৃত। ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক গবাদিপশুর ক্ষুদ্র বা মাঝারি আকারের খামার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক খাদ্যাভাব গবাদিপশুর প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে এবং প্রজনন, রোগ প্রতিরোধ ও উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এদেশে লোক বসতির ঘনত্ব ছিল কম। গবাদিপশুর স্বাধীনভাবে চরে খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত চারণভূমি ছিল। ক্ষুদ্র এ দেশটিতে বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বাস। দিন দিন জনসংখ্যা আরো বাড়ছে। তাদের জন্য বাড়তি বসতবাড়ি, অন্যান্য অবকাঠামো ও কল-কারখানা স্থাপন করতে আবাদী জমি কমছে। এ দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.২৫ একর। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে আবাদযোগ্য জমির প্রায় সবটাই ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে। এহেন পরিস্থিতিতে পশুপাখির জন্য সবুজ ঘাস উৎপাদনে আবাদযোগ্য জমির ব্যবহার দুষ্কর। তথাপিও বাড়তি জনসাধারণের জন্য আমিষ খাদ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস সৃষ্টি করার জন্য গবাদিপশু পালনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার সুযোগ নাই। ফসল উৎপাদনকে ব্যাহত না করে একই আবাদযোগ্য জমি ও বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত জমি থেকে গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদন করার জন্য প্রাণিসম্পদ বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পতিত জমিতে অথবা দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে বা অন্য কোন ফসলের সাথে আবাদী জমিতে, নতুন জেগে ওঠা চরে, পাহাড়ের ঢালে, সড়ক ও রেলপথের ঢালু এলাকায়, সরকারি খাস জমি, উপকূল, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, জমির আইল, সড়ক-জনপথ, বাড়ীর আশেপাশের পতিত স্থান এবং তুলনামূলকভাবে অলাভজনক ফসলের জমিতে উন্নত জাতের ঘাস চাষের প্রবর্তন। গবাদিপশুর জন্য সবুজ ঘাসের অভাব দূর করতে প্রয়োজন লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প জমিতে অধিক পরিমাণ ঘাস উৎপাদন। এজন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ, চারা উৎপাদন করে উৎসাহী কৃষক, খামারিদের নিকট বিতরণ করা হয়। আশা করা যায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রয়াস গবাদিপশুর সবুজ ঘাস সরবরাহ বৃদ্ধি করে গবাদিপশুর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এখানে গবাদিপশুর খাদ্যের পুষ্টিমান ও প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা হল।

খাদ্যের পুষ্টি নির্ণয়: খাদ্যের পুষ্টি নির্ণয়ের জন্য প্রধানত শক্তি উৎপাদী ক্ষমতা (energy value) এবং খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ (protein value) জানা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে খাদ্যে পুষ্টি নির্ণয় করা যায়।

১। মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদান (Total digestable nutrients = TDN)

পশু যে খাদ্য খায় তার কিছু অংশ দেহে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ মলের আকারে বের হয়ে যায়। খাদ্যের যে অংশটুকু দেহের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয়ে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে তাকে মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদান (TDN) বলে।

মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদানকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে এক কেজি সুপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এক কেজি সুপাচ্য প্রোটিনের সমান এবং এক কেজি সুপাচ্য ফ্যাট ২.২৫ কেজি সুপাচ্য কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনের সমান তাপ উৎপন্ন করে। নিম্নোক্তভাবে খাদ্যে মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদান নির্ণয় (TDN) নির্ণয় করা যায়-

টিডিএন (TDN) = (% প্রোটিন ডাইজেস্টেড) + (% শর্করা ডাইজেস্টেড) + (% NFE ডাইজেস্টেড) +
(% চর্বি ডাইজেস্টেড × ২.২৫) + (% খনিজ পদার্থ ডাইজেস্টেড)

২। সুপাচ্য ক্রুড প্রোটিন (Digestible crude protein)
সব খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ একরুপ নয়। কোন খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিন থাকলেও সবটুকু দেহে শোষিত হয় না। কিম্বা দেহের প্রয়োজনে আসেনা। তাই প্রত্যেক খাদ্যের প্রোটিন কতটুকু হজম হয়ে দেহের প্রয়োজনে লাগে তা জানা প্রয়োজন। কোন খাদ্যে প্রোটিনের যতটুকু অংশ পরিপাক হয়ে দেহের কাজে লাগে তাকে সুপাচ্য ক্রুড প্রোটিন বলে।

পুষ্টিমানের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব: নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমন্ডলীয় (ট্রপিক্যাল) অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্যে খাদ্যমান শীতপ্রধান অঞ্চলের খাদ্যমান অপেক্ষা কম। উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের লতাগুল্মাদি অধিক আঁশযুক্ত থাকে এবং পরিণত বয়সে এতে অধিক পরিমাণে লিগনিন জমা হয় যা একেবারেই অপাচ্য। সর্বোপরি সর্বমোট পাচ্য খাদ্য উপাদানের (টিডিএন) পরিমাণ বেশ কম থাকে। এ ছাড়া উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের গো-খাদ্যে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস আনুপাতিক হারে কম থাকে (জব্বার ১৯৯০)।

রাসায়নিক সংযুক্তি বা গঠনে ঋতুর প্রভাব: বর্ষাকালে ও শুষ্ক ঋতুতে গো-খাদ্যের মানের ও পরিমাণের বেশ পরিবর্তন হয়ে থাকে (Ahmed et al. 2012)। বিশেষ করে আমিষ ও আঁশের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার বেশি এবং এতদঞ্চলীয় ঘাস শীতপ্রধান অঞ্চলের ঘাসের চেয়ে কম উন্নত মানের। আবার প্রাপ্যতার কথা চিন্তা করলে বর্ষাকালে বেশি পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গো-খাদ্যের রাসায়নিক সংযুক্তি বা গঠনে বিভিন্ন ঋতুর প্রভাবের ওপর বিশেষ কোন কাজ হয়নি। বিভিন্ন ঋতুতে ঘাসের খাদ্যমানের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণির প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে উপযুক্ত খাবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা একান্ত দরকার।

খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও পাচ্যতার সম্পর্ক: উষ্ণমন্ডলীয় গো-খাদ্যের আঁশযুক্ত অংশ পরিপাক তন্ত্রে ধীরগতিতে অগ্রসর হওয়ার ফলে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায় এবং সর্বোপরি তা পশুপুষ্টিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে (জব্বার ১৯৯০)।

ঘাসে খনিজ পদার্থের পরিমাণ: বিভিন্ন ঘাসে বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থের আধিক্য দেখা যায় যেমন গিনি ঘাসে ক্যালসিয়াম বেশি পরিমাণে থাকে, শংকর জাতের নেপিয়ারে ফসফরাসের পরিমাণ বেশি থাকে, পারা বা রোড্স ঘাসে অন্যান্য ঘাস অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সোডিয়াম থাকে (জব্বার ১৯৯০)। উপরন্তু, শুষ্ক মৌসুমে ও বর্ষাকালেও ঘাসের খনিজ পদার্থের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্য উপাদানের পরিমাণের ওপর খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতির প্রভাব: বিভন্ন খাদ্যশস্য বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে খাদ্য উপাদানের পরিমাণের তারতম্য ঘটে থাকে (Al-Mamun et al. 2002)। আমাদের দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের কোন নির্দিষ্ট ষ্টান্ডার্ড বা স্বীকৃত মান নেই। চাউলের কারখানার বিভিন্ন মালিক বিভিন্ন ছাঁকনি ব্যবহার করে থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে উপজাত দ্রব্যগুলো গুদামজাত করে থাকে। এতে তাদের গুণগতমানের বিভিন্নতা দেখা যায়। অধিকন্তু খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত দ্রব্যে বিভিন্ন রকম ভেজাল মেশানো আমাদের দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে আছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, শুটকি মাছের গুঁড়ো বা হাড়ের গুঁড়োতে মাটি বা কংকর মেশানো হয়। ভালভাবে গুদামজাত করার অভাবে খাদ্যের মান বহুলাংশে কমে যায়। যেমন, চাউলের কুঁড়া বা খৈল জাতীয় খাদ্য স্যাঁতসেঁতে স্থানে রাখলে তাদের মধ্যে আফলাটক্সিন সৃষ্টি হয় এবং তা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

৩.২.৫ উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন কলাকৌশল

আমাদের দেশে গো-সম্পদ উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে গো-খাদ্যের (কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্য) অপ্রতুলতা। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে গো-সম্পদ উন্নয়ন দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যের, বিশেষ করে কাঁচা ঘাসের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এর সফলতা কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না। এর ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী দুধ ও মাংস উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে হতাশাব্যঞ্জক। এজন্য গবাদিপশু পালনকল্পে স্বতন্ত্রভাবে ঘাস চাষ অত্যাবশ্যকীয়। মূলত মানুষের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের ফলে গবাদিপশুর জন্য ঘাস চাষের আর কোন সুযোগ থাকে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাসচাষও লাভজনক। যিনি গবাদিপশু পালন করেন তিনি যদি গবাদিপশুর জন্য স্বতন্ত্রভাবে উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ করেন তাহলে সেই ঘাস তাঁর গাভীই গ্রহণ করবে এবং এর ফলশ্রুতিতে গাভীর দুধ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে যা বিক্রয় করে তিনি প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবেন। মোটকথা কাঁচাঘাস ব্যতীত গাভী পালন কোনক্রমেই লাভজনক হয় না। এজন্য যাঁদের উন্নতজাতের গাভী আছে তাঁদেরকে অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ করতে হবে। আমাদের যে সমস্ত জাতের ঘাস রয়েছে তার মধ্যে কতগুলো স্থায়ী ঘাস এবং কতগুলো অস্থায়ী বা মৌসুমী ঘাস। স্থায়ী ঘাস হল সেই সমস্ত জাতের ঘাস যা একবার লাগালে কয়েক মৌসুম বেঁচে থাকে। আর মৌসুমী ঘাস বা অস্থায়ী ঘাস হচ্ছে সেই সমস্ত ঘাস যা একবার লাগালে এক মৌসুম বেঁচে থাকে এবং একবার কেটে খাওয়ালেই শেষ হয়ে যায়। এই সমস্ত ঘাসের কতগুলো গ্রামীণ পরিবার ভুক্ত বা ঘাস জাতীয় এবং কতগুলি শুটি জাতীয়। কতগুলো গ্রীষ্মকালে জন্মে আবার কিছু শীতকালে জন্মে। তাই গো-খাদ্য উৎপাদন করতে হলে কোন ঘাস কি ধরণের এবং চাষাবাদ কি সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। এখানে উৎপাদন মৌসুম ও প্রক্রিয়ানুযায়ী ঘাসের যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে যা 'পশুখাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা' বই থেকে সংগৃহীত (রহমান ও চৌধুরী ২০০০)-

- গ্রীষ্মকালীন স্থায়ী ঘাস: নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি, সিগনাল, বাকশা, পেংগুলা, রোডস, সেটারিয়া।
- গ্রীষ্মকালীন স্থায়ী শুটি: সেন্ট্রোসিমা, গ্লাইসিন, গ্রীন লিফ ডেসমোডিয়াম, এক্সিলারিস, স্টাইলো।
- গ্রীষ্মকালীন অস্থায়ী ঘাস: টিউসেন্টি, ভূট্টা, সরগম।
- গ্রীষ্মকালীন অস্থায়ী শুটি: কাউপি, মাসকলাই, ভেচ।
- শীতকালীন ঘাস: ওটস
- শীতকালীন শুটি: বারসিম, খেসারি
- পশুখাদ্য গাছ: ডেউয়া, জগ ডুমুর, খোকসা ডুমুর, কাঞ্চন, গ্লিরিসিডিয়া, ইপিল ইপিল, মান্দার ইত্যাদি।

সারণি ৩.১ঃ আমাদের দেশের আবহাওয়ায় খাপ খায় এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘাসের চাষ পদ্ধতি।

ঘাসের নাম	জমি নির্বাচন	রোপন/বপনের সময় (মাস)	রোপন/বপনের দূরত্ব (ফুট)	বংশ বিস্তার	একর প্রতি বীজ/ চারার পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	**একর প্রতি উৎপাদন (প্রতি কাটিং/প্রতি বছর)**
নেপিয়ার	উঁচু ও ঢালু	বৈশাখ হতে আশ্বিন	২ × ১.৫	কাটিং/মুথা	১০,০০০	**বছরে ৪-৬ কাটিং, ১০-১২ টন/কাটিং**
পারা	নীচু, ঢালু ও জলাবদ্ধ	বৈশাখ হতে আশ্বিন	১.৫ × ১.৫	কাটিং/মুথা	২০,০০০	**বছরে ৪-৬ কাটিং, ৫-৬ টন/কাটিং**
জার্মান	নীচ ও জলাবদ্ধ	বৈশাখ হতে আশ্বিন	১.৫ × ১.৫	কাটিং/মুথা	১০,০০০	বছরে ৫ কাটিং, ৮-১০ টন/কাটিং
হাইব্রিড নেপিয়ার (জাম্বু)	এটেল/দোঁয়াশ	সারা বছর	ছিঁটিয়ে	বীজ	২-৩	
ডেসমোডিয়াম	উঁচু	বৈশাখ হতে শ্রাবন	ছিঁটিয়ে	বীজ	২-৩	১০-২৫ টন/বছর
ভূট্রা	বেলে-দোঁয়াশ/উঁচু	বৈশাখ হতে শ্রাবন	ছিঁটিয়ে	বীজ	২০-৩০	২০-২২ টন/বছর

ঘাসের নাম	জমি নির্বাচন	রোপন/বপনের সময় (মাস)	রোপন/বপনের দূরত্ব (ফুট)	বংশ বিস্তার	একর প্রতি বীজ/ চারার পরিমাণ (সংখ্যা/কেজি)	**একর প্রতি উৎপাদন (প্রতি কাটিং/প্রতি বছর)**
মাসকালাই	বেলে-দোঁয়াশ	বৈশাখ হতে আশ্বিন	ছিটিয়ে	বীজ	১০-১২	১০ টন/বছর
ওটস	উঁচু নিচু/দোঁয়াশ	কার্তিক	ছিটিয়ে	বীজ	২৫-৩০	১৬-১৮ টন/বছর
খেসারি	নীচু, ঢালু/ পলিমাটি	আশ্বিন হতে কার্তিক	ছিটিয়ে	বীজ	২০-২৫	৬-৮ টন/বছর

বহুবর্ষজীবি ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে যদিও ঘাসের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা যায় তথাপি অধিকাংশ ঘাসের উৎপাদন শীতকালে কমে আসে। এজন্য বহুবর্ষজীবি ঘাসের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী ঘাস এককভাবে বা সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা উচিত। খাদ্যশস্য ও ঘাসের সম্ভাব্য মিশ্র চাষ (ইমদাদুল হক ২০০৩) নিম্নে প্রদত্ত হল।

- ভুট্রা + কাউপি (শীত ও গ্রীষ্ম)
- ভুট্রা + খেসারি (শীত)
- ভুট্রা + মাসকালাই (বর্ষাকালে)
- ভুট্রা + মাসকালাই + খেসারি (শীতকালে)
- আমন ধান + খেসারি (কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস)
- আমন ধান + মাসকালাই + খেসারি (কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস)
- আমন ধান + সীম + মাসকালাই + খেসারি (কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস)
- ভুট্রা + ইপিল ইপিল (সারা বছর)

৩.২.৬ খড়ভিত্তিক রসদে লাভজনক মাংস ও দুধ উৎপাদন

এদেশে গবাদিপশুর মোট খাদ্যের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই খাড়। অথচ খড়ের পুষ্টিমান অত্যন্ত কম হওয়ায় এদেশে গবাদিপশু মারাত্বক অপুষ্টিতে ভোগে। নিচের সারণিতে খড়, কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে পুষ্টিমান দেয়া হল।

সারণি ৩.২ঃ ধানের খড়, কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যে গড় পুষ্টিমান।*

খাদ্য উপাদান	শুষ্ক পদার্থ	প্রোটিন (%)	বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল প্রতি কেজি)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম প্রতি কেজি)	ফসফরাস (গ্রাম প্রতি কেজি)
খড়	৮৫-৯০	৩-৪	৬-৭	৩.৫	১.৫
নেপিয়ার	১৫-২০	১০-১১	৮.৫-৯.০	৩-৫	৩-৪
তিলের খৈল	৯০-৯৫	৩০-৩৫	১৩-১৪	২৫	১০

* এই সারণিতে সন্নিবেশিত তথ্য বিএলআরআই প্রকাশিত ট্রেনিং ম্যানুয়েল হতে নেয়া হয়েছে (ইমদাদুল হক ২০০৩)।

তাছাড়া খড় সাধারণত খুব আঁশযুক্ত এবং অধিক আয়তনযুক্ত খাবার। ধানের খড়ে প্রচুর পরিমাণ লিগনিন (৭%) এবং সিলিকা (১৫-২০%) থাকে যার ফলে এর পাচ্যতা কখনোই ৪০-৫০% এর বেশি হয় না। পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য খড়কে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে। যেমন-

<u>ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট</u>
- ছোট ছোট করে কাটা।
- পানিতে ভিজিয়ে রাখা।

<u>বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট</u>
- এনজাইম দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- মাশরুম চাষ করা।

<u>কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট</u>
- ইউরিয়া দিয়ে খড় সংরক্ষণ।
- ইউরিয়া দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ।

৩.২.৭ ইউরিয়া দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ

গবাদিপশুর খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাবারের সাথে পরিমাণমত ইউরিয়া মিশিয়ে খাওয়ালে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বাড়ে এবং শর্করাকে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। যে সকল পশু জাবর কাটে শুধুমাত্র তারাই ইউরিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। ইউরিয়া পশুর পেটের ভেতর বিশ্লেষিত হয়ে নাইট্রোজেন মুক্ত করে যা পরে মাইক্রোবিয়াল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নাইট্রোজেন। ইউরিয়ায় শতকরা ৪৬.৭ ভাগ নাইট্রোজেন

থাকে। তাই ইউরিয়াকে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অধিক পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, যার ফলে গরু দ্রুত মোটাতাজা হয় এবং অধিক দুধ উৎপাদন করে।

খড় প্রক্রিয়াজতকরণ পদ্ধতি

আমাদের দেশে গরুকে ইউরিয়া খাওয়ানোর জন্য ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ৮২ ভাগ খড়ের সাথে ১৫ ভাগ মোলাসেস, ৩ ভাগ ইউরিয়া এবং প্রয়োজন অনুপাতে পানি মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো হয়। চিটাগুড় ও ইউরিয়া মেপে নেওয়ার পর পরিষ্কার খাবার পানিতে এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে দ্রবণটুকু সহজেই খড়ের সঙ্গে মেশানো যায়। শুকনো খড় ৮ ইঞ্চি সাইজে কেটে পাকা মেঝে বা পলিথিনের ওপর বিছিয়ে নিয়ে ইউরিয়া ও মোলাসেস দ্রবণ আস্তে আস্তে ছিটিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে খড় পাল্টিয়ে ভালভাবে দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ মেশাতে হবে। ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরির পর পরই গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে তবে কোন অবস্থাতেই তা ৩ দিনের বেশি রাখা যাবে না। নিম্নে ইউএমএস তৈরির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার দেখানো হল যাতে যে কেউ চাহিদা মাফিক ইউএমএস তৈরি করতে পারে।

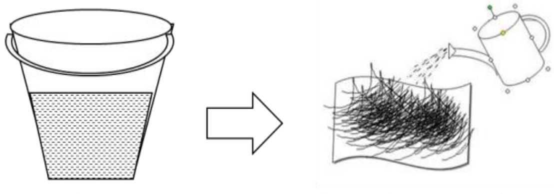

চিত্র ৩.৪ঃ ইউএমএস তৈরির পদ্ধতি।

সারণি ৩.৩ঃ ইউএমএস তৈরিতে বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার।

শুকনো খড়	মোলাসেস	ইউরিয়া	পানি
৩ কেজি	৬৩০-৭২০ গ্রাম	৯০ গ্রাম	১.৫-২.১ লিটার
১০ কেজি	২.১-২.৪ কেজি	৩০০ গ্রাম	৫-৭ লিটার
২০ কেজি	৪.২-৪.৮ কেজি	৬০০ গ্রাম	১০-১৪ লিটার
১০০ কেজি	২১-২৪ কেজি	৩ কেজি	৫০-৭০ লিটার

উল্লেখ্য যে, মিশ্রণে ইউরিয়ার পরিমাণ যেন কিছুতেই নির্দিষ্ট অনুপাতের বেশি না হয়। এতে করে বিষক্রিয়া দেখা দেবে এবং পশু মারা যেতে পারে। ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে খড়ের পুষ্টিমান বেড়ে যায়। শুকনো খড় ও প্রক্রিয়াজাত খড়ের তুলনামূলক পুষ্টিমান নিম্নের সারণিতে (ইমদাদুল হক ২০০৩) প্রদত্ত হল।

সারণি ৩.৪ঃ শুকনো খড় এবং প্রক্রিয়াজাত খড়ে তুলনামূলক পুষ্টিমান।

পুষ্টিমান	শুষ্ক খড়	প্রক্রিয়াজাত খড়
প্রোটিন (%)	৩-৫	৭-১০
পাচ্যতা (%)	৪০-৪৫	৫০-৬০
বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল প্রতি কেজি)	৬-৭	৮-৯

ইউএমএস বাছুর বা বাড়ন্ত গরু, দুগ্ধবতী বা গর্ভবতী গরু ও মহিষকে খাওয়ানো যায়। আর কোন খাবার না দিয়ে শুধমাত্র ইউএমএস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়। গাভীকে শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউএমএস খাওয়ালে গাভী প্রতি দৈনিক দানাদার খাদ্যের পরিমাণ ১.৫ কেজি কমিয়েও দুধের উৎপাদন ১ লিটার বাড়ানো যায় (ইমদাদুল হক ২০০৩)। ইউএমএস ছাড়াও বাংলাদেশে গবাদিপশুকে ইউরিয়া এবং মোলাসেস দ্বারা প্রস্তুতকৃত অন্যান্য খাওয়ানোর ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে যার দ্বারা মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির তথ্য প্রমাণিত হয়েছে (Miah et al. 2000, Mazed et al.

2004, Alam et al. 2006, Alam et al. 2009)। শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) খাওয়ালে গাভীর যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তার একটি নমুনা নিম্নের সারণিতে (ইমদাদুল হক ২০০৩) দেয়া হল।

সারণি ৩.৫ঃ শুকনো খড় এবং প্রক্রিয়াজাত খড়ে তুলনামূলক দুধ উৎপাদন।

শুকনো খড়	দানাদার	মোট	খাদ্য গ্রহণ*	যে উৎপাদন আশা করা যায়
৬.৭৫	০.৪৫	৭.২	১.৮	গরুর দৈহিক চাহিদাও পূরণ হয় না।
৭.০৫	১.৩৫	৮.৪	২.১	কোন মতে দৈহিক চাহিদা পূরণ হয়।
৬.৫০	২.৭০	৯.২	২.৩	দৈহিক চাহিদা মিটিয়েও প্রায় ৪ লিটার দুধ হতে পারে।
প্রক্রিয়াজাত খড়	দানাদার	মোট	খাদ্য গ্রহণ*	যে উৎপাদন আশা করা যায়
৮.৮০	-	৮.৮০	২.৩০	দৈহিক চাহিদা মিটিয়েও ২-৩ লিটার দুধ হতে পারে।
৮.৩০	০.৯০	৯.২০	২.৩০	দৈহিক চাহিদা মিটিয়েও প্রায় ৪ লিটার দুধ হতে পারে।
৭.৭০	২.৭০	১০.৪০	২.৬০	দৈহিক চাহিদা মিটিয়েও প্রায় ৯ লিটার দুধ হতে পারে।

* প্রতি ১০০ কেজি ওজনে।

সাবধানতা

পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এমন হাড্ডিসার গরুকে ‘ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র’ নিয়মিত খাওয়ালে গরু দ্রুত মোটাতাজা হয়। এই ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় সব ধরণের গরু মহিষকে (বাড়ন্ত, দুগ্ধবতী, গর্ভবর্তী ইত্যাদি) তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়। এর পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য পশুকে খাওয়ানো যায়। যেমন- কাঁচা ঘাস, ভূষি, খৈল ইত্যাদি। ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যে সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- পশুর বয়স অবশ্যই ৬ মাসের বেশি হতে হবে এবং পশু সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে হবে। অসুস্থ গবাদিপশুকে ইউরিয়া মিশ্রিত কোন খাবার খাওয়ানো যাবে না। ভাতের মাড় বা শুধু পানিতে গুলে বা সরাসরি দানাদার বা পাউডার ইউরিয়া খাওয়ানো যাবে না।
- ইউরিয়া প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দেয়া যাবে না। একসাথে বেশি পরিমাণ ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না। গরুকে প্রথমে অল্প অল্প করে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।
- ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য পশুকে খালি পেটে খাওয়ানো যাবে না। ইউরিয়া মোলাসেস খড় খাওয়ানোর ১ ঘন্টা আগে ও পরে পেট ভরে পানি খাওয়ানো যাবে না। যে সমস্ত গরু দিয়ে শারীরিক পরিশ্রম করানো হয় যেমন হাল টানা, গাড়ি টানা সেসব গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।
- গর্ভবতী গাভীকে গর্ভাবস্থার শেষ দিকে (৬ মাসের পর) ইউরিয়া মিশ্রিত খাবার খাওয়ানো যাবে না। ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানোর পর গরুকে অধিক রোদে রাখা যাবে না। কোন পশুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানোর পর অস্বস্তি বোধ করলে বা এলার্জিজনিত কোন সমস্যা দেখা দিলে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।
- গরুকে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ানো শুরু করলে মুখে কোন এন্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। যদি খাওয়ানো জরুরি হয় তবে গরুকে ইউরিয়া খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে এবং এন্টিবায়োটিক কোর্স শেষ করার ৭-১০ দিন পর থেকে আবার ইউরিয়া খাওয়ানো শুরু করতে হবে।
- ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়া মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করলে বিষক্রিয়ায় পশু মারা যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।
- এই পদ্ধতিতে খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশি রাখা বা খাওয়ানো যাবেনা। কারণ এসময়ের পর খড়ে ইউরিয়া ও লালিগুড়ের পরিমাণ কমে যায়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুকে প্রত্যহ ৫০ গ্রামের অধিক ইউএমএস (১.৬৭ কেজি) খাওয়ানো উচিত নয়।

ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর অসুবিধা

পশুকে ইউএমএস খাওয়ানোর জন্য প্রধানত নিম্নোক্ত তিন ধরণের অসুবিধা হতে পারে (Schiere and Ibrahim 1989)।
১। প্রচার সমস্যা - (ক) আর্থিক সীমাবদ্ধতা। (খ) কৃষকের শিক্ষার অভাব। (গ) উদ্যম ও উদ্যোগের অভাব। (ঘ) পর্যাপ্ত ঘাসের সরবরাহ থাকলে ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো প্রয়োজন হয় না। (ঙ) গাভীর দুধ উৎপাদন বা পশু থেকে আর্থিক লাভের জন্য কোন উৎস না হলেও প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোতে লাভ হয় না।
২। টেকনিক্যাল সমস্যা - (ক) উন্নতমানের খড়ের প্রয়োজন হয়। (খ) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় প্রথমে পশু খেতে চায় না। (গ) ইউরিয়া, পানি ও পলিথিনের প্রয়োজন পড়ে। (ঘ) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত অথবা স্বাভাবিক খড়ের স্তূপে ছত্রাক থাকতে পারে। (ঙ) ক্ল্যাম্পের গঠন ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। (চ) সঠিক মাত্রার ইউরিয়ায় বিষক্রিয়া হয় না। (ছ) স্বাভাবিক শুষ্ক খড়ে বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়ে ভিটামিন-এর অভাবে পরোক্ষভাবে পশুর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। (জ) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর ফলে পশুর মল গাঢ় খয়েরী বর্ণের হয়। যা দেখে মলে রক্ত রয়েছে বলে মনে হতে পারে।
৩। স্বাস্থ্য সমস্যা - (ক) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়ের স্তূপ ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির ফলে মাইকোটকসিন সৃষ্টি হয়। এই ছত্রাকযুক্ত খড় খাওয়ালে গাভীর গর্ভপাত ও ডেগন্যালা রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। (খ) অসাবধানতাবশতঃ মাত্রার অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরিয়া বিষক্রিয়ায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউরিয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ এবং করণীয়

ইউরিয়া বিষক্রিয়া হলে পশুর অস্বাভাবিক লালা ঝরে, পেট ফুলে যায়, ঘন ঘন প্রস্রাব ও পায়খানা হয়, শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংস কাঁপতে থাকে এবং লক্ষণ প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যেতে পারে। চিকিৎসার জন্য অতি দ্রুত ভেটেরিনারি চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কোন প্রকার খাদ্য খাওয়ানো যাবে না। পশু যেন শুয়ে পড়তে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পেটের গ্যাস বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। বড় প্রাণির ক্ষেত্রে ৪ লিটার ভিনেগার বা সিরকা পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়া মাংসপেশীতে ১০ মিলি পরিমাণ এট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন করা যেতে পারে। কিছুই পাওয়া না গেলে গরুকে ২০-৪০ লিটার ঠান্ডা পানি খাওয়াতে হবে।

৩.৩ বাংলাদেশে পশুপুষ্টির বর্তমান পরিস্থিতি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সেই আদিকাল থেকে কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রাণিসম্পদ। গবাদিপশুর ওপর এখন পর্যন্ত গ্রামীণ বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরশীল। গবাদিপশু উৎপাদনে চারটি মূল বিষয় হল প্রজনন, খাদ্য, পরিচর্যা ও রোগ-বালাই দমন। তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারি হল খাদ্য ও পুষ্টি। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র পুষ্টির খরচ পুরো খরচের শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ। কথিত আছে, 'ঘাসই মাংস' অর্থৎ ঘাস খেয়ে পশু তার শরীর বৃদ্ধি করে থাকে। আরও কথিত আছে 'গাভীর মুখেই দুধ' অর্থাৎ গাভী যত বেশি পুষ্টিকর খাবার পাবে তত বেশি দুধ দিবে। এককালের বাংলাদেশে কৃষকদের গোয়াল ভরা গরু আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে। গরু থাকলেও তার অবস্থা অস্থিচর্মসার। এর প্রধান কারণ পশুখাদ্যের অপ্রতুলতা। বলতে গেলে বাংলাদেশে কোন সংজ্ঞায়িত চারণভূমি নেই। তবে সবুজ ঘাস বা চারণভূমি কিছুটা আছে বলেই বাংলাদেশের পাবনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম জেলায় কিছু উন্নত জাতের গবাদিপশু পাওয়া যায় (Udo et al. 1992)। অথচ আগে আমাদের দেশে গো-খাদ্যের কোন সমস্যাই ছিল না। তখন পর্যাপ্ত চারণভূমি ছিল। তাই কৃষককে গো-খাদ্যের জন্য কোন চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু কালের বিবর্তনে এসবই রূপকথার মতো হয়ে গেছে।

গবাদিপশুর খাদ্যসামগ্রীকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- আঁশ জাতীয় (roughage) খাদ্য এবং দানাদার (concentrate) খাদ্য। আঁশ জাতীয় খাদ্য খড়বিচালিতে শক্তি ও আমিষ কম এবং তা অনেক ক্ষেত্রে পশুর প্রয়োজনীয়

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব থাকে। তাই খড়বিচালি কোনক্রমেই পশুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেটাতে সক্ষম নয়। অথচ আমাদের দেশে গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হল খুবই কম খাদ্যমানসম্পন্ন ধানের খড় যা গড়ে দৈনিক সরবরাহকৃত ঘাসের ৯০%-এরও বেশি হবে। এ সমস্ত উচ্ছিষ্টের খাদ্যমান অত্যন্ত কম বিধায় পশুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মোটেই সমর্থ নয়। বছরের কিছু অংশে কিছু সবুজ ঘাস পায় প্রধানত আইল বা রাস্তার পাশে বা পরিত্যাক্ত কোন জমিতে। কাঁচা ঘাসের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে ক্ষেতে জন্মানো বিভিন্ন জাতীয় ঘাস, রাস্তা বা পতিত জমির আশে-পাশে জন্মানো ঘাস, কচুরি পানা ও বিভিন্ন উদ্ভিদের লতা-পাতা। গবাদিপশুর জন্য স্বতন্ত্রভাবে উন্নতজাতের ঘাসচাষের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে দানাদার খাদ্য শক্তি ও আমিষ সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। ডাল জাতীয় অন্যান্য খাদ্যশস্যের উপজাত এখানে গৌণ। উন্নত দেশের মত এদেশে শস্যকণা পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য জমির অভাব রয়েছে, সেখানে পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি ব্যবহার করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পশুর উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত খাদ্যের তালিকা, খাদ্যসামগ্রীর সহজ প্রাপ্যতা, বিভিন্ন প্রাণির পয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োজনীয়তা অজানা। আমাদের দেশে এখনও পশুর রসদ প্রস্তুতকালে আমেরিকায় উদ্ভাবিত মরিসনের খাদ্যতালিকা সুপারিশ করা হয়। গবাদিপশুর খাদ্যের এ অবস্থার জন্য নানাবিধ কারণ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে (Huque and Sarker 2014)। এগুলো মোটামুটি সংক্ষেপে হচ্ছে-

- কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটাই কাজে লাগানো হয়। ফলে গবাদিপশুর মূল খাদ্য যেমন ঘাস উৎপাদন একেবারে সীমিত হয়ে পড়েছে।
- নগরায়নের জন্য নানাবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, দালান-কোঠা নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য নানা ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যাদির ফলে দারুণভাবে ভূমি-সঙ্কোচন হওয়ায় ঘাস উৎপাদনের কোনই সুযোগ থাকছে না।
- খাদ্যাভাব ক্রমাগতভাবে প্রকট হতে থাকায় গবাদিপশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছে।
- গো-খাদ্য বিশেষত দানাদার খাদ্যের (concentrate) ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও নিম্নমানের হওয়া ও তার পুষ্টিমান আশানুরূপ না হওয়া। গো-সম্পদের স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হবার ফলে এই দুরাবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটছে।

সারণি ৩.৬ঃ দেশে বর্তমান সবুজ ঘাসের প্রাক্কলিত বাৎসরিক উৎপাদন।*

জমির ধরন	ঘাস চাষ উপযোগী জমি (হেক্টর)	প্রাক্কলিত সবুজ ঘাস উৎপাদন (২ টন/হেক্টর)
ফসলের ক্ষেতে আগাছা	৩০৯,৩১২	৬১৮,৬২৩
অনাবাদী জমি	৩৮৭,৪৪৯	৭৭৪,৮৯৯
ক্ষেতের আইল	৮০৩,৪৪১	৮০৩,৪৪১
ঘাস চাষ	- - - -	৯৭,৯৭৫
মোট		২,২৯৪,৯৩৯

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ জমিতেই ধান ও অন্যান্য কৃষিজ ফসল উৎপাদন করা হয়। এর ফলে অবশিষ্ট যেটুকু জমি থাকে সেখানে গবাদিপশুর জন্য খাদ্য উৎপাদন করার তেমন কোন সুযোগই থাকে না। এছাড়াও বন্যা, খরা ইত্যাদিতো রয়েছেই। স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের উঁচু অঞ্চলে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাও পর্যাপ্ত নয়। পক্ষান্তরে বন্যাপ্রবণ এলাকায় বর্ষাকালে খাদ্য ঘাটতির ফলে গবাদিপশুর অবস্থার অবনতি ঘটে। প্রতিবছর বাংলাদেশের নদী অববাহিকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকা বর্ষা ও বন্যার পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এ সময় অতি নিম্নমানের খড়ই একমাত্র ভরসা হয়ে থাকে কিন্তু, তাও সংরক্ষণের অভাবে প্রায়শ পচে গিয়ে খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ ও পানীয় জলের দুস্প্রাপ্যতার কারণে বহু গবাদিপশু ডায়রিয়া, কৃমি, বদহজম ও অন্যান্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সারণি ৩.৭ঃ শস্যের উচ্ছিষ্ট থেকে প্রাপ্ত ঘাসের প্রাক্কলন ।*

শস্য	উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ (টন)	শস্য-উচ্ছিষ্ট অনুপাত	মোট উৎপাদন
আন	৩৪.২৬	১ঃ১	৩৪.২৬
গম	১.০৪	১ঃ১.৩	১.৩৫
ভূট্রা	১.৩৭	১ঃ৩	৪.১১
ডাল	০.৩০	১ঃ৪	১.২০
তৈল বীজ	০.২৭	১ঃ২	০.৫০
মোট			৪১.৪৬

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৮ঃ প্রাক্কলিত খৈল-ভূষি বাৎসরিক উৎপাদন ।*

শস্য	উৎপাদন (টন)	উপজাত	নির্যাস হার	উৎপাদিত উপজাতের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)
ধান	৩৪.২৬	কুঁড়া	৬%	২.০২
ধান	৩৪.২৬	খুদ	১%	০.৩৪
গম	১.০৪	ভূষি	২০%	০.২০
ভূট্রা	১.৩৭	শস্য	১০০%	১.৩৭
ডাল	০.৩০	ভূষি	৩০%	০.০৯
তৈলবীজ	০.২৭	খৈল	৭০%	০.১৮
নারিকেল	০.৩৬	খৈল	৭০%	০.২৫
তুলাবীজ	০.০০২	শস্য	১০০%	০.০০২
চিটাগুড়	- - -	- - -	- - -	০.০৭
শুটকি মাছ	- - -	- - -	- - -	০.৩০
সর্বমোট				৪.৮২

*ফৌজদার কর্তৃক রচিত ২০১০ সালের নিবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

উপরোল্লিখিত সারণিসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে মোট ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ গো-সম্পদের (গরু ২.৩৫ কোটি + মহিষ ০.১৪ কোটি + ছাগল ২.৫৪ কোটি + ভেড়া ০.৩২ কোটি) জন্য যে পরিমাণ গো-খাদ্য (সবুজ ঘাস, খৈল-ভূষি ও শস্যের উচ্ছিস্ট) উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এর ফলশ্রুতিতে গবাদিপশুকে চাহিদা অনুযায়ী কখনই খাদ্য সরবরাহ করা যায় না। সুষম খাদ্যের গুরুত্বের কথা যতোই ব্যক্ত করা হোক না কেন তা বাস্তবে প্রদান করা সম্ভব হয় না। এর ফলে গবাদিপশুর সার্বিক উৎকর্ষতা অর্জিত হচ্ছে না। এ সমস্ত কারণে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য এর সাথে নানা ধরণের রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবও (প্রধানত ক্ষুরারোগ) গবাদিপশুর সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

উত্তম ও আশানুরুপ উৎপাদন পেতে হলে খাদ্যে অবশ্যই অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের সাথে গ্লুকোজ ও গ্লুকোজেনিক যৌগ এবং প্রয়োজনীয় এমিনো এসিড থাকতে হবে। আমাদের দেশে খড়বিচালিতে উক্ত পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্যতা একেবারেই কম। তাই সঙ্গত কারণেই দেশের গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা কম এবং তা বংশগত গুণাগুণ যেটুকু বহন করে তাও পুরাপুরি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু উন্নত খাবার ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হলে গবাদিপশুর উৎপাদন অনেক বাড়ানো যাবে এবং সাথে সাথে জাতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৩.৪ বাংলাদেশে মানুষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রয়াসে পশুপুষ্টি সংকট

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন নীতির প্রধান উদ্দেশ্য দ্বিবিধ- (১) যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, (২) ডাল, তৈলবীজ, তরিতরকারি ও প্রাণিজাত খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করে দৈনিক খাদ্যের মান বৃদ্ধি করা। তবে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ওপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় বহুবিধ কারণে। খাদ্য উপাদান তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায় হল ভূমির স্বল্পতা। দেশের সকল চাষযোগ্য জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে। কৃষি খাতে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়ের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে স্বল্পসুদে ঋণদান, সার, বীজ, জলসেচ যন্ত্রের উৎপাদন ও বিতরণের ওপর ভর্তূকি প্রদান ইত্যাদি। বস্তুত সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নানাবিধ কারণে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসল ঘনত্ব বা নিবিড়তা এবং একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রধানত যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তা হল সার-বীজ-জলসেচ কেন্দ্রিক প্রযুক্তির প্রসার।

প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যেসব কৌশল নেয়ার কথা বলা হয়েছে তা হল ফসল উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পশুখাদ্য উৎপাদন সন্নিবেশিত করা, রোগব্যাধিজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সকল পশুকে রোগ প্রতিরোধ ও রোগ দমন কার্যক্রমের আওতায় আনা। শস্য উৎপাদনের জন্য কার্যক্রমগুলো যতটা বাস্তবায়িত হয়েছে প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম তেমনটা বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রধান উৎস হল খড় এবং তার সাথে সামান্য ঘাস। গবাদিপশুর পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান যেমন শস্যের উপজাত কূঁড়া, খৈল, ডালের ভূষি ইত্যাদি অনেক কৃষকের জন্যই দূরুহ। কাজেই পশুপাখির খাদ্যের পুষ্টিমান এমনিতেই খুব খারাপ। তার ওপর খাদ্যশস্য উৎপাদনকেন্দ্রিক নীতি ও কৌশল খাদ্যশস্য বহির্ভূত অন্য ফসলের উৎপাদনকেই শুধু ব্যাহত করেনি, প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদনও ব্যাহত করেছে। এ ক্ষেত্রে সম্পদের অপ্রতুলতার চেয়েও বড় কারণ হল প্রাণিজাত দ্রব্য উৎপাদনের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বটিও বাস্তবে উপেক্ষা করা হয়েছে। খাদ্যশস্য কেন্দ্রিক উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর খাদ্যের পরিমাণ ও মান উভয়ই আরও কমেছে নিম্নলিখিত কারণে-

- সুষম খাদ্যের অভাবে দেশের গবাদিপশু তাদের পুষ্টির জন্য প্রধানত খড়ের উপর নির্ভরশীল। যদিও আমাদের দেশে পতিত জমি চাষ এবং এক ফসলী জমির দোফসলী আবাদের মধ্য দিয়ে দিন দিন ধান উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু সেই অনুপাতে ধানের খড়ের পরিমাণ বাড়ছে না। খড় প্রাপ্তি কমে আসার প্রধান কারণ হল অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান চাষের প্রসার লাভ। অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ধান গাছ লম্বায় ছোট হওয়ার কারণে এ থেকে খড় উৎপাদন কম হয়। এ ধরণের খড়ে আবার লিগনিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বেশি থাকায় এদের পাচ্যতা (digestibility) অনেক কম।
- খড়ের প্রাপ্যতা কমে যাওয়ার কয়েকটি কারণ আছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় এখন অধিক জমিতে বোরো মৌসুমে ধান চাষ করা হচ্ছে। এই ধান বর্ষার শুরুতে কাটা হয়। ফলে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে খড় পচে যায় এবং তা পশুর গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে জ্বালানীর অভাব দিন দিন প্রকটতর হওয়ার কারণে জ্বালানী হিসেবে খড়ের ব্যবহারও বেড়ে চলেছে।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে উন্নত জাতের ধান বা গম উৎপাদনের হার ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ঐতিহ্যগতভাবে উৎপন্ন রবিশস্য যেমন ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু ইত্যাদির উৎপাদন কমে যাচ্ছে। তার অর্থ হল এসব ফসলের উপজাতের উৎপাদন কমেছে। উপরন্তু বিদেশ থেকে ডাল, খাবার তৈল, চিনি আমদানি করে ঘাটতি মেটানো হয় কিন্তু উপজাতগুলো সঙ্গে আসে না বলে গবাদিপশুরা তাদের খাদ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া গম চাষ সম্প্রসারণ অভিযান রবিশস্যের উৎপাদনকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় গবাদিপশু তাদের উপজাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বোবা নির্বিবাদী গবাদিপশুর ভাগ্যে এক কঠিন বিপর্যয় নেমে এসেছে।

- ক্রমাগতভাবে বেশি পরিমাণ ধান, ডাল, তৈলবীজ, ইক্ষু অটোমেটিক মিলে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। ফলে মিল থেকে এসব ফসলের উপজাত যেমন কূঁড়া, খৈল, ভূষি কৃষকদেরকে প্রায়ই কিনে আনতে হয়। অনেক ছোট কৃষকই অর্থের অভাবে সেটা করে না।
- দেশে গবাদিপশু পালনের জন্য আলাদা করে চারণ ভূমি রাখা হয় না। তবে কোন কোন অঞ্চলে কিছু প্রাকৃতিক মৌসুমী চারণভূমি আছে যেমন হওড়, বাথান, বড় বড় বিল ইত্যাদি। বিশেষত সিলেট, ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলায় কিছু নিচু এলাকা আছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে অনেক দূর থেকেও কৃষকরা এসব জায়গায় পশু চরাতে আসে। কিন্তু ভূমি পুনরুদ্ধার, জল নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, হাওড় উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে এসব প্রাকৃতিক চারণভূমির একটা বড় অংশ এখন ধান উৎপাদন এলাকায় রুপান্তরিত হয়েছে।
- উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদনের সাথে সাথে পোকামাকড় দমনের ব্যবহারও দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে ধানক্ষেতে উৎপন্ন আগাছাসমূহ গো-খাদ্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে এবং গবাদিপশুর স্বাধীনভাবে চড়ে খাওয়ার সুযোগও নিঃশেষ হচ্ছে। তাছাড়া উন্নত জাতের ধান চাষের ভাল ব্যবস্থাপনার ফলে আগাছার বংশ বিস্তারও লোপ পাচ্ছে। তাছাড়া রাস্তা বা জমির আইলের ওপর চড়িয়ে খাওয়ানোর সুযোগও এর ফলে সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

উপরিবর্ণিত সব তথ্য থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে খাদ্যশস্য-কেন্দ্রিক উৎপাদন নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিজাত খাদ্যের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর অর্জিত ফলাফল থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে এই নীতি ও কৌশল অব্যাহত থাকলে তা আত্মঘাতী হতে পারে। খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে অন্যান্য অন্যান্য শস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্যের উৎপাদন আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে দেশে উৎপাদন, বন্টন, খাদ্যগ্রহণ ও পুষ্টিমানে এমন ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে যা বড় রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যের সাথে সাথে অন্যান্য শস্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা বহুগুণ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের সনাতন কৃষিতে শস্য, পশুপাখি ও মাছের উৎপাদনের যে আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বিত রুপ ছিল তা বৈদেশিক সাহায্য ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে যত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তত তাড়াতাড়ি সকল ক্ষেত্রে বিশেষিত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। দেশের বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও অপ্রতুল সম্পদের অবস্থায় এ রকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে সনাতন কৃষির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে পরোপুরি বিসর্জন দেয়ার সময় বাংলাদেশে এখনও আসেনি বরং কৃষির বিভিন্ন অংশের আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বিত রুপকে ভিত্তি করেই উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবনের ওপর জোর দেয়া উচিত। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা দূর করার সময় এখনও আছে এবং তা কাজে লাগানো উচিত।

৩.৫ গবাদিপশুর খাদ্য উৎপদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ

বাংলাদেশে গবাদিপশুর খাদ্য ঘাটতি আরো প্রকট। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে গবাদিপশুর আঁশ জাতীয় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৫০% এবং দানাদার খাদ্য ঘাটতির পরিমান আরও বেশি। অথচ গবাদিপশুর গুণগতমান উন্নয়নের পূর্বশর্ত খাদ্য। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে গবাদিপশুর সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় এদেশে গবাদিপশু পালন করা হতো মূলত হালচাষ ও পরিবহণ কাজে ব্যবহারের জন্য। বয়ঃবৃদ্ধি অথবা কাজের অযোগ্য হলে মাংসের জন্য অথবা নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে এসব গবাদিপশু বাজারে বিক্রি করা হতো। দুধ ছিল উপজাত খাদ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবাদিপশু কৃষকের ঘরে সনাতন পদ্ধতিতে পালন করা হতো। এসব পশুর খাদ্য সাধারণত কৃষি উপজাত যেমন ধান ও গমের খড়, চাউলের কূড়া, গমের ভূষি, তৈলবীজের খৈল, জমিতে জন্মানো আগাছা, ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি। দেশের আবাদি জমির সবটাই ব্যবহার করা হতো কৃষি কাজে। তাছাড়া রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও দূরদর্শীতার অভাবে এদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গমের ভূষি, চাউলের কূড়া ও তৈলবীজের খৈল বিদেশে রপ্তানি করা হতো। অধিক জন ঘনত্বের কারণে গৃহায়ন ও অবকাঠামোগত প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে গবাদিপশুর চারণভূমি সীমিত হয়েছে, এর ফলে সৃষ্ট খাদ্যাভাব দেশে গবাদিপশুর উন্নয়ন এবং আমিষ খাদ্য হিসেবে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অনেকটাই পূরণ করতে পারেনি।

আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম মূলত পশুপাখির চিকিৎসা ও রোগ দমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে এবং পশুখাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য সংকট নিরসনে বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মূল্যায়ন কালে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে পশুখাদ্যের ঘাটতিকে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৮৫ সালে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গবাদিপশু উন্নয়নে ৪ টি মূল লক্ষ্য নির্ধরণ করা হয়।

- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় উৎপাদিত সংকর জাতের গবদিপশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস উৎপাদন।
- অধিক উৎপাদনশীল পুষ্টিকর ঘাস উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা।
- ঘাস চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রচারনা বৃদ্ধি ও ঘাস চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- দেশের গবাদিপশুর জন্য সরকারি পর্যায়ে খাদ্য কারখানা স্থাপন করে দানাদার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের ২২ টি বৃহত্তর জেলায় পশু খাদ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় সাভার দুগ্ধ ও গবাদিপশুর উন্নয়ন খামারকে কেন্দ্র করে ও রাজশাহী জেলার বাজাবাড়ীহাটে স্থাপিত হয় ঘাস উৎপাদন খামার। প্রতিটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও ২২ টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয় ঘাস উৎপাদন ও ক্যাম্পাস নার্সারি। এছাড়াও প্রতিটি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ঘাসের প্রদর্শনী নার্সারি তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব খামার ও নার্সারি থেকে কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের নেপিয়ার, পারা, গিনি, ভুট্রা, ইপিল ইপিল, কালাই জাতীয় ঘাসের বীজ ও কাটিং সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাড়ীর আঙ্গিনায়, পতিত জমি, রাস্তা ও রেল লাইনের ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ, ক্ষেতের আইল এমনকি অন্যান্য ফসলের সাথে এবং দুই ফসলের মধ্যবর্তী কালীন সময়ে ঘাস চাষের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সরকারি গবাদিপশুর খামার সমূহে দানাদার পশুখাদ্য সরবরাহ ও বেসরকারি খামার/কৃষকের নিকট সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণের জন্য ঢাকা জেলার সাভারে পশুখাদ্য করাখানা স্থাপন করা হয়।

আশির দশকের শেষার্ধে গবাদিপশু পালন লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে বিকাশলাভ করতে শুরু করে। ফলে পশুখাদ্যের চাহিদার বাড়তে থাকে। বর্ধিত এ চাহিদার প্রেক্ষিতে কৃষি উপজাত হিসেবে গমের ভূষি, কুঁড়া, তৈলবীজের খৈল, চিটাগুড় ইত্যাদি রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। দানাদার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য বিশেষ আমদানি সুবিধায় ভুট্রা, গম, সয়াবিন, কনসেনট্রেটেড আমিষ, মিনারেলস, ভিটামিন, এমাইনো এসিড ইত্যাদি আমদানির জন্য বেসরকারি খাতকে সুযোগ দেয়া হয়। একই সাথে সরকারি খামারে দানাদার হাঁস-মুরগির খাদ্য সরবরাহ এবং বেসরকারি খামারিদের নিকট নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় মুরগির খামার মিরপুর, আঞ্চলিক মুরগির খামার পাহাড়তলী চট্রগ্রাম এবং জেলা মুরগির খামার যশোর ও রংপুরে খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়। তাছাড়া উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে দেশে আরো হাঁস-মুরগির খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়। ফলে বর্তমানে দেশে পশুখাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খড় ও আঁশ জাতীয় খাদ্যের সংরক্ষণ ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য সমসাময়িক সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বেশ কিছু লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করছে যার মধ্যে ইউরিয়া দ্বারা খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসব খাদ্য দানাদার খাদ্যের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ডাক উইড, এজোলা, এ্যালজি এবং অন্যান্য অপ্রচলিত খাদ্যের ব্যবহার চালুর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

৩.৬ গবাদিপশুর উপাদন বাড়াতে পশুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির বিকল্প নাই

বাংলাদেশে গবাদিপশুর উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে চারটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যথা- খাদ্য সমস্যা, দুর্বল স্বাস্থ্য, অনুন্নত জাত ও দুর্বল খামার ব্যবস্থাপনা। অন্যভাবে গবাদিপশু উন্নয়নের অন্তরায়কে আমরা আবার দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা- পরিবেশ ও জাত। পরিবেশের মধ্যে পড়ে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও খামার ব্যবস্থাপনা।

বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবেশগত উচ্চ তাপ পীড়ন (high heat condition) এর এই দেশে গবাদপশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরিবেশ তথা পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনার প্রভাব শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগ। আবার পশুর শরীরে যদি পুষ্টির অভাব ঘটে তাহলে এরা যেমন শারীরিকভাবে দুর্বল ও কম উৎপাদনশীল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে ফলে তখন চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ফলপ্রসু হয় না। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞবৃন্দ মত প্রকাশ করেন যে, দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ গবাদিপশু আছে তাদেরকে প্রয়োজনমত খাদ্য সরবরাহ করতে পারলে এদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, রোগব্যাধি কম হবে এবং তখন এদের থেকে মাংস, দুধ ও কর্ষণ শক্তি প্রাপ্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পশুপাখির মাংস উন্নতমানের আমিষ। আমিষের অভাবে মানসিক ও দৈহিক বৃদ্ধির (বিশেষ করে শিশুদের) সংঘাতিক ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষের গড় উচ্চতা পূর্বের তুলনায় কমে গেছে। আমাদের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের অভাবই সম্ভবত এর মূল কারণ। আমাদের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে গবাদিপশুর অবদানকে খাটো করে দেখলে চলবে না। গবাদিপশু আমাদের আর্থসামাজিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ২০ ভাগ) এর সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থান প্রাণিসম্পদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে দুঃস্থ মহিলা ও গরীব কৃষক সম্প্রদায় ছাগল-ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কিছু উপার্জনের মুখ দেখে। হিসাব মতে প্রায় ৫০ ভাগ জনগণের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভর করে। এছাড়াও গবাদিপশুর গোবর ফসলের ক্ষেতে সার এবং রান্নার কাজে জ্বলানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে ফসলের জমি চাষাবাদের জন্য এখনো শতকরা ৯৫ ভাগ শক্তি আসে পশুশক্তি থেকে। অতএব দেখা যাচ্ছে গবাদিপশুর অভাবে বাংলার ক্ষেতে খামারে লাঙ্গল অচল হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষেতে ফসল ফলবে না এবং বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাতের অভাব অর্থাৎ দূর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এ ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা সমীচিন হবে যে, ৭০ দশকে যেখানে একেটি গরু থেকে প্রায় ০.২৫ অশ্ব শক্তি পাওয়া যেত বর্তমানে দেশের গবাদিপশু পুষ্টি অভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি গরু থেকে মাত্র ০.১৭ অশ্ব শক্তি পাওয়া যায়। ফলে দেশে বর্তমানে কর্ষণ শক্তি ঘাটতি প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ। দেশে রাসায়নিক সারের চাহিদার প্রায় ২০ ভাগ আসে গোবর থেকে। গবাদিপশুর চামড়া রপ্তানি করে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সম্পদের উপর আমাদের অস্তিত্ব বির্ভরশীল সেই সম্পদের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

অনেকে অবশ্য মত প্রকাশ করেন যে আমাদের দেশের গবাদিপশু জাতগত দিক থেকে কম উৎপাদনশীল। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের গবাদিপশুর ঘনত্ব বেশি থাকা সত্ত্বেও (বাংলাদেশে ১৪৫/বর্গ কিলোমিটার যেখানে ভারত ও ব্রাজিলে যথাক্রমে ৯০ ও ৫০/বর্গ কিলোমিটার) এদের উৎপাদন কম। তাদের এ ধারণা একবারে অযৌক্তিক নয়। তবে একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের দেশের গবাদিপশু নিম্নমানের খাবার, প্রয়োজনের তুলনায় অল্প পরিমাণে খেয়ে, প্রতিকূল পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও বেঁচে আছে এবং আমরা এই সম্পদ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। যুগ যুগ ধরে ব্যাপারটা চলার জন্য দেশের গবাদিপশু নিম্নমানের খাবার খেয়ে কর্মক্ষম থাকার এবং স্থানীয় রোগব্যাধি থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অপরপক্ষে বিদেশী অদিক উৎপাদনশীল পশুর জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার সরবরাহ ও উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। তাছাড়া এদের দিয়ে লাঙ্গল অথবা গাড়ী টানার কাজ করা সম্ভব নয় এবং এরা স্থানীয় রোগ ব্যাধির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ খামারির ঘরে বিদেশি গরুর উৎপাদন ব্যহত হতে বাধ্য। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত খামার, যেমন দুগ্ধ খামার, মাংস উৎপাদন খামার ইত্যাদি যেখানে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ সাধারণ ব্যবস্থাপনা উন্নতমানের রাখা সম্ভব সেখানে উন্নত জাতের গবাদিপশু থেকে ভাল ফল আশা করা যায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপশু আমদানির মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারণাটি কার্যকর করার চেয়ে দেশী গবাদিপশুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ করে একটি দেশীয় উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো বিশেষ প্রয়োজন। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে দেশি গবাদিপশু উন্নত জাতের বিদেশি গবাদিপশু দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন বাড়ানোর ধারণার চেয়ে সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতিতে স্থানীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের

মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধর ধারণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিশেষজ্ঞ মত এটাও যে দেশে বর্তমানে যে গবাদিপশু রয়েছে তাদেরকে উন্নত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা উপহার দেওয়ার মাধ্যমে এদের থেকেই আমরা পায় দ্বিগুণ উৎপাদন পেতে পারি।

৩.৭ গবাদিপশুর খাদ্য সংকট নিরসনে বাস্তবমুখী পদক্ষেপসমূহ

গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুখাদ্যের সরবরাহ বা প্রাপ্যতা বৃদ্ধি একান্ত অপরিহার্য। পশুখাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার জন্য প্রয়োজন জমির। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে খাদ্য উৎপাদন তথা শস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি করতে হচ্ছে, এবং সঙ্গত কারণেই পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য পৃথক জমি বরাদ্দের বিষয়টি ক্রমে আরো গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের গবাদিপশু থেকে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য বিকল্প উপায়ে পশুখাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। দেশে আঁশ জাতীয় আদ্যের অভাব প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং দানাদার খাদ্যের অভাব প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ। অর্থাৎ দেশে পশুখাদ্যে পুষ্টির অভাব গুরুতর; এদের মধ্যে শক্তি (energy) ও আমিষের (protein) অভাব আশঙ্কাজনকভাবে অধিক। তবে কৃষি ও শিল্পের উপজাত দ্রব্যসামগ্রীর যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করলে পশুখাদ্যে শক্তির ঘাটতি অনেকাংশ পূরণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া অপ্রচলিত আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য সঠিকভাবে ব্যবহার করে আমিষের বিরাট ঘাটতি বহুলাংশে মেটানো সম্ভব। এখন কি উপায়ে খামার উপজাত বা শিল্প উপজাত দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে ও যথাযথভাবে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

আঁশ জাতীয় খাদ্যের মানোন্নয়ন: গো-খাদ্যের মোট শুষ্ক পদার্থের শতকরা ১০ ভাগ পাওয়া যায় খড়বিচালি জাতীয় সামগ্রী থেকে। এ জাতীয় খাদ্যসামগ্রী বিভিন্ন পুষ্টির মধ্যে সাধারণত শক্তির উৎস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। এ সব খাদ্যসামগ্রী স্বভাবতই অতি নিম্নমানের হয়ে থাকে। তাই আমাদের দেশের গো-সম্পদের পুষ্টি সমস্যার সমাধানকল্পে সর্বাগ্রে খড়বিচালি জাতীয় খাদ্যসামগ্রীর মান উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিভিন্ন উপায়ে নিম্নমানের আঁশ জাতীয় খাদ্যের মানোন্নয়ন করা যায়। দেশ বিদেশে এর ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সফলতাও লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- খড় একটি নিম্ন পুষ্টিমান সম্পন্ন পশুখাদ্য তবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করা যায়। তন্মধ্যে- ক) ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় ও খ) ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া খনিজ লবণ, ডাল জাতীয় ঘাস, খৈল, শুটকি মাছের গুড়া, এজোলা, কচুরিপানা ইত্যাদি এক বা একের অধিক খড় বা বিচালি জাতীয় খাদ্যের সাথে বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থায় খাওয়ালে নিম্নমানের খড়বিচালির খাদ্যমান ও পাচ্যতা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

অপ্রচলিত উৎসের খাদ্য ব্যবহার করা: দেশে বিদ্যমান অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সঠিক ও পূর্ণ ব্যবহার করে পশুখাদ্যের লভ্যতা বাড়ানো যায়। যেমন খামার বা কৃষি শিল্পের অনেক উপজাত আছে যা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় যদিও তা বর্তমানে তেমন খুব একটা হচ্ছে না। বরং অনেক ক্ষেত্র এসব উপজাত দ্রব্যের অপসারণ কষ্ট সাধ্য এবং পরিবেশকে দূষিত করে থাকে। যেমন- গরুর রোমন্থন থলির বস্তু, কসাইখানার রক্ত, হাড়, রান্না ঘরের উচ্ছিষ্ট, ফলের শাস ও উচ্ছিষ্ট, রেশম শিল্পের উপজাত দ্রব্য, গুটি পোকার পিউপা, চা বাগানের উচ্ছিষ্ট, চিংড়ির উচ্ছিষ্ট, রাবার বীজ, শাল গাছের বীজ, কতকগুলো গাছের পাতা, কচুরিপানা, মিষ্টি আলুর পাতা, পাট পাতা, এ্যালজি, এজোলা, সুতিপানা, কচুরিপানা ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পশুখাদ্য উৎপদনে অপ্রচলিত ভূমির ব্যবহার বৃদ্ধি: ঘাস অথবা ফডার উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত জমির অভাবে যেখানে যতটুকু জমি পাওয়া যায় সেটুকুই পশুখাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যায়। যেমন- রাস্তার ধারে, বাঁধের ধারে, পতিত জমিতে, পাহাড়ী এলাকায়, চা বাগন, ফলের এবং সজি বাগানে উপযুক্ত ফডার জাতীয় গাছ লাগানো; ঘরের আনাচে, কানাচে পতিত জায়গায় এমন গাছ লাগানো যার কাঠ রান্না বান্না ও পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত এলাকায় উপযুক্ত ঘাস চাষের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পশুখাদ্য উৎপদনে কৃষি জমির বহুল ব্যবহার: কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সম্বন্ধের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের সাথে সাথে গবাদিপশুর ঘাস উৎপাদনের উপযুক্ত কর্মসূচি হাতে নেয়া যেতে পারে।

তাছাড়া বিভিন্ন শস্যের ক্ষেতে সাথী ফসল হিসেবে গো-খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়। ভূট্রা জাতীয় দ্বিমুখী জাতীয় ফসলের চাষ বাড়ানোও একটি ভাল পদ্ধতি। কারণ ভূট্রা যেমন মানুষ খেতে পারে তেমনি পশুপাখিও খেতে পারে। এছাড়া ভূট্রার গাছ ফডার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা ফসল ওঠার পর তা চমৎকার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন চাষাবাদ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের গো-খাদ্যের জাত বা প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, পুষ্টিমান ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রণয়ন জরুরি।

বনভূমির ব্যবহার: আমাদের দেশে যে বনভূমি রয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করেও গো-খাদ্যের কিছুটা চাহিদা মেটানো সম্ভব। এসব বনভূমিতে যেসব গাছ রয়েছে তাদের ফাঁকে ফাঁকে গো-খাদ্যের চাষ করা একটা সুন্দর পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশ এ পদ্ধতিতে ঘাস উৎপাদন করে আসছে। বৃক্ষরাজির সাথে ইন্টারক্রপ বা আন্তঃফসল হিসেবে ঘাস উৎপাদন করে অনেকে লাভবান হয়েছেন। যেমন, নারিকেল গছের ফাঁকে ঘাস উপাদন, পাম বাগানে ঘাস চাষ এবং রাবার বাগানে ঘাস চাষ। এসব জায়গায় গো-চারণ করে আশানুরুপ ফললাভ হয়েছে। গবেষকগণ আগাছা বৃদ্ধি রোধ, মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে বেশ ভাল ফল পেয়েছেন। আমাদের দেশেও এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পশুখাদ্যের ঘাটতি কিছুটা কমানো সম্ভব হবে।

হাওড়-বাওর ব্যবহার: বাংলাদেশের হাওড়-বাওরে নানা রকম ঘাস জন্মায়। এসব এলাকায় বর্ষাকালে সাধারণত অন্য কোন অর্থকরী ফসল হয় না। এসব জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের চাষ করে খুব ভাল ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব উৎপাদিত ঘাস সঠিক প্রক্রিয়াজত ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ঘাসের অপ্রতুলতা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। এ ছাড়া আধুনিক কৌলি ও প্রজনন বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এ সমস্ত হাওর ও বিলে উপযুক্ত ঘাসের চাষ করা যেতে পারে।

পশুখাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া: বাংলাদেশে সার্বিকভাবে পশুখাদ্যের অভাব থাকলেও বিশেষ বিশেষ ঋতুতে ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন পশুখাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত পশুখাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিলে খাদ্যাভাবের সময় অথবা খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- ক) বর্ষা মৌসুমে ভিজা ও তাজা খড় সংরক্ষণ, খ) সবুজ ঘাস সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রাপ্ত খাদ্যের পুষ্টি ভিত্তিক সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা: বাংলাদেশের কৃষক এবং সধারণ খামারিদের পশুপুষ্টি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে তাদের পক্ষে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রীর সমন্বয়ে সুষম পশুখাদ্য তৈরি করা সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যায়, অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রী কৃষক তার গবাদিপশুকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাওয়ায় এবং খাদ্য সামগ্রীর এ ধরণের অদক্ষ ব্যবহারের জন্য পশুখাদ্যের প্রচুর অপচয় হয়। এই অপচয় রোধে প্রয়োজন অঞ্চল ও ঋতু ভিত্তিক খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্তির তালিকা প্রণয়ন করা এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ঋতুভিত্তিক সুষম অথচ সস্তা খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে তা কৃষকদের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া।

দুষ্প্রাপ্য পশুখাদ্যের অপব্যবহার রোধ করা: উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- গ্রামাঞ্চলে জ্বালানির অভাবের সময় ধানের খড় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার কারা হয়। প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবেও এই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পশুখাদ্যের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। খড় ও অন্যান্য পশুখাদ্যের এ ধরণের অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা: অনেক খাদ্য উপকরণ দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে সেগুলি অপচয় হচ্ছে এবং উৎপাদন এলাকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত খামারিকে একই খাদ্য উপকরণ অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়- চিনিকলগুলিতে প্রতি কেজি মোলাসেসের মূল্য মাত্র ১ টাকা। একই মোলাসেস দূরত্বভেদে খামারিদের ক্রয় করতে হয় ৪ টাকা থেকে ১২ টাকা দরে। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে মোলাসেস ও স্টিলেজের পশুখাদ্য হিসেবে চহিদা থাকা সত্ত্বেও এগুলি অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে এবং মিল কর্তৃপক্ষ সেগুলি ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সমন্বিত গবেষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া: দেশে পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। কৃষি, বন ও বিভিন্ন শস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিক ফলনের উপর গবেষণা চালানোর সময় পশুখাদ্যের দিকটি বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজন প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প হাতে

নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের পশুর প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের সহজ উপায় বের করার জন্য অন্যতম পন্থা হিসেবে খাদ্য খাওয়ার পদ্ধতির ওপর বিশেষভাবে গবেষণা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে গো-খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, খাদ্যের নিম্ন গুণাগুণসম্পন্নতা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের দেশীয় সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিসমূহকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য দেশের সমস্ত স্তরের খামারি ভাইদেরকে খাদ্য সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে (NGO) এ বিষয়ে এক যোগে কাজ করতে হবে। আমাদের কৃষকভাইদেরকে এ সকল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিসমূহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এ বিষয়ে তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে। গো-খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সীমিত চাষযোগ্য জমি এবং উৎপাদিত পশুখাদ্যের পরিমাণ যেহেতু চাহিদার তুলনায় অনেক কম সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প এবং অপ্রচলিত খাদ্যের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। গো-খাদ্য বিশেষ করে কাঁচা ও ভেজা ঘাস, ভুট্টার কান্ড, ভেজা ও শুকনো খড়, আখের উপজাত, কলাগাছ ও কচুরিপানা সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া দরকার। এ সমস্ত পশুখাদ্য যদি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন গো-খাদ্যের পচনরোধ করা যায় তেমনি অপর পক্ষে খাদ্যের ঘাটতি বহুলাংশে মেটানো সম্ভব। শুধু তাই নয় বরং দীর্ঘস্থায়ী পশুখাদ্যের ঘাটতি পূরণ করে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা অবশ্যই বৃদ্ধি করা যেতে পারে। আলোচিত ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে আপৎকালীন পর্যাপ্ত গো-খাদ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী দুধ ও মাংস উৎপাদনের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে দেশ অনেকটা এগিয়ে যাবে সেটা নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করা যায়। উল্লেখ্য, এ সকল ব্যবস্থাদি পরিবেশবান্ধব এবং খামারিকে দুর্যোগের সময় উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত রেখে গবাদিপশু পালন ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন রেখে দুধ ও মাংস উৎপাদনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে পশুখাদ্যের পরিমাণ ও মানগত চাহিদার চেয়ে প্রাপ্যতা যদিও বহুলাংশে কম তথাপি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় বা পন্থা অবলম্বন করে এ বিশাল ঘাটতির অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। আলোচ্য বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সম্যক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজন দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করানো। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সম্প্রসারণ কর্মসূচি হতে নেওয়া। পরিশেষে বলা যায়, আমরা যদি পশুখাদ্যের এই সঙ্কট সম্পর্কে সচেতন হই, পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক হই এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই তাহলে এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। পশুখাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, নিম্নমানের পশুখাদ্য, নিম্নহারে খাদ্য গ্রহণ, পাচ্যতার নিম্নহার, বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাব, আমিষ বা শক্তি উৎসের তথা খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি এসব কিছুর মধ্যেই গবাদিপশুর উন্নতিকল্পে পশুপুষ্টি বিজ্ঞানীদের সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৮ অপ্রচলিত খাদ্যসমূহের কার্যকর ব্যবহার

গবাদিপশু মানুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী ঘাস, খড়, লতা-পাতা, কূঁড়া-ভূষি প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করে মানুষের জন্য উন্নতমানের সুষম খাদ্য তৈরির ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতা আছে। গবাদিপশু মানুষের খাদ্যের প্রক্রিয়ার সাথে কখনো প্রতিযোগীতা করে না বরং মানুষের খাদ্যের উচ্ছিষ্ট পশু উপজাত খেয়ে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরি করে থাকে। যেহেতু বর্তমানে আমাদের দেশ খাদ্যে (প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদিকে বিবেচনায় না এনে) স্বয়ংসম্পূর্ণ সেহেতু ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ দিয়ে খুব সহজে এদেশের গবাদিপশুর খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায় এবং সেই সাথে পূরণ করা যায় খাদ্যের অন্যান্য জরুরি উপকরণের ঘাটতি অর্থাৎ প্রাণিজ আমিষ, ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদির।

আমাদের দেশে গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যয়িত মোট অর্থের ৭০% হচ্ছে খাদ্য বাবদ যা প্রকৃতপক্ষে খামারির লভ্যাংশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশে ১৫ মিলিয়ন টন খাদ্যের চাহিদার বিপরীতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১.৩৭ মিলিয়ন টন যা গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এর মধ্যে আমিষের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত প্রায় সব খাদ্য উপাদানসমূহের বেশির ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে।

আমাদের চারপাশে এমন অনেক প্রচলিত এবং অপ্রচলিত খাদ্যদ্রব্য আছে যা সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে গবাদি এবং পোল্ট্রির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় (IAEA 2006)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব অপ্রচলিত খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার সঠিক কারিগরি জ্ঞান আমাদের না থাকায় আমরা এসব ব্যবহার করতে পারছি না। অথচ আমরা যদি কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসকল অপ্রচলিত খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে উন্নত মানের খাদ্য তৈরি করতে পারি তাহলে তা দিয়ে গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি শিল্পের জন্য খাদ্য ক্রয়বাবদ ব্যয় অনেকটা কমানো যাবে আবার পরিবেশ দূষণ অনেকটা রোধ করা যাবে। এমন ধরণের কিছু অপ্রচলিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণের পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হল-

পোল্ট্রির নাড়িভূড়ি (intestinal waste): মুরগি জবাই-এর পর মাংস প্রক্রিয়াজাত করার সময় পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ বর্জ্য হিসাবে ফেলে দেয়া হয়। অথচ এতে রয়েছে উচ্চমানের আমিষ যা সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে পোল্ট্রি এবং গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এজন্য মুরগির পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে ভালভাবে ধুয়ে পরিস্কার করে একটি পাত্রে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উত্তাপ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে তা নামিয়ে ঠান্ডা করে ছোট ছোট করে টুকরো করে রৌদ্রে শুকাতে দিতে হবে অথবা ওভেনে ৭০০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শুকানো যেতে পারে। এগুলো ভালভাবে শুকানোর পর গুঁড়ো করে পোল্ট্রি এবং গবাদিপশুর খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা যায়।

হ্যাচারি উপজাত (hatchery waste): হ্যাচারি উপজাতের মধ্যে রয়েছে ডিমের খোসা, মৃত ভ্রূণ, অপরিপক্ক মৃত বাচ্চা, অনুর্বর এবং পচা ডিম ইত্যাদি। হ্যাচারির বর্জ্য হিসাবে এসব উপজাতকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে আমিষের উৎস হিসাবে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি এভাবে পরিবেশকেও দূষণমুক্ত রাখা যায়। এ উদ্দেশ্যে হ্যাচারির উপজাত একটি বড় পাত্রে নিয়ে পরিমাণ অনুযায়ী পানি দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে তাপ দিয়ে (প্রায় ৩০ মিনিট) সেদ্ধ করতে হয়। সেদ্ধ হয়ে যাবার পর আগের পদ্ধতিতে এসব গুঁড়ো করতে হবে।

পশুর রক্ত (blood meal): কসাইখানায় পশু জবাই-এর সময় প্রচুর রক্ত নির্গত হয়। এসব রক্ত একটি চৌবাচ্চা বা গর্তে জমা করতে হবে। সেখানে থেকে কোনো ড্রাম বা পাত্রে নিতে হবে। জমাট বাঁধা রক্তের দলা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য হাতে গ্লোভস ব্যবহার করতে হবে। এরপর রক্তের মোট ওজনের ১% ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) মিশাতে হবে। এবারে ১০% গমের ভূষি এর সাথে সংযোগ করে হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশাতে হবে। মিশানোর সময় কোনো দলা থাকলে তা হাত দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে হবে। মেশানোর প্রক্রিয়া শেষ হলে তা রৌদ্রে ভালোভাবে শুকাতে হবে। পরে ওভেনে ৬০-৭০$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একদিন ভাল করে শুকাতে হবে। এরপর গুঁড়া করে পোল্ট্রি এবং গবাদিপশুর খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা যাবে।

চামড়ার উপজাত (leather waste): চামড়া শিল্পে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার সময় অনেক উপজাত বর্জ্য হিসাবে পাওয়া যায় যা ফেলে দেয়া হয়। এই সব উপজাত সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে আমিষের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। একে 'কোলাজেন মিল' (Colagen meal) বলে। এটা প্রস্তুতের জন্য প্রতি ২০ কেজি চামড়ার উপজাতের জন্য ১.৭ কেজি Ca(OH)২ (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) ১০০ লিটার পানিতে গুলে উপজাত দ্রব্যাদি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর তা তিনবার পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এপর প্রতি ২০ কেজি চামড়ার উপজাতের জন্য ২ লিটার H2SO4 (সালফিউরিক এসিড) ১০০ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করে তার মধ্যে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সময় শেষ হলে আবারও পানি দিয়ে ভালভাবে তিনবার ধৌত করতে হবে। এরপর ১০০ লিটার পানিতে ১ কেজি খাবার লবণ (NaCl) গুলে তার মাঝে উপজাত দ্রব্যাদি ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে সেগুলো পানি দিয়ে তিনবার ধুতে হবে। এরপর এগুলো হাত দিয়ে ভেঙ্গে ছোট টুকরো করে রৌদ্রে শুকাতে হবে। এগুলো ভালভাবে গুঁড়া করার জন্য ওভেনে ৬০-৭০$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেডে দুই দিন শুকাতে হবে। এই উপজাতে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ থাকে।

চিটাগুড় (molasses): চিটাগুড় পশুখাদ্যের জন্য অন্যতম শক্তি সরবরাহকারী উপাদান এবং মিনারেলস সমৃদ্ধ উপাদেয় পশুখাদ্য। বাংলাদেশে উপযুক্ত বিপনন ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার ফলে বর্তমানে বৎসরে বেশ কয়েক লক্ষ টন চিটাগুড় চিনিকল এলাকাসমূহে অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যায়। উপযুক্ত বিপনন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের চিটাগুড় ব্যবহার করে গবাদিপশুর উঁচুমানের খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে।

ডাক উইড (duck weed): বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ডোবা-নালা, পুকুর এবং বদ্ধ বা স্রোতহীন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে ডাক উইড পাওয়া যায়। এটা একজাতীয় আগাছা। এতে ৫০% পর্যন্ত আমিষ, পশুপাখির জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডসমূহের অনেকগুলো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন এ এবং ডি থাকে যা পশুপাখি এবং মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। হাঁস-মুরগির খাদ্যে 'ডাক উইড' ব্যবহার করলে ডিম উৎপাদন, ডিমের ওজন ও ডিমে আমিষ এবং ক্যারোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। গো-খাদ্যে এটা ব্যবহার করলে মাংস এবং দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়। জলাশয় থেকে ডাক উইড সংগ্রহ করার পর ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। শুকানোর পর তা আবার ওভেনে (৬০-৭০$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেড) ২৪ ঘন্টা শুকাতে হবে। এরপর গুঁড়ো করতে হবে। এজাতীয় গুঁড়ো ডাক উইড ছাড়াও সবুজ ডাক উইডও ব্যবহার করা যায়।

ইপিল ইপিল পাতা: রাস্তার দুই ধারে তেঁতুল পাতার মত পাতা বিশিষ্ট বহু ইপিল ইপিল গাছ দেখা যায়। এ সকল ইপিল ইপিল পাতা গবাদি এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দেড় মাস অন্তর বছরে ২ বার কচি ডগাসহ পাতা সংগ্রহ করে রাখা যায়। পাতা সংগ্রহ করে রৌদ্রে ভালভাবে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বস্তায় ভরে রাখলে শুকনো মৌসুমে পশুপাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই পাতাতে ২৩-২৪% আমিষ থাকে। এছাড়া ক্যালসিয়াম এবং ফরফরাস থাকে ১৫:১ অনুপাতে। ইপিল ইপিলের কাঁচা পাতা শুকনো খড় এবং চিটাগুড়ের সাথে মিশিয়ে গবাদিপশুকে খাওয়ালে দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য খাদ্যের সাথে ইপিল ইপিলের শুষ্ক পাতা ৪০-৫০% হারে মিশিয়ে উন্নতমানের খাদ্য হিসাবে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

ক্লোরিলা: ক্লোরিলা এক ধরণের এক কোষ বিশিষ্ট মাইক্রো-এ্যালজি, যা পোটিন, ভিটামিনস, মিনারেলস ও ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ। এই ক্লোরিলা ডেইরি শিল্পের জন্য কাঁচা ঘাসের বিকল্প আদর্শ পশুখাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটা কম খরচে উৎপাদনের প্রযুক্তি এখন বাংলাদেশের ডেইরি খামারিগণের অনেকের জানা আছে। আমাদের দেশে উৎপাদিত ঘাসের চেয়ে অনেক বেশি পুষ্টিমান সম্পন্ন এই শেওলা উৎপাদনের জন্য খুব অল্প পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হয়। পঞ্চাশটি গাভীর দৈনিক কাঁচা ঘাসের চাহিদা মিটানোর জন্য মাত্র পাঁচ শতাংশ জমির প্রয়োজন। অপরদিকে প্রতি গাভীর কাঁচা ঘাসের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দশ শতাংশ অর্থাৎ পঞ্চাশটি গাভীর জন্য ঘাস চাষের জন্য প্রয়োজন প্রায় ৫০০ শতাংশ বা ১৫ বিঘা। ক্লোরিলা উৎপাদনের এই প্রযুক্তি বাংলাদেশ ডেইরি শিল্পের বিকাশের পথকে সুগম করেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের অপ্রচলিত খাদ্যের পর্যাপ্ততা রয়েছে। যে সকল স্থানে যে ধরণের অপ্রচলিত খাদ্য পাওয়া যায় তা দিয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিতে খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায়। এ সকল খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করার সময় প্রাথমিকভাবে সামান্য ব্যয় হয়ে থাকে যা পোল্ট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত প্রচলিত খাদ্য ক্রয়ের তুলনায় অনেক কম। প্রক্রিয়াজাত এজাতীয় অপ্রচলিত খাদ্য ব্যবহারের ফলে খামারের খাদ্য খরচ অনেক কমে যাবে। এছাড়া গুণগত মানের দিক থেকেও এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তবে খামারে প্রচলিত খাদ্য প্রদান হঠাৎ বন্ধ করে এ জাতীয় অপ্রচলিত খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। পশুপাখিকে অপ্রচলিত খাদ্য প্রথমে অল্প পরিমাণে প্রদান করে অভ্যস্ত করে নিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। সঠিক কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এ সকল অপ্রচলিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করে পোল্ট্রি এবং গবাদিপশুকে নিয়মিত প্রদান করে দেশের খাদ্য ঘাটতি সমস্যা হ্রাস করা যেতে পারে। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম যথেষ্ট সহায়কা ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৯ সবুজ ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি

দেশের বিভিন্ন এলাকা ও ঋতু ভেদে ঘাসের প্রাপ্যতা ভিন্নতর হয়ে থাকে। নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে এবং উঁচু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে যথেষ্ট সবুজ ঘাস জন্মায়। এ সময়ে ঘাসের প্রাপ্যতা বেশি হওয়ায় উক্ত অঞ্চলে উদ্বৃত্ত ঘাস নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই ঘাস যদি বৈজ্ঞানিক প্রদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে বছরের অন্যান্য সময়ে যখন ঘাসের অভাব ঘটে তখন তা দিয়ে সহজেই খাদ্যাভাব পূরণ করা যায়। শুধু তাই নয় এর ফলে খাদ্যের পুষ্টিমানও সমৃদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় কিভাবে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। প্রধানত

তিনটি পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- ক) শুকিয়ে সংরক্ষণ, খ) হিমায়িত করে সংরক্ষণ এবং গ) রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সংরক্ষণ।

শুকিয়ে সংরক্ষণ: কাঁচা বা ভেজা খড়কে রৌদ্রে শুকানো হলে সে ঘাস আর নষ্ট হয় না; তবে এমনভাবে শুকাতে হবে যেন ঘাসের আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বা তার কাছাকাছি হয়। আর্দ্রতা কম থাকায় জীবাণুর বিস্তার ও অন্যান্য এনজাইমের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায় এবং এ কারণেই ঘাস বা খড় আর পচে না।

হিমায়িত করে সংরক্ষণ: বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা, বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়ার কারণে ঘাস ঠিক মতো শুকানো যায় না। এর ফলে আর্দ্র পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, ঈস্ট এবং কাঁচা ঘাসে বিশেষ ধরণের এনজাইমের প্রভাবে ঘাস/খড় দ্রুত পচে যায়। এভাবে দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ঘাস/খড় পচে খাদ্য সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করে। ভেজা ঘাস বা খড়কে হিমাঙ্কের নিচে অর্থাৎ ১ থেকে মাইনাস ২০$^{\circ}$ সেন্টিগ্রেডে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা গেলে সেখানে এনজাইম ও জীবাণুর কর্মতৎপরতা স্থগিত হয়ে যায়। ফলে ঘাস/খড় আর পচে না। তবে এ পদ্ধতি আমাদের দেশে অনুসরণ করা বাস্তবসম্মত নয়।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ: এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল অম্লীয় বা ক্ষারীয় অবস্থা সৃষ্টি করে জীবাণু ও এনজাইমের কার্যক্রমকে প্রতিহত করে ঘাস/খড় সংরক্ষণ করা। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে।

৩.৯.১ সাইলেজ ও সাইলো কি?

সাইলেজ হল বায়ুশূন্য গাঁজনের (ফারমেন্টেশন) মাধ্যমে উৎপন্ন উচ্চ আদ্রতাসম্পন্ন সবুজ ঘাস। সাইলো হল একটি বায়ূশূন্য আঁধার যার মধ্যে গাঁজন প্রক্রিয়া ঘটিয়ে সবুজ ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের দেশে সহজপ্রাপ্য চিটাগুড় অবায়বীয় পরিবেশে সংরক্ষণকারক হিসাবে সহজেই ব্যবহার করা যায়। আবার স্বল্প মূল্যের ইউরিয়া সারও একই পদ্ধতিতে ব্যবহার করে অনুরূপ সুফল পাওয়া যায়। সাইলোর মাঝে এনারোবিক অবস্থা বিরাজ করায় সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান ও গুণাবলী অপরিবর্তিত থাকে। তাই শুষ্ক খড় বা ঘাস (hay) অপেক্ষা সাইলেজের খাদ্যমান অনেক বেশি থাকে।

সাইলেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত ঘাস: সাইলেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত সবুজ ঘাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রবণীয় সুগার থাকা প্রয়োজন। ভুট্টা ও সরগাম সাইলেজ তৈরির জন্য সবচেয়ে ভাল ঘাস (যে ঘাসে ৬৫-৭০% পানি ও ৩০-৩৫% শুষ্ক পদার্থ থাকে তা সাইলেজের জন্য উপযুক্ত)। ঘাসের জলীয় অংশের শতকরা পরিমাণ অবশ্যই বেশি হতে হবে। খুব শুষ্ক ঘাস সাইলোতে রাখলে তার মধ্যে বাতাস থাকার দরুণ মোল্ড (ফাংগাস) উৎপন্ন হয়। যদি ঘাসে মধ্যে জলীয় অংশ বেশি থাকে তবে সাইলেজ বেশি টক বা একবারে নষ্ট হবে বা পচে যাবে। এছাড়া নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, ওট ইত্যাদি ঘাস খুব সহজেই সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ভূট্টা, সরগাম, নেপিয়ার ইত্যাদি ঘাসের সঙ্গে শিম জাতীয় ঘাস (খেশারি, মাসকালাই, গোমটর ইত্যাদি) মিশিয়ে উন্নতমানের সাইলেজ তৈরি করা যায়। ডাল বা লিগুম জাতীয় ঘাস যেমন খেসারি, মাসকালাই, কাউপি, ইপিল ইপিল ইত্যাদি ঘাসও সবুজ অবস্থায় সাইলেজ করে রাখা যায়। তবে এ জাতীয় ঘাসে অধিক পরিমাণে আমিষ থাকে বিধায় শুধুমাত্র ডালজাতীয় ঘাস দ্বারা সাইলেজ করলে উচ্চমানের নাও হতে পারে। এজন্য এক্ষেত্রে এ ধরণের ঘাসের সাথে নন-লিগুম জাতীয় ঘাস যেমন ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদি সর্বোচ্চ ১ঃ১ বা সর্বনিম্ন ১ঃ৩ অনুপাতে মিশিয়ে চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ করা উচিত। মিশ্রিত ঘাসের স্তরে স্তরে খড় দেয়া ভাল। নন-লিগুমজাতীয় ঘাস না পাওয়া গেলে শুকনো খড়ের সাথে মিশিয়েও সাইলেজ প্রস্তুত করা যায়।

৩.৯.২ সাইলেজ তৈরীর নীতি ও সাইলো পিটের বৈশিষ্ট্য

ল্যাকটিক এসিড উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া প্রকৃতিগতভাবে শস্য/ঘাসের মধ্যে থাকে। এসব ব্যাকটেরিয়া এনোরবিক/বায়ুশূণ্য অবস্থায় ঘাসের সুগার এবং দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট হতে গাঁজন (ফারমেন্টেশন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে। এতে ঘাসের P^{H} কমে যায়। ফলে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি (বিউটারিক এসিড

উৎপন্নকারী কলষ্ট্রিডিয়া এবং এসিটিক এসিড উৎপাদনকারী কলিফরম নামক ব্যাকটেরিয়া) বন্ধ হয়ে যায় এবং সাইলেজ হিসাবে ঘাস সংরক্ষিত থাকে। এনোরবিক অবস্থা বজায় রেখে সাইলেজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। এখানে সাইলো পিটের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল-

- সাইলো পিটের দেয়াল বায়ু নিরোধক হবে এবং এর দেয়াল অবশ্যই শক্ত ও মসৃণ হবে। সাইলো পিটের দেয়াল শক্ত ও দৃঢ় হতে হবে যাতে পিটের মধ্যে ঘাসের ফারমেন্টেশন থেকে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সহ্য করতে পারে।
- ব্যাসের তুলনায় সাইলো পিটের উচ্চতা দুই গুণের বেশি হবে। সাইলো পিটের তলায় একটি ড্রেন বা আউটলেটের ব্যবস্থা থাকবে যার মাধ্যমে সাইলেজের ভিতর থেকে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যেতে পারে।

৩.৯.৩ সাইলেজ তৈরির সুবিধাসমূহ

- সবুজ ঘাস রসাল অবস্থায় দীর্ঘদিন সাইলেজ করে রাখা যায়। কম খরচে বছরের যে কোন সময় সাইলেজ তৈরি করে উচ্চ গুণসম্পন্ন কাঁচা ঘাসের যোগান দেয়া সম্ভব। উত্তম মানের সাইলেজ ১২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য সাইলেজ প্রস্তুত করা হলে বছরের যে কোন সময় তা খাওয়ানো যায়।
- সাইলেজ সবুজ ঘাসে বিদ্যমান খাদ্যমানের শতকরা ৮৫ ভাগ সংরক্ষণ করে যা হে (ঘাস শুকিয়ে তৈরি করা হয়) অপেক্ষা অনেক বেশি গুণসম্পন্ন। ভূট্টা বা সরগাম জাতীয় কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ করার সবচেয়ে ভাল ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হল তা হতে সাইলেজ তৈরি করা।
- বর্ষার সময় হে করার চেয়ে সাইলেজ তৈরি করা অনেক সহজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করে অপচয় রোধ করা যায়। এক্ষেত্রে ঘাস শুকানোর জন্য সূর্যালোকের ওপর নির্ভর করতে হয় না।
- সাইলেজ পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও কিছুটা রেচক প্রকৃতির এবং শুষ্ক ঘাস অপেক্ষা অধিক প্রোটিন ও ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। মোটা কান্ডবিশিষ্ট ঘাসের সবটুকু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাইলেজ তৈরি একটি উত্তম পন্থা। ভূট্টা, জোয়ার প্রভৃতি গাছের মোটা ও শক্ত ডাঁটা শুকালে গরু খেতে পারে না কিন্তু সাইলেজ করা হলে তা খেতে অসুবিধে হয় না।
- এক ঘনফুট হে অপেক্ষা এক ঘনফুট সাইলেজে প্রায় তিনগুণের বেশি শুস্ক পদার্থ থাকে। ফলে দেশের বন্যা কবলিত বা নিচু এলাকায় অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণে গো-খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়।
- শস্যে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ঘটলে ফসল কেটে নিয়ে তা দিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়। এর ফলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হয়। শুষ্ক খড় অপেক্ষা সাইলেজ সংরক্ষণের জন্য কম জায়গার প্রয়োজন হয়।
- সাইলেজ প্রস্তুত আগাছা নিয়ন্ত্রণের একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ আগাছায় ফুল থেকে বীজ হবার পূর্বেই তা কেটে সাইলেজ তৈরি করা হয়। এর ফলে নতুন আগাছার বংশবিস্তার হ্রাস পায়।

সাইলেজ তৈরির অসুবিধাসমূহ: সাইলেজের সুবিধা বহুবিধ হলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তা অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। এগুলো হচ্ছে-

- শুষ্ক ঘাস তৈরির চেয়ে সাইলো প্রস্তুতের জন্য অধিক ব্যয় হয় কারণ সাইলো তৈরির জন্য সাইলো ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া সূর্যালোকে শুকানো ঘাস অপেক্ষা সাইলেজে ভিটামিন ডি কম থাকে।
- আর্দ্রতার আধিক্যহেতু সাইলেজ সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের জন্য শুষ্ক ঘাসের চেয়ে তিন গুণ বেশি খরচ পড়ে।
- সাইলেজ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষক (preservative) ব্যবহার করলে খরচ অনেক বেড়ে যায়। আবার অস্বাভাবিকভাবে গাঁজনকৃত (fermented) সাইলেজে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যায় ৪

গবাদিপশুর বাসস্থান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৪.১ গবাদিপশুর বাসস্থান

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যপ্রাণী, চোর প্রভৃতি থেকে খামারের গবাদিপশুকে রক্ষা করার জন্য এবং উন্নত আরামদায়ক অবস্থা ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রদানের জন্য আশ্রয় স্থলকে গবাদিপশুর বাসগৃহ (housing of cattle) বলা হয়। গবাদিপশুর বাসগৃহ আরও যে সকল কারণে আবশ্যক তা হল- ১) প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝড়, বৃষ্টি, অত্যাধিক রোদের গরম ও ঠান্ডায় আশ্রয়দান; ২) হিংস্র ও বন্য মাংসাশী জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করা; ৩) পশুকে আরামে ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালন পালনের সুবিধা; ৪) সুষ্ঠু চিকিৎসার সুবিধা ও সংক্রামক রোগব্যাধি থেকে অন্য পশুকে রক্ষা করা; ৫) পশুকে শান্ত, ধীরস্থির ও অনুগত করার সুবিধা এবং সহজেই পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিতকরণের সুবিধা; ৬) রাত্রে পশুকে আশ্রয়দান করা ও চোরের হাত থেকে রক্ষা করা; ৭) রোগাক্রান্ত পশুর রোগ নির্ণয় এবং নিয়মিত গর্ভধারণ ও প্রসবের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সুবিধা এবং ৮) গাভীকে দুধ দোহনে সুবিধা সৃষ্টি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ও জীবাণুমুক্ত উপায়ে দুধ দোহন।

৪.১.১ গবাদিপশুর বাসগৃহের স্থান নির্বাচন

দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খামারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন (site selection)। গবাদিপশু (এবং হাঁস-মুরগি) খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হল-

- স্থানটি শুকনো, উঁচু ও সমতল হবে যেখানে বৃষ্টির পানি জমবে না এবং সহজেই বর্জ্য পদার্থ নিস্কাশন করা যাবে।
- যে স্থানে খামার করা হবে সেখানকার মাটি বালু ও কাঁকর মিশ্রিত হতে হবে এবং মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।
- যেখানে খামার করা হবে সেখানে বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
- দুগ্ধ খামার অবশ্যই জনবসতি ও জনবহুল রাস্তা থেকে দূরে হতে হবে। ঘাস চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি থাকা উচিত।
- খামারের আশেপাশে জলাভূমি থাকা চলবে না এবং ভবিষ্যতে খামারটি বড় করার সুযোগ থাকা আবশ্যক।
- খামার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত স্থানের মূল্য তুলনামূলকভাবে কম কি-না সেটাও বিবেচনা করতে হবে।
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সহজে ও স্বল্পমূল্যে শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে।

৪.১.২ গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণীবিন্যাস

গবাদিপশুর বাসগৃহ প্রধানত আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের গবাদিপশুর বাসগৃহ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। আমাদের দেশের উপযোগী প্রধানত দু'ধরণের পশুগৃহ (types of animal housing) নির্মাণ করা যায় যথা- (১) উদাম ঘর পদ্ধতি এবং (২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি।

(১) উদাম ঘর পদ্ধতি (loose housing system): এ পদ্ধতিতে বাচ্চা প্রসব ও দুধ দোহার সময় ছাড়া দিন ও রাত্রি গবাদিপশুকে দেয়াল বেষ্টিত খোলা জায়গায় (paddock) পালন করা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, গরম, ঠান্ডা ইত্যাদি সময় পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খোলা স্থানের সংলগ্ন ঘর সংযুক্ত থাকে। এধরণের বাসগৃহে একটি খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র সকল পশুর জন্য উন্মুক্ত থাকে। বয়স্ক বাছুর ও দুধ দিচ্ছেনা এমন গাভীর জন্য উদাম ঘর পদ্ধতি সুবধাজনক। একটি গাভীর জন্য ৩.৫ বর্গমিটার আবৃত স্থান এবং ৭.০ বর্গমিটার খোলাস্থান আয়তনের মেঝের প্রয়োজন।

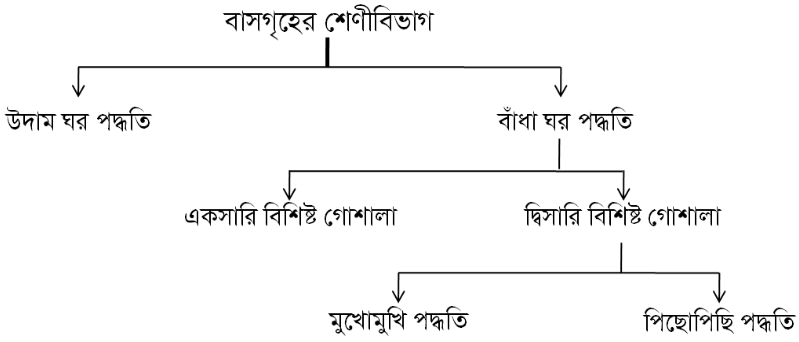

চিত্র ৪.১ঃ গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণীবিভাগ।

(২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি (stanchion row system): এই পদ্ধতির গোশালাকে প্রচলিত গোশালা (conventional barn) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গরুর গলায় দড়ি বা লোহার জিঞ্জির দিয়ে সীমাবদ্ধ স্থানে বেঁধে পালন করা হয়। একই স্থানে গাভীর দুধ দোহন ও খাওয়ানো সম্পূর্ণ করা হয়। বাঁধা ঘর পদ্ধতির গোশালায় গবাদিপশু সব সময় বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। সেজন্য গোশালা সহজে যাতে পরিস্কার করা যায় এবং গরু যাতে আরামে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গোশালা নির্মাণ করা প্রয়োজন। প্রধানত বাঁধা গোশালা দু'ধরণের হয়। (ক) এক-সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালা।

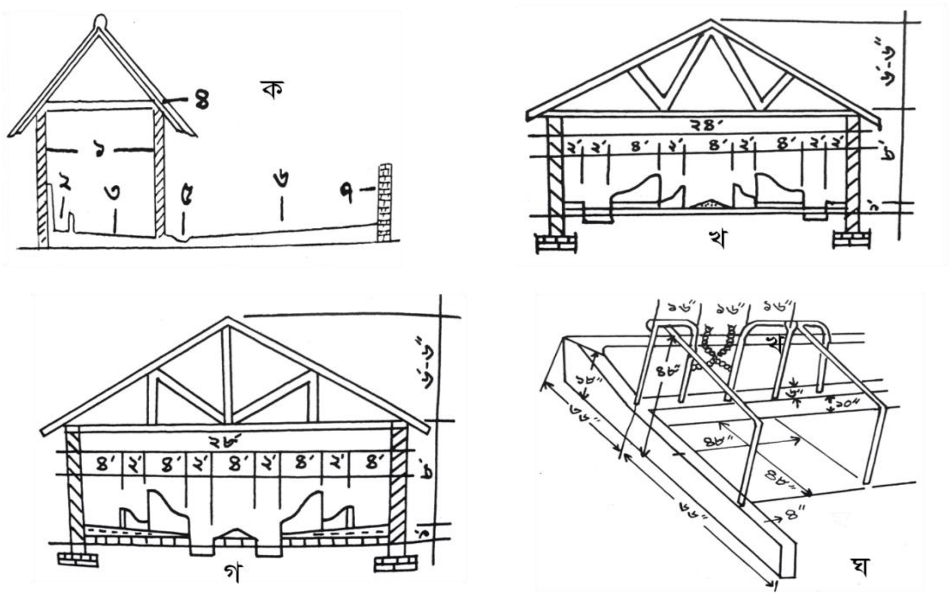

চিত্র ৪.২ঃ (ক) উদাম প্রকৃতির একটি গরুর ঘরের নমুনা। ১ = ঘরের দেয়াল, ২ = মেনজার, ৩ = আবৃত মেঝে, ৪ = ছাদ, ৫ = গাটার, ৬ = খোলা মেঝে, ৭ = প্রাচীর; (খ) মুখোমুখি পদ্ধতিতে গরু রাখার গেশালার নমুনা; (গ) পিছোপিছি পদ্ধতিতে গরু রাখার গেশালার নমুনা; (ঘ) আদর্শ গোশালায় গরু বাঁধার স্থানের নমুনা। এই চিত্রটি 'লাভজনক পশুপাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসা' বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০২)।

(খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা (double row system cowshed): অধিক সংখ্যক পশু পালনের জন্য দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা প্রয়োজন হয়। এধরণের গোশালায় দু'সারি গরুর মাঝখানে ৪ ফুট চওড়া একটি সাধারণ পথ থাকে। এই

ধরণের গোশালায় পশুকে দুভাবে দুসারিতে রাখা হয়। যথা- (অ) মুখোমুখি পদ্ধতি এবং (আ) লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি পদ্ধতি। মুখোমুখি (Face-in or Face to Face system) পদ্ধতিতে গোশালায় দুই সারি পশু সামনা সামনি থাকে। লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি (Face-out or Tail to Tail system) পদ্ধতিতে উভয় সারির মাথা বহিমূর্খী থাকে।

৪.১.৩ গাভী ও বাছুরের বাসস্থান

গাভীর বাসস্থান: গাভীর বাসস্থানকে গোশালা বলে। এদেশে গোয়াল ঘরও বলা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুটি পন্থায় গাভী পালন করা হয়, যথা- ক) চারনভূমিতে গরু চরানোর মাধ্যমে ও খ) গোশালায় বেঁধে রেখে খাদ্য পরিবেশন ও মলমূত্র নিস্কাশনের মাধ্যমে। আমাদের দেশে গোশালা বা গোয়াল ঘরে গাভী প্রতিপালনই এদেশে গাভী পালনের পদ্ধতি হিসেবে সমাদ্রিত। এ গোশালা বাড়ির অনতিদূরে (৪৫-৬০ মিটার) একটি উঁচু জায়গায় নির্মাণ করা শ্রেয়, যাতে দুর্গন্ধ ও গরুর মলমূত্র থেকে মানুষের সমস্যা সৃষ্টি না হয়। গোশালার উচ্চতা ১০ ফুট হতে হবে। খাদ্য পরিবেশনের জন্য চাড়ি বা গামলা ও পানির পাত্র গোশালায় থাকতে হবে। গোশালার প্রতিটি গাভীর জন্য আড়পাতা (chute) থাকে যেখানে গাভী বেঁধে রাখতে হয়। খাবারের চাড়ি পাকা কনক্রিট ও আড়পাতা মসৃণ লোহার রড বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করতে হয়। গাভীর বাসস্থান বা ঘর তৈরি করার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হল-

- গাভীর ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে যা দক্ষিণমুখি হাওয়া আবশ্যক যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাফেরা করে।
- ঘরের মেঝে পাকা এবং খসখসে হবে। এতে গাভী পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভবনা কম থাকে।
- ঘরের মেঝে ঢালু হবে এবং নিস্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে গোবর, চনা ইত্যাদি সহজে পরিস্কার করা যায়।
- ঘরের চালা এসবেস্ট, ছন বা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। তবে টিন ব্যবহার করলে গরমের দিনে ঘর যাতে উত্তপ্ত না হয় সেজন্য টিনের নিচে চাটাই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাছুরের বাসস্থান: সাধারণত জন্মের পর থেকে এক বছরের কিছু বেশি বয়সের গরু মহিষের বাচ্চাই বাছুর নামে পরিচিতি। প্রতিটি বড় বাছুরের জন্য ৫ ফুট × ৭ ফুট = ৩৫ বর্গফুট জায়গার ভিত্তিতে বাছুরের বাসস্থান তৈরি করা হয়। এ বাসস্থানে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ বাসস্থান কাঁচা অথবা পাকা হতে পারে। এতে বাছুরের মলমূত্র নিস্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট খোপ (calf pen) তৈরি করে প্রতি খোপে একটি করে বাছুর রেখে পালন করা যায়। সেক্ষেত্রে এ খোপগুলোর প্রতিটির পরিসর হবে ৩ ফুট × ৪ ফুট × ৩.৫ ফুট। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট আলো-বাতাস ব্যবস্থা সম্পন্ন ঘরে একসাথে সমবয়সী ৫-১০ টি বাছুর পালন করা যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ঘরের সামনে বেষ্টনি ঘেরা খোলা জায়গা থাকা দরকার যাতে বাছুর ব্যায়াম ও খেলাধুলা করতে পারে। বাছুরের খোপে খড়বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে। মেঝে পাঁকা হলে ২.৫৪ সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চি পুরু বিছানার প্রয়োজন হয়। মেঝে কাঁচা হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা স্যাঁতসেঁতে ও নোংরা পরিবেশে বাছুর ফুসফুস প্রদাহ (pneumonia) রোগে ভুগে থাকে। এ রোগ বাছুরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ১.৫-২.০ মাস বয়সের বাছুরকে বড় বাছুরের বাসস্থানে স্থানান্তর করা উচিত।

৪.১.৪ ডেইরি ফার্মের বিভিন্ন নির্মাণমূলক গঠন

ডেইরি ফার্মের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে দেয়াল ও ছাদ এবং পরে ভিতরের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে হয়। ফার্মের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে বিভিন্ন জিনিস পত্রের প্রয়োজন হয়। তবে ফার্মের ধরণ, দ্রব্যের মূল্য ও জিনিসপত্রের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে ডেইরি ফার্ম নির্মাণ করতে হয়।

ক) গোশালার মেঝে নির্মাণ (construction of floor)ঃ গোশালার মেঝে কাঁচা বা পাকা হতে পারে। তবে পাকা মেঝে যেন মসৃণ না হয়। কারণ তাতে পশুর পিছলে পড়ার আশংকা থাকে। তাই সিমেন্ট, পাথর ও বালি দিয়ে ঢালাই

করে মেঝে তৈরি করে দড়ি বসিয়ে মাঝে মাঝে দাগ কেটে দিতে হয়। মেঝের নর্দমার দিক অল্প ঢালু করে তৈরি করতে হবে। এতে গোবর তোলার পর পানি দিলে ধুয়ে দিলে শুকিয়ে যেতে দেরি হয় না।

খ) দেয়াল (walls): গোশালার দেয়াল মাটি বা ইট দিয়ে তৈরি করা যায়। তবে পাকা দেয়াল অনেক ভাল। পাকা দেয়ালের ভিতর দিক সিমেন্ট দিয়ে উত্তমরুপে প্লাস্টার করা উচিত। এতে পশুকে আক্রান্তকারী কীট-পতঙ্গ দেয়ালের ফাঁকফোকর না পেয়ে বাসা বাঁধতে পারে না। গোশালার দেয়াল প্রায ১০ ফুট উচ্চ হয় এবং দেয়ালে প্রায় ৪×৩ ফুট জানালা থাকে।

গ) ছাদ (roof): গোশালার ছাদ খড়, টালি, অ্যাসবেসটর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। অবশ্য পাকা ছাদ হলে সব দিক থেকে উত্তম।

ঘ) নর্দমা (drains): গবাদিপশুর মলমূত্র ও গোশালা পরিষ্কার করে পানি বের করার জন্য পাকা নালা বা নর্দমা প্রয়োজন। এই নালার ঢালু দিকের শেষ প্রান্তে পানি বা মূত্র সংগ্রহের জন্য একটি চৌবাচ্চা ও গর্তের প্রয়োজন। চৌবাচ্চায় জমাকৃত মূত্র ও পানি জমির সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গোশালার ধারে কাছে গোবর সার সংগ্রহের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

ঙ) ভোজন পাত্র (manger): পশুর ভোজন পাত্র সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের হওয়া প্রয়োজন। এইরুপ ভোজনপাত্র মজবুত ও টেকসই এবং সহজে পরিষ্কার করা যায়। ভোজনপাত্র হবে লম্বা আকৃতির। আর প্রতিটি পশুর জন্য একটি নির্দিষ্ট আয়তনের ভোজন পাত্রের প্রয়োজন হয়। লম্বা ভোজন পাত্রের উপর একটি পাইপ লম্বালম্বি ভাবে দেয়া হয় যাতে পশু ভোজন পাত্রে প্রবেশ করতে বা পড়ে যেতে না পারে।

চ) পানির পাত্র (water troughs): পশুর পানির পাত্র ইট, সিমেন্ট ও বালি দিয়ে গোলাকৃত্রির বানাতে হয়। পানি পাত্রের চারপাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখার জন্য দু'মিটার চওড়া একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে হয়।

ছ) ফার্মের দরজা ও পথ (gates and passages): ডেইরি ফার্মে দু'ধরণের গেট হয়। যেমন- প্রত্যেকটি গোশালার জন্য পৃথক পৃথক গেট এবং ফার্মের প্রধান গেট। ট্রাক, গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন সহজেই যাতায়াতের জন্য ফার্মের প্রধান গেট বেশ চওড়া হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি গোশালার দরজা প্রায় ১.২ মিটার চওড়া এবং প্রধান গেট ২.৫ মিটার চওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফার্মের গেট লোহার বা শক্ত কাঠ দিয়ে দু'ভাবে তৈরি করা যায় যথা- অ) জোড়া কবজা গেট (double hinged gate) ফার্মের জন্য বেশ উপযোগী এবং আ) জোড়া বার গেট (double bar gate) গরু গোড়া, মহিষ ইত্যাদি বড় পশুর ফার্মের জন্য উপযোগী।

জ) ফুট বাথ (foot bath): ফার্মের গেটের সামনে ১২×৪ মিটার আয়তন এবং ০.৩ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট ফুট বাথ ট্যাঙ্ক তৈরি করতে হয়। এই ট্যাঙ্ক জীবাণুনাশক সলুশন দিয়ে পূর্ণ রাখতে হবে। ফার্মের ভিতর প্রবেশ ও ভিতর থেকে বাইরে আসা পশুর পা ও গাড়ীর চাকা জীবাণু মুক্ত করা ফুট বাথের উদ্দেশ্য। এতে ফার্মে বাইরের জীবাণুর সংক্রমণ ঘটবেনা।

সারণি ৪.১ঃ বিভিন্ন প্রজাতির পশুর খাদ্য ও পানির পাত্রের মাপ।

ক্রমিক পশু	প্রতিটি পশুর জন্য প্রয়োজন (সেন্টিমিটার)				
	ভোজন পাত্র	পানি পাত্র	চওড়া	গভীরতা	দেওয়ালের উচ্চতা
(১) গরু ও মহিষ	৬০-৭৫	৬.০-৭.৫	৬০	৪০	৫০
(২) বাছুর	৪০-৫০	৪.০-৫.০	৪০	১৫	২০
(৩) মেষ ও ছাগল	৪০-৫০	৪.০-৫.০	৫০	৩০	৩৫
(৪) মেষ ও ছাগল ছানা	৩০-৩৫	৩.০-৩.৫	৫০	২০	২৫

৪.২ পশুর বাসস্থানে ব্যবহৃত রুটিন পদ্ধতি

৪.২.১ পশু সনাক্তকরণ

বাংলাদেশে পারিবারিক পর্যায়ে হাতে গোনা কয়েকটি করে পশু পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে পশু সনাক্তকরণ ব্যবস্থা না করলে তেমন অসুবিধা হয়না। এসব পশুকে তার মালিক বিভিন্ন নামকরণ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী চিনে। এছাড়া অল্প পশুর ক্ষেত্রে প্রতিটি পশুর বয়স, আকৃতি চলন ভঙ্গি, গঠন ও উৎপাদন দেখে নিজের পশুকে চেনা যায়। কিন্তু যেখানে অনেক পশু একত্রে থাকে এবং বিভিন্ন উন্নত ও সংকর জাতের পশু পালন করা হয় সেসব বাণিজ্যিক খামারে পশু সনাক্তকরণের ব্যবস্থা থাকা অতি জরুরী। সেক্ষেত্রে পশুর বাচ্চা জন্মের পরই সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে পশু সনাক্তকরণ (indentification of animals) প্রয়োজন।

- খামারে পশু সনাক্তকরণে পশু পালনকারীর সুবিধা হয়।
- পশু হারানো বা চুরি হওয়ার সন্দেহ থাকে না।
- ফার্মে বিভিন্ন শ্রেণীর ও জাতের মোট পশু সংখ্যা জানা যায়।
- পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় সনাক্তকরণ অত্যাবশ্যক।
- খামারের সনাক্তকৃত পশু বিক্রয় বা নিলাম কাজের সুবিধা হয়।
- পশুর প্রজনন, জনন ও দুধ উৎপাদন রেকর্ড সুষ্ঠুভাবে রাখা যায়।
- পশুর বীমা করা সুবিধা হয়।

সনাক্তকরণ পদ্ধতি

প্রধানত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পশু চিহ্নত করা যায় (Gibbons 1966; Rosenberger 1979; Radostits et al. 1994)। তবে পশুর শরীরের রং বা দেহের বিশেষ চিহ্ন দেখে, এমনকি মাজল ছাপ (muzzle impression) নিয়েও পশু সনাক্ত করা যায়। তাছাড়া রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেও পশু সনাক্ত করা যায়। তবে মানুষের চেয়ে পশুর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় অত্যন্ত জটিল। প্রায় ১৩ টি সিস্টেমে গরুর এ পর্যন্ত ৭০ টি রক্ত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমান যুগে গবাদিপশুর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে প্রজননের ষাঁড় নির্বাচন করা হয়।

১) ব্রান্ডিং (Branding)

- তপ্ত ধাতু দ্বারা ত্বকে ছাপ মেরে পশু সনাক্তকরণ পদ্ধতিই হল ব্রান্ডিং। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামাঞ্চলে পশুর মালিক বা গোয়ালাগণ তাদের পালের পশুকে চিহ্নিতকরণের জন্য এই ব্রান্ডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে।
- প্রধানত গরু, মহিষ, ঘোড়া ও উট সনাক্তকরণে এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। বাছুর মায়ের দুধ ছাড়ার পূর্বে বা মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে পৃথকভাবে পালন করার, আগেই সনাক্তকরণ চিহ্ন দেওয়া হয়।
- সংখ্যা, অক্ষর, ডিজাইন বা এসবের সংযোগে তপ্ত লোহা বা রাসায়নিক দ্রব্যের (তরল নাইট্রোজেন) মাধ্যমে ত্বকে ছাপ দেয়া হয়।
- পশুর ত্বকে ছাপ দেবার জন্য বাজারে লোহা ও তামার ব্রান্ডিং সেট পাওয়া যায়। তবে লোহা অপেক্ষা তামার সেট বেশি ভাল। কারণ তামার পাত অধিকক্ষণ তাপ ধরে রাখে এবং লোমের সাথে লেগে যায় না। আবার রাসায়নিক ব্রান্ডিং অপেক্ষা তপ্ত লোহার ছাপ অধিক স্থায়ী।
- ছাপ লাগানোর সময় পশুকে অবশ্যই কাস্টিং ও চার পা বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- সংখ্যার ছাপ একটি নিয়ম অনুযায়ী দিতে হয়। যেমন- ব্রন্ডের প্রথম এক বা দু'টি সংখ্যা (digits) জন্মের মাস এবং শেষ সংখ্যাটি জন্মের বছর নির্দেশ করবে।
- এই পদ্ধতির একটি অসুবিধা হল চামড়ায় একটি স্থায়ী দাগ ফেরে দেয়। এতে চামড়ার মূল্য কমে যায়। তাই দাগটি পাছার নিচে দিকে দিলে তেমন অসুবিধা হয়না (Sastry and Thomas 1976; Banerjee 1991)।
- বর্তমান যুগে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার হয় না তবে শিংযুক্ত পশুর শিংয়ে ব্রান্ডিং করা যায়।

২। ট্যাটুইং (Tattooing)

- প্রায় সকল জাতের গরু চিহ্নতকরণের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। নম্বর লাগানোর একটি ট্যাটুইং সেট থাকে। সেই সেটে থাকে ১টি ট্যাটুইং ফরসেপ, ট্যাটুইং কালি এবং একটি অনুক্রমিকযুক্ত সংখ্যা বা অক্ষর।
- হালকা রংয়ের পশু সনাক্তকরণ উদ্দেশ্যে নম্বর লাগানোর জন্য কানের ভিতর পার্শ্বে শিরা (ear vein) বাদ দিয়ে ছাপ দিতে হয়। মহিষ ও গাঢ় রংয়ের গরুর ক্ষেত্রে লেজের গোড়ার নিচে নম্বর দেয়া হয় (Sastry and Thomas 1976)।
- নম্বর লাগানোর স্থানটি প্রথমে ভাল করে সাবান পানিতে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর শুষ্ক কাপড় দিয়ে মুছে মেথিলেটেড স্প্রিট দিয়ে মুছে নিতে হবে। পরে আলতোভাবে কালি লাগাতে হয়। ফরসেপে প্রয়োজন মতো ধাতুর নম্বর দিয়ে কানের ভিতরের দিকে নির্দিষ্ট স্থানে পাঞ্চ করে দেয়ার পর তাতে পুনরায় কালি লগিয়ে দেয়া হয়। এই অদ্রবণীয় রং স্থায়ী ভাবে টিস্যুতে লেগে থাকে।
- এই পদ্ধতির একটি মাত্র অসুবিধা হল সনাক্তকরণের জন্য পশুকে ধরে তার কান উল্টিয়ে নম্বর দেখতে হয়।

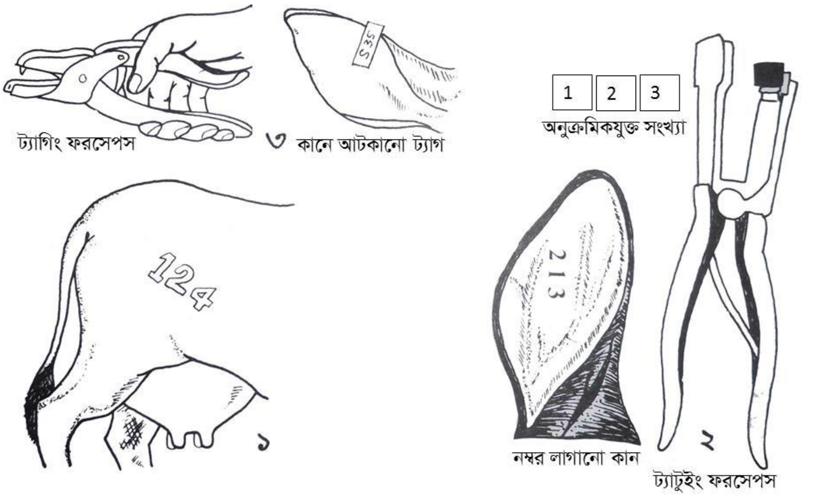

চিত্র ৪.৩ঃ পশুর সনাক্তকরণ পদ্ধতি (১) ব্রান্ডিং, (২) ট্যাটুইং এবং (৩) ইয়ার ট্যাগিং।

৩। ইয়ার ট্যাগিং (Ear tagging): নম্বরযুক্ত হালকা ধাতুর পাত বা শক্ত প্লাষ্টিকের তৈরি ট্যাগ সুনির্দিষ্ট ট্যাগিং ফরসেপের সাহায্যে পশুর কানে ঝুলিয়ে সনাক্তকরণের নামই ইয়ার ট্যাগিং। বাছুরকে তার মা গাভীর কাছ থেকে পৃথক করার পূর্বে ট্যাগিং করতে হয়। প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে পশুর কানে ট্যাগ লাগানো হয়।

ক) ছিদ্রকারী ট্যাগ (self-piercing tags)- এরুপ ট্যাগের প্রান্ত খুব ধারালো থাকে। একটি ট্যাগিং ফরসেপের মাধ্যমে ইয়ার ট্যাগ দিয়েই কান ফুটো করে ট্যাগ কানে আটকে দেয়া হয়।

খ) অছিদ্রকারী ট্যাগ (non-piercing)- এ ধরণের ট্যাগ কানে পরাতে হলে প্রথমে ট্যাগ পাঞ্চ যন্ত্র দিয়ে কান ফুটো করতে হয়। পরে কানের ঐ ছিদ্র দিয়ে নম্বরযুক্ত ট্যাগ আটকিয়ে দেয়া হয়। কানের গোড়া থেকে এক তৃতীয়াংশে কানের ফুটো দিয়ে ঝুলিয়ে এই ট্যাগ আটকনো হয়। কানের গোড়া থেকে এক তৃতীয়াংশে কানের ফুটো দিয়ে ঝুলিয়ে এই ট্যাগ আটকানো হয়। নম্বরযুক্ত দিকটা বাহিরের দিকে থাকে বলে পশুকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। সাধারণত মেষ, ছাগল, শূকর ও বাছুর সনাক্তকরণে ইয়ার ট্যাগ ব্যবহার করা হয়।

৪। গলায় ঝুলানো ট্যাগ (neck chains with tags): নম্বরযুক্ত হালকা ধাতুর পাত শিকলে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল পশুকে না ধরে দূর থেকেই নম্বর দেখে সনাক্ত করা যায়। তবে পশুর গলা থেকে অনেক সময় এই ট্যাগ পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতি ব্যয়বহুলও।

৫। কান কেটে সনাক্তকরণ (ear notching): শূকর ও মেষ এই পদ্ধতিতে সনাক্ত করা যায়। পশু সনাক্তকরণের জন্য এই পদ্ধতিতে কানে ছোট ছোট কাটা দাগের সৃষ্টি করা হয়। দাগের অবস্থানের উপর নম্বর নির্ভর করে পশু সনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে পশুর কান কাটা হয় বলে অনেকে পছন্দ করে না।

৬। অন্যান্য পদ্ধতি (other methods): পশুর শিংয়ে তপ্ত লোহার দাগ দিয়ে, অল্প দিনের জন্য রং লাগিয়ে, জন্মগত চিহ্ন যেমন- দেহের রং ছাপ ইত্যাদি দেখে পশু সনাক্ত করা যায়।

৪.২.২ পশুর বয়স নির্ণয়

পশুর বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ হয়। আবার বিভিন্ন প্রজাতির পশুর জীবনকাল ভিন্ন। অপরদিকে পশুর উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা অনেকাংশে বয়সের উপর নির্ভরশীল; যেমন- গাভী তৃতীয় বিয়ানে (প্রায় ৫-৬ বছরে) সর্বোচ্চ পরিমাণ দুধ দেয়। সুতরাং পশু প্রজননকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতার পশুর সঠিক বয়স জানা আবশ্যক। এছাড়া পশুর বয়সের তারতম্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতার তারতম্য ঘটে। আবার পশুর দেহে সঠিক মাপের ঔষধ প্রয়োগের জন্য বয়স জানা দরকার। তাই পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বয়স জানা জরুরী। বাংলাদেশে অধিকাংশ পশু গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে পালিত হয়। কৃষকের পক্ষে পশুর বয়স লিখে রাখা সম্ভব হয়না। পশুর মালিকের নিকট থেকে অথবা ফার্মের নথিপত্র থেকে বয়স উদ্ধার সম্ভব না হলে নিম্নোক্তভাবে পশুর বয়স নির্ণয় করা যায় (Rosenberger G 1979; Bhullar et al. 1986; Banerjee 1991)।

ক) নাভির লোম (Umbilical hair): অকালজাত বাছুরে (Pre-maturely born calf) নাভির লোম ছোট ছোট কুচির মত। সদ্যজাত স্বাভাবিক বাছুরে নভির লোমের দৈর্ঘ্য সমান থাকে। দীর্ঘ গর্ভাবস্থার বাছুরে নাভির লোম দর্শনীয় লম্বা হয়, আর ত্বক কোঁকড়ানো লোমে অচ্ছাদিত থাকে।

খ) নাভি রজ্জু (Umbilical cord): জন্মের ৪ দিন পর্যন্ত নাভি রজ্জু ভেজা থাকে। পরে শুষ্ক হয়ে সংকুচিত হয়। প্রায় ১৪ দিন পর নাভিতে সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে নাভি রজ্জু ঝরে পড়ে।

গ) নবজাত বাছুরের ক্ষুরের গদি (Fetal claw cushion): নবজাত বাছুরের ক্ষুরের গদি জন্মের ৪ দিনের মধ্যে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঘ) দন্তোদগম (Dentition): সাধারণত দাঁতের সংখ্যা ও প্রকৃতি পরীক্ষা করে পশুর বয়স নির্ণয় করা হয়। তবে পশুর দাঁত দেখে বয়স নির্ণয় করার জন্য দাঁতের প্রকার, গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পশুর দাঁত প্রধানত ঘাস ও খাদ্য খাওয়া, চর্বণ ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার হয়। মুখ গহবরের দাঁতের আকার ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে দাঁতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ছেদন দাঁত (incisor teeth), শ্বদন্ত (canine teeth), প্রাক-পেষণ দাঁত (premolar teeth) এবং পেষণ দাঁত (molar teeth)। উল্লেখ্য, রোমন্থক পশুর কোন শ্বদন্ত (canine teeth) থাকে না। দাঁতের প্রধানত নিম্নোক্ত ৪ টি অংশ রয়েছে।

- মূল (Root)- দাঁতের যে অংশ মাড়ির ভিতর থাকে তাকে মূল বলা হয়।
- গলা (Neck)- দাঁতের মুকুট ও মূলের সংযোগ স্থলকে দাঁতের গলা বলা হয়।
- মুকুট (Crown)- দাঁতের যে অংশ মাড়ির উপর থাকে তাকে মুকুট বলা হয়।
- টেবিল (Table)- দাঁতের যে অংশ বিপরীত পাটির দাঁতের সংস্পর্শে থাকে তাকে দাঁতের টেবিল বলা হয়।

মানুষের মত পশুরও দুই সেট দাঁত হয়। দাঁতের প্রকৃতির অনুযায়ী দাঁতকে নিম্নোক্ত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

অ) অস্থায়ী দাঁত (Temporary teeth)

পশুর প্রথম সেট দাঁতকে অস্থায়ী দাঁত বলা হয়। জন্ম থেকেই এই অস্থায়ী দাঁত গজায়। একটি নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মে ক্রমান্বয়ে ১ম সেটের দাঁত পড়ে ২য় সেটের দাঁত গজায়। একারণে অস্থায়ী দাঁতকে পতনশীল দাঁত (deciduous teeth) বা দুধের দাঁত (milk teeth) বলা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার অস্থায়ী দাঁত সর্বমোট ২০ টি যা নিম্নোক্ত ফরমূলায় প্রকাশ করা হয়।

$$\frac{I(0) \quad C(0) \quad P(3) \quad M(0)}{I(4) \quad C(0) \quad P(3) \quad M(0)} \times 2 = (3+7)\times 2 = 20$$

[where, I = Incisors, C = Canines, P = Pre-molar M = Molar

অর্থাৎ সংক্ষেপে অস্থায়ী দাঁতের সংখ্যা = $\frac{০}{৪} \quad \frac{০}{০} \quad \frac{৩}{৩} \quad \frac{০}{০}$ × ২ = (৩+৭) × ২ = ২০ টি

আ) স্থায়ী দাঁত (Permanent teeth)

পশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে অস্থায়ী দাঁত পড়ে যে নতুন দাঁত গজায় থাকে স্থায়ী দাঁত বলে। তাবে অস্থায়ী দাঁত অপেক্ষা স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা বেশি থাকে; যেমন- গরুর অস্থায়ী দাঁত ২০ টি কিন্তু স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২ টি। গরুর স্থায়ী দাঁতের বিন্যাস ফরমুলায় প্রকাশ করা যায়। গৃহপালিত বিভিন্ন পশুর স্থায়ী ও অস্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২ টি। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার স্থায়ী দাঁতের বিন্যাস ফরমুলায় প্রকাশ করা যায়।

গরুর স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা = $\frac{০}{৪} \quad \frac{০}{০} \quad \frac{৩}{৩} \quad \frac{৩}{৩}$ × ২ = (৬+১০) × ২ = ৩২ টি

প্রধানত ছেদন দাঁতের বহিরাকৃতি ও গঠনের অবস্থা পরীক্ষা করে পশুর বয়স নির্ণয় করা হয়। উল্লেখ্য, রোমন্থক পশুর উপর চোয়ালে কোন ছেদন দাঁত থাকেনা। অপরদিকে নিচের চোয়ালে ৮ টি ছেদন দাঁত থাকে। জন্মের পর থেকেই অস্থায়ী ছেদন দাঁতগুলো বের হতে থাকে। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব অস্থায়ী ছেদন দাঁতগুলো ক্রমান্বয়ে একে একে ভেঙ্গে যায় এবং সেই স্থানে স্থায়ী দাঁত গজায়। অস্থায়ী দাঁত স্থায়ী দাঁত অপেক্ষা ছোট এবং তে-কোণা আকৃতির হয়। অন্যদিকে স্থায়ী দাঁত মোটা কোদাল আকৃতির হয়ে থাকে। প্রতিটি স্থায়ী দাঁতের মাথা ও গোড়ার মাঝে সুস্পষ্ট গলা থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব স্থায়ী ছেদন দাঁত ক্ষয় হয় এবং অন্যান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর অস্থায়ী ছেদন দাঁত একটি নিয়মের মাধ্যমে গজায় ও পড়ে। অনুরূপভাবে স্থায়ী ছেদন দাঁতও একটি নিয়মে গজায় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরুপ দাঁতের অবস্থা ও পরিবর্তন পরীক্ষা করে পশুর বয়স নির্ণয় করা হয়।

ছেদন দাঁতের অবস্থা ও ক্ষয় (position and wear of incisors)

অ) বাছুর মাঢ়ি দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় ৬-৮ টি অস্থায়ী ছেদন দাঁত নিয়ে জন্মে।

আ) বাছুরের ১২ দিন বয়সে সম্মুখের মাঝের ছেদন দাঁতদ্বয় মাঢ়ি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। প্রায় ৩ সপ্তাহ ক্রমান্বয়ে সম্মুখের, কোণার ও পাশের ছেদন দাঁত বের হয় এবং কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ বয়সে অস্থায়ী ছেদন দাঁতগুলো প্রায় সমান হয়ে যায়। তবে অনেক সময় অস্থায়ী ছেদন দাঁতের পূর্ণতা লাভ করতে ৫-৬ মাস সময় লেগে যায়।

ই) বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব ছেদন দাঁতে ক্ষয় ও অন্যান্য পরিবর্তন দেখা যায় এবং এরুপ পরিবর্তন বয়স নির্ণয়ে সহায়ক। বাছুরের ১০ মাস বয়সে মধ্যবর্তী দুটো ছেদন দাঁতের ক্ষয় আরম্ভ হয়। প্রায় ১৫ মাস বয়সে পাশের দুটো ছেদন দাঁতের ক্ষয় দেখা যায়। প্রায় সব কটি ছেদন দাঁত সমান হয়ে যায় ১৮ মাস বয়সে।

ঈ) পূর্ণবয়স্ক পশুর বিভিন্ন অস্থায়ী ছেদন দাঁত নিম্নোক্ত বিভিন্ন পর্যায়ে পড়ে এবং স্থায়ী নতুন দাঁত গজায়। উল্লেখ্য, স্থায়ী দাঁত পূর্ণাঙ্গ আকারে উঠতে প্রায় ৬ মাস সময় লাগে। সাধারণত ২১ মাস বয়সে গরুর কেন্দ্রীক ছেদন (central incisors) দাঁতদ্বয় পড়ে স্থায়ী দাঁতদ্বয় গজায়। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দুটি স্থায়ী কেন্দ্রিক ছেদন দাঁত দেখে গরুর বয়স দু'বছর বলা যায়। স্থায়ী মধ্যবর্তী ছেদন (intermediate incisors) দাঁতদ্বয় উঠে ৩০ মাস বয়সে। তাই স্থায়ী দু'টি মধ্যবর্তী দাঁত থাকলে গরুর বয়স ৩ বৎসর বলা হয়। পার্শ্ববর্তী (lateral) স্থায়ী ছেদন দাঁত জোড়া সাধারণত গজায় ৩৯ মাস বয়সে। সুতরাং ৬টি স্থায়ী ছেদন দাঁত থাকলে গরুর বয়স প্রায় সাড়ে তিন বছর বলা যায়। গরুর ৪ বছর বয়সে শেষের বা প্রান্তিক (corner) দাঁতদ্বয় উঠে থাকে। তাই গরুর ৮ টি পূর্ণাঙ্গ ছেদন দাঁত থাকলে প্রায় সাড়ে ৪ বছর বয়স বলা যায়। অনুরুপভাবে তথ্য অনুযায়ী অন্যান্য পশুর বয়স নির্ণয় করা যায়।

স্থায়ী ছেদন দাঁত ক্ষয়ের বয়স

সাধারণত ৫-৬ বছর বয়সে স্থায়ী ছেদন দাঁতের ক্ষয় আরম্ভ হয় যা পশুর বয়স নির্ণয়ে সহায়ক। সুনির্দিষ্ট সময়ে গরুর ছেদন দাঁতের ক্ষয় হয়।

- কেন্দ্রীক (Central) = ৬-৭ বছর বয়সে।
- মধ্যবর্তী (Intermediate) = ৭-৮ বছর বয়সে।
- পার্শ্ববতী (Lateral) = ৮-১০ বছর বয়সে।
- প্রান্তিক (Corner) = ১১-১২ বছর বয়সে।

স্থায়ী ছেদন দাঁত ক্ষয়ের বিশ্লেষণ

- প্রায় ৬ বছর বয়সে ব্যবহারের ফরে সম্মুখের ছেদন দাঁতের (জিহবার তলের) এক-চতুর্থাংশ হতে এক-তৃতীয়াংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- প্রায় ৭ বছর বয়সে দাঁতের প্রায় অর্ধেকাংশ ক্ষয়ে যায়।
- প্রায় ৯ বছর বয়সে জিহবার সমগ্র তল অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- প্রায় ১২ বছর বয়সে ছেদন দাঁতের সুস্পষ্ট গলা বেরিয়ে আসে। ক্রমশ দাঁত ক্ষয়ের ফলে বৃদ্ধ বয়সে গরুর কেবল দাঁতের গলাটুকু লেগে থাকে।

ব্যতিক্রম (Exception)

ছেদন দাঁত পরীক্ষা করে পশুর বয়স মোটমুটি ধারণা করা গেলেও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়না। পশুর অস্থায়ী ছেদন দাঁত গজানো ও পড়া এবং স্থায়ী দাঁত গজানো ও ক্ষয় হওয়া ইত্যাদির পিছনে প্রধানত নিম্নোক্ত কারণগুলো রয়েছে।

- পশুর খাদ্যের প্রকৃতি (চরে খাওয়া বা বেঁধে খাওয়া)।
- পশুর জাতের পার্থক্য (দেশী বা বিদেশী জাত)।
- পশুর পুষ্টির অবস্থা।
- একক পশুর পার্থক্য (individual variation)।

শিঙের চক্র বা রিং

গরুর শিংয়ের রিং বা চক্র (horn ring) দেখে বয়স ধারণা করা যায়। সাধারণত শিংয়ের প্রথম রিং ২.৫-৩ বছর বয়সে সৃষ্টি হয়। এরপর প্রতিবছর একটি রিং সৃষ্টি হয়। একটি গাভীর বাচ্চা দেয়ার সাথে এই রিং সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। কারণ প্রতি বছর একটি বাচ্চার জন্য একটি রিং সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং গাভীর বয়স আন্দাজ করতে হলে শিংয়ের রিং দেখে বা বাচ্চা কয়টি হয়েছে জেনে তার সাথে ২.৫-৩ বছর যোগ করে মোটামুটি গাভীর বয়স জানা যায়। অর্থাৎ গাভীর মোট বয়স = শিংয়ের আংটির সংখ্যা + ২.৫-৩ বছর। উল্লেখ্য শিং দেখে পশুর বয়স নির্ণয় খুব একটা নির্ভরযোগ্য বা বিজ্ঞান সম্মত নয়। কারণ অ) অনেক সময় অসৎ ব্যবসায়ীরা বয়স কম হবে করে দেখাবার জন্য শিংয়ের রিং ঘষে উঠিয়ে দেয়। আ) সব গরুর শিং থাকেনা, তাই এ পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয় সম্ভব নয়।

সারণি ৪.২ঃ গৃহপালিত পশুর অস্থায়ী ও স্থায়ী ছেদন দাঁত উদগমনের সময় ও বয়স নিরূপণ (সামাদ ২০০১)।

পশু	দাঁত	কেন্দ্রিক (Central)	মধ্যবর্তী (Intermediate)	পার্শ্ববর্তী (Lateral)	প্রান্তিক (Corner)
গরু	অস্থায়ী	০০-০১ মাস	০০-০১ মাস	০০-০১ মাস	০০-০১ মাস
	স্থায়ী	২৪-৩০ মাস	৩৬ মাস	৪৮ মাস	৫৪-৬০ মাস
মহিষ	অস্থায়ী	০৩-১৭ দিন	০৪-২৭ দিন	০৯-৩৯ দিন	৩০-১২০ দিন
	স্থায়ী	৩০-৩৭ মাস	৩৬-৪৮ মাস	৪৮-৬০ মাস	৬০-৭২ মাস
মেষ	অস্থায়ী	০০-১৩ দিন	০০-২৫ দিন	৩৬ দিন	৫০ দিন
	স্থায়ী	১৪-২০ মাস	২১-২৭ মাস	৩০-৩৫ মাস	৩০-৪৩ মাস
ছাগল	অস্থায়ী	০	০	০	০১-০৪ মাস
	স্থায়ী	১৫-১৮ মাস	২১-২৪ মাস	২৫-২৮ মাস	২৯-৩৬ মাস

ঘোড়ার বয়স নির্ণয়

- উদগম (eruption) এবং স্থানচ্যুতি /পতন (displacement/shedding): অস্থায়ী পার্শ্বস্থ ইনসিজরস দাঁত (incisors) ৬ দিন সেন্ট্রাল ৬ সপ্তাহ এবং কর্নার ৬ মাস বয়সে উদগম হয়। সেন্ট্রাল ২.৫ বছরে, পার্শ্বস্থ ৩.৫ বছরে এবং কর্নার দাঁত ৪.৫ বছরে পতন হয়।
- ইনসিজর দাঁতে ক্ষয় (wear of incisors): ইনসিজর স্থায়ী দাঁতের এনামেলের রিং মার্ক নিচের সেন্ট্রালে ৭ বছরে, নিচের পার্শ্বের দাঁতের ৮ বছরে উপরের কর্নারের দাঁতের ৯ বছরে উপরের সেন্ট্রালের ১০ বছরে এবং উপরের কর্নারের দাঁতের ১১ বছর বয়সে থাকেনা।

মেষের বয়স নির্ণয়

- মেষের অস্থায়ী ইনসিজর দাঁতের উদগম (eruption): জন্ম বা জন্মের ১ম সপ্তাহে লেটারলস, ১-২ সপ্তাহে সেন্ট্রালস, ২-৩ সপ্তাহে মিডিয়াল এবং ৩-4 সপ্তাহে কর্নার দাঁত উদগম হয়। অস্থায়ী দাঁতের ক্রাউন ১০-১২ মাসে ক্ষয় ও নড়বড়ে হয়।
- ইনসিজর দাঁতের পতন

দাঁতের অবস্থা	সেন্ট্রালস	মিডিয়াল	ল্যাটারালস	কর্নারস
অস্থায়ী ইনসিজর দাঁতের পতন	১ বছর ৬ মাস	১ বছর ৯ মাস	২ বছর ৩ মাস	৩ বছর
স্থায়ী দাঁতের কর্তন (cutting)	১ বছর ৬ মাস	২ বছর	২ বছর ৬ মাস	৩ বছর ৩ মাস

ছাগলের বয়স নির্ণয়

- অস্থায়ী ইনসিজর দাঁতের উদগম (eruption): ল্যাটারাল, সেন্ট্রাল ও মিডিয়াল জন্মের সময় এবং কর্নার দাঁত তিন সপ্তাহ বয়সের মধ্যে গজায়।
- ইনসিজর দাঁতে পতন (displacement of incisors): সেন্ট্রালস ১ বছর ৩ মাস, মিডিয়াল ১ বছর ৯ মাস, ল্যাটারাল ২ বছর এবং কর্নার ২ বছর ৯ মাস।
- স্থায়ী দাঁতের পরিবর্তন: ন্যারো গ্লাইডিং সার্ফিস ৩ বছরে এবং হলুদ ব্রাউন রিং ৪ বছরে হয়।

৪.২.৩ পশুর দৈহিক ওজন নির্ণয়

প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে পশুর দৈহিক ওজন নেয়া হয়।

- একসাথে একই বয়সের পালিত পালের বা গোয়ালের বা ফার্মের পশুর ওজনের তারতম্য দেখে পশুর দৈহিক বাড়ন, পুষ্টির অবস্থা নির্ণয়ের সাথে সাথে রুগ্ন ও স্বাস্থ্যবান পশু নির্ণয় করা যায়।
- ঔষধের মাত্রা নিরুপণের জন্য দৈহিক ওজন জানার প্রয়োজন হয়।
- চিকিৎসারত পশুর নিয়মিত দৈহিক ওজন নিয়ে ঔষধে কাজ হচ্ছে কিনা বুঝা যায়।

পশুর দৈহিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতি

ওজন নেয়ার যন্ত্রের (ব্যালান্স) সাহায্যে পশুর ওজন সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। তবে যন্ত্রের সাহায্যে ওজন নেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পশুর দৈহিক ওজন নির্ণয় করা যায়। যেমন- গবাদিপশু ও ঘোড়ার দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় থেকে মোটামুটি দৈহিক ওজন নির্ণয় করা যায়। বুকের বেড় মাপার জন্য প্রথমে পশুকে চার পায়ের উপর সোজাসোজি দাঁড় করাতে হবে। অতঃপর সামনের পায়ের ঠিক পেছনে বুকের উপর ফিতা ফেলে বুকের বেড় (সিনা) ইঞ্চিতে মাপতে হবে। পরে ব্রিসকেট (brisket) হতে বাটক (butock) পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে মেপে নিয়ে নিন্মোক্ত ফরমুলায় ফেলে দৈহিক ওজন বের করা যায়। তবে পশুর সঠিক ওজনের কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যায়। ক্লু টেপের সাহায্যে পশুর দৈর্ঘ্য ও বুকের মাফ নেওয়া হয়।

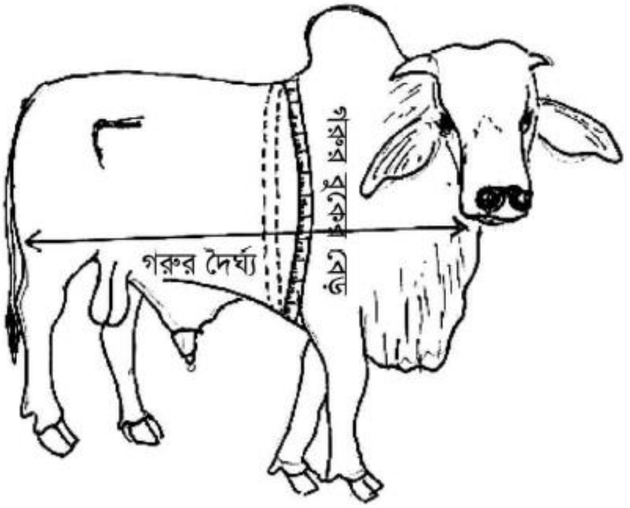

চিত্র ৪.৪: গরুর ওজন নির্ণয়ের জন্য দৈর্ঘ্য ও বুকের বেড় মাপার পদ্ধতি।

$$\textbf{পশুর ওজন} = \frac{\text{পশুর দৈর্ঘ্য} \times (\text{পশুর বুকের বেড়})^{২}}{৩০০ \times ২.২} \text{ কেজি}$$

পশুর দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) = পশুর লেজের উপরের পিন পয়েন্টে থেকে অথবা পাছার উঁচু হাড় হতে সোল্ডার পয়েন্ট বা গলার মাঝ বরাবর পর্যন্ত বুকের বেড় (ইঞ্চি) = সামনের ২ পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর। এছাড়াও গবাদিপশুর বুকের বেড় থেকে তাদের দৈহিক ওজন নির্ণয় করা যায়। নিচে তালিকা দেয়া হল-

বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)
২৫	১৯	৩৯	৬৪	৫৩	১৬২
২৬	২০	৪০	৬৯	৫৪	১৭১
২৭	২১	৪১	৭৩	৫৫	১৮১
২৮	২৩	৪২	৭৮	৫৬	১৯১
২৯	২৫	৪৩	৮৩	৫৭	২০০
৩০	২৭	৪৪	৮৭	৫৮	২১০
৩১	৩০	৪৫	৯২	৫৯	২১৯
৩২	৩২	৪৬	৯৬	৬০	২২৯
৩৩	৩৫	৪৭	১০১	৬১	২৩৪
৩৪	৩৯	৪৮	১১৩	৬২	২৪৭
৩৫	৪৩	৪৯	১২৩	৬৩	২৫৬
৩৬	৪৯	৫০	১৩৩	৬৪	২৬৫
৩৭	৫৪	৫১	১৪৩	৬৫	২৭৫
৩৮	৫৯	৫২	১৫২	৬৬	২৮৬

৪.৩ স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদনে আধুনিক জবাইখানা

আধুনিক জবাইখানার সুযোগ-সুবিধাই দিতে পারে কেবলমাত্র রোগজীবাণুমুক্ত মাংস সরবরাহ করতে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত মাংস পেতে হলে আধুনিক পশু জবাইখানার বিকল্প নেই। আধুনিক জবাইখানায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদন এবং তা পরবর্তীতে জনসাধারণ খাদ্য হিসাবে নির্ভয়ে গ্রহণ করতে পারে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ দেশ স্বাধীনের প্রায় ৪৩ বছর পূর্ণ হলেও আমাদের দেশে সরকারি উদ্যোগে কোন আধুনিক জবাইখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি যেখান থেকে রপ্তানিযোগ্য জীবাণুমুক্ত মাংস ও মাংসজাত পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। অথচ এশিয়ার অনেক দেশ এরই মধ্যে আধুনিক জবাইখানাসহ মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে সুখের খবর এই যে, স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ইতিমধ্যে 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' করেছে। উক্ত আইনের ধারা ৩(১) দ্বারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রির জন্য জবাইখানার বাহিরে পশু জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৪.৩.১ সিটি করপোরেশনে গবাদিপশুর আদর্শ জবাইখানা স্থাপন

'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' এর বিধান অনুসারে সিটি করপোরেশন এলাকার জবাইখানাসমূহ সিটি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রাধীন ভেটেরিনারিয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এখানে সিটি করপোরেশন এলাকায় আধুনিক জবাইখানার প্রকৃতি তুলে ধরা হল। স্বাস্থ্যসম্মত মাংস পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই জবাইখানাগুলোতে গবাদিপশু রাখার জন্য একটি আধুনিক কাউ সেড স্থাপন করতে হবে যেখানে প্রথমে গবাদিপশু রাখা হবে। গবাদিপশু রাখার পর এদের শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা করা হয় একজন রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে। এই পরীক্ষায় পশু সুস্থ প্রমাণিত হলে তাকে জবাইপূর্ব পরীক্ষার (ante-mortem) সম্মুখীন হতে হয়। এ পরীক্ষায় পশু সম্পূর্ণ সুস্থ বিবেচিত হলে গবাদিপশুকে জবাই উপযোগী সার্টিফিকেট দেয়া হয়। আর অসুস্থ প্রমাণিত হলে সে প্রাণিটিকে আইসোলেশন শেডে নেয়ার পর যথোপযুক্ত চিকিৎসার পর সুস্থ করে জবাই উপযোগী করা হয়। জবাই উপযোগী গবাদিপশুকে স্টেইনলেস স্টিলের আধুনিক যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত জবাইখানায় জবাই করার জন্য নেয়া হয়। মনে রাখতে হবে, অসুস্থ গবাদিপশুকে কোন অবস্থায়ই জবাই করা যাবে না। জবাইয়ের পর ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শরীর থেকে রক্ত বের হওয়ার সময় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যথাযথ রক্তক্ষরণ না হলে মাংসের গুণগত মান ঠিক থাকে না। কারণ মাংসের মধ্যে রক্ত থাকলে সেখানে রোগজীবাণু তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করতে পারে। রক্ত একটি খুব ভাল মিডিয়াম বলেই সেখানে খুব তাড়াতাড়ি রোগজীবাণু বংশবিস্তার করে। তাই গবাদিপশু জবাই করার পর মাংসের গুণাগুণ সঠিক রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে রক্তক্ষরণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জবাইয়ের পর চামড়া ছাড়ানোসহ যাবতীয় কাজ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে করতে হবে। চামড়া ছাড়ানোর পর গবাদিপশুর ময়না তদন্ত বা পোস্টমর্টেম করবেন একজন রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তার এবং সেজন্য দরকার একটি আধুনিক প্যাথলজি ল্যাবরেটরি যেখানে অণুজীব কালচার করা সম্ভব। এর পর মাংসের মান নির্ধারণ করা হয় ও পরবর্তীতে খাদ্য উপযোগী ও প্রক্রিয়াকরণের সার্টিফিকেট বা অনুমতি দেয়া হয়। সার্টিফিকেট বা অনুমতি প্রাপ্তির পর চামড়া ও বিভিন্ন ভিসেরাল অরগান ছাড়ানো গবাদিপশুর কারকাসকে পাঠানো হয় হিমঘরে (চিলিং রুমে)। মাংসের আর্দ্রতা দূর করতে কারকাস বা শবদেহকে এই ঠান্ডা ঘরে আট ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এর পর কারকাসকে প্রক্রিয়াজাতকরণের কক্ষে নেয়া হয়। সেখানে জৈবনিরাপত্তার প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ করে বিভিন্ন অঙ্গের মাংসকে টুকরো করা হয় এবং এই মাংস চিলিং ভ্যান বা শীতল যানযোগে বিভিন্ন মার্কেট বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বাজারজাত করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দোকান বা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে মাংস রাখার মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফ্রিজার থাকতে হবে। আধুনিক পশু জবাইখানার স্থান হবে শহর বা সিটি কর্পোরেশনের বাইরে যেখানে খোলামেলা জায়গা ও অবকাঠামো নির্মাণে কোন অসুবিধা না ঘটে। অর্থাৎ বলা যায়, শহরে কেবলমাত্র আধুনিক জবাইখানার জবাইকৃত সিলযুক্ত মাংস আনীত হবে। শহরে জবাইয়ের জন্য কোন পশু আনা যাবে না। এটাই হবে স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদনে আধুনিক জবাইখানার প্রকৃতি।

৪.৩.২ জেলা ও উপজেলা সদরে গবাদিপশুর আদর্শ জবাইখানা স্থাপন

জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যেখানে সেখানে গরু-ছাগল জবাই করে এর মাংস বাজারজাত করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন জবাইকৃত পশুর রক্ত, নাড়ীভূড়ি, হাড়, গোবর ইত্যাদির অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর জায়গায় পশু জবাইয়ের ফলে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি করছে। 'পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১' এর বিধান অনুসারে জেলা ও উপজেলার জবাইখানাসমূহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন ভেটেরিনারিয়ানের তত্ত্বধানে পরিচালিত হবে। এ ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা সদরে একটি আদর্শ কসাইখানা স্থাপন করত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গবাদিপশু জবাই করে মাংস বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- উপজেলা সদরের এক পার্শ্বে (জনবহুল এলাকা ব্যতীত) একটি আধাপাকা ঘরে কসাইখানা স্থাপন করা যেতে পারে। কসাইখানার আয়তন এমন হবে যাতে একসংগে ২-৩ টি গরু ও ৪-৫ টি ছাগল জবাই, চামড়া ছাড়ানো ও মাংস তৈরির কাজ সম্পন্ন করা যায়।
- জবাই করা জায়গাটি মেঝে থেকে একটু উঁচু করতে হবে যেন জবাইকৃত পশুর রক্ত একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয় এবং ইহা পরবর্তী পর্যায়ে সহজেই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যায়।
- কসাইখানা ঘরের দুই পার্শ্বে লৌহ নির্মিত বার তৈরি করে জবাইকৃত পশু ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- কসাইখানা দৈনিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য গরু-ছাগল জবাই 'ফি' ধার্য করা যেতে পারে।
- জেলা ও উপজেলায় কর্মরত রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসক জবাইয়ের পূর্বে গরু-ছাগল পরীক্ষা করত সার্টিফিকেট প্রদান করার পরই গরু-ছাগল জবাই নিশ্চিত করতে হবে।
- গবাদিপশু জবাই করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত হবে। এছাড়া কসাইখানায় কুকুর বিড়ালের উপস্থিতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য সনদপত্র ছাড়া কাউকে গবাদিপশু জবাই, মাংস উৎপাদন বা মাংস বিক্রির কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৪.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগ হল প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সংঘটিত এমন ঘটনা যাহা চলমান স্বাভাবিক সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যাহার মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় যে উহা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়া পূরণ করা সম্ভব নয়। দুর্যোগ প্রতিরোধ, মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, মোকাবেলা এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন- এই সমস্ত কর্মকান্ডকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় যে সমস্ত দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাশিত দুর্যোগ সমূহের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে সাধারণত প্রাক-দুর্যোগ ব্যবস্থা বলা হয়, তাহাও এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত।

বাংলাদেশের মানুষের নিকট ঝড়, অতিবর্ষণ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরিচিত নয়। প্রায় প্রতি বছর এসবের রুদ্ররুপ এদেশের মানুষকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। অজস্র নদী-নালা আর জলাভূমি অধ্যুসিত এদেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। দেশের নদীগুলোর ঔদ্ধত্য বন্যার সময় যেন দুর্দমনীয় হয়ে উঠে। এসময় দুকূলের বিস্তীর্ণ জনপদ, ক্ষেতখামার ও বাড়িঘর নদীর তীব্র ভাঙ্গনের মাঝে প্রবল জলরাশির আবর্তে খড়কুটোর মতো বিলীন হয়ে যেতে থাকে। হাজার হাজার গৃহহীন ও সহায়সম্পদ নিঃস্ব মানুষের আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে বাংলার আকাশ-বাতাস। প্রকৃতির বৈরী তান্ডবের কাছে বিধ্বস্ত এসব মানুষের দুঃখ-বেদনার চিত্র বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সামান্য একটু আশ্রয়ের সন্ধানে সব বিসর্জন দিয়ে পাড়ি জমান অজানার পথে। পরিবারের সদস্যরা অবিশ্বস্ত দুর্বল কলাগাছের ভেলায় সামান্য কিছু সহায়-সম্বল আর প্রাণপ্রিয় গুটিকয়েক হাঁস-মুরগি ও ছাগল-ভেড়া নিয়ে ভেসে চলেন শুকনো একটু মাটির আশায়। এর সাথে আবার খাদ্য ও খাবার পানির প্রকট সমস্যা যুক্ত হয়ে মর্মবেদনাকে

আরো গভীর ও দুর্বহ করে তোলে। এই নির্মম যাতনাকে আরো দুঃসহ করে ওঁৎ পেতে থাকা নানা রোগব্যাধি যার নিষ্ঠুর করাল আঘাতে ঝরে পড়তে থাকে অমূল্য জীবন পুষ্পরাজি। এমন করুণ বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে চলচিত্রের মতো চিত্রায়িত হলেও আমাদের হতাশ বা হতোদ্দম হলে চলবেনা বরং সমগ্র জাতিকে এ দুর্যোগ উত্তরণের জন্য একযোগে নিঃস্বার্থ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হবে। সর্বস্তরের সকল মানুষের একনিষ্ঠ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা থাকলে দুর্যোগের কালোনিশার অবসান ঘটে আবার প্রভাতের স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল সূর্যের উদয় হবে। আবার কৃষকের ঘরের আঙ্গিনা মুখর হয়ে উঠবে হাঁস-মুরগির কল-কাকলিতে, গোয়ালে প্রতিধ্বনিত হবে গরুর হাম্বা রব, পুকুরে খেলা করবে মাছের দল আর মাঠের সোনালী ফসলের বুকে ঢেউ খেলে যাবে উদাসী বাতাস। এতো আমাদের স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবতা।

৪.৪.১ প্রাণিসম্পদ রক্ষায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে পারেন এবং সম্পাদনে সমর্থ হন। এই স্থায়ী আদেশাবলীতে প্রদত্ত দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা নিজ নিজ কর্ম পরিকল্পনা (action plan) প্রস্তুত পূর্বক নিজ নিজ দায়িত্ব ও ক্ষমতার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দুর্যোগ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সমন্বয় নিশ্চিত করেন জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (IMDMCC)। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় করেন যথাক্রমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ইহাদের সার্বিক সহায়তা করে। মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ তাহাদের কর্মপরিকল্পনায় জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিযুক্ত তাহাদের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন, যাহাতে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে তাহারা উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কাজে সাহায্য করতে পারেন। সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে দুর্যোগ প্রশমণ, প্রস্তুতি ও জরুরি মোকবেলার ব্যবস্থা করবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী' এর (ইসলাম উদ্দিন মালিক ১৯৯৭) আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের জেলা ও উপজেলা অফিসসমূহ কর্তৃক করণীয় বিষয়াবলী নিম্নে আলোচনা করা হল; এই আদেশাবলীর আওতায় সকল কর্মকান্ড ৩টি পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়- ক) স্বাভাবিক সময়; খ) দুর্যোগ পর্যায় এবং গ) দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক করণীয়

স্বাভাবিক কার্যবলী সম্পাদন ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুর্যোগ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে-

ক) স্বাভাবিক সময়ে: * অধিদপ্তরের অফিসে একজন কর্মকর্তাকে দুর্যোগ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করিবে * উপ-দপ্তরসমূহ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাঠ পর্যায়ের সরকারি অফিস এবং সিপিপি এর সাথে অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবে * ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হইবার পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকল ফিল্ড অফিসারকে সজাগ করিয়া দিবে যাহাতে নিজস্ব সম্পদসমূহ, যেমন হাঁস-মুরগি খামারের মজুদ, পশুপালন খামারের গবাদিপশুর আশ্রয়স্থল ইত্যাদি সুরক্ষিত থাকে * ঘূর্ণিঝড়জনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা মৌসুমে প্রবল বন্যা হইতে গবাদিপশু রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনে এবং সিপিপি এর সহিত আলোচনাক্রমে উঁচু স্থান নির্বাচন করবে ও তাহা নির্দিষ্ট করে রাখবে * গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ এলাকাসমূহে ঔষধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুদের ব্যবস্থা করবে * ঘূণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করিবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর উহা হালনাগাদ করবে * ঘূণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস অত্যাসন্ন হলে গবাদিপশু নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করবে এবং টিকাদান ও চিকিৎসার জন্য আগে ভাগেই পরিকল্পনা করবে * গবাদিপশুর পুনর্বাসন এবং হারাইয়া যাওয়া প্রাণিসম্পদ পূনঃপূরণের উদ্দেশ্যে অনুপূরক ব্যবস্থাদির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে * দুর্গত এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য জরুরি

ভিত্তিতে পশুখাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে * মাঠ এবং মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং ষ্টাফদের ঘূর্ণিঝড়/বন্যা দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও পরিচিতি প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

খ) দুর্যোগ পর্যায়ে: * দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একজন যোগাযোগ কর্মকর্তা নিয়োগ করবে * আটকাইয়া পড়া গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও অপসারণ কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে (বন্যার সময়) * আশ্রয়স্থলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির দ্রুততার সহিত টিকাদান ও চিকিৎসার বিধান করবে (বন্যার সময়) * দুর্গত এলাকাসমূহে পশুদের টিকাদান পরিচালনা করবে (বন্যার সময়)।

গ) পুনর্বাসন পর্যায়ে: * ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য ঋণ ও পশুখাদ্য সরবরাহের আকারে অবিলম্বে ত্রাণ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহিত সংযোগ সাধন করবে * ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের জন্য অবিলম্বে জরিপ কার্য পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনবোধে গবাদিপশু আমদানির ব্যবস্থা করবে * ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে জরুরি ভিত্তেতে পশু চিকিৎসা মেডিকেল টিম গঠন ও প্রেরণ করবে * ক্ষতিগ্রস্ত গবাদিপশুর পুনর্বাসন এবং হারাইয়া যাওয়া প্রাণিসম্পদ পুনঃপূরণের উদ্দেশ্যে অনুপূরক ব্যবস্থাদির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই উদ্দেশ্যে স্থায়ী তহবিল সংরক্ষণ করিবে * দুর্গত এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পশুখাদ্য ও খাবার সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই উদ্দেশ্যে স্থায়ী জরুরি তহবিলের ব্যবস্থা করবে * হারাইয়া যাওয়া/মৃত গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির সংখ্যা, রোগগ্রস্ত গবাদিপশু/হাঁস-মুরগির সংখ্যা ও মহামারীর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদন আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে * সরাইয়া নেওয়া/সংগৃহীত গবাদিপশুর সংখ্যাসহ গবাদিপশু আশ্যয় কেন্দ্রের অবস্থান বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবে (বন্যার সময়) * অবিলম্বে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংগঠিত করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সকল প্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করিবে * উদবাসন আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ হইতে নিজ নিজ এলাকা ও মালিকের নিকট গবাদিপশু প্রত্যর্পণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবে * স্বাভাবিক লভ্যতা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান করবে * বাছাইকৃত পশুসহ গবাদিপশুর পুনর্বাসনের জন্য সকল জরুরি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে * উপদ্রুত এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ কর্তৃক করণীয়

স্বাভাবিক দায়িত্ব নির্বাহ ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসসমূহ নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিজস্ব কর্মগন্ডীর আওতায় সম্পাদন করবে-

ক) স্বাভাবিক সময়ে: * প্রতি বছর এপ্রিল মাসে ঘূর্ণিঝড় মৌসুম শুরু হইবার পূর্বেই গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু এবং উহাদের খাদ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কৃষকগণকে সজাগ করে দিবে * ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকাসমূহে গৃহীত পরিকল্পনার কার্যকারিতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অধীনস্থ অফিসসমূহ, সিপিপি এবং কৃষক প্রতিনিধিদের সহিত নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবে যাতে সর্বনিম্ন পর্যায় হইতে প্রাণিসম্পদ সমূহ একটি সুশৃংখল সুরক্ষা ব্যবস্থায় আবদ্ধ থাকে * ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আক্রমণ হতে গবাদিপশু/হাঁস-মুরগি ইত্যাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে ইহাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় উঁচু জমি, টিলা কিংবা মাটির ঢিবি স্থানীয় প্রশাসনের সহিত আলোচনাক্রমে নির্বাচন করিবে এবং স্থানীয়ভাবে উহা প্রচার করিবে * গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকাসমূহে ঔষধ ও সরঞ্জামের জরুরি মজুদের ব্যবস্থা করবে * ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকাসমূহের জন্য পশুখাদ্যের রিজার্ভ ষ্টক নিশ্চিত করবে * প্রতি বছর এপ্রিল মাসে ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকাসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা সম্পর্কে জরিপ পরিচালনা করবে * নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্থানীয়ভাবে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ প্রস্তুতির পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

খ) দুর্যোগ পর্যায়ে: * স্থানীয় দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য একজন যোগাযোগ অফিসার চিহ্নিত করিবে * আটকাইয়া পড়া গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উদ্ধার ও অপসারণ কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ স্থানীয় জনগণকে/সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে (বন্যার সময়) * আশ্রয়স্থলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিদের টিকাদান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে (বন্যার সময়) * দুর্গত এলাকাসমূহে পশুদের পাইকারী হারে টিকাদানের ব্যবস্থা করিবে (বন্যার সময়)।

গ) পুনর্বাসন পর্যায়ে: * ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গবাদিপশু ক্রয়ের জন্য ঋণ/অনুদান প্রদান ও পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে * ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের জন্য অবিলম্বে জরীপ কার্য পরিচালনা করিবে এবং অন্যান্য এলাকা হইতে গবাদিপশু আমদানির ব্যবস্থা করবে।

৪.৪.২ বন্যাপরবর্তী সময়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য করণীয়

বন্যা বাংলাদেশের একটি দৈনন্দিন চিত্র। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর এপ্রিল হতে অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণত দুই ধরণের বন্যা হয়ে থাকে; ধীরে ধীরে পানির উচ্চতা প্রাপ্ত বন্যা ও হঠাৎ বন্যা। অতিবর্ষণ ও বন্যার ব্যাপক ক্ষতি সমগ্র দেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কিন্তু আমাদের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এ ক্ষতির ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর। আমাদের দেশের সমগ্র গ্রামীণ অঞ্চলসমূহে পারিবারিক ভিত্তিতে পালিত হাঁস-মুরগি, গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়া আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পোল্ট্রি প্রতিপালন সারাদেশেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় এ পেশার সম্প্রসারণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবাদিপশু পালন অনুরূপভাবে উৎকর্ষতা না পেলেও গরু মোটাতাজাকরণ প্রযুক্তি এখন বাণিজ্যিকভাবে বহু খামারিদের নিকট একটি আদর্শ পেশা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আমাদের খামারিরা ছাগল-ভেড়া পালনকে তেমনিভাবে প্রযুক্তিভিত্তিক পর্যায়ে আনতে না পারলেও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের ঘরে ঘরে প্রতিপালন নিতান্ত একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পারিবারিক ভিত্তিতে গ্রামীণ পর্যায়ে যে প্রাণিসম্পদ প্রতিপালিত হয় তার মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের এমনই এক বিপুল সম্পদ প্রকৃত অর্থে সব সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নিকট নিতান্ত অসহায় অবস্থায় থাকে। হাজার হাজার মানুষের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, ফসল, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে যায়। অগণিত হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পোষা পশুপাখির জীবনহানি ঘটে। যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তা পূরণ করার মতো সম্পদ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি আমাদের সীমিত হলেও এ অবস্থা উত্তরণের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বন্যা পরবর্তী সময়ে যেসব পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাবলী নিতে হবে সেগুলি আলোচনা করা হল।

- বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে গবাদিপশুর খাদ্যের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। তাই দেশের বন্যামুক্ত এলাকাসমূহ থেকে গবাদিপশুর খাদ্য যেমন খড়, ভূষি, ঘাস ইত্যাদি ক্রয় করে উপদ্রুত এলাকার কৃষক ও খামারিদের নিকট দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থাকরণ।
- বন্যায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির অধিকাংশ ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এগুলো পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থাও অবিলম্বে প্রয়োজন হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে খামারিদেরকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা উচিত।
- খামারিদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় সব ধরণের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আশ্রয় কেন্দ্র থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার পর গোয়াল ঘর ও হাঁস-মুরগির ঘর মেরামত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত করা জরুরি। ডোবা, নালা বা জলাশয়ের দূষিত পানি কোনক্রমেই গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে পান করতে দেয়া যাবেনা।
- বন্যার পানি নেমে যাবার পরে স্বভাবতই প্রচুর পরিমাণে কঁচি ঘাস গজায়। এজাতীয় ঘাস আপনার গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে না। কারণ তাতে বিষক্রিয়া, ডায়রিয়া বা অন্যান্য মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে।
- বন্যার পরে গবাদিপশুর গলাফুলা, তড়কা, বাদলা, ক্ষুরারোগ ইত্যাদি নানা ধরণের সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। এজন্য সরকারি প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহায়তায় এদেরকে এসব রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে হাঁস-মুরগিরও এ জাতীয় ভ্যাকসিন দিতে হবে।

- বন্যার পরবর্তী সময়ে গবাদিপশুর ডায়রিয়া জাতীয় রোগ প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়। এজন্য পশুদের খাদ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বাসি-পচা খাদ্য দ্রব্য যেন এরা না খায় সেদিকে খেয়াল রাখা বিশেষ জরুরি। রোগের জটিলতার ক্ষেত্রে অবশ্যই নিকটস্থ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- খামারিরা অসুস্থ পশুপাখিকে সুস্থদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন এবং সুস্থদেরকে দেখাশোনা করার পরই অসুস্থদেরকে সেবাযত্ন ও পরিচর্যা করবেন। রোগের জটিলতার ক্ষেত্রে সবসময় পশু হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। রোগাক্রান্ত পশুপাখির মৃত্যু ঘটলে সেগুলো মাঠে ফেলে না দিয়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
- যেহেতু গবাদি পশুরখাদ্যাভাব ঘটে সেহেতু এরা কচুরিপানাসহ অন্যান্য জলজ ঘাস-পাতা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এজন্য এসময়ে কচুরিপানা ও জলজ ঘাস খাওয়ানোর সময় অর্ধেক কচুরিপানা ও জলজ ঘাস এবং বাকী অর্ধেক খড় মিশিয়ে খাওয়ালে ডায়রিয়া হবার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।
- বাড়ির আঙ্গিনায় সংরক্ষিত খড় যদি বন্যার পানিতে ভিজে থাকে এবং তা যদি পচে না যায় তাহলে তা খুব ভালভাবে রোদে শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। গবাদিপশুর জন্য বিকল্প খাদ্য হিসাবে কাঁঠাল পাতা, কলাপাতা, বাঁশ পাতা, হিজল পাতা, জিগা পাতা, মান্দার পাতা, বাবলা পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেও খাওয়ানো যেতে পারে।
- কৃষকভাইদের অনেকের বাড়ির আশপাশের নিচু এলাকা যেখানে পানি জমে থাকে সেখানে দল ঘাস নামক এক জাতীয় জলজ ঘাস চাষ করা যেতে পারে। এছাড়া বাড়ীর আশপাশে বা পরিত্যক্ত স্থানে পশুপাখির খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ইপিল ইপিল, ধইঞ্চা, নেপিয়ার, পারা ইত্যাদি ঘাস চাষ করা উচিত। এসব ঘাসের কাটিং, বীজ ইত্যাদি নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়।
- এসময় বাড়ীর আশেপাশে ও পতিত জমিতে গবাদির খাদ্যের জন্য খেসারি, মাসকলাই এবং ভুট্টার বীজ ছিটিয়ে দিলে অল্প দিনের মধ্যেই তা গবাদিপশুর জন্য উত্তম ফডার হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হবে।
- মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত খাদ্য নষ্ট না করে তা হাঁস-মুরগিকে খেতে দিতে হবে। এ সময়ে নিচু এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে শামুক ও ঝিনুক পাওয়া যায় যা সংগ্রহ করে হাঁস-মুরগিকে দিলে প্রয়োজনীয় আমিষের সংস্থান হবে।
- হাঁস-মুরগির ঘরের মেঝেতে ছাই, তুষ, কাঠের গুঁড়া বা বালি বিছিয়ে দেয়া উচিত এবং তা কয়েকদিন পর পর পরিবর্তন করতে হবে। ঘরের পরিবেশ সবসময় শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পশুপাখির ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস যেন প্রবাহিত হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দুর্গত এলাকায় স্বভাবতই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ করে যা থেকে নানা ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাবের সমূহ সম্ভাবনা থকে। এজন্য এসমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণুনাশক বিতরণ করতে হবে। দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির চরম সঙ্কট বিরাজ করে। এজন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করাও খুবই জরুরি।
- উপদ্রুত এলাকায় মানুষের মনোবল সমুন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের পাশে দাঁড়ানো। এজন্য সরকারি ও অন্য সকল সংস্থান কর্মীদের সমন্বয়ে সম্মিলিতভাবে একটি টিম হিসাবে কাজ করার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- বন্যার ন্যায় মহাদুর্যোগ এদেশের জন্য আকস্মিক বিপদ নয়। এজন্য এ দুর্যোগ যথাসময়ে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেটে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখা যেতে পারে। তাহলে সরকারের নির্দেশ মোতাবেক তা জরুরি ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে।

এসমস্ত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেই বন্যা পরবর্তী দুর্যোগ উত্তরণ করতে হবে। আমাদের পারিবারিক প্রাণিসম্পদ দেশের অমূল্য সম্পদ। প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের ক্ষেত্রে এখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। তাই এককভাবে এর অপূরণীয় ক্ষতির উত্তরণ পাওয়া দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যময় এ শিল্পকে সমুন্নত রাখতে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সকল সংস্থার সর্বাত্মক, সক্রিয় ও ঐকান্তিক সবধরণের সহযোগিতা ও সহায়তা একান্ত কাম্য।

৪.৪.৩ দুর্যোগ থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষার জন্য সুপারিশসমূহ

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি পর্যায়ে, স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ের সুপারিশসমূহ শুধু বন্যা বা বন্যাত্তোর পুনর্বাসন কর্মসূচির আলোকেই নয় বরং দেশের সার্বিক প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের স্বার্থেই বাস্তবায়িত হওয়া দরকার। তবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তি পর্যায়ে: * বন্যার ব্যাপারে সচেতনতা বা পূর্ব প্রস্তুতি রাখা। খামার করার সম্ভব হলে বন্যায় ডুবে যায় এমন এলাকা এড়িয়ে যাওয়া বা তা সম্ভব না হলে খামারের জায়গা উঁচু করে নেওয়া * বর্ষা মৌসুমের আগে ঘরের দেয়াল, পার্শ্ব দেয়াল, ছাদের ছিদ্র কিংবা অনাকাঙ্খিত ফাঁকফোকর থাকলে তা বন্ধ করে নেয়া * বৃষ্টির পানিতে যাতে শেড ভিজে না যায় সেজন্য পর্দা ঠিকঠাক করে নেওয়া ও পার্শ্ব ছাউনি একটু বাড়িয়ে করা * খামারে যাতে কোথাও পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা। খামারের নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলে তা সারিয়ে ফেলা * যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে যাতে পণ্যাদি বাজারজাতকরণে অসুবিধা না হয় তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা * যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার জন্য যাতে খাদ্যের অভাব না হয় তার জন্য আপৎকালীন খাদ্য মজুদ রাখা। গুদামঘরে খাদ্য মজুদের সময় খেয়াল রাখতে হবে আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য যাতে খাদ্যে ছত্রাক না হয় * কচুরিপানা জাতীয় খাবার না খাওয়ানো। খড় উঁচু জায়গায় চালার নিচে রাখা * নতুন গজানো ঘাস না খাওয়ানো, খাওয়ালে খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো * কোন পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আলাদা রাখা। কারণ বন্যার সময় পশু চড়ানোর জায়গায় পশুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রোগ দ্রুত বিস্তৃত হয় * পশুপাখিকে বৃষ্টির পানিতে দীর্ঘক্ষণ ভিজতে না দেওয়া। বাঁধ বা রাস্তার পাশে গবাদিপশু রাখলে ছাউনির নিচে রাখা * পর্যাপ্ত ঔষধ ও ভ্যাকসিন মজুদ রাখা। ভ্যাকসিন সিডিউল মেনে চলা * লিটার বা বিছানার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাতে এগুলো ভিজে না যায় * বাচ্চা পরিবহনের সময় বাচ্চা যাতে ভিজে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক রাখা।

স্থানীয় পর্যায়ে: * উপজেলা পরিষদের বরাদ্দে প্রাণিসম্পদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। এসব বরাদ্দের সাহায্যে পশুখাদ্য ক্রয়, উঁচু স্থানে আবাস নির্মাণ, অস্থায়ী আবাস বা ছাউনি নির্মাণের জন্য সামগ্রী ক্রয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রির অনুমোদন আছে এমন সিনথেটিক কমদামী শিট ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য পলি প্রপাইনিল বা জিআই পাইপের (পুনঃব্যবহার যোগ্য) ফ্রেম তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে * বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদকে গুরুত্ব দেয়া। সাধারণত পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদকে কৃষির উপখাত হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এজন্য বরাদ্দের প্রশ্নে প্রাণিসম্পদ খাত প্রায়শই বঞ্চিত হয়। বিভিন্ন আধুনিক জাতের ঘাস চাষ, ভূট্টা, সয়া চাষ, বিভিন্ন উপজাত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নেওয়া যায় * তাছাড়া, জনসাধারণের বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে প্রাণিসম্পদ রক্ষায় করণীয় কি সে সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে।

জাতীয় পর্যায়ে: * বন্যাকালীন সময়ে ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও এখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি * প্রানিসম্পদ খাতকে একটি স্বতন্ত্র খাত হিসেবে বিবেচনা করা। বিশেষত উপজেলা পর্যায়ের বরাদ্দ বিভাজনের ক্ষেত্রে এ খাতকে আলাদা খাত হিসেবে বিবেচনায় নিলে এ খাতের গুরুত্ব অনেকটা বাড়বে * জাতীয় পর্যায়ে একটি শক্তিশালী ডাটাবেজ ও ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলা যাতে করে বন্যার সময় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব দ্রুত পাওয়া যায় * গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য পৃথক আশ্রয়কেন্দ্র এবং আপৎকালীন খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা * গবাদিপশুর চিকিৎসা সেবা ও রোগ প্রতিরোধ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি * বন্যা মোকাবেলার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার অফিস সমূহকে আরো আধুনিক করে তোলা।

প্রাণিসম্পদ খাতে বরাদ্দের অপ্রতুলতা যেমন একটি সমস্যা তেমনি সামাজিকভাবে এই খাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার মনোভাবের অভাবও সামগ্রিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমাদের দেশে বন্যা, ঝড়, খরা ইত্যাদি মোকাবেলা করে একটি স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হলে প্রাণিসম্পদ খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বন্যার সঙ্গেই আমাদের বসবাস করতে হবে। বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আমাদের ভূখন্ড বসবাসের অনুপযোগী করে তোলার মারাত্মক ঝুঁকি আমাদের নিতে হতে পারে। তাছাড়া এদেশে সামাজিক ন্যায় বিচার ও দরিদ্র অভিসারী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চাইলে প্রাণিসম্পদ খাতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতেই হবে। কারণ আমাদের পশুপাখির ৬০-৭৫ ভাগের মালিক দরিদ্র বা ক্ষুদ্র কৃষক। প্রাণিসম্পদকে বন্যার সময় গুরুত্ব না দিলে ক্ষতির বোঝাটা তাদের উপরই চাপবে।

অধ্যায় ৫

গবাদিপশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন

৫.১ পশুর প্রজনন

গাইনিকোলজি শব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রীক শব্দ ‘gyne’ (অর্থ প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীলোক) এবং `logos’ (অর্থ আলোচনা করা) থেকে। অর্থাৎ মেডিক্যাল বিজ্ঞানের যে বিষয়ে মহিলাদের জনন তন্ত্রের রোগ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে গাইনিকোলজি বলে। অবস্ট্রেট্রিক্স শব্দের ব্যুৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘obsterix’ (অর্থ ধাত্রী- midwife) থেকে। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার গর্ভধারণ থেকে বাচ্চা প্রসব অবস্থা পর্যন্ত যত্ন ও সমস্যা সম্পর্কে যে বিষয়ে আলোচনা করে তাকে অবস্ট্রেট্রিক্স বলা হয়। ভেটেরিনারি গাইনিকোলজি প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী পশুর রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং ভেটেরিনারি অবস্ট্রেট্রিক্স পশুর গর্ভধারণ থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত যত্ন ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। জনন ক্রিয়া বা রি-প্রডাকশন একটি জটিল বিজ্ঞান। রি-প্রডাকশনে অকৃতকার্য হলে আশ্চর্য হওয়ায় কিছু নেই। কিন্তু অধিকাংশ গর্ভাবস্থায় ফিটাসের সাফল্যের সাথে জন্ম লাভ একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা। সব মিলিয়ে রি-প্রডাকশন একটি জটিল বিষয়। তাই এই জটিল বিজ্ঞান সম্পর্কে সুষ্টুভাবে জ্ঞান লাভের জন্য এনাটমি, ফিজিওলজি, এন্ডোক্রাইনোলজি, এন্ড্রোলজি, এমব্রায়োলজি, হিস্টোলজি, সাইটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও পুষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পশুর রি-প্রডাকশন পদ্ধতি প্রধানত তিনটি কাজে ব্যবহার হয়। যথা- ক) প্রজাতি বা জাতকে বিলুপ্ত থেকে রক্ষা করা। খ) মানুষের খাদ্য সংস্থান করা যেমন- দুধ মাংস ইত্যাদি এবং গ) জেনিটিক উন্নতি সাধন। পশু পালন লাভজনক করতে হলে নিয়মিত ও উপযুক্ত বাচ্চা উৎপাদন আবশ্যক। পশুর খামারে নিয়মিত ও সুস্থসবল বাচ্চা উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

- স্ত্রী পশুর স্বাভাবিক সংখ্যায় ডিম্বাণু সৃষ্টি এবং সে ডিম্বাণু পুরুষ পশুর শুক্রাণুর দ্বারা নিষক্তি হতে হবে।
- স্ত্রী পশুর জননতন্ত্র অবশ্যই সুস্থ, স্বাভাবিক ও ক্রটিমুক্ত হতে হবে যাতে ভ্রূণ ধারণে বিঘ্ন না ঘটে।
- পুরুষ পশুকে অবশ্যই পর্যাপ্ত সুস্থ সবল শুক্রাণু তৈরিতে সক্ষম হতে হবে যা ডিম্বাণুর সাথে নিষক্তি হবে।
- গরম হওয়া পশুকে সঠিক সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে পাল দিতে বা কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সহজে গর্ভধারণ সম্ভব হয়।

৫.১.১ গাভীর জনন তন্ত্র

স্ত্রী পশুর জনন তন্ত্র (genital system) বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত। যথা- ১। ডিম্বাশয় (ovary), ২। ডিম্বনালী (oviduct), ৩। জরায়ু (uterus), ৪। জরায়ু-গ্রীবা (cervix), ৫। যৌনি (vagina) এবং ৬। যৌনিমুখ (vulva) ওলান স্ত্রী পশুর জনন তন্ত্রের একটি আনুষঙ্গিক বা অতিরিক্ত অঙ্গ যা গর্ভান্থার শেষ পর্যায়ে সক্রিয় হয়।

১। ডিম্বাশয় (ovary): প্রতিটি স্ত্রী জাতীয় পশুর দু'টি করে ডিম্বাশয় থাকে। এই ডিম্বাশয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জনন গ্রন্থি যা পশুর উদর গহবরে অবস্থিত এবং এর পৃষ্ঠদেশ ব্রড লিগামেন্টের সাথে সংযুক্ত। গাভীর ডিম্বাশয়ের আয়তন প্রায় ৩৫×২৫×১৫ মিলিমিটার। তবে আমাদের দেশী গাভীর ডিম্বাশয় অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রতিটি ডিম্বাশয়ে ৭৫,০০০ এর অধিক ফলিকল থাকে (Health and Olusanya 1988; Banerjee 1991)। ডিম্বাশয় প্রধানত দু'ধরণের কার্য সম্পাদন করে। যথা- ডিম্বাণু উৎপাদন এবং হরমোন (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরোন ইত্যাদি) ক্ষরণ।

২। ডিম্বনালী (oviduct): ডিম্বানালীকে ফ্যালোপিয়ান টিউব বলা হয়। এটি সরু আঁকাবাঁকা নালী বিশেষ। এই নালী ডিম্বাশয়ের অতি নিকটে থাকে। গাভীর ডিম্বনালী ২০-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। এর ছিদ্রের ব্যাস প্রায় ০.১ সেন্টিমিটার। ডিম্বনালীর প্রধান তিনটি অংশ থাকে। যথা- ইনফানডিবুলাম (infundibulum), এ্যাম্পুলা (ampulla) এবং ইসথমাস (isthmus)। ডিম্বনালীর ফানেল আকৃতির মুখে (infundibulum) ডিম্বাণু অতি সহজেই স্খলিত হয়। ডিম্বনালীর উপঝিল্লীক কোষ সিলিয়াযুক্ত যার গতি নলের ভিতর মুখী। ইসথমাস অ্যাম্পুলার সংযোগ স্থানে ডিম্ব স্খলিত হয় এবং সিলিয়ার গতি ও পেশী কলার সংকোচনের ফলে ডিম্বাণু জরায়ুর দিকে ধাবিত হয়। আর নিষিক্ত ডিম্ব (fertilized ovum) গবাদিপশুর জরায়ুতে ৩-৪ দিনের মধ্যে জরায়ুতে নেমে আসে।

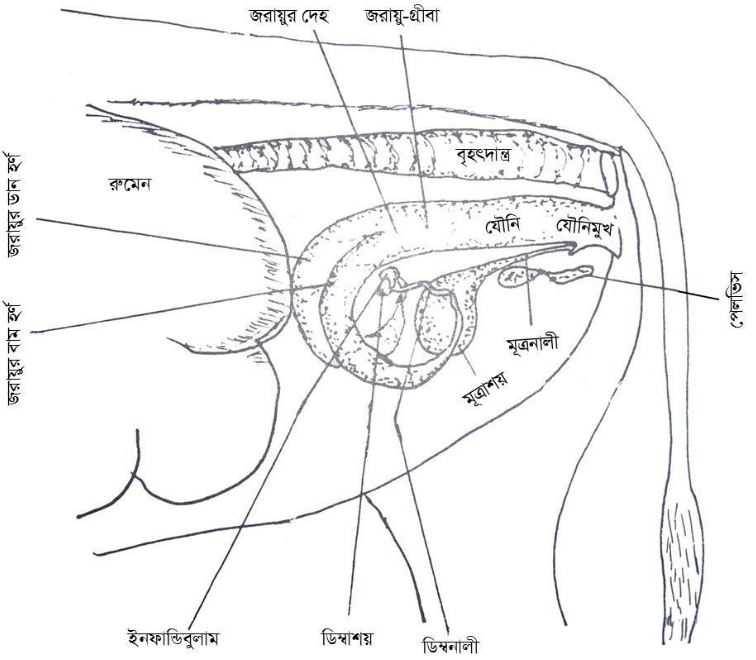

চিত্র ৫.১ঃ গাভীর জনন তন্ত্রের গঠন।

৩। **জরায়ু (uterus):** এক জোড়া কুন্ডলী পাকানো শৃঙ্গ ও মাঝারি আকৃতির দেহ সংযোগে জরায়ু ইংরেজি 'Y' আকৃতির একটি ফাঁপা মাংসল অঙ্গ বিশেষ। জরায়ুর সাধারণ গহবরের সাথে উক্ত দু'টি শৃঙ্গের ছিদ্র সংযুক্ত। অগর্ভাবস্থায় জরায়ু পেলভিক গহবরে অবস্থান করে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় বিশেষ করে ৫০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে জরায়ু উদর গহবরে নেমে আসে। জরায়ুর প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত যথা- ক) বাহির স্তর- সারভোসা (servosa/serosa), খ) মাঝের স্তর- মাসকুলারিস (myometrium) এবং গ) ভিতরের স্তর- মিউকোসা (endometrium)। জরায়ু দেহ এবং শৃঙ্গের মিউকোসা গ্রন্থি (uterine glands) ভ্রূণের পুষ্টি যোগাতে 'জরায়ু দুধ' ('uterine milk') ক্ষরণ করে। পরবর্তীতে মিউকোসার ক্যারানকল (caruncle) ফিটাসের প্লাসেন্টোর ০.২ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধে কটিলেডনের সাথে সংযুক্ত থেকে জন্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ফিটাসে পুষ্টি সরবরাহ করে।

৪। **জরায়ু গ্রীবা (cervix):** জরায়ু গ্রীবা জরায়ু ও যৌনির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মাংসপেশীর স্ফিংটার যা কপাটিকার কাজ করে। অধিকাংশ খামারভূক্ত পশুর জরায়ু-গ্রীবা ৫-১০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২-৫ সেন্টিমিটার চওড়া থাকে। এই কপাটিকা গর্ভাবস্থায় ও অগরম অবস্থায় শক্তভাবে আটকানো থাকে। গরম অবস্থায় ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এই কপাটিকা খুলে যায়। আবার বাচ্চা প্রসবের সময় এই কপাটিকা খুলে যায় ইস্ট্রোজেন ও প্রস্টাগ্লানডিন এফ$_২$ আলফা হরমোনের প্রভাবে। তবে গবাদিপশুর ইস্ট্রাসের ৪-১৭ দিন পর্যন্ত (লুটিয়াল ফেজ অবস্থায়) এই কপাটিকা বন্ধ থাকে। আবার ইস্ট্রাসের (ফলিকুলার ফেজ অবস্থায়) প্রথম ০-৩ দিন এবং শেষের ১৮-২১ দিন খোলা থাকে। তাই পশুর গরম অবস্থায় জরায়ু-গ্রীবার গবলেট কোষ এক প্রকার জীবাণুনাশক আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে যা যৌনিদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, ইস্ট্রোজেনও জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সাহায্য করে।

৫। **যৌনি (vagina):** যোনি স্ত্রী ও পুরুষ পশুর মিলনের স্ত্রী যৌন অঙ্গ। এটি অতি স্থিতিস্থাপক অঙ্গ যা যৌনি মুখ থেকে জরায়ু-গ্রীবা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যৌনিমুখ থেকে মিউকাস ক্ষরিত হয়। যৌনি মিলনের সময় এটি যৌন অঙ্গ হিসেবে কার্য সমাধা করে। যৌনির শেষ প্রান্তে অর্থাৎ গাভীর জরায়ু মুখের সামনে বীর্যপাত হয়। বাচ্চা প্রসবের সময় এই যৌনি প্রসবনালীর (bath canal) কাজ করে। অগর্ভাবস্থায় গাভীর যোনি ১৫-৪০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ থাকে।

৬। যৌনিমুখ (vulva): মলদ্বারের সামান্য নিচে অবস্থিত স্ত্রী পশুর জননালীর বাহিরের লম্বালম্বি আকৃতির ছিদ্র পথই যৌনি মুখ। এই যৌনি মুখে টেকটাইল লোম (tectile hair) বিশিষ্ট দু'টি ওষ্ঠ থাকে। যৌনির ছিদ্র অপেক্ষা যৌনিমুখ অধিক চওড়া হয়। মূত্র বহির্গমনের মুখ যৌনি ও যৌনি মুখের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। যৌনি মুখে প্রচুর গ্রন্থি রয়েছে। যৌন উত্তেজনায় এই গ্রন্থি থেকে পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়ে সংগমকালে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যৌনি মুখের মেঝের পশ্চাদভাগে পুরুষাঙ্গের ন্যায় ছোট বোধহীন উত্থানক্ষম (erectile) ভংগ্নাকুর (clitoris) থাকে।

৫.১.২ যৌবনারম্ভ ও জনন প্রক্রিয়ায় হরমোনের ভূমিকা

যে বয়সে বা সময়ে পশুর জনন অঙ্গ পরিপক্ক হয় এবং ডিম্ব ক্ষরণের মাধ্যমে প্রথম গরম হয়ে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে তাকে যৌবনারম্ভ (puberty) বলে। পুরুষ পশুর প্রথম শুক্রপাত বা বীর্যপাত এবং স্ত্রী পশুর প্রথম ইস্ট্রসে আসা বা ডাকা যৌবনারম্ভ হওয়ার লক্ষণ। সাধারণত ১৫-২৪ মাস বয়সে ঘোড়া, ৮-১৮ মাস বয়সে গরু ও মহিষ (প্রজাতির উপর নির্ভরশীল), ৬-১০ মাস বয়সে ছাগল, ৬-১২ মাস বয়সে কুকুর ও বিড়াল ৫-৮ মাস বয়সে শূকর এবং ৭-১০ মাস বয়সে মেষের যৌবন শুরু হয়। অবশ্য বিভিন্ন পশুর প্রজাতি ও জাতের যৌবনারম্ভ কাল পরিবর্তনশীল। প্রধানত প্রজাতি, জাত জেনেটিক ফ্যাক্টর, ঋতু, পুষ্টি ইত্যাদির উপর যৌবনারম্ভ কালের তারতম্য হয়।

জন্ম হতেই স্ত্রী জাতীয় পশুর ডিম্বাশয়ে গ্র্যানুলোসা কোষ বেষ্টিত বহু ডিম্ব অঙ্কুর থাকে। স্ত্রী পশুর যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস হতে গোনাডোট্রফিন রিলিজিং হরমোন সম্মুখবর্তী পিটুইটারি গ্রন্থি প্রভাবান্বিত হয়ে ফলিকুল স্টিমিউলেটিং হরমোন (FSH) ডিম্বাশয়ের প্রথম ফলিকল (graafian follicle) পরিপক্ক করে। এই ফলিকল ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে জনন অঙ্গকে পরিপক্ক করে। ফলে অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি সাধন হয়, স্ত্রী পশুর বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং ইস্ট্রাস চক্র শুরু হয়। সুস্থ স্বাভাবিক স্ত্রী পশুর যৌবনারম্ভের পর গর্ভধারণ না করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়মে ঋতু বা ইস্ট্রাস চক্র আবর্তিত হতে থাকে। আর এই চক্র সংঘটিত হয় ডিম্বাশয়ের চক্রাকার পরিবর্তনের ফলে (Thomas 1983; Morrow 1986)।

৫.১.৩ ইস্ট্রাস চক্রে হরমোনের ভূমিকা

প্রধানত পিটুইটারি প্রন্থির হরমোন ডিম্বাশয়ের উপর এবং ডিম্বাশয়ের হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থির উপর ক্রিয়ার মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে ইস্ট্রাস চক্র নিয়ন্ত্রিত হয়।

১ম অবস্থা (1st stage) সম্মুখবর্তী পিটুইটারি গ্রন্থির ফলিকল স্টিমিউলেটিং হরমোন (FSH) রক্তের মাধ্যমে ডিম্বাশয়ে গ্র্যানুলোসা কোষের বৃদ্ধি ঘটিয়ে ডিম্বযুক্ত ফলিকল (graafian follicle) সৃষ্টি করে।

২য় অবস্থা (2nd stage) ডিম্বাশয়ের ফলিকল ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণ করে। এই হরমোন স্ত্রী পশুকে গরম, জনন অঙ্গকে মিলনের উপযোগী এবং পিটুইটারি গ্রন্থিকে লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) নিঃসরণে সহায়তা করে।

৩য় অবস্থা (3rd stage) পিটুইটারি গ্রন্থি লিউটেনাজিং হরমোন নিঃসরণ করে। এই হরমোন ফলিকুলকে পরিপক্ক ও ডিম্বস্ফোটন করে। ডিম্বস্ফোটনের শূন্য ফলিকুলে গ্রানুলোসা ও থিকাল স্তরের কোষের বৃদ্ধির ফলে করপাস লিউটিয়াম সৃষ্টি হয়।

৪র্থ অবস্থা (4th stage) করপাস লিউটিয়ামের প্রোজেস্টেরোন হরমোন ফলিকল স্টিমিউলেটিং হরমোন সৃষ্টি বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে পশু গর্ভধারণ করছে কি করছেনা তার উপর ভিত্তি করে কার্যসম্পাদন হয়। যদি পশু গর্ভধারণ করে তবে ভ্রূণ জরায়ু নিঃসৃত প্রোস্ট্রগ্লান্ডিনকে প্রতিরোধ করে। ফলে ইস্ট্রাস চক্র বন্ধ হয়। পশু যদি গর্ভধারণ না করে তবে ডিম্বস্ফোটনের প্রায় ১৬/১৭ দিন পরে জরায়ু গ্রন্থির সৃষ্ট প্রোস্টাগ্লান্ডিন করপাস লিউটিয়ামকে বিনষ্ট (luteolysis) করে। ফলে প্রোজেস্টেরোন হরমোন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় সম্মুখবর্তী পিটুইটারী গ্রন্থি পুনরায় ফলিকল স্টিমিউলেটিং হরমোন নিঃসরণ আরম্ভ করে। শুরু হয় নতুন ইস্ট্রাস চক্র।

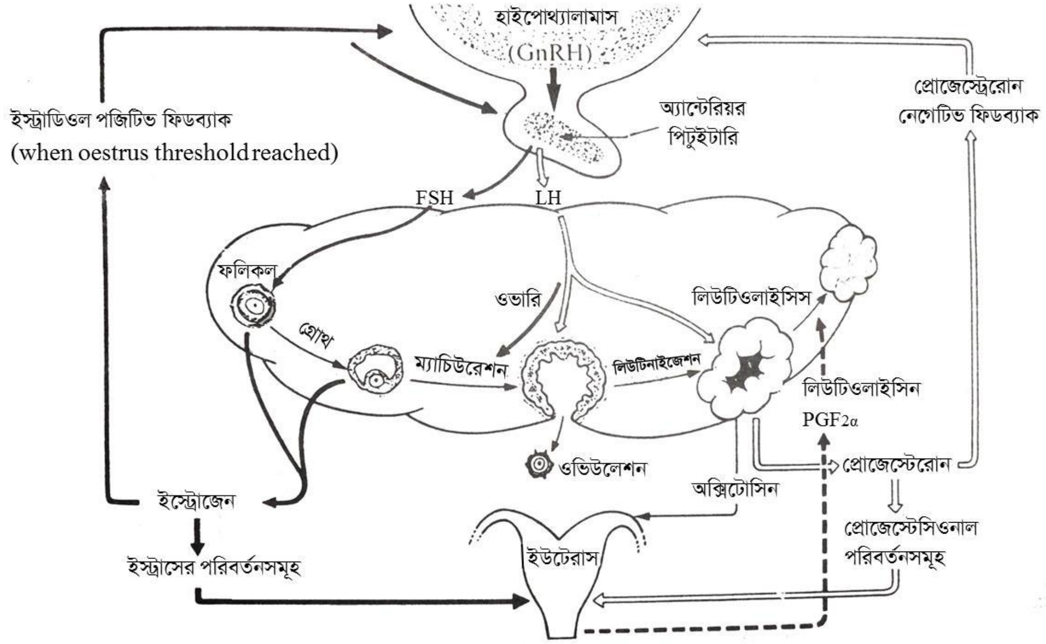

চিত্র ৫.২ঃ ডিম্বাশয় চক্রে হরমোনের নিয়ন্ত্রণ।

ইস্ট্রাস চক্র মূলতঃ হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারী, ডিম্বাশয় ও জরায়ুর হরমোনের মিথষ্ক্রিয়ায় (interaction) একটি জটিল এন্ডোক্রাইনোলজিক্যার প্রক্রিয়া। হাইপোথ্যালামাস গোনাডেট্রফিন রিলিজিং হরমোনের (GnRH) প্রভাবে সম্মুখবর্তী পিটুইটারী গ্রন্থির ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বাশয়ে ফলিকল সৃষ্টি করে। এই ফলিকল ইস্ট্রোজেন (oestradiol 17β) হরমোন সৃষ্টি করে। এই হরমোন একদিকে জরায়ুকে মিলন ও গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত করে অন্যদিকে পজিটিভ ফিড ব্যাক পদ্ধতিতে হাইপোথ্যালামাস তথা পিটুইটারি গ্রন্থিকে লিউটেনাইজিং হরমোন (LH) নিঃসরণে সহায়তা করে। এই লিউটিনাইজিং হরমোন ফলিকলকে পরিপক্ক ও ডিম্বস্ফোটনে সাহায্য করে। এছাড়াও পরবর্তীতে ফলিকলে করপাস লিউটিয়াম সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণে (leutrophic) সহায়তা করে। আর এই করপাস লিউটিয়াম প্রোজেস্টেরোন হরমোন নিঃসরণ করে এবং নিগেটিভ ফিড ব্যাক পদ্ধতিতে হাইপোথ্যালামাসের উপর প্রতিক্রিয়ায় GnRH নিঃসরণ হ্রাস করে। পরিণামে ফলিকল স্টিমিউলেটিং ও লিউটেনাইজিং হরমোন নিঃসরণও বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে পশু গর্ভধারণ না করলে জরায়ুর গ্রন্থি (endometrial glands) নিঃসৃত প্রোস্টাগ্লান্ডিন এফ২ আলফা ($PGF_2\alpha$) করপাস লিউটিয়ামকে লিউটোলাইসিস করে প্রোজেস্টেরোন হরমোন নিঃসরণ বন্ধ করে দেয়। ফলে তখন নেগেটিভ ফিড ব্যাক পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যায়। পরিণামে বাড়ন্ত ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়ে যায়। এই হরমোন পজিটিভ ফিড ব্যাক প্রক্রিয়ায় হাইপোথ্যালামাসকে উত্তেজিত করে। পরিণামে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি ফলিকল স্টিমিউলেটিং ও লিউটিনাইজিং হরমোন নিঃসৃত করে যা ডিম্বস্ফোটন ঘটায়। গর্ভধারণ না হলে পুনরায় একই পদ্ধতিতে পশুর পরবর্তী ঋতু চক্র আরম্ভ হয়ে যায়।

৫.১.৪ প্রজনন পদ্ধতি

মানুষের কল্যাণের জন্য পশু প্রজননের মূল উদ্দেশ্য পশুর দৈহিক ও গুণগতমান উন্নয়ন করা। পশু উন্নয়নের জন্য পশু প্রজননকারীর পশু নির্বাচন ও প্রজনন পদ্ধতি (system of breeding) একমাত্র পথ। প্রধানত দু'টি পদ্ধতির মাধ্যমে পশু প্রজনন করা যায়। যথা- ১) ইন-ব্রিডিং (In-breeding) এবং ২) আউট-ব্রিডিং (Out-breeding)।

১। ই-ব্রিডিং (In-breeding)

নিকট সম্পর্কযুক্ত পশুর মধ্যে প্রজনন ঘটানো হলে তাকে ইন-ব্রিডিং বলা হয়। এই পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে করা যায়।

ক) ক্লোজ ব্রিডিং (Close breeding): এই পদ্ধতিতে ভাই × বোন, মা × ছেলে, বাপ × মেয়ে সম্পর্কের পশুর মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। **সুবিধাসমূহ:** অবাঞ্ছিত প্রচ্ছন্ন (recessive) জীন সনাক্ত করা যায় এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজননের লাইন থেকে বাদ দেয়া যায়। বংশধরদের বৈশিষ্ট্য একরুপ বা অপরিবর্তনশীল থাকে। **অসুবিধাসমূহ:** বংশধরের মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায়। প্রজনন সমস্যা ও জননে অক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতির প্রজনন বন্ধ করার সময় নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক। বংশধররা বংশগত রোগে অধিক সংবেদনশীল হয়। প্রজননের পর্যায় বা অবস্থা জানা কঠিন হয়।

খ) লাইন ব্রিডিং (Line breeding): এই পদ্ধতিতে নিয়মিত ভাবে দূর রক্ত সম্পর্কিত পশুর মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। যেমন- খুড়তুতো, জেঠতুতো, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই ও ভগিনী সম্পকিত পশুর মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়। **সবিধাসমূহ:** পশুর বংশের লাইন সংরক্ষণ করা যায়। ক্লোজ ব্রিডিংয়ের অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য রোধ করা যায়। **অসুবিধাসমূহ:** প্রজননকারী বংশ বিবরণের (pedigree) তেমন গুরুত্ব দেয়না। বেশ কয়েকবার প্রজননের পরে নির্বাচনে তেমন কোন উপকার পাওয়া যায় না।

ইনব্রিডিং পদ্ধতির ব্যবহার ও সাধারণ ফলাফল: ক্লোজ ও লাইন ব্রিডিংয়ের ফলাফল মূলত একই। তবে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। ক্লোজ ব্রিডিংয়ে লাইন ব্রিডিং অপেক্ষা অধিক অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হল।

- ইন-ব্রিডিংয়ে জেনেটিক প্রতিক্রিয়া (Genetic effects of in-breeding): ধারাবাহিকভাবে ইন-ব্রিডিং এর ফলে জেনেটিক্যালি হোমোজাইগোসিটি সৃষ্টি হয়। ইহা প্রকট (dominant) এব প্রচ্ছন্ন (recessive) জীন বিশিষ্ট হোমোজাইগাস বংশ বা পরিবার সৃষ্টি কওে এবং ইন-ব্রিড বংশ থেকে হেটারোজাইগোসিটি কমতে থাকে। উদাহরণ- আমরা যদি ১০০% হেটারোজাইগাস (Aa) পশু নিয়ে প্রজনন আরম্ভ করি, তবে প্রতি জনুতে (generation) ৫০% হোমোজাইগাস জেনোটাইপ বৃদ্ধি পায় (চিত্র-১৩)। অর্থাৎ ৫০% হেটারোজাইগোসিটি কমতে থাকে এবং ১০তম জনুর পওে হেটারোজাইগোসিটি দূরীভূত হয়ে বিশুদ্ধ হোমোজাইগাস বংশ বা লাইন সৃষ্টি হয়। তবে এতে প্রজন্মের মধ্যে জেনেটিক সমরূপতা (uniformity) বজায় থাকে।
- পশুর খাঁটি জাত বা স্ট্রেন রক্ষার একমাত্র প্রজনন পদ্ধতি। এতে অবাঞ্ছিত পশু ছাঁটাই সহজ হয়।
- ইন-ব্রিডিংয়ের বাহ্য প্রতিক্রিয়া:
  - ✓ দৈহিক বাড়নের উপর প্রতিক্রিয়া- গবেষণাগারের প্রাণীর ক্ষেত্রে বাড়ন ও ওজন হ্রাস পায়।
  - ✓ জননকার্যে প্রতিক্রিয়া- শুক্রাশয়ে পূর্ণতা ও যৌবনারম্ভ দেরিতে হয়। এছাড়া ভ্রূণের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।
  - ✓ পশু স্বাস্থ্যে প্রতিক্রিয়া- নিকট সম্পর্কে অর্থাৎ বংশের মধ্যে প্রজননে উৎপাদিত পশুর মৃত্যুর হার দূর সম্পর্কের পশুর মধ্যে প্রজননে উৎপাদিত পশু অপেক্ষা অধিক।
  - ✓ উৎপাদনের উপর প্রতিক্রিয়া- ইন-ব্রিডিং বৃদ্ধির ফলে প্রজন্মের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
  - ✓ মারাত্মক ও অস্বাভাবিকতা- আউট-ব্রিড অপেক্ষা ইন-ব্রিড পশুর মধ্যে বংশগত অস্বাভাবিকতা বা মারাত্মক বৈশিষ্ট্য (lethal factors) অধিক পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ক্লোজ ব্রিডিং অপেক্ষা লাইন ব্রিডিং পদ্ধতিতে প্রজনন অধিক নিরাপদ।
- গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে ইন-ব্রিড প্রাণীর প্রয়োজন হয়।
  - প্রধানত কতিপয় ক্ষেত্রে ইন-ব্রিডিং পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়। যথা- উন্নত জাতের পশু পালন, খামার মালিক যখন ইন-ব্রিডিংয়ের সম্ভাবনা ও সুপ্ত বিপদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ থাকে, পশুপালে দুই বা ততোধিক ষাঁড় ব্যবহার করে ইন-ব্রিডিং ফলাফল নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কতিপয় পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।
  - আবার কতিপয় ক্ষেত্রে পশুর পালে সাধারণত ইন-ব্রিডিং পদ্ধতি সুপারিশ করা হয় না। যেমন- ক্রম অনুসারে সাজানো অথবা বাণিজ্যিক ফার্ম এবং জেনেটিক জ্ঞান বর্জিত খামার মালিক ও একটি মাত্র প্রজননক্ষম ষাঁড় থাকলে।

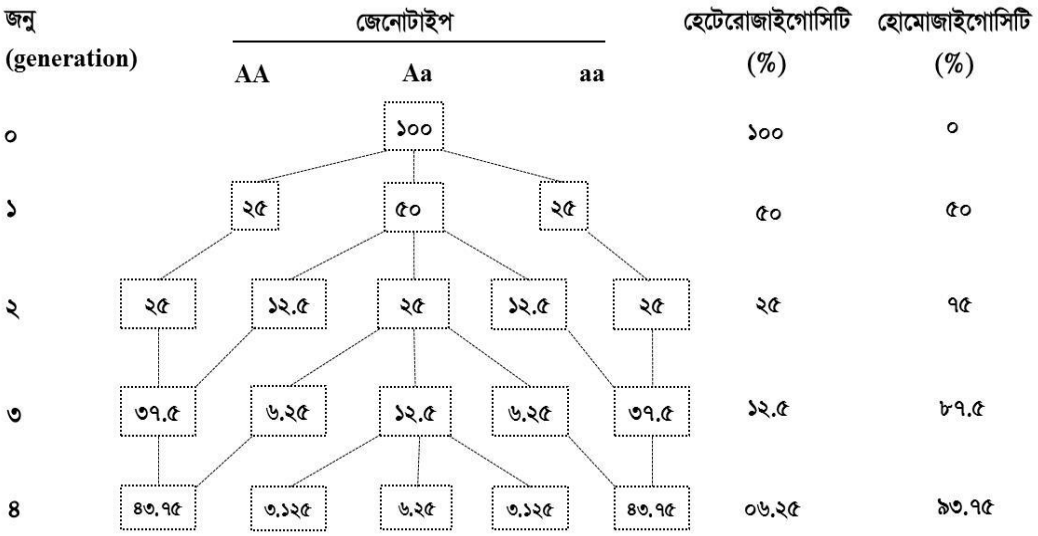

চিত্র ৫.৩ঃ ইন-ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে হোমোজাইগোসিটি বৃদ্ধির নমুনা।

২। আউট-ব্রিডিং (Out-breeding)

রক্ত সম্পর্কিত নয় এমন পশুর মধ্যে প্রজনন পদ্ধতিকে আউট-ব্রিডিং বলা হয়। প্রধানত চারটি পদ্ধতিতে পশুর আউট-ব্রিডিং করা হয়। যথা- ক) আউট-ক্রসিং (Out-crossing), খ) ক্রস-ব্রিডিং (Cross-breeding), গ) প্রজাতির সংকরায়ন (Species hybridization) এবং ঘ) গ্রেডিং-আপ (grading-up)।

ক) আউট-ক্রসিং (Out-crossing): পরস্পর সম্পর্কিত এমন বিশুদ্ধ জাতের পশুর মধ্যে প্রজনন পদ্ধতিকে আউট-ক্রসিং বলা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধাসমূহ- (অ) পশুর জাতের উৎকৃষ্ট গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেমন- দুধ উৎপাদন, মাংসল জাতের পশুর দ্রুত দৈহিক ওজন বৃদ্ধি। (আ) সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জেনেটিক উন্নয়নের জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি। (ই) প্রায় সকল পশু পালের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

খ) ক্রস-ব্রিডিং (Cross-breeding): বিভিন্ন জাতের পশুর মধ্যে প্রজননের পদ্ধতিকে ক্রস-ব্রিডিং বলে। এই পদ্ধতিতে নতুন জাত সৃষ্টি সম্ভব। প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে ক্রস-ব্রিডিং করা হয়।

- ক্রিস-ক্রসিং (Criss-crossing)- যখন দু'টি জাতের মধ্যে বিকল্পরুপে প্রজনন করা হয় তখন সে পদ্ধতিকে ক্রিস-ক্রসিং বলে।
- ট্রিপল-ক্রসিং (Triple-crossing)- রোটেশন পদ্ধতিতে তিনটি জাতের পশুর মধ্যে প্রজনন করার পদ্ধতিকে ট্রিপল-ক্রসিং বলা হয়। এই পদ্ধতিকে রোটেশন ক্রসিংও বলা হয়।
- ব্যাক-ক্রসিং (Back-crossing)- সংকর জাতের পশুকে তার পূর্বপুরুষের সাথে প্রজনন করাকে ব্যাক-ক্রসিং বলা হয়। সাধারণত এই প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার হয় না। তবে জেনেটিক গবেষণায় ব্যবহার হয়।

ক্রস-ব্রিডিংয়ের সুবিধাসমূহ: একটি জাতের মধ্যে পছন্দমত বৈশিষ্ট সংযোজন করা যায়। নতুন জাত উদ্ভাবনের উত্তম পদ্ধতি। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজন্মের পরিবর্তন সাধন করা যায়। বংশগত ভাবে আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের রুপান্তর গবেষণার জন্য একটি সহজ কৌশল। সংকর জাতের পশু সাধারণত তেজদীপ্ত ও দ্রুত বৃদ্ধি হয় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক উৎপাদনক্ষম হয়।

ক্রস-ব্রিডিংয়ের অসুবিধাসমূহ: ক্রস-ব্রিডিংয়ের প্রতিষ্ঠিত পশুর জাতের বিলুপ্তি ঘটে। ভিন্ন প্রকৃতির (heterozygous) জীনের সমন্বয় ঘটায় এবং ক্রস-ব্রিড পশুর ভবিষ্যত প্রজনন গুণ হ্রাস পায়। দ্রুত পশুর জাত উন্নয়নের জন্য ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি প্রয়োগে দুই বা ততোধিক জাতের পশুর প্রয়োজন হয়।

গ) প্রজাতির সংকরায়ন (Species hybridization): দু'টি ভিন্ন প্রজাতির পশুর মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে নতুন কর্মঠ সংকর পশু সৃষ্টি করা যায়। যেমন- পুরুষ গাধা ও স্ত্রী ঘোড়া প্রজনন ঘটিয়ে খচ্চর (mule) সৃষ্টি হয়। তেমনি পুরুষ ঘোড়া ও স্ত্রী গাধার প্রজনন ঘটিয়ে সৃষ্টি হয় হিনি (hinny)। তবে খচ্চর ও হিনি সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে। আবার ইউরোপিয়ান গরু ও আমেরিকান বাইসন (bison) প্রজননের মাধ্যমে পুরুষ ও বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম স্ত্রী পশু সৃষ্টি হয়।

ঘ) ক্রমোন্নতি (Grading-up): উন্নত ভাল জাতের পশুর সাথে অ-জাতভূক্ত (non-descriptive) পশুর প্রজননের পর প্রজন্ম ধরে প্রজনন ঘটিয়ে পশুর উন্নয়ন সাধনকে ক্রমোন্নতি বলা হয়। সাধারণত বিদেশী ভাল বিশুদ্ধ জাতের ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর ৭ম পুরুষ পর্যন্ত প্রজনন করালে প্রায় বিশুদ্ধ জাতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পশু সৃষ্টি সম্ভব হয়। ক্রমোন্নতি প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুর বৈশিষ্ট্য সহজেই নতুন প্রজন্মে আনা যায়। এই পদ্ধতিতে তেমন কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করা হয় না। তবে উন্নত জাতের পশুর বৈশিষ্ট্য দেশী অনুন্নত পশুর মধ্যে এনে পশুর জাত উন্নয়ন সাধন করা যায়।

সুবিধাসমূহ: কয়েক প্রজন্মেই (৭-৮ টি প্রজন্ম) বিশুদ্ধ উন্নত জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সম্ভাবনাময় ষাঁড়ের ব্যবহার পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে অল্প খরচে প্রজনন শুরু করা যায়।

অসুবিধাসমূহ: আমাদের মত দেশের দেশী জাতের পশুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী তবে ইউরোপের উন্নত জাতের পশুর ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি অচল। সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় একরুপ ফলাফল হয় না।

সারণি ৫.১: গ্রেডিং-আপ পদ্ধতির ফলাফল।

প্রজন্ম	সন্তান-সন্ততি		প্রজন্ম	সন্তান-সন্ততি		প্রজন্ম	সন্তান-সন্ততি	
	উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য, %	দেশী জাতের বৈশিষ্ট্য, %		উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য, %	দেশী জাতের বৈশিষ্ট্য, %		উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য, %	দেশী জাতের বৈশিষ্ট্য, %
১ম	৫০.০০	৫০.০০	৪র্থ	৯৩.৭৫	০৬.২৫	৭ম	৯৯.২২	০.৭৮
২য়	৭৫.০০	২৫.০০	৫ম	৯৬.৮৭	০৩.১৩	-	-	-
৩য়	৮৭.৫০	১২.৫০	৬ষ্ট	৯৮.৪৪	০১.১৫	-	-	-

৫.১.৫ প্রজনন সমস্যাসমূহ

প্রজনন পদ্ধতি বাচ্চা উৎপাদনের একটি বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রজনন জনিত কারণে প্রতি বছর বেশ কিছু গাভী ডেইরি খামার থেকে ছাঁটাই করতে হয়। এই সমস্যা প্রধানত চার প্রকৃতির দেখা যায়। যথা- ১) লালন-পালন জনিত সমস্যা। ২) জন্মগত সমস্যা এবং ৩) সুনির্দিষ্ট রোগ জনিত সমস্যা (Verma and Agarwal 1998)।

১। লালন-পালন জনিত সমস্যা (Breeding trouble due to management)
প্রধানত নিম্নোক্ত লালন-পালন ত্রুটির কারণে একটি পশু পালের প্রজনন কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

- পুষ্টি (Nutrition): বকনা বা গাভী যাতে অত্যাধিক দুর্বলা, পাতলা বা চর্বিযুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে মূলত মিনারেল ও ভিটামিনের অভাবে। তাই ষাঁড়, গাভী ও বকনের জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক।
- প্রজননের বয়স (Age at breeding): পশুর জাত ও দৈহিক বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে ১৫ থেকে ১৮ মাস বয়সের বকনের প্রজনন করা হয়। তাই বকনের প্রজনন ১৮ মাসের অধিক হলে প্রজনন কার্যক্ষমতার অপচয় হয় এবং অতিরিক্ত এই সময়কে পশুর অলাভজনক সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।
- যৌন বিরতি (Sexual rest): শর্ট-কাভিং ইন্টারভাল এবং পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য গাভী বাচ্চা দেয়ার ৬০ দিন পর প্রজনন করা ভাল। তবে গাভী জমজ বাচ্চা প্রসব করলে বা জরায়ুর কোন সংক্রমণ থাকলে ৮০ দিন পর্যন্ত যৌন বিরতি দেয়া প্রয়োজন।
- প্রজননের উপযুক্ত সময় (Appropriate timing for breeding): গাভীর ইস্ট্রাস চক্রের উপযুক্ত সময়ে পাল দেয়া বা প্রজনন করা প্রয়োজন। কারণ উপযুক্ত সময়ে প্রজনন না করালে গাভী গর্ভধারণ করেনা। বস্তুত পশুর গরম হওয়ার লক্ষণ ও ইস্ট্রাস চক্রের রেকর্ড করে পশু প্রজনন কর্মক্ষমতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করা যায়।
- গর্ভাবস্থা নির্ণয় (Pregnancy diagnosis): গাভী গর্ভবতী হয়েছে কিনা তা জানার জন্য কৃত্রিম প্রজননের ৬০ দিন পর ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেয়া ভাল। সাধারণত ষাঁড় ও গাভী একসাথে পালিত হলে এবং জনন অঙ্গে কোন সমস্যা থাকলে গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা প্রয়োজন।
- অপ্রকাশিত কামোদ্দীপনা (Quit/Silent heat): অনেক সময় পশুর স্বাভবিক ইস্ট্রাস চক্রে এতো সামান্য কামোদ্দীপনার প্রকাশ থাকে যে, তা পশুর মালিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পশুর মালিক গাভীর ইস্ট্রাস অবস্থা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় না। এসব পশুর ইস্ট্রাস চক্র অতি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
- পুনঃ পুনঃ গরম হওয়া (Repeat breeding): অনেক সময় গাভী পাল রাখেনা বা পুনঃ পুনঃ গরম হয়। এ অবস্থা হলে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা গাভী পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিত। তবে সাধারণত সিস্টিক ডিম্বাশয় (cystic ovaries) এর কারণে গাভীর এরুপ সমস্যা হয়।

২। জন্মগত কারণে প্রজনন সমস্যা (Breeding problems due to inheritance)

- ফ্রী-মার্টিন (Free-martin): গাভীর যমজ বাচ্চার একটি বকন ও একটি ষাঁড় হলে সাধারণত ৯০% ক্ষেত্রে বকনটি বন্ধ্যা হয় এবং এই বকনকে ফ্রী-মার্টিন বলা হয়। গর্ভাবস্থায় যদি পুরুষ ও স্ত্রী উভয় বাচ্চার এই গর্ভফুলের মাধ্যমে সারকুলেশন হয়, তবে সৃষ্ট পুরুষ হরমোন স্ত্রী বাচ্চার গিয়ে তার যৌন অঙ্গের অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। তবে যমজ বকন ও ষাঁড়ের রক্তের গ্রুপ ভিন্ন হলে বকন উর্বর হতে পারে।
- ক্রিপ্টোরচিডিজম (Cryptorchidism): যখন পুরুষ বাচ্চা একটি বা উভয় অন্ডকোষ উদর গহবরে রেখে জন্ম গ্রহণ করে তখন তাকে ক্রিপ্টোরচিডিজম বলে। যদি অন্ডকোষ অন্ডকোষথলিতে নেমে আসে তবে স্বাভাবিক শুক্রাণু তৈরি করে এবং যদি অন্ডকোষ থলিতে নেমে না আসে তবে এই ষাঁড় বন্ধ্যা হয়।

৩। সুনির্দিষ্ট রোগ জনিত প্রজনন সমস্যা (Breeding trobles due to specific diseases)

- ব্রুসেলোসিস (Brucellosis): ষাঁড় ও গাভী উভয়ই এরোগে আক্রান্ত হয়। গাভীতে এরোগ গর্ভপাত ঘটায়।
- ট্রাইট্রাইকোমোনিয়াসিস (Tritrichomoniasis): এই প্রোটোজোয়া গাভী ও ষাঁড়ে জননতন্ত্রের রোগ সৃষ্টি করে। গাভীর প্রথম ট্রাইমিস্টারে গর্ভপাত ঘটায়।
- ক্যাম্পাইলোব্যঅক্টেরিওসিস (Campylobacteriosis): গাভীর জনন অঙ্গে এজীবাণুর সংক্রামণে অকাল গর্ভপাত ঘটায়।
- লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis): গর্ভবতী গাভীর এরোগ গর্ভপাত ঘটতে পারে।

- জনন অঙ্গের রোগ: যোনি-প্রদাহ (vaginitis), জরায়ু-গ্রীবাদাহ (cervicitis) এবং জরায়ু-প্রদাহ (metritis) প্রভৃতি রোগের কারণে গাভীর গর্ভধারণের হার হ্রাস পায়। অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা এসব রোগের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

৪। ফাংশনাল গোলযোগ জনিত সমস্যা (Functional disorders)
অনেক গাভীর কোন সংক্রমণ নেই, জনন অঙ্গের তেমন কোন ত্রুটিও ধরা পড়েনা, এমন কি পুষ্টির অভাবও নেই অথচ প্রজনন সমস্যা দেখা যায়, এঅবস্থাকে ফাংশনাল গোলযোগ বলে। যেমন-
- পারসিসটেন্ট করপাস লিউটিয়াম (Persistent corpus luteum)
- সিস্টিক গর্ভাশয় (Cystic ovary)

৫.২ বাংলাদেশের গবাদিপশুর জাত পরিচিতি

সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে গরুর কোন অবিমিশ্র (pure) কিংবা উন্নত জাত নেই। অন্য দেশ থেকে আনা কোন অবিমিশ্র জাতের গরু এদেশের কোন চাষীর বাড়ীতেও দেখা যায়না। আবার এমন কোন মিশ্র, উচ্চ-উৎপাদনশীল জাতও বাংলাদেশী জাত হিসেবে গৃহীত হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গরু সে সব অঞ্চলের নামানুসারে পরিচিত। যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের গরুকে চাটগাঁইয়া, পাবনার গরুকে পাবনাইয়া এবং ভৈরবের গরুকে ভৈরবী বলে। এসব স্থানীয় নামের মিশ্রজাত ৩.৭ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। সময়মত সুষম খাবার প্রদান ও যত্ন নিলে দেশী গরু হতে অধিক পরিমাণে দুধ পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এ জাতগুলোর মধ্য হতে নির্বাচন ও নিয়মিত উৎকৃষ্ট জাতের ষাঁড় দিয়ে সংকরায়ন ও প্রজননের মাধ্যমে সহজেই উন্নত জাতের গুণাবলী দেশীয় জাত সমূহের মধ্যে প্রসারিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে নিজস্ব উৎকৃষ্ট জাতের কোন মহিষ নেই। এখানে বিদেশী জাতের যে সকল মহিষ দেখা যায় তার মধ্যে মুরড়া, নিলা, রাভি ও কুন্ডি উলেখযোগ্য। তবে মুরড়া জাতের মহিষই বেশি দেখা যায়। এ দেশের আবহাওয়ায় লালিত পালিত এবং বংশ বিস্তারের মাধ্যমে এরা বর্তমানে এদেশের মহিষ নামে পরিচিত। বাংলাদেশে ভারবাহী বা কাজের জন্য জলা মহিষ বা সোয়াম্প মহিষ এবং দুধ উৎপাদনের জন্য নিলা, মুরড়া, কুন্তি ও রাভি জাতের মহিষ দেখা যায়। মহিষ পানি এবং মাটি উভয় জায়গায় থাকে। তবে এরা পানিতে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। মহিষের জন্য জলাশয়, ডোবা, খাদ, গর্ত, বিল, ইত্যাদির প্রয়োজন যেখানে তারা নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখে। আমাদের দেশের মহিষের দুধ দেয়ার ক্ষমতা দৈনিক ৫.১৫ লিটার। উদ্দেশ্য অনুযায়ী গরুর জাতকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-
- দুধের জন্য- লাল সিন্ধী, শাহীওয়াল, থার্পার্কার, হলষ্টিন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আয়ার শায়ার, বাদামী সুইস।
- কাজের জন্য- হরিয়ানা, বাগনারী, ধান্নী ও থার্পার্কার।
- দুধ ও কাজ উভয়ের জন্য- হরিয়ানা ও থার্পার্কার।

নিম্নে কয়েকটি উন্নত জাতের গরু ও মহিষের পরিচিতি দেয়া হল-
- **হলষ্টিন ফ্রিজিয়ান:** হল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড প্রদেশে এর উৎপত্তিস্থল। দুধাল জাতের গাভীর মধ্যে এজাত তুলনামূলকভাবে বড়। শরীরের সামনের অংশ চিকন এবং ওলান বেশ বড়। শরীর বেশ পেশীযুক্ত। গাভীগুলো শান্ত স্বভাবের কিন্তু ষাঁড়গুলো বদ মেজাজের। গায়ের রং কালো সাদায় চিত্রা এবং এ দুয়ের যে কোন একটির প্রধান্য থাকে।
- **শাহীওয়াল:** পাকিস্থানের পাঞ্জাব প্রদেশের মন্টগোমারী এর উৎপত্তিস্থল। গাভী আকারে কিছুটা লম্বা, হালকা-পাতলা, ছোট পা ও গতি ধীর। এদের মাথা আকারে ছোট এবং কপালের স্থান উচু। লতি কান ও নাভী ঝুলানো। চুট ও গলকম্বল বেশ বড়। ওলান বড় ও ঝুলন্ত গায়ের রং হালকা লাল বা হালকা হলুদ। দৈনিক ৯.১০ লিটার দুধ দেয় এবং প্রায় ২৮০ দিন দুগ্ধবতী থাকে। বলদ বা ষাঁড় হাল চাষের অনুপযোগী।
- **লাল সিন্ধী:** পাকিস্থানের সিন্ধু প্রদেশের করাচি, লাসবেলা ও হায়দরাবাদ এর উৎপত্তিস্থল। গায়ের রং লাল বলে একে লাল সিন্ধী বলে। এটি ছোট মাথাওয়ালা মোটা ও খাটো জাতের গরু। শিং মোটা ও সামনের দিকে বাঁকানো।

কপাল প্রশস্ত, কানের আকার মাঝারি, নীচের দিকে ঝুলানো, ওলান বেশ বড় ও সুগঠিত। নাভী বড় ও ঝুলানো। এ গরু প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে পারে এবং দুধও দেয় বেশি। দৈনিক ৮.১০ লিটার দুধ দেয় এবং প্রায় ৩৫০ দিন দুগ্ধবতী থাকে।

- **জার্সি:** ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়। দুধাল জাতের মধ্যে জার্সি সর্বাপেক্ষা বড়। দেহের গঠন উন্নত ও সুন্দর। ওলান বেশ বড়। চুটি নেই। গায়ের রং লাল, জিহ্বা ও লেজের রং কালো। গোচারণে অভ্যস্ত। বছরে দুধ উৎপাদন ২,৭৫০-৪,০০০ লিটার।
- **মুরড়া মহিষ:** বাংলাদেশে মুরড়া জাতের মহিষই বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়। ভারতের দিল্লী ও হারিয়ানা এ জাতের মহিষের উৎপত্তিস্থল। শরীর বড়, পা ছোট, শিং খাট ও বাঁকানো এবং কালো। চামড়া কালো এবং পশমও কালো। স্ত্রী মহিষের মাথা সুগঠিত কিন্তু পুরুষ মহিষের মাথা ভারী ও মোটা। কপালের সম্মুখভাগ চওড়া ও উঁচু। এরা কষ্ট সহিষ্ণু এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে উপযোগী।

৫.৩ গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন

বংশ বিস্তারের মাধ্যম হল প্রজনন। প্রজননে গাভীর গর্ভে তার ডিম্বানুর সাথে ষাঁড়ের শুক্রানুর মিলনের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্ভব হয়। ভাল জাতের বীজ বপন করলে যেমন ভাল ফসল হয় তেমনি ভাল জাতের ষাঁড়ের সিমেন ভাল জাতের বাছুর উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে হালচাষ ও পরিবহন শক্তি বৃদ্ধি অপরিহার্য। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রজনন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। সাধারণত গবাদিপশুর প্রজননের জন্য দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

- প্রাকৃতিক প্রজনন- এই পদ্ধতিতে কোন ষাঁড়ের দ্বারা সরাসরি গাভীকে প্রজনন করানো হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন- ষাঁড়ের সিমেন বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা গরম হওয়া (ইস্ট্রাস অবস্থায়) গাভীর জরায়ুতে প্রয়োগ করে গর্ভসঞ্চারণের পদ্ধতিকে কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়। অর্থাৎ, কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়, সংগৃহীত বীর্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়, বীর্যকে তরল করা হয় এবং যান্ত্রিক উপায়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বীর্য প্রবেশ করানো হয়। কৃত্রিম প্রজননে দুই ধরণের সিমেন ব্যবহার করা হয়। যথা-
  - ✓ তরল সিমেন: এই সিমেনের প্রতি মাত্রা থাকে এক মিলি যাতে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। ৩ থেকে ৫° সেন্ট্রিগেড তাপমাত্রায় এই সিমেন ২-৩ দিন সংরক্ষণ করা যায় ।
  - ✓ হিমায়িত সিমেন: এই সিমেন ধারনের জন্য ব্যবহৃত নলে ০.২৫ মিলিলিটার সিমেন থাকে। যাহাতে ২০-৩০ মিলিয়ন শুক্রানু থাকে। এই সিমেন ১৯৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে ২০-২৫ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

৫.৩.১ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব, সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব

গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। বর্তমানে সারা বিশ্বে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য এ পদ্ধতি বহুলভাবে প্রচলিত। বর্তমানে আমাদের দেশেও এ পদ্ধতি চালু আছে। এক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ষাঁড় ব্যবহার করে বহুসংখ্যক গাভীকে পাল দেওয়ানোর জন্য কৃত্রিম প্রজনন কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। বংশগত কারণে গাভী বা বলদ যথাক্রমে নির্দিষ্ট মাত্রায় দুধ উৎপাদন করে এবং আকারে বড় হয়। পশুর জাত উন্নয়ন ছাড়া তার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে পশুর উৎপাদন কিছুটা বাড়ানো গেলেও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। তবে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে গাভীকে প্রজনন করানো হলে উন্নত গুণাবলী তার বাচ্চার দেহে সঞ্চালিত

হয়। তাই উন্নত ষাঁড়ের পরিবর্তে উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে এদেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করার একমাত্র মাধ্যম কৃত্রিম প্রজনন।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধাগুলে নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা অতি দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নত জাতের গবাদিপশু তৈরি করা সম্ভব। একটি ষাঁড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়; ফলে ষাঁড়ের ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- প্রজননের পূর্বে শুক্রাণুর গুণাগুণ পরীক্ষা করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নত ষাঁড় নির্বাচন করা যায়। ফলে অনুন্নত ষাঁড় এবং অপ্রয়োজনীয় ষাঁড় ছাটাই করতে সুবিধা হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে কম খরচে অনেক বেশি গাভীকে পাল দেওয়া যায় যেহেতু প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।
- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগসহ যৌনরোগ সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধ করা যায় (Islam et al. 2007)। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজননের সময় বিভিন্ন যৌনরোগ যেমন- ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমনিয়াসিস ইত্যাদি মারাত্মক যৌনরোগসমূহ ষাঁড়ের মাধ্যমে আক্রান্ত গাভী থেকে অন্যান্য গাভীর মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড়ের পরিবর্তে অল্প খরচে তার সিমেন আমদানি করা যায়।
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সংগঠিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং সংগমে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়। যে সমস্ত গাভী ষাঁড়কে উপরে উঠতে দেওয়া পছন্দ করে না সে সমস্ত গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে পাল দেওয়া যায়।
- উন্নত পালন পদ্ধতি অনুসরন করে সঠিক প্রজনন রেকর্ড রাখা সম্ভব হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশুর মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে শংকর জাত সৃষ্টি করা যায়।

কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতা

কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- কৃত্রিম প্রজনন কাজে সিমেন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। খামার মালিককে কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ানের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে গাভীর উত্তেজনাকাল সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করে কৃত্রিম প্রজনন করতে হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়েজন হয় এবং যেখানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি।
- সুষ্ঠ প্রজনন নিবন্ধিকরণের (AI recording) প্রয়োজন হয় এবং স্বাস্থ্যসন্মত উপায়ে প্রজনন না হলে গর্ভসঞ্চারের হার হ্রাস পায়।

৫.৩.২ গভীর হিমায়িত সিমেন মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালী

সংরক্ষণ প্রণালী

গভীর হিমায়িত সিমেন সাধারণত স্ট্রতে প্রস্তুত করা হয় এবং লিকুইড নাইট্রোজেন ক্যানে তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে '–' (মাইনাস) ১৯৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। নাইট্রোজেন ফ্লাক্সেও তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে এই তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নাইট্রোজেন ফ্লাক্স হতে প্রত্যহ কিছু কিছু নাইট্রোজেন বাস্পায়িত হয়ে উড়ে যায়। যে কারণে ১-৩ লিটার ধারণক্ষমতা বিশিষ্ট ফ্লাক্সে সাধারণত ৪ দিন পর, ১০ লিটার ফ্লাক্সে ১০ দিন পর এবং

২০ লিটার থেকে উর্ধ্বে ধারণক্ষমতা বিশিষ্ট ফ্লাস্কে ১৫ দিন পর পর তরল নাইট্রোজেন পুনরায় ভরাট করতে হয়। তথাপিও কয়েকদিন পর পর নাইট্রোজেন ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় অথবা স্কেল দ্বারা মেপে দেখতে হয় যে সিমেন ষ্ট্র গুলো ক্যানষ্টারের ভিতর নাইট্রোজেন এর মধ্যে ডুবে আছে কিনা। যদি ডুবে না থাকে তবে পুনরায় নাইট্রোজেন ভরাট করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে এবং মাত্রাতিরিক্ত সময় পাত্রের মুখ খোলা রাখা উচিৎ নয়। সিমেনসহ নাইট্রোজেন ফ্লাস্কটি সবসময় ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়, কখনও রোদ্রে বা বেশি গরম জায়গায় রাখা উচিৎ নয়, এতে অতি বেশি হারে নাইট্রোজেন বাস্পায়িত হয়।

ব্যবহার প্রণালী

নাইট্রোজেন ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলে ক্যানষ্টারটি আলাদাভাবে উপর দিকে উঁচু করে নাইট্রোজেন লেভেলে এনে লম্বা ফরছেপ (১৮ সেন্টিমিটার) দ্বারা যে কোন একটি ‘ষ্ট্র’ অতিদ্রুত উঠিয়ে নিয়ে ৩৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম পানিতে ফেলে সাথে সাথে ক্যানষ্টারটি নাইট্রোজেন ফ্লাস্কের যথাস্থানে স্থাপন করে ঢাকনা বন্ধ করতে হয়। গরম পানি সাধারণত কিডনী ট্রে অথবা ঐ জাতীয় ছোট ট্রের মধ্যে ঢেলে নিতে হয়। থার্মোমিটার দ্বারা পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করে নিতে হয়। ১২-১৫ সেকেন্ড সময় গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর ষ্ট্র’টি উঠিয়ে শুকনা তোয়ালে অথবা ডাষ্টার কাপড় দ্বারা ভাল করে মুছতে হয়। ষ্ট্র’র সিল করা মাথা কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলতে হয়। ষ্ট্র’টি এআই সিথের মধ্যে ভরে এআই গানে স্থাপন করে লক আপ করতে হয়। লক আপ করার সময় খুবই সাবধান থাকতে হয় যেন এআই গানের পিষ্টন নিরাপদ দূরুত্বে থাকে, যাতে চাপ লেগে ষ্ট্র হতে সিমেন বের হয়ে না পড়ে। স্বাভাবিক প্রযুক্তিগত নিয়মে এআই গানটি এবার গাভীর জরায়ুতে স্থাপন করে পিষ্টনে চাপ দিতে হয়। প্রজনন শেষে গাভীর কানে নাম্বার লাগিয়ে যথারীতি রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হয়।

৫.৩.৩ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের বর্তমান পদ্ধতি

কৃত্রিম প্রজনন একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে নিয়োজিত উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে অত্যন্ত সচেতন ও নিষ্ঠার সাথে যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে হয়। সেই সঙ্গে এ কার্যক্রমের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। অন্যথায় কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে গবাদিপশুর গুণগতমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া তথা গবাদিপশু উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিম্নবর্ণিত কর্মপদ্ধতি কার্যকরী করতে হয়-

- সাভারস্থ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, রাজশাহীস্থ দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার এবং কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন কার্যালয় যৌথভাবে প্রজনন নীতি অনুযায়ী প্রজনন ষাঁড় উৎপাদন করে হিমায়িত সিমেন উৎপাদন করেন এবং জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করে তরল সিমেন উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
- জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক তার কেন্দ্রের প্রজনন ষাঁড় সমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানসন্মত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সিমেন উৎপাদন, সিমেন সংরক্ষণ, উপকেন্দ্র/পয়েন্টে সপ্তাহে ৩ দিন তরল সিমেন এবং মাসে ১ দিন প্রয়োজনে ২ দিন গভীর হিমায়িত সিমেন ও তরল নাইট্রোজেন সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তিনি কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে তার নিয়ন্ত্রাধীন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট সমূহ তদারকী, নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব একইভাবে পালন করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক এর নির্দেশ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করেন।
- উপজেলায় কর্মরত সকল মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে প্রজননকৃত প্রতিটি প্রজননের জন্য এআই সার্টিফিকেট সঠিকভাবে পূরণ করতে হয়। গাভীর বাচ্চা জন্ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে ও রেকর্ড সংরক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হয়। কৃত্রিম প্রজনন রেজিষ্টারে প্রজননের রেকর্ড, বছুর হওয়ার রেকর্ড এবং সিমেনের রেকর্ড নির্ভূলভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বিভিন্ন তথ্যাদি লিপিবদ্ধের জন্য সর্বদা একটি নোটবুক সঙ্গে রাখতে হবে এবং আনুসঙ্গিক কাগজপত্র কেন্দ্রীয়

কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। কৃত্রিম পজননের সঠিক ফলাফল পাওয়ার জন্য নিয়মিত কৃত্রিম প্রজননের রেকর্ড অত্যন্ত প্রয়োজন। কৃত্রিম প্রজনন রেকর্ড সর্বদা নির্ভুল, সম্পূর্ণ এবং প্রাত্যহিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫.৩.৪ কৃত্রিম প্রজনন ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার পিছনে যেমন সিমেন স্ট্র ও সিমেন দায়ী তেমনি প্রজননকারী, গাভী ও গাভীর মালিক দায়ী হতে পারে (Uddin et al. 2010)। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল-

- সিমেন স্ট্রঃ ত্রুটিপূর্ণভাবে স্ট্র পরিবহন, সংরক্ষণ ও থোয়িং পদ্ধতি। সিমেন ক্যানে নাইট্রোজেনের পরিমান কমে যাওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে সিমেন ক্যান থেকে স্ট্র বের করা। সিমেন ক্যানের ঢাকনির সাথে সংলগ্ন লাল সিলের ত্রুটি।
- সিমেন: দুর্বল বা মৃত শুক্রাণুযুক্ত সিমেন ব্যবহার। সিমেনের মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় শুক্রাণুর সংখ্যার কম থাকা। অনুর্বর বা অধিক বয়স্ক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার। সিমেনের গুণগতমান সঠিক না থাকা। পরিবেশের প্রভাবেও কোন ষাঁড়ের শুক্রাণুর গুণাগুন কমবেশি হতে পারে (Sarder 2007)।
- প্রজননকারী: প্রজননকারীর অনভিজ্ঞতা এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অদক্ষভাবে প্রজনন করানো। সঠিক সময়ে প্রজনন না করা এবং প্রজননের পর গাভীকে বিশ্রাম না দেওয়া। প্রজননের সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত না করা এবং জীবাণু দ্বারা শুক্রাণু সংক্রমিত হওয়া।
- গাভীর মালিক: গাভীর ডাকে আসা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান করতে না পারা। ডাকে আসার লক্ষণ সঠিকভাবে যাচাই না করতে পারা। গাভীকে সঠিকভাবে পরিচর্যা না করা ও সুষম খাদ্য প্রদান না করা।
- গাভী: গাভীর প্রজনন অঙ্গ যৌন বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া। অনিয়মিত ঋতুচক্র। পুনঃ পুনঃ গরম হওয়া ও ভুল বা ফলস্ গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া। হরমোন নিঃসরনের অভাব ও ভারসাম্যহীনতা। নীরব ইষ্ট্রাস। অধিক বয়স। পুষ্টির অভাব।

৫.৪ গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন

কৃষি ভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। সমন্বিত কৃষি খামার পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ এর ব্যবহার বহুবিধ। মাংস, দুধ উৎপাদন ছাড়াও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, বায়োগ্যাস উৎপাদন ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রাণিসম্পদ খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশে প্রায় ২ কোটি ৫৩ লক্ষ গরু ও মহিষ রয়েছে। এর মধ্যে যে সমস্ত গাভী কোন নির্দিষ্ট পরিবেশে পালন খরচের তুলনায় অধিক উৎপাদনে সক্ষম তাদেরকে উন্নত জাত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে গবাদিপশুর ঘনত্ব বেশি। এত বিশাল আকারের ষ্টক থাকা সত্বেও কোন নির্দিষ্ট জাতের গাভী বা মহিষ নেই, সবই হল দেশীয় (indigenous) জাতের। যাদের দুধ ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তবে দেশের কিছু কিছু এলাকা যেমন- ফরিদপুর, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম জেলার গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য এলাকার তুলনায় কিছু বেশি। দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃত্রিম প্রজনন অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি আধুনিক প্রযুক্তি। বেশি উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে গাভীকে প্রজনন করানো হলে উন্নত কৌলিক গুণাবলী তার বাচ্চার দেহে সঞ্চালিত হয়। গাভী পালনকে লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উন্নতজাতের গাভীর। উন্নত জাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রজনন কর্মসূচি এবং ভবিষ্যত বংশধর সৃষ্টিতে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান।

৫.৪.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পটভূমি

জাত উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হল গবাদিপশুর কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন- দুধ উৎপাদন, দৈহিক বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা, যৌন পরিপক্কতা, মাংস উৎপাদন ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন। এ উন্নয়ন দু'ভাবে ঘটানো যায়- ক) কৌলিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং খ) পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটিয়ে। উপযুক্ত খাদ্য, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে পরিবেশগত উন্নয়ন ঘটানো যায়

(Azizunnesa et al. 2008)। কিন্তু কৌলিক মানের উন্নয়নের জন্য চাই সঠিক প্রজনন কৌশল। পশু প্রজননের দুটো হাতিয়ার রয়েছে- বাছাই ও সমাগম।

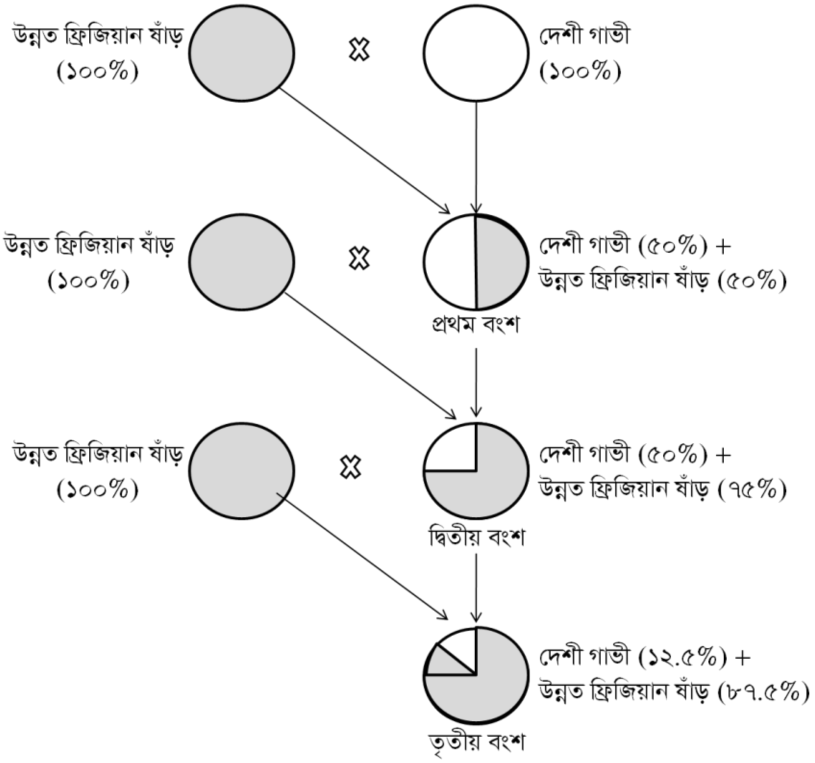

চিত্র ৫.৪ঃ গ্রেডিং-আপ এর রেখাচিত্র।

গ্রেডিং-আপ

গ্রেডিং-আপ (Grading-up) পদ্ধতিতে উন্নত জাতের বিদেশী ষাঁড় ও দেশী অনুন্নত জাতের গাভীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মিলন ঘটিয়ে উন্নত জাত সৃষ্টি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একটি দেশী গাভীকে একটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করানো হলে যে বাচ্চা জন্ম নেয় তার দেহে ৫০% দেশী ও ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান রক্ত থাকে। এ বাছুরকে F_1 ক্রস বলে। এ বাছুর বকনা হলে বড় হওয়ার পর হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড় দিয়ে তাকে প্রজনন করানো হলে বাচ্চার দেহে আদি দেশী মা গাভীর রক্ত আর অর্ধেক কমে ২৫% হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি ৭৫% উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য পাবে। এটাকে F_2 ক্রস বলে। এভাবে সংকর গাভী থেকে সাত পুরুষে তাত্ত্বিকভাবে প্রায় ১০০% খাটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান আনা যায়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, প্রথম বংশের গাভী বা ষাঁড়ই ৫০% দেশী ও ৫০% হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান রক্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে বেশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

গবাদিপশুর উন্নয়নে ONBS প্রজনন কর্মসূচি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে গবাদিপশুর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গবাদিপশুকে বলা হয় মানুষের খাদ্য যোগানের জৈবিক মেশিন। বাংলাদেশের গবাদিপশুর কৌলিক মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কৌলিক মান নির্ণয়ের জন্য পশুর পরিবেশগত প্রয়োজনগুলো আগে মেটানো দরকার।

উপযুক্ত পরিবেশে কৌলিক মান নির্ণয় করা হলে আমাদের দেশেও অনেক ভাল জাতের গবাদিপশু পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে উন্মুক্ত নিউক্লিয়াস প্রজনন কর্মসূচি (Open Nucleus Breeding System) সংক্ষেপে ONBS হাতে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। বিশ্বের অনেক দেশ এই কর্মসূচি ব্যবহার করে গবাদিপশুর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। যেমন- জার্মানি, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, তানজিনিয়া, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দান। আমাদের দেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে অনুন্নত গবাদিপশুর উন্নয়নে ONBS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই পদ্ধতিতে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গবাদিপশুর মধ্যে থেকে অধিক উৎপাদনশীল ১০০০ টি গবাদিপশু নির্বাচন করা হয় এবং একটি কেন্দ্রে এনে রাখা হয়। অতপর আবারো উৎপাদনের ভিত্তিতে ২০০ টি গাভী বা ৫০০ টি ছাগী বা ভেড়ী নির্বাচন করা হয়। এটিই নিউক্লিয়াস পাল। এই পালের প্রতিটি প্রাণির বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনুমানকৃত প্রজনন মান (predicted breeding value) দ্বারা ২০ টি ষাঁড় বা ৫০ টি পাঠা নির্বাচন করে নিউক্লিয়াস পালে সংযোজন করা হয়। অতপর এদের মাঝে প্রজনন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনক্ষম প্রাণিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাই করা হয় এবং শতকরা ২০ ভাগ নিম্নমানের প্রাণিকে ছাঁটাই করা হয়। নিউক্লিয়াস পালের পুরুষ প্রাণিগুলোকে কৃত্রিম প্রজননের কাজে ব্যবহার করে অথবা প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন কাজে ব্যবহার করে গ্রামের কৃষকদের স্ত্রী প্রাণিগুলোকে পাল দেওয়ানো হয়। ফলে কৃষকের ঘরে যে বাচ্চা উৎপন্ন হবে তা কিছুটা উন্নত মানের হবে। তখন আবার গ্রামীণ কৃষকদের প্রাণিগুলো থেকে ২০% অধিক উৎপাদনশীল স্ত্রী প্রাণী বাছাই করে নতুন নিউক্লিয়াস পাল তৈরি করা হয়। এভাবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ৪-৫ বারে অর্থাৎ ২০-২৫ বছরে উন্নত ও অধিক উৎপাদনক্ষম গবাদিপশু তৈরি করা সম্ভব।

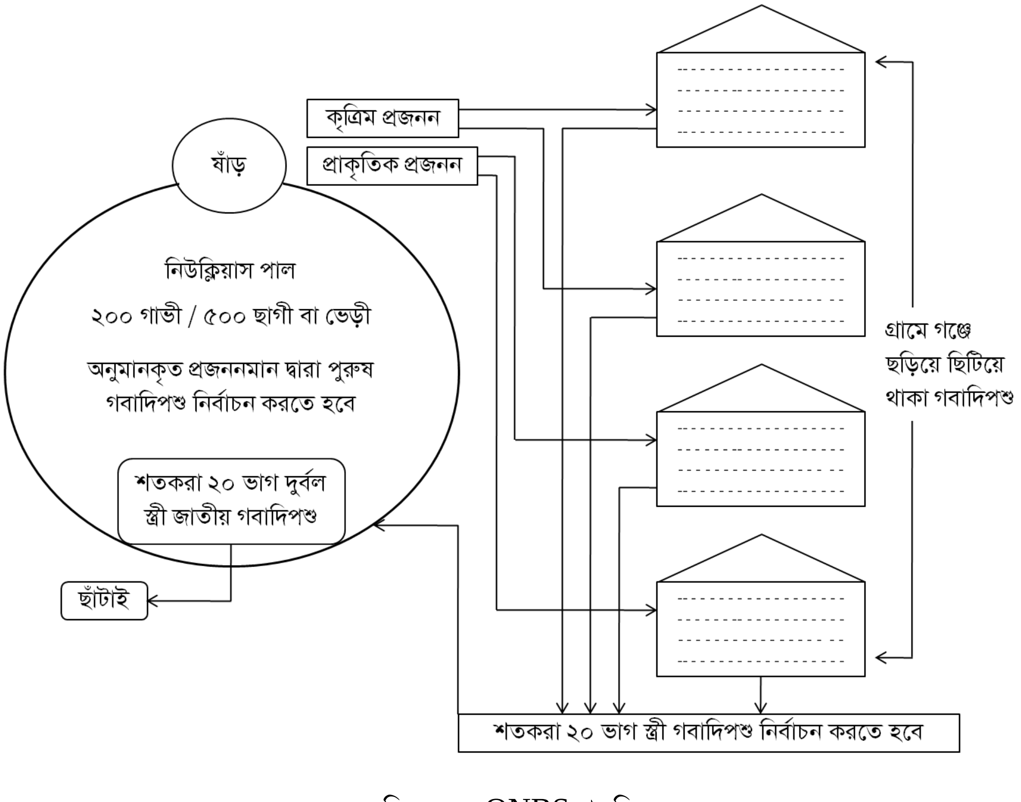

চিত্র ৫.৫ঃ ONBS পদ্ধতি।

গবাদিপশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়নের পটভূমি

ত্রিশের দশকের পূর্বে এদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। প্রাকৃতিক নিয়মে স্থানীয়ভাবে কিছু ষাঁড় পালন এবং ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু ছেড়ে দেয়া 'খোদাই ষাঁড়' এর অবাধ ও অপরিকল্পিত প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর বংশবিস্তার ঘটতো। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করে হাল চাষ ও পরিবহন কাজে পশুশক্তি বৃদ্ধি এবং মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ১৯৩৩ সালে তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের ভাইস রয় লর্ড লিনলিথগো উত্তর পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল থেকে কিছু হারিয়ানা ষাঁড় সংগ্রহ করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং ত্রিশের দশকে সিলেটের টিলাগড় এবং ঢাকার তেজগাঁয়ে দু'টি দুগ্ধ খামার স্থাপিত হয়। সেই থেকে বর্তমান বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের সূচনা। বিতরণকৃত হারিয়ানা ষাঁড়ের সাথে দেশীয় গাভীর মিলনের ফলে জেনেটিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন, পশুর আকার এবং কায়িক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর ভারত থেকে হারিয়ানা ষাঁড় প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ায় জেনেটিক উন্নয়ন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এজন্য সিলেট ও তেজগাঁও খামার দু'টি প্রজনন খামার হিসেবে রুপান্তর করা হয়। এসব খামারে পাকিস্তান থেকে যথাক্রমে বস ইন্ডিকাস (*Bos indicus*) জাতের সিন্ধি, শাহীওয়াল, থারপারকার গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। খামার দু'টি থেকে উৎপাদিত ষাঁড়গুলো দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য বিতরণ করা হয়। এভাবে গবাদিপশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রণের ফলে নির্দিষ্ট রক্তের জেনেটিক উন্নয়ন ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য পূর্ব থেকে অবস্থিত হারিয়ানা জাতের সাথে পরবর্তীতে আমদানিকৃত সিন্ধি, শাহিওয়াল ও থারপারকার জাতের শংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বস ইন্ডিকাস (*Bos indicus*) জাতের পশু দৈহিক আকারে অধিক বড় ও শক্তিশালী হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সালে তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ঢাকা, চট্রগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও যশোরে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রসমূহে সীমিত আকারে তরল সিমেন উৎপাদন করে দেশী গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে পাল দেয়া হতো। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক পরিমাণ সিমেন উৎপাদনের জন্য এসব কেন্দ্রে উন্নতমানের পর্যাপ্ত ষাঁড়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। উন্নত জাতের ষাঁড় উৎপাদন ও গবাদিপশুর সার্বিক উন্নয়নের স্বর্থে ১৯৫৯-৬০ সালে ঢাকার অদূরে ঢাকা-আরিচা রোডে সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ঠাকুরগাঁও, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট এবং ময়মনসিংহে সম্প্রসারণ করা হয়। এ সমস্ত কেন্দ্রে মূলত সিন্ধি, শাহীওয়াল ও থারপারকার জাতের ষাঁড় সরবরাহ করা হতো। তখন সারাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬৫ টি। ১৯৬৯ সালে সাভার খামারের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তদানিন্তন পাকিস্তান ও জার্মান সরকারের মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক কারিগরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই কারিগরি সহযোগিতা চুক্তিতে সমগ্র দেশব্যাপী গবাদিপশুর প্রজনন কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও জনশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই কর্মসূচির কার্যক্রম স্থগিত থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে ১৯৭২-৭৩ সালে এই চুক্তি নবায়ন করা হয় এবং ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জার্মান বিশেষজ্ঞগণ এ দেশে অবস্থান করে এ দেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজে সহায়তা প্রদান করে।

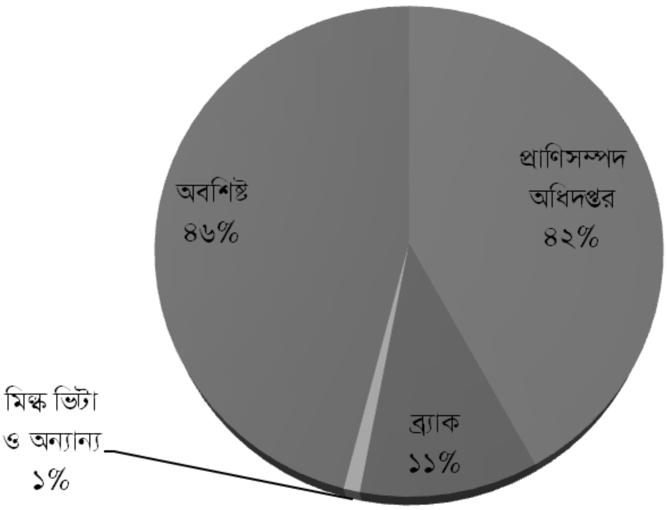

চিত্র ৫.৬ঃ দেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আওতায় কৃত্রিম প্রজননের আওতাভূক্ত গবাদিপশু। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রজননক্ষম গবাদিপশুর সংখ্যা ১ কোটি ১৬ লক্ষ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক এই চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া থেকে অনুদান হিসাবে ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি জাতের ১২৫ টি গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর মিলন ও উৎপাদিত শংকর জাতের গবাদিপশুর উৎসাহ ব্যঞ্জক ফলাফলের ভিত্তিতে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে সমগ্র দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ সময় সাভার খামার গবাদিপশু উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং সাভার কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এই দৃশ্যপটে আরও পরিবর্তনের সূচনা হয়। এসময়ে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোক্তা এগিয়ে আসতে শুরু করে। প্রয়োজন দেখা দেয় অধিক উৎপাদনশীল উন্নতজাতের গাভীর। তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণকালে অবহেলিত প্রাণিসম্পদ খাতের মৌলিক সমস্যাবলীর প্রতি কিছুটা দৃষ্টি প্রদান করা হয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এসময়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে স্থিতিশীল করতে কিছু অবকাঠামো সৃষ্টিসহ উন্নয়ন নীতিমালা গৃহীত হয়। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৭৬ সালে একটি ব্রিডিং পলিসি প্রণয়ন করা হয় যা ১৯৮২ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৮২ সালের অনুমোদিত ব্রিডিং পলিসি ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। উক্ত পলিসি ১৯৯৭ সালে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে জার্সি জাত বাদ দিয়ে পলিসি মোতাবেক ৫০% ফ্রিজিয়ান এবং ৫০% শাহীওয়াল জাতের বুল উৎপাদন করে এবং উক্ত বুলের সিমেন দিয়ে দেশব্যাপি কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই সময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২২টি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ২০০৭ সালে ব্রিডিং পলিসি পুনরায় সংশোধন করে লাইভষ্টক ডেভেলপমেন্ট পলিসি-২০০৭ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া দেশীয় গবাদিপশুর উন্নয়নে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে উন্নতমানের মোট ৪,৩০,৪৩৩ মাত্রা সিমেন আমদানি করা হয়। এই কর্মসূচির অধীন দেশী পশুর উন্নয়ন গবেষণা পর্যালোচনার জন্য বাছুরের জন্মকালীন ওজন, দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, প্রথম গর্ভবতী হওয়ার বয়স, গর্ভধারণকালীন সময়, গর্ভধারণের বিরতি, গড় দুধ উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদনকালীন সময়, গর্ভধারণের জন্য মোট পাল দেয়ার সংখ্যা, গাভীর উর্বরতা ইত্যাদি রেকর্ড করা হয়।

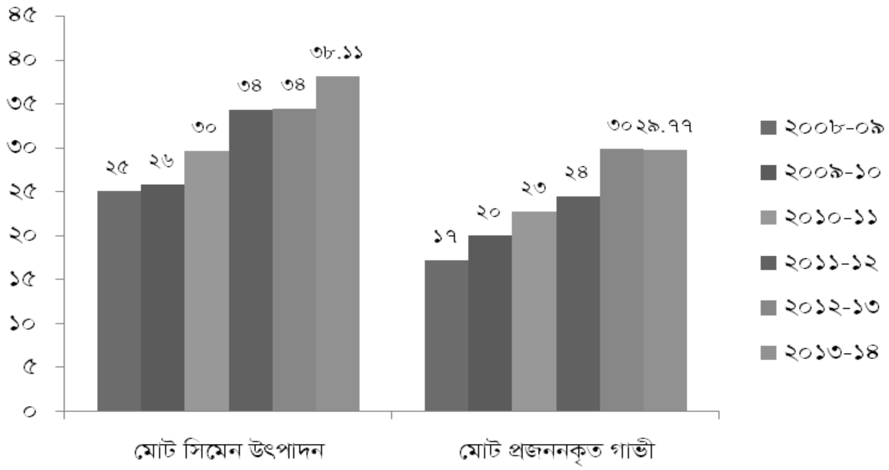

চিত্র ৫.৭ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সিমেন উৎপাদন ও প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ সংখ্যা)। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক এই চিত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ষাঁড় থেকে সিমেন উৎপাদন করে কৃত্রিম প্রজনন সেবা চালিয়ে যাচ্ছে, যারা হচ্ছেন (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং (২) ব্র্যাক কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও মিল্ক ভিটা, ইজাব, আমেরিকান ডেইরি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সীমিত পরিসরে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ঢাকার সাভার ও রাজশাহীর রাজাবাড়ীহাটে ২টি বুল ষ্টেশন কাম কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ২২ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ৪৭৭ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র এবং ৩৭২৫ টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট চালু আছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জানুয়ারি ২০১৫ এর তথ্য)। দেশীয় কম উৎপাদনশীল জাতের গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সারাদেশে ব্যাপক হারে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগারে উন্নত জেনেটিক গুণগতমানের দেশী, শাহীওয়াল, রেড চিটাগাং ক্যাটেল, ফ্রিজিয়ান ও দেশী ফ্রিজিয়ান ক্রসব্রেড ব্রিডিং বুল উৎপাদন ও ফ্রোজেন সিমেন উৎপাদন করে জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকেন্দ্র ও পয়েন্টে সরবরাহ করা হয়। উপকেন্দ্র ও পয়েন্টে নিয়োজিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীগণ উক্ত সিমেন দিয়ে কৃষক/খামারিগণের গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন সেবা দিচ্ছেন।

৫.৪.২ গবাদিপশুর প্রজনন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গাভীর বাচ্চা উৎপাদন সফলতা লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩০০ টি গাভী সমৃদ্ধ কোন খামারের গর্ভধারণ হার মাত্র ৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে বছরে খামারের আয় ১,১২৬ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পায়। লাভজনক দুগ্ধ খামারের সাথে সম্পর্কিত পুনরুৎপাদন (Reproduction) সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়াদি নিম্নে বর্ণনা করা হল।

- বাচ্চা জন্ম থেকে প্রথম প্রজনন বিরতি (Days Open): বাচ্চা জন্মের পর থেকে প্রথম প্রজনন পর্যন্ত যে সময় লাগে তাকেই জন্ম থেকে প্রথম প্রজনন বিরতি বলে। লাভজনক দুগ্ধ খামারে জন্য এই সময় ৬০ থেকে ৭০ দিন হওয়া উচিত।
- বাচ্চা জস্ম থেকে গর্ভধারণ বিরতি (Calving to Conception Interval): বাচ্চা জন্মের পর থেকে সফল প্রজনন বা গর্ভধারণ পর্যন্ত সময়কাল। লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য এই সময়কাল ৮৫ দিন হওয়া উচিত।
- ইস্ট্রাস নির্ণয় হার (Estrus Detection Rate): ইস্ট্রাস নির্ণয় করার পর প্রজননকৃত গাভী ও খামারের মোট গাভীর শতকরা অনুপাত হলো ইস্ট্রাস নির্ণয় হার। এই অনুপাত শতকরা ৫০-৭০ ভাগ হওয়া উচিত।

$$\text{EDR} = \frac{\text{ইস্ট্রাসকৃত গাভী}}{\text{মোট গাভী}} \times ১০০$$

- প্রথম প্রজনন গর্ভধারণ হার (First Service Conception Rate): বাচ্চা জন্মের পর প্রথম প্রজননকৃত গর্ভবতী গাভী এবং মোট প্রজননকৃত গাভীর শতকরা অনুপাত। এই অনুপাত শতকরা ৫০-৬০ ভাগ হওয়া বাঞ্চনীয়।

$$\text{FSCR} = \frac{\text{প্রথম প্রজননের পর গর্ভবতী গাভী}}{\text{প্রথম প্রজননকৃত মোট গাভী}} \times ১০০$$

- গর্ভধারণ হার (Conception Rate): গর্ভধারণকৃত মোট গাভী এবং মোট প্রজননের সংখ্যার শতকরা অনুপাত।

$$\text{CR} = \frac{\text{মোট গর্ভবতী গাভীর সংখ্যা}}{\text{মোট প্রজননের সংখ্যা}} \times ১০০$$

- প্রতি গর্ভধারণে প্রজনন সংখ্যা (Service Per Conception): প্রতিটি সফল গর্ভধারণে ব্যয়িত মোট প্রজনন এবং খামারের মোট গর্ভবতী গাভীর অনুপাত। প্রতি গর্ভধারণে প্রজনন সংখ্যা ১.৭ থেকে ২.২ হওয়া ভাল।

$$\text{SPC} = \frac{\text{মোট প্রজনন সংখ্যা}}{\text{মোট গর্ভবতী গাভীর সংখ্যা}}$$

- গাভী বিয়ান বিরতি (Calving Interval): গাভীর এক বিয়ান থেকে অন্য বিয়ানের বিরতিকালকে বুঝায়। এক বিয়ান থেকে পরবর্তী বিয়ান বিরতি ৩৬০-৩৯৫ দিন অতিক্রম করা উচিত।
- দুধ দোহনকাল (Days in Lactation): প্রথম দুধ দোহনের দিন থেকে শুরু করে গাভীর শুষ্ক হওয়ার দিন পর্যন্ত সময়। এই সময় ৩০৫ দিন হওয়া উচিত।

৫.৪.৩ জাত উন্নয়নে দেশে ব্রিডিং প্রোগ্রাম ও তার ফলাফল

দেশে বাস্তবায়িত ব্রিডিং প্রোগ্রাম ও তার ফলাফল

নব্বই দশকের কথা, এসময় দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবাদিপশু থাকলেও তা ছিল আকারে ছোট ও অনুৎপাদনশীল। ১৯৮১ সালের BBS রিপোর্ট অনুসারে দেশে ৭২ লক্ষ বলদ এবং ৭৩ লক্ষ বাছুর থাকলেও তারা কোন নির্দিষ্ট জাতের ছিল না। এদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অসন্তোষজনক। এই জাতের বকনা বাছুর ৪৮-৫৬ মাসে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং দুগ্ধ উৎপাদনকালীন সময়ে ২৫০-৫০০ লিটার দুধ উৎপাদন করে। এদের বাছুর প্রসব বিরতি ১৫-২০ মাস। এসমস্ত গরু Nondescript Local জাত হিসাবে পরিচিত। এই সমস্ত দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দেশের আবহাওয়া উপযোগী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৮২ সালে ব্রিডিং প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। এই প্রোগ্রাম অনুসারে শহর ও শহরতলী এবং মিল্ক পয়েন্ট অঞ্চলে খাঁটি ফ্রিজিয়ান ষাঁড় ও শাহীওয়াল গাভীর শংকরায়নে উৎপাদিত ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা দেশী গাভীকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করানো হয়। দেশের অবশিষ্ট পল্লী অঞ্চলে খাঁটি ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর শংকরায়নে উৎপাদিত ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা দেশী গাভীকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করা হয়। এই ব্রিডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সাভার খামারকে সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়। সাভার কেন্দ্রীয় ক্যাটেল ব্রিডিং ষ্টেশন (CCBS) ব্রিডিং ষাঁড় উৎপাদন, ব্রিডিং সরঞ্জাম ক্রয়, সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রজেনির মধ্যে ৫০ ভাগ এবং কোন

কোন ক্ষেত্রে ৭৫ ভাগ বিদেশী রক্ত সংরক্ষিত রাখা হয়। ফলে পরবর্তী দশকে বিপুল সংখ্যক nondescript গরু থেকে crossbred গরু উৎপাদিত হয়। এ সমস্ত crossbred গবাদিপশু উন্নত ব্যবস্থাপনায় প্রতি দুগ্ধ উৎপাদনকালীন সময়ে ১৮০০-৩০০০ লিটার দুধ উৎপাদন করে। এরা ১৮-২৪ মাসে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং বাছুর উৎপাদন বিরতি সময় মাত্র ১৩-১৫ মাস।

পরিচালিত ব্রিডিং প্রোগ্রাম বিষয়ে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যানুসারে দেখা যায় যে এফ-২ জেনারেশনে হেটেরোজিনাস জিনের আবির্ভাবের কারণে ফলাফল তেমন সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকে না। তাছাড়া উক্ত প্রোগ্রামের মধ্যে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না রাখার ফলে খামারিগণ বিপাকে পড়েন। অনেক সময় দেশী গরুর মধ্যে বিদেশী রক্তের পরিমাণ ৮৭.৫ ভাগ বা তার চেয়ে বেশি হয়। আবহাওয়াজনিত ধকল সৃষ্টি ছাড়াও এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষতা কমে যায়। ফলে বাছুরের মৃত্যুহার বেশি হয় এবং অনুর্বরতা বৃদ্ধিসহ যৌন সমস্যা দেখা যায়। তাছাড়া ৫০ ভাগের বেশি বিদেশী রক্ত সম্পন্ন বলদ চাষাবাদ ও পরিবহন কাজের জন্য উপযোগী নয়। বিশেষ করে গরম আবহাওয়ায় দিনের বেলা তাদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতির ৫.১ অনুচ্ছেদে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি উন্নয়ন তথা চাষাবাদ ও গ্রামীণ পরিবহনে পশুশক্তির চাহিদা মিটাবার উদ্দেশ্যে উন্নত জাতের ষাঁড়, বলদ ও মহিষ উৎপাদন কর্মসূচি সম্প্রসারণের এবং ৫.১.১ অনুচ্ছেদে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুল পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদনশীল এলাকাসমুহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। দেশে পরিচালত প্রজনন কর্মসূচির সমস্যার প্রেক্ষিতে এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতির ৫.১ এবং ৫.১.১ অনুচ্ছেদের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রজনন কর্মসূচির সংস্কার ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৫/০৯/১৯৯৭ ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা মিলনায়তনে ‘গবাদি ব্রিডিং প্রোগ্রাম ও উন্নয়ন স্ট্রাটেজী’ শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিশ্রুতিশীল দুগ্ধ খামারিগণ ব্রিডিং প্রোগ্রাম সংক্রান্ত এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বিভিন্ন বক্তার মতামতের প্রেক্ষিতে ব্রিডিং প্রোগ্রাম সংশোধনের জন্য গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে গো-প্রজনন কর্মসূচি সংশোধন করা হয়।

সংশোধিত ব্রিডিং প্রোগ্রাম বা গো-প্রজনন নীতির উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের জন্য একটি সংশোধিত ব্রিডিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালা কেবল গো-সম্পদের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ এবং ইহা ‘গো-প্রজনন নীতি’ বলে আখ্যায়িত। দেশে সংশোধিত ব্রিডিং প্রোগ্রাম বা গো-প্রজনন নীতির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপ-

- গো-প্রজনন নীতির মূল লক্ষ্য হল দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। উক্ত নীতিতে মাংস উৎপাদন ও ড্রাফট পাওয়ারের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- দেশে বস টরাস গবাদিপশু দ্বারা দেশী গবাদিপশুকে শংকরায়ন করে জাত উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ষাঁড়গুলির প্রজেনির পারফরমেন্স যাচাই করত ব্রিডিং ভ্যালুর ভিত্তিতে ষাঁড়ের নির্বাচন চূড়ান্ত করা।
- যেহেতু এফ-২ জেনারেশনে হেটেরোজিনাস জিনের আবির্ভাবের কারণে ফলাফল তেমন সন্তোষজনক পর্যায়ে থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশী গরুর মধ্যে বিদেশী রক্তের পরিমাণ ৫০ ভাগের বেশী হওয়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, আবহাওয়াজনিত ধকল সৃষ্টি হয়, বাছুরের মৃত্যুহার বেড়ে যায় এবং অনুর্বরতা বৃদ্ধিসহ যৌন সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং পূর্বের প্রোগ্রামের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশী এবং বস টরাস এর শংকর জাতের গবাদি উন্নয়নের জন্য Open Nucleus Breeding System (ONBS) কর্মসূচি গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। এতে করে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হবে এবং দ্রুত জাত উন্নয়ন করা যাবে।

সংশোধিত গো-প্রজনন নীতিতে বিভক্ত অঞ্চল

সংশোধিত ব্রিডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশকে তিনটি অঞ্চলে (যেমন শহর, শহরতলী ও গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চল) ভাগ না করে ইনটেনসিভ ও এক্সটেনসিভ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইনটেনসিভ এলাকায় ক্রস ব্রিডিং পদ্ধতি এবং এক্সটেনসিভ এলাকায় সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

- ইনটেনসিভ (Intensive) এলাকা: শহর ও শহরতলী এবং মিল্ক পকেট এলাকাকে ইনটেনসিভ এলাকা বলে ধরা হয় এবং এসব এলাকায় 'ফ্রিজিয়ান×দেশী' গবাদিপশুর শংকরায়নের ভিত্তিতে ক্রস ব্রিডিং প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এই কর্মসূচি একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি বিধায় এখানে ONCS (Open Nucleus Cross-breeding System) প্রথায় ব্রিডিং কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই ফ্রিজিয়ানের জীন রক্তে ৫০ ভাগের বেশী হবে না। তাছাড়া প্রজনন বিরতি (generation interval) কমিয়ে অতি দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত নিউক্লিয়াস হার্ড তৈরি করে MOET (Multiple Ovlation & Embryo Transfer) প্রথায় অধিক উৎপাদনশীল বকনা ও ষাঁড় তৈরি করতে হবে।
- এক্সটেনসিভ (Extensive) এলাকা: সমস্ত গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলকে এক্সটেনসিভ এলাকা বলে ধরা হয়েছে এবং এসব এলাকায় সিলেকটিভ ব্রিডিং প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় যতদিন পর্যন্ত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত জাতের দেশী ষাঁড় উৎপাদন না হবে ততদিন পর্যন্ত শাহীওয়াল সহ বাছাইকৃত দেশীয় ষাঁড় দ্বারা কার্যক্রম চলবে। তাছাড়া এসকল অঞ্চলে অবস্থিত বাণিজ্যিক খামার গুলোকে চাহিদা অনুযায়ী ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার করা হবে।

সংশোধিত গো-প্রজনন নীতির মেটিং পদ্ধতি

(ক) সিলেকটিভ ব্রিডিং (Selective Breeding): দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাইকৃত দেশীয় উন্নতমানের গবাদিপশু নির্বাচন করে ONBS (Open Nucleus Breeding System) পদ্ধতিতে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে (উন্নত মানের দেশী গরু বলতে বৃহত্তর ঢাকা, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার উন্নত গাভী গুলোকে বুঝায়)। রেড চিটাগাং গবাদিপশুকে পৃথক লাইন হিসাবে সিলেকটিভ ব্রিডিংয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে।

(খ) ক্রস ব্রিডিং (Cross Breeding): ক্রস ব্রিডিং এর লক্ষ্যে, সিলেকটিভ ব্রিডিং-এর ন্যায় দেশীয় জেনেটিক সম্পদ নির্ধারণ করে তা থেকে ষাঁড়ের মা বাছাই করা হচ্ছে। বাছাইকৃত ষাঁড়ের মাকে পরীক্ষিত ১০০% বস টরাস (Bos taurus) ষাঁড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রজননের ফলে উৎপন্ন ৫০% বস টরাস - ৫০% দেশী ক্রসব্রেড ষাঁড় বাছাই করে সেগুলোর সিমেন সংগ্রহ করে তা দিয়ে ক্রসব্রেড গাভীকে পাল দেয়া হচ্ছে। দেশে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাভী আছে। এ সকল ক্রসব্রেড গাভীতে বিভিন্ন মাত্রায় বস টরাস জাতের গরুর রক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় ব্রিডিং কর্মকান্ডকে সহজতর করার লক্ষ্যে সকল বস টরাস রক্তমাত্রার গাভীকে ক্রসব্রেড হিসেবে ধরে নিয়ে একটি মাত্র কেটাগরি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। ক্রস ব্রিডিং-এর লক্ষ্যে ৫০% বস টরাস উৎপাদনের জন্য অধিক দুধ উৎপদন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশী গাভী প্রয়োজন হয়। এসকল গাভীর সংখ্যা খুবই কম বিধায় নির্বাচিত গাভীগুলোকে MOET (Multiple Ovulation & Embryo Transfer) পদ্ধতি ব্যবহার করে সেগুলো থেকে এক সাথে অনেক ষাঁড় পাওয়া যেতে পারে। মোয়েট ও কৃত্রিম প্রজনন যুগল ব্যবস্থাপনায় প্রজনন কর্মকান্ড চালিয়ে ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে দ্রুত দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে গবাদিপশুর উন্নয়ন করা সম্ভব।

দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবদিপশুর প্রজননের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর ন্যায় এক্ষেত্রেও প্রতি নতুন প্রজন্মের গড় দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও দুগ্ধ দানকালীন সময় নির্ধারণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের উৎপাদন ক্ষমতার মূল্যায়ন করে ক্রসব্রেড গাভী সম্বলিত দুগ্ধ খামারের ব্যবস্থাপনা খরচ ও লাভ সম্বন্ধে আগ্রহী খামারিকে সম্যক ধারণা দেয়া সম্ভব হবে। শংকর জাতের (crossbred) গরুর মধ্যে ৫০% বস টরাস রক্ত বজায় রাখার লক্ষ্যে দুধ উৎপাদন প্রতিযোগীতার

মাধ্যমে সারাদেশ থেকে অধিক দুধ উৎপাদনকারী ৫০% বস টরাস - ৫০% দেশী গাভী বাছাই করে সেগুলোকে ষাঁড়ের মা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এসব গাভীকে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনকারী মায়ের ষাঁড় বাছুরের (৫০% বস টরাস - ৫০% দেশী) দেশী সিমেন দিয়ে পাল দিতে হবে।

সংশোধিত গো-প্রজনন নীতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি

সংশোধিত গো-প্রজনন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে-

- দেশে গৃহীত ব্রিডিং প্রোগ্রামের সাথে সঙ্গতি নেই এমন জাতের হিমায়িত সিমেন, ভ্রূণ অথবা জীবন্ত পশু কৃত্রিম প্রজননের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ করা সহ প্রজনন সামগ্রী আমদানিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে আগ্রহী হলে ব্রিডিং প্রোগ্রামের নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতির প্রয়োজন হবে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তি মালিকানায় অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রজনন কার্যক্রম চালু করা যাবে না।
- গো-প্রজনন কার্যক্রমের সকল অঞ্চল ও পর্যায়ে ব্রিডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রজেনি টেস্টেড ষাঁড় ব্যবহার করতে হবে। নির্বাচিত ষাঁড়গুলোর প্রজেনির পারফরমেন্স যাচাই করত ব্রিডিং ভ্যালুর ভিত্তিতে প্রজেনি টেস্টেড ষাঁড়ের নির্বাচন চূড়ান্ত করতে হবে।
- বেসরকারি পর্যায়ে যে সমস্ত খামার মালিক বা এজেন্সী শতকরা ১০০ ভাগ বিদেশী জাত বা বস টরাস পালন করবেন তাদের ব্রিডিং কর্মসূচি নিজস্ব খামারেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গো-প্রজনন সংক্রান্ত দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার কার্যক্রম 'গো-প্রজনন কর্মসূচির' আলোকে করতে হবে এবং এর মান নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যগত নিশ্চয়তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ তথা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
- গো-প্রজনন কার্যক্রমের মত একটি অত্যন্ত জটিল ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাব থাকায় অতিসত্ত্বর দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে চাকুরীকালীন উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গো-প্রজনন কর্মসূচি সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা মনিটর করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে।
- Extensive এলাকায় সিলেকটিভ ব্রিডিংয়ের জন্য উন্নতমানের দেশী গাভী, ষাঁড়ের মা (bull mother) এবং নির্ধারিত গুনাগুণ বিশিষ্ট ষাঁড় নির্বাচন করতে হবে। ইনটেনসিভ এলাকার ক্ষেত্রে কাঙ্খিত জেনোটাইপ হবে ৫০% বস টরাস - ৫০% দেশী যার জন্য উক্ত crossbreeding-কে Open Nucleus Crossbreeding System বলা হবে।
- গো-খাদ্য উৎপাদন ও মাননিয়ন্ত্রণ কৃত্রিম প্রজনন কর্মকান্ড ও জাত উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খামারিদের গবাদিপশুর জন্য তার জাত, লিঙ্গ, ব্যবহার, বয়স, দুধ উৎপাদন হার এবং ওজন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাংলাদেশে ক্রসব্রিড বাছুর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপুষ্টি ও কৃমির আক্রমণে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাই এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাছুরের শালদুধ খাওয়ানো, নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পরিমানমত দুধ প্রদান, দুধ ছাড়ানোর বয়স নির্ধারণ, নির্ধারিত দানাদার ও ছোবড়া জাতীয় খাদ্য প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধক টিকা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে খামারিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রজনন গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি গবেষণাগার ও ব্রিডিং সেল স্থাপন করতে হবে যেখানে দেশের আবহাওয়া উপযোগী এবং চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিডিং প্রোগ্রামের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণালব্দ ফলাফল ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কৌশল মাঠ পর্যায় থেকে আরম্ভ করে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অবগতির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৫ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়নে করণীয়

৫.৫.১ গবাদিপশুর আন্তঃপ্রজনন রোধে সণাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ

আমাদের দেশে দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নের জন্য মূলত স্বাধীনতার পর থেকে দেশী জাতের গাভীর সাথে আমদানিকৃত হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৩৫ লক্ষ গরু-বাছুর রয়েছে, তন্মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ প্রজননক্ষম বকনা/গাভী যার প্রায় ৩৪ লক্ষ সংকর জাতের। বিগত বছরগুলোতে গবাদিপশুর সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি না পেলেও কৃত্রিম প্রজননের ফলে দুধ ও মাংস উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বছরের পর বছর কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানসম্মত প্রজনন নীতিমালা মেনে তা করা হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে কৃত্রিম প্রজননের উন্নয়নের ধারা একটি আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে পৌঁছানোর পরও বিভিন্ন কারণে এর ধারা এখন স্থবির এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নগামী। আন্তঃপ্রজনন যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা। আন্তঃপ্রজনন বলতে বোঝায় নিকট আত্মীয়ের মধ্যে প্রজনন। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাদের সাথে বিবাহ হারাম বা নিষিদ্ধ, প্রাণির ক্ষেত্রেও ওই সকল সম্পর্কে প্রজনন ঘটালে আন্তঃপ্রজননের প্রভাব বাড়তে থাকে। এর ফলে প্রাণিদেহে প্রচ্ছন্ন জিনের সাদৃশ্য বাড়তে থাকে, কিন্তু অধিক উৎপাদনশীল প্রাণী উৎপাদনে প্রাধান্য বিস্তারকারী জিনের বৈসাদৃশ্যের আধিক্য অপরিহার্য। বস্তুত জিন বলতে প্রাণিদেহের বংশগত বৈশিষ্ট্য বহনের ক্ষুদ্রতম একককে বুঝায়, যার মাধ্যমে মা-বাবার কোন নির্দিষ্ট দোষ-গুণ সন্তানের মধ্যে বংশ পরম্পরায় পরিবাহিত হয়।

বাংলাদেশের ডেইরি খামারগুলোতে আন্তঃপ্রজনন ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে অন্যতম কারণ হিসাবে প্রাণী সনাক্তকরণ ও প্রজনন তথ্য সংরক্ষণের অভাবকেই দায়ী করা যায়। কৃত্রিম প্রজননের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে প্রাণী সনাক্তকরণ, যা প্রাণির কানে ট্যাগ লাগানোর মাধ্যমে করতে হয়। অতঃপর সণাক্তকৃত প্রাণির প্রজনন তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট রেজিস্টার বা এআই চার্টে সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। প্রজনন তথ্যাদি ছাড়া যেমন একটি বকনা/গাভীর মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর উৎপাদন এবং বংশগত অন্যান্য তথ্য রাখা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি উক্ত তথ্য সংরক্ষণ প্রাণী সনাক্তকরণ (ট্যাগ) ছাড়াও অসম্ভব। বংশগত এই তথ্যাদি কেবল আন্তঃপ্রজনন রোধ করে তা কিন্তু নয়, খামারের জন্য উপযুক্ত/অনুপযুক্ত বকনা বা ষাঁড় তার পূর্ব পুরুষের তথ্যের ভিত্তিতে বাছাই/ছাঁটাই করা যায়। যেহেতু দিনকে দিন পশুপালন ব্যয় সাপেক্ষ হচ্ছে ও চারণভূমি কমে আসছে, তাই এখন থেকে সংকর জাতের বকনা/গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে তাদের গুণগতমান (অধিক উৎপাদনক্ষম) বৃদ্ধি বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এই গুণগতমান কেবল একটি গাভীর পূর্ব পুরুষের তথ্যই নিশ্চিত করতে পারে, যা ট্যাগ এবং পিডিগ্রী (পূর্ব পুরুষের তথ্য) ছাড়া কল্পনাতীত। তাছাড়া দেশের আবহাওয়া উপযোগী প্রজেনি (বাচ্চা) সৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট প্রজনন পরিকল্পনা প্রত্যক্ষভাবে প্রাণী সনাক্তকরণ ও পিডিগ্রীর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ ও এর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন উষ্ণ জলবায়ু সম্পন্ন দেশগুলোতে গবেষণায় দেখা যায় যে, দেশী ও এক্সোটিক ব্রিডের (ফ্রিজিয়ান, জার্সি) ক্রস ব্রিডিং-এ উৎপন্ন সংকর জাতের গাভীতে বিদেশী রক্তের পরিমাণ শতকরা ৫০-৬২.৫ ভাগের বেশি হলে উৎপাদন ও প্রজননে নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যদিও উন্নত পালন ব্যবস্থাপনায় তা কিছুটা কম হয়।

গবাদিপশু উন্নয়নের পরিকল্পনা ইনব্রিডিং তথা নানা সমস্যায় জর্জরিত হবে, যদি না কৃত্রিম প্রজননের আওতাভুক্ত প্রতিটি গাভীকে সঠিকভাবে সনাক্তকরণ ও তথ্য সংরক্ষণের আওতায় না আনা হয়। দেশের অধিকাংশ ডেইরি খামারি এবং প্রজননকর্মী প্রজনন নীতিমালা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই খামারি ও প্রজননকর্মীর নিজস্ব চাহিদা ভিত্তিক কৃত্রিম প্রজননে আমাদের দেশীয় গাভীর সাথে ফ্রিজিয়ান/ফ্রিজিয়ান ক্রস ষাঁড়ের প্রজননের মাত্রাতিরিক্ত বিদেশী রক্তের প্রজেনি সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, দেশি-শাহীওয়াল-ফ্রিজিয়ান জাতের সমন্বয়ে তথ্যহীন এমন কিছু সিনথেটিক বা কম্পোজিট গাভী সৃষ্টি হচ্ছে যারা আপতদৃষ্টিতে বেশি দুধ দিলেও দেশীয় জাতকে দিন দিন বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং এই গাভীগুলো থেকে যেসব প্রজেনি সৃষ্টি হচ্ছে তাদের জাত ও উৎপাদনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এটা সত্যি যে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভারে জাতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত বেশির ভাগ ষাঁড়গুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফেনোটাইপিক (বাহ্যিক) বৈশিষ্ট্যের

ওপর জোর দিয়েই নির্বাচন করা হচ্ছে। তাই এই প্রক্রিয়ার শুদ্ধতার জন্য চলমান 'ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট' প্রকল্প (৩য় পর্যায়) দেশের ২২ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে প্রমাণিত ষাঁড় (proven bull) তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে বকনা/গাভী সনাক্তকরণ, পরিকল্পিত প্রজনন এবং প্রজেনির উৎপাদন ও প্রজনন তথ্যাদি সংরক্ষিত হচ্ছে। প্রমাণিত ষাঁড় বলতে ওই সকল ষাঁড়কে বুঝানো হচ্ছে যাদেরকে প্রজননের জন্য নির্বাচন করা হয় তাদের প্রজেনির উৎপাদন তথ্যের ভিত্তিতে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় খামারিদেরকে তাদের গবাদিপশুর তথ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব ও সংরক্ষণের উপায় নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। অতঃপর উক্ত খামারিদেরকে কৃত্রিম প্রজনন চার্ট (এআই কার্ড) এবং চার্ট সংরক্ষণের জন্য ফাইল সরবরাহ করা যেতে পারে, যা খামারির বাড়িতে সংরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য প্রস্তাবিত তথ্য সংরক্ষণ চার্টটি এমন হওয়া দরকার যাতে ১টি বকনা/গাভীর সারা জীবনের প্রজনন তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে এবং প্রজননকারীগণ উক্ত চার্টটি (এআই কার্ড) প্রজনন করার সময় পূরণ করবে। শুধু তাই নয়, বকনা বা গাভী ক্রয়/বিক্রয়ের সময় উক্ত কার্ডটি পশুর সাথে হস্তান্তরের জন্য খামারিদেরকে পরামর্শ দেয়া দরকার, যা অবশ্য প্রতিটি খামারিকে তার নিজ স্বার্থেই করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি বকনা/গাভী পূর্বের রেকর্ড অনুযায়ী জাত নির্ণয় অথবা তথ্য না থাকলে ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য ও দুধ উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে জাত নির্ণয়পূর্বক তথ্য সংরক্ষণ চার্ট পূরণ করা আবশ্যক। এভাবে আন্তঃপ্রজনন রোধপূর্বক উক্ত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে অধিক দুধের গাভী সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের দুধের চাহিদা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, যা মেধাবী জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। আর একটি মেধাবী জাতিই কেবল গড়তে পারে ডিজিটাল বাংলাদেশ। অতএব, কৃত্রিম প্রজননের ধারাবাহিক সফলতা বজায় রাখতে হলে এখন থেকে প্রতিটি প্রজননকৃত বকনা/গাভীর সনাক্তকরণ (ট্যাগ) এবং খামারি পর্যায়ে প্রতিটি গাভীর তথ্য সংরক্ষণ (এআই কার্ড) নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় আমাদের দেশীয় জাতটি হারিয়ে যাবে এবং কৃত্রিম প্রজননের সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে।

৫.৫.২ কৃত্রিম প্রজননে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার চালুকরণ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই গ্রামে বাস করে যাদের গড় মাথাপিছু আয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এই জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির দরুন খাদ্য তথা পশু থেকে উৎপাদিত দ্রব্য যেমন দুধ ও মাংসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। খামারিদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে তারা চাষাবাদের পরিবর্তে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য গবাদিপশু পালন করে থাকে। গাভীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ১৯৫৮ সালে কৃত্রিম প্রজনন চালু হলেও, দেশের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির হার (২%), দুধের চাহিদার তুলনায় (৩%) পেছনেই থেকে গেছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হল পর্যাপ্ত সংখ্যক সংকর জাতের গবাদিপশু তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সংকর জাতের গাভী সাধারণত অধিক দুধ উৎপাদনক্ষম হয়। তবে তাদের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচিসহ পর্যাপ্ত ভেটেরিনারি সেবা এবং দুগ্ধ বাজারজাত করার সুযোগ প্রয়োজন। কারণ, অধিক দুগ্ধ উৎপাদনশীল গাভী দেশী জাতের গাভীর তুলনায় রোগব্যাধিসহ প্রজনন সমস্যায় সাধারণত বেশী ভূগে থাকে। অধিকন্তু, এ ধরণের গাভীর অধিক খাদ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় বিধায় অধিক উৎপাদন খরচ মেটানোর জন্য দুধ বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত বাজার ব্যবস্থার প্রয়োজন। 'কমিউনিটি-বেজড ডেইরি ভেটেরিনারি ফাউন্ডেশন (সিডিভিএফ)' উন্নত ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করে গাভী প্রতি দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে (Shamsuddin et al. 2010)। এই ভেটেরিনারি সেবায় যুক্ত আছে গবাদিপশুতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি। গবাদিপশুতে আল্ট্রাসনোগ্রাফির সুবিধাদি নিম্নে তুলে ধরা হল।

- আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে গাভীতে প্রজনন করার মাত্র ৩০ দিন পর গর্ভপরীক্ষা করা যায়।
- কতদিনের গর্ভবতী এবং কতদিন পরে গাভীটি বাচ্চা প্রসব করবে তা নিশ্চিত করা যায়।
- জরায়ুর ইনফেকশন ও ওভারিয়ান সিস্টের ন্যায় প্রজনন সংক্রান্ত অন্যান্য রোগ চিহ্নিত করা যায়।
- গাভী ও মহিষের প্রজনন অক্ষমতার কারণ নির্ণয়সহ তার উপযুক্ত চিকিৎসা করা যায়।

মানুষের ন্যায় গরু ও মহিষ গাভীতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে গর্ভাবস্থা নির্ণয় এবং জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পরীক্ষাসহ গাভীর ইনফার্টিলিটির কারণ নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। গবাদিপশুতে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার বিশ্বে নব্বই দশকে শুরু হলেও বাংলাদেশে প্রথম এ কার্যক্রমের সূচনা করে সিডিভিএফ। আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে সিডিভিএফ ভেটেরিনারিয়ানগণ গাভীতে প্রজনন করার মাত্র ৩০ দিন পর গর্ভপরীক্ষা করতে পারছেন। গর্ভ পরীক্ষার মাধ্যমে ভেটেরিনারিয়ান বলতে পারছেন গাভীটি গর্ভবতী কিনা, কতদিনের গর্ভবতী এবং কতদিন পরে গাভীটি বাচ্চা প্রসব করবে। ফলে খামারিগণ গর্ভবতী গাভীর জন্য যেমন উন্নত যত্ন ও পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারছেন তেমনি গর্ভধারণে ব্যর্থ গাভীর উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারছেন। এছাড়াও ভেটেরিনারিয়ানগণ গাভী ও মহিষে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে জরায়ুর ইনফেকশন ও ওভারিয়ান সিস্টের ন্যায় প্রজনন সংক্রান্ত অন্যান্য রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন। গবাদিপশুর আল্ট্রাসনোগ্রাম খুবই নিরাপদ পদ্ধতি হওয়ায় খামরিগণ সহজেই এমন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী হন। আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করা ছাড়াও সিডিভিএফ এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে গাভী ও মহিষের ইনফার্টিলিটির কারণ নির্ণয়সহ তার উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিস্কারের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে (Kamal et al. 2013; Rahman et al. 2012)।

৫.৫.৩ দেশী ও বন্য গরুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের মধ্যে গবাদিপশুর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি। হাল-চাষ, গাড়ী টানা, ধান মাড়াই থেকে শুরু করে পুষ্টিকর দুধ ও মাংসের জন্য আমরা গবাদিপশুর উপর নির্ভরশীল। সারা বিশ্বেই অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু ও আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন রকমের গৃহপালিত ও বন্য গবাদিপশুর দেখা মিলে। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে যত্নে অযত্নে এরা টিকে রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। আমাদের দেশে গবাদিপশুর তেমন উল্লেখযোগ্য উচ্চ উৎপাদনশীল জাত না থাকলেও তুলনামূলকভাবে টেকসই দেশীয় জাত যেমন রেড চিটাগং ক্যাটল ও পাবনা টাইপ ক্যাটল রয়েছে। এছাড়া দেশের সর্বত্র ইনডিজেনাস টাইপের গাভী দুধ ও মাংসের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। দেশীয়/ইনডিজেনাস টাইপের গরু আকারে ছোট বিধায় খাদ্য ও ব্যবস্থাপনায় ব্যয় কম, স্থানীয় প্রতিকূল আবহাওয়ায় অভিযোজিত, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এদের মাংস ও দুধের চাহিদাও বেশি। তবুও অদ্যাবধি দেশীয় গরুর উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন হয়নি। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশী ও বন্য গরুর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে বলে জানা গেছে। বন্যজাতের গরুর মধ্যে 'গৌর' নামে এক জাতের গরু আমাদের দেশের বনাঞ্চলে পাওয়া যেত। এছাড়া বনগরু, গয়াল ইত্যাদিও রয়েছে। চট্রগ্রাম ও পার্বত্য-চট্টগ্রামের বনে 'বনগরু' পাওয়া যেত যা বর্তমানে হারিয়ে গেছে। বন্য ও দেশীয় গরুর সংকরায়নে সৃষ্টি গরু গয়াল নামে পরিচিত। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় এখনও গয়াল রয়েছে। আশার কথা বাংলাদেশে একটি গয়াল খামার আছে কিন্তু তা চরম অবহেলিত। দেশীয় গরু সংরক্ষণে সুষ্ঠু প্রদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের দেশী গরুর জাত বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে গবেষকগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের গরুর কাঁধে কিছুটা উঁচু মাংস থাকে। ষাঁড়ের ক্ষেত্রে এটা বেশি দেখা যায়। 'গৌরের' ক্ষেত্রে এই মাংসপেশী কাঁধ থেকে শুরু করে পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। গয়ালকে এই পৃষ্ঠদেশের বেশি উঁচু রাখতে হলে মাঝে মাঝেই বনগরু বা গৌরের সাথে প্রজনন করানো উচিত। কাঁধের উঁচু মাংসপেশীর প্রয়োজনীয়তা বেশি এই জন্য যে এরা এতদ্বাঞ্চলের আবহাওয়ায় বেশ মানানসই। কেননা উষ্ণ অঞ্চলের গরু কাঁধের মাংসপেশীর মাধ্যমে তাপ হারায়। অতএব, মাংসল তথা সম্ভাবনাময় জাত সৃষ্টিতে বন্যজাত খুবই সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। এই অপার সম্ভাবনা নিয়ে বান্দরবন জেলার সর্বদক্ষিণের উপজেলা নাইক্ষংছড়িতে স্থাপিত হয়েছিল দেশের একমাত্র গয়াল গবেষণা কেন্দ্র ১৯৮৭ সালে। স্থানীয় উপজাতির ভাষায় গয়ালকে 'তংগরু' বলা হয়। বিলুপ্ত হওয়ার পথে গয়ালের বংশ সংরক্ষণ ও গবেষণার দায়িত্বভার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছিল। গভীর অরণ্যের ১৬২ একর পাহাড়ী ভূমিতে বেষ্টনী দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে খামারটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানেও ছোট-বড় ৯টি গয়াল আছে খামারে। পাহাড়ী অঞ্চলের এ অমূল্য সম্পদ গয়াল/তংগরু সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দেশ ও জাতি

অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। সরকারি উদ্যোগ ছাড়াও বেসরকারি সংস্থা ও শিল্পপতিদের এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা উচিত। ভারতে এতদ্বসংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও তংগরু বিদ্যমান। এ ব্যাপারে পার্শ্ববতী দেশ দুটি হতে সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

দেশী গরুর উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম বিধায় দেশে দুধের চাহিদা পূরণে সরকারিভাবে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু আছে। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, শাহীওয়াল, সিন্ধি ও জার্সী ষাঁড়ের বীজ দিয়ে দেশীয় গরুকে সংকরায়ন করা হচ্ছে। এতে একদিকে উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই কিন্তু সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা না থাকায় পরবর্তীতে কি ঘটবে তা সকলের অজানা রয়ে যাচ্ছে। এজন্য কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অনিয়ন্ত্রিত পন্থায় সংকরায়নের ফলে দেশীয় গরুর গুণাগুণ হারিয়ে যাচ্ছে। এজন্য দেশীয় গরুর জাত সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশীয় গরুর জাত উন্নয়নের জন্য একটি শুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় নিয়ন্ত্রিত পন্থায় সংকরায়ন করতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে বাড়বে দুধ উৎপাদন, উপকৃত হবেন কৃষক, সংরক্ষিত হবে দেশীয় গরুর গুণাগুণ। এর ফলে পরবর্তীতে গবেষকদের বাড়তি সুবিধা হবে নতুন নতুন জাত সৃষ্টিতে।

৫.৬ কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প

কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প, ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেষ্ট প্রকল্প এবং মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হল-

৫.৬.১ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প

উন্নয়নশীল বিশ্বে সংখ্যাগত দিক দিয়ে গবাদিপশুর পরিমাণ অধিক হলেও মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহে প্রাণিসম্পদ আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না। উন্নয়নশীল বিশ্বে যে সকল কারণ প্রাণিসম্পদের আশানুরূপ অবদানের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে, নিম্ন কৌলিকমান তাদের মধ্যে অন্যতম। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে ২ কোটি ৫০ লক্ষ গবাদিপশু (গরু ও মহিষ) থাকলেও দেশের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এদেশের মানুষের দৈনিক দুধ গ্রহণের হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্ন। গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন তথা কৌলিকমান উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এদেশে কৃত্রিম প্রজননের প্রচলন শুরু হয়। সুদীর্ঘ ৫০ বছরেরও অধিক সময়কাল ধরে ইউরোপিয়ান জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ প্রজনন উপযোগী গাভী ও বকনা রয়েছে। এসকল প্রজননক্ষম গাভী ও বকনার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। গবাদিপশুর জাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট গাভী এবং বকনাকেও উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা প্রয়োজন।

গবাদিপশুর জাত দ্রুত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার গত ২০০২-০৩ অর্থ বছরে 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের ১০০০ টি ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে জনগণের চাহিদার নিরিখে ও বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের কলেবর আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ২য় পর্যায় গ্রহণ করে। উক্ত পকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের ফলে দেশের আরও প্রায় ১০০০ টি ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা বিস্তৃত করা সহ রাজশাহীতে একটি আধুনিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার কাম বুল

ষ্টেশন স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৩য় পর্যায় ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চালু হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপ-

- সিমেন (semen) উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সমগ্র বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- দেশী জাতের গবাদিপশুর কৌলিকমান (genetic make-up) উন্নয়ন করা।
- জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন করা।
- চট্রগ্রাম ও ফরিদপুরে বুল স্টেশন কাম এআই ল্যাব স্থাপন করা।
- সিলেট, বগুড়া, বরিশাল, খুলনা ও রংপুরে বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব স্থাপন করা।
- সাভার দুগ্ধ খামার ও এর আশে পাশের গ্রামীণ দুগ্ধ খামারের গবাদিপশুর ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের কার্যপদ্ধতি

প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের নির্ধারিত ইউনিয়ন থেকে শিক্ষিত বেকার যুবককে (কমপক্ষে এসএসসি পাস, বিজ্ঞান বিভাগ অগ্রাধিকার) ৩ মাস ব্যাপী কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের পর উক্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ নিজ ইউনিয়নে উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদনের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন এআই পয়েন্টে কার্যক্রম শুরু করেন। এভাবে শিক্ষিত বেকার যুব সমাজ যারা সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতো তারা কাজের সুযোগ পেয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ সকলেই ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছে দেয় ফলে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের বাচ্চা হওয়ায় গবাদিপশু পালনে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বেচ্ছাসেবীরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করে এবং সামাজিকভাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ায় উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজপ্রাপ্তি কৃষকের জন্য সহজলভ্য হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে ষাঁড়ের সিমেন উৎপাদন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বছরে প্রায় ৩৪ লক্ষে দাঁড়িয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প' (১ম এবং ২য় পর্যায়) এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে ষাঁড়ের জেনেটিক গুণাগুণকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আর ভ্রূণ স্থানান্তর এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটি গাভীর জেনেটিক গুণাগুণকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই ভ্রূণ স্থানান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এটা নিয়ে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কাজ হয়েছে তবে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল এবং উপযুক্ত দাতা ও গ্রহীতা গাভীর অভাবের কারণে কাংখিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জাতের প্রজনন অক্ষম গাভীর জেনেটিক গুণ ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব।

৫.৬.২ ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট প্রকল্প

আমাদের দেশী গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং অন্যান্য পুনঃপ্রজনন গুণাবলীও নিম্নমানের। এই অনুন্নত গবাদিপশুর উৎপাদন ও প্রজনন গুণাবলী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম এদেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সারাদেশ ব্যাপী অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, হারিয়ানা ও শাহীওয়াল জাতের ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হয়। এই ক্রসব্রিডিং এর কারণে হেটারোসিসের ফলে F1 জেনারেশনে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন আশানুরুপভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে পুনঃপ্রজনন উৎপাদন গুণাগুণেরও উন্নতি ঘটে। যেমন F1 জেনারেশনে ৫০% ফ্রিজিয়ান ব্লাড লেভেলে অনেক গাভী ১৫ থেকে ২০ লিটার দুধ দেয়। কিন্তু পরবর্তী জেনারেশনে (F2/F3) গিয়ে বা উচ্চ ব্লাড লেভেলে (>৭৫%) তার প্রজেনি হতে দুধ

পাওয়া যায় গড়ে ৮-১০ লিটার বা তারও কম। পাশাপাশি দৈহিক বৃদ্ধি ও বাচ্চা দানের ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। আসলে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর যাবৎ ক্রসব্রিডিং এর ফলে একদিকে যেমন সংকর জাতের গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে অনিয়মতান্ত্রিক ও অতিরিক্ত ব্লাড লেভেল ইনফিউশন, যথাযথ সিলেকশন ও কালিং পদ্ধতির অভাব এবং ইনব্রিডিং ইত্যাদি কারণে জেনেটিক অবক্ষয়ের দরুণ উৎপাদন ক্ষমতা আশানুরুপভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি বা টেকসই জাতও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় পরিকল্পিতভাবে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপায় হল কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে প্রজেনি টেস্টেড ষাঁড় ব্যবহারসহ planned mating পদ্ধতি অবলম্বন করা।

কোন প্রাণির বাচ্চার বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ প্রাণির প্রজনন মান নির্ণয় করে বাছাই করার পদ্ধতিকে প্রজেনি টেন্টিং বলে। যেমন- পরীক্ষাধীন ষাঁড়ের বকনা বাচ্চার দুধ উৎপাদন ও অন্যান্য গুণাবলী পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ ষাঁড়কে বাছাই করার পদ্ধতিই হল প্রজেনি টেস্টিং। সাধারণত এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি ষাঁড়ের pedigree অর্থাৎ বাবা-মা, দাদা ও নানীর উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন (phenotype) এবং তার নিজস্ব গুণাগুণ (সিমেন quality ইত্যাদি) বিচার করে candidate bull হিসাবে নির্বাচন করা হয় এবং উক্ত ষাঁড় হতে সংগৃহীত হিমায়িত সিমেন দ্বারা কিছু সংখ্যক নির্বাচিত গাভীকে (dam) (যাদের উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন herd average হতে পজেটিভ) প্ল্যান মেটিং পদ্ধতিতে প্রজনন করা হয় এবং তাদের যে প্রজেনি হয় তার উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন গুণাগুন ডাটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়। যে ষাঁড়ের (sire) প্রজেনি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হার্ড এর গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন হয় ঐ সমস্ত ষাঁড়কে প্রজেনি টেষ্টেড (proven bull) হিসেবে চিহ্নিত করে শুধু মাত্র ঐ সমস্ত proven bull দ্বারা পরবর্তীতে ONBS পদ্ধতিতে প্রজনন কার্যক্রম চালানো হয় এবং বাকী ষাঁড়গুলো ছাটাই করা হয় ও তাদের সংগৃহীত সিমেন ধ্বংস করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

পরিকল্পিতভাবে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট প্রকল্পর বাস্তবায়িত হচ্ছে-

- প্রজেনি টেস্টিং পদ্ধতির মাধ্যমে জেনেটিক মান সম্পন্ন প্রুভেন ষাঁড় তৈরি করা।
- প্রজেনি টেস্টেড প্রুভেন ষাঁড় হতে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা।
- কন্ট্রাক্ট দুগ্ধ খামারির সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রজেনি টেস্টিং পদ্ধতির মাধ্যমে প্রুভেন ষাঁড় তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
- প্রুভেন প্রজনন ষাঁড় তৈরির জন্য অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গাভী ও বকনা চিহ্নিত করা।
- পরিকল্পিত মিলনের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাতের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কার্যপদ্ধতি

ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট প্রকল্পের কর্মপদ্ধতি নিম্নরুপ-

- ষাঁড়ের জাত নির্বাচন: প্রুভেন ষাঁড় তৈরির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ দেশী লাইন ও সংকর জাতের বিভিন্ন ব্লাড লাইন বিবেচনা করা হয়।
- গাভী/বকনা নির্বাচন: উৎপাদন ও পূনরুৎপাদন গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে সারাদেশ হতে গুণগতমান সম্পন্ন গাভী/বকনা নির্বাচন করা হয়।
- সিমেন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: গুণগতমান সম্পন্ন পরীক্ষাধীন ষাঁড় নির্বাচন করা হয়, যাদের প্রতিটি হতে ২০-২৫ হাজার মাত্রা সিমেন সংগ্রহ ও হিমায়িত করে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।
- পরিকল্পিত প্রজনন (plan mating): নির্বাচিত গাভী/বকনাগুলোর জাত ও ব্লাড লেভেলের উপর ভিত্তি করে গাভী/বকনাগুলোকে পরীক্ষাধীন ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা প্রজনন করানো হয়। প্রতিটি পরীক্ষাধীন ষাঁড় দ্বারা ২৫০-৩০০ টি গাভী/বকনা প্রজনন করানো হয়।

- প্রজনন তথ্য সংগ্রহ: নির্বাচিত গাভী/বকনাগুলো হতে প্রাপ্ত বকনা বাছুরগুলোর (প্রজেনি) বিভিন্ন তথ্যাদি (জন্ম তারিখ, জন্ম ওজন, প্রজনন বয়স ও তারিখ, বাচ্চা দানের বয়স, দৈনিক দুধ উৎপাদন ইত্যাদি) নির্ধারিত ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়।
- ষাঁড় মূল্যায়ন (sire evaluation): প্রতিটি পরীক্ষাধীন ষাঁড়ের প্রজেনি হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাদি statistical breeding theory অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। যে ষাঁড়ের প্রজেনির গড় দুধ উৎপাদন বেশি হয় এবং অন্যান্য পজেটিভ গুণাবলী পাওয়া যায়, শুধুমাত্র সেই ষাঁড়গুলোকে জাতীয়ভাবে পরীক্ষিত ষাঁড় (proven bull) হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এদের উৎপাদিত সিমেন দ্বারা সারাদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালানো হয়।

বিগত প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে যে সমস্ত সংকর জাতের অধিক উৎপাদনক্ষম গবাদিপশু তৈরি করা হয়েছে তাদের অদ্যাবধি কোন qualitative performance test করা হয়নি। তাই পকৃতপক্ষে এই পদ্ধতির মাধ্যমে গবাদিপশুর কতখানি উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তার অবস্থা কি তা 'প্রজেনি টেষ্ট প্রকল্পের' মাধ্যমে প্রজেনি টেষ্ট করে জানা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে শ্রেষ্ঠ ষাঁড় ও গাভী নির্বাচিত হবে। তাদের মাধ্যমে প্ল্যান মেটিং এর ফলে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গুঁড়োদুধ আমদানি কমে যাবে এবং ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সেইসাথে টেকসই উন্নত দেশী গবাদিপশুর জাত তৈরি করা যাবে।

৫.৬.৩ মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প

মহিষের জাত উন্নয়নে এই প্রকল্পের আওতায় কৃষকদেরকে মহিষ পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ টাংগাইল ও সাভারে মহিষ প্রজনন খামারের নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য এর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমও এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৫.৭ মোয়েট, ষ্টিল বার্থ, ফ্রি মার্টিন ও ইপিষ্টেসিস

মোয়েট বা MOET

MOET (Multiple Ovulation and Embryo Transfer) হল এমন একটি অত্যাধুনিক প্রজনন কৌশল যার মাধ্যমে একটি স্ত্রী পশুর জরায়ুতে একই সাথে অনেকগুলো ডিম্বক্ষরণ (multiple ovulation) ঘটানো হয় এবং সেগুলোকে নিষিক্ত (fertilization) করার মাধ্যমে ভ্রূণ (embryo) তৈরি করে পরবর্তীতে সেই ভ্রূণ সংগ্রহ করে অন্য একাধিক স্ত্রী পশুর গর্ভে স্থাপন করার মাধ্যমে একাধিক পূর্ণাঙ্গ নবজাতক বাচ্চার জন্মদান করানো হয়। MOET পদ্ধতি বর্তমানে অধিক উৎপাদনশীল গরু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের গো-প্রজনন কর্মসূচিতে প্রজনন বিরতি (generation interval) কমিয়ে অতি দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিউক্লিয়াস হার্ড তৈরি করে MOET পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল বকনা ও ষাঁড় তৈরির কথা বলা হয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে MOET পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়-

- **দাতা (donor) গ্রহীতা (recipient) নির্বাচন:** অধিক উৎপাদনশীল, শারীরিকভাবে সুস্থ্য, যৌনরোগ মুক্ত, নিয়মিত স্ফুরণের (regular oestrus) গাভীকে দাতা গাভী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সাধারণত ৪-৫ বছরের গাভী এ কাজে অধিক উপযুক্ত। গ্রহীতা গাভীকে দাতা গাভীর গরম (oestrus) অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাচন করা হয়, কারণ দাতা গাভী হতে ভ্রূণ সংগ্রহের পর অনেক ক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই তা গ্রহীতা গাভীতে স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।
- **ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন (oestrus synchronization):** গ্রহীতাকে গরম (oestrus) অবস্থায় পাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়পঞ্জী নির্ধারণ করে $PGF2\alpha$ হরমোন প্রয়োগ করা হয়। ফলে দাতা ও গ্রহীতার ঋতুচক্রের

সমন্বয় (synchronization) সাধিত হয় এবং ভ্রূণ সংগ্রহ ও প্রতিস্থাপনের সময় জরায়ুর মধ্যে একই রকম পরিবেশ বিরাজ করে।

- **সুপার ওভুলেশন (superovulation):** সুপার ওভুলেশন প্রক্রিয়ায় দু'টি প্রধান হরমোন যথা- PMSG ও FSH ব্যবহার করা হয়। নির্ধারিত সময়সূচি ও পরিমাপ অনুসারে হরমোন দু'টি ব্যবহারের পর LH হরমোন ব্যবহার করে গাভীকে হিটে আনা হয়। ঋতুচক্রের ৮-১৪ দিনের মধ্যে সুপার ওভুলেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় একই সাথে অনেকগুলো ডিম (ovum) পরিপক্ক হয় এবং ডিম্বক্ষরণ (ovulation) ঘটে।
- **দাতা গাভীর গরম হওয়া এবং কৃত্রিম প্রজনন:** দাতা গাভীর গরম অবস্থা শুরু হওয়ার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে উন্নত জাতের ষাঁড় (proven bull) এর সিমেন দ্বারা ২-৩ বার কৃত্রিম প্রজনন করানো হয় যাতে একাধিক ডিম্বানুর সাথে শুক্রাণুর মিলনে অধিক ভ্রূণ সৃষ্টি হতে পারে।
- **ভ্রূণ সংগ্রহ ও ফ্ল্যাশিং (flashing):** ভ্রূণ সংগ্রহের জন্য দাতা গাভীকে প্রজনন করার ৭-৮ দিন পর ফ্ল্যাশিং পদ্ধতির মাধ্যমে ১৮ গেজ সাইজের ত্রিমুখী ফলি ক্যাথেটারের সাহায্যে ভ্রূণ সংগ্রহ করা হয়।
- **ভ্রূণ প্রসেসিং ও সংরক্ষণ:** ভ্রূণকে পরীক্ষাগারে ৫০০ মিলি সিলিন্ডারে মিডিয়াসহ ৩০ মিনিট স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা হয় ফলে ভ্রূণগুলো থিতিয়ে নিচে যায়। ৫০ মিলি মিডিয়া রেখে অতিরিক্ত মিডিয়া ফিল্টার পদ্ধতিতে ফেলে দেয়া হয়। মিডিয়া পেট্রিডিসে রেখে ভ্রূণ সণাক্ত ও বাছাই করা হয়। ভাল ভ্রূণ চিহ্নিত করে স্ট্র ফিলিং করে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য লিকুইড নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা হয়।
- **ভ্রূণ প্রতিস্থাপন:** বাছাইকৃত ভাল ভ্রূণ নিয়ে তা গ্রহীতা গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলশ্রুতিতে এক বা একাধিক পূর্ণাঙ্গ নবজাতক বাছুর জন্মলাভ করে।

ষ্টিল বার্থ বা Still Birth

গাভীতে গর্ভাবস্থার ২৭০ দিন পর মৃত বাছুর প্রসব হলে তাকে ষ্টিল বার্থ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোন গর্ভবতী প্রাণী কর্তৃক মৃত পরিপূর্ণ (mature) বাচ্চা প্রসব করাকে ষ্টিল বার্থ (Still Birth) বলে। প্রধানত দীর্ঘস্থায়ী গর্ভাবস্থা (prolonged gestation) ও ফিটাল হাইপোক্সেমিয়া (fetal hypoxemia) এর কারণে ষ্টিল বার্থ (Still Birth) ঘটে থাকে। গর্ভাবস্থার শেষ দিকে যে সমস্ত গর্ভবতী প্রাণির শারীরিক অবস্থা খারাপ (poor body condition) থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে ষ্টিল বার্থ (Still Birth) এর ঝুঁকি বেশি থাকে।

ফ্রি মার্টিন (Free Martin)

যখন কোন গাভীর যমজ বাচ্চা হয় এবং একটি বাচ্চা এড়ে ও অপর বাচ্চাটি বকনা হয় তখন সাধারণত বকনা বাছুরটি ষ্টেরাইল বা প্রজননে অক্ষম হয়। এরুপ প্রজননে অক্ষম যমজ বকনা বাছুরকে ফ্রি মার্টিন বলে। আমরা জানি একটি স্বাভাবিক বকনা বাছুরের কোষে ক্রোমোজোম চিহ্নিতকরণ সংখ্যা হলো 60 XX (৬০ জোড়া ক্রোমোজোম, উভয়টি XX ক্রোমোজোম) এবং এড়ে বাছুরে ক্রোমোজোম চিহ্নিতকরণ সংখ্যা হলো 60 XY (৬০ জোড়া ক্রোমোজোম, একটি X এবং অন্যটি Y ক্রোমোজোম)। ফ্রি মার্টিন বাছুর (ফেনোটিপিক্যালি দেখতে বকনা বাছুরের মত) এর কোষে প্রধানত 60 XX ক্রোমোজোম বহন করে এবং সামান্য অনুপাতে 60 XY ক্রোমোজোম বহন করে। সইটোজেনেটিক্স এ কাইমেরিজম (Chimerism) এর একটি ক্লাসিক্যাল উদাহরণ হলো ফ্রি মার্টিন। ফ্রি মার্টিন বকনা বাছুরের যমজ এড়ে বাছুরটিও কাইমেরিক (Chimeric) হতে পারে এবং এর প্রজনন ক্ষমতা স্বাভাবিক এর চেয়ে কম হতে পারে।

ইপিস্টেসিস বা Epistasis

পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি নন-হোমোলগ (non-homologue) ক্রোমোজোমের একটির এলিল (allele) অন্যটির উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে ইপিস্টেসিস বলে। যে জীন (genes) প্রভাব বিস্তার করে তাকে ইপিস্টেটিক

(epistatic) জীন এবং যে জীন প্রভাবিত হয় তাকে হাইপোস্টেটিক (hypostatic) জীন বলে। ইপিস্টেসিস নিম্নবর্ণিত ৬ (ছয়) প্রকারের হয়ে থাকে।

- প্রকট ইপিস্টেসিস (Dominant Epistasis): যখন দুইটি জীনের একটির প্রকট এলিল অন্য জীনের এলিলদ্বয়ের প্রকাশকে অবদমিত করে নিজের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে প্রকট ইপিস্টেসিস বলে।
- প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস (Recessive Epistasis): একটি জীন লোকাসের প্রচ্ছন্ন এলিলদ্বয় কর্তৃক অন্য জীন লোকাসের এলিলদ্বয়ের প্রকাশকে বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস বলে।
- দ্বিগুণ প্রকট ইপিস্টেসিস (Duplicate Dominant Epistasis): দুইটি লোকাসের প্রকট এলিলদ্বয় ইপিস্টেটিক হলে এবং এরা একত্রে একই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটালে তাকে দ্বিগুণ প্রকট ইপিস্টেসিস বলে।
- দ্বিগুণ প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস (Duplicate Recessive Epistasis): যখন দুইটি লোকাসের হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন এলিলদ্বয় একই ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে তখন তাকে দ্বিগুণ প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস বলে।
- প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস (Dominant and Recessive Epistasis): যখন দুইটি লোকাসের একটি প্রকট এলিল ও অন্য লোকাসের প্রচ্ছন্ন এলিল একই ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে তখন প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ইপিস্টেসিস বলে।
- দ্বিগুণ জীনের মিথস্ক্রিয়া (Duplicate genes with interaction): যখন কতকগুলো ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য উভয় জীন লোকাসের প্রকট এলিলদ্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫.৮ গাভীর বাচ্চা উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত রোগসমূহ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ট্রাইকোমোনিয়েসিস (Trichomoniasis): ট্রাইকোমোনাস ফিটাস (*Trichomonas fetus*) নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা গাভীর এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত গাভীকে পাল দেয়ার ১-৬ সপ্তাহ পর গর্ভপাত ঘটে। ফলে গাভী বার বার গরম হয় অথচ পাল রাখে না। সাধারণত ট্রাইকোমোনাস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ষাঁড় বা গাভীর মাধ্যমে যৌন ক্রিয়া বা বাহক ষাঁড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। এ রোগ নিম্নরুপে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

- এ রোগে আক্রান্ত গাভী আপনা থেকেই সেরে উঠে। তবে গাভী ইস্ট্রাসে আসলে পর পর ৩ বার পাল দেয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে গাভীতে কৃত্রিম প্রজনন করানোই ভাল।
- ষাঁড় এ রোগে একবার আক্রান্ত হলে আর কখনই এ ষাঁড় প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ব্রুসেলোসিস (Brucellosis): ব্রুসেলার বিভিন্ন প্রজাতি (যেমন- *Brucella abortus*) দ্বারা মানুষ ও গবাদিপশুতে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে সাধারণত গাভীর গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসের দিকে গর্ভপাত হয় এবং পরবর্তীতে প্রজনন অক্ষমতা প্রকাশ পায়। সাধারণত সংক্রমিত খাদ্য ও পানি, আটালী বা মশার কামড় এবং ব্রুসেলোসিস দ্বারা রোগাক্রান্ত ষাঁড় দ্বারা পাল দেয়া হলে বা ওই ষাঁড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করা হলে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। রোগাক্রান্ত গাভীকে ভাল ষাঁড় দ্বারা পাল দেয়া হলে ওই ষাঁড়ও গাভীর রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ নিম্নরুপে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

- খামারের আশেপাশে জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে পৃথক করে রাখতে হবে। পরিচর্যাকারীর হাত ও খামারের আসবাবপত্র জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- পৃথককৃত পশুকে সিরোলজিক্যাল টেষ্ট করে পজিটিভ পাওয়া গেলে খামার থেকে বাদ দিতে হবে। তবে এ সকল পশুকে মেরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলাই উত্তম।
- গাভীর গর্ভপাত হলে গর্ভপাতকৃত বাছুর, গর্ভফুল ও অন্যান্য নিঃসরণ মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

ক্যাম্পাইলোব্যাকটেরিওসিস (Compylobacteriosis): ক্যাম্পইনোব্যাকটেরিয়া ফিটাস (*Compylobacteria fetus*) নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। মানুষ ও গবাদিপশুতে এ রোগ হয় বিধায় একে জুনোটিক রোগ বলা হয়। এ রোগের জীবাণু মানুষে ডায়ারিয়া ও গবাদিপশুতে অনুর্বরতা ও গর্ভপাত ঘটায়। এ রোগ নিম্নরুপে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

- ষাঁড়ের প্রিপিউসে এ রোগের জীবাণু থাকে এবং পাল দেয়ার মাধ্যমে গাভীর জননতন্ত্রে ছড়ায়। এ জন্য আক্রান্ত ষাঁড় দিয়ে গাভীকে পাল দেয়া যাবে না।
- এ রোগে সাধারণত ভ্রুণের প্রাথমিক পর্যায়ে মৃত্যু ঘটে এবং গাভীতে অনুর্বরতা দেখা যায়। তবে গর্ভবস্থার ৪-৬ মাসে গর্ভপাত হতে পারে। এ অবস্থায় ৩-৪ ইস্ট্রাস পর্যন্ত পাল না দিয়ে গাভীকে প্রজনন করানো থেকে বিরত রাখতে হবে।

ইনফেকশাস বোভাইন রাইনো-ট্রাকিইটিস (Infectious bovine rhinotracheitis): এটি ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগে শ্বসনতন্ত্র, জননতন্ত্র, চোখ ও মস্তিস্কের প্রদাহ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে। এ রোগ নিম্নরুপে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

- টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- আক্রান্ত পশুকে সুস্থ্য পশু থেকে পৃথক করে চিকিৎসা করতে হবে।
- আক্রান্ত পশুর নাক ও জননতন্ত্রের নিঃসরণ জীবানুনাশক দ্বারা ধৌত করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- এ রোগের ভাইরাস সিমেনের মাধ্যমে ছড়ায় বলে আক্রান্ত ষাঁড় প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

জরায়ু গ্রীবার প্রদাহ: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাচ্চা প্রসব, গর্ভপাত, গর্ভফুল নির্গমনে ব্যাঘাত এবং কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত টিউবের মাধ্যমে জীবাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

জরায়ুর প্রদাহ: বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, ভাইরাস ও ছত্রাক, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং দুর্বল জৈবনিরাপত্তার কারণে জরায়ুতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

জরায়ুতে পুঁজ: জীবাণুর সংক্রমণের ফলে জরায়ুতে পুঁজ হতে পারে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণ বিশেষ করে প্রসবের সময় জরায়ুতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে।

গাভী বার বার গরম হওয়া: তিন বা তার অধিক বার পাল দেয়া বা কৃত্রিম প্রজনন করা সত্ত্বেও গর্ভধারণ না করা এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এছাড়া জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য রোগ হল (১) ভিবরিওসিস এবং (২) লেপ্টোস্প্রাইরোসিস।

ডিসটোকিয়া ও প্রসবে সাহায্যকরণ: জরায়ু হতে বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে বের না হয়ে আটকে গেলে তাকে ডিসটোকিয়া বলে। স্বাভাবিক প্রসব প্রক্রিয়ায় বাচ্চার মুখ ও সামনের দুই পা যোনি পথে বের হয়ে আসে। ফলে কোন প্রকার সাহায্য ছাড়াই বা সামান্য সাহায্য করলে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। কিন্তু বাচ্চার অবস্থানের তারতম্য বা মাতৃজনিত কারণে বাচ্চা না বেরিয়ে আটকে যেয়ে ডিস্টোকিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ অবস্থায় প্রসবে সাহায্যকরণ প্রয়োজন হয়। নিচে সংক্ষিপ্তভাবে প্রসবে সাহায্যকরণ (Assisting delivery) বিষয়ে আলোচনা করা হল-

- মিউটেশন (Mutation): প্রসবকালে বাচ্চার মাথা, পা ইত্যাদির অবস্থান সংশোধন করাকে মিউটেশন বলে। প্রসবের সময় বাচ্চা আটকে গেলে বিভিন্ন মিউটেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
  - ✓ ভিতরের দিকে ঠেলে দেয়া (Repulsion): এ পদ্ধতিতে যদি প্রসবকৃত বাচ্চার দুটি পা বেরিয়ে থাকে তা প্রথমেই পরিস্কার দড়ি দিয়ে পা দুটিতে বাঁধতে হবে। অতঃপর লুব্রিকেন্ট (পিচ্ছিল তরল পদার্থ) ব্যবহার করে পা দুটিকে ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বাছুরের মাথা টেনে যোনি মুখে আনতে হবে।
  - ✓ ঘুর্ণন (Rotation): প্রসবকালে বাছুরের অবস্থান যদি উল্টো হয় অর্থাৎ মেরুদন্ড গাভীর পেটের দিকে তাহলে বাছুরের মাথা ও দু পা ধরে ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে ঘুরিয়ে অবস্থান ঠিক করা হয়।

- টানা (Traction): এ পর্যায়ে দড়ি এবং মাথা একসাথে টান দিতে হবে; প্রয়োজনবোধে অবস্টেটিক্যাল হুক ব্যবহার করা যায়। তবে হুক অবশ্যই বাছুরের চোখের গর্তে বা থুতনির নিচে লাগাতে হবে।
- বাচ্চা কর্তন (Fetotomy): গর্ভস্থ বাচ্চার আকার যদি অস্বাভাবিক বড় হয় সেখানে কোন অবস্থাতেই টেনে বের করা সম্ভব না হয় সে অবস্থায় ঘাভীকে বাঁচানোর জন্য বাচ্চা কর্তনের প্রয়োজন হয়।
- সিজারিয়ান অপারেশন (Caesarian operation): যদি উপরে বর্ণিত কোন পদ্ধতিই কাজে না আসে এবং বাছুরও জীবিত পাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে সিজারিয়ান অপারেশন করা প্রয়োজন হয়।

৫.৯ গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

প্রজনন অঙ্গের সুস্বাস্থ্যকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বলা হয়। লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য গবাদিপশুর প্রজনন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি প্রধানত গর্ভধারণের কিছু সমস্যার জন্য গবাদিপশুর খামারের বার্ষিক দুধ ও বাছুর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হয়। উন্নত প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এই সমস্যার ভালো সমাধান দিতে পারে। এর ফলে খামারের দুধ ও বাছুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চিকিৎসা খরচও অনেকাংশেহ্রাস পাবে।

<u>প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো থাকলে কি কি উপকার হবে?</u>

- বকনার ১২-১৫ মাস বয়সে ডাক আসবে।
- গাভী ১২ মাস পর পর ১টি করে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাচ্চা প্রসব করবে।
- প্রসবের তিন মাসের মধ্যে গাভী পুনরায় গর্ভধারণ করবে।
- ষাঁড় বা গাভীর মাধ্যমে রোগ ছড়াবে না।

<u>প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কি ক্ষতি হয়?</u>

- গর্ভপাত হয়।
- জরায়ুতে ক্ষতের সৃষ্টি বা সংক্রমণ হয়।
- ভ্রূণ অকালে মারা যায়।
- ঋতুচক্র অনিয়মিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

অতএব খামারের গাভী হতে সময়মতো বাচ্চা উৎপাদনের জন্য পশুর সুস্থ ও রোগমুক্ত প্রজনন অঙ্গ থাকতে হবে। যৌনাঙ্গের কোন রোগে আক্রান্ত যাঁড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করা হলে সংক্রমিত বীজের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবাণু গাভীর জননাঙ্গে প্রবেশ করে। ফলে গাভীর গর্ভপাত ছাড়াও প্রজনন অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে।

প্রজনন স্বাস্থ্যহানির কারণ

যে সকল কারণে প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে তা নিম্নে তুলে ধরা হল-

- অসচেতনতা: অসচেতনতার কারণে প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, যে ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করা হবে তার প্রজনন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আছে কি না তা যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি যে গাভীকে প্রজননের জন্য আনা হবে তারও প্রজনন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। তা না হলে একে অপরকে রোগ জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত করতে পারে। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে খামারিকে সচেতন হতে হবে।
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ: এই পরিবেশে খামারে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ পশুর সার্বিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হলে প্রজনন স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানি: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষিত বা পরিবেশিত খাদ্য ও পানিতে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। খাদ্য ও পানি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- অদক্ষ হাত: অদক্ষ হাতে বা অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বাচ্চা প্রসব করানোর কারণে গাভীর জরায়ু সংক্রমিত হতে পারে। উপরন্তু, অদক্ষতার কারণে যৌন রোগে আক্রান্ত যাঁড় দ্বারা প্রজনন করানো হলে বা সংক্রমিত বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হলে প্রজনন স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

সাধারণ জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, পরজীবী, পোকামাকড়, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি খামারের প্রাণির বাসস্থানে প্রবেশ করতে না দেয়া বা বেঁচে থাকতে না দেয়া এবং প্রাণিকে সংক্রামিত বা বিপদগ্রস্ত করা থেকে বিরত রাখার সমন্বিত প্রয়াসই

হল জৈবনিরাপত্তা। গবাদিপশুর সাধারণ জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেমন সাধারণ রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায় তেমনি প্রজনন সংক্রান্ত রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। নিম্নে সাধারণ জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

- সংক্রমণমুক্ত খাদ্য ও পানি: সংক্রমিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পশুর দেহে বিভিন্ন রোগের জীবাণু প্রবেশ করতে পারে এবং ওই সকল জীবাণু দ্বারা প্রজনন অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে। যেমন-ব্রুসেলোসিস।
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বাসস্থান: অপ্রতুল আলো-বাতাস চলাচল ব্যবস্থা ও ত্রুটিপূর্ণ বাসস্থান এবং রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত চারণভূমি পশুর স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।
- নিয়মিত বাসস্থান পরিষ্কারকরণ: নিয়মিত বাসস্থান পরিষ্কার করতে হবে এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক পরিবেশ উন্নত করতে হবে। নিয়মিত জীবাণুনাশক দ্বারা গোয়াল ঘর পরিষ্কার করতে হবে। বাসস্থানের আশেপাশে প্রতি সপ্তাহে চুন ছিঁটিয়ে দিতে হবে। এতে জীবাণুর সংক্রমণ কম হবে। চারণভূমি প্রতি বছর ২-৩ বার চাষ করে মাটি ওলট-পালট করে দিতে হবে। এতে জীবাণু মাটি চাপা পড়ে যাবে এবং রোগের সংক্রমণের হার কমে যাবে।
- বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ: বন্যপ্রাণী খামারে রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই খামারে বন্য প্রাণির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ: রক্ত পান করা পোকা-মাকড় যেমন- আটালী ও মশার মাধ্যমে ব্রুসেলোসিস রোগ ছড়াতে পারে। পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থাপনা অবশ্যই পশু খামারে থাকতে হবে।

প্রজনন সংক্রান্ত জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধমে প্রজনন স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়। প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সাধারণ জৈবনিরাপত্তার পাশাপাশি প্রজনন সংক্রান্ত জৈবনিরাপত্তা পালন করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যে কোন পরামর্শের জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

জরায়ু সংক্রমণ: স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ু জীবাণুমুক্ত থাকে। অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে কৃত্রিম প্রজনন, যৌন রোগে আক্রান্ত ষাঁড় দ্বারা প্রজনন, সংক্রামিত বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন ও অদক্ষ হাতে অস্বাস্থ্যকর উপায়ে বাচ্চা প্রসব করানোর ফলে জীবাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে ও জরায়ু সংক্রমিত হয়। জরায়ুর সংক্রমণের ফলে জরায়ুর স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয় এবং শুক্রাণুর চলাচলে বিঘ্ন ঘটে ও শুক্রাণু মারা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের দেশে ২৭% গাভীতে জরায়ুর সংক্রমণ আছে। অতএব, প্রজননের সময় উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রজনন করাতে হবে।

গাভী গরম না হওয়া এবং বিলম্বে যৌবনপ্রাপ্তি: বাছুরের বয়সের সাথে দৈহিক ওজনের অসামঞ্জস্যতার কারণে যৌবনারম্ভ দেরীতে শুরু হয়। ভালো জাতের বকনা ১২-১৫ মাস বয়সের সময় প্রথম ডাকে আসে, তবে অপুষ্টি ও অন্যান্য রোগের (কৃমি ও সংক্রামক) কারণে প্রজনন অঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। কৃমিনাশক ব্যবহার ও সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধান করা যায়।

প্রজনন অঙ্গের পরিচর্যা: প্রাণির প্রজনন অঙ্গ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রসবের পর গাভীকে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে জরায়ু জীবাণুনাশক দিয়ে ধৌত করতে হবে। ষাঁড়ের জননাঙ্গে অনেক সময় পশম বড় হয়ে যায়। এগুলো নিয়মিত কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

গর্ভকালীন ব্যবস্থাপনা: গর্ভকালীন অবস্থায় গাভীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। গাভীকে যাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পানি দিতে হবে। গাভী যেন কোন ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রসবের সময় যাতে সহজে বাচ্চা প্রসব হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অধ্যায় ৬

গবাদিপশুর রোগব্যাধির চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

পর্যাপ্ত পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বজায় রাখার পর দেহ স্বাভাবিক কার্যসম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে সে অবস্থাকে রোগ বলে। এছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন পদ্ধতি বা কার্যসম্পাদনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে অকৃতকার্য হলে সে অবস্থাকেও রোগ বলা হয়। মানুষের মধ্যে রোগ যেমন মহামারী আকার ধারণ করে অনুরুপ গবাদিপশুর বেলাও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে মানুষ ও গবাদিপশুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ তার অসুস্থতা কথার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু গবাদিপশু তা পারে না। তাই গবাদিপশুর রোগব্যাধির ব্যবস্থাপনা যে দুরূহ ব্যাপার তা বলাই বাহুল্য।

৬.১ সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ

সুস্থ গবাদিপশুর বাহ্যিক লক্ষণ জানতে হলে প্রথমে অসুস্থ পশুর লক্ষণসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। সে কারণেই এখানে সুস্থ ও অসুস্থ পশুর বাহ্যিক লক্ষণসমূহ যুগপৎভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

- মাজেল (muzzle): উপরের ঠোঁটের লোমবিহীন অংশকে মাজেল বলে। একটি সুস্থ পশুর মাজেল সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকে। বিন্দু বিন্দু ঘামে সিক্ত এ অংশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অসুস্থ পশুর মাজেল সাধারণত শুষ্ক থাকে।
- লালা (saliva): কোন সুস্থ পশুর মুখ থেকে সাধারণত লালা পড়ে না। মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা নির্গত হলে তা রোগাবস্থা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, মুখগহ্বরে কোন ক্ষত হলে (যেমন- ক্ষুরারোগ) মুখ থেকে অতিরিক্ত লালা পড়ে। আবার জলাতঙ্ক রোগে ক্ষতাবস্থা ছাড়াও লালা পড়ে।
- খাদ্য গ্রহণ (feeding): সুস্থ পশুতে স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা ও অসুস্থ পশুতে ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। গলবিল বা ফ্যারিংসের অবশতার কারণে পশু খাদ্য গলধঃকরণ করতে পারে না। ফলে খাবার নাকমুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।
- জাবরকাটা (rumination): রোমন্থক পশু, যেমন- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জাবরকাটে। তৃণভোজী এসব প্রাণী খাদ্য যথাযথভাবে না চিবিয়ে গলধঃকরণ করে। পরে বিশ্রামকালে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এসব খাদ্য পাকস্থলী থেকে অন্ননালির মাধ্যমে মুখগহ্বরে আসে। লালা সংমিশ্রণ ও চর্বিতচর্বনের পর এ খাদ্য পুনরায় অন্ননালি হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়াকে জারবকাটা বা রোমন্থন বলে। রোমন্থন সুস্থতার লক্ষণ। কোন অসুস্থ পশু সাধারণত রোমন্থন করে না।
- নাসিকারন্ধ্র (nostrils): সুস্থ গবাদিপশুর নাসিকারন্ধ্র পরিষ্কার থাকে। নাক থেকে কোনো শ্লেষ্মাজাতীয় তরল পদার্থ বের হলে তা সাধারণত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ইঙ্গিত করে।
- শ্বাসপ্রশ্বাস (respiration): বিভিন্ন প্রজাতির পশুর নির্দিষ্ট শ্বাসপ্রশ্বাসের হার রয়েছে। সুস্থ পশুতে এ হার স্বাভাবিক থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের অস্বাভাবিকতা তাই অসুস্থতার লক্ষণ। এ লক্ষণ বাহ্যিকভাবে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- চোখ ও কান (eye and ear): সুস্থ পশুর চোখ পরিষ্কার থাকে। চোখে আঘাত লাগলে, ডারময়েড সিস্ট (dermoid cyst) হলে চোখ থেকে পানি পড়ে। জীবাণু সংক্রমণ হলে চোখে ময়লা জমতে পারে এবং চোখ লাল হতে পারে। তাছাড়া জন্ডিস (jaundice) হলে চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। সুস্থ পশুর কান সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোন শব্দ হলে কান খাড়া করে ও সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। পশু অসুস্থ হলে এরূপ প্রতিক্রিয়া বিলুপ্ত হয়।
- লেজ (tail): সুস্থ পশুর লেজ সর্বদা ব্যস্ত থাকে। কোন মশামছি বা কীটপতঙ্গ গায়ে বসলে লেজের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে তাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ পশুতে লেজ নিশ্চল থাকে এবং মশামাছি সারা শরীরে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করে। এছাড়া গরু-মহিষের লেজে পচনশীল ঘা (gangrene) থাকতে পারে। আবার সুস্থ পশুর লেজ পরিষ্কার থাকে। গরু-মহিষে প্রায়শ ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়। এসব ক্ষেত্রে পশুর লেজ এবং তদসংলগ্ন স্থানসমূহে পায়খানা লেগে থাকতে দেখা যায়। জরায়ুতে পুঁজ (pyometra) হলে লেজের উপরিভাগে পুঁজ জড়িয়ে থাকবে। কখনও কখনও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা লেজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। এসব অসুস্থতার লক্ষণ।

- বহিরাবরণ (body coat): সুস্থ পশুর বহিরাবরণ কোমল, মসৃণ ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়। অপুষ্টি, চর্মরোগ প্রভৃতির কারণে বহিরাবরণের এ বৈশিষ্ট্য খর্ব হয় এবং খসখসে ও রুক্ষরূপ ধারণ করে। কখনও কখনও শরীরের অংশবিশেষ লোমহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া খোসপাঁচড়া, ফোঁড়া, বিভিন্ন প্রকার ঘাত, কীড়াপড়া (myiasis), টিউমার, সিস্ট (cyst), আঁচিল (papillomatosis), জোয়ালকান্দা, কুঁজে ঘা প্রভৃতি রোগ শরীরের বাহ্যিক আবরণ পরীক্ষা করে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সুস্থ পশুর লোম শায়িত অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত শীত ও জ্বরে পশুর লোম খাড়া থাকে।
- নাভি (navel): বাছুরের নাভিতে প্রায়ই ফোঁড়া (navel abscess) ও হার্নিয়া (umbilical hernia) দেখা যায়। শঙ্কর জাতের বাছুরে এ দুটো রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এসব রোগে নাভি সংলগ্ন এলাকা স্ফীত হয় এবং সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।
- বাহু (limb): পশুর ৪টি বাহু অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনটিতে ত্রুটি হলে পশু তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease), পা পঁচা (Foot Rot), পদপ্রদাহ (laminitis), ঝিঞ্জি বা টাশ রোগ (upward patellar fixatioin), সন্ধিচ্যুতি (dislocation of joint), সন্ধিপ্রদাহ (arthritis), বাহুর অবশতা (limb paralysis), হাড়ভাঙ্গা (Fracture) প্রভৃতি রোগে পশু খোঁড়া হয়ে যায়। সুস্থ পশুর বাহুগুলো ত্রুটিমুক্ত থাকবে।
- স্বাস্থ্যগত অবস্থা (health status): পুষ্টিহীনতা আমাদের গবাদিপশুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুষ্টিহীন পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আমাদের দেশের গবাদিপশুকে স্বাস্থ্যগতভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- অতি স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যহীন ও অতি স্বাস্থ্যহীন। এদের মধ্যে অতি স্বাস্থ্যহীন পশুকে অসুস্থ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ ধরণের পশুর বৈশিষ্ট্য/লক্ষণ এখানে দেয়া হয়েছে । যেমন- এদের বক্ষদেশের সকল হাড় (ribs) স্পষ্ট দেখা যাবে; লাম্বার ট্রান্সভার্স প্রসেস (Lumbar Transverse Process) স্পষ্ট দেখা যাবে; প্যারালাম্বার ফোসা (Paralumbar Fossa) গভীর হবে; লেজের গোড়া সংকীর্ণ থাকবে। গ্লুটিয়াল পেশি অবতল (concave) থাকবে এবং টিউবার কক্সি (Tuber Coxae) ও টিউবার ইস্চি (Tuber Ischi) ধারালোভাবে ভেসে উঠবে।

৬.২ গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি

৬.২.১ গবাদিপশুর সাধারণ রোগব্যাধি

রোগের কারণ অনুযায়ী গবাদিপশুর রোগব্যাধিকে সাধারণত নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

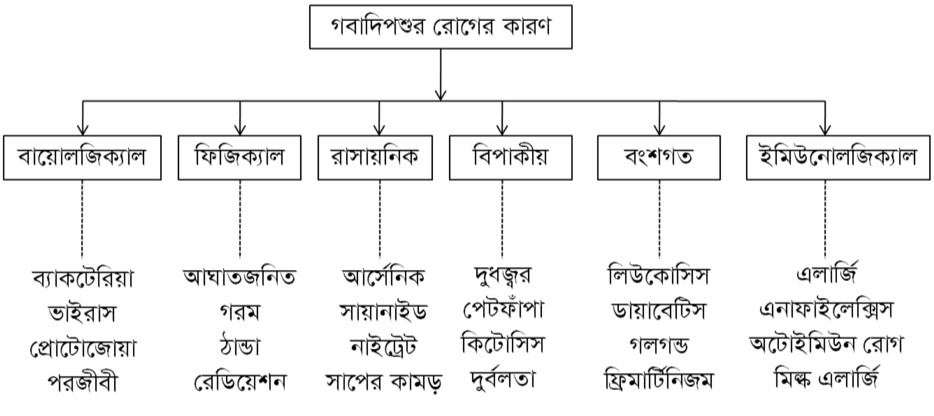

চিত্র ৬.১ঃ গবাদিপশুর রোগের প্রকারভেদের প্রবাহ চিত্র।

(১) বায়োলজিক্যাল বা জীবাণুঘটিত রোগ: এ সকল রোগে নির্দিষ্ট রোগ জীবাণু সুস্থ পশুর দেহে প্রবেশ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করে বলে এদেরকে সংক্রামক রোগ বলে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ	ভাইরাসঘটিত রোগ	প্রোটোজোয়াজনিত রোগ	ছত্রাকজনিত রোগ	পরজীবিজনিত রোগ
তড়কা বা এনথ্রাক্স	ক্ষুরারোগ বা এফএমডি	ট্রাইকোমোনিয়াসিস	রিংওয়ার্ম বা দাদরোগ	কলিজা কৃমি
বাদলা	জলাতংক বা র‌্যাবিস	ব্যাবেসিওসিস	এসপারজিলোসিস	গোল কৃমি
গলাফুলা	বোভাইন এফিমেরাল ফিভার	ককসিডিওসিস	একটিনোব্যাসিলোসিস	ফিতা কৃমি
ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস	বোভাইন ভাইরাল ডাইরিয়া	ব্যালানটিডিওসিস	একটিনোমাইকোসিস	কেঁচো কৃমি বা এসকারিয়াসিস
ব্রুসেলোসিস	পিপিআর বা ছাগ বসন্ত			ফুসফুসের কৃমি
কলিব্যাসিলোসিস	রিন্ডারপেষ্ট বা গো-বসন্ত			আঠালি, উকুন
টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা	প্যারাপক্স			

বিভিন্ন মাধ্যমে এ সকল রোগ জীবাণু সুস্থ পশুতে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। কতিপয় মাধ্যম (ফাত্তাহ ২০০০) নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) সংক্রামক: তড়কা, বাদলা, ক্ষুরারোগ, আমাশয়, ব্যাবেসিওসিস ইত্যাদি।
- বাতাসের মাধ্যমে- ক্ষুরারোগ, পিপিআর, বসন্ত ইত্যাদি।
- পানির মাধ্যমে- কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি।
- সংস্পর্শে- তড়কা, ক্ষুরারোগ, র‌্যাবিস ইত্যাদি।
- মাটির মাধ্যমে- তড়কা, বাদলা ইত্যাদি।
- দূষিত খাদ্যের মাধ্যমে- বটুলিজম, আমাশয়, পেটের পীড়া, পেটব্যাথা ইত্যাদি।
- মশামাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ- ম্যালেরিয়া, হাম্পসোর, ব্যাবেসিওসিস ইত্যাদি।

(২) ফিজিক্যাল: আঘাতজনিত, গরম ঠান্ডা, রেডিয়েশন ইত্যাদি।
(৩) রাসায়নিক: বিষ দ্বারা সৃষ্ট রোগ যেমন লেড, আর্সেনিক, সায়ানাইড, নাইট্রেট, সাপের কামড় ইত্যাদি।
(৪) বিপাকীয় ও অপুষ্টিজনিত: দুধজ্বর, পেটফাঁপা, কিটোসিস, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, রাতকানা ইত্যাদি।
(৫) বংশগত ও জন্মগত কারণ: লিউকোসিস, ডায়াবেটিস, গলগন্ড, ফ্রিমার্টিনিজম ইত্যাদি।
(৬) ইমিউনোলজিক্যাল: এলার্জি, এনাফাইলেক্সিস, অটোইমিউন রোগ, মিল্ক এলার্জি ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ বাংলাদেশে একটি অন্যতম প্রধান ক্ষতিকারক রোগ যার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া গরীব-ধনী কৃষকের জীবনে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। তাছাড়া বাংলাদেশের গবাদিপশুতে প্যারাপক্স ভাইরাসের সংক্রমণ সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে (Lederman et al. 2014) এবং ধারণা করা হচ্ছে যে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

৬.২.২ গবাদিপশু হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরুপ রোগ

ব্যাকটেরিয়াজনিত	ভাইরাসজনিত	পরজীবিজনিত
তড়কা (Anthrax)	জলাতংক (Rabies)	টিনিয়াসিস (Tania solium)
যক্ষা (Tuberculosis)	ম্যাড কাই	মেঞ্জ (Mange)
ধনুষ্টংকার	সার্স (SARS)	ট্রাইকোমোনিয়াসিস
ব্রুসেলোসিস (Brucellosis)	মানকি পক্স	টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasma gondi)
ভিব্রিওসিস	প্যারাপক্স*	হুক ওয়ার্ম (Aneylostoma aninum)
সালমোনেলোসিস		

*সম্প্রতি বাংলাদেশের গবাদিপশুতে parapoxvirus নামক জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে (Lederman et al. 2014)।

যে সকল রোগ পশুপাখি থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে পশুপাখিতে সংক্রমিত হয় তাদেরকে জুনোটিক রোগ বলা হয়। এ সকল রোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত প্রাণিকে main host বা natural host বলে এবং পরোক্ষভাবে আক্রান্ত প্রাণিকে intermediate host বা reservoir বলে। বাংলাদেশে বিভিন্ন জুনোটিক রোগ এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা হয়েছে (Samad 2011, Islam 2014)। তবে সার্বিকভাবে নিম্নবর্ণিত জুনোটিক রোগগুলোর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগটি জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক।

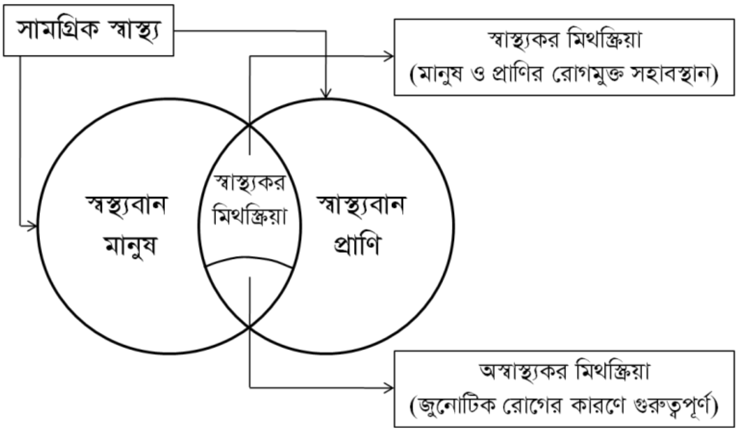

চিত্র ৬.২ঃ জুনোটিক রোগের ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রাণির মিথস্ক্রিয়া।

৬.৩ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

৬.৩.১ প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা (Pathological examination)

ক) ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল পদ্ধতি (Clinical pathological techniques)
রোগাক্রান্ত পশুর রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়।

খ) পোস্ট-মর্টেম বা মৃতদেহ পরীক্ষা (Necropsy/Post-mortem examination)
প্রধানত রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই মৃত পশুর পোস্ট-মর্টেম করা হয়। চাক্ষুষ প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা মূল উদ্দেশ্য। হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য টিস্যু এবং রোগের কারণ সনাক্তকরণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে হয়।

পোস্ট মর্টেমে প্রয়োজন

- জীবাণুমুক্ত এক সেট যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যেমন- পোস্ট-মর্টেমের ছুঁরি, কাচি, হাতের গ্লাভস, এ্যাপ্রন, রাবারের জুতা মাস্ক, বালতি, স্টেনলেস ট্রে, মগ, পলিথিন কাগজ, স্পিরিট ল্যাম্প, সুতা, জীবাণুনাশক পদার্থ যেমন- ডেটল বা স্যাভলন বা স্পেনিল, মেথিলেটেড স্পিরিট, তুলা ইত্যাদি।
- নমুনা সংগ্রহের জন্য উপকরণ বিশেষ- জীবাণুমুক্ত ভায়াল, গ্লাস স্লাইড, জীবাণুমুক্ত সোয়াব, দাগ দেয়ার পেনসিল ইত্যাদি।

পোস্ট-মর্টেম পদ্ধতি

- প্রথমে মৃত দেহের ওজন, বয়স, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ, রং, চিহ্ন ও কেস নম্বর লিখে নিতে হবে।
- রোগের ইতিহাস, লক্ষণ, গবেষণাগারের ডাটা, চিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, মৃত ও পোস্ট-মর্টেমের মধ্যবর্তী সময়, মৃত সময়ের ভঙ্গি ইত্যাদি রিপোর্টে লিখে নিতে হবে।

- মরণ-সঙ্কোচন (rigormortis), পেট ফাঁপা, মলাশয়ের নির্গমন ও পচনজনিত গন্ধ, বাহ্যিক অঙ্গ, যৌনাঙ্গ, ওলান ও বাছুরের নাভী পরীক্ষা করতে হবে। কোন আঘাত বা থেতলানো, চর্ম রোগ, বহিঃদেহের পরজীবী, অস্থি ভঙ্গ, অস্থিসন্ধিচ্যুতি, টিউমার আছে কিনা এবং থাকলে কোথায় আছে ইত্যাদি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- চোয়ালের অস্থিসন্ধি থেকে কাটা আরম্ভ করে বস্তি শ্রোণীকোনা (pelvis) পর্যন্ত লম্বা লম্বি ভাবে চামড়া কাটতে হবে।
- পেট কেটে উদরের ভিতর সমস্ত অঙ্গের অবস্থান পরিবর্তন ও অন্ত্রচ্ছেদীয় গহ্বরের তরল পদার্থের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- বক্ষ গহ্বর উন্মুক্ত করে ফুসফুসাবরক ঝিল্লীর তরল পদার্থ, হৃৎপিন্ডের রক্ত সংগ্রহ করতে হয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে হয়।
- জিহ্বা বক্ষ গহ্বরের সমস্ত অঙ্গ বের করে ব্রঙ্কাই ও ফুসফুস পৃথক ভাবে পালপেশন করে অস্বাভাবিকতা গুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- গলকোষ, টনসিল, খাদ্যনালী, ল্যারিঙ্কস, ট্রাকিয়া, থাইরয়েড গ্রন্থি, চোয়ালাস্থি সংক্রান্ত লসিকা গ্রন্থিগুলো পরীক্ষা করতে হয়।
- হৃৎপিন্ড গহ্বর খুল দেয়াল, কপাটিকা এবং সঙ্গের ধমনী ও শিরা লম্বালম্বিভাবে কেটে পরীক্ষা করতে হয়।
- বক্ষ গহ্বরের ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করার পর উদর গহ্বরের অঙ্গগুলো পরীক্ষা করতে হবে। প্লীহা ও অগ্নাশয় পরীক্ষা করে অস্বাভাবিকতা দেখতে হবে। যকৃতের পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে পিত্তনালী লম্বালম্বিভাবে কেটে কলিজার পাতাকৃমি ও পিত্ত পাথরী আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
- বৃক্ক, বৃক্কনালী, মূত্রাশয়, মূত্রনালী এবং বিভিন্ন যৌনাঙ্গ লম্বালম্বি ভাবে কেটে পরীক্ষা করতে হবে।
- মস্তিষ্ক ও সুষুম্মাকান্ড (spinal cord) বের করে মেরুরস পাসচার পিপেটের সাহায্যে সংগ্রহ করতে হবে।
- পাকান্ত্র কেটে খুলতে হবে। যদি বিষক্রিয়ার সন্দেহ থাকে তবে পাকস্থলীর বস্তু সমুদয়ের কিছু অংশ পরিষ্কার বোতলে সংগ্রহ করতে হবে এবং পদার্থের পরিমাণ, প্রকৃতি, পরজীবীর উপস্থিতি এবং শ্লেষ্মাঝিল্লীর অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- মৃত পশুর মাংসপেশী, অস্থি, অস্থিসন্ধি এবং লসিকা গ্রন্থিসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- পোস্ট-মর্টেমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন রিপোর্ট ফর্মে লিপিবদ্ধ করার সাথে সাথে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা উচিত।

নমুনা সংরক্ষণ

- বিষক্রিয়ায় মৃত পশু সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণের জন্য কোন ঔষধ (preservative) না দেয়াই ভাল। এই নমুনা ড্রাই আইসের সাহায্যে গবেষণাগারে পাঠানো প্রয়োজন।
- ব্যাকটেরিয়া স্বতন্ত্র করার জন্য সোয়াব ও টিস্যু ঠান্ডা অবস্থায় কোন প্রিজারভেটিভ না দিয়ে পাঠানো দরকার।
- ভাইরাস স্বতন্ত্রীকরণের জন্য ৫০% গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠান্ডা অবস্থায় পাঠানো যায়।
- হিস্টোপ্যাথোলোজিক্যাল পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত টিস্যুর প্রায় ১০ গুণ ১০% নিরপেক্ষ ফরমালিনে সংগ্রহ করে পাঠানো প্রয়োজন।
- নমুনা সুষ্ঠুভাবে প্যাকিং করে এবং সিলগালা লাগিয়ে গবেষণাগারের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

নমুনার সাথে নিম্নোক্ত তথ্যাবলি পাঠাতে হবে।

- পোস্ট মর্টেম পশুর বর্ণনা- প্রজাতি, জাত, বয়স, লিঙ্গ, রোগের ক্লিনিক্যাল ইতিহাস ও লক্ষণ।
- রোগ আক্রান্তের মেয়াদ ও তীব্রতা এবং রোগ আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার।
- নমুনার প্রকৃতি এবং সংগৃহীত সময় ও তারিখ। এছাড়া প্রয়োগকৃত চিকিৎসা ও টিকার বিবরণ।
- প্রেরিত নমুনার কোন প্রিজারভেটিভ দেয়া হয়েছে কিনা এবং পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ফর্ম।
- প্রেরক ভেটেরিনারিয়ানের নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর।

নমুনার প্রেরণের ব্যবস্থা।

- নমুনা প্যাকিংয়ে লেবেল- প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা, পশুর প্রজাতি, নমুনার প্রকৃতি এবং নমুনা সংগ্রহের সময় ও তারিখ থাকা প্রয়োজন।
- সাধারণত ডাক বিভাগ বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নমুনা পাঠানো যায়। তবে আমাদের দেশে সরাসরি লোক মারফত নমুনা পাঠানোই উত্তম ব্যবস্থা।
- নমুনা পাঠাবার ঠিকানাঃ আঞ্চলিক পশুরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার অথবা কেন্দ্রীয় পশুরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (CDIL), ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-১০০০।

গ) হিস্টোপ্যাথলজিক্যার পরীক্ষা (Histopathological examination)

ইমুনোডায়াগনস্টিক পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে হিস্টোপ্যাথলজ্যিাল পরীক্ষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ঘ) টক্সিকোলজিক্যাল পদ্ধতি (Toxicological examination)

৬.৩.২ বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসার প্রেক্ষাপট

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশে জাতীয় আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে উন্নত জাতের প্রাণিসম্পদ পালনে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনাসহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিস্কৃত প্রায় সকল আধুনিক পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং এসব কিছুই পশুপাখি পালন ব্যবস্থাপনায় প্রয়োগ হচ্ছে। এতো সমৃদ্ধ প্রযুক্তি ও উপকরণের সমাহার যখন আমাদের এই দেশে যথার্থভাবেই রয়েছে তখন এই আধুনিক খামার পদ্ধতিতে পালিত পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর চিকিৎসা পদ্ধতিও আধুনিকতার দাবী রাখে। এজন্য আধুনিককালে মানব সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণও দেশের ও জতির জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। সুতরাং মানুষের চিকিৎসার জন্য যেমন উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়; তেমনি প্রাণিসম্পদের চিকিৎসার জন্যও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার থাকা প্রয়োজন। দেশের পশুপাখির চিকিৎসার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ভেটেরিনারি চিকিৎসালয় এবং জেলা পর্যায়ে ভেটেরিনারি হাসপাতাল থাকলেও এইসবে পশুপাখির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয় (Sen 2014)। ভেটেরিনারি সার্ভিসের বর্তমান চিত্রানুযায়ী প্রাণিসম্পদের কাংখিত উন্নয়ন কোনদিনই আশা করা যায় না। প্রাণিসম্পদ পালনে আধুনিক ব্যবস্থাপনা চর্চার প্রেক্ষাপটে ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা যুগোপযোগী করণের সমস্যা ও সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল-

অবকাঠামো: ভেটেরিনারি চিকিৎসার মত একটি আধুনিক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সেবা কর্ম পরিচালনা করবার মতো সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব রয়েছে সর্বত্র; যে কারণে সমগ্র বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আজ সমস্যাগ্রস্থ। উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসালয় (ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি) গুলোতে প্যাথলজি বিভাগের অভাবের কারণে স্থানীয়ভাবে সঠিক চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হয় না। আবার মাত্র একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের পক্ষে পুরো উপজেলার বিপুল সংখ্যক প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া সম্ভব হয় না। সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা চিকিৎসালয় গুলোকে হাসপাতালে উন্নীত করে জরুরি চিকৎসার জন্য জরুরি বিভাগসহ একটি পৃথক রোগ নির্ণয় শাখা রাখা প্রয়োজন। এই শাখায় ভেটেরিয়ানের পদ সৃষ্টিসহ অন্যান্য লোকবলের (যেমন প্যাথলজিষ্ট, সুইপার ইত্যাদি) পদ সৃষ্টি এবং উপকরণের যোগান দেয়া আজ সময়ের দাবী। বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যন্ত রোগ নির্ণয়ের সুযোগ সুবিধাসহ জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ না করা গেলে একটি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কখনই নিশ্চিতকরণ সম্ভব নয়।

ভেটেরিনারিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি: প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ডিগ্রি অর্জন করে একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক ভীষণভাবে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং এই কর্মব্যস্ততার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পেশাজীবিদের অধ্যায়ন বা অনুশীলনের সুযোগ থাকে না। ফলে যা কিছু ছাত্র জীবনের অর্জন তা দিয়েই একজন ভেটেরিনারিয়ান সমস্ত জীবন দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং জটিল চিকিৎসা কর্মটি পরিচালনা করতে থাকেন। এছাড়া প্রাণিসম্পদ কেন্দ্রিক কর্মসম্পৃক্ততার সঙ্গে অর্থ উপার্জনের

একটি সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবেই অর্থমোহ, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব এবং ব্যক্তিগত উৎসাহের অভাবের কারণে একজন ভেটেরিনারিয়ান নিজেকে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন না। এই সকল প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবা যুগোপযোগী করতে হলে ব্যক্তিগতভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন চিকিৎককে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা: হাসপাতালে চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তার রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানসহ আন্তরিকতা, সততা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে রোগীর রোগমুক্তির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকেন। বিশেষ করে হাসপাতাল একটি সার্বক্ষণিক চিকিৎসাস্থল হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় সেখানে রোগী পৌঁছামাত্রই তার সঠিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবার উপকরণ ও ব্যবস্থাদি থাকা প্রয়োজন যাতে ডাক্তারের পক্ষে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সহজতর হয়। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে প্রাণিসম্পদ অফিস সমূহে পশুপখির চিকিৎসা চলছে তাতে এই শিল্পের উন্নয়ন কোনদিনই আশা করা যায় না। বাংলাদেশ সরকার সর্বদাই জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে যুগের দাবী অনুযায়ী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করলেও ভেটেরিনারি চিকিৎসার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি চিন্তাগতভাবেই অনুপস্থিত। ফলে পেশাদারী দক্ষতা অথবা সেবার উৎকর্ষতা ঘটেনি। একইভাবে বলা যায় প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সেবার কর্ম পরিকল্পনা যারা করছেন তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টায় বিষয়টির সার্বিক দিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করে সমন্বয় ঘটাতে পারলেই প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রগুলি সমস্যামুক্ত করা সম্ভব হবে এবং একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক ভেটেরিনারি চিকিৎসা কর্মকাঠামো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

দক্ষতা অর্জন: বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ পালনে আদিকালের ব্যবস্থাপনার স্থলে নতুন এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার চর্চা হচ্ছে। উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির প্রসার এবং অনুন্নত দেশী জাতের গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রসারের তুলনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নের জন্য দেশ-বিদেশ প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের উদ্যোগ এবং সুযোগ দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কম। মানব সম্পদ উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ব্যর্থতার কারণেই ভেটেরিনারি চিকিৎসার মতো দ্রুত অগ্রসরগামী একটি আধুনিক পেশায় দক্ষতার সঙ্গে কর্ম পরিচালনায় ব্যর্থতা আসে। এতে করে প্রাণী স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং এই ক্ষতির মধ্য দিয়ে প্রাণী চিকিৎসার সামগ্রিক সুনামও ক্ষুন্ন হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা সেবা যুগোপযোগী করতে হলে ব্যক্তিগতভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন চিকিৎসক সমস্যার মোকাবেলা করলেই হবে না বরং ভেটেরিনারি চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সেবার দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য খামার ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়সহ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির উপর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি আবশ্যক।

জনবল: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা খামার এবং বাড়ির আঙ্গিনায় পালিত পশুপাখির রোগব্যাধিতে অনেক সময় উপজেলা ভেটেরিনারি চিকিৎসালয় পর্যন্ত পশুপাখির প্রতিপালকগণ যোগাযোগ করতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত পশুপাখি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবার অভাবে মৃত্যুবরণ করে অথবা রোগের জটিলতায় পশুপাখির কষ্টভোগ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কিছু কিছু রোগ জীবাণু আক্রান্ত পশুপাখির পাশাপাশি অবস্থানকারীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এই দিকটি বিচার করে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা ও রোগ প্রতিরোধ সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ করা গেলে খামারীগণ গ্রাম্য কোয়াক অথবা ঔষধ কোম্পানির সেলসম্যানদের শরনাপন্ন না হয়ে সঠিক ভেটেরিনারি সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং একটি বন্ধুত্ব সুলভ ও বিশ্বাসযোগ্য 'চিকিৎসক-খামারি সম্পর্ক' গড়ে উঠবে।

ঔষধ: বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবায় সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে সরকারি ডিসপেনসারিতে ঔষধের অভাব। খামারি বা কৃষকদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় অনেক সময় লেটেষ্ট জেনারেশনের ঔষধ ক্রয় করতে পারে না এবং কখনও কখনও পুরো ডোজ ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চিকিৎসা করান না। এইভাবে অসম্পূর্ণ চিকিৎসা করার ফলে রোগের জীবাণু শরীরের মধ্যে থেকে প্রাণির দেহে প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষতি করে এবং ঐ জীবাণুটির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ঔষধ এর উপর resistance গড়ে ওঠে। ঔষধের স্বল্পতার কারণে অনেক সময় ভাল চিকিৎসককেও নানা প্রকার সমালোচনার মুখোমুখী

হতে হয়। এমতাবস্থায়, চিকিৎসালয়ে ঔষধের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল হাসপাতাল কেন্দ্রিক প্রাণিস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন সম্ভব।

মানব সম্পদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একদিকে যেমন আছে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা অপরদিকে রোগ প্রতিরোধের জন্য আছে বিভিন্ন রোগের আধুনিক টিকা, পুষ্টি পুরণের জন্য আছে বিভিন্ন উন্নত খাদ্য উপকরণ, স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আছে রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক প্রচারণা ইত্যাদি। কিন্তু পশুপাখির বেলায় এর প্রায় সবগুলোই অনুপস্থিত। পশুপাখির পুষ্টি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার যেসব উপাদান ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন খামারিগণ সে ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নয় এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে জ্ঞান প্রদানের যথেষ্ট ব্যবস্থাও নাই। অথচ বাংলাদেশে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর প্রতিপালন, প্রাণিসম্পদের সাথে আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে; উন্নয়নের এই ধারাকে টিকিয়ে রাখতে আধুনিক চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা প্রত্যেকটি উপজেলা চিকিৎসালয় পর্যন্ত সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যকীয় একটি ব্যাপার। বর্তমান সময়ে পৃথিবীব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থার উপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ কারণে আধুনিক চিকিৎসা সেবার সঙ্গে প্রতিরোধমূলক টিকা উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং প্রয়োগের নেটওয়ার্কটি যুগোপযোগী করা অত্যন্ত জরুরি।

৬.৩.৩ শ্বাস তন্ত্রের রোগের চিকিৎসার মূলনীতি

শ্বাস তন্ত্রের রোগের চিকিৎসায় সুনির্দিষ্ট ও সহায়ক চিকিৎসা উভয়ের ব্যবহার হয়।

ক) এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা (Antibiotic therapy): প্রজাতি, জীবাণুর সংক্রমণ ও সেনসিটিভিটি অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক নির্বাচন করে চিকিৎসা করতে হয়।

খ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন (Environmental alterations): শ্বাস তন্ত্র রোগাক্রান্ত পশুকে কর্মবিহীন অবস্থায়, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করে এমন শুষ্ক ঘরে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় রাখতে হবে।

গ) অক্সিজেন সরবরাহ (Oxygen therapy): অ্যানোক্সিক অ্যানোক্সিয়ার (anoxic anoxia) ক্ষেত্রে অক্সিজেন সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়।

ঘ) শ্বাসীয় উত্তেজক (Respiratory stimulant): শ্বাসীয় নিয়ন্ত্রণ কোষের ডিপ্রেশনে শ্বাসীয় উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করা হয়। পিক্রোটক্সিন (Picrotoxin), মেট্রাজোল (metrazol), কোরামিন, ক্যাফিন (caffein), অ্যাম্ফেটামিন সালফেট (amphetamine sulfate) উত্তেজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঙ) শ্লেষ্মারেচক (Expectorant): ব্যথাপূর্ণ কাশি ও অবসন্নতা এবং চটচটে বা আঠালো নিঃস্রাবে সিডেটিভ শ্লেষ্মারোচক যেমন- অ্যামোনিয়াম বা পটাসিয়াম সল্ট দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। দীর্ঘমেয়াদী ব্রঙ্কাইটিসে যখন কাশি নরম এবং ব্রঙ্কিয়াল নিঃস্রাব অধিক থাকে সেক্ষেত্রে উত্তেজক শ্লেষ্মারেচক অধিক কার্যকর। যখন কাশি জনিত অবসন্নতা ও কার্যকলাপে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি হয় কিন্তু নিঃস্রাব যৎসামান্য সে ক্ষেত্রে বেদনা হ্রাসক (anodyne) শ্লেষ্মারেচক যেমন- মরফিন, কোডিন, বেলাডোনা ব্যবহার করতে হয়।

চ) ক্রোমনালী প্রেসারক (Bronchodilators): ক্রোমনালী প্রসারক বায়ু চলাচল বৃদ্ধি ও ভারসাম্যহীনতা সংশোধন করে ফলে অক্সিজেন বিনিময় প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটে। প্রাধানত অ্যামিনোফাইলন (Aminophylline) ও থিওফাইলিন (theophylline)।

ছ) শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা লাঘব (Relief of obstruction to respiration): প্রদাহিক বা অ-প্রদাহিক কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালী বন্ধের ক্ষেত্রে ট্রাকিওটোমি করে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হয়।

৬.৪ গবাদিপশুর তড়কা রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা

তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগ পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতিতীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। *Bacillus anthracis* নামক গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়ার কারণে এ রোগ হয়। এ রোগে মানুষসহ যে কোন ধরণের পশু আক্রান্ত হতে পারে। ইংরেজিতে এ রোগকে এনথ্রাক্স (Anthrax) বলে। সেপ্টিসেমিয়া এবং হঠাৎ মৃত্যু এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ রোগে মৃত পশুর দেহে দ্রুত পচন ধরে এবং পেট ফুলতে শুরু করে। নাক, মুখ, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে আলকাতরার মতো কালো বর্ণের রক্ত বের হতে থাকে। মৃতদেহে কাঠিন্য আসে না (rigormortis)। এটি এ রোগের জন্য রোগ-লক্ষ্মণিক ক্ষত বা প্যাথোগনোমনিক লেশন (pathognomonic lesion)। ময়নাতদন্তে প্লীহা অত্যন্ত স্ফীত, নরম ও কালো দেখা যায়। এজন্য অনেকে এ রোগকে চার্বন (Charbon) বা স্প্লেনিক ফিভার (Splenic Fever) বলে থাকেন। এন্টিসিরাম, এন্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ওষুধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পালন করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তড়কা রোগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

রোগের কারণ ও বিস্তার: *Bacillus anthracis* (ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস) নামক এক ধরণের গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া তড়কা রোগের জন্য দায়ী। এ ব্যাকটেরিয়ার দেহে আবরণী বা ক্যাপসুল আছে। ক্যাপসুল ও জীবাণুর মধ্যে একটি স্পোর থাকে। এ স্পোর জীবাণুনাশক ঔষধ বা সাধারণ তাপে নষ্ট হয় না। স্পোর মাটিতে ৩০-৪০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। এ সময়ের মধ্যে কোন পশু সেখানে চলাচল করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব দেশে মানুষসহ পশুর এ রোগ হয়। তবে, কুকুর, বিড়াল ও আলজেরিয়ান জাতের ভেড়াতে এ রোগ হয় না। এদেশে যে কোন রোগে মৃত পশুকে খোলা অবস্থায় ভাগাড়ে ফেলে রাখা হয়। ফলে শবাহারি পশুপাখির মাধ্যমে রোগের জীবাণু ছড়ায় এবং মাটিতে স্পোর বিস্তার লাভ করে। এমতাবস্থায় খরার পর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে এবং গরম ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এ জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এছাড়া বন্যার পানির মাধ্যমেও এ জীবাণু ছড়াতে পারে। নিম্নলিখিতভাবে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। যথা-

- প্রধানত দূষিত খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমেও স্পোর সংক্রমিত হতে পারে।
- ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ রোগ সংক্রমিত হয়। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে রক্তচোষক কীটপতঙ্গের মাধ্যমে আক্রান্ত পশু থেকে সুস্থ পশুতে এ জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এ রোগের মড়কের সময় আক্রান্ত পশুর মৃত্যুর ভয়ের কারণে পশু জবাই করে মাংস খায়। এক্ষেত্রে মাংস কাটার সময় মানুষে জীবাণু সংক্রমিত হয়।
- এ রোগে মৃত পশুর সংস্পর্শে মানুষের রোগ হয়। মানুষের ত্বকে এ জীবাণু ম্যালিগন্যান্ট কারবাঙ্কল (malignant carbuncle) রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ: *Bacillus anthracis* জীবাণুর স্পোর দেহে সংক্রমিত হওয়ার পর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়ে প্রবেশ করে এবং ফ্যাগোসাইটের (phagocyte) মাধ্যমে স্থানিক লসিকাগ্রন্থিতে এসে বংশবিস্তার করে। পরবর্তীতে এরা লসিকাগ্রন্থি থেকে রক্তে পৌঁছে রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিসেমিয়ার সৃষ্টি করে এবং দেহের প্রায় সকল টিস্যুকে আক্রান্ত করে। জীবাণু থেকে নিঃসৃত বিষ ইডিমা সৃষ্টি করে এবং টিস্যুকে বিনষ্ট করে। প্রধানত শক (shock), তীব্র রেন্যাল অকার্যকারিতা ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যস্থতায় অন্তিম অক্সিজেন স্বল্পতায় পশুর মৃত্যু ঘটে। রোমন্থক পশুতে এ রোগ প্রধানত দুপ্রকৃতির হয়ে থাকে। যথা- অতি তীব্র প্রকৃতির রোগ এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ। অতি তীব্র প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে পশু কোন লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যায়। তবে ১-২ ঘন্টা বেঁচে থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যায়-

- জ্বর, পেশির কম্পন, শ্বাসকষ্ট, ঝিল্লীপর্দায় রক্ত সঞ্চায়ন ইত্যাদি।
- অতঃপর অন্তিম খিঁচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পশুর মৃত্যু ঘটে।

- মৃত পশুর দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ, যেমন মুখ, মলদ্বার, যোনিপথ, নাসারন্ধ্র প্রভৃতি দিয়ে আলকাতরার মতো কালচে রক্ত বের হয়।

তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত পশু প্রায় ৪৮ ঘন্টা জীবিত থাকে। এ সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা–

- ৪০°-৪১.৭° সেন্টিগ্রেড জ্বর ওঠে। ক্ষুধামন্দা, নিস্তেজতা, পেটফাঁপা, দেহের ঝাঁকুনি, চোখের রক্তাভ পর্দা ইত্যাদি দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত হয় এবং হৃৎপিন্ডের গতি বৃদ্ধি পায়। রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা হয়।
- অনেক সময় নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। পাকান্ত আক্রান্তের ফলে ডায়রিয়া ও রক্ত আমাশয় দেখা দেয়।
- দুগ্ধবতী গাভী দুধ দেয়া কমিয়ে দেয় এবং দুধ হলুদ ও রক্তমিশ্রিত হয়। গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয়।
- আক্রান্ত গরু একদিনের বেশি জীবিত থাকলে জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি ও যৌনিদ্বার ইডিমার কারণে স্ফীত দেখায়।

রোগ নির্ণয়: গবাদিপশুর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগলক্ষণ পরীক্ষা করে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে এ রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত পশুর কানের রক্ত ও স্থানিক ইডিমার ফ্লুইড নিতে হয়। এগুলো গ্রামস স্টেইন ও পলিক্রোম মিথাইল ব্লু স্টেইন করে *Bacillus anthracis* জীবাণু শণাক্ত করা যায়। মৃত পশুর দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন দেখেও রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা- পচন দ্রুত শুরু হয় ও পেটফাঁপা থাকে; দেহের স্বাভাবিক ছিদ্রপথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে না; মৃত্যুর পর অঙ্গপত্যঙ্গে কাঠিন্য আসে না বা রাইগর মরটিস হয় না; সমগ্র দেহে রক্তক্ষরণ, স্ফীত লসিকগ্রন্থি, অন্তপ্রদাহ ও গ্যাসীয় পচন হয় এবং প্লীহা স্ফীত থাকে এবং নরম ও কালো দেখায়। অ্যাসকলি প্রিসিপিটেশন টেস্টের (Ascoli Pricipitation Test) মাধ্যমেও এ রোগের নিশ্চিত পরীক্ষা করা যায়।

চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ: অ্যান্টিসিরাম, অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনেমাইড গ্রুপের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা সম্ভব। অ্যান্টিসিরাম দেয়ার পর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ৪/৫ দিন চিকিৎসা করতে হবে। কারণ, অ্যান্টিসিরাম শুধু জীবাণু সৃষ্ট বিষ নষ্ট করবে। কাজেই, জীবাণুকে মারার জন্য এন্টিবায়োটিক বা সালফোনামাইড গ্রুপের ঔষধের ব্যবহার প্রয়োজন। এন্টিসিরাম না পাওয়া গেলে শুধু এন্টিবায়োটিক বা সালফোনেমাইড গ্রুপের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে। নিম্নে এ রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে ধরা হল।

- আক্রান্ত পশুর চিকিৎসা করতে হবে। সুস্থ পশুকে টিকা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে এনথ্রাক্স স্পোর ভ্যাকসিন পাওয়া যায়। বছরে একবার নির্ধারিত মাত্রায় এ টিকা প্রয়োগ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য নিন্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে। যথা-
- এ রোগে মৃত পশুর কোন ময়না তদন্ত বা কাটাছেঁড়া করা যাবে না। কারণ, জীবাণু বায়ুর সংস্পর্শে আসলেই স্পোরে পরিণত হয়। তাই মৃত পশুর দেহের সকল স্বাভাবিক ছিদ্রপথ তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এতে মরদেহ পচনের সাথে সাথে জীবাণুরও মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া এ রোগে মৃত পশুকে ২ মিটার গভীর গর্তে পর্যাপ্ত কলিচুন সহকারে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটির উপরে কাঁটাজাতীয় কোন গাছের ডাল পুতে দিতে হবে যেন সেখানে লোকজন বা পশু চলাচল না করে।
- স্পোর সৃষ্টির পূর্বেই মৃত পশুর গোয়াল ঘরকে গরম ১০% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (৬০° সেন্টিগ্রেড) দিয়ে ধৌত করলে জীবাণুর মৃত্যু ঘটবে। তবে স্পোর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ঘন জীবাণুনাশক ঔষধ, যেমন- ৫% লাইজল বা ফরমালিন বা অন্য কোন কার্যকরী জীবাণুনাশক ওষুধ নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।
- আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শের অন্যান্য সুস্থ পশুকে পৃথক করে হাইপারইমিউন সিরাম (hyperimmune serum) ইনজেকশন দেয়া যায়।
- পশুজাত দ্রব্য, যেমন- বোন মিল আমদানির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়াতে পারে। সুতরাং বোন মিল আমদানির ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা প্রয়োজন।

৬.৫ গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ ও তার দমন ব্যবস্থা

ক্ষুরারোগ একটি অতি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগকে গ্রামে ক্ষুরাচল বা বাতনাও বলে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বি-খুর বিশিষ্ট প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর মুখ ও পায়ে ঘা হয় এবং মুখ থেকে সুতাকৃতির লালা নির্গত হয়। দৈহিক তাপমাত্রা ৪০.০°-৪১.১° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ রোগে পশু খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং খুঁড়িয়ে হাঁটে। বয়স্ক পশু অপেক্ষা বাছুরে এ রোগের মৃত্যুর হার বেশি। রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস প্রধাণত খাদ্য ও শ্বাসনালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত পশুর লক্ষণ দেখে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষুরারোগের কোন কার্যকর চিকিৎসা নেই। তবে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের জটিলতা প্রতিরোধের জন্য মুখ ও পায়ের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক প্রয়োগ ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ক্ষুরারোগ এপথোভাইরাস নামক এক প্রকার অতিক্ষুদ্র ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়। সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত এ ভাইরাসের ৭টি টাইপ সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি টাইপের আবার অনেক সাবটাইপ রয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত গরু, মহিষ ও ছাগলের নমুনা থেকে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন এবং এলাইজা প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাইরাস টাইপিং ও সাবটাইপিং করা হয়। দেশে এ পর্যন্ত ৪ টি টাইপ (O, A, C ও Asia-1) এবং একটি সাব-টাইপ (A_{22}) সনাক্ত করা হয়েছে। ক্ষুরারোগ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হল যে, এক টাইপের দ্বারা তৈরি ভ্যাকসিন অন্য টাইপ দ্বারা সৃষ্ট রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এ কারণেই ক্ষুরারোগ দমন ব্যবস্থা কিছুটা সমস্যাবহুল ব্যাপার। বাংলাদেশে বর্ষা এবং শীতকালে ক্ষুরারোগের প্রকোপ বেশি দেখা গেলেও প্রায় সারা বছরেই কিছু না কিছু ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। বর্ষার পর পা ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং শীতকালে ক্রমেই বেশি হয়ে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে স্মরণকালের ভয়াবহতম ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

ক্ষুরারোগের ক্ষতিকর প্রভাব (bad effects): ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে ব্যাপক। প্রতি বছর অসংখ্য পশু এ রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংক্রামক রোগ। এই রোগে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে থাকে। (১৯৯২ সালের জরিপ, ২০০২-০৩ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। ক্ষুরারোগগ্রস্থ পশুর দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন কমে যাওয়ায় এই অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়।

- এদের মধ্যে অনেক পশু, বিশেষ করে বাছুর, মারা যায়।
- এ রোগের কারণে দীর্ঘদিন পশুকে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়।
- দৈহিক ওজন হ্রাস পাওয়ায় মাংসের উৎপাদন কমে যায়। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়। কাজেই এ রোগের কারণে প্রথম পর্যায়ে কৃষক এবং পরবর্তীতে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে।
- এ রোগের কারণে পশুর গর্ভধারণ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, এমনকী গর্ভপাত হতে পারে যা কৃষকের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

রোগের লক্ষণ: ক্ষুরারোগে আক্রান্ত পশুতে প্রথম অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। মুখের ভিতরে, জিহ্বায়, মাড়িতে, মাজলে ও দুই খুরের মাঝখানে ফোসকা উঠে। অনেক সময় দুধের বাটেও ফোসকা দেখা যায়। এক দিনের মধ্যেই এই ফোসকা ফেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ সময়ে আক্রান্ত পশুর যত্ন না নেয় হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যান্য জীবাণুঘটিত সংক্রমণের ফলে রোগ জটিল আকার ধারণ করে। মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং লালা ফেনার মত হয়। পশু খেতে পারে না এবং ওজন অনেক কমে যায়। পায়ের ক্ষতে মাছি বসে অনেক সময় পোকা হতে পারে। দুগ্ধবতী পশুতে দুধ অনেক কমে যায়। এমনকি গাভী সুস্থ্য হয়ে উঠলেও দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আর কখনও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না। রোগাক্রান্ত পশু ১৬-২৬ দিনের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে উঠে। তবে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার আগেই বাছুর মারা যেতে পারে।

চিকিৎসা: ক্ষুরারোগ ভাইরাস জনিত রোগ হওয়ায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে পশুকে দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য সহায়ক চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন যার ফলে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পটাসিয়াম

পারম্যাংগানেট মিশ্রিত পানি (এক লিটার পানিতে পটাসিয়াম পারম্যাংগানেটের কিছু দানা, প্রায় ০.০০১%) দিয়ে মুখ এবং পায়ের ক্ষত ধুয়ে ফেলতে হবে। ধোয়ার জন্য কপার সালফেট বা তুঁতে ১% সলিউশন অথবা ফিটকিরি বা এলাম ২-৪% অথবা খাবার সোডা ৪% অথবা সোডিয়াম বাইকার্বনেট ০.১-৫% ব্যবহার করা যেতে পারে। পায়ের এবং মুখের ক্ষত দৈনিক ৩ বার ধোয়ানো উচিত। মুখ ধোয়ার পর বোরো গ্লিসারিন ৪% অথবা বোরাক্স গ্লিসারিন ২-৪% লাগানো যায়। গ্লিসারিনের পরিবর্তে মধু বা নারিকেল তেল সমপরিমান ব্যবহার করা যাবে। পায়ের ক্ষতের জন্য পা জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয়ানোর পর এন্টিবায়োটিক বা সালফার ড্রাগস জাতীয় পাউডার লাগাতে হবে। এর পর ক্ষতে বিশুদ্ধ তারপিন তেল লাগিয়ে দিলে পায়ে মাছি বসবে না এবং পোকা ধরবে না। অন্যান্য করণীয় বিষয়গুলি হল-

- রোগক্রান্ত পশুকে সুস্থ্য পশু থেকে আলাদা রাখতে হবে এং কোন অবস্থাতেই মাঠে চরানো যাবে না।
- পশুকে সব সময় শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। মুখের ক্ষত ভাল না হওয়া পর্যন্ত পশুকে নরম খাদ্য খাওয়ানো উচিত।
- পশুর আবাসস্থল পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট সলিউশন অথবা আইওসান (১-৩%) অথবা কাপড়কাঁচা সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট (৪%) সলিউশন দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। অসুস্থ্য পশুর বিছানা, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যে সকল লোক অসুস্থ্য পশুকে পরিচর্যা করবে তাদের কাপড়-চোপড় গরম পানিতে বা কাপড়কাঁচা সোডা দিয়ে পরিস্কার করা উচিত।

রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ: পৃথিবীর অনেক দেশ ক্ষুরারোগমুক্ত। এসব দেশের মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। এসব দেশে হঠাৎ কোন স্থানে ক্ষুরারোগ দেখা দিলে আক্রান্ত পশুকে মেরে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। আমাদের দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক বলে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার তারতম্য, সূর্যরশ্মি ও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই এ ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়।

- গবাদিপশুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ, আক্রান্ত পশু একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলের ফলে রোগ বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত পশুকে সুস্থ্য পশু থেকে আলাদা করে রাখতে হবে যেন সুস্থ্য পশুতে এ রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আক্রান্ত পশুর আবাসস্থল (গোয়াল ঘর) ২% সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অথবা ৪% সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।
- ক্ষুরারোগে কোন পশু মারা গেলে দূরে একটি গভীর গর্ত খুঁরে মৃত পশুকে তার মধ্যে রেখে তার উপর কাপড়কাঁচা সোডা বা পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে দিয়ে পুতে ফেলতে হবে, অথবা মৃত পশুকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ, মৃতদেহ মুক্তস্থানে ফেলে রাখলে এ রোগের ভাইরাস সহজেই অন্যান্য পশুতে সংক্রমিত হয়।
- টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এ রোগের টিকা নির্ধারিত মাত্রায় পশুর গলকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন আকারে দেয়া হয়। চার মাসের কম বয়সের পশুকে এ টিকা দেয়া হয় না। গর্ভবতী গাভীকে ক্ষুরারোগের টিকা দেয়া যায়। ক্ষুরারোগের জন্য এটেনুয়েটেড ভ্যাকসিনে ফলাফল ভাল পাওয়া যায় না বিধায় বর্তমানে ইনএ্যাকটিভেটেড ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য গবাদিপশুতে বছরে ২ বার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বহুযোজী (polyvalent) ভ্যাকসিন দরকার অর্থাৎ আমাদের দেশে ভাইরাসের যে ৪টি টাইপ এবং ১টি সাবটাইপ সনাক্ত করা হয়েছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।
- কোন এলাকায় ক্ষুরারোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে সে এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পর ভাইরাস টাইপ নির্ণয় করে ঐ এলাকার সকল সুস্থ্য পশুকে (দ্বি-খুরাবিশিষ্ট) এবং চারপার্শ্বের সমস্ত সংবেদনশীল পশুকে নির্ণীত ভাইরাস টাইপ এর বিরুদ্ধে একযোজী (monovalent) ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে যাতে প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করে রোগ অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এ সময় ঐ এলাকা এবং বাইরের এলাকার মধ্যে পশু চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে মানুষ চলাচলের উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

- দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সংবেদনশীল সব পশুকে ভ্যাকসিন দিয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করা দরকার। এতে সীমান্তের পার্শ্ববর্তী দেশের ভাইরাস টাইপ জেনে সেই টাইপ বা টাইপ সমূহের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- পার্শ্ববর্তী দেশের কোন পশু দেশে প্রবেশ করানোর জন্য 'পশু সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা' (quarantine measure) নিতে হবে। রোগাক্রান্ত পশু দেশে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন পশু বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করার মুহূর্তে পশু সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তত ৭-১৪ দিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ অবস্থায় রোগের উদ্ভব না হলে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে এ কাজগুলো অবশ্যই রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

৬.৬ গবাদিপশুর জলাতঙ্ক রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা

জলাতঙ্ক কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি মারত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এই রোগে গলবিলের পেশীর অবশতার কারণে পানি ও খাদ্য গ্রহণে অসুবিধার জন্য ভীতির সৃষ্টি হয় বলে বাংলায় ইহা জলাতঙ্ক নামে পরিচিত। এ রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশ পেলে মৃত্যু অবধারিত। মানুষসহ সকল উষ্ণ রক্তবাহী পশু জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগ প্রধাণত পাগলা কুকুর-শিয়ালের দংশনে সংক্রমিত হয়। আক্রান্ত পশু প্রথমে উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়। পরবর্তীতে উর্ধ্বমুখী প্যারালাইসিসের কারণে পশু নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করে। পাগলা কুকুরে কামড়ানোর অভিযোগ ও আক্রান্ত পশুর লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। লক্ষণ প্রকাশের পর এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তবে, কুকুর কামড়ানোর পরপরই এন্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। রাস্তাঘাটের কুকুর-শিয়াল নিধন ও নিয়মিত টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রোগের কারণ ও বিস্তার: Rhabdovifidae গোত্রভূক্ত Lyssavirus জেনাসের RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের ২টি ষ্ট্রেইন ক) Street খ) Fixed এ রোগের জন্য দায়ী। শীতকালে (সাধারণত কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে) কুকুরের যৌনমিলনের মৌসুমে এ প্রাণির আনাগোনা বেড়ে যায় তখন রোগের প্রকোপ বাড়ে। রোগাক্রান্ত কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, বেজী যখন কোন সুস্থ মানুষি বা পশুকে কামড়ায় তখনই এ রোগ সংক্রমিত হয়। কামড়ানোর পর ভাইরাস ক্ষতস্থানের রক্তের সাথে মিশে মস্তিস্কে পৌঁছায় এবং লক্ষণ প্রকাশ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২১ দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে।

লক্ষণ: জলাতঙ্ক রোগে পশুর অবসাদভাব, সামান্য জ্বর ও ক্ষুধামন্দা পরিলক্ষিত হয়। মুখ দিয়ে লালা ঝরে। পশু ভগ্নকণ্ঠে ঘন ঘন ডাকতে থাকে। কান খাড়া, চোখ বড় দেখায়। সম্মুখ বস্তুকে আক্রমণ করে ও কামড়াতে চেষ্টা করে। মাথা মাটির সাথে চাপ দেয় উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। পিছনের পায়ে পক্ষাঘাত হয় এবং তা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। উপসর্গের ৪-৭ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ: জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে চিকিৎসায় কোন ফল আসে না। তবে রোগ সংক্রমণের পর পরই অর্থাৎ কুকুর/শিয়াল কামড়ানো মাত্রই ক্ষতস্থান সাবানের পানি দিয়ে ধুয়ে সেখানে antiserum লাগিয়ে ভাইরাস neutralize করা যায়। ক্ষতস্থানে কার্বলিক এসিড দিয়ে পুড়ে দেয়া যেতে পারে। তাছাড়া কুকুর/শিয়াল কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে টিকা প্রয়োগ করতে হবে। কুকুরে LEP (low egg passage) টিকা ১ মিলি ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। গবাদিপশুতে HEP (high egg passage) টিকা ১ মিলি ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। HDC (human diploid cell) টিকা মানুষের জন্য উত্তম। কামড়ের পর ১ মিলি করে ০, ৩, ৭, ১৮, ৩০ এবং ৯০ দিনে মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেয়া হয়। জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত ব্যাবস্থাদি গ্রহণ করতে হয়।

- জলাতঙ্ক আক্রান্ত পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষার মাধ্যমে: এক্ষেত্রে পোষা প্রাণির টিকা ও বেওয়ারিশ কুকুর বিড়াল নিধন করা উচিত। বনে-জঙ্গলে অবস্থানরত সংক্রমণকারী প্রাণী, যেমন- নেকড়ে, হায়েনা, বানর, শিয়াল, বেজি,

কাঠবিড়ালী যথাসম্ভব মেরে ফেলতে হবে। ইউরোপে বন্যপ্রাণির মধ্যে শিয়াল ৮৫% রোগ সংক্রমিত করে। আমাদের দেশেও এ রোগ বিস্তারে কুকুরের পরেই শিয়ালের স্থান। কাজেই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিয়াল নিধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা দুরূহ কাজ বিধায় এ রোগের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অনেকটা অসম্ভব।

- কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালুকরণ: জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে বিদেশ থেকে আগত কুকুর-বিড়ালের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায়, বিদেশ থেকে আসা সকল কুকুর-বিড়ালকে ৩-৬ মাস পর্যন্ত পৃকভাবে রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ না দেখা দিলে ঐসব পশুকে দেশের অভ্যন্তরে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা কার্যকর। কিন্তু যেসব দেশের মধ্যে সাধারণ স্থলসীমা বিদ্যমান সেসব দেশে এ ব্যবস্থা রোগ নিয়ন্ত্রণে তেমন ভূমিকা রাখে না।
- টিকা প্রয়োগ: টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশে জলাতঙ্ক রোগের জন্য দুপ্রকার টিকা বা ভ্যাকসিন রয়েছে। লেপ (LEP = low embryo passage) টিকা কুকুরে ও হেপ (HEP = high embryo passage), টিকা গবাদিপশুতে প্রয়োগ করা হয়। এসব টিকা প্রয়োগ করলে পশু এক বৎসর পর্যন্ত জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।
- জনসচেতনতা: জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি পোষা প্রাণির মালিকের রোগ সম্পর্কিত জ্ঞান, রোগ সনাক্তকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পর্যাপ্ত কার্যকরী টিকা সরবরাহ, টিকা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। সর্বোপরি দেশে এ রোগের নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠু পরিকল্পনাসহ ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ পার্সোনেল, ডাক্তরা ও পুলিশ বিভাগের সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

৬.৭ গবাদিপশুর অন্যান্য রোগসমূহ ও তাদের প্রতিকার

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
বাদলা	*Clostridium chauvoei* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। বর্ষাকালে ও ২ মাস থেকে ২ বছর বয়সের প্রাণিতে বেশি হয়। খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয়। এ রোগের জীবাণু স্পোর সৃষ্টি করে মাটিতে ৩-4 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণী হঠাৎ মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা, জ্বর, পেটে গ্যাস, নাকের শ্লেস্মা দেখা যায়। প্রাণির পায়ের মাংসপেশী আক্রান্তের ফলে প্রাণী হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হয়।	আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে। মৃত দেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখা বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। স্যাঁতসেঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের সকল প্রাণিকে টিকা দিতে হবে।
গলাফুলা	*Pasteurella multocida* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। সকল বয়সের প্রাণিই আক্রান্ত হয়। বর্ষার পর স্যাঁতসেঁতে জমিতে চরালে এ রোগ বেশি হয়। অসুস্থ প্রাণির সংস্পর্শ, লালা, মলমূত্র, দূষিত খাদ্য ও পানি দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।	অতি তীব্র প্রকৃতির হলে হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায়, ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কারণে গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।	অসুস্থ প্রাণিকে আলাদা রাখা ও সালফানিলামাইড জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা। মৃতদেহ সৎকার করা। সব সুস্থ্য প্রাণিকে সুস্থ্য অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেয়া।

রোগের নাম	কারণ	লক্ষণ	প্রতিকার
ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ	*Streptococcus genus* ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয়। অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান, ময়লা হাতে দোহন, বাটে বা ওলানে আঘাত, ওলানে দুধ জমাট বেঁধে থাকা ইত্যাদি কারণে রোগজীবাণু সংক্রমিত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সংক্রমিত ওলান ও দূষিত পরিবেশ এ রোগ সৃষ্টি করে।	অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হয়। ওলান লাল হয়ে ফুলে যায় ও গরম হয়। প্রাণী ব্যাথা অনুভব করে ও তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা, অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যায় ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হয়।	অসুস্থ্য প্রাণিকে সুস্থ্য প্রাণী থেকে আলাদা করা। গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।
ব্যাবেসিওসিস	ব্যাবেসিয়া গণ ভুক্ত প্রোটোজোয়া অঠালির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	আক্রান্ত প্রাণির জ্বর, রক্তাল্পতা ও হেমোগ্লোবিনিউরিয়া দেখা যায়।	আক্রান্ত প্রাণির সুষ্ঠু চিকিৎসা ও বাহক (আটুলি) নিয়ন্ত্রণ ।
দুগ্ধ জ্বর	রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়া।	ক্ষুধামন্দা, উত্তেজিত ভাব, মাথা ও পা কাঁপা, দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটতে গেলে টলতে থাকা, পিছনের পায়ের দুর্বলতার কারণে শুয়ে পড়া। পা গুলো ছড়াতে থাকে যা থলথলে ও দুর্বল দেখায়।	ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড খাওয়ানো, দানাদার খাদ্যের সাথে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম খাওয়ানো।
কিটোসিস	গর্ভবতী গাভীর শর্করা খাদ্যের ত্রুটিপুর্ণ বিপাকের কারণে সৃষ্ট বিপাকীয় রোগ। রক্তে গ্লুকোজের অভাব, খাদ্যে শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে এ রোগ হয়।	ক্ষুধামন্দা, দুধ উৎপাদন কম, দানাদার খাদ্য খাওয়া বন্ধ করে কিন্তু খড় খেতে থাকে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, গাভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব ও গোয়াল ঘরে অ্যালকোহলিক গন্ধ থাকে। সবকিছু অহেতুক চাটতে থাকে, টলমল করে। দাঁড়াতে পারে না, দেহে কাঁপুনি ও খিচুনি থাকে।	গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ইনজেকশন দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া	শ্যামা, হেলেঞ্চা, বোরা ইত্যাদি নাইট্রেট যুক্ত ঘাস খেয়ে। ভূট্টা গেইচা, মূলা, সরিষাতে ৩% এবং নেপিয়ারে ৯.৮% নাইট্রেট থাকে বিধায় এসব ঘাস খাওয়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ।	লালাক্ষরণ, ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্ট দেখা যায়, পেশীর কম্পন, দুর্বলতা, টলমল অবস্থা ও পরে মাটিতে শুয়ে পড়ে ও খিচুনি হয়।	১% এর অধিক নাইট্রেট যুক্ত ঘাস প্রাণিকে না খাওয়ানো ও কাঁচা ঘাসের সাথে খড় মিশিয়ে খাওয়ানো।

৬.৮ গবাদিপশুর সাধারণ পরজীবিজনিত রোগ ও তার প্রতিকার

পরাশ্রয়ী বা পরাঙ্গ পুষ্ট জীবকে পরজীবী বলা হয়। সাধারণত দু'টি ভিন্ন প্রজাতির জীবন ধারণের ক্ষেত্রে একটি অপরটির উপর বাস করে লাভবান হয় এবং অপরটির ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে লাভবান জীবটিকে পরজীবী এবং ক্ষতিগ্রস্থ জীবটিকে পোষক বা হোস্ট বলা হয়। উল্লেখ্য, পোষক ছাড়া পরজীবীর জীবিকা নির্বাহ ও বংশ বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ কৃমির বংশবিস্তারের পক্ষে অনুকূল। তাই এদেশের অধিকাংশ গবাদিপশু কোন না কোন কৃমি দ্বারা আক্রান্ত। ফলে এসব গবাদিপশু পুষ্টিহীনতার শিকার। তাছাড়া পুষ্টিহীন গবাদিপশুতে কৃমির আক্রমণ বেশি হয়। গবাদিপশু কৃমি রোগে আক্রান্ত হলে উৎপাদন ব্যহত হয়, এমনকি আক্রান্ত প্রাণী মারাও যেতে পারে। গবাদিপশু নানা প্রজাতির কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলেও অল্প কিছু সংখ্যক কৃমি এদের উৎপাদনে বাঁধার সৃষ্টি করে। এদেরকে সাধারণত পাতাকৃমি, ফিতাকৃমি ও গোলকৃমি এ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রধাণত গোলকৃমি ও পাতাকৃমি গবাদিপশুকে আক্রমণ করে দুধ ও মাংস উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পশু দুর্বল হয়ে পড়ায় জমি কর্ষণ ও পরিবহণ কাজ ব্যহত হয়। কৃমি পশুর যকৃত, ফুসফুস, পাচনতন্ত্র ইত্যাদি আক্রমণ করে স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাঁধা দেয়। এছাড়া আক্রান্ত গবাদিপশুর চামড়ার মূল্যমানও কমে যায়। অন্তঃপরজীবী আক্রান্ত গবাদিপশুতে নিম্নলিখিত অপকার করে থাকে। যথা-

- অন্ত্র, যকৃতসহ বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ ঘটায়। রক্তপান রক্তশূন্যতার সৃষ্টি করে।
- অন্ত্রনালি বন্ধ করে বাছুরের মৃত্যু ঘটায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।
- প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস পাতলা পায়খানা উপসর্গের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত অন্ত্রের ঝিল্লির শোষণ ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। যকৃত, ফুসফুস এবং মাংসের ভিতর ক্ষত সৃষ্টি খাওয়ার ফলে অনুপযুক্ত করে তোলে।
- চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে চামড়ার মান ও মূল্য উভয়ই কমিয়ে দেয়।
- আক্রান্ত পশুর মল, নাকের শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেশে কৃমির ডিম ছড়ানোর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

৬.৮.১ পরজীবিবিদ্যা ও পরজীবির শ্রেণীবিভাগ

প্রাণিবিদ্যার (Zoology) যে শাখায় পরজীবী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় তাকে পরজীবীবিদ্যা বা প্যারাসাইটোলজি (Parasitology) বলা হয়। তবে ভেটেরিনারি প্যারাসাইটোলজির আলোচ্য বিষয় প্রধানত পশুপাখির পরজীবীসমূহ। পশুর পরজীবী সম্পর্কিত আলোচনার পুর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কতিপয় সংজ্ঞা জেনে রাখা আবশ্যক যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

- পরজীবী (Parasite): পরাশ্রয়ী বা পরাঙ্গ পুষ্ট জীবকে পরজীবী বলা হয়। সাধারণত দু'টি ভিন্ন প্রজাতির জীবন ধারণের ক্ষেত্রে একটি অপরটির উপর বাস করে লাভবান হয় এবং অপরটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে লাভবান জীবটিকে পরজীবী এবং ক্ষতিগ্রস্থ জীবটিকে পোষক বা হোস্ট বলা হয়। উল্লেখ্য, পোষক ছাড়া পরজীবীর জীবিকা নির্বাহ ও বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়।
- পরজীবীতা (Parasitism): পরজীবী পোষকের অবস্থাপনের অবস্থাকে পরজীবীতা বলে।
- কমেনসালিজম (Commensalism): দু'টি ভিন্ন প্রজাতির জীবের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এক জীব অন্য জীবে বাস করলে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ বা লাভবান না হলে এরুপ অবস্থাকে কমেনসালিজম বলে। অর্থাৎ একটি প্রজাতি উপকৃত হয় এবং অন্যটি না ক্ষতিগ্রস্থ না উপকৃত হয়। উল্লেখ্য, এরূপ সহঅবস্থান ছাড়া উভয় প্রজাতিই জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
- মিউচুয়ালিজম (Mutualism): দু'টি ভিন্ন প্রজাতির জীবের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে একজীব অন্যজীবে বাস করলে যদি উভয়ই লাভবান হয়, এইরূপ অবস্থাকে মিউচুয়ালিজম বলে। যেমন- এক ধরণের কাঁকড়া (kingcrab) ও সীঅ্যানেমোন (sea anemone) মাঝে সৃষ্ট সহঅবস্থান।
- সিম্বায়োসিস (Symbiosis): দু'টি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে একটি ফিজিওলজিক্যাল ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একত্র জীবন ধারণের অবস্থাকে সিম্বায়োসিস বলা হয়। যেমন- রোমন্থক পশুর রূমেনের জীবাণু।

পরজীবীবিদ্যার শ্রেণীবিভাগ

পরজীবীবিদ্যা প্রধানত তিনটি শাখায় বিভক্ত। যথা- (১) কৃমিতত্ত্ব বা হেলমিন্থোলজি (Helminthology), (২) প্রোটোজোলজি (Protozoology) এবং (৩) কীটতত্ত্ব বা এন্টোমোলজি (Entomology)।

(১) হেলমিন্থোলজি: হেলমিন্থ বা আন্ত্রিক কৃমি সম্পর্কে পরজীবীবিদ্যার যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে হেলমেন্থোলজি বলা হয় (Soulsby 1982; Urquhart et al. 1996)। প্রধানত তিন শ্রেণীর হেলমিন্থস রয়েছে। যথা- (ক) গোলকৃমি (Nematodes), (খ) পাতাকৃমি (Trematodes) এবং (গ) ফিতাকৃমি (Cestodes)।

(ক) গোলকৃমি (Nematodes)

নেমাটোড কৃমিকে রাউন্ড ওয়ার্ম বা বাংলায় গোলকৃমি বলা হয়। অধিকাংশ গোলকৃমি নলাকার যার প্রান্ত ক্রমশঃ সরু। দেহ বর্ণহীন, ট্র্যান্সলুসেন্ট স্তর বিশিষ্ট কিউটিকল দ্বারা গঠিত। গোলকৃমির দুই পার্শ্বে দু'টি পার্শ্বস্থ নিঃসরণ নালী এবং ডর্সাল ও ভেন্ট্রালে দুইটি স্নায়ু থাকে। পেশী কোষসমূহ লম্বালম্বি ভাবে হাইপোডারমিস ও দেহ গহবরের মধ্যস্থানে সুবিন্যাস্ত থাকে। দেহ গহ্বরের উচ্চ চাপ সম্পন্ন ফ্লুইড দেহকে স্ফীত রেখে কৃমির দৈহিক আকৃতি রক্ষা করে। এই কৃমির পরিপাক তন্ত্র নলাকৃতির। অনেক গোলকৃমির মুখ ২-৩টি ওষ্ঠযুক্ত যা সরাসরি খাদ্যনালীর সাথে সংযুক্ত থাকে। কিছু গোলকৃমির মুখ বড় এবং দাঁত বিশিষ্ট বাক্কাল ক্যাপসুলযুক্ত। গোলকৃমি দাঁতের সাহায্যে পোষকের আন্ত্রিক মিউকোসা কেটে অথবা মুখের গ্রন্থির এনজাইম কিম্বা এন্টিকোয়াগুলেন্ট ক্ষরণ করে কার্যসিদ্ধি করে যেমন- ট্রাইকোস্ট্রোনজাইলয়েডস কৃমির বাক্কাল ক্যাপসুল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অ্যাসকারিডয়েডস্ কৃমির মুখ হয় সাধারণ ছিদ্রযুক্ত। তাই এসব কৃমি আন্ত্রিক মিউকোজাল ফ্লুইড ও কোষের ডেব্রিস খায়। ট্রাইকোস্ট্রোনজাইলয়েডস্ কৃমির মুখে দাঁত থাকে এবং হুক ওয়ার্ম বা বক্রকৃমি এন্টিকোয়াগুলেন্ট ক্ষরণ করে। কৃমির পেশীর খাদ্যনালী (ইসোফেগাস) মুখ থেকে খাদ্যকে অন্ত্রে পৌঁছায়। বিভিন্ন গোলকৃমির খাদ্যনালীর গঠনে পার্থক্য রয়েছে। তাই গোলকৃমির খাদ্যনালীর গঠনের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করে বিভিন্ন গ্রুপের গোলকৃমি সনাক্ত করা যায়।

- ফিলারিফর্ম (Filariform)- সরল ও পশ্চাদ দিক সামান্য পুরু। যেমন- বার্সাযুক্ত গোলকৃমি।
- বাল্ব আকৃতি (Bulb shaped)- পশ্চাদ দিকটা বেশ মোট বা পুরু। যেমন- অ্যাসকারিডয়েড কৃমি।
- জোড়া বাল্ব আকৃতি (Double bulb shaped)- এরূপ থাকে অক্সিইউরয়েডস গোলকৃমির।
- মাসকুলার গ্লান্ডুলার (Muscular glandular)- ফিলারিওয়েডস (Filariods) ও স্পাইরুরয়েডস (Spiruroids) গোলকৃমির খাদ্যনালী এ ধরণের।
- ট্রাইচুরয়েড (Trichuroid)- খাদ্যনালী ক্যাপলারি প্রকতির হয়।
- র‍্যাবডিটিফর্ম (Thabditiform)- সম্মুখ ও পশ্চাদ অংশ স্ফীত থাকে।

স্ত্রী কৃমির পরিপাকনালী অ্যানাসে শেষ হয়। কিন্তু পুরুষ কৃমির পরিপাকনালী ক্লোয়েকায় শেষ হয় যা দিয়ে পুরুষ যৌন অঙ্গ স্পাইকিউলাস (spicules) বের হয়। গোলকৃমির কিউটিকলস বা বহিঃত্বক রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন দৈহিক কাঠামোর সুষ্টি করে।

(খ) পাতা কৃমি (Trematodes)

পূর্ণাঙ্গ ট্রেমাটোডস কৃমিকে ফ্লুক বা পাতাকৃমি বলা হয়। এসব পূর্ণাঙ্গ কৃমি প্রধানত পোষকের পিত্তনালী, খাদ্য অন্ত্র ও রক্তনালীর মধ্যে অবস্থান করে। অধিকাংশ পাতকৃমি পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা আকৃতির হয়। এদের পরিপাকতন্ত্র অসমাপ্ত। এরা সাকারযুক্ত ও উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। পূর্ণাঙ্গ পাতাকৃমির দু'টি সাকার থাকে। একটি ওরাল ও অপরটি ভেন্ট্রাল সাকার। কখনও কখনও শোষণক্ষম সাকার স্পাইন দ্বারা আবৃত থাকে। এদের দেহ গহ্বর থাকেনা। পরিপাক তন্ত্র মুখ গহ্বর, ফ্যারিংকস, ইসোফেগাস ও এক জোড়া ছিদ্রবিহীন শাখা প্রশাখাযুক্ত আন্ত্রিক সিকা সহযোগে গঠিত। এ কৃমি প্রধানত রক্ত

ও টিস্যু ডেব্রিস ভক্ষণ করে এবং সিকায় হজম ও শোষিত হয়। উভয় লিঙ্গের এই কৃমির ক্রস ও সেলফ ফার্টিলাইজেশন উভয় সংঘটিত হয়। পুরুষ অঙ্গে ভাস-ডেফারেন্সযুক্ত এক জোড়া টেসটিস থাকে। একটি সিরাস স্যাকের সাথে সেমিনাল ভেসিকুল ও সিরাসযুক্ত থাকে। সিরাস পুরুষাঙ্গ হিসেবে জেনিটাল ছিদ্র পর্যন্ত পৌঁছে। স্ত্রী জনন তন্ত্র ক্রমান্বয়ে একটি ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, ওটাইপ, ইউটেরাস জেনিটাল ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে। ভাইটালিন গ্রন্থিসমূহের নিঃসরণ দিয়ে ইওক বা ডিম্বকুসুম ও শেষে খোলস সৃষ্টি হয়ে পূর্ণাঙ্গ ডিমে পরিণত হয় যা জেনিটাল ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে।

গ) ফিতাকৃমি (Cestodes)

এসব কৃমি দেখতে সাদা ও ফিতার ন্যায় লম্বা বলেই এদের ফিতাকৃমি বলা হয়। প্রায় সব প্রজাতির পশুর ফিতাকৃমি হয়। এসব কৃমি প্রধানত পোষকে অন্ত্রনালীতে থাকে। তবে ফিতাকৃমির কোন অন্ত্রনালী থাকে না। এসব কৃমি বেশ কয়েক মিটার লম্বা হয়। প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ফিতাকৃমির স্কোলেক্স (scolex) মাথা রয়েছে। মাথার পর সেগমেন্ট বিহীন ঘাড় এবং তার পশ্চাতে একের পর এক সাজানো সেগমেন্ট চেইন। এই চেইনকে স্ট্রোবিলা (strobila) বলা হয়। আর প্রত্যেক সেগমেন্টকে বলা হয় প্রোগলোটিড। সাধারণত স্কোলেক্সের পার্শ্বে চারটি সাকার থাকে। এই সাকার কখনও কখনও আঁকর্শিযুক্ত থাকে। স্কোলেক্সের মুখে বহিঃপ্রসারণক্ষম কোণ রয়েছে যাকে রোস্টেলাম (rostellum) বলা হয়। অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে রোস্ট্রেলামে এক বা দুই সারি আকর্শি থাকে। ফিতাকৃমির ঘাড় থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রোগলোটিডস বর্ধিত হয় এবং পশ্চাৎ স্ট্রোবিলা থেকে পূর্ণাঙ্গ সেগমেন্ট (gravid segments) খসে পড়ে। প্রতিটি প্রোগরোটিডের মধ্যে এক বা দুই সেট স্ত্রী ও পুরুষ জনন অঙ্গ থাকে। তাই ফিতাকৃমি উভয়লিঙ্গ (hermaphrodite) বিশিষ্ট। সেগমেন্টের পার্শ্বস্থ প্রান্তে জেনিটাল পোর বা ছিদ্র থাকে। ফিতাকৃমির প্রোগলোটিডের মধ্যে স্ব-নিষেক (self-fertilization) ও ক্রস-নিষেক (cross-fertilization) উভয়ই হয়ে থাকে। ফিতাকৃমির পূর্ণাঙ্গ সেগমেন্ট খসে পোষকের মলের সাতে বের হয় যা থেকে ডিম বেরিয়ে আসে অথবা জনন তন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে ডিম বেরিয়ে আসে। ফিতাকৃমির পূর্ণাঙ্গ সেগমেন্ট খসে পোষকের মলের সাথে বের হয় যা থেকে ডিম বেরিয়ে আসে অথবা জনন তন্ত্রের ছিদ্র দিয়ে ডিম বেরিয়ে আসে। ফিতাকৃমির ডিম সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। যেমন- ক) ডিম্বস্থ ভ্রূণ ছয় হুক (hexacanth) বিশিষ্ট। খ) ডিমের খোলস পুরু গাঢ় ও রেখাঙ্কিত (embryophore)। পূর্ণাঙ্গ ফিতাকৃমি অত্যন্ত শোষণক্ষম। তাই এ কৃমি তার সকল পুষ্টির চাহিদা মেটায় প্রধান পোষকের অন্ত্র থেকে ত্বকের মাধ্যমে শোষণ করে।

৬.৮.২ পরজীবীর সংক্রমণ পদ্ধতি ও প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ

পরজীবীর সংক্রমণ পদ্ধতি: প্রধানত নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পোষকে পরজীবী সংক্রমিত হয়।

- খাদ্যের মাধ্যমে- যেমন খাদ্য অন্ত্রের গোল কৃমি। যথা- ফিতকৃমি, গোলকৃমি।
- বিদারণের মাধ্যমে- যেমন হুক ওয়ার্ম, সিস্টোসোমিয়াসিস।
- মাধ্যমিক পোষকের মাধ্যমে- বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাধ্যমিক পোষক থেকে প্রধান পোষকে সংক্রমিত হয়।
- বাতাসের মাধ্যমে- যেমন মানুষ ও ঘোড়ার পিনওয়ার্মের ডিম।
- পেনিট্রেশনের মাধ্যমে- যেমন ওরবুল ফ্লাই লার্ভি।
- ইনকিউলিশন ও পেনিট্রেশনের মাধ্যমে- যেমন ম্যালেরিয়া, ব্যাবেসিয়া, থাইলেরিয়া জীবাণু।
- জন্ম পূর্ব সংক্রমণ- প্রধানত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংক্রমিত হয়।
  - ✓ ট্রান্সওভারিয়ান- যেমন ব্যাবেসিয়ার জীবাণু আঠালীর ডিমের মধ্য দিয়ে সংক্রমিত হয়।
  - ✓ গর্ভফুলের মাধ্যমে- যেমন হুক ওয়ার্ম, টক্সোপ্লাজমা ইত্যাদি।
  - ✓ ওলানের মাধ্যমে- যেমন হুক ওয়ার্ম, টক্সোকেরা ভিটুলেরাম ইত্যাদি।
  - ✓ সংস্পর্শে- ত্বকের পরজীবী যেমন উকুন, মাইট ইত্যাদি।
  - ✓ যৌন মিলন- ট্রাইট্রাইকোমোনাস ফিটাস, ট্রিপানোসোমা ইকাইপাডাম ইত্যাদি।

পরজীবিজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ: বিভন্ন কারণে পরজীবিজনিত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল-

- জাত ও পুষ্টি: বিদেশী উন্নত জাত ও পুষ্টিহীন গবাদিপশু কৃমিরোগে বেশি আক্রান্ত হয়। উন্নত জাতের বাছুরকে সময়মতো কৃমির চিকিৎসা দিলে মৃত্যু হার কমে যায়।
- আবহাওয়া: এদেশের আবহাওয়া কৃমির বংশবিস্তারের জন্য অনুকূল। নিম্নাঞ্চলে কৃমি আক্রান্তের হার অধিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যার পর নতুন জেগে উঠা ঘাস খাওয়ালে গবাদিপশু কৃমিতে বেশি আক্রান্ত হয়।
- আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট: দেশের জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে কৃমি সমস্যা জড়িত। একজন শিক্ষিত মানুষ পশু পালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপশুর খামার করে কৃমি দমন করতে পারেন। অথচ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন খামারির কাছে নতুন প্রযুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো দুরহ কাজ। এক সময় দেশের কৃষকদের মধ্যে ধারণা ছিল যে, উন্নত জাতের বাছুর বাঁচে না। ধারণাটি সম্প্রসারণ কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।
- ব্যবস্থাপনা: একইস্থানে পশুকে বেশিদিন ঘাস খাওয়ালে কৃমির প্রকোপ বাড়ে।

৬.৮.৩ গবাদিপশুর পরজীবিজনিত প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ

রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ, অন্ত্রনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটা, পাতলা পায়খানা কৃমি আক্রমণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। পরজীবিজনিত প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- প্যারাম্ফিস্টোমিয়াসিস (Paramphistomiasis): প্যারাম্ফিস্টোমিয়াসিসে পাতলা পায়খানা হয় এবং পায়খানার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কৃমি দেখা যায়।
- ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliasis): ফ্যাসিওলিয়াসিসে রক্তশূন্যতা, দূর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা ও বোটল-জ হয় এবং ওজন কমে যায়।
- অন্তের সিস্টোসোমিয়াসিস (Enteric Schistosomiasis): অন্তের সিস্টোসোমিয়াসিসে রক্তশূন্যতা প্রকট হয় এবং পায়খানায় রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা দেখা যায়।
- নাগেশ্বরি বা ন্যাজাল সিস্টোসোমিয়াসিস (Nasal Schistosomiasis): নাগেশ্বরি বা ন্যাজাল সিস্টোসোমিয়াসিসে নাক দিয়ে সর্বদা রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা ঝরতে থাকে ও পশু শব্দ করে শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে।
- মনিজিয়াসিস (Monieziasis): মনিজিয়াসিসে পেটে পীড়া হবে এবং পায়খানায় মধ্যে ভাতের দানার মতো অপ্রাপ্তবয়স্ক কৃমি দেখা যায়।
- অ্যাসকারিয়াসিস (Ascariasis): অ্যাসকারিয়াসিস হলে ক্ষুদ্রান্ত বন্ধ হওয়ার কারণে বাছুর ভীষণ পেট ব্যাথায় পিঠ উঁচু করে ডাকতে থাকে।
- প্যারাসাইটিক গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস (Parasitic Gastro-Enteritis): পরজীবিজনিত গ্যাস্ট্রো-এন্টারাইটিস রোগে আক্রান্ত পশুর পাতলা পায়খানা, রক্তশূন্যতা, ক্ষুধামন্দা হয় এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়।
- হুকওয়ার্ম ডিজিজ (Bunostomiasis): হুকওয়ার্ম রোগে আক্রান্ত পশুতে ক্রমবর্ধমান রক্তশূন্যতা, পাতলা পায়খানা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে।
- হাম্পসোর (Humpsore): হাম্পসোরে শরীরের যে কোন স্থানের চামড়ায় ঘা হয় যা সর্বদা চুলকায় এবং শীতে শুকিয়ে যায় ও গরমের সময় বেড়ে যায়।

৬.৮.৪ পাতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ

ফ্যাসিওলা প্রজাতির (Fasciola spp) পাতাকৃমি দ্বারা সৃষ্ট পশুর রোগকে ফ্যাসিওলিওসিস বলা হয়। ক্রমশঃ কৃশকায় অবস্থা, ডায়রিয়া রক্তাল্পতা ও সাব-ম্যান্ডিবুলার এডিমা এরোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ফ্যাসিওলিয়াসিস এর কারণতত্ত্ব ও এপিডেমিওলজি

- কালিজার পাতাকৃমি ফ্যাসিওলা হেপাটিকা (F. hepatica) এবং ফ্যাস, জাইগানটিকা (F. gigantica) এরোগের কারণ।
- সুনির্দিষ্ট প্রজাতির শামুক সুনির্দিষ্ট প্রজাতির কলিজার পাতাকৃমির মাধ্যমিক পোষক হিসেবে কাজ করে। তাই যে দেশে বা অঞ্চলে সেই প্রজাতির শামুক রয়েছে সেখানে ফাসিওলা প্রজাতির প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বাংলাদেশে ফ্যাস. জাইগানটিকা পাতাকৃমির মাধ্যমিক পোষক লিমেনিয়া রুফেসেন্স (Lymnaea rufescens) ও লিম. একুমিনেটা (L. acuminata) রয়েছে। একারণে আমাদের দেশে ফ্যাস, জাইগানটিকা পশুর ফ্যাসিওলিয়াসিস রোগ সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে শতকরা ২১ ভাগ গরু ফ্যাস. জাইগানটিকা কৃমিতে আক্রান্ত (Howlader et al. 1988; Bhatia et al. 1989)।
- রোমন্থক পশু বিশেষ করে গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ এরোগে আক্রান্ত হয় (Hoque and Samad 1996; Hoque and Samad 1997; Huq et al. 1997)। ঘোড়া ও মানুষে এরোগ হবার তথ্য রয়েছে (Bendezu 1969; Beresford 1976)। বয়স্ক পশু অপেক্ষা অল্প বয়স্ক পশুতে এই কৃমি অধিক তীব্র অবস্থার সৃষ্টি করে।
- এই কৃমি রোগে বিভিন্ন ভাবে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন হয়। যেমন- মৃত্যুর হার শতকরা ২% যকৃত বিনষ্ট হয়, দুধ ও মাংস উৎপাদন হ্রাস পায়, চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় হয় এবং জনন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে (Cawdery MJH 1976; Owens 1977)।

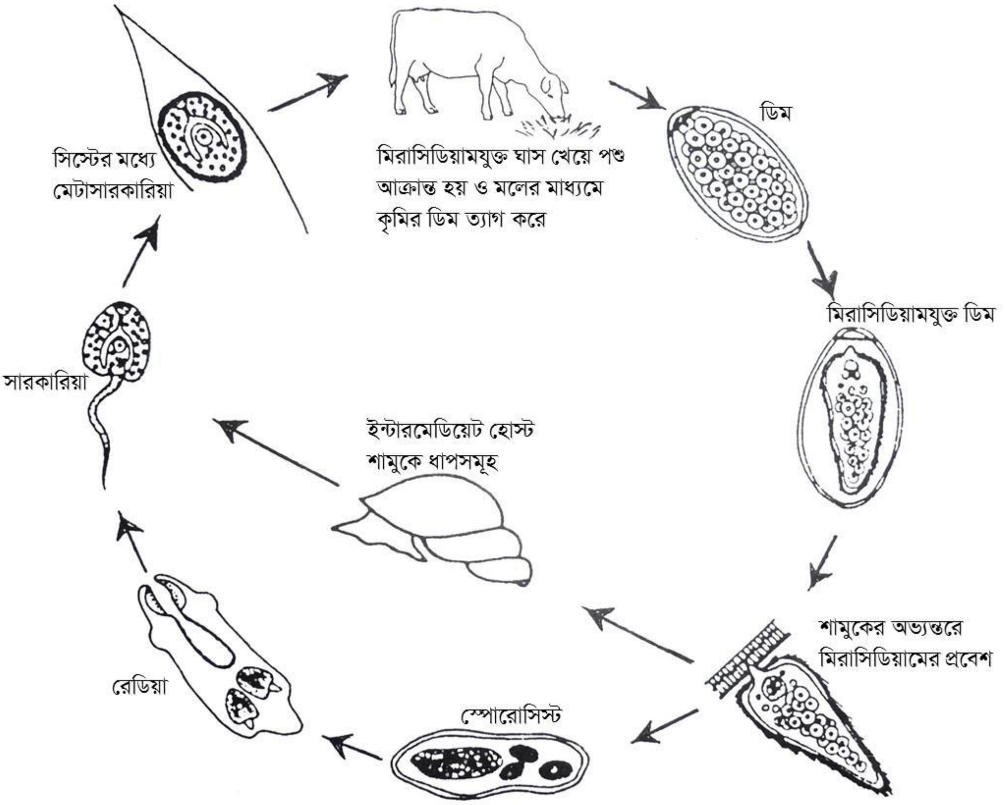

চিত্র ৬.৩ঃ রোমন্থক পশুর লিভার ফ্লুকের জীবন চক্র।

ফ্যাসিওলিয়াসিস এর জীবন চক্র

- পোষকের পিত্ত নালী অবস্থান থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি ডিম দেয়। এসব ডিম পিত্তের সাথে অন্ত্রনালীতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে মলের সাথে বেরিয়ে মাটিতে আসে।
- অনুকূল পরিবেশে (২২-২৬ ডিগ্রি সেঃ) ৯ দিনের মধ্যে ডিম থেকে চলনক্ষম সিলিয়াযুক্ত মিরাসিডিয়াম বেরিয়ে আসে এবং ২৪-৩০ ঘন্টার মধ্যে উপযুক্ত মাধ্যমিক পোষক শামুকের মধ্যে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য, এ সময়ের মধ্যে উপযুক্ত শামুক না পেলে মিরাসিডিয়াম মারা যায়।
- মিরাসিডিয়াম শামুকের ভিতর প্রথমে স্পোরোসিস্ট (sporocyst) ও পরে রেডি (redae) এবং শেষে সারকেরিয়া সৃষ্টি করে (Qadir 1976; Qadir 1980)।
- সারকেরিয়া শামুক থেকে বেরিয়ে ঘাস বা জলজ উদ্ভিদে লেগে থাকে। প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সারকেরিয়া মেটাসারকেরিয়ায় রুপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, একটি মিরাসিডিয়াম থেকে ৬০০ এর অধিক মেটাসারকেরিয়া তৈরি হয়। আর এই পর্যায় সম্পন্ন হতে কমপক্ষে ৬-৭ সপ্তাহ লেগে যায়।
- মেটাসারকেরিয়া খাদ্যের সাথে পোষকের অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে সারকেরিয়া সিস্ট থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর অন্ত্র প্রাচীর ছিদ্র করে পেরিটোনিয়াম পার হয়ে যকৃতে পৌঁছে।
- যকৃতের প্যারেনকাইমায় ৬-৮ সপ্তাহ থেকে তরুণ ফ্লুক ক্ষুদ্র পিত্ত নালীতে প্রবেশ করে ও শেষে প্রধান পিত্ত নালীতে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে।
- প্রিপ্যাটেন্ট পিরিয়ড ১০-১২ সপ্তাহ। তবে জীবন চক্র সম্পন্ন করতে ফ্যাস. হেপাটিকা কৃমির ক্ষেত্রে ১৭-১৮ সপ্তাহ এবং ফ্যাস. জাইগানটিকা কৃমির ক্ষেত্রে ১৩-১৬ সপ্তাহ সময় লাগে। পিত্ত নালীতে পূর্ণাঙ্গ কৃমি প্রায় ২৬ মাস বেঁচে থাকতে পারে। সর্বোচ্চ মাত্রায় ডিম পারে ৩-৮ মাসে। ডিম পাড়া হ্রাস পায় বা বন্ধ হয় ১০ মাস বয়সে (Ross 1968)।

ফ্যাসিওলিয়াসিস রোগ এর জননতত্ত্ব ও লক্ষণ

কত সংখ্যক মেটাসারকেরিয়া দেহে অনুপ্রবেশ করলে তার উপর রোগ লক্ষণ নির্ভর করে। যেমন- অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় প্রচুর মেটাসারকেলিয়া সংক্রমণে তীব্র (acute), দীর্ঘ সময় প্রচুর সংখ্যায় মেটাসারকেরিয়া সংক্রমণে মাঝারি তিব্র (sub-acute) এবং দীর্ঘ সময় অল্প সংখ্যক মেটাসারকেরিয়া সংক্রমণে দীর্ঘমেয়াদী (chronic) প্রকৃতির রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হয় (সামাদ ২০০১)।

- তীব্র প্রকৃতির রোগে তীব্র যকৃত প্রদাহ ও রক্তক্ষরণের কারণে উপসর্গ প্রকাশের পূর্বেই পশুর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।
- কৃমির মাইগ্রোশনে যকৃত কলা ধ্বংস হয় ফলে যকৃতে প্রোটিন সংশ্লেষণ হ্রাস পায়। এতে হাইপোপ্রোটিনিমিয়া তথা বটল জ্ব (bottle-jaw) দেখা দেয়।
- তীব্র প্রকৃতির রোগে প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমির যকৃত প্যারেনকাইমায় মাইগ্রোশনের কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। দীর্ঘমেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমির রক্ত শোষণ ও ক্ষরণের ফলে পোষকের দেহে লৌহের ঘাটতি দেখা দেয়। এছাড়া কৃমি নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ (proline) অস্থিমজ্জার কার্যক্ষমতা হ্রাস করে ফলে লোহিত কণিকা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি পিত্ত নালীতেও কৃমি রক্তনাশ করে। এইভাবে প্রতিটি কৃমির কারণে প্রতিদিন ০.৫ থেকে ১০ মিলিলিটার রক্ষনাশ হয় ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।
- বয়স্ক কৃমিগুলো পিত্তনালীর প্রদাহ (Cholangitis) ঘটিয়ে ফাইব্রোসিস সৃষ্টি করে। ফলে পৌত্তিক প্রতিবন্ধকতার (biliary obstruction) সৃষ্টি হয়। পরিণামে পরিমিত পিত্ত অন্ত্রনালীতে যেতে পারেনা। একারণে বদহজম ও মাঝে মাঝে ডায়রিয়া দেখা দেয়। ক্ষুধামন্দা, বিমর্ষতা ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। পেটে ব্যথা থাকে। চোখের কনজাঙ্কটিভা ফ্যাকাশে হয়।
- পাতাকৃমি দ্বারা যকৃতে সৃষ্ট ক্ষত ক্লস্ট্রিডিয়াম নোভাই জীবাণুর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এতে পশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ফ্যাসিওলিয়াসিস রোগ নির্ণয়

- রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ বিশেষ করে ডায়রিয়া, বটল জ্ব দেখে প্রাথমিকভাবে এরোগ ধারণা করা যায়।
- অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মল পরীক্ষা করে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপারকুলেটেড ফ্লুকের ডিম দেখে এরোগ নিরুপণ করা যায়। ফ্যাসিওলা ও পারামফিসটোমাম উভয় প্রজাতির কৃমির ডিম পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট ও অপারকুলামযুক্ত। তবে ফ্যাসিওলা প্রজাতির ডিম পিত্তের রংয়ের কারণে হলদে বাদামী বর্ণের হয় কিন্তু প্যারামফিসটোমাম কৃমির ডিম হয় বর্ণহীন স্বচ্ছ ও নবযুক্ত।
- তীব্র প্রকৃতির এারোগ হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃমির সংক্রমণে। একারণে মলে ডিম পাওয়া যায়না। এক্ষেত্রে মৃত পশুর যকৃত পরীক্ষা করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী রোগে পিত্তথলিতে প্রাপ্ত বয়স্ক এক্রিমি পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত জীবিত পশুর বেলায় রক্তাল্পতা, ইয়োসিনোফিলিয়া, হাইপো-অ্যালবিউমিনোমিয়া, সিরাম বিলিরুবিন বৃদ্ধি এবং সিরাম এনজাইম (GOT, GPT) তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায়।
- ইমুনো-ডায়গনোস্টিক টেস্টের (ELISA, allergic test) সাহায্যে এরোগ নির্ণয় করা যায়।

ফ্যাসিওলিয়াসিস এর চিকিৎসা

নিম্নোক্ত যে কোন একটি ঔষধ এরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। তবে যে কোন ঔষধ প্রথম মাত্রার তিন সপ্তাহ পরে ২য় মাত্রা ঔষধ প্রয়োগে অধিক সুফল পাওয়া যায় (সামাদ ২০০১)।

- ট্রাইক্লাবেন্ডাজল (Triclabendazole) প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মিলিগ্রাম হিসেবে রোমন্থক পশুকে খাওয়ালে অপ্রাপ্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক এই কৃমির বিরুদ্ধে শতকরা ৯৩-১০০ ভাগ কার্যকর হয়। তবে মহিষে চিকিৎসায় অনেক সময় কার্যকর হয় না। এছাড়া এ ঔষধ রেজিস্ট্যান্ট হবা তথ্য রয়েছে।
- নাইট্রোক্সিনিল (Nitroxynil) প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম (@ 1.5 ml /50 kg bwt) হিসেবে গরু, মহিষ, মেষের ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিয়ে ৬ সপ্তাহ অধিক বয়স্ক কৃমির বিরুদ্ধে শতকরা ৮০-১০০ ভাগ কার্যকর।
- অক্সিক্লোজানাইড (Oxyclozanide) প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মিলিগ্রাম হিসেবে মহিষ ও মেষকে খাওয়ালে শতকরা ৯০-১০০ ভাগ কার্যকর হয়।
- অ্যালবেন্ডাজল (Albendazole) প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৭-১৫ মিলিগ্রাম হিসেবে খাওয়ালে একৃমি রোগে অক্রান্ত গরু, মহিষ ও ছাগলে যথাক্রমে ২৬.২৫%, ৫৪-৯৭.০৬% এবং ৯৬.১৮% কার্যকর।
- হেক্সাক্লোরোফেন (Hexachlorophene) কৃমি আক্রান্ত মেষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১৫ মিলিগ্রাম হিসেবে খাওয়ালে শতকরা ৮৭ ভাগ কার্যকর হয়।
- সহায়ক চিকিৎসা (Supportive treatment)
- দুর্বলতা ও ডিহাইড্রেশনের জন্য ডেক্সট্রোজ স্যালাইন শিরার মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায়।
- দুর্বলতা ও রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশন ও মিনারেল মিকশ্চার খাওয়ানো যেতে পারে।
- কৃমির চিকিৎসায় কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট ইনজেকশন দেয়া যায়।

ফ্যাসিওলিয়াসিস প্রতিরোধ

১। একৃমির মাধ্যমিক পোষক শামুকের সংখ্যা হ্রাস বা ধ্বংস করে (সামাদ ২০০১)।

- শামুক খেকো প্রাণী পালন করে। যথা- পাতিহাঁস ইত্যাদি পাখি পালনের মাধ্যমে শামুকের সংখ্যা কমানো যায়।
- এছাড়া ছোট ছোট গর্ত, খাল, জলাশয় মাটি দিয়ে ভরাট করে অথবা জালের মাধ্যমে শামুক তুলে ফেলে শামুকের বংশবিস্তার রোধ করা যায়।
- শামুক নাশক (molluscicide) কপার সালফেট (০.৫%) প্রতি হেক্টরে ২২.৫ কেজি হিসাবে ছিটানো যায়।

- কপার পেন্টাক্লোরফেনেট (Copper pentachlorphenate) হেক্টর প্রতি ১১.২ কেজি ৪৫০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছিটাতে হয়।

২। পশুকে সংক্রমণ থেকে মুক্ত রেখে। সন্দেহজনক স্থানের যেমন- নিচু বা ড্রেনের পাশের ঘাস খাওয়ানো ঠিক নয়। এছাড়া গোবর এক জায়গায় গর্ত করে জমা রাখলে এরোগ ছড়ায়না।

৩। আক্রান্ত পশুর যথাযথ চিকিৎসা করে কৃমি ধ্বংসের মাধ্যমে এরোগের উৎস বন্ধ করা যায়।

এক নজরে ফ্যাসিওলিয়াসিস

বাংলাদেশে রোমন্থক পশুর ফ্যাসিওলা জাইগানটিকা (*Fasciola gigantica*) পাতা কৃমি দ্বারা সৃষ্ট রোগকে ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliasis) বলা হয়।

- জীবন চক্র ও সংক্রমণ: রোমন্থক পশু এই কৃমির প্রধান এবং শামুক এই কৃমির মাধ্যমিক পোষক। প্রধানত পোষকের পিত্ত নালীতে থেকে প্রাপ্তবয়স্ক কৃমি ডিম দেয় এবং ডিম পিত্তের সাথে অন্ত্র নালীতে প্রবেশ করে এবং মলের সাথে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে। অনুকূল পরিবেশে উক্ত ডিম থেকে মিরাসিডিয়াম বেরিয়ে শামুকের মধ্যে প্রবেশ করে। শামুকের মধ্যে প্রথমে স্পোরোসিস্ট ও পরে রেডিয়া এবং শেষে সারকেরিয়া সৃষ্টি হয়। সারকেরিয়া শামুক থেকে বেরিয়ে ঘাস বা জলজ উদ্ভিদে লেগে থাকে এবং প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সারকেরিয়া মেটাসারকেরিয়ায় (সিস্ট) রুপান্তরিত হয়। মেটাসারকেরিয়াযুক্ত ঘাস খাওয়ার মাধ্যমে পোষকে সংক্রমিত হয়। অন্ত্রে সিস্ট থেকে সারকেরিয়া বেরিয়ে আসে এবং অন্ত্রের প্রাচীর ছিদ্র করে যকৃতে পৌঁছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পিত্ত নালীতে অবস্থান গ্রহণ করে।
- লক্ষণ: ক্রমশঃ শুকিয়ে যাওয়া, ডায়রিয়া, রক্তাল্পতা ও সাব-ম্যান্ডিবুলার এডিমা (বটল-জ্ব) এরোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- চিকিৎসা: ট্রাইক্লিয়াবেন্ডাজল প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মিলিগ্রাম হিসেবে একবার খাওয়াতে হবে। ছোট গরুকে একটি এবং বড় গরুকে দুইটি ট্যাবলেট একসাথে খাওয়াতে হয়। নাইট্রোক্সিনিল প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম হিসেবে ত্বকের নিচে একবার ইনজেকশন দিতে হয়।
- প্রতিরোধ: কৃমির মাধ্যমিক পোষক শামুকের সংখ্যা হ্রাস (হাঁস পালনের মাধ্যমে) বা ধ্বংস (কপার সালফেট ০.৫% স্প্রে) করে। আক্রান্ত পশুর যথাযথ চিকিৎসা করে কৃমি ধ্বংসের মাধ্যমে এরোগের উৎস বন্ধ করা যায়।

৬.৮.৫ ফিতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ

ফিতাকৃমির জীবন চক্র (Life cycle)

- প্রতিটি ফিতা কৃমির জীবন চক্র প্রধানত পরোক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়। এই জীবনচক্র সম্পন্ন করতে এক বা একাধিক মধ্যবর্তী পোষকের প্রয়োজন পড়ে।
- সাধারণত প্রধান পোষকের ক্ষুদ্রান্ত্রে পূর্ণাঙ্গ ফিতাকৃমির অবস্থান। আর পরিপক্ক সেগমেন্ট অথবা ডিম মলের সাথে বেরিয়ে আসে।
- খাদ্যের মাধ্যমে পোষকের খাদ্য অন্ত্রে ভ্রূণযুক্ত ডিম প্রবেশ করে। পাকস্থলী ও আন্ত্রিক রসে এই ভ্রূণযুক্ত ডিমের আবরণ (embryophore) হজম হয় এবং ভ্রূণকে (onchosphere) সক্রিয় করে।
- ভ্রূণ তার হুকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা ছিদ্র করে রক্ত বা লিম্ফে আসে। অথবা অমেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে দেহ গহবরে প্রবেশ করে।
- ফিতাকৃমির ভ্রূণ তার আসক্তিস্থান বা প্রিডাইলেকশন সাইটে অবস্থান গ্রহণের পর ভ্রূণে হুক খসে পড়ে। অতঃপর প্রজাতি অনুযায়ী লার্ভাল অবস্থার সৃষ্টি করে, যাকে মেটাসেসটোডস (metacestode) বলা হয়।
- মাধ্যমিক পোষকে বিভিন্ন ফিতাকৃমির বিভিন্ন ব্লাডার ওয়ার্ম হয়।

- ✓ সিস্টিসারকাস (Cysticercus) বড় আকৃতির তরল পদার্থ ভর্তি সিস্ট যার মধ্যে ভবিষ্যত কৃমির একটি স্কোলেক্স বা মাথা থাকে।
- ✓ সিস্টসারকয়েড (Cysticercoid) ক্ষুদ্রাকৃতির শক্ত সিস্ট যার মধ্যে ফিতা কৃমির একটি মাথা বা স্কোলেক্স থাকে। এটি সাধারণত মাধ্যমিক পোষক কীট পতঙ্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়।
- ✓ সিনিউরাস (Coenurus) সিস্টিসারকাস সিস্টের মতই তবে একটি সিস্টের মধ্যে অনেক মাথা বা স্কোলেক্স থাকে।
- ✓ হাইডাটিড সিস্ট (Hydatid cyst) বড় আকৃতির তরল পদার্থ ভর্তি সিস্ট। এর প্রাচীরে কোন মাথা জন্মে না বরং ব্রুড ক্যাপসুল (brood capsule) থাকে যার মধ্যে মাথা সৃষ্টি হয়। এই সিস্টের মধ্যে তরল পদার্থ ছাড়া থাকে স্কোলেক্স ও ব্রুড ক্যাপসুল। তাই অনেক সময় একে 'হাইডাটিড স্যান্ড' বলা হয়।

- ○ প্রধান পোষক এসব সিস্ট খাওয়ার ফলে আক্রান্ত হয়। সিস্ট থেকে স্কোলেক্স বের হয়ে আন্ত্রিক মিউকোসায় সংযুক্ত হয় এবং সিস্টের আংশিক অবশিষ্টাংশ হজম হয়ে যায়। স্কোলেক্সের ঘাড় থেকে প্রোগলেটিডের চেইন সৃষ্টি হয় যা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর খসে মলের সাথে বেরিয়ে আসে।

পোষকের ফিতাকৃমি জনিত ক্ষতি

- ○ ফিতাকৃমি পোষকের আহার্য দ্রব্যের পুষ্টি শোষণ করে ফলে পশু পুষ্টিহীনতায় ভুগে।
- ○ কোন কোন ফিতাকৃমি বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে পোষকের রক্তাল্পতা ঘটায়।
- ○ অনেক সময় ফিতাকৃমির আক্রমণে অন্ত্রনালী আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়।
- ○ আন্ত্রিক মিউকোসায় ইরিটেশন দিয়ে এই কৃমি অন্ত্র প্রদাহ ও ডায়রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।
- ○ ফিতাকৃমির লার্ভা মধ্যবর্তী পোষকের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রান্ত করে সংশ্লিষ্ট লক্ষণ সৃষ্টি করে। এতে পোষকের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

৬.৮.৬ গবাদিপশুর পরজীবিজনিত রোগ দমন কৌশল

কৃমিরোগ দমন অর্থ রোগ নির্মুল করা নয়। রোগ দমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবাদিপশুর মধ্যে রোগের প্রকোপ কমানো এবং পরিবেশকে কৃমির লার্ভামুক্ত রাখা ও গবাদিপশুকে লার্ভাযুক্ত পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। গবাদিপশুকে সাধারণত তিনভাবে কৃমির আক্রমণ পরিহার করে পালন করা সম্ভব। যথা-

- ○ চারণভূমি বা আবাসস্থল কৃমির লার্ভামুক্ত রেখে: আক্রমণের পূর্বে কৃমির লার্ভা মাঠের ঘাস, পানি, কেঁচো, কীটপতঙ্গ বা মুক্তাবস্থায় বিরাজ করে। খাদ্যের সাথে বা শরীরের চামড়া ভেদ করে এ লার্ভা গবাদিপশুকে আক্রমণ করে। এ আক্রমণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব। স্বাস্থ্যবান গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং গ্রহণ করা কৃমির লার্ভা ধ্বংস করতে সক্ষম। কারণ, বয়স্ক গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাছুরের চেয়ে বেশি। আবার কৃমিমুক্ত চারণভুমিতে আগে অল্পবয়স্ক বাছুর গরু ছাড়তে হয়। এর ফলে চারণভূমিও আপাতত লার্ভামুক্ত থাকে।
- ○ কৃমির লার্ভামুক্ত পরিবেশে গবাদিপশু পালন করে: কৃমির লার্ভা সকাল ও পড়ন্ত বিকেলে ঘাসের ডগায় বেশি থাকে বলে এসময় গরু-ছাগল মাঠে না চরালে রোগের প্রকোপ কমে যায়। নিচু জলাভূমিতে গোবর ধোয়া পানির জন্য ভাল ঘাস হয়। এসব স্থানের ঘাসে কৃমির লার্ভাও বেশি থাকে বলে এ ঘাস কেটে শুকিয়ে খাওয়াতে হয়।
- ○ কৃমিবাহক গবাদিপশুর চিকিৎসার মাধ্যমে: একস্থানে গরু-ছাগলকে অনেকদিন ধরে ঘাস খাওয়ালে এখানে ঘাস কমে যাওয়ার কারণে এরা মাটিসহ ঘাস খায়। এর ফলে মাটিতে অবস্থিত লার্ভা খেয়ে ফেলে এবং গবাদিপশুর কৃমির প্রকোপ বেড়ে যায়। কৃমিনাশক দ্বারা চিকিৎসা পর সেখানে গরু-ছাগল ছাড়লে নতুন চারণভূমি লার্ভামুক্ত রাখা সম্ভব।

পরজীবিজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

অন্তঃপরজীবিজনিত রোগে আক্রান্ত পশুর নিয়মিত চিকিৎসা করে রোগ দমন করাই উত্তম। আক্রান্ত পশুকে রোগমুক্ত ও চারণভূমি লার্ভামুক্ত রাখার জন্য কৃমির চিকিৎসা করতে হয়। কৃমি দমনের জন্য দুধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা- কৌশলগত এবং তাৎক্ষণিক পরিবর্তনগত। দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌশলগত চিকিৎসা সারা বছরের জন্য একটি কৃমি দমন পদ্ধতি। এ ব্যবস্থা ঋতু পরিবর্তনের সাথে কৃমিরোগের প্রকোপের হার পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশের অস্বাভাবিক আবহাওয়া পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। কৃমি দমনের পরিকল্পনা কৃমির প্রজাতি, আক্রান্ত পশুর সংখ্যা, জাত ও বয়স, আবহাওয়ার পরিবর্তন, কৃমিনাশক ঔষধের শ্রেণী, কার্যকারিতা, মাত্রা ও প্রয়োগ সংখ্যা, কৌশলগত বা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সবকিছুকে বিবেচনায় রেখে তবেই গ্রহণ করতে হয়।

কৃমি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় দ্রুত বংশবিস্তার করে। দেশের অধিকাংশ গবাদিপশু কৃমিতে আক্রান্ত। গোলকৃমি এবং পাতাকৃমি বেশি ক্ষতিকারক। কৃমি আক্রান্ত হলে দুধ, মাংস উৎপাদন, কর্ষণ শক্তি এবং চামড়ার মূল্য ও মান উভয়ই কমে যায়। রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ, অন্ত্রনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটা, পাতলা পায়খানা কৃমি আক্রমণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। প্যারাম্ফিস্টোমিয়াসিস, ফ্যাসিওলিয়াসিস, সিস্টোসোমিয়াসিস, মনিজিয়াসিস, অ্যাসকারিয়াসিস, parasitic gastro-enteritis, বুনোস্টোমিয়াসিস, হাম্পসোর গবাদিপশুর বিশেষ বিশেষ পরজীবিজনিত রোগ। পরজীবিজনিত রোগের প্রকোপ পশুর জাত, পুষ্টিমান, দেশের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। কৃমি দমনের উদ্দেশ্যে কৃমির প্রজাতি, আক্রান্ত পশুর সংখ্যা, জাত, বয়স, কৃমিনাশকের কার্যকারিতা, কৌশলগত বা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সবকিছুকে বিবেচনায় রেখে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হয়।

৬.৯ গবাদিপশুর ত্বকের রোগসমূহ

ত্বকের রোগ প্রাথমিক (primary) ভাবে সরাসরি ত্বকেই সৃষ্ট হয় অথবা অপ্রধান (secondary) ভাবে অন্যান্য অঙ্গের রোগ ত্বকে প্রকাশ পায়। তাই ত্বকের প্রধান ও অপ্রধান রোগ পার্থক্যের জন্য রোগীর পূর্নাঙ্গ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

চর্মপ্রদাহ (dermatitis)

ত্বকের ডারমিস ও এপিডারমিস স্তরের যে কোন প্রদাহকে চর্মপ্রদাহ বলে।

কারণ: ফিজিক্যাল এজেন্ট (আঘাত), রাসায়নিক পদার্থ, পুষ্টিহীনতা (জিঙ্ক, নিকোটেনিক এসিড) ও অ্যালার্জিক ক্রিয়ায় (একজিমা) চর্মপ্রদাহ হয়। ব্যাকটেরিয়া (Dermatophilus congolensis, Staphylococcus aureus etc), ভাইরাস (pox, pseudorabies etc), ছত্রাক (ringworm) ও পরজীবী (mange, humpsore etc) ত্বকের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

লক্ষণ: কারণ অনুসারে উপসর্গ প্রকাশ পায়। চর্মপ্রদাহে ক্ষতস্থানে কিছুটা স্ফীত হয়। ব্যথা থাকে ও চুলকায়। আক্রান্ত পশুর ক্ষুধা থাকে না, ওজন কমে যায় এবং দুগ্ধবতী পশুর দুধ উৎপাদন হ্রাস পায়।

চিকিৎসা: কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। যেমন- ব্যাকটেরিয়াল কারণে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। জীবাণু ঘটিত চর্মপ্রদাহে জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে প্রদাহ স্থান পরিষ্কার করতে হবে। পরে সমপরিমাণ জিঙ্ক কার্বনেট নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে দিনে ২ বার লাগাতে হবে। মেঞ্জের কারণে চর্মপ্রদাহ হলে কীটনাশক ঔষধ অথবা মাইট ধ্বংসকারী ঔষধ যেমন ভার্মিক প্রয়োগ করতে হবে। এলার্জিক কারণে চর্মপ্রদাহ হলে যে কোন একটি এন্টিহিস্টামিন ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

পোড়া ক্ষত (Burns)

আগুনে পোড়া ক্ষতকে ইংরেজিতে বার্ন এবং গরম পানি বা বাস্পে সৃষ্ট ক্ষতকে বাস্প প্রদাহ বলে।

কারণ: প্রধানত আগুনে, গরম তরল পদার্থে, বাস্পে, রাসায়নিক দ্রব্যে ও বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়ে ত্বকে পুড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রশি বা বস্তুর ঘর্ষণে সৃষ্ট ক্ষতকে ঘর্ষণ জনিত পোড়াক্ষত বলে।

লক্ষণ: পোড়া ক্ষতের উপসর্গ কারণের উপর নির্ভর করে। সাধারণত ব্যথা ও অসহ্য জ্বালায় পশু ছটফট করে। ক্ষতে জীবাণুর জটিলতা ঘটলে নেক্রোসিস ও পুঁজ হতে পারে। পশুর দেহে ডিহাইড্রেশন, রক্তচাপহ্রাস, টকসেমিয়া ও শক দেখা দিলে পশু মারা যায়।

চিকিৎসা: আগুনে বা উত্তাপে পোড়ার সাথে সাথে শীতল পানিতে ০.০১% এক্রিফ্লেভিন মিশিয়ে ক্ষতস্থানে ঢালতে হবে। ব্যথা কমানোর জন্য ক্ষতস্থানে লোকাল অ্যানেসথেটিক ঔষধ ছিটিয়ে জীবাণু নাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করে যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম অথবা ০.১% এক্রিফ্লেভিন নারিকেল তেলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ইনজেকশন করা যায়। ক্ষতে মাছি বসে যাতে পোকা না পড়ে সে জন্য ক্ষতের চারিদিকে তারপিন তেল লাগতে হবে। রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ক্ষত হলে, বিশেষত এলকালি দ্বারা পুড়ে গেলে ভিনেগার বা পাতলা এসিটিক এসিড (৫%) দ্বারা কয়েকবার ধুয়ে দিলে উপকার হয়। এসিডে পুড়লে ২-৪% সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্বারা কয়েকবার ধুয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে ডেক্সট্রোজ স্যালাইন (৫%) শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। ভিটামিন-সি ৫০০ মিলিগ্রাম মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিলে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

জোয়াল ঘর্ষণ রোগ (Yoke gall)

লাঙ্গল ও গাড়ী টানার কাজে ব্যবহৃত গরু-মহিষের কাঁধের লিগামেন্টাস নিউকিতে জোয়ালের ঘর্ষণের বা আঘাতে সৃষ্ট প্রদাহকে জোয়াল ঘর্ষণ রোগ বলে। জোয়ালের ক্রমাগত ঘর্ষণে অধঃত্বকে ফাইব্রাস টিস্যু বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে থলের মত একটা কৃত্রিম বার্সার সৃষ্টি হয়।

কারণ: পশুকে জীবনের প্রথমবারেই বহুক্ষণ লাঙ্গল বা গাড়ি টানার জন্য ব্যবহার করা। গর্ত বা নিচু জায়গা থেকে গাড়ি তোলার কাজে ব্যবহার করা। গাড়ি টানায় ব্যবহৃত দুটি পশুর উচ্চতায় অসামঞ্জস্যতা। অধিক ওজনের গাড়ি টানা। শক্ত মাটি চাষ করা। অমসৃণ জোয়াল ব্যবহার করা ইত্যাদি।

লক্ষণ: জোয়াল ঘর্ষণে গরু ও মহিষের কাঁধে তীব্র ও পুরাতন প্রকৃতির টিউমার, সিস্ট ও ফোড়া সদৃশ্য সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া ক্ষতস্থানে হাম্পসোর এবং কখনও কখনও মিয়াসিস রোগের জটিলতা দেখা দিতে পারে। লক্ষণ দেখেই এরোগ চেনা যায়। তবে কি প্রকৃতির রোগ তা জানার জন্য সূচ দ্বারা ক্ষতস্থানের কয়েক জায়গা ছিদ্র করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

চিকিৎসা: জোয়ালের ঘর্ষণ রোগ দেখা মাত্রই পশুকে পূর্ণ বিশ্রামে রেখে চিকিৎসার আশ্রয় নেয়া উচিত। ব্যথা ও প্রদাহ নিবারণের জন্য ব্যথা ও প্রদাহরোধী ঔষধ ইনজেকশন দিতে হবে। টিউমার প্রকৃতির এই রোগে ২০% সোডিয়াম স্যালিসাইলেট সলুশন প্রতিদিন ১০-২০ মিলি করে ৩-৫ দিন মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেয়া যায়। কর্পূর, মেনখল ও থাইমল প্রতিটি ১% করে মিশিয়ে মলম তৈরি করে ক্ষতস্থানে লাগানো যায়। জীবাণুর জটিলতা রোধের জন্য যে কোন একটি এন্টিবায়োটিক অথবা সালফোনেমাইড ঔষধ ইনজেকশন করতে হয়। পুরাতন প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা যায়। তবে বড় টিউমার অস্ত্রেপচারের উপযোগী নয়। সিস্ট ও ফোড়া প্রকৃতির রোগে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মধ্যকার পদার্থ বের করে দিয়ে আয়োডিন গজ এবং পরে ডাস্টিং পাউডার দিয়ে ক্ষতস্থান ড্রেসিং করতে হবে।

অধ্যায় ৭

পশুপাখির সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ভেটেরিনারি চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে বিষয়ে পশুপাখির রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে অধ্যায়ন করা হয় তাকে ভেটেরিনারি মেডিসিন বলা হয়। ভেটেরিনারি মেডিসিন বিষয়ের যে শাখায় পশুপাখির রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অধ্যায়ন করে তাকে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বলা হয়। উল্লেখ্য, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিষয়ে এককভাবে রোগাক্রান্ত পশুর রোগ নিরুপণ ও চিকিৎসা করা হয় কিন্তু প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বিষয়ে পশুপাখির পাল বা ফার্মে সুস্থ, রোগাক্রান্ত ও মৃত পশুপাখির উপর গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাতে রোগ না হয় তার ব্যবস্থা করা প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের উদ্দেশ্য। প্রধানত নিম্নোক্ত দু'ই পদ্ধতির মাধ্যমে পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা- ক) এপিডেমিওলজিক্যাল পদ্ধতি (epidemiological methods) এবং খ) ইমুনোলজিক্যাল পদ্ধতি (Immunological methods)

৭.১ এপিডেমিওলজিক্যাল পদ্ধতি

এপিডেমিওলজি শব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'epi' (অর্থ উপরে = on), 'demos' (অর্থ জন সাধারণ = people) এবং 'logos' (অর্থ আলোচনা করা) থেকে। অপর দিকে এপিজুটিওলজি (Epizootiology) শব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'epi' (অর্থ উপরে), `zoon' (অর্থ পশু = animal) এবং 'logos' (অর্থ আলোচনা করা = discourse) থেকে। অর্থাৎ শব্দের অর্থের দিক থেকে এপিডেমিওলজি শব্দটি হিউম্যান মেডিসিন এবং এপিজুটিওলজি শব্দটি ভেটেরিনারি মেডিসিনে ব্যবহারযোগ্য কিন্তু এডিডেমিওলজি ও এপিজুটিওলজির নীতি একই হবার কারণে হিউম্যান ও ভেটেরিনারি উভয় মেডিসিনে এপিডেমিওলজি পারিভাষিক শব্দ (terminology) হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Martin et al. 1994; Radostits et al. 2000; Thrushfied 2000)।

এপিডেমিওলজির সংজ্ঞা: বিভিন্ন পুস্তক লেখক বিভিন্নভাবে এপিডেমিওলজির সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাই এপিডেমিওলজি বিষয়ের একাধিক সংজ্ঞা বিদ্যমান। তবে এপিডেমিওলজির মূল উদ্দেশ্য হল একক পশুর পরিবর্তে পশু পালের রোগ অধ্যয়ন করা।

- পশু পালে বা ফার্মে রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তৃতিতে জড়িত ফ্যাক্টরসমূহ অধ্যয়ন করাকে এপিডেমিওলজি বলা হয়।
- রোগের প্রাদুর্ভাব নিরূপণে রোগ এবং রোগের ফ্যাক্টরস অধ্যয়ন করার বিষয়কে এপিডেমিওলজি বলা হয়।
- রোগের বিস্তৃতি (distribution) ও নির্ধারক (determinants) অধ্যয়ন করার বিষয়কে এপিডেমিওলজি বলা হয়।
- ভেটেরিনারি পেশার একটি মূল উদ্দেশ্য পশু পাখির স্বাস্থ্যরক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যে বিষয়ে রোগের বিস্তৃতি (distribution) ও নির্ধারক (determinants) সম্বন্ধে আলোচনা করে রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে সে বিষয়কে এপিডেমিওলজি বলা হয়।

এপিডেমিওলজির উদ্দেশ্য: এপিডেমিওলজির মূল উদ্দেশ্য হল পশু পালের সংশ্লিষ্ট রোগের ডাটা সংগ্রহ করে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। নিম্নে এপিডেমিওলজির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হল (Martin et al. 1994; Radostits et al. 2000; Thrushfied 2000)।

ক) বিশেষ উদ্দেশ্য (Special purpose)

- তথ্য সরবরাহ (Providing information): রোগের বিস্তৃতি ও পুনঃপুনঃ প্রাদুর্ভাবের হারের বর্ণনা এবং রোগের বিস্তৃতিসহ পশুর মড়কের এলাকা ও সময় নির্ধারণ।
- কারণসূচক ফ্যাক্টর চিহ্নতকরণ (Identification of causative factors): রোগের প্রাদুর্ভাব ও তীব্রতার উপর পারিপার্শ্বিক ফ্যাক্টরের প্রভাব। কারণসূচক ফ্যাক্টর স্বতন্ত্রীকরণ, সনাক্তকরণ, বিস্তৃতি ও সিরোলজিক্যাল পরীক্ষা।

- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control measures): স্বাস্থ্য ও রোগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ। রোগ নিয়ন্ত্রণে জবাই, পৃথককরণ (quarantine) পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও টিকা প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।
- স্ট্যাটিসটিক্যাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিরূপণ করা।

খ) এপিডেমিওলজির কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্য (Operational purposes of epidemiology)

- প্রাথমিক বা প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Primary prevention): রোগের কারণসূচক ফ্যাক্টরের বিস্তৃতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পৃথককরণ (quarantine) ও টিকা প্রয়োগ রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক উদাহরণ।
- সেকেন্ডারি বা অপ্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Secondary prevention): ক্লিনিক্যাল রোগ সৃষ্টির পূর্বে রোগ নির্ণয় করা।

৭.২ পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

৭.২.১ পশুপাখির রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব

ভবিষ্যতের রোগের কথা চিন্তা করে আগাম ব্যবস্থা হল প্রতিরোধ। খামারে রোগব্যাধি দমনে বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন- খামারের ভৌগলিক অবস্থান, জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে 'prevention is better than cure' অর্থাৎ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। তাই পশুপাখির রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদানের পাশাপাশি খামার ব্যবস্থাপনা তথা জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়া দরকার। প্রাণিসম্পদ শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, যে কোন সংক্রামক রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে। তাছাড়া অধিক উৎপাদনশীল প্রাণিসম্পদের রোগ সারানোর জন্য ঔষধ ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রেই এরা রোগ থেকে সেরে ওঠে সত্য, কিন্তু রোগ সংক্রান্ত পীড়নের ফলে এরপর এদের থেকে আর কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভাইরাসঘটিত রোগের জন্য তো এখন পর্যন্ত কোন চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয়নি। পশুপাখির রোগব্যাধি প্রতিরোধে খামারির করণীয় কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলেই পশুপাখির খামার রোগমুক্ত থাকবে, কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাবে এবং খামারি তথা দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

৭.২.২ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রকারভেদ

আমরা নিজেদের অজান্তে অজস্র রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছি। কিন্তু আমরা সচারচর এইসব রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইনা। কারণ আমাদের দেহ বিভিন্ন পর্যায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ঐসব রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই সব রোগের জীবাণুই আমাদের সহজে আক্রান্ত করতে পারেনা। সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে দেহের এই প্রতিরোধ সৃষ্টিই ইমিউনিটি বা রেজিস্ট্যান্স। প্রধানত দুই পদ্ধতিতে দেহে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। যথা- ১) অনির্দিষ্ট ইমিউনিটি এবং ২) সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি।

প্রাকৃতিক বা অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ প্রক্রিয়া (natural or non-specific immunity): প্রাকৃতিক বা অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় পশুপাখির দেহের রক্তের মনোসাইট (Monocyte), নিউট্রোফিল (Neutrophyl), ইউসিনোফিল (Eosinophyl) ও বেসোফিল (Basophyl); ফুসফুস, প্লিহা (Spleen) ও যকৃতের ম্যাক্রোফেজ (Macrophage) ইত্যাদি রাক্ষুসে কোষ যে কোন রোগজীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তা গ্রাস করে মেরে ফেলে।

অর্জিত বা নির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (acquired or specific immunity): নির্দিষ্ট বা অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় রক্তের লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) নির্দিষ্ট জীবাণুর সংস্পর্শে এলে প্রতিক্রিয়া করে এবং দ্রুত এর বিভিন্ন কার্যকরী বংশধর তৈরির মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীকে ধ্বংস করে শরীর থেকে নির্গমনের ব্যবস্থা করে। যখন কোন লিম্ফোসাইট কোন নির্দিষ্ট জীবাণু বা তার অংশ বিশেষের সংস্পর্শে আসে তখন তার বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর (sensitized)

হয়ে থাকে। স্পর্শকাতর লিম্ফোসাইটের পরবর্তী বংশধরেরাও নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি স্পর্শকাতর হয়। লিম্ফোসাইটের এ স্মরণশক্তিকেই রোগ প্রতিরোধ বা immune system বলে। আর এ ব্যবস্থা কাজে লাগানোকেই রোগ প্রতিরোধ বা immunization বলা হয়। কোন নির্দিষ্ট জীবাণু বা জীবাণুর অংশবিশেষ (specific antigen) নির্দিষ্ট মাত্রায় (specific dose) নির্দিষ্ট শক্তিতে (live/attenuated) দেহে প্রবেশ করিয়ে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা হয় তাকে অর্জিত প্রতিরোধ (specific immunity বা acquired immunity) ব্যবস্থা বলে। এ কাজে যে জীবাণু বা জীবাণুর অংশ বা অ্যান্টিজেন (antigen) ব্যবহার করা হয় তাকে টিকা (vaccine) বলে।

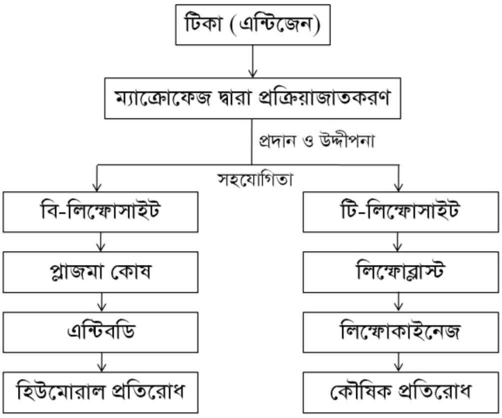

চিত্র ৭.১ঃ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি।

৭.২.৩ অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি (Immunity)

একটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ শক্তির (resistance) অবস্থাকে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি বলে। অনাক্রম্যতার শ্রেণীবিন্যাস দেখানো হল।

১। অনির্দিষ্ট ইমিউনিটি (Non-specific immunity)

ক) দেহের প্রতিবন্ধকসমূহ (Barriers): অনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকসমূহ সব ধরণের জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

খ) সহজাত ও জন্মগত (Inherited/Innate): কতিপয় প্রজাতি বা জাত বংশাণুক্রমে এ প্রকৃতির ক্ষমতা লাভ করে থাকে। তাই এ প্রকৃতির প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জেনেটিক বা আভ্যন্তরিক (constitutional) ইমিউনিটি বলা যায়।

অ) সুনিশ্চিত বা সম্পূর্ণ (Absolute): যেমন ইঁদুর একটি প্রজাতি হিসেবে ডিফথেরিয়া রোগে রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু মানুষ ও গিনিপিগ সংবেদনশীল। একইভাবে ক্ষুরারোগে ঘোড়া, ক্যানাইন ডিসটেম্পারে গরু রেজিস্ট্যান্ট।

আ) আংশিক (Partial): একই প্রজাতির সুনির্দিষ্ট উপজাত, জাত বা স্ট্রেন কতিপয় রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে। যেমন- ইউরোপীয় জাতের মেষের তুলনায় আলজেরিয়ান জাতের মেষ এনথ্যাক্স রোগে রেজিস্ট্যান্ট।

২। সুনির্দিষ্ট অর্জিত ইমিউনিটি (Specific acquired immunity)

সুনির্দিষ্ট অণুজীবের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি প্রাকৃতিকভাবে অথবা কৃত্রিম প্রদ্ধতিতে দেহে সৃষ্টি হয়। উভয়ক্ষেত্রে প্রতিরোধক্ষম এন্টিবডি এবং সেনসিটাইজড কোষ এককভাবে অথবা একত্রে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে।

ক) প্রাকৃতিক ইমিউনিটি (Natural immunity)

অ) প্রাকৃতিক প্রত্যক্ষ ইমিউনিটি (Natural active immunity): যখনই কোন বাইরের অণুজীব (এন্টিজেন) দেহে প্রবেশ করে তখনই দেহে একটি অনুক্রমিক প্রক্রিয়া (learning process) শুরু হয়। দেহের কোষ প্রথমে বাইরের

অণুজীব বা তাদের টকসিনকে এন্টিজেন হিসেবে সনাক্ত করে। পরে তাদের বিরুদ্ধে এন্টিবডি বা সেনসিটাইজ কোষ সৃষ্টি হয়। এন্টিবডিজ জীবাণুকে ধ্বংস করে বা ধ্বংস করার জন্য তরলীকরণ বা ক্ল্যাম্পিং করে। ক্ল্যাম্পিংকৃত জীবাণুকে ফ্যাগোসাইটিক কোষ সহজেই ভক্ষণ করে। এছাড়া এন্টিবডিজ জীবাণুর টকসিনকে নিষ্ক্রিয়করণ (neutralize) করে ফলে দেহে টকসিনজনিত কোন ক্ষতি হয় না। প্রাকৃতিকভাবে দেহে সংক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, দেহের কোষ কোন একটি এন্টিজেনের বিরুদ্ধে একবার জ্ঞাত (learnt) হলে সে এন্টিজেন বা জীবাণুকে কোষ (memory cell) আর ভুলেনা। তাই দ্বিতীয়বার একই জীবাণু (এন্টিজেন) দেহে সংক্রমণ ঘটলে দেহের কোষ (memory cell) অতি সহজেই তাকে সনাক্ত করতে পারে এবং দ্রুত সুনির্দিষ্ট এন্টিবডিজ বা সেনসিটাইজ কোষ সৃষ্টি করে দেহকে প্রতিরোধ করে।

আ) প্রাকৃতিক পরোক্ষ ইমিউনিটি (Natural passive immunity): প্রাকৃতিকভাবে রোগজীবাণু সংক্রমণের ফলে মায়ের দেহে এন্টিবডিজ সৃষ্টি হয়। সে এন্টিবডিজ গর্ভাবস্থায় প্লাসেন্টার মাধ্যমে ফিটাসে অথবা নবজাত বাচ্চায় শালদুধ খাওয়ার মাধ্যমে দেহে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় তাকেই প্রাকৃতিক পরোক্ষ ইমিউনিটি বলা হয়।

খ) কৃত্রিম ইমিউনিটি (Artificial immunity): প্রত্যক্ষ (active) অথবা পরোক্ষ (passive) ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট সংক্রমণের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট দেহের প্রতিরোধ অবস্থাকে কৃত্রিম ইমিউনিটি বলা হয়।

(অ) প্রত্যক্ষ কৃত্রিম ইমিউনিটি (Active artificial immunity): টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে দেহে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় তাকে প্রত্যক্ষ কৃত্রিম ইমিউনিটি বলা হয়। টিকা ইনজেকশন দেয়ার পর দেহের ইমিউনো-কম্পিটেন্ট কোষ তার কাজ বুঝে নেয় (educated) এবং দেহে সুনির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। যেমন- এনথ্রাক্স, টিটেনাস, হেমোরেজিক সেপটিসেমিয়া প্রভৃতি রোগের টিকা দীর্ঘস্থায়ী। প্রবল ইমিউনিটির আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য।

(আ) কৃত্রিম পরোক্ষ ইমিউনিটি (Artificial passive immunity): জরুরী অবস্থায় তৎক্ষণাৎ প্রতিরোধের (immediate protection) জন্য তৈরি এন্টিবডিজ অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট এন্টিসিরাম ইনজেকশন দিয়ে যেভাবে রোগ প্রতিরোধ করা হয় তাকে কৃত্রিম পরোক্ষ ইমিউনিটি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্থায়ী হয়। স্বাভাবিক পরোক্ষ ইমিউনিটি কিছুটা অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয় যেখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ইমিউনিটি আমরণ থাকে।

৭.২.৪ অনির্দিষ্ট ইমিউনিটি (Non-specific)

অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রায় সব ধরণের জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রধানত চার ভাবে দেহে অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে। যথা- ক) পোষক ফ্যাক্টর, খ) শারীরিক ফ্যাক্টর, গ) রাসায়নিক ফ্যাক্টর এবং ঘ) কৌষিক ফ্যাক্টর।

ক) পোষক ফ্যাক্টর (Host factors):

- কতিপয় প্রাণী স্বাভাবিক অবস্থায় নিজ দেহকে রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।
- প্রজাতি বিশেষের প্রতিরোধ ক্ষমতা- গিনিপিগ ও মানুষের ডিপথেরিয়া হয় কিন্তু ইঁদুরের হয় না। আবার ঘোড়া ক্ষুরারোগ ও মানুষ ক্যানাইন ডিসটেম্পার রোগে রেজিস্ট্যান্ট।
- জাত বিশেষের প্রতিরোধ ক্ষমতা- সকল জাতের মেষের এনথ্রাক্স রোগ হলেও আলজেরিয়ান জাতের মেষে এ রোগ হয় না।

খ) শারীরিক ফ্যাক্টর (Physical factors)

অ) অক্ষত ত্বক (Intact skin): দেহের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রয়েছে অক্ষত ত্বক (intact skin)। সাধারণত জীবাণুর বিরুদ্ধে অক্ষত ত্বক শারীরিক প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যদি দেহে ক্ষত সৃষ্টি হয় তবে সেই ক্ষত দিয়েই রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য কিছু জীবাণু যেমন- ব্রুসেলা, লেপ্টোস্পাইরা, হুক ওয়ার্ম লার্ভি, সিস্টোসোমা সারকেরিয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক ত্বক ছিদ্র করে দেহের সংক্রামিত হয়।

আ) আনুনাসিক লোম ও শ্বাসনালীয় সিলিয়া (Nasal hairs and tracheal cilia): নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (mucous membrane) কোষে চুল সদৃশ যে লোম থাকে সেগুলো সিলিয়া। বাইরের কোন পদার্থ বা জীবাণু

নিঃশ্বাসের সাথে নাকের ভিতর প্রবেশ করলে এসব সিলিয়া বাইরের এসব পদার্থকে দ্রুত ঠেলে দেয় ফলে হাঁচি বা কাশির সৃষ্টি হয়ে তা বেরিয়ে যায়।

ই) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane): দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের যেমন- শ্বাসতন্ত্র, খাদ্যতন্ত্র ইত্যাদির ভিতর ভাগে প্রতিরোধক্ষম স্তর (mucous membrane) থাকে।

গ) রাসায়নিক ফ্যাক্টর (Chemical factors)

অ) দেহের নিঃসৃত রস বা ক্ষরণ (Body secretions): সোয়েট (sweat) ও সিবেশাস্ (sebaceous) গ্রন্থির ক্ষরণ রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সোয়েট গ্রন্থির ল্যাকটিক এসিড এবং সিবেশাস্ গ্রন্থির ফ্যাটি এসিডসমূহের (caprylic acid oleic acid etc) ব্যাকটেরিয়া নাশক হিসেবে সক্রিয়তা রয়েছে। ত্বকের গ্রন্থির ক্ষরণের pH এসিডিক যা ত্বকের জীবাণুর বংশ বৃদ্ধিতে বাধাদান করে। অশ্রুজল ও শ্বাসীয় শ্লেষ্মা ঝিল্লী (mucosa) জীবাণুনাশক (bactericidal) লাইসোজাইম এনজাইম ক্ষরণ করে। লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের এন-এসিটাইল গ্লুকোসামিন ও এন-এসিটাইল মিউরামিক এসিড এর মধ্যের সংযুক্তি ভেঙ্গে দেয়। এছাড়া চোখের জল চোখের ভিতর ঢুকে যাওয়া পদার্থকে বের করে দিতে সাহায্য করে। সাধারণ ঠান্ডা (common cold) লাগা সর্দিতে নাক দিয়ে তরল পদার্থ নির্গত হয় যা দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ অবস্থা নির্দেশ করে। শৈষ্মিক ক্ষরণে (mucous secretion) মিউকোপলিস্যাকারাইড থাকে যা পোষক কোষে ভাইরাস প্রবেশে বাধা দান করে অথবা সংবেদনশীল কোষে ভাইরাসের সংযুক্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। লালাক্ষরণ (salivation) মুখের মধ্যে প্রবেশকৃত যেসব জীবাণু পেটের মধ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা থুথুর মাধ্যমে ফেলে দেয়া সম্ভব হয়। পাকস্থলীর ক্ষরণ (stomach secretions) পাকস্থলীর ক্ষরণে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। খাদ্যের মাধ্যমে কোন জীবাণু পেটের পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড জীবাণুকে মেরে ফেলে। এমনকি বিপদজনক কলেরা ও টাইফয়েড জীবাণুকেও এই এসিড ধবংস করতে সক্ষম। সিমেনের মধ্যে থাকে স্পারমিন (spermin) যা শুক্রাণুকে জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আ) দেহের রেচন বা নিঃসরণ (body excretions): প্রসবকরণ (urination) পর্যায়ক্রমে মূত্র ত্যাগ মূত্রনালীকে ধৌত করে ফলে দেহ বর্জ্য পদার্থ মুক্ত হয়। খাদ্য অন্ত্রে জীবাণুর সংক্রমণে বমি বা ডায়রিয়া হয় অথবা একসঙ্গে দু'টোই হতে পারে। বমি ও ডায়রিয়া (vomiting and diarrhoea) দেহকে আক্রান্ত জীবাণু থেকে মুক্ত করে। অন্ত্রের স্বাভাবিক জীবাণুর নিঃসরণে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। অন্ত্রে স্বাভাবিক জীবাণুর উপস্থিতি ও তাদের বিভিন্ন নিঃসরণ অন্ত্রের কোলনে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বাড়ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে বাধাদান করে।

ই) হরমোন (hormone): কর্টিকোস্টেরয়েডস লাইসোজাইম এনজাইম নিয়ন্ত্রণ করে ফলে অন্তঃকোষীয় এনজাইম জীবাণু ধবংস করতে পারেনা। তাই এন্ডোক্রাইন গোলযোগের রোগী যেমন- ডায়াবেটিস (Diabetes melitus) ও অ্যাড্রেনাল গোলযোগে জীবাণুর প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীল।

ঈ) অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ (Other chemical agents): অজ্ঞাত উত্তেজকের (এন্টিজেন) বিরুদ্ধে প্রধানত দেহে IgM এন্টিবডিজ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই এন্টিবডি আন্ত্রিক ও ত্বকের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিক প্লাজমা প্রোটিনে প্রোপারডিন (Properdin) থাকে। কমপ্লিমেন্ট (C) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg+) আয়নের উপস্থিতিতে প্রোপারডিন কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করে। সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (C-reactive protein) স্বাভাবিক রক্তের প্লাজমায় নন-ইমিউনোগ্লোবিউলিন (non-lg) মলিকুল হিসেবে থাকে। ক্যালসিয়াম আয়নের (Ca+) উপস্থিতিতে নিউমোকোক্কাসের (Pneumcoccus) সি-কার্বোহাইড্রেট (C-CHO) গ্রুপকে অধঃক্ষেপে (precipitate) পরিণত করে। ইন্টারফেরোনা (Interferons) হল সাইটোকাইনস (cytokines) যা পোষক কোষে ভাইরাস আক্রান্তের এক ঘন্টার মধ্যে ভাইরাস আক্রান্ত কোষ থেকে মুক্ত হয় (released) এবং কয়েক দিনের মধ্যেই দেহে এন্টিবডিস সৃষ্টির পূর্বেই সর্বোচ্চ মাত্রায় সৃষ্টি হয়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

ঘ) কৌষিক ফ্যাক্টরস (Cellular factors)

ম্যাক্রোফেজ (macrophages) ও অন্যান্য প্রাণী কোষ যেমন- নিউট্রোফিল ও ইয়োসিনোফিল ইত্যাদি বহিরাগত বস্তু ভক্ষণ করে। এদেরকে অণুজীব খাদক (phagocyte) কোষ বলে। যে পদ্ধতিতে এই কাজ সমাধা করে তাকে অণুজীব ভক্ষণ ক্রিয়া (ingest) বলা হয়।

৭.২.৫ সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি (Specific immunity)

সংক্রামক জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রধানত দু'ভাবে সুনির্দিষ্ট ইমিউনিটি সৃষ্টি হয়। যথা- ক) হিউমোরাল এবং খ) সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি।

ক) হিউমোরাল ইমিউনিটি (Humoral immunity)

এন্টিবডিজের মাধ্যমে দেহে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে হিউমোরাল ইমিউনিটি বলা হয়। এন্টিবডিজ মেডিয়েটেড ইমিউনিটি প্রতিরোধ করে মূলতঃ টকসিনকে নিষ্ক্রিয় করে (neutralization) এবং অণুজীব ভক্ষণ ক্রিয়ায় (phagocytosis) ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে।

খ) সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি (Cell mediated immunity)

সেনসিটাইজড লিম্ফোসাইটের নিঃসৃত সলিউবল ফ্যাক্টর লিম্ফোকাইনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করে। এছাড়া মাইক্রোফেজকে সক্রিয়করণ করে। দেহের এতসব বাধা বা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে জীবাণু যদিও বা দেহে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে লসিকা গ্রন্থি আটকায়। উল্লেখ্য, সমগ্র দেহে লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা নালী জালের ন্যায় বিছিয়ে রয়েছে। লসিকা গ্রন্থি জীবাণুর ছাঁকনীর স্টেশন হিসেবে কাজ করে। এরপরও জীবাণু লসিকা গ্রন্থি থেকে ভিতরে প্রবশে করতে সক্ষম হলে দেহে একটা অনুক্রমিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়াকে 'প্রদাহিক প্রতিক্রিয়া' (inflammatory secretion) বলে। এই প্রতিক্রিয়ায় শ্বেতকণিকা জীবাণুর চারপাশে জড়ো হয় এবং ভক্ষণ ও ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু অবশেষে শ্বেতকণিকা জীবাণুর কাছে হেরে গেলে অর্থাৎ শ্বেতকণিকার মৃত্যু ঘটলেও এক প্রকার পদার্থ সৃষ্টি হয় যা জীবাণুকে পাতলা করে দেয়। এঅবস্থায় দেহে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেহে জ্বর দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায় প্রাণী দেহ প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে টিকে থাকে। দেহে এত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগ হওয়া একটি ব্যতিক্রম বটে।

ইমিউন রেসপন্স পদ্ধতি (mechanisms of the immune response)

যখন কোন এন্টিজেন দেহে প্রবেশ করে তখন ম্যাক্রোফেজ, ডেনড্রাইটিক (dendritic) কোষ ও বি-কোষ তাকে প্রথমে ফাঁদ (traped) ফেলে এবং প্রক্রিয়ান্বিত (processed) করে। অতঃপর দেহের বাইরের পদার্থ হিসেবে সনাক্ত করে। যদি তা নন-সেল্ফ (non-self) বা দেহের অপরিচিত হয় তবে সে সংবাদ এন্টিবডি-ফর্মিং সিস্টেমে অথবা সেল-মিডিয়েটেড ইমিউন সিস্টেমে পৌঁছিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি দ্রুত প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট এন্টিবডি বা সেনসিটাইজড কোষ বা উভয় সৃষ্টি করে যা এন্টিজেনকে বের (eliminate) করে দেয়। ইমিউন সিস্টেম এই ঘটনা মনে রাখতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে একই এন্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে ইমিউন পদ্ধতির রেসপন্স খুব দ্রুত ও কার্যকর হয়।

ইমিউন সিস্টেমের প্রয়োজন মূলত ৪ টি উপাদান। প্রথমত দেহের সংশ্লিষ্ট কোষ বাইরের এন্টিজেনকে পাকড়াও করে এবং প্রক্রিয়ান্বিত করে যাতে দেহের কোষ সহজেই সনাক্ত করতে পারে। দ্বিতীয়ত দেহের কোষ প্রক্রিয়ান্বিত এন্টিজেনের সাথে যুক্ত হয় এবং রেসপন্ড করে এন্টিজেন সেনসিটিভ কোষ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত এন্টিজেনের বিরুদ্ধে কোষ এন্টিবডিজ সৃষ্টি বা সেল মেডিয়েটেড-ইমিউন রেসপন্সের মাধ্যমে ক্রিয়াপ্রসূ (effector) কোষ সৃষ্টি করে। সেল মেডিয়েটেড ইমিউন রেসপন্স সৃষ্টিকারী লসিকা কোষকে টি-কোষ এবং এন্টিবডিজ সৃষ্টিকারী কোষকে বি-কোষ বলা হয়। চতুর্থত বা শেষে স্মৃতি কোষ (memory cells) হিসেবে দেহে থেকে যায় এবং পরবর্তীতে একই এন্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দ্রুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

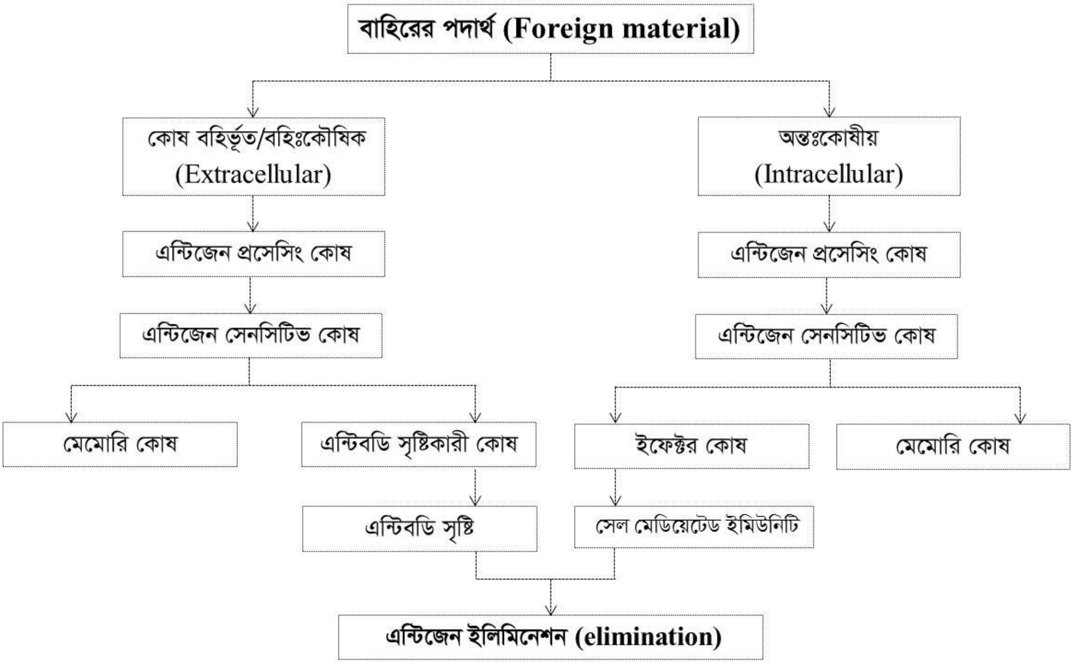

চিত্র ৭.২ঃ ইমিউন রেসপন্স এর একটি সাধারণ নমুনা।

ইমিউন রেসপন্সে জড়িত কোষসমূহ (Cells involved in immune response)

লিম্ফোসাইটস (lymphocytes) এবং ম্যাক্রোফেজ (macrophages) ইমিউন রেসপন্সে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে (Trizard 1996; Janeway and Travers 1997)।

৭.৩ পশুপাখির রোগ প্রতিরোধ ও দমনের মৌলিক উপায়সমূহ

পশুপাখির খামারে রোগ প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ-

সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে: যে কোন সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ রোগ প্রতিরোধ (prevention) ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এজন্য দুগ্ধ খামার মালিকদেরকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

কোয়ারেন্টাইন (quarantine) বা সঙ্গনিরোধ: সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

- সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত দ্রুত সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে যতদিন না ঐ রোগ অন্য পশুকে সংক্রমনের আশঙ্কামুক্ত হয়।
- নতুন ক্রয় করা বা অন্য কোন ভাবে সংগৃহীত প্রাণিকে এনেই খামারের অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে না। তিন সপ্তাহ সময় সেগুলোকে পৃথকভাবে রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি নতুন প্রাণির কোন রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবেই খামারের পুরানো প্রাণির সঙ্গে রাখা যাবে।
- বহিরাগত দর্শকদের খামারে প্রবেশের সময় পা জুতার তলা জীবাণুনাশক পদার্থ গুলানো পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে।

- যে সকল সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায় সে সকল রোগের টিকা সঠিক সময়ে নিয়ম মতো দিতে হবে। নিজের খামারে টিকা প্রদানের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী খামার বা প্রাণী সমূহকেও একই টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাণির খাদ্য টাটকা, নির্ভেজাল হতে হবে ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে নিজ খামারেই মিশ্রিত করতে হবে।
- কোন এলাকাতে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সে এলাকার পশুপাখি বা পশুপাখিজাত দ্রব্যাদি হাটে বাজারে বা ঐ এলাকার বাইরে যাতে যেতে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খামারে বন্য জন্তু প্রবেশ ও চলাচল বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া মশা-মাছি ইঁদুর ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে হবে।
- খামারের রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে হবে। ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে তা জবাই করে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের ব্যবস্থামতে মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রাণির মরদেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

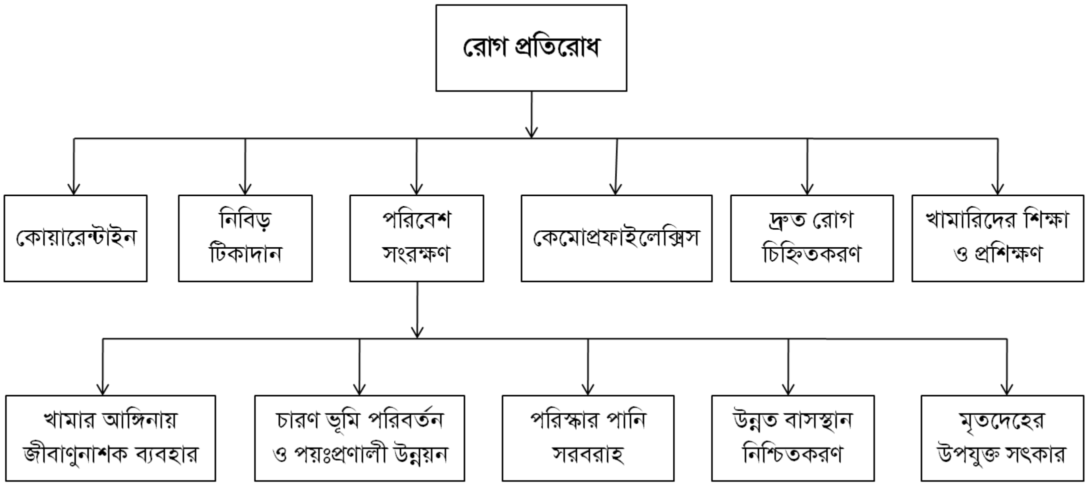

চিত্র ৭.৩ঃ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রবাহ চার্ট।

নিবিড় টিকা প্রদান (mass immunization): কোন নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সকল বয়সের পশুপাখিকে নিবিড়ভাবে টিকা প্রদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়।

কেমোপ্রফাইলেক্সিস (chemoprophylaxis): গবাদিপশুর পানি ও খাবারে প্রতিষেধক মাত্রায় এন্টিবায়োটিক, সালফোনামাইড এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণের (environmental measures) ব্যবস্থা:

- খামার আঙ্গিনায় জীবাণুনাশক ছিঁটিয়ে পরিস্কার করা- খামার আঙ্গিনা পরিস্কার করে জীবাণুনাশক (আয়োসান, ডেটল, স্যাভলন, টিমসেন, সুপারসেপ্ট) ছিঁটিয়ে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বিস্তার রোধ ও ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ করা হয়।
- চারণ ভূমি পরিবর্তন ও পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন- নির্দিষ্ট সময় পর পর চারণভূমির পরিবর্তন করে কৃমি এবং ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধের একটি ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাযুক্ত উন্নত নর্দমা এবং ভাল পানির ব্যবস্থাযুক্ত চারণভূমি ব্যবহার করা।
- পরিস্কার পানি সরবরাহ- গবাদিপশুকে সব সময় পরিস্কার পানি সরবরাহ করা উচিত। কোন অবস্থাতেই পঁচা, ডোবা বা নর্দমার পানি খেতে দেয়া উচিত নয়।

- উন্নত বাসস্থান- গবাদিপশুকে অতিরিক্ত রৌদ্র, গরম, ঠান্ডা, ঝড়-বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য উন্নত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
- মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকার- সংক্রামক রোগে মৃত গবাদিপশুকে খোলা মাঠে বা পানিতে ভাসিয়ে দেয়া উচিত নয়। এক্ষেত্রে মৃত গবাদিপশুর দেহ মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা অথবা ভালভাবে পুড়িয়ে ফেলানো উচিত।

দ্রুত রোগ চিহ্নিতকরণ: রোগের লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। নির্দষ্ট কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। যেমন- টিউবারকুলিন পরীক্ষায় টিবি, এসলুটিনেশন পরীক্ষায় ব্রুসেলোসিস, ফিজিক্যাল এবং কেমিকেল পরীক্ষায় উলান ফোলা রোগ নির্ণয় করা যায়।

খামারিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, টিকা প্রদান এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.৪ জৈবনিরাপত্তা কি এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়?

পশুপাখি পালনে যে কোন রোগজীবাণু তথা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, বা পরজীবি ইত্যাদির সম্ভাব্য সংক্রমণ অনুপ্রবেশ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎস মূলেই প্রতরোধ করত পশুপাখিকে সুরক্ষা প্রদানকেই জীবনিরাপত্ত বা বায়োসিকিউরিটি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, জীবনের জন্যই জীবনকে রোগজীবাণু থেকে দূরে রাখা বা রোগজীবাণুকে জীবন থেকে দূরে রাখাই জৈবনিরাপত্তা। অর্থাৎ রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পশুপাখি রক্ষা করার জন্য যত ধরণের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী আছে তাদের সবগুলোর সমম্বয়কে একত্রে 'জৈবনিরাপত্তা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বস্তুত সময়ের সাথে সাথে পশুপাখি পালন বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পরিশীলিত রুপ লাভ করলেও খামারে জৈবনিরাপত্তার বিধি-বিধান যথেষ্ট দক্ষতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসৃত হচ্ছে না। কঠোর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে পশুপাখিকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিতে এবং আর্থিক বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত করতেই মূলত জৈবনিরাপত্তার অনুশীলন এখন প্রাণিসম্পদ পালনের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। জৈবনিরাপত্তার উদ্দেশ্যবলী নিম্নরুপ-

- রোগ/ রোগজীবাণুকে দূরে রাখা। রোগাক্রান্তের/মৃত্যুর হার হ্রাস করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন। খামারকে পরিবেশ-বান্ধব করে তোলা।
- বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত রাখা। বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবেশ করা। জীবাণু-সন্ত্রাস রপ্তানির সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা।

৭.৪.১ জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে গৃহীতব্য কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বে গবাদিপশু এবং পোল্ট্রি শিল্পে 'জৈবনিরাপত্তা' বা biosecurity কথাটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে। যদিও এটি গবাদিপশু ও পোল্ট্রি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে তথাপি এ সম্পর্কে অনেক খামারির মধ্যেই বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন হয়তো খামারের প্রবেশপথ জীবাণুনাশক দিয়ে বা এ জাতীয় কিছু টুকটাক ব্যবস্থার মাধ্যমেই পশুপাখির 'জৈবনিরাপত্তা' বিধান করা যাবে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। আসলে জৈবনিরাপত্তা হচ্ছে সফল পশুপাখি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পশুপাখিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যায়। সার্থক জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে নিতে হলে রোগজীবাণু প্রবেশের বা সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলোকে জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গবাদিপশু অপেক্ষা পোল্ট্রি খামারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বেশি প্রযোজ্য। যেমন-

- খামারের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ উপযোগী ঘর তৈরি করতে হবে। আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন- আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং অন্য কোন পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার থেকে যতটা সম্ভব দূরে খামার স্থাপন।

- খামারের প্রধান ফটক সব সময় তালা বন্ধ রাখতে হবে। ফটকে 'প্রবেশ সংরক্ষিত' অথবা 'কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ' অথবা 'বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা চালু আছে- প্রবেশ নিষেধ' এ ধরণের সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।
- মুরগি গ্রহণ বা বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য বা অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য আগত সকল যানবাহনের চাকা (টায়ার), ম্যাট ও নিচের অংশ ভালভাবে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক স্প্রে ব্যবহার করার পর খামারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে। যদি যানবাহন যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত হবার বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে তা খামারে প্রবেশ করতে পারবে না। যানবাহনে বহনকারী খাঁচা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ভালভাবে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় লোকজন যেমন কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান বা এ জাতীয় টেকনিশিয়ানকে খামারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যায় তবে তাদেরকেও উল্লিখিত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে আনীত যন্ত্রপাতিসমূহ পরিষ্কারের পর জীবাণুনাশ করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ধরণের বহিরাগতদের নাম, পদবি, বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং পরিদর্শনের তারিখ, সময় ইত্যাদি একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে তাদের স্বাক্ষর নিতে হবে।
- খামারের ম্যানেজার বা কোন কর্মচারী অন্য কোন খামার পরিদর্শন করবেন না। তাছাড়া খামারের ব্যক্তিবর্গকে মুরগি বিক্রয় কেন্দ্র বা যেখানে নানা প্রজাতির সৌখিন পাখি বিক্রয় হয় সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ এসব পাখি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, লেরিঙ্গেট্রাকিয়াইটিস, মাইকোপাজমা সাইনোভি এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের জীবাণু বহন করতে পারে।
- খামারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ খামারে প্রবেশের পূর্বে পরিধেয় সকল বস্ত্রাদি (জুতাসহ) পরিবর্তন করে খামার কর্তৃক প্রদত্ত পোষাক, বুটজুতা, দস্তানা ও টুপি পরিধান করবেন। জীবাণুনাশক সলিউশনেপূর্ণ 'ফুট ডিপে' জুতা ডুবিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবেন। খামারে পরিচর্যা ও অন্যান্য কাজ শেষে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্তন করে হাত ও বাহু ভালভাবে পরিষ্কার করে খামার পরিত্যাগ করতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা। লক্ষণীয় বিষয় হল এ খাদ্য ও পানিতে যেন পশুপাখির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধাদানকারী উৎপাদকমুক্ত থাকে। ছোটখাট খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পশুপাখিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। যেমন- খাদ্য ও পানির পাত্র, ডিম সংগ্রহের যন্ত্র, বর্জ্য সংগ্রহের যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রোগ ছড়ানোর মাধ্যম হওয়ার কারণে এগুলোকে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে ভিতরে ঢোকাতে হবে। আর এগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া খামারের এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। সেকারণেই সম্ভব হলে প্রত্যেক শেডের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত।
- কার্যকর নিরোধন (quarantine) ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া খামারের প্রবেশপথে চেক পয়েন্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে করে খামারে কোন জীবজন্তু বা মানুষের প্রবেশ ও বের হয়ে যাওয়ার ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে। খামারের নিজস্ব পশুপাখি বাদে আশেপাশের এলাকার যে কোন পোল্ট্রি, পোষা পাখি বা প্রাণী এবং বন্যজন্তু রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কাজেই এগুলোকে খামারের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। খামারে অবস্থানরত অনেক কর্মচারীই ব্যক্তিগতভাবে মুরগি বা অন্যান্য পশুপাখি পুষে থাকেন। এগুলো অবশ্যই রোধ করতে হবে। আর এটি করার উৎকৃষ্ট পথ হল তাদেরকে সস্তায় ডিম ও মাংস সরবরাহ করা।
- ইঁদুর ও অন্যান্য ইঁদুর-জাতীয় প্রাণী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামারকে মুক্ত রাখতে হবে। বন্যজন্তু এবং ইঁদুর যেহেতু পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাই ঘরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদিতে চিকন তারজালির স্ক্রীন লাগিয়ে হাউসে এদের প্রবেশ রোধ করা যায়। তবে, খাদ্য এবং লিটার গুদাম এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা বেশ কষ্টকর। খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাছাড়া পোল্ট্রির ঘরে ব্যবহৃত খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যেখানে সেখানে খাদ্যের উচ্ছিটাংশ ফেললে বা পোল্ট্রি খামারের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার না রাখলে

সহজেই ইঁদুর সেখানে বাসা তৈরি করবে, বাচ্চা দেবে, উৎপাত করবে এবং রোগজীবাণু ছড়াবে। কাজেই পুড়িয়ে বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ পদ্ধতিতে সৎকার করতে হবে। তাছাড়া কম্পোস্ট বা পিট পদ্ধতির মাধ্যমেও এগুলো থেকে উৎকৃষ্টমানের সার তৈরি করা যায়।

- খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' (all-in-all-out) পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ খামারের কোন ঘরে একটি ব্যাচ ঢোকানোর পরে তা বিক্রি না করা পর্যন্ত সে ঘরে আর কোন নতুন ব্যাচ ঢোকানো যাবে না। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এটি সম্ভব না হলে যত কম রাখা যায় ততই ভাল। এই বিষয়টি শুধুমাত্র পোল্ট্রি খামারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
- কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ এলাকায় প্রাপ্ত জীবাণুর সেরোটাইপের (serotype) ওপর নির্ভর করে করতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। মৃত মুরগি মাটির গভীরে পুঁতে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মৃত মুরগির নমুনা পলিথিন দ্বারা ভালভাবে প্যাকেটজাত করে বরফ সহযোগে প্লাস্টিক বা অনুরূপ বাক্সের মাধ্যমে দ্রুত সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করে রোগ নির্ণয় করাতে হবে ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন- খালি কার্টন, বাক্স, বোতল, টিকা বা ওষুধের খালি শিশি ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। যেমন- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৌতকরণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, ফিউমিগেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে পোল্ট্রি হাউজের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারি ও কর্তাব্যক্তিকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।
- খামারে পেশাগতভাবে যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যে কোন প্রকার হাতুড়ে লোক খামারের লোকসানের জন্য যথেষ্ট।
- 'জৈবনিরাপত্তা' সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত উপাদানের সবকয়টি একই সঙ্গে সঠিকভাবে যদি মেনে চলা না যায় তবে যে কোন পশুপাখির খামারির মহৎ উদ্যোগই ভেস্তে যাবে। যে কোন 'জৈবনিরাপত্তা' কর্মসূচির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর। আর তা করতে হলে খামারের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাছাড়া এ সম্পর্কে সকলের পর্যাপ্ত জ্ঞানও থাকতে হবে। কোন জৈবনিরাপত্তা কার্যক্রমে, যেমন- হ্যাচারি বা ব্রুডিং এর জন্য এক ধরণের মানদন্ড আর গ্রোয়িং হাউস বা লেয়িং হাউজের জন্য অন্য এক ধরণের মানদন্ড থাকলে চলবে না। সবক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট মানদন্ড থাকতে হবে।

৭.৪.২ মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায়

জৈবনিরাপত্তা বিষয়টি যেহেতু পশুপাখির খামার ব্যবস্থাপনা ও এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একত্রে নির্দেশ করে সেহেতু মানুষ জৈবনিরাপত্তা কার্যক্রমের একটি প্রধান অংশ। তাই খামারের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তির সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হওয়ার ওপর জীবাণুঘটিত রোগ হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে। এজন্য খামারের আশেপাশে যারা অবস্থান করবে তাদের সকলকেই সমানভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

- অপ্রয়োজনে যে কোন দর্শনার্থীকে খামারের ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া। যেসব দর্শণার্থী অনুমতি সাপেক্ষে খামারে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেকের রেকর্ড রাখতে হবে। যেমন- তাদের পেশা কি, কেন এবং কখন তারা খামারে প্রবেশ করেছিল, তারা ঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছিল কিনা ইত্যাদি।
- এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার দ্বারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে। অর্থাৎ ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকার মধ্যে ডিভাইডার (divider) থাকবে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে পরিষ্কার এলাকায় যেতে হলে নিজেকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

- যে কোন বড় খামারের ক্ষেত্রেই গাড়ি পার্কিংয়ের এলাকা, দর্শনণার্থী কক্ষ ইত্যাদিকে ময়লা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার এবং গাড়ি দুটোই ময়লা হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই পশুপাখির সামগ্রী বহনকারী গাড়ি, ড্রাইভার এবং খামারের কর্মচারীকে পরিষ্কার এলাকাতে ঢুকতে হলে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- দর্শণার্থীর মধ্যে যারা খামারের পরিষ্কার এলাকায় প্রবেশ করবে তাদেরকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। আর খামারে যেসব কর্মচারী কাজ করতে ঢুকবে তারা অবশ্যই রাবারের জুতো, বিশেষ ধরণের জামা ও মাথায় বিশেষ ধরণের টুপি পরে ঢুকবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি শেডের দরজার সামনে জীবাণুনাশক ঔষধ থাকবে যা তাদেরকে মাড়িয়ে যেতে হবে।

৭.৫ পশুপাখির রোগ প্রতিরোধে টিকার ব্যবহার

৭.৫.১ টিকার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, পরিবহণ ও সংরক্ষণ

টিকাবীজ হচ্ছে রোগের প্রতিষেধক, যা রোগের জীবাণু বা জীবাণুর অ্যান্টিজেনিক (antigenic) উপকরণ দ্বারা তৈরি করা হয়। পাখির দেহের ভিতর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য টিকাবীজ প্রয়োগ করতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে কোন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঐ রোগের জীবাণু দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে প্রতিষেধক তৈরি করা হয় তাহাই টিকা। টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে দেহের ভিতর রক্ত বা রক্তরসে একপ্রকার ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin) নামক আমিষজাতীয় পদার্থ তৈরি হয়, যাকে অ্যান্টিবডি (antibody) বলা হয়। এ অ্যান্টিবডিই হচ্ছে রোগ-প্রতিরোধক পদার্থ। যে রোগের জীবাণু দিয়ে টিকাবীজ তৈরি করা হয় টিকাবীজ প্রয়োগের ফলে সে রোগের বিরুদ্ধেই দেহের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে। সাধারণত জীবাণুকে জীবিত রেখে বা মেরে ফেলে বা নিষ্ক্রিয় করে টিকাবীজ তৈরি করা হয়। তৈরিকৃত টিকাবীজ তরল এবং ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। সময়মতো সংক্রামক রোগের টিকা প্রয়োগ করলে পশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহত হয়। খামারের পশুপাখিকে সুস্থ রাখতে হলে সময়মতো দেশে বিদ্যমান সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে টিকা বা প্রতিষেধক প্রয়োগ করতে হবে। এতে প্রাথমিক খরচ আপাতত বেশি হলেও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তা থেকে ভাল মুনাফা আসবে।

টিকাবীজ তৈরির পর এদের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। টিকাবীজের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। এমনকি টিকাবীজ পরিবহনের সময়ও ঠান্ডা অবস্থা বজায় রাখতে হয়। এখানে টিকাবীজ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করে ব্যবহার পর্যন্ত নির্দিষ্ট ঠান্ডা তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থাকে cool-chain system বলে। আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় পশুপাখির টিকা উৎপাদন কিছুটা কম। উৎপাদিত টিকার প্রায় ১৮% টিকা পরিবহণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে অপচয় হয়। টিকার সঠিক সংরক্ষণে এ অপচয় কমিয়ে ঘাটতি মেটানো ও অর্থিক সাশ্রয় করা সম্ভব। তাই উৎপাদিত টিকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে টিকার সঠিক পরিবহন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

টিকার প্রকারভেদ: টিকার কার্যকরী ক্ষমতা ও প্রস্তুত প্রণালীর উপর ভিত্তি করে প্রধাণত দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে-

- জীবন্ত টিকা (live attenuated vaccine): জীবন্ত টিকা যা জীবন্ত রোগজীবাণু কিন্তু রোগ সৃষ্টি করতে অসমর্থ। এই প্রকার টিকার জীবাণুকে বিভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এমনভাবে দুর্বল করে তোলা হয় যে, উক্ত টিকায় অবস্থিত ভাইরাসের রোগ তৈরি ক্ষমতা রহিত হয়ে যায়। উপরন্তু রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। তবে এই প্রকার টিকা প্রয়োগে মৃদু প্রকৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। জীবন্ত টিকাকে আদর্শ টিকা বলা হয়। কারণ, এ থেকে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী এবং ইহা প্রয়োগের ফলে পশুপাখিতে অতিদ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। পূর্বে কখনো টিকা প্রয়োগ হয়নি শুধুমাত্র সেই সকল পশুপাখিকেই নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট লাইভ ভাইরাস ভ্যাকসিন দেয়া হয়। এই প্রকার টিকা প্রয়োগের ফলে ইম্যুনিটি যে ভাবে অতি

তাড়াতাড়ি পিক লেভেলে পৌঁছায় ঠিক তেমনি নেমেও যায় তাড়াতাড়ি। তাই এই ধরণের টিকা প্রয়োগের পর কিল্ড ভ্যাকসিন করলে লাইভ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

- মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত টিকা (killed vaccine): মৃত জীবাণু থেকে প্রস্তুত এ টিকাও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। এই ধরণের টিকায় ভাইরাস মৃত থাকে। তাই রোগ তৈরির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রকারে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে ফলে ধীরে ধীরে ইমিউনিটির সৃষ্টি হয়। ইহা মূলত লাইভ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাকে ধরে রাখে। লাইভ ভ্যাকসিনের ন্যায় এই প্রকারের ভ্যাকসিন কর্তৃক সৃষ্ট ইমুউনিটি অতি দ্রুত নেমে যায় না।

টিকাবীজ পরিবহণ: গবাদিপশু সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয় টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে খামারগুলো বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ বহন করতে হয়। এটা cool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই পশুপাখিকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

- টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ নেয়া যায়। তবে, বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।
- বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (cool room) রেখে স্থানান্তর করা হয়।
- থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে করে বেশি সময় ধরে পরিবহণের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাক্সে রাখতে হবে।
- টিকা কুলবক্সের বা ফ্লাক্সের বাইরে বের করে থইং (thawing) বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাক্সে বরফ থাকতে হবে।
- টিকার সঠিক পরিবহণের ওপর নির্ভর করে এর অপচয় ও ঘাটতি। খুব কম সময়ের জন্য টিকাবীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

টিকাবীজ সংরক্ষণ: প্রতিটি টিকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংরক্ষণ তাপমাত্রা আছে। ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত টিকা ব্যবহার করলে তা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। টিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া অনুযায়ী টিকাবীজকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. হিমশুষ্ক (freeze dried) ও খ. তরল সাসপেনশন (liquid suspension)। সাধারণত হিমশুষ্ক টিকা ২°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে এবং তরল টিকা ৪°-৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত রাখতে হয়। টিকা কোন সময়ই ডিপফ্রিজে রাখা যাবে না। রেফ্রিজারেটরে টিকা রাখার পর ফ্রিজের দরজা ঠিকমতো বন্ধ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফ্রিজের সুইচ, সকেট, প্লাগ ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা এবং ফ্রিজ ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

- প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমতো টিকাবীজ সংরক্ষণ করতে হবে। অবশ্যই রেফ্রিজারেটরের ঠান্ডা পরিবেশে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এ নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অতিরিক্ত অথবা অতি অল্প তাপমাত্রায় টিকাবীজ সংরক্ষণ করলে টিকার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- টিকাবীজ ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়সীমা থাকে। উক্ত সময়সীমার মধ্যেই টিকাবীজ ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ যতই যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হোক না কেন, এর গুণাগুণ নির্দিষ্ট সময় সীমার পর কোনক্রমেই থাকে না। তাই মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকাবীজ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা উচিত নয়।

- শুষ্ক হিমায়িত ট্যাবলেট আকারের টিকাবীজ পরিস্রুত পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। যে কোন টিকাবীজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। সাধারণত একটি টিকাবীজ এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে শেষ করতে হয়। এ সময়ের পর গুলানো টিকাবীজ কখনোই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে না। তাই ব্যবহারের পর টিকার অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করা যাবে না।

সারণি ৭.১৪ পশুপাখির টিকা সংরক্ষণের সাধরণ নিয়মাবলী।*

ক্রমিক	টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি	সংরক্ষণের মেয়াদ
১	ক্ষুরারোগ	২° থেকে ৪° সেন্টিগ্রেড	৩-৬ মাস
২	তড়কা	৪° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৩	বাদলা	৪° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৪	গলাফুলা	৪° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৫	জলাতংক	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		০° সেন্টিগ্রেড	৪৮ ঘন্টা
৬	পিপিআর	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
		২° থেকে ৮°সেন্টিগ্রেড	১ মাস
৭	বসন্ত	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		২° থেকে ৮°সেন্টিগ্রেড	১ মাস
৮	মারেক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
৯	বাচ্চা মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর+
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
		২° থেকে ৯°সেন্টিগ্রেড	৪ মাস
		থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১৫ দিন
১০	বড় মুরগির রাণীক্ষেত	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর+
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
		২° থেকে ৯°সেন্টিগ্রেড	৪ মাস
		থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	১৫ দিন
১১	ফাউল পক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৫ মাস
১২	পিজিয়ন পক্স	-২০° সেন্টিগ্রেড	১ বছর
		-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৫ মাস
১৩	হাঁস-মুরগির কলেরা	৪° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
১৪	সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড	২° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
১৫	গামবোরো	০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
১৬	ডাকপ্লেগ	-৫° থেকে ০° সেন্টিগ্রেড	৬ মাস
		৪° থেকে ৮°সেন্টিগ্রেড	১ মাস
		থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ	৭ দিন

*পশুপাখির রোগ প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নির্দেশিকা বই থেকে নেয়া হয়েছে (শাহ্জাহান ২০০৮)।

৭.৫.২ পশুপাখির টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী

- প্রতিষেধক টিকা সর্বদাই সুস্থ পশুপাখিকে প্রয়োগ করতে হবে। সংক্রামক রোগ ও কৃমিতে আক্রান্ত পশুপাখিকে দেয়া উচিত নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী পশুকে টিকা দেয়া উচিত নয়।
- চিকাবীজ সূর্যালোকের সংস্পর্শে নেয়া যাবে না। টিকাবীজ ব্যবহারের পাত্র, নিডল, সিরিঞ্জ, ডাইলুয়েন্ট ইত্যাদি পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। জীবাণুমুক্তকরণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা ঠিক নয়।
- প্রতিষেধক টিকা সকালে বা সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা উত্তম। ব্যবহারকালে টিকা মিশ্রণ ছায়াযুক্ত স্থানে বরফ পাত্রে রাখা উচিত। ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গোলানো টিকা বীজ ১ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ বা বিবর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগকালে টিকা প্রয়োগস্থান পানি দ্বারা পরিস্কার করতে হবে এবং এজন্য কখনই রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন টিকা প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে অপর টিকা ব্যবহার না করা উচিত।
- টিকাবীজ ব্যবহারের পূর্বে নিজে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত, টিকাবীজ ব্যবহারের সরঞ্জাম ফুটন্ত পানিতে জীবাণুমুক্ত করা উচিত এবং টিকাবীজ ব্যবহারের পর অতিরিক্ত বীজ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।
- টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে কুলচেইন বা ঠান্ডাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। লাইভ ভ্যাকটিন ব্যবহারের সময় নিচে কাগজ বিছিয়ে নেয়া উচিত। কাগজের উপর ভ্যাকসিন ড্রপ পড়ার পর টিকা প্রদান শেষে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।
- গামবোরো/রাণীক্ষেত ইত্যাদি রোগের প্রাথমিক টিকা প্রদানের পূর্বে ইমিউনিটি টাইট্রেশন মাত্রা পরীক্ষা করা উচিত।

৭.৫.৩ গবাদিপশুর টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি

গবাদিপশুর সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে ক্ষুরারোগ (foot and mouth disease), তড়কা (anthrax), বাদলা (black quarter), গলাফোলা (haemorrhagic septicaenia), সংক্রামক গর্ভপাত (brucellosis), জলাতঙ্ক (rabies) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ম্যাস্টাইটিস (mastitis) বা ওলানপ্রদাহ দুগ্ধবতী গাভীর একটি অতি সাধারণ রোগ। উপরোক্ত রোগগুলোর প্রতিষেধক টিকা সরকারিভাবে এদেশে তৈরি হয় এবং তা বিভিন্ন ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারিতে সরবরাহ করা হয়। কাজেই নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো গবাদিপশুকে নিয়মিত এসব সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া পশুরোগ নিবারণের সর্বোত্তম পন্থা। অবশ্য ওলানপ্রদাহের কোন প্রতিষেধক টিকা নেই। এজন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই উত্তম। আমাদের দেশে গবাদিপশুর সংক্রামক রোগের টিকা উৎপাদন করাসহ তাহা সরকারি ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

গর্ভবতী পশুকে গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে টিকা প্রদান করলে বাচ্চা যথাসময়ে কলস্ট্রাম খাওয়ার মাধ্যমে দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। বাচ্চার দেহে টিকা প্রয়োগ (actives immunization) তখনই কার্যকর হয় যখন বাচ্চার দেহে সংশ্লিষ্ট রোগের কলস্ট্রাল এন্টিবডি তেমন একটা থাকেনা। বাচ্চার দেহে কলস্ট্রাম এন্টিবডিজের সুনির্দিষ্ট অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়না তাই বাচ্চা পশুকে কমপক্ষে দু'বার টিকা প্রদান করতে হয়। কুকুর ও বিড়ালের বাচ্চাকে ২য় টিকাটি প্রায় ১৫ সপ্তাহ বয়সে এবং রোমন্থক পশুর বাচ্চাকে ৬ মাস বয়সে দেয়া উত্তম সময়। নিষ্ক্রিয় টিকায় দুর্বল ইমিউনিটি সৃষ্টি হয় তাই ৬ মাস পরপর একই টিকা প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু লাইভ ভ্যাকসিন দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সৃষ্টি করায় দুই বা তিন বছর পরপর টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সারণি ৭.২ঃ গবাদিপশুর টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি।

টিকার নাম	টিকার প্রকার	মাত্রা ও প্রয়োগবিধি	সরবরাহ বোতল	মন্তব্য
তড়কা রোগের টিকা বা Anthrax vaccine	জীবন্ত স্পোর	গরু ও মহিষ ১ মিলি এবং মেষ ও ছাগল ০.৫ মিলি করে চামড়ার নিচে; প্রতি বছর ১ বার	১০০ মিলি	৪ মাস বয়সে
বাদলা রোগের টিকা বা BQ vaccine	মৃত টিকা	বাছুর ৫ মিলি এবং ভেড়া ২ মিলি করে চামড়ার নিচে প্রতি বছর ২ বার	৩০০ এবং ১০০ মিলি	৪ মাস বয়সে
গলাফুলা রোগের টিকা বা HS vaccine	নিষ্ক্রিয়	গরু ও মহিষ- ২ মিলি করে চামড়ার নিচে; ১ম বার দেবার ৪ সপ্তাহ পর বোস্টার ডোজ দিতে হয়, এরপর প্রতি বছর ২ বার	১০০ মিলি বোতল	৬ মাস বয়স থেকে
ক্ষুরা রোগের টিকা বা FMD vaccine	ইনঅ্যাকটিভেটেড টিকা	মনোভ্যালেন্ট- ৩ মিলি, ডাইভ্যালেন্ট- ৬ মিলি ও ট্রাইভ্যালেন্ট- ৯ মিলি করে গলার চামড়ার নিচে ৪-৬ মাস পর পর ব্যবহার করা হয়	৯৬ মিলি	৪ মাসে পর থেকে
জলাতঙ্ক রোগের টিকা বা Rabies vaccine	জীবন্ত টিকা	৩ মিলি করে মাংসপেশীতে; ১ম বার দেবার ১ মাস পর বোস্টার ডোজ দিতে হয়, এরপর প্রতি বছর ১ বার	১ মাত্রা	প্রাণির বয়স ৩ মাসের উর্দ্ধে

টিকার ব্যবহার পদ্ধতি ও পরিমাণ পরিবর্তনশীল। এজন্য উৎপাদনকারী সংস্থার নির্দেশমালা অনুযায়ী যে কোন টিকা প্রয়োগ করা উচিত।

৭.৫.৪ টিকা প্রদানের পরও কেন রোগ হয়?

বিভিন্নভাবে টিকাবীজের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে টিকা প্রয়োগের পরও খামারে রোগ দেখা দেয়। তাই টিকা ব্যবহারের পরও খামারে রোগ দেখা দেয়ার কারণগুলি এখানে উল্লেখ করা হল-

- টিকার জীবাণুর সাথে মুরগির দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংবেদনশীল (immunocompetence) না হলে। যেমন- খাদ্যে আফলাটক্সিনের উপস্থিতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে। এছাড়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন পশুপাখি বংশগত কারণে প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হতে পারে।
- খামারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিধ্বংসী রোগ যেমন- গামবোরো, চিকেন এনিমিয়া, রিও ভাইরাস ইনফেকশন, ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটলে। এ রোগগুলো মুরগির রোগ প্রতিরোধ উৎপন্নকারী অঙ্গসমূহকে দুর্বল করে, ফলে মুরগি সহজেই অন্যান্য রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।
- অসুস্থ পোল্ট্রিকে টিকা প্রয়োগ করলে। যেমন পোল্ট্রির দেহে পরজীবীর আক্রমণ ও বিপাকীয় ক্রিয়ার ত্রুটি থাকলে। এতে পশুপাখির দেহে প্রোটিন সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায় ফলে টিকা ভালভাবে কার্যকর হয় না। অত্যধিক পরজীবী আক্রমণে পশুর দেহে প্রোটিন সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। এসব পশুতে টিকা ভালভাবে কার্যকর হয়না।
- নির্দেশমত টিকা সংরক্ষণ, স্থানান্তর ও প্রয়োগ না হলে। টিকা প্রয়োগের যন্ত্রপাতি কোন রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিষ্কার করলে। মৃত টিকা বীজ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা পর্যাপ্ত প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারেনা।
- বয়সের সাথে সম্পৃক্ত না রেখে টিকাবীজ প্রয়োগ করলে এবং যে রোগের টিকা দেয়া হয় পশুপাখি যদি সেই রোগে আক্রান্ত হয়। সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ না করলে এবং ব্যবহৃত টিকাবীজের জীবাণু স্ট্রেইন ও আক্রান্ত জীবাণুর স্ট্রেইনের পার্থক্য হলে।
- টিকাবীজ খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে এবং টিকা ব্যবহারের যন্ত্রপাতির গায়ে জীবাণু লেগে থাকলে।
- নিম্ন গুণগতমানের টিকা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকা পর্যাপ্ত প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না।
- প্লাসেন্টা বা প্রসবকালীন দুধের মাধ্যমে বাচ্চায় প্রাপ্ত এন্টিবডি টিকার কার্যকারিতায় বাধা দেয়।
- জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত না করা এবং টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।

বিভিন্নভাবে টিকার গুণাগুণ পরীক্ষা করা যায়, তবে এ জন্য মাঠ পর্যায় ও ল্যাবরেটরি উভয় স্থানেরই প্রয়োজন হয়। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত ভ্যাকসিন কতটুকু ইমুউনিটি সৃষ্টি হবে তা ল্যাবরেটরি টেষ্ট করিয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করা যায়। আবার টিকাসমূহ ল্যাবরেটরি এনিমেলে/মাঠ পর্যায়ে পশুপাখিতে প্রয়োগ করার পর উহার রক্ত/সিরাম পরীক্ষা করে টিকার গুণগত মান নির্ণয় করা সম্ভব। এ জন্য HA Test, HI Test, ELISA Test এবং AG Test পরীক্ষা করা যায়।

৭.৬ সংক্রামক রোগ দেখা দিলে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সমূহ

কোন এলাকায় সংক্রামক রোগ দেখা দিলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে-

পৃথকীকরণ: খামারে বা কোন বাড়িতে রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত প্রাণী পৃথক করতে হবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাণির কাজ কর্ম করার জন্য যদি একজন লোকই থাকে তবে প্রথমে সুস্থ প্রাণির কাজ কর্ম ও খাদ্য প্রদান করে অসুস্থ বা আক্রান্ত প্রাণির সেবা করতে হবে। যদি কোন প্রাণী রোগাক্রান্ত বলে সন্দেহ হয় তাকে পৃথক করে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

আক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা অথবা নির্মূল করণ: যে সকল রোগের চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যায় সে সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে, কিন্তু যে রোগের চিকিৎসা করলেও পরিপূর্ণভাবে ভাল হয় না এবং রোগের বাহক হিসাবে প্রাণিটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব প্রাণিকে জবাই করে মৃতদেহ পুঁড়িয়ে অথবা মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।

রোগাক্রান্ত এলাকার প্রাণী বিক্রয় না করা: রোগ দেখা দিলেই অনেক লোকের মধ্যে রোগাক্রান্ত পশুপাখি বাজারে বিক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়, এর ফলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ প্রবণতা অবশ্যই রোধ করতে হবে। রোগাক্রান্ত এলাকার পশুপাখি যেন বাজারে বা রাস্তায় বের না হতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

রোগাক্রান্ত প্রাণী ও তার পরিচর্যা: রোগাক্রান্ত প্রাণির সেবা বা আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা ভিন্ন লোক দ্বারা করানোই ভাল। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের সমস্ত কিছু পৃথক থাকতে হবে এবং তা সুস্থ প্রাণির ঘরে কখনই আনা যাবে না। রোগাক্রান্ত প্রাণির ঘরের ময়লা, আবর্জনা, খড়-কুটা সবই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম না হলে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে। প্রতিদিন ঘরে সুবিধাজনক কোন জীবাণুনাশক যেমন-স্যাভলন, আইওসান, ফিনাইল বা ডেটল ব্যবহার করতে হবে।

মৃত দেহের সৎকার: সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণী মারা গেলে তার দেহে প্রচুর পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রোগের জীবাণু থাকে। রোগে মরা প্রাণির মৃতদেহ পুঁড়িয়ে ফেলাই উত্তম। তবে পুঁড়িয়ে ফেলা সম্ভব না হলে অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। মৃত প্রাণির ঘরের সকল আসবাবপত্র সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কিছু এমনকি ঘরের দেওয়াল, বেড়া, সিলিং, সব কিছু জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং এই ঘরে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন সুস্থ প্রাণী না তুলে কমপক্ষে ২-৩ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। মৃত প্রাণী ঘর থেকে বের করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রাণির দেহ থেকে কোন পদার্থ না পড়ে। এই সকল পদার্থে প্রচুর জীবাণু থাকে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত মৃত প্রাণির চামড়া ছাড়ানো যাবে না। মৃত দেহ মাটিতে পোঁতার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন কুকুর, শেয়াল বা অন্য কোন বন্য জন্তু তা তুলে না ফেলে। মাটি চাপা দেওয়ার আগে মৃত দেহের উপর চুন, সোডা অথবা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়।

প্রচার: সংক্রামক রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এলাকার জন সাধারণকে সে রোগ সম্পর্কে সচেতন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য ঢোল, মাইক, প্রয়োজনে পত্র-পত্রিকায়, বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপরোল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে নিম্নোক্ত নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন-

- পশুপাখির আমদানি ও রপ্তানি এবং ঔষধ ও ভ্যাকসিন নীতিমালা প্রণয়ন ও সঠিক বাস্তবায়ন।
- প্রণীত কোয়ারেন্টাইন নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন যেমন- জৈবনিরাপত্তা জোরদার, টিকা প্রদান, পুষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি।
- আধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশল ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের উন্নতি সাধন।
- প্রচলিত ভেটেরিনারি সার্ভিসের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।
- গণ সচেতনতা সৃষ্টি, খামারিদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ।

৭.৭ প্রাণিরোগ ব্যবস্থাপনায় সার্ভিলেন্স কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়ন

প্রাণিরোগ ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে সচারচর প্রথমেই আলোচনায় আসে চিকিৎসার বিষয়টি- যদিও সার্বিক বিবেচনায় প্রাণির চিকিৎসা এক্ষেত্রে একটি গৌণ উপাদান। কেবলমাত্র চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ দমনের চেষ্টা অনেকটা উৎসের সন্ধান না করে আগুনের শিখায় পানি ঢেলে অগ্নি-নির্বাপন প্রচেষ্টার মতোই পন্ডশ্রম। যে কোন রোগকে সার্থকভাবে দীর্ঘমেয়াদে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের জানা দরকার অনেকগুলো বিষয় যেমন- রোগটির উৎস, সংবেদনশীল প্রাণী, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক সংবেদনশীলতা (susceptibility), রোগ বিস্তারের প্রকৃতি (mode of transmission), ঋতু/ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক সংবেদনশীলতা, বাহক (carrier), ভৌগলিক বিস্তার, রোগ বিস্তার (outbreak) কালীন সময় ভিন্ন অন্য সময়ে রোগজীবাণুর অবস্থান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়। বিষয়গুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকতে পারে একাধিক সম্ভাবনা। তাই প্রতিটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করে জানা দরকার সম্ভাবনার কোন ধারাটি ক্রিয়াশীল। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভৌগলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এ সকল অনুঘটক গুলোর (factors) বাস্তব অবস্থান জানাটা খুবই জরুরি।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়গুলো বেশ জটিল এবং আমাদের সীমিত সম্পদ ও সামর্থে বাস্তবায়নযোগ্য নয় বলে মনে হতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বিভাগীয় জনসম্পদের সমসাময়িক চাহিদানুযায়ী পূর্ণবিন্যাস, নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং এবং সহযোগী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট সহযোগিতার মাধ্যমে অবশ্যই এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জিত হতে পারে। জাতীয় স্বার্থে তো বটেই, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও আমাদের পশুপাখির রোগ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন একান্তই জরুরি। বিশ্বের অন্যান্য অধিকাংশ দেশের মতো আমাদের দেশকে 'রিন্ডারপেষ্ট' রোগমুক্ত ঘোষণা করা কিংবা ছাগলের মরণঘাতী পিপিআর রোগের মোকাবেলায় আঞ্চলিক সমন্বয় ও সহযোগিতায় কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। যে পদ্ধতিগত disease surveillance এর ক্ষেত্রে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত বা নেপাল যখন যথেষ্ট এগিয়ে গেছে আমাদের অবস্থান সেখানে বলতে গেলে আতুড় ঘরেই। বিভিন্ন সংক্রামক রোগের তথ্যাদি নিয়মিত উপজেলা পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রেরণ ও প্রক্রিয়াকরণের যে পদ্ধতি বর্তমানে ক্রিয়াশীল তা নিতান্তই দায়সারা গোছের। এর মাধ্যমে কোন রোগের বিস্তার সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য যথাসময়ে অবহিত হওয়া যায় না, ফলে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণও সম্ভব হয় না। এর অন্যতম কারণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সীমিত জনবল যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না। এছাড়া গবেষণাগারের মাধ্যমে দ্রুত রোগ নির্ণয় নেটওয়ার্ক কিংবা সচেতনভাবে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসও যথার্থভাবে ক্রিয়াশীল নয়। এর ফলে বাংলাদেশের বর্তমান বিভিন্ন সংক্রামক ও অন্যান্য রোগের প্রকৃতি, ভৌগলিক বিস্তার, সংঘটনের ধারা, ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ, গৃহীত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত কিংবা সংরক্ষিত হয় না। এ সংক্রান্ত কোন বুলেটিনও কোন তরফ থেকেই প্রকাশিত হয় না। ফলে রোগ নিয়ন্ত্রণের যে কোন পরিকল্পনা অনুমান নির্ভর তথ্যের ভিত্তিতেই করতে হয়। নির্ভরযোগ্য, সার্বিক এবং সঠিক তথ্যের অভাবে অনেক বড় সমস্যাই রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকষর্ণে ব্যর্থ হয়।

যথাযথ রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন একটি পরিকল্পিত সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম। সার্ভিলেন্স প্রোগ্রাম কিভাবে রোগ ব্যবস্থাপনার সহায়ক হতে পারি মোটা দাগে তার জবাব পাওয়া যেতে পারে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে। জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসতে পারে জাতীয় পশুরোগ ব্যবস্থাপনার রুপরেখা।

- কোন নির্দিষ্ট রোগ ব্যবস্থাপনায় কোন কোন তথ্য জানা প্রয়োজন?
- তথ্য বা ডাটা কে সংগ্রহ করবে?
- ডাটা সংগ্রহের প্রক্রিয়া কি হবে?
- ডাটা কিভাবে যথাযোগ্য স্থানে প্রেরিত হবে?
- সংগৃহীত ডাটা সমূহ কে প্রক্রিয়াকরণ করবে?
- প্রক্রিয়াতে ফল কিভাবে যথাযোগ্য স্থানে প্রেরণ করা হবে?

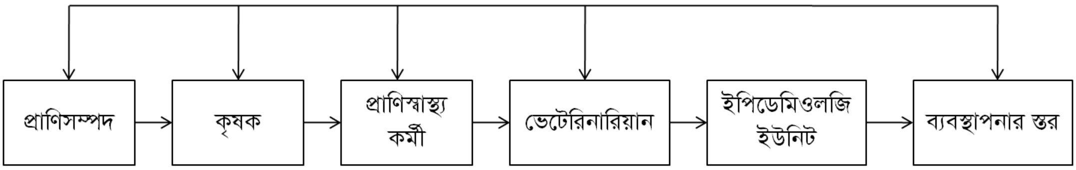

চিত্র ৭.৪ঃ সার্ভিল্যান্স এবং প্রাণিসম্পদের রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য প্রবাহ।

কোন নির্দিষ্ট রোগ ব্যবস্থাপনায় কোন কোন তথ্য প্রয়োজন? এটি এই সার্বিক কার্যক্রমের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক সময় এমন অনেক তথ্য বা ডাটা সংগ্রহের জন্য বলা হয়, নির্দিষ্ট ভাবে যা সংগ্রহ করা হয়তো সম্ভব নয় অথবা যা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার এমন কিছু তথ্য হয়তো বাদ পড়ে যায় যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে কোন একটি বিষয়ে সার্বিক ডাটা-ছক প্রণয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা হল সরেজমিন পর্যায় থেকে এভাবে সাধারণ তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের সুনির্দিষ্ট ডায়াগনোসিসের জন্য নিয়মিত উপজেলা পর্যায় থেকে রোগ নির্ণয়কারী আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে নমুনা প্রেরণের প্রয়োজন। আমাদের আঞ্চলিক প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (FDIL) গুলো এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও যথাযথ ভাবে কাজ করছে না। কারণ উপজেলা পর্যায় থেকে গবেষণাগারে নমুণা প্রেরণের জন্য যে সকল সুবিধা এবং অর্থায়ন প্রয়োজন, তার কোন ব্যবস্থা কোথাও নেই। দেশব্যাপী গবেষণাগার ভিত্তিক রোগ নির্ণয়, রিপোর্টিং, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রকাশনারও একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল নেটওয়ার্ক আধুনিক রোগ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অঙ্গ।

- তথ্য সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- ঐ উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব বাহুল্য বর্জিত ছক প্রণয়ন করা।
- গ্রুপ ডিসকাশন বা কর্মশালার মাধ্যমে ঐ ছক প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা।
- বিভিন্ন ভৌগলিক ক্ষেত্রে ঐ ছক সরেজমিনে পূরণের মাধ্যমে ফিল্ড ট্রায়াল করা ও প্রক্রিয়াকরণ।
- ফিল্ড ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে ছক পুনঃনির্ধারন ও সরেজমিন পর্যায়ে প্রয়োগ।
- সময়ে সময়ে এই ছকের উপযোগীতা পুনঃমূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনঃনির্ধারন।

তথ্য বা ডাটা কিভাবে সংগ্রহ করবে? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহের মতো পর্যাপ্ত জনবল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নেই। বর্তমানে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন রোগ সম্পর্কিত যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয় তাতে জাতীয় চিত্র প্রতিফলিত হয় না। ফলে বিভিন্ন রোগ বা অন্যান্য সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে নীতি নির্ধারকদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে যা করা সম্ভব তা হল- যেহেতু জনবল বৃদ্ধির বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর, তথ্য সংগ্রহের কাজে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সহায়তা নেয়া, ওয়ার্ড মেম্বারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পশুপাখির রোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া যেতে পারে। এ কাজে মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। রোগ সম্বলিত পুস্তিকা ব্যাপকভাবে বিতরণ এবং রেডিও-টিভির মতো গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনার মাধ্যমে গবাদিপশুর যে কোন রোগ সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারনকে প্রাণিসম্পদ দপ্তর অথবা ইউনিয়ন পরিষদে জানানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা ত্বরান্বিত করার জন্য প্রশাসন এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেয় যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করার পাশাপাশি বিভাগীয় বর্তমান তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকতে পারে। এতে করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটা যৌক্তিক অবস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

তথ্য প্রেরণ: উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় পূর্বক দ্রুত জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরণ করা প্রয়োজন। দ্রুত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হলে জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়কে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং ইন্টারনেট নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বয় পূর্বক

কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ অনেক সহজ হতে পারে। অন্যথায় জেলা ভিত্তিক সমন্বিত প্রতিবেদন একই সাথে বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করা যেতে পারে। অনুরুপভাবে বিভাগ থেকে এ সমন্বিত প্রতিবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়সীমার বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন।

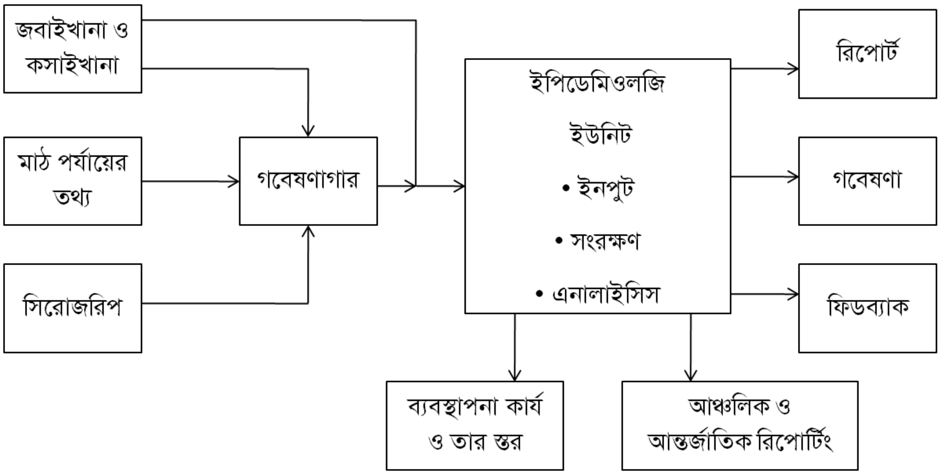

চিত্র ৭.৫ঃ কমপ্লেক্স পদ্ধতিতে সার্ভিল্যান্স এর জন্য তথ্য প্রবাহ।

তথ্য বা ডাটা প্রক্রিয়াকরণ: প্রক্রিয়াকরণ ভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টি তাই অতীব জরুরি। কেন্দ্র এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ডাটাবেজ স্থাপন এবং দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এ কাজ সহজেই করা যেতে পারে।

প্রক্রিয়াজত ফল যথাযথ স্থানে প্রেরণ: তথ্য প্রক্রিয়াজত ফল যথাসময়ে নীতি নির্ধারক এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রেরণ খুবই জরুরি। এছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাতেও এ ধরণের রিপোর্ট অধিদপ্তরকে নিয়মিত প্রেরণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে মাসিক বুলেটিন এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল প্রকাশের বিষয়টি ভাবা যায়।

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় রোগ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী এবং উক্ত তথ্যজাত সিদ্ধান্ত সমূহ জানা থাকলেই কেবল বিভিন্ন মরণঘাতী রোগ সম্পর্কে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা প্রাপ্তিতে সহজ হয়। পার্শ্ববর্তী ভারত বা নেপাল এমনকি ভূটানও এক্ষেত্রে আমাদের চাইতে বেশ এগিয়ে আছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় উপরে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের কেন্দ্রীয় এবং অন্ততঃপক্ষে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত দক্ষ এবং সৃজনশীল কর্মকর্তা সমন্বয়ে ইপিডেমিওলজি সেল গঠন করা প্রয়োজন। একটি সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো ও দক্ষতা উন্নয়ন, ফলোআপ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের সঠিক প্রক্রিয়া। আর বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় তার অগ্রাধিকার নিরুপন, নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ, সঠিক সময় এবং স্থানে সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কেবলমাত্র আমরা যথাযথভাবে অগ্রসর হতে পারি। এছাড়া বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে রোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার মোকাবেলায় প্রয়োজন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। কিন্তু বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর না হলে এ সহযোগিতাও পাওয়া কঠিন। তাই সার্বিক বিবেচনায় প্রাণিরোগ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন আজ একান্তই সময়ের দাবী। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে আর বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অলস প্রহরে দিবাস্বপ্নে কালক্ষেপনের অবকাশ একেবারেই নেই। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তার বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে।

অধ্যায় ৮

ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন

আজ থেকে প্রায় ১১,০০০ বছর আগে ছাগল ও ভেড়াকে মানুষ পোষ মানায়। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কৃষিকাজ করার পূর্বেই ছাগল ও ভেড়া পালন শুরু করেছিল। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান ইরান, ইরাক, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, ফার্টাইল ক্রিসেন্ট এলাকা জুড়ে প্রথমে ছাগল ও ভেড়া পালন শুরু হয়। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। দরিদ্ররা সাধারণত অধিকাংশ গ্রামে বাস করে। তাদের অধিকাংশের কাছে গরু বা মহিষ কেনার মত অধিক পুঁজি নেই। কিন্তু স্বল্প পুঁজি ব্যয়ে তারা সহজেই ছাগল ও ভেড়া কিনতে পারে এবং তা পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করতে পারে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ছাগলের সংখ্যা ২ কোটি ৫৭ লক্ষ এবং ভেড়ার সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য)। ফলত সারাদেশে গড়ে উঠেছে ছোট বড় অনেক ছাগল ও ভেড়ার খামার। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে ছাগল ও ভেড়া পালনের গুরুত্ব অত্যাধিক।

সারণি ৮.১ঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে ছাগল ও ভেড়ার পরিসংখ্যান (লক্ষ সংখ্যা)*

ক্রমিক	বছর	ছাগলের সংখ্যা (লক্ষ)	ভেড়ার সংখ্যা (লক্ষ)	মোট সংখ্যা (লক্ষ)
১	২০০৪-০৫	১৯১.৬০	২৪.৭০	২১৬.৩০
২	২০০৫-০৬	১৯৯.৪০	২৫.৭০	২২৫.১০
৩	২০০৬-০৭	২০৭.৫০	২৬.৮০	২৩৪.৩০
৪	২০০৭-০৮	২১৫.৬০	২৭.৮০	২৪৩.৪০
৫	২০০৮-০৯	২২৪.০১	২৮.৭৭	২৫২.৭৮
৬	২০০৯-১০	২৩২.৭৫	২৯.৭৭	২৬২.৫২
৭	২০১০-১১	২৪১.৪৯	৩০.০২	২৭১.৫১
৮	২০১১-১২	২৫১.১৬	৩০.৮২	২৮১.৯৮
৯	২০১২-১৩	২৫২.৭৭	৩১.৪৩	২৮৪.২০
১০	২০১৩-১৪	২৫৪.৩৯	৩২.০৬	২৮৬.৪৫
১১	২০১৪-১৫	২৫৬.০২	৩২.৭০	২৮৮.৭২
১২	২০১৫-১৬	২৫৭.৬৬	৩৩.৩৫	২৯১.০১

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য।

৮.১ ছাগল ও ভেড়ার জাত

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল দেখা যায়। ছাগল পালন এদেশে খুবই পুরানো রেওয়াজ। ব্ল্যাক বেঙ্গল নামক ছাগল এদেশের খুবই পরিচিত জাত। এ জাতের ছাগল এদেশের জলবায়ুতে বসবাসের খুবই উপযোগী। এরা অল্প বয়সে গর্ভবতী হয় এবং ছয় মাস অন্তর অন্তর বাচ্চা প্রসব করে, এবং এক সাথে একাধিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। বাংলাদেশে যেখানে পশুখাদ্যের খুব অভাব, সেখানে কম খাবারে মাংস উৎপাদনের জন্য ছাগল একটি উৎকৃষ্ট প্রাণী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক দেশী জাতের ভেড়া দেখা যায়। ভেড়া দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে ভালবাসে। ছাগলের তুলনায় বাংলাদেশে ভেড়ার সংখ্যা কম। এদেশের ভেড়া আকারে ছোট ও বিভিন্ন রংয়ের হয়। এরা কম উৎপাদনশীল জাত। পৃথিবীর কোন কোন দেশে ভেড়া পালনের প্রধান উদ্দেশ্যে হল উহা হতে পশম সংগ্রহ করা। তবে এদেশে ভেড়া মাংসের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। চার ধরণের বন্য ভেড়া থেকে বর্তমান ভেড়ার উদ্ভব হয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা (বিএলআরআই ২০০৪)।

ছাগলের জাত

উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছাগলের জাতকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়। তবে বাংলাদেশে সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ও যমুনাপারী জাতের ছাগল দেখা যায়। তাই নিম্নে ব্ল্যাক বেঙ্গল ও যমুনাপারী নামক দুটি জাত সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-
১। দুধ উৎপাদনকারী জাত: স্যানিন, এ্যাংলো, নুবিয়ান, ব্রিটিশ এলপাইন, যমুনাপারী, বারবারী।
২। মাংস উৎপাদনকারী জাত: ব্ল্যাক বেঙ্গল, বোয়ার, যমুনাপারী, ফিজিয়ান, কেম্বিং কেটজ।
৩। চামড়া উৎপাদনকারী জাত: মুবেনডি, ব্ল্যাক বেঙ্গল।

ব্ল্যাক বেঙ্গল: এটি বাংলাদেশের কালো ছাগল নামে পরিচিত এবং দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। এর শরীর খাটো এবং নরম কালো লোম দ্বারা আবৃত। এর কানগুলো সাধারণত উপর দিকে খাড়া থাকে। শিং কালো এবং ২-৩ ইঞ্চি লম্বা হয়। অল্প বয়সে গর্ভবতী হয় এবং ছয় মাস পর পর বাচ্চা দেয়। এজাতের খাসির মাংস অতি উৎকৃষ্ট। এ জাতীয় ছাগলের চামড়া মসৃণ ও মোলায়েম হয় এবং বয়স্ক ছাগলের সাদা বা ধূসর বর্ণের দাড়ি থাকে।

যমুনাপারী: গঙ্গা, যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এ ছাগলের উৎপত্তিস্থল। ভারতে এ ছাগল বেশি দেখা যায় তবে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এ ছাগল নজরে পরে। দীর্ঘকায়, দীর্ঘ পদবিশিষ্ট ভারতীয় এ ছাগল ধূসর বাদামী, কখনো কালো তামাটে বা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে। এদের শিং চ্যাপ্টা ও খাটো এবং প্রায় ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা ঝুলন্ত কান বহন করে। এ জাতীয় ছাগলের দু'উরুর মাঝে লম্বা তুলতুলে অধিক পরিমাণে লোম থাকে। এ জাতের ছাগল দৈনিক ২.৩ লিটার দুধ দেয়।

ভেড়ার জাত

ভেড়ার জাতকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা- ১) মাংস বা পশম উৎপাদনের হারের উপর ভিত্তি করে; ২) মুখের রংয়ের উপর (সাদা বা লাল) ভিত্তি করে; ৩) শিং এর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে; ৪) উৎপত্তি অনুযায়ী এলাকার উপর (উঁচু ভূমি, পর্বত, নিম্নভূমি) ভিত্তি করে; এবং ৫। পশমের বিভিন্নতা অনুসারে। উপমহাদেশে যে সকল জাতের ভেড়া দেখা যায় সেগুলো হল বিবরিক, ওয়াজিরি, কাগনি, লোহি, হারনাই, দামানি, ইত্যাদি। লোমের জন্য বিখ্যাত এমন দুটি জাত সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হল।

মেরিনো: এ জাতীয় ভেড়ার উৎপত্তিস্থল স্পেন দেশে। এদের মুখ ও পা সাদা, কান ও পায়ের গোড়ালীতে লালচে বাদামী রংএর দাগ দেখা যায়। এদের পা এবং মাথার বেশির ভাগই পশম দ্বারা আবৃত। চামড়ার গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে মেরিনোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- এ-টাইপ (মোটা জাত। ভেড়ার মাথা হতে লেজের গোড়া পর্যন্ত কোকড়ানো পশমে আবৃত থাকে); বি-টাইপ (ঘাড়ের পশম ব্যতীত সমস্ত শরীর অপেক্ষাকৃত কম পশমে আবৃত থাকে) এবং সি-টাইপ (চামড়া গোলাপী রং এর। পশম তুলনামূলকভাবে মসৃণ। মাংসের মান অন্য দু'জাতের তুলনায় উত্তম)।

রোমনী নার্স: ইংল্যান্ডের রোমনী নার্স অঞ্চলে এদের উৎপত্তিস্থল। এরা সবচেয়ে ছোট জাতের ভেড়া। এদের পা ছোট ও সাদা। মুখ সাদা এবং কপালে এক গুচ্ছ পশম থাকে। এদের শিং নেই।

৮.২ বাংলাদেশে ছাগল পালনের গুরুত্ব

ছাগল পালন অত্যন্ত লাভজনক পেশা। এতে পুঁজি কম লাগে। গ্রামে-গঞ্জে বেকার, ভূমিহীন, বঞ্চিত দরিদ্র মহিলা এবং ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক ছাগল পালনের মাধ্যমে সংসারে বাড়তি আয়ের যোগদান দিতে পারে এবং দারিদ্রের অভিশাপ হতে সহজেই রক্ষা পেতে পারে। এছাড়াও অংখ্য বেকার যুবক স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকারে ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারে এবং সেই সাথে দেশের পুষ্টির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ছাগল পালন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। ছাগল আকারে ছোট বলে জায়গা কম লাগে। এরা বিরীহ বলে ছোট

ছোট ছেলেমেয়েরাও পালন করতে পারে। গরু এবং মহিষের তুলনায় এদের খাদ্য খরচ কম লাগে। ছাগলের খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা গরু-মহিষের তুলনায় অনেক বেশি। এরা খাদ্যকে অধিক দক্ষতার সাথে মাংস, দুধ ও বাচ্চা উৎপাদনে কাজে লাগাতে পারে। এরা স্বল্প মূল্যের খাদ্য যেমন- লতাপাতা, কাঠাল পাতা, ঘাস ইত্যাদি খেয়ে সহজেই জীবন ধারণ করতে পারে। গরু-মহিষের তুলনায় এদের রোগব্যাধি কম হয়। ফলে চিকিৎসা ও মৃত্যুজনিত লোকসান কম হয়। ফলত এদেশের দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষ স্বল্প পুঁজিতে ও বসতবাড়িতে সহজেই পারিবারিক ছাগল খামার গড়ে তুলতে সক্ষম। যথাযথ প্রযুক্তি, সুষম খাদ্য ও প্রতিপালন ব্যবস্থায় এসকল ছাগলের চাষাবাদ/খামার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে শুধু যে দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবার তাদের দারিদ্র অবস্থা থেকেই মুক্তি পাবে তাই নয় দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি ও রপ্তানি আয়ের বিরাট অবদান রাখবে।

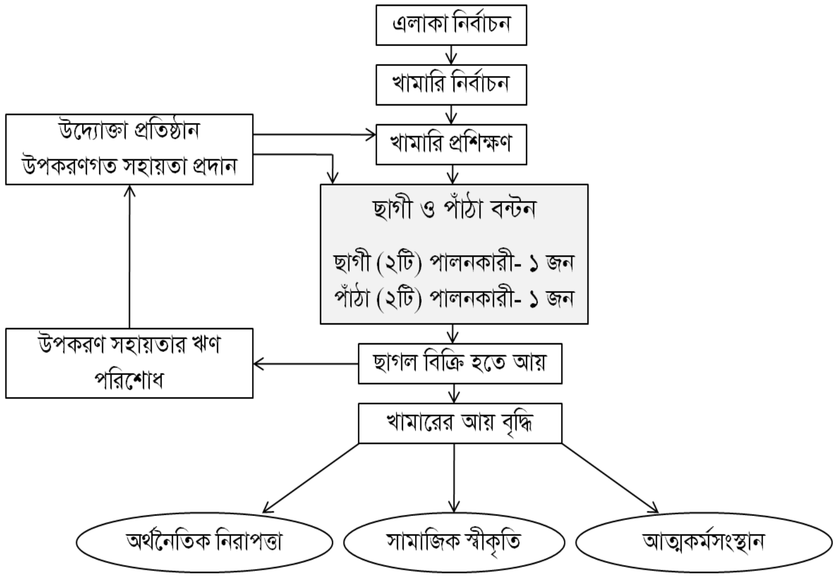

চিত্র ৮.১ঃ দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন পদ্ধতি। এই চিত্রটি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ‘পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা’ বই থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৮)

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সমস্যা উন্নত জাতের পশুপাখির অভাব। সৌভাগ্যবশত এদেশের কালো ছাগল অর্থাৎ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পৃথিবীর অন্যান্য জাতের ছাগলের চেয়ে উন্নত। এর প্রজনন ক্ষমতা এবং মাংস, দুধ ও চামড়া মানের দিক থেকে অনেক উন্নত এবং পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। এই ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের তুলনায় বেশি। ৬-৭ মাস বয়সেই এরা প্রজননের উপযোগী হয়ে উঠে এবং মাত্র এক বছর বয়সেই প্রথমে বাচ্চা দেয়। এরা বৎসরে দুই বার এবং প্রতিবারে ২ থেকে ৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে যেখানে অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগল দুই বছরে ২-৩ টি বাচ্চা দিয়ে থাকে। এই ছাগলের মাংস অত্যন্ত উন্নতমানের, মোলায়েম, সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত এবং বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। এজন্যে এই মাংস আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দামী। বাজারে এই মাংসের চাহিদা গরু, মহিষ ও মুরগির তুলনায় সবসময়ই বেশি। ছাগলের দুধ গরু ও মহিষের দুধের তুলনায় সহজে হজম হয়। এই দুধের চর্বিকণা ছোট ও সহজপাচ্য তাই, এই দুধ রোগীদের (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়ারেটিস, হৃদরোগসহ) জন্য পথ্য ও শিশুদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। এদেশের মোট মাংস ও দুধ উৎপাদনের প্রায় ২৩ শতাংশ মাংস এবং ৪.২ শতাংশ দুধ আসে ছাগল থেকে যার উৎপাদন প্রায় ১.৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ০.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া গেলে এর পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্ণিত আর্থিক যোগান ছাড়াও পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালনের ফলে দরিদ্র ও দুঃস্থ শিশুরা যৎসামান্য হলেও ছাগ দুগ্ধ পান করার সুযোগ পাওয়ায় অপুষ্টিজনিত রোগ, যক্ষা, রাতকানা, হাফানী ইত্যাদি ঘাতক ব্যাধি থেকে অনেকখানি রক্ষা পাচ্ছে। কারণ ছাগ

দুগ্ধে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'এ' ও যক্ষা নিরোধক গুণাবলী রয়েছে। এই ছাগলের চামড়ার গুণগতমান অতি উন্নত এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এই চামড়ার সারবস্তু এবং দানাদার অংশ (grain layer) অত্যন্ত বেশি এবং তন্তু (fiber) অত্যন্ত ঘনভাবে সন্নিবেশিত থাকে এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়। এই চামড়া যে কোন আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং আর্দ্র জলবায়ু এমনকি পানিতেও সহজে নষ্ট হয় না। এসব কারণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়র চাহিদা বিশ্ববাজারে অত্যন্ত বেশি। এজন্য ছাগলের চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুতরাং দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে ছাগল পালনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৮.৩ বাংলাদেশে ছাগল পালনের সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

বাংলাদেশে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খোলামেলা পরিবেশে ঘাস লতাপাতা চড়ে খেতে পছন্দ করে। আমাদের দেশের ছাগল থেকে গড়ে প্রতিদিন ৩০০-৩৫০ মিলি দুধ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগল থেকে প্রায় ১০-১২ কেজি মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অনাবাদি ও পতিত জমি হ্রাস পাওয়ায় সে সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। ফলত খাদ্য সংকট, অপুষ্টিজনিত কারণে ও অসুখ বিসুখে প্রায় প্রতি বছর ২৩% ছাগল মারা যাচ্ছে এবং এসবের উৎপাদনশীলতাও কমে যাচ্ছে। পতিত জমির সংকটের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) ছাগল পালনে সেমিইনটেনসিভ/ ষ্টল ফিডিং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং বিএলআরআই এর গবেষণায় দেখা গেছে এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যথাযথভাবে প্রতিপালন, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা গেলে প্রতিটি ছাগীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৮০০ মিলি থেকে ১২০০ মিলি এ উন্নীত করা সম্ভব। এছাড়াও ৬ মাস বয়সেই একটি ছাগল থেকে ১৫-১৬ কেজি মাংস উৎপাদন সম্ভব। ছাগল পালন একটি সহজ এবং অত্যন্ত লাভজনক পেশা হলেও আমাদের দেশে এই পেশায় বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান রয়েছে। এসকল সমস্যা সমাধানে দেশের সরকার ও জনগণ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এদেশে ছাগল পালনের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল হতে পারে। নিম্নে প্রধান প্রধান সমস্যা এবং এর সমাধান সম্বন্ধে আলোকপাত করা হল-

ছাগল পালন সম্বন্ধে কৃষকের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব: গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র ও বেকার জনমানুষ ছাগল পালন, ছাগলের খাদ্য, প্রজনন, যত্ন ও ব্যবস্থাপনা, রোগ দমন ও অধিক লাভ পাওয়ার উপায় ও কৌশল সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। ফলে ছাগল পালনে তারা যুগ যুগ ধরে মান্ধাত্বার আমলের ব্যবস্থাপনা দিয়ে আসছে। ফলে এদেশের ছাগলগুলো পর্যাপ্ত উৎপাদন দিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং অসংখ্য প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে হাড্ডিসার শরীর নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে কৃষককে শুধুই শান্তনা দানের জন্য। এই সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য আমাদের কৃষকদেরকে যথাযথ জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বিষয়ের সিলেবাসে ছাগল পালন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান সমৃদ্ধ অধ্যায় সংযোজন করতে হবে যাতে করে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ছাগল পালন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সেই সাথে প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকদেরকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে ছাগল পালনে দক্ষতা দান করতে হবে।

পুঁজির অভাব: বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এমতাবস্থায় ছাগল পালনের জন্য নূন্যতম পুঁজি তারা বিনিয়োগ করতে পারে না। তাছাড়া আমাদের অসংখ্য বেকার যুবকগণ যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির অভাবে ক্ষুদ্রায়তনে খামার গড়ে তুলতে পারে না। ফলে দেশে ছাগলের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে অধিক লাভ হতে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতা নিয়ে।

খাদ্য সমস্যা: যেখানে মানুষের খাদ্যের অভাব সেখানে ছাগলের খাদ্যের কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা একবার ভাবতেই চাই না যে, আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে ছাগল কত বড় ভূমিকা পালন করছে। ফলে ছাগলের খাদ্য তালিকায় গম, ভূট্রা, খৈল, কূঁড়া, ভূষি আমরা বরাদ্দ করতে চাই না। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও,

টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে ছাগলের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ কাজে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নেতৃত্বদান করা উচিত।

বাসস্থান সমস্যা: ছাগল পালনে কৃষকদের জ্ঞানের অভাবে তারা জানে না কেমন বাসস্থান ছাগলের জন্য আরামদায়ক এবং পছন্দনীয়। ফলে অপরিকল্পিত বাসস্থানে ছাগল পালনের জন্য ছাগল নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং এর চিকিৎসার জন্য কৃষকের যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ অপচয় হয়। সুতরাং কৃষক যাতে স্বল্প ব্যয়ে ছাগলের পছন্দনীয় এবং রোগমুক্ত বাসস্থান নির্মাণ করতে পারে সেজন্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রজনন সমস্যা: আমাদের দেশে খাসির মাংসের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বাজারে এই মাংসের দাম অত্যন্ত চড়া। ফলে কৃষকগণ অধিক মুনাফা লাভের আশায় পুরুষ বাচ্চাগুলোকে অল্প বয়সে খাসি করার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে দিন দিন পাঁঠার সংখ্যা কমে যাচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম হেটেও বর্তমানে একটি পাঁঠার সন্ধান মিলে না। ফলে কৃষকগণ ছাগীকে প্রজনন করতে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং পাঁঠা পালনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে।

বাজারজাতকরণের সমস্যা: দরিদ্র কৃষকগণ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ছাগল উৎপাদন করে কিন্তু সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার অভাবে মধ্যস্বত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীরা সমস্ত মুনাফা শুষে নিচ্ছে এবং উৎপাদনকারীরা প্রকৃত মুনাফা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তারা দিন দিন ছাগল পালনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এমতাবস্থায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ছাগল লাভজনক মূল্যে বিক্রি করতে পারে।

রোগব্যাধিজনিত সমস্যা: ছাগল পালনে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং রোগ দমনের কার্যকরী পন্থা অবলম্বন না করার ফলে এবং সর্বোপরি পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিনের সরবরাহ না থাকায় প্রায়শঃই ছাগল রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে কৃষক বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অবস্থায় ছাগলের রোগ দমনের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন সরবরাহে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে আরও তৎপর হওয়া বাঞ্ছণীয়।

মর্যাদার সমস্যা: আমাদের সমাজে ছাগল পালন একটি নীচ পেশা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আসছে। ব্রিটিশদের শেখানো এই হীন মনোভাব আমাদের মন থেকে এখনও বিদায় নেয়নি। একবিংশ শতাব্দীর এই অর্থনৈতিক যুদ্ধের যুগে এখনও আমরা উৎপাদনের মতো একটি মহৎ কাজে মর্যাদার প্রশ্নে জর্জরিত। হিংস্র প্রাণী হিসেবে বাঘ আমাদের প্রাণনাশের মত ক্ষতি সাধন করে থাকে। অথচ বাঘের বাচ্চা বলে আমরা মানুষের প্রশংসা করে থাকি। এতে আমরা উৎফুল্লও অনুভব করি। কিন্তু যে ছাগল জীবন দিয়ে শুধুই আমাদের সেবা করে চলেছে, নিজে ভাজা হয়ে খাবার টেবিলে আমাদের রসনা বিলাস সাধন করছে ভুড়ি ভোজনে সহায়তা করছে এমনকি দেশের উন্নয়নে অব্যাহত ভূমিকা রেখে চলেছে সেই ছাগলকে তাচ্ছিল্য করে আমরা ছাগলের বাচ্চা বলে গালি দিয়ে থাকি। এই মানসিকতা হতে আমাদের সরে আসতে হবে। কৃষককে আমাদের বন্ধু ভাবতে হবে। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে তাদের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য আমাদের প্রচারনা চালাতে হবে। তবেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তসহ অনেকেই ছাগল পালনে এগিয়ে আসবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপুল সংখ্যক নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন তাদের অধিকাংশই ছাগল পালন করেছেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে জনবলের অভাব: বাংলাদেশে ছাগল উন্নয়নে নীতি নির্ধারণ, কৃষকদের সমস্যাসমূহ উপলব্ধিকরণ, দক্ষতাপূর্ণ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনাকরণ এবং রোগ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা উদ্ভাবন এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণদান ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জনবল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে নেই। ফলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে হিমশিম খাচ্ছে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সৎ, মেধাবী, কর্মঠ ও দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা উচিত।

৮.৪ বাংলাদেশে ছাগল প্রতিপালনের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ছাগলের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রাম-গঞ্জের অধিকাংশ দুস্থ ও বিধবা মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক খামারিরা অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে ছাগল পালন করে থাকে। কারণ তার পুঁজি এবং সেই সাথে জমির অভাবের জন্য ইচ্ছা থাকলেও গরু-মহিষ বা উন্নত হাঁস-মুরগি লালন পালনের সুযোগ পাচ্ছে না। যাদের মাথা গোঁজার সামান্য স্থান আছে তারা কষ্ট করে হলেও পারিবারিকভাবে দু'চারটি ছাগল ও পাঁচ-দশটি দেশীয় জাতের মুরগি পালন করে থাকে। পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে ছাগল প্রতিপালনকারী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৫৩ শতাংশ। দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছাগল পালনকে তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক দুগ্ধ প্রাপ্তির উৎস হিসাবে বিবেচনা করে। এ কারণে আমাদের দেশে ছাগলকে 'গরীবের গাভী' বলা হয়। এ সকল দিক থেকে বিবেচনায় বাংলাদেশের পেক্ষাপটে ছাগল পালনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আদিকাল থেকেই এ দেশের জনগণ ছাগল পালন করে আসছে। আর আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ জাতের ছাগল কোন বিদেশী জাত নয়। এটি সম্পূর্ণ আমাদের নিজের দেশের সম্পদ। লেয়ার ব্রয়লার বা শংকর জাতের গাভী উৎপাদন এমনকি গার্মেন্টস শিল্পের মত বড় বড় শিল্প ও বিদেশী জাত, স্ট্রেইন বা উপকরণ নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের দেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল গর্বের ধন। এর উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে অতি অল্প সময়ে এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আশা করা যায় যে, সরকার ও জনগণের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ছাগল পালনে নব বিপ্লব সাধিত হবে, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ হতে দেশ মুক্তি পাবে এবং উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে যাবে অনেকদুর। ছাগল প্রতিপালনের সম্ভাবনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

দারিদ্র বিমোচনের সোপান: এদেশের দরিদ্র মানুষ যুগ যুগ ধরে ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্রের সাথে পাঞ্জা লড়ে আসছে। তাদের বেশির ভাগই শয়ন ঘরে ছাগলকে থাকতে দেয়। বর্তমানে দিন দিন জায়গা জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে পশুখাদ্যের পরিমাণ। খাদ্য নিয়ে পশুকে আজ মানুষের সাথে প্রতিযোগীতা করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় গ্রামের দরিদ্র কৃষক গরু, মহিষ পালনের চিন্তাই করতে পারছে না। তাদের পুকুর নেই। ফলে তারা মাছ উৎপাদন করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে স্বল্প জায়গায়, স্বল্প পুজি ব্যয়ে, স্বল্প খাদ্যে ছাগল পালনই হতে পারে তাদের দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম সোপান। দারিদ্র বিমোচন ছাগল পালন ছাড়া আর কোন প্রযুক্তি নেই যার মাধ্যমে এত স্বল্প সময়ে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। সুতরাং যথাযথ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে দারিদ্র বিমোচনে ছাগল নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে।

বেকারত্ব দূরীকরণ: বাংলাদেশ আজ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। আমাদের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার তরুণ আজ চাকরির নেশায় হন্যে হয়ে ছুটে চলেছে দিক হতে দিগন্তে। তারা আজ সরকারের তথা দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র এই দেশে সকল শিক্ষিত নাগরিকের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরদিকে বেকার তরুণরা জায়গা, জমি এবং মোটা অংকের পুঁজির অভাবে গরু মহিষ, মৎস্য ও পোল্ট্রি খামার স্থাপন করতে পারছে না। এমতাবস্থায় স্বল্প পরিসরে, স্বল্প পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বেকার যুবকেরা সহজেই ছাগলের খামার গড়ে তুলতে পারে। এতে করে তাদের বেকার সমস্যার সমাধান এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হতে পারে।

আমিষের ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: এ জাতের ছাগলের মাংস ও চামড়া পৃথিবী বিখ্যাত। আত্মকর্মসংস্থান সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছাগল পালন অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এর মাধ্যমে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। এর চামড়া অতি উন্নত মানের এবং বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বাংলাদেশে ছাগল পালনসহ অন্যান্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের জেলায় জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে পশুপাখি পালন ও প্রাথমিক চিকিৎসায় তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলছে এবং প্রশিক্ষিত যুবকদের পুঁজির সমস্যা সমাধানে স্বল্প পরিমাণে ঋণের যোগান দিচ্ছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবক ও যুব মহিলারা যুব ঋণ নিয়ে ছাগলের খামার স্থাপন করে আর্থিকভাবে লাভবান

হতে পারে এবং এতে করে তাদের বেকারত্বের দুঃখ ঘোচাতে পারে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই অনেক সফল হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যেই সোনালী, অগ্রণী, কৃষি ও জনতা ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকসমূহ ছাগল পালনে বিশেষ ঋণ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে করে ছাগল পালনে পুঁজি সমস্যার যথেষ্ট সমাধান হবে। এই অবস্থায় দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষী, দুঃস্থ ও বঞ্চিত মহিলা এবং বেকার যুবক ও যুব মহিলারা ব্যাংক ঋণের সুযোগ নিয়ে সহজেই ছাগল পালন ও ছাগলের খামার গড়ে তুলতে পারেন।

৮.৫ ছাগল উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পদক্ষেপ

পূর্বে বর্ণিত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নব্বই এর দশকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এ সময়ের পূর্বে এদেশে ছাগলের গুণগতমান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম ছিল সীমিত। নব্বই এর দশকে ছাগল উৎপাদনশীলতা ও কৌলিকমান উন্নয়নের নিমিত্বে জনসাধারণের মধ্যে উন্নত জাতের প্রজনন পাঁঠা ও ছাগী বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন সাভার, রাজশাহী, সিলেট, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহে ৫ টি ছাগল উন্নয়ন খামার স্থাপন করে এবং ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে দারিদ্র দূরীকরণ প্যাকেজ কর্মসূচি হাতে নেয়। এই সকল খামারে উন্নত জাতের পাঁঠা উৎপাদন করে প্রজননের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সরকার নির্ধারিত স্বল্পতর মূল্যে বিতরণ করা হয়। দেশের বিভন্ন প্রজনন কেন্দ্রের প্রজননের জন্য উন্নতমানের পাঁঠা পালন করা হয়। এছাড়াও গরীব জনগণের মাঝে শর্তসাপেক্ষে বিনামূল্যে ছাগী বিতরণ করা হয়। এছাড়া পারিবারিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক খামার গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পরামর্শ, সেবা ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু করে এবং ছাগলের মহামারী রোগ অর্থাৎ পিপিআর এর টিকা উৎপাদন ও বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ছাগল পালন কমসূচিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এছাড়াও অধিদপ্তর ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং করছে।

- দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় বিনা সুদে দারিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে ছাগল পালনের জন্য ঋণ বিতরণ করা। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ প্রকল্প চালু হয়েছে। এর অধীনে সুদমুক্ত ঋণে ২টি করে ছাগী বাচ্চা সহ গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।
- দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প ছাড়াও জাতীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছাগল পালন প্যাকেজের অধীনে বেকার ও দরিদ্র জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে ছাগল পালনের জন্য বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি সরবরাহ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন জাতীয় কর্মসূচি' গ্রহণ করেছে। এ জাতীয় কর্মসূচির আওতায় সেমিনার, প্রশিক্ষণ, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ছাগল বিতরণ ও ছাগলকে বিনামূল্যে পিপিআর ভ্যাকসিন প্রদান ও প্রচারণা চালানোর কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক অধুনা আর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় জনগণকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে সরল সূদে বিনা জামানতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি অঞ্চলে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে সংরক্ষনের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট প্রেডাকশন এবং এক্সটেনশন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা রয়েছে।

এ সকল কর্মকান্ড সার্বিক প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। সরকারের একক প্রচেষ্টায় ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নেয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, জনদরদী ব্যক্তিবর্গ, শিল্পপতি, সমাজসেবক এবং সর্বোপরি সকলের আন্তরিক প্রয়াসই আলোচ্য কর্মসূচিকে সফল করতে পারে। পরিশেষে এতটুকু বলা যায়, ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সরকারি নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাসম্ভব সচেষ্ট রয়েছে।

৮.৬ ছাগলের গুণগত মানোন্নয়নে প্রজনন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সমস্যা উন্নত জাতের পশুপাখির অভাব। এ দেশে গরু, মহিষ ও ভেড়ার কোন সুনির্দিষ্ট জাত নেই। কিন্তু ছাগলের ক্ষেত্রে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল' দেশের একমাত্র ছাগলের জাত। দেশী কালো ছাগল পৃথিবীর অন্যান্য জাতের ছাগলের তুলনায় বিভিন্ন দিক থেকে যেমন বংশবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট মাংস ও চামড়া উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক উন্নত ও সকলের কাছে সমাদৃত। এছাড়াও তুলনামূলকভাবে এদের রোগবালাইও কম। এরা দ্রুত প্রজননশীল এবং বছরে দু'বার বাচ্চা দেয় (প্রতিবারে সাধারণত ২টি বাচ্চা)। এদেশীয় ছাগলের মাংস এবং চামড়ার পৃথিবীব্যাপী বিপুল চাহিদা রয়েছে। গরু, ভেড়া বা মহিষের তুলনায় ছাগলে আঁশ জাতীয় খাদ্যের পাচ্যতা ৩-২৫% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের চামড়ার গুণগতমান উন্নততর হওয়ার জন্য প্রতি বছর চামড়া থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ছোট প্রাণী বিধায় খাদ্য, আবাসন, বিনিয়োগ এবং ঝুঁকিও কম। ছাগলের দুধ শিশু ও বৃদ্ধসহ সকলেই গ্রহণ করতে পারে কারণ তা সহজপাচ্য। এ দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ছাগল পালনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ঘাস, লতাপাতা ও সাধারণ খাদ্য খেয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মাঝেও এরা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

৮.৬.১ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছাগলের প্রচলিত প্রজনন ব্যবস্থা

পাঁঠা পালনে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ না থাকলেও আমাদের দেশে পাঁঠা পালনকে সামাজিক দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পেশা হিসাবে বিবেচনা করা হয়না। দেশে পাঁঠার সংখ্যা ক্রমশঃ সীমিত হয়ে পড়ছে। এছাড়াও খাসীর মাংসপ্রীতির কারণে যে সমস্ত পাঁঠা বাচ্চা জন্মায় সেগুলোর সবই খোঁজা করে দেয়া হয়। এতে প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য পাঁঠা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। কোন গ্রামে যদি ২/১টি পাঁঠা থাকেও তাও প্রায়শ দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে থাকে। যেখানে পাঁঠাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে সেখানে এদের গুণগতমানের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে গৌণ হয়ে পড়ে। এর ফলে ছাগলের বংশ বৃদ্ধি ঘটলেও গুণগতমানের কোন উন্নতি হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু পরিবার পাঁঠা পুষে থাকেন কিন্তু একই পাঁঠা দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রজনন করানো হচ্ছে। এর ফলে ইনব্রিডিং-এর ক্ষতিকর দিকগুলো জাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠাকে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪-৫ বার প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উচিত হলেও অজ্ঞানতাহেতু দিনেই কয়েকবার প্রজননে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অপ্রাপ্তবয়স্ক ৪-৬ মাসের বাচ্চা পাঁঠা দিয়েও যথেচ্ছ প্রজনন কাজ চালানো হচ্ছে। অবশ্য এসবই হচ্ছে পাঁঠার স্বল্পতা ও প্রজনন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞানের অভাবে। এর ফলে, পাঁঠার জীবনী শক্তি যেমন খর্ব হয় তেমনি ছাগীর গর্ভধারণের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশী ছাগীতে সাধারণত ৪-৬ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হবার লক্ষণ প্রকাশ প্রায়। কিন্তু অল্প বয়সে এবং শারীরিক বৃদ্ধি পর্যাপ্ত না হলে (কমপক্ষে ১২-১৩ কেজি ওজন) পাল দেওয়ানো ঠিক নয়। সাধারণত ৭-৮ মাস বয়সে পাল দেয়া যায়। অথচ গ্রামাঞ্চলে এ সমস্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়না। এছাড়া বাচ্চা প্রসব করার ২০-৩০ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হয়। কোন কোন সময় ৯-১২ দিনের মধ্যেও গরম হতে পারে। ছাগীর স্বাস্থ্যগত কারণ বিবেচনা করে কখনই এ সময়ে পাল দেয়া উচিত নয়। বাচ্চা প্রসবের পর দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে ছাগী যখন গরম হয় তখন পাল দেয়া উচিত। উপরে আলোচিত ত্রুটিপূর্ণ প্রজনন কার্যক্রম ক্রমাগতভাবে অনুসরণের ফলে ছাগলের উন্নতমানের বৈশিষ্টাবলী ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা হল, অনেক বেশি দৈহিক ওজনবিশিষ্ট খাসী পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই রাম ছাগল/যমুনাপারীর সাথে দেশীয় ছাগীর প্রজনন করাচ্ছে। এ জাতীয় নানা সমস্যার কারণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

৮.৬.২ ছাগলের গুণগত মানোন্নয়নে নীতিমালা ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৭' অনুসারে ছাগলের মান উন্নয়ন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় উল্লেখ আছে যে এই জগত বিখ্যাত ছাগলের সাথে কোন অবস্থাতেই অন্য কোন জাতের ছাগলের শংকরায়ন করা যাবে না। খাটি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য রাজশাহীর রাজাবাড়ীহাট, ঢাকার সাভার, সিলেটের টিলাগড়, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহে

একটি করে ছাগল খামার স্থাপন করা হয়েছে। অনুরুপভাবে দিনাজপুর, বরিশাল চট্রগ্রামে আরও ৩টি ছাগলে খামার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল খামারে উন্নত জাতের পাঁঠা উৎপাদন করে প্রজননের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সরকার নির্ধারিত স্বল্পতর মূল্যে বিতরণ করা হয়। দেশের বিভন্ন প্রজনন কেন্দ্রের প্রজননের জন্য উন্নতমানের পাঁঠা পালন করা হয়। এছাড়াও গরীব জনগণের মাঝে শর্তসাপেক্ষে বিনামূল্যে ছাগী বিতরণ করা হয়।

৮.৬.৩ সঠিক প্রজনন ব্যবস্থাপনায় যা করণীয়

'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট'-এর কৌলিকমান উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামারিদের মাঝে উন্নত মানের পাঁঠা বিতরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এজন্য দেশের সিলেট, সাভার, রাজশাহী, চুয়াডাংগা ও ঝিনাইদহে সরকারি ছাগল খামার স্থাপন করেছে। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে ছাগল পালনে ঋণ বিতরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালু রয়েছে কিন্তু চাহিদার তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল। সরকারের পক্ষে এককভাবে দেশের সর্বত্র একযোগে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য দেশের সুশীল সমাজ, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সকলকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি পুঁজিবিহীন সর্বজন গ্রহণযোগ্য ওপেন নিউক্লিয়াস ব্রিডিং সিস্টেম (ONBS) চালুর মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গুণগতমান সংরক্ষণ করা সম্ভব। ONBS পদ্ধতিতে গ্রামে-গঞ্জে ও ক্ষুদ্র খামারে যে সব দেশী ছাগল পালন করা হয়ে থাকে সেসব থেকে বাছাই করে 'দল তৈরি করা' এবং উৎপাদিত বাচ্চা নির্দিষ্ট এলাকায় বিতরণ করতে হয়। পরবর্তীতে ছাগল বিতরণকৃত এলাকাসমূহ থেকে ছাগল বাছাই করে 'নির্দিষ্ট দলে' সংযোজন করতে হয়। এরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে জাত সংরক্ষণ বা মান উন্নয়নকে ওএনবিএস (ONBS) বলা হয়। উল্লিখিত পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে মডেল হিসাবে কোন গ্রাম, ইউনিয়ন বা উপজেলাকে এরূপ কার্যক্রমের আওতায় আনা যেতে পারে। এর জন্য কোন পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এজন্য সামাজিক সংকল্প বা সোসাল মবিলাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সেবামূলক কাজ হিসাবে সকলে সম্মিলিতভাবে একাজে এগিয়ে আসলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ উপকৃত হবে ও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাতের ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই আশা করা যায়।

৮.৭ ভেড়া পালনের সুাবিধা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

উন্নয়নশীল বিশ্বে ভেড়া পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভেড়া থেকে প্রধানত মাংস, পশম, চামড়া দুধ, জৈবসার ছাড়াও এরা খামারির জীবন্ত-বীমা (life insurance) হিসেবে প্রয়োজনের সময় খামারিকে অর্থের যোগান দেয়। তাছাড়া মিশ্র খামারে ভেড়া ফসলহানি জনিত ক্ষতি পূরণে (risk aversion) সাহায্য করে। তাই সমাজভিত্তিক ভেড়া পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহরায়নের ফলে মাংসের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভেড়াসহ অন্যান্য গবাদিপশুর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৮৩-৮৪ সালে কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ শুমারী অনুসারে এদেশে ভেড়ার সংখ্যা ছিল ৬.৬৭ লক্ষ যা ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুসারে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬.৯০ লক্ষে। এই ১২ বছরে ভেড়ার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৫৩%, যা বাৎসরিক হারে দাঁড়ায় ১২.৭৫%। অন্যদিকে উক্ত ১২ বছরে এদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৪০% যা বাৎসরিক হারে দাঁড়ায় ৩.৩৫%। অর্থাৎ এদেশে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় ৩.৮ গুন। অনুরুপভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ভেড়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.০৬ লক্ষে। অর্থাৎ বিগত ১৮ বছরে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮৯.৭০%। তাই এখনও বাৎসরিক হারে ভেড়ার বৃদ্ধি (৪.৯৮%) মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের (১.২%) চেয়েও বেশি। যদিও এদেশের সকল জেলায় ভেড়া পাওয়া যায় তবে দেশের উত্তর-পশ্চিম বরেন্দ্র অঞ্চল, মধ্যাঞ্চলের যমুনা-ব্রক্ষ্মপুত্র অববাহিকা এবং উপকুলীয় অঞ্চলে এর ঘনত্ব বেশি। সামগ্রীকভাবে বাংলাদেশের ৩২.০৬ লক্ষ ভেড়ার শতকরা ৭২% পালন করে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিরা, ২১% পালন করে মাঝারি খামারিরা এবং কেবল ৭% পালন করে বৃহৎ খামারিরা। অর্থাৎ ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে তরান্বিত করা সম্ভব। ভেড়া এদেশে সনাতনী পদ্ধিতিতে পালন করা হয়। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কারিগরি উন্নয়ন এদেশের ভেড়ার

উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। যদিও এদেশে ভেড়ার মাংসের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম তথাপি ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কমানোসহ ভেড়ার মাংস রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

ভেড়া উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভেড়াসমূহ এখন পর্যন্ত জাত (ব্রীজ) হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কৃষি পরিবেশগত অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশে তিন ধরণের ভেড়া দেখা যায়। বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া, যমুনা অববাহিকার ভেড়া এবং উপকুলীয় অঞ্চলের ভেড়া। ভেড়ার মাংস সুস্বাদু এবং চর্বিযুক্ত। পূর্ণ বয়স্ক একটি ভেড়া থেকে ৪০-৪৫% ভক্ষণযোগ্য মাংস পাওয়া যায়। ৬-৯ মাস বয়সে একটি ভেড়ার দৈহিক ওজন হয় ১২-১৫ কেজি। বাংলাদেশী ভেড়া থেকে উৎপাদিত পশম মোটা ও মধ্যম মানের। পূর্ণ বয়স্ক একটি ভেড়া থেকে বছরে ০.২৫-০.৫ কেজি পশম পাওয়া যায়। দেশী ভেড়ী এক সঙ্গে ১-৩টি বাচ্চা দেয়। এরা বছরে ২ বার বাচ্চা দিয়ে থাকে। ফলে, সাধারণত বছরে ৪-৬টি বাচ্চা পাওয়া যায়। ভেড়া থেকে যে চামড়া পাওয়া যায় তা মধ্যম মানের। বাজারে মধ্যম আকারের প্রতিটি চামড়ার দাম ১০০-১৫০ টাকা।

ভেড়া পালনের সুবিধা

ভেড়া ছাগলের মতই একটি সম্ভাবনাময় চতুষ্পদ প্রাণী। সুদূর অতীত কাল হতে মানুষ পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি ভেড়া পালন করা হয়ে থাকে। তবে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা গুলোতে এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে ভেড়া পালন উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বাংলাদেশে ভেড়া পালন একটি লাভজনক পেশা হতে পারে। ভেড়ার খামারে বিনিয়োগকৃত অর্থ অতি অল্প সময়ে উঠে আসে। ভেড়া পালনের সুবিধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

অল্প জায়গা: ভেড়া পালনের জন্য খুব বড় চারণভূমি না হলেও চলে। অল্প জায়গাতেই ভেড়া পালন করা সম্ভব। ভেড়ার বাসস্থানের জন্য অল্প জায়গার প্রয়োজন হয় বিধায় গ্রামের ক্ষুদ্র খামারিরা যাদের শুধু বসতভিটা আছে তারাও ২-৩ টি ভেড়া পালন করতে পারেন। ভেড়া গরু-ছাগলের সাথেও পালন করা যায়। গাভী পালন করার সামর্থ্য নেই এমন খামারিও অনায়াসে ২-৩ টি ভেড়া পালন করতে পারেন।

খাদ্য: ভেড়া পালনের জন্য খুব বেশি খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ঘাস চাষের প্রয়োজন হয় না। বসতভিটার আশেপাশের পতিত জমি, ক্ষেতের আইল এবং রাস্তার পার্শ্বের ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করতে পারে। ভেড়া সব ধরণের খাদ্য গ্রহণ করে এবং এদের দৈহিক বৃদ্ধির হার ভাল। খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা ভাল হলে ৬-৯ মাস বয়সে একটি ভেড়ার বাচ্চা ১২-১৪ কেজি ওজনের হয়ে থাকে।

সহজ পরিচর্যা: ভেড়া পরিচর্যা সহজ। তাই ভেড়ার খামারে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমের প্রয়োজন হয়। ভেড়া শান্ত প্রাণী হওয়ায় একজন মহিলা বা বাচ্চা ছেলের পক্ষেও একসাথে অনেকগুলো ভেড়ার পরিচর্যা করা সম্ভব।

স্বল্প মূল্য/সহজ বিনিয়োগ: ছোট প্রাণী হওয়ায় ভেড়ার একক মূল্য কম। তাই ভেড়া পালনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে দরিদ্র বা নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষেও ভেড়া পালনে বিনিয়োগ করা সম্ভব।

মাংস উৎপাদন: বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে যেসব ভেড়া পালন করা হয় তা মূলত মাংস উৎপাদনের জন্য। ভেড়ার মাংস সুস্বাদু, তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই। একটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হতে গড়ে ২৫-৩০ কেজি মাংস পাওয়া যায়। সাধারণত একটি ভেড়া থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৪টি বাচ্চা পাওয়া যায়।

পশম উৎপাদন: বাংলাদেশে স্থানীয় ভাবে পালিত ভেড়াগুলো উন্নত জাতের না হওয়ায় এদের পশমও উন্নত মানের নয়। তবে এসব ভেড়া হতে প্রাপ্ত পশম হতে রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে কম্বল তৈরি করা হয়।

রোগ প্রতিরোধ: ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং পরিবেশের সাথে সহজেই খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে। ভেড়া খারাপ ব্যবস্থাপনায়ও বেঁচে থাকতে পারে বিধায় এদের মৃত্যুহার কম।
ভেড়া থেকে প্রধানত মাংস, পশম, চামড়া, জৈব সার পাওয়া যায়। এছাড়াও ভেড়া প্রয়োজনে খামারিকে অর্থের যোগান দেয়। সমাজভিত্তিক ভেড়া পালনের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন বহুলাংশে সম্ভব।

৮.৮ বাংলাদেশে ভেড়া উৎপাদনে সমস্যা ও করণীয়

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সার্বিক আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ৩২.০৬ লক্ষ ভেড়ার শতকরা ৭২% পালন করে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারিরা, ২১% পালন করে মাঝারি খামারিরা এবং কেবলমাত্র ৭% পালন করে বৃহৎ খামারিরা। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধি করার কার্যকর প্রচেষ্টা গৃহীত হলে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোল্ট্রি এবং মাংস উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে ভেড়া উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নানাবিধ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশের আবাদী জমিসহ পতিত জমির পরিমাণ কমে গিয়ে বাড়ছে শহরায়ন এবং শিল্পায়ন। ফলে ভেড়ার চারণভূমি কমে গেছে যা ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এক সময় ছিল প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ভেড়া পাওয়া যেত কিন্তু এখন তা অঞ্চল ভিত্তিক সীমিত হয়ে পড়েছে। ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যাদি নিম্নে তুলে ধরা হল-

- বাজারে ছাগলের মাংসের তুলনায় ভেড়ার মাংসের চাহিদা কম।
- উলের গুণাগুণ নিম্নমানের এবং উৎপাদনের পরিমাণও কম।
- ছাগলের চামড়ার তুলনায় ভেড়ার চামড়া নিম্নমানের। ভেড়া পালনকে নিম্নমানের কাজ ভাবা হয়।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অভাব।
- বাজার ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা ও ভেড়া পালন সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞানের অভাব।
- উষ্ণ-আর্দ্র জলাবায়ুর জন্য শীতপ্রধান দেশের উন্নত জাতের ভেড়া আমাদের দেশে পালনের উপযোগী নয়।

দুম্বার নাম অনেকেই শুনেছি এবং দুম্বা অনেকেই দেখেছি। হজ্জ মৌসুমে মীনা ময়দানে বিপুল সংখ্যক হাজী সাহেবান দুম্বা কোরবানি দিয়ে থাকেন। সেই সুবাদে দুম্বা নামক প্রাণিটির নাম মুসলিম সমাজে ঠাঁই করে নিয়েছে। সৌদি সরকার কর্তৃক প্রেরিত কোরবানি করা দুম্বার মাংস বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের রসনার তৃপ্তি মিটিয়ে আসছে বহু বছর ধরে। আরেকটি দিক হল, আমাদের দেশের লাখ লাখ ভাই-বোনেরা জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের কাছেও দুম্বা খুবই পরিচিত প্রাণী। কিন্তু আমাদের দেশে সেই দুম্বার স্বজন, দেশী ভেড়া দেশবাসীর খুব একটা নজর কাড়তে পারেনি। যদিও পুষ্টিমানে ও গুণে কোন দিকেই ছাগলের মাংসের চেয়ে ভেড়ার মাংস পিছিয়ে নেই তথাপি ভেড়ার মাংসকে আমরা সামাজিকভাবে সাদরে গ্রহণ করছি না। তবে অসাধু ব্যবসায়ীদের কল্যাণে খাসীর মাংস হিসেবে আমরা অহরহই ভেড়ার মাংস কিনে খাচ্ছি। রসনার তৃপ্তি ষোল আনা পাওয়ার তাগিদে দেশী ভেড়াকে 'বাংলাদেশের দুম্বা' বললে খুব একটা দোষের কিছু হবে না।

বাংলাদেশের আবহাওয়া উন্নতজাতের ভেড়া পালনের উপযোগী না হলেও এদেশের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুতে স্থানীয় জাতের ভেড়া সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে এবং অবহেলার মাঝেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশের আবহাওয়াতে ভেড়া ও অন্যান্য জীবজন্তুর কৃমির সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। কৃমিতে আক্রান্ত প্রাণির পুষ্টি (প্রায় ২০% আমিষ) কৃমি কর্তৃক শোষিত হয়। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী শুকিয়ে যায় এবং বদহজম ও ডায়রিয়াতে ভোগে। এ জন্য বর্ষা ও শীতের আগে অবশ্যই নিয়মিতভাবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বহিঃপরজীবী (উকুন, আঁঠালী, মায়াসিস ও মেন্জ) থেকে ভেড়াকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতিমাসে ন্যূনপক্ষে একবার ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণে ডিপিং করাতে হয়। এছাড়া অন্য যে কোন ধরণের রোগব্যাধির ক্ষেত্রে নিকটস্থ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। সৃষ্টিগতভাবেই ভেড়ার শরীরে পশম বৃদ্ধি পায়। সেই পশম ছাঁটানো বা শিয়ারিং না করলে

অথবা পরিষ্কার করলে ময়লা আর ঘামের গন্ধে ভেড়ার প্রতি মানুষের কিছুটা অনীহা আসে। যার প্রভাবে আমাদের রুচিতে ভেড়ার মাংস খাবার টেবিলে আসে কম। তাই বছরে ২/৩ বার পশম ছাঁটাই করা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লালন-পালন করলে খাসীর মাংসের পাশাপাশি দেশীয় দুম্বার মাংস রসনাপ্রিয় হতে বাধ্য।

বাংলাদেশে পারিবারিকভাবে যেসব ভেড়া পালন করা হয় তা উন্নত জাতের নয়। উচ্চ উৎপাদনশীল ভেড়া এদেশে পালন না করার কারণে এদের পশম নিম্নমানের এবং গড় মাংস উৎপাদনও কম। ভেড়া পালন সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব এবং ভেড়া পালনে আগ্রহের অভাব এদেশে ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটি অন্যতম অন্তরায়। ভেড়ার খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেও এসব ভেড়া হতে কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ব্যাপারে খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এদেশে পালন উপযোগী ভেড়া আমদানি করলে বাংলাদেশের খামারিগণ ভেড়া পালন করে লাভবান হতে পারবে। ভেড়াপালন লাভজনক বলেই তা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাই ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।

৮.৯ বাংলাদেশের ভেড়া পালনের সম্ভাবনা

জনবহুল আমাদের এই দেশে প্রায় ৮০% মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বর্ধিষ্ণু জনগণের জন্য বাড়ী-ঘরসহ আনুষাঙ্গিক কাঠামো তৈরির কারণে সংগতভাবেই চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্য চাহিদা মেটাতে গিয়ে শস্য উৎপাদনের জন্য সিংহভাগ ভূমি ফসল আবাদের আওতায় আসছে। ফলে দেশে গবাদিপশুর জন্য চারণভূমি নাই বললেই চলে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিকল্প উৎসের দিকে নজর দিতে হবে। ভেড়া বেশ জনপ্রিয়। একে তো ছোট প্রাণী, সেই সাথে যে কোন ধরণের আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতার কারণে বাংলাদেশে অযত্নে অবহেলায় আজও ভেড়া টিকে আছে। আদিকাল থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এ ক্ষুদ্র প্রাণিটির লালন পালন ও সংরক্ষণ করে আসছে। এরা আমাদের গরু, মহিষ, ছাগলের সাথে মিলে মিশে টিকে আছে। এদের লালন পালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা সব বিষয়ে আমাদের সমাজের লোকেরা খুবই পরিচিত। দেশী স্থানীয় ভেড়া বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়, বিরূপ আবহাওয়ার উপযোগী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। গরুসহ অন্যান্য পশু থেকে এর বৃদ্ধিও তুলনামূলক বেশি। এছাড়া, ভেড়ার জন্য ব্যয়বহুল বাসস্থানের দরকার হয় না। অন্যান্য পশুর তুলনায় প্রাথমিক খরচ কম বরং অর্থনৈতিক উপযোগীতাও বেশি। এদের রোগব্যাধিও কম। ভেড়ার খাদ্য ও পালন ব্যবস্থাপনা তুলনামূলক সহজ এবং খরচ কম। পারিবারিক পর্যায়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কম পুঁজিতে ও অল্প পরিচর্যায় ভেড়া পালন আয়ের একটি লাগসই উপায় হতে পারে। ভেড়া আমাদের অন্যতম প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান আমিষের প্রাকৃতিক ভান্ডার। ছাগলের চেয়ে কোন অংশে ভেড়া পিছিয়ে নেই বরং তুলনামূলক সহজে দলবদ্ধভাবে ভেড়া লালন পালন করা যায়। কথায় আছে 'গোয়াল ঘরে গরুর সাথে ভেড়া রাখি স্বাচ্ছন্দে'। ভেড়া গরুর সাথে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় ভেড়ার মাংস ও পশম উৎপাদন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন তথা অর্থ উপাজনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে।

ভেড়ার মাংস উৎপাদন সম্ভাবনা

ভেড়ার মাংস পুষ্টি সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু। এ দেশের বাজারে ভেড়ার মাংসকে ছাগলের মাংস হিসাবেই চালিয়ে দেয়া হয়। মোট বিক্রিত ছাগলের মাংসের প্রায় ২০ শতাংশই প্রকৃতপক্ষে ভেড়ার মাংস। খামারিগণ স্থানীয় বাজারে পাইকার/বেপারীর নিকট ভেড়া বিক্রি করে। পরবর্তিতে দেশের বড় বড় শহরে কসাইদের কাছে এসব ভেড়া বিক্রি করা হয়। এতে একদিকে খামারিগণ তাদের ভেড়ার উপযুক্ত মূল্য পায় না, অন্যদিকে ক্রেতাদেরকে অধিক দামে মাংস কিনতে হচ্ছে। সেহেতু, ভেড়া পালনকারীরা তাদের ভেড়া বিক্রির জন্য ব্যাপারীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। সংগত কারণেই ব্যাপারীরা সস্তায় ভেড়া কিনে নেয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ভেড়ার মাংস হালাল এবং পুষ্টি বিজ্ঞানিদের মতে ভেড়ার মাংস পুষ্টি সমৃদ্ধ বিধায় ভেড়ার মাংসের গন্ধের দোহাই দিয়ে ভেড়ার মাংস খাওয়া, লালন পালন থেকে বঞ্চিত হওয়া মোটেই সমীচীন নয়। আমরা যদি নিয়মিত ভেড়ার পশম ছাঁটাই করি সেইসাথে এর শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি তাহলে ভেড়া দেখতে সুন্দর

লাগবে, গন্ধতো প্রশ্নই আসেনা। ফলশ্রুতিতে ভেড়ার গোশতের প্রতি আমাদের রসনা তৃপ্তির বাসনা জাগবে। তাছাড়া আমরাতো খাসির লেবেল লাগানো ভেড়ার মাংস খাচ্ছি যেখানে লেবেল লাগানোর কাজটি কসাইরা করছেন। আর, ভেড়ার মাংসে খাসির লেবেল লাগালে তার স্বাদ খাসির মাংসের মতো হওয়ার কথা না। স্বাদ যেহেতু খাসির মাংসের ন্যায়, তাহলে ভেড়ার মাংস খাসির নামে ও দামে না কিনে যদি সরাসরি ভেড়ার মাংস কেনাই সমীচিন। এতে ভেড়া লালন পালনে জনগণের আগ্রহ বাড়বে। খাসির চড়া দামে কিছুটা হলেও ভাটা পড়বে। খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমিষের চাহিদা কিছুটা হলেও মিটবে।

ভেড়ার মাংস ও পশম রপ্তানির সম্ভাবনা

বিশ্বের সকল দেশেই ভেড়ার মাংস সমাদৃত। যেহেতু ভেড়ার মাংসের চাহিদা বিদেশে রয়েছে সেহেতু রপ্তানি খাতে নতুন পণ্য হিসাবে ভেড়ার মাংস সংযোজন হতে পারে। আমাদের দেশে সনাতনী ব্যবস্থায় মাংস প্রক্রিয়াজাত করা হয়। তবে, অতিসম্প্রতি দু'একটি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রপ্তানিকে সামনে রেখে দেশে বিদ্যমান মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে ছোট বড় ভেড়া মোটাতাজাকরণের খামার স্থাপন করা যেতে পারে। এতে ভেড়া পালনের মাধ্যমে গরীব জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পও তাদের প্রয়োজনীয় পশু সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন। সম্ভাবনাময় এই প্রাণিটি লালন-পালনের মাধ্যমে মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এর অতি মূল্যবান পশম (wool) আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে নতুন সংযোজন হয়ে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।

ভেড়া বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ হিসেবে বিবেচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে ভেড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার ভেড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI) এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS) এর মাধ্যমে যৌথভাবে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৩ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এতে দেশী ভেড়া সংরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি জাত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে আশা করা যায়। ফলশ্রুতিতে, বাণিজ্যিক ও সমবায়ভিত্তিক ভেড়া পালনে নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং এর সাথে মাংসের উৎসও প্রসারিত হবে। বিশেষত, ঈদুল আযহা'র সময় কোরবানির পশুর সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, ছাগলের ওপর অনেকটা চাপ কমবে। ইদানিং অনেক বেসরকারি সংস্থাও ভেড়া পালনে এগিয়ে আসছে। ভেড়া একদিকে মাংস দেয় অন্যদিকে পশম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অনেকের ধারণা ভেড়া মানেই পশম উৎপাদন। হয়তবা সে কারণে তার মাংস আমাদের নজর কাড়তে পারেনি। কিন্তু বাস্তবতা হল, পশম উৎপাদনে আমাদের দেশে ভেড়া তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাই ভেড়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি দু'খাতেই আরো জোরদার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে।

৮.১০ ভেড়ার প্রজনন পরিকল্পনা

বিদেশী ভেড়ার তুলনায় এদেশীয় ভেড়া আকারে ছোট এবং প্রধানত মাংস উৎপাদনের জন্য পালিত হয়। পূর্ণবয়স্ক ১৮-২০ কেজি ওজনের একটি ভেড়া থেকে ৯-১০ কেজি মাংস পাওয়া যায়। ভেড়ার মাংস সুস্বাদু এবং চর্বিযুক্ত। বাংলাদেশী ভেড়ার পশম তুলনামূলকভাবে মোটা ও নিম্নমানের যা থেকে শুধু কম্বল বা কার্পেট জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরি করা সম্ভব। পূর্ণবয়স্ক একটি ভেড়া বছরে ০.৮-১.৫ কেজি পশম উৎপাদন করে। এরা বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়, প্রতি বারে ১-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। বাড়ন্ত ভেড়ার দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার ৩৫-৭০ গ্রাম। এদেশীয় ভেড়ার পূনরুৎপাদন ক্ষমতা খুবই ভাল। এরা ৫-৮ মাস বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। প্রথম গর্ভধারণ ৫-৮ মাস বয়সেই হতে পারে এবং ১০-১৩ মাস বয়সেই প্রথম বাচ্চা দিতে পারে। বাচ্চা দেয়ার ২৫-৩৮ দিনের মাথায় ভেড়ী গরম হয় এবং গরম অবস্থার (heat/oestrus period) স্থায়ীত্ব ১৮-২০ ঘন্টা। বাচ্চার জন্মকালীন ওজন ১.০-২.৪ কেজি হতে পারে। এ জাতীয় ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবল এবং এদের বাচ্চার মৃত্যুর হার ৫.০% এর নিচে। সাধারণত এই ভেড়াতে পিপিআর এবং একথাইমা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। একই বা বিভিন্ন এলাকার ভেড়ার মধ্যে উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক পার্থক্য

দেখা যায়। এই জন্য বাছাইকৃত অধিক উৎপাদনশীল ভেড়াকে পরিকল্পিত প্রজননের মাধ্যমে এদের কৌলিক মান উন্নয়ন করা সম্ভব। ভেড়ার এই কৌলিক মান উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যক্তি/সমবায় পর্যায়ে এবং সরকারি/বেসরকারি ব্রিডিং খামারে হতে পারে।

৮.১০.১ ব্যক্তিগত খামারে ভেড়ার উন্নয়ন

ব্যক্তি পর্যায়ে দেশী ভেড়া উন্নয়নের জন্য সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষেত্রে ১০০ বা তার অধিক ভেড়া বিশিষ্ট খামারে, খামারি তার ভেড়া উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করে ভেড়া/ভেড়ী বাছাই করবেন। জাত উন্নয়নে বাছাই কর্মসূচির জন্য খামারে ভেড়ার উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেবলমাত্র বাছাইকৃত ভেড়া/ভেগীকে প্রজননের কাজে ব্যবহার করতে হবে। ভেড়ার পালকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিটি গ্রুপকে এক একটি পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। একটি পরিবারে উৎকৃষ্ট ভেড়ার সাথে ভিন্ন পরিবারের উৎকৃষ্ট ভেড়ীর প্রজনন করাতে হবে। এতে খামারে একদিকে যেমন অন্তঃপ্রজননের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না অন্য দিকে উন্নত কৌলিক মান সম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদিত হবে। উৎপাদিত এসব বাচ্চার মধ্যে যাদের ওজন বৃদ্ধির (বিশেষত ৬ মাস বয়সের ওজন) ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং অধিক শৌর্য্য-বীর্য সম্পন্ন তাদেরকে পরবর্তী প্রজন্ম উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। যেসব বাচ্চায় উল্লেখিত কাঙ্খিত গুণাবলী থাকবে না তাদেরকে কোন অবস্থাতেই প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে না বরং এদেরকে মাংস উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। এ পদ্ধতিতে ৫-১০ প্রজন্ম পর্যন্ত প্রজনন কর্মসূচি চালু রাখলে একটি উন্নত কৌলিক মান সম্পন্ন ভেড়ার জাত পাওয়া যেতে পারে। ৫-১০ টি ভেড়া বিশিষ্ট ছোট ছোট খামারি, যারা এদেশের ভেড়ার সিংহভাগই পালন করেন, তাদের বেলায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। তবে তারাও সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতিতে তাদের ভেড়ার উন্নয়ন করতে পারেন। এজন্য তারা তাদের উৎকৃষ্ট ভেড়া/ভেড়ীকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করবেন। প্রজননের জন্য তারা নিজ খামারের উৎকৃষ্ট পাঁঠার সাথে পার্শ্ববর্তী খামারের উৎকৃষ্ট পাঁঠার বিনিময় করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই প্রজনন কর্মসূচিতে কোন ভাবেই একটি পাঁঠাকে তার মা, বোন, দাদী, বা নানী এর সাথে প্রজনন করানো যাবে না। তাছাড়াও এলাকার ক্ষুদ্র খামারিগণ ইচ্ছা করলে সমবায় ভিত্তিতে সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতিতে দেশি ভেড়ার উন্নয়ন করতে পারেন।

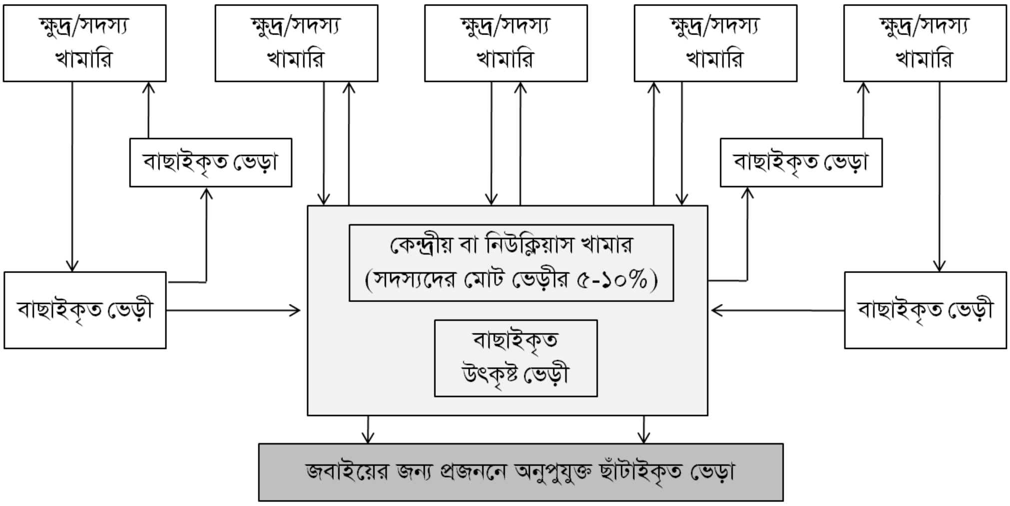

চিত্র ৮.২ঃ ক্ষুদ্র খামারিদের সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিডিং খামারের মাধ্যমে ভেড়ার জাত উন্নয়ন। এই চিত্রটি ভেড়া পালন ম্যানুয়েল থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৪)।

৮.১০.২ দলবদ্ধ বা সমবায় ভিত্তিতে ভেড়ার জাত উন্নয়ন

এই পদ্ধতিতে দলবদ্ধভাবে বা সমবায় সমিতির মাধ্যমে ভেড়ার প্রজনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে সমিতির সদস্যগণ ভেড়ার জাত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা ও চুক্তি করেন। প্রতি সদস্যের একটি ভেড়ার খামার থাকে, তাছাড়া সমিতির একটি কেন্দ্রীয় প্রজনন খামার থাকে। সদস্যদের প্রতিটি খামারে ৫-১০ টি ভেড়া থাকতে পারে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় খামারে সমিতির সদস্যদের মোট ভেড়ার প্রায় ৫-১০% ভেড়া থাকবে। সদস্যদের খামারে সিলেকটিভ ব্রিডিং পদ্ধতি অনুসরণ করে বাছাইকৃত ভেড়া/ভেড়ী প্রজনন করেন। সদস্যরা তাদের খামারে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের ভেড়ী কেন্দ্রীয় প্রজনন খামারে সরবরাহ করেন, বিনিময়ে তারা কেন্দ্রীয় খামার থেকে উৎকৃষ্ট মানের পাঁঠা পান। সাধারণত প্রতি ৪টি ভেড়ীর বিনিময়ে তারা ১টি পাঁঠা সংগ্রহ করেন। কেন্দ্রীয় প্রজনন খামারে প্রজননের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরন পূর্বক প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৮.১০.৩ সরকারি/বেসরকারি ব্রিডিং খামারে ভেড়ার জাত উন্নয়ন

সরকারি/বেসরকারি ব্রিডিং খামারে দেশী জাতের ভেড়ার জাত ঠিক রেখে সিলেকটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। এজন্য পিউর-ব্রিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শুরুতে (১ম বছর) বাহ্যিক গুণাবলী ও উৎপাদনশীলতার (সম্ভব হলে) উপর ভিত্তি করে ভাল ভেড়া/ভেড়ী নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত ভেড়া ও ভেড়ীর প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাচ্চার উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই পূর্বক জেনেটিক ও ফেনোটাইপিক বা বাছাই করতে হবে। এভাবে ৫-১০ জেনারেশন সিলেকশনের মাধ্যমে দেশী ভেড়ার উন্নত জাত পাওয়া যেতে পারে।

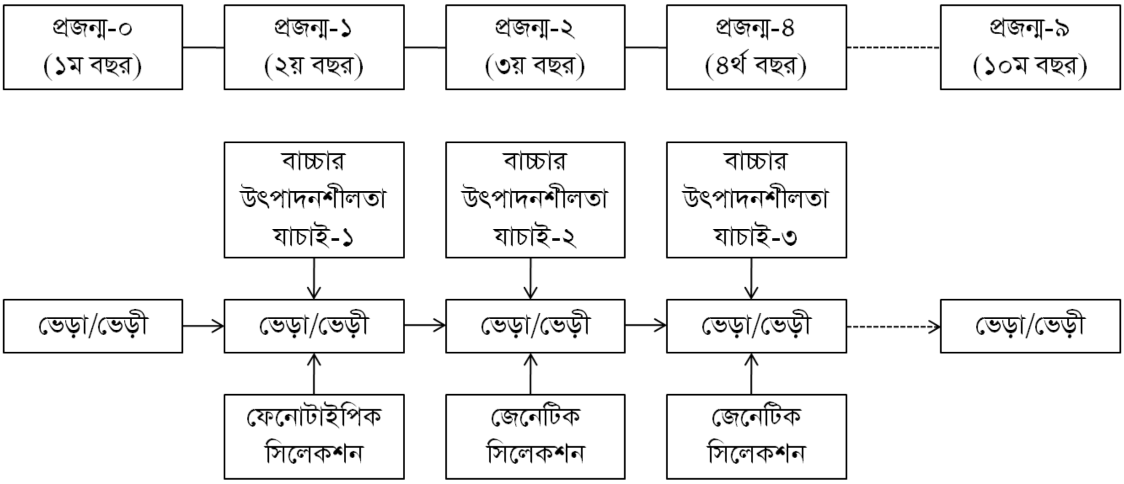

চিত্র ৮.৩ঃ সরকারি/বেসরকারি ভেড়ার প্রজনন খামারে সিলেকটিভ ব্রিডিং এর মাধ্যমে দেশীয় জাতের উন্নয়ন। এই চিত্রটি ভেড়া পালন ম্যানুয়েল থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৪)।

৮.১০.৪ সংকরায়ন বা ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন

স্বতন্ত্র দুইটি ভিন্ন জাতের ভেড়ার মধ্যে প্রজনন করাকে ক্রস ব্রিডিং বলে। সাধারণত ক্রস ব্রিডিং এর ফলে ভেড়ার উন্নয়নের হার দ্রুততর হয় এবং উভয় জাতের ভেড়ার বংশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সংকর জাতের মধ্যে সমন্বিত হয়ে হেটেরোসিস (heterosis) বা অধিক উৎপাদনশীল সংকর ভেড়ার উদ্ভব করে। এক্ষেত্রে দেশীয় জাতের সাথে উন্নত জাতের ভেড়ার ক্রিস ক্রসিং (cris-crossing) পদ্ধতিতে প্রজনন করা যেতে পারে। প্রথমে (প্রজন্ম-০) দেশী জাতের

ভেড়ীকে বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়া দিয়ে ক্রসিং করানো হয়। প্রজন্ম-১ এ প্রাপ্ত শংকর জাতের ভেড়ীর সাথে দেশী জাতের ভেড়ার ক্রস করা হয় এবং প্রজন্ম-২ এ পুনরায় শংকর জাতের ভেড়ীর সাথে বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়ার ক্রস করা হয়। ফলশ্রুতিতে, পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে উদ্ভূত সংকর ভেড়ায় প্রজন্ম-১ এ প্রাপ্ত হেটেরোসিস ইফেক্ট (heterosis effect) এর দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিদ্যমান থাকবে। ভেড়ার জাত উন্নয়নের জন্য এদেশে যদিও বিভিন্ন বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়া (যেমন রোমনিমার্স, সাফ্ক, মেরিনো, লোহী এবং কাচ্চি) নিয়ে ক্রস ব্রিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা কখনো ফলপ্রসু হয়নি। এর কারণ, এক দিকে যেমন সম্ভবত ভুল বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়া নির্বাচন, অন্যদিকে অভাব ছিল সঠিক, সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী প্রজনন কার্যক্রমের। এজন্য, যে উন্নত জাতের ভেড়াকে দেশী ভেড়া উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে তা যেন এদেশের উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়া সহনশীল এবং আর্থসামাজিক পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। উল্লেখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ক্রস ব্রিডিং গ্রহণ করা যাবে না। তবে সরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত জাত নির্বাচন পূর্বক সঠিক ও দীর্ঘমেয়াদী ক্রস ব্রিডিং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অধিক মাংস/উল উৎপাদনের জন্য সিনথেটিক ভেড়ার জাত উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তবে সব সময় দেশী জাতের ভেড়ার জেনেটিক সংরক্ষণ (genetic conservation) করতে হবে। এজন্য ক্রস ব্রিডিং কার্যক্রমকে কখনোই অবাধ করা উচিত হবে না।

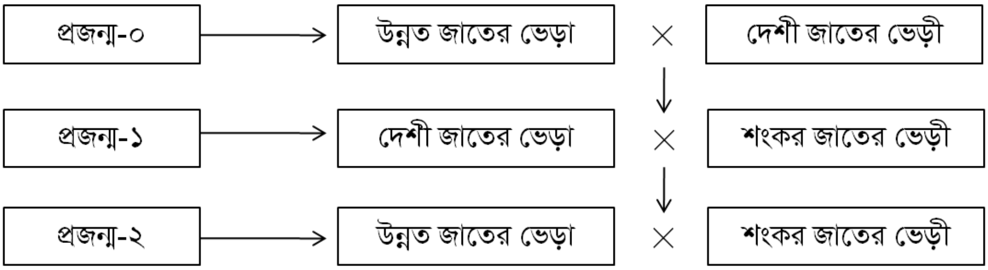

চিত্র ৮.৪ঃ ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে দেশীয় ভেড়ার উন্নয়নের সম্ভাব্য ব্রিডিং প্ল্যান। এই চিত্রটি ভেড়া পালন ম্যানুয়েল থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৪)।

৮.১১ ছাগল ও ভেড়ার গুরুত্বপূর্ণ রোগব্যাধি

৮.১১.১ ছাগল ও ভেড়ার গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক রোগব্যাধি

ছাগলের এবং ভেড়া প্রায় একই রকমের রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ছাগল-ভেড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগ হল পিপিআর বা গোট-শিপ প্লেগ বা Peste des petits ruminants। এটি একটি অনুপ্রবেশকারী সংক্রামক ব্যাধি। এদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধি নিম্নে প্রদত্ত হল-

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ	ভাইরাসজনিত রোগ
ম্যাসটাইটিস (ভাইরাস দ্বারাও হতে পারে) তড়কা বা Anthrax ধনুষ্টংকার বা Tetanus বাদলা বা Black Quarter এন্টারোটক্সেমিয়া বা Enterotoxemia	পিপিআর/গোট-শিপ প্লেগ বা Peste des petits ruminants গোটপক্স/শিপপক্স বা Goat/Sheep Pox সোর মাউথ বা Contagius Ecthyma ক্ষুরারোগ বা Foot and Mouth Disease আঁচিল বা Papillomatosis

৮.১১.২ ছাগল ও ভেড়ার ভ্যাকসিনেশন সিডিউল

সারণি ৮.২ঃ ছাগল ও ভেড়ার ভ্যাকসিনেশন সিডিউল।

টিকার নাম	টিকার প্রকার	মাত্রা ও প্রয়োগ স্থান	সরবরাহ বোতল	ইমিউনিটি
পিপিআর রোগের টিকা বা PPR Vaccine	ইনএ্যাকটিভেটেড	১০০ মিলি ডাইলুয়েন্টের সাথে মিশিয়ে ১ মিলি কাঁধের চামড়ার নিচে	১০০ মাত্রা	৩/৪ বৎসর
তড়কা রোগের টিকা বা Anthrax Vaccine	জীবন্ত স্পোর	ছাগল ও ভেড়ায় ০.৫ মিলি চামড়ার নিচে	১০০ মিলি	১ বছর
বাদলা রোগের টিকা বা Black Quarter Vaccine	মৃত টিকা	ছাগল ও ভেড়ায় ২ মিলি চামড়ার নিচে	৩০০ এবং ১০০ মিলি	৬ মাস
ক্ষুরারোগের টিকা বা Foot And Mouth Disease Vaccine	ইনএ্যাকটিভেটেড	মনোভ্যালেন্ট- ১ মিলি, ডাইভ্যালেন্ট- ২ মিলি, ট্রাইভ্যালেন্ট- ৩ মিলি গলার চামড়ার নিচে	৯৬ মিলি	৬ মাস

প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদানের পর প্রতি ছয় মাস অন্তর বুস্টার হিসেবে ক্ষুরারোগ এবং এন্টারোটক্সিমিয়া রোগের ভ্যাকসিন দিতে হবে। ভেড়া যদি ২ বছরের অধিক পালে থাকে তবে ২.৫ বছর বয়সে প্রথমে পিপিআর এবং এর এক মাস পর শীপ-পক্স ভ্যাকসিন দিতে হবে। যেহেতু একদিনে একই বয়সের অনেক ভেড়া পাওয়ার সম্ভাবনা কম এবং এ সকল টিকার একক ডোজ হিসাবে পাওয়া যায় না সেজন্য বর্ণিত কর্মসূচিটি একথাইমা ব্যতীত ভেড়ার বয়স ১ মাস পর্যন্ত আগ পিছ করা যেতে পারে।

৮.১১.৩ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ

পিপিআর ছাগল ও ভেড়ার একটি তীব্র ও ছোঁয়াচে প্রকৃতির ভাইরাস রোগ যার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, নেক্রটিক স্টোমাটাইটিস, ডায়রিয়া, চোখ ও নাক থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘন পদার্থ নিঃসরণ, কষ্টসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, অবসাদগ্রস্ততা, গর্ভবতী প্রাণির গর্ভপাত ইত্যাদি। এ রোগের পরিচিতি রয়েছে নানাভাবে। পিপিআর (Peste des Petits Ruminants) কে গোট প্লেগ বা কাতা (Kata) হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আরও বিভিন্ন নাম যেমন সিউডোরিন্ডারপেস্ট অব স্মল রুমিন্যান্টস্, পেস্ট অব স্মল রুমিন্যান্টস্, পেস্ট অব শিপ এন্ড গোটস্, স্টোমাটাইটিস-নিউমোএন্টেরাইটিস সিনড্রোম, কন্টাজিয়াস পাসচুলার স্টোমাটাইটিস এবং নিউমোএন্টারাইটিস কমপ্লেক্স হিসেবে একে অভিহিত করা হয়েছে। ইহা ছাগল ও ভেড়ার একটি ভাইরাসজনিত রোগ হলেও তা ছাগলের ক্ষেত্রে প্রায়শ অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে থাকে এবং মহামারী আকারে দেখা দেয়। যেখানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় সেখানে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত ছাগল আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সব বয়সের ছাগলই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে এক বছর বয়স পর্যন্ত ছাগলই অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সব স্থানেই এ রোগের প্রাদুর্ভাবের ইতিহাস রয়েছে। পিপিআর রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাবের ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাগলের প্রাণহানি ঘটে এবং এর ফলে শত শত কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কারণতত্ত্ব: ছাগলের পিপিআর রোগ একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের ভাইরাস Paramyxoviridae ফ্যামিলি-এর অন্তর্ভুক্ত একটি morbillivirus। গবাদিপশুর রিন্ডারপেস্ট, কুকুরের কেনাইন ডিস্টেমপার, ঘোড়ার ইকুয়াইন ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং মানুষের হামের ভাইরাসের সাথে এই ভাইরাস গভীর সম্পর্কযুক্ত। পিপিআর ভাইরাসের আফ্রিকান ও এশিয়ার ভাইরাসের স্ট্রেইনস্-এর মধ্যে কিছু জৈবরাসায়নিক পার্থক্য রয়েছে যা ইঙ্গিত করে যে উভয় স্টেইনস্ সম্ভবত স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভব ঘটেছিল। আবার অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, প্রায় ৬০/৭০ বছর যাবৎ গবাদিপশুর রিন্ডারপেস্ট রোগ দমনকল্পে গোট-এডাপটেড ভ্যাকসিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তা থেকে সম্ভবত ছাগলে এ রোগের সূত্রপাত ঘটে থাকতে পারে।

রোগতত্ব (epidemiology): প্রধানত ছাগলই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে ভেড়াতেও এ রোগ দেখা দিয়ে থাকে। হরিণ এ রোগের প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের দেহে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে না। অধিক দুর্বল, ধকলযুক্ত অবস্থা, একই সময়ে পরজীবী ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে। যমুনাপারি জাতের ছাগলের চেয়ে (৩২.৭৬%) দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট জাতের ছাগলে (৬৭.২৮%) অধিক সংক্রমণ ঘটে বলে জানা গেছে। পিপিআর রোগ সর্বপ্রথম ১৯৪২ সালে আফ্রিকার আইভোরী কোস্টে সণাক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তা সেনেগাল, ঘানা, টোগো, বেনিন ও নাইজেরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে তা আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, মিয়ানমার, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ ছাগল ও ভেড়ার প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। ধারণা করা হয়, ইতোপূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছাগল ও ভেড়াতে এ জাতীয় রোগের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল তখন তা রিন্ডারপেস্ট হিসাবে সন্দেহ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয় তা সম্ভবত পিপিআর রোগের সংক্রমণ ছিল কারণ এই উভয় রোগেরই নিদানিক লক্ষণসমূহ একই ধরণের যা উপসর্গ প্রত্যক্ষ করে সহজে সণাক্ত করা সম্ভবপর নয়।

সাধারণত বাজার বা অন্য কোন স্থান থেকে ক্রয়কৃত প্রাণী খামার বা নিজস্ব ছাগল-ভেড়ার পালের সাথে রাখলে রোগের বিস্তার ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ঈদের প্রাক্কালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক ছাগল-ভেড়া বিক্রির জন্য দেশের প্রধান প্রধান এমনকি ছোট হাট-বাজারেও একত্রিত করা হয়। প্রধানত এখান থেকেই রোগের বিস্তার আরো ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। আবার অবিক্রিত পশু ফিরিয়ে নিয়ে নিজের খামার বা পালের ছাগল-ভেড়ার সাথে রাখলেও রোগের বিস্তার ঘটে থাকে। ছাগলের ক্ষেত্রে এ রোগে মৃত্যুহার ৫৫-৮৫% পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা গেলেও ভেড়ার ক্ষেত্রে তা ১০%-এর নিচে থাকে বলে জানা গেছে। এ রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে ঋতুর প্রভাবের বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি। তবে যেটা লক্ষ্য করা গেছে তা হচ্ছে, মাতৃপ্রদত্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কার্যত প্রায় চার মাসের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায় ও সর্বোচ্চ বাচ্চা প্রদানের মৌসুমের পর ৩-৪ মাস বয়স্ক সংবেদনশীল বাচ্চাদের সংখ্যা তখন বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণেই আলোচ্য মৌসুমে বাচ্চাদের মধ্যে রোগের সংক্রমণ লক্ষণীয় হয়।

রোগ বিস্তার: আক্রান্ত প্রাণির নিবিড় সাহচর্য, ব্যবহৃত দূষিত সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য উৎস থেকে মূলত ভাইরাস সুস্থ প্রাণির দেহে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে। এছাড়াও আক্রান্ত প্রাণির দেহ হতে নিঃসৃত সকল ধরণের পদার্থ (বিশেষত তরল মল) দ্রুত রোগ বিস্তার করে। প্রাধাণত শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এ রোগের ভাইরাস সংক্রমণ ঘটায়। এছাড়াও কনজাংকটাইভা এবং মুখের মিউকোসার মাধ্যমেও এ রোগের বিস্তার ঘটে। তবে কীট-পতঙ্গ এ রোগের বাহকের ভূমিকা পালন করে না বলে জানা গেছে। আক্রান্ত প্রাণির চক্ষুনিঃসৃত অশ্রু, নাক ও মুখ থেকে নির্গত পদার্থ, শ্লেষ্মা, মলমূত্রাদি থেকে এ রোগের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া বিশেষ করে যখন ধর্মীয় উৎসব হয় তখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাট-বাজারে গরু ও ছাগল বাজারজাত করা হয় এবং সেখান থেকে সহজেই রোগ দ্রুত অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ক্রয়কৃত সন্দেহজনক পশু থেকে পালের অন্যান্য সুস্থ ছাগল অচিরেই এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এছাড়া হাট থেকে অবিক্রিত ছাগল পুনরায় নিজ পালে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও রোগ বিস্তারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। রিন্ডারপেস্ট রোগের ন্যায় এ রোগের বাহক অবস্থার সৃষ্টি হয় না। তবে রোগাক্রান্ত প্রাণির রোগের সুপ্ত অবস্থায় এ রোগের ভাইরাস নিঃসরণ হয় যা থেকে সুস্থ প্রাণী আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রোগ লক্ষণসমূহ: পিপিআর রোগ তীব্র বা নাতিতীব্র হতে পারে। তীব্র ধরণের রোগ সাধারণত ছাগলে প্রত্যক্ষ করা যায় যা বাস্তবিক পক্ষে গরু-মহিষের রিন্ডারপেস্টের ন্যায় তবে এ ক্ষেত্রে শ্বাসতন্ত্রের তীব্র লক্ষণাদি দেখা দেয়। নাতিতীব্র রোগ প্রধাণত ভেড়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তবে ছাগলেও এ ধরণের রোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগলক্ষণ ও লিশানস্ বরং কম লক্ষণীয় হয় এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত প্রাণী মারা গেলেও এদের সংখ্যা কম হয় ও অধিকাংশ প্রাণী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

- এ রোগের সুপ্তিকাল ৪-৫ দিন; তবে তা সর্বনিম্ন ৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন পর্যন্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত প্রাণির দেহের তাপমাত্রা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা ১০৫-১০৭° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। জ্বর শুরু হবার ৩-৪ দিনের মধ্যে ডায়রিয়া দেখা দেয় এবং তা পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়। মলের সাথে মিউকাস থাকতে পারে ও তা রক্ত মিশ্রিত হতে পারে।
- আক্রান্ত প্রাণিকে বিষন্ন দেখায় ও হাঁচির সাথে নাক ও চোখ থেকে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। এক থেকে দুই দিন পর মুখের মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে নেক্রটিক লিশানস-এর উদ্ভব হয় যা মুখের সমগ্র মিউকোসাতে বিস্তৃত হয় এবং ডিপথেরিক প্লাক সৃষ্টি করে।
- রোগাক্রান্ত প্রাণী মাথা নিচু করে ঝিমায়। আক্রান্ত প্রাণির মুখের ঘা ও প্রদাহযুক্ত ঠোঁটের কারণে খাদ্য গ্রহণে অক্ষম হয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গর্ভবতী প্রাণিদের গর্ভপাত হতে পারে। বয়স্কদের থেকে ছোট প্রাণিরা বেশি আক্রান্ত হয় ও এদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হারও বেশি হয়।
- প্রথমে আক্রান্ত প্রাণির নাক ও চোখ থেকে পাতলা পানির ন্যায় পদার্থ বের হয় যা পরে গাঢ় ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরবর্তীতে নিঃসৃত পদার্থ শুকিয়ে গিয়ে চোখ ও নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দেয়।
- আক্রান্ত প্রাণির মুখের ভেতর মাড়ি, চোয়াল ও জিহ্বায় ঘা দেখা দেয়। এছাড়াও যোনিদ্বারসহ যোনিনালীর মধ্যে ও লিঙ্গাগ্র ত্বকে (prepuce) ঘা হতে পারে। মুখের ভেতর নেক্রটিক প্রদাহ হয়ে নিচের ঠোঁট ও মাড়ি এবং রোগের মারাত্মকতা বেশি হলে প্যালেট, গাল ও এর প্যাপিলি এবং জিহ্বা আক্রান্ত হয়। রোগের মারাত্মক অবস্থায় লিশানস্/ঘা হার্ড প্যালেট ও ফ্যারিংস্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।
- ডায়রিয়ার প্রকোপ খুব বেশি হলে শরীর শুকিয়ে যায় ও পানিশূন্যতা দেখা দেয় এবং দেহের তাপমাত্রা নিচে নেমে যেতে থাকে ও মৃত্যু ঘটে। এ অবস্থা সাধারণত ৫-১০ দিনের মধ্যে ঘটে থাকে।
- আক্রান্ত প্রাণিদের সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য রোগজীবাণু কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে রোগ জটিল আকার ধারণ করে।

ময়নাতদন্তে লক্ষণীয় লিশানস্: প্রাণির মৃতদেহ মারাত্মকভাবে পানিশূন্য থাকে এবং পেছনের অংশসমূহ তরল মল দ্বারা নোংরা হয়ে থাকে। চোখের আশেপাশে ও নাকে নিঃসৃত পদার্থের মামড়ি লেগে থাকে। ওষ্ঠ ফোলা থাকে। মুখের মিউকোসা, ফ্যারিংস্ এবং ইসোফেগাসের উর্ধ্বাংশে বিচ্ছিন্নভাবে বা ব্যাপকভাবে ঘা, নেক্রসিস ও আলসার লক্ষ্য করা যায় যা এবোমেসাম এবং ক্ষুদ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ইলিয়োসিকাল অঞ্চল ও কোলনে রক্তরঞ্জিত আলসার পরিদৃষ্ট হয় এবং মলনালীতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'জেব্রার দেহের ন্যায় দাগ' (zebra stripes) লক্ষ্য করা যায়। রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল ও মেসেনটেরিক লিম্ফ নোডসমূহ স্ফীত ও নরম থাকে এবং প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। শ্বাসনালীর সর্বত্র মারাত্মক ধরণের লিশান প্রায়শ লক্ষ্য করা যায়। নাসিকার প্রবেশ পথ থেকে ল্যারিংস্ পর্যন্ত ঘন আঠালো শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ থাকে। সাধারণত প্রায়শ ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ ও জটিলতার ফলে পুরুলেন্ট বা ফাইব্রিনাস ব্রংকোনিউমোনিয়া এবং প্লুরাইটিস দেখা যায়। অন্ত্রনালীর মাঝে যে আণুবীক্ষণিক লিশানস্ দেখা যায় তা রিন্ডারপেস্টের অনুরূপ হয় তবে এ ক্ষেত্রে তা আরো মারাত্মক হয়। পেয়ারর্স প্যাচেসে ব্যাপক আলসারেশন ও নেক্রসিস দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়: ক্লিনিক্যাল, প্যাথলজিকাল ও এপিডেমিওলজিকাল তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এ রোগ সন্দেহ করা যেতে পারে তবে নিশ্চিত হবার জন্য ভাইরাস পৃথকীকরণ ও তা সনাক্তকরণ বিশেষ জরুরি। সদ্য মৃত ছাগলের লিম্ফনোড, টনসিল, পীহা ও ফুসফুস সংগ্রহ করে কুল বক্সে বরফ দিয়ে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে। ল্যাবরেটরিতে রোগ নির্ণয়ের

জন্য ইলাইজা, নিউট্রালাইজেশন, আগার জেল প্রেসিপিটেশন অথবা আরটি-পিসিআর টেস্ট সম্পাদন করতে হয়। অন্যান্য যেসব রোগের সাথে পিপিআর-এর পার্থক্যের প্রয়োজন হয় সেগুলি হল ক) রিন্ডার পেস্ট, খ) হার্ট ওয়াটার, গ) নিউমোনিক পাসচুরেলোসিস, ঘ) কন্ট্যাজিয়াস ক্যাপ্রাইন এন্ড ওভাইন প্লুরোনিউমোনিয়া, ঙ) ককসিডিওসিস, চ) কন্ট্যাজিয়াস একথাইমা এবং ছ) রাসায়নিক বিষক্রিয়া।

চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা: ছাগলের পালে এ জাতীয় রোগ লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই অসুস্থ ছাগলকে পৃথক করে অন্যত্র রাখতে হবে। এ রোগ যেহেতু ভাইরাসঘটিত সেহেতু এর কোন চিকিৎসা নেই। তবে পরবর্তী পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পালের সংবেদনশীল সকল ছাগলকে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের এন্টিবায়োটিক প্রদানসহ পিপিআর হাইপারইমিউন সিরাম দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত। পানিশূন্যতা রোধে নরম্যাল স্যালাইন প্রয়োগ করতে হবে। চোখ, নাক ও মুখের লিশানস্ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে হবে এবং সম্ভাব্য সব ধরণের সেবাযত্ন প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত ব্যাবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে-

- প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অফিসে দ্রুত খবর দিতে হবে। আক্রান্ত প্রাণিকে ঘরের বাইরে বা মাঠে নেয়া যাবে না।
- মৃত ছাগলকে গভীর গর্তের মধ্যে রেখে তার ওপর ব্লিচিং পাউডার বা চুন ছিটিয়ে পুঁতে দিতে হবে অথবা পুঁড়িয়ে ফেলা যায়। আক্রান্ত ছাগলের ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও সকল বর্জ্য একই প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করতে হবে। এরপর উক্ত ঘর ভালভাবে পরিষ্কার করে (ডিটারজেন্ট সহযোগে) কার্যকর জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে তা তালাবন্ধ রাখতে হবে।
- বাজার থেকে ছাগল ক্রয়ের পর তাকে স্বতন্ত্র ঘরে রেখে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে অন্য ছাগলের সঙ্গে রাখা যাবে।
- কোন স্থানে পিপিআর রোগ দেখা দিলে উক্ত স্থানের চতুর্দিকে দীর্ঘ এলাকাকে কেন্দ্র করে সকল ছাগল-ভেড়াকে ভ্যাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগকে উক্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা।
- বিক্রির জন্য ছাগল বা ভেড়াকে হাটে নেয়ার পর যদি অবিক্রিত থাকে তাহলে সেসব ছাগল ও ভেড়াকে স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ করে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এরপর যদি সুস্থ থাকে তাহলে অন্যান্য পশুর সাথে মিশতে দেয়া যাবে।
- রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ছাগল ও ভেড়াকে অবশ্যই ভ্যাকসিন প্রদান করা জরুরি। ছাগলের বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলেই ভ্যাকসিন দেয়া যাবে; তবে ২ মাস বয়সের সময়ও দেয়া যেতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ৬ মাস পর বুস্টার ভ্যাকসিন (অর্থাৎ পুনরায়) দিতে হবে। একবার ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে সাধারণত ৩ বছর পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় থাকে।
- পিপিআর অথবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত ছাগল বা ভেড়াকে এই ভ্যাকসিন দেয়া যায় না। আক্রান্ত ছাগলের পালের অন্যান্য ছাগল/ভেড়াকে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল প্রাণিকেই ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব: অর্থনৈতিক দিক থেকে পিপিআর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগ। ছাগল ও ভেড়াতে প্রতি বছর পিপিআর রোগ মহামারীরূপে আবির্ভূত হয় যার ফলে বিপুলসংখ্যক প্রাণিসম্পদ বিনষ্ট হয়। বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল নানা কারণে পৃথিবীব্যাপী খ্যাত ও পরিচিত। দেশের প্রায় সর্বত্র এ ছাগল প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এমনি অবস্থায় যখন তাঁরা তাদের এই মূল্যবান সম্পদ এ রোগের কারণে হারান তখন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বছরে ২ বার বাচ্চা দান, একবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদান, সহজে অল্প স্থানে প্রতিপালন, রোগব্যাধির প্রতি কম সংবেদনশীল, শান্ত প্রকৃতির ও অন্যান্য কারণে এ জাতের ছাগল অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া ও মাংস। এ সবের গুণাগুণ ও উন্নত মানের জন্য সারা পৃথিবীতে এগুলির স্বতন্ত্র কদর রয়েছে। এই রপ্তানিযোগ্য পণ্যকে রক্ষা করার জন্য পিপিআর রোগ দমন অত্যন্ত জরুরি। শুধু তাই নয়, এই মারাত্মক রোগের ফলে বছরে যে বিপুল সংখ্যক ছাগল মারা যায় তাতে দেশ অতি উৎকৃষ্ট মানের প্রাণিজ আমিষও হারায়। এই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতিও দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

রোগ নির্মূল পরিকল্পনা: আমাদের দেশে প্রায় ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ছাগল এবং ৩২ লক্ষ ভেড়া রয়েছে (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৩-১৪ বছরের তথ্য)। প্রাণিসম্পদের এই বিপুল সম্ভারের জন্য আমরা অবশ্যই গর্বিত কিন্তু এদের রোগব্যাধি, খাদ্যাভাব ইত্যাদির কারণে আমাদেরকে সতত চিন্তিত থাকতে হয়। আলোচ্য পিপিআর রোগ স্থায়ী মহামারী (endemic) হিসাবে দেশে বিরাজ করায় প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক ছাগল ও ভেড়া মারা যায়। একদা আমাদের দেশে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন উৎপাদন হতো না কিন্তু এখন দেশে পর্যাপ্ত মাত্রায় ভ্যাকসিন উৎপাদিত হচ্ছে। রিন্ডারপেস্টসদৃশ রোগ পিপিআর আমাদের অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে দীর্ঘকালব্যাপী রিন্ডারপেস্ট বিরাজ করেছে এবং তার ফলে গোসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু এই মারাত্মক মহামারীকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জন্য যৌক্তিক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল এবং এই কর্মকান্ড সফলভাবে সম্পাদনের জন্য বিপুলসংখ্যক কর্মী দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে কর্মরত থেকেছেন। এক্ষণে বর্তমানে দেশে বিরাজিত পিপিআর রোগ নির্মূলের উদ্দেশ্যেও অনুরূপ স্ট্র্যাটেজী অনুসরণ করা উচিত। এজন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে নিবিড়ভাবে ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। এই সাথে অতি দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ, আক্রান্ত প্রাণিদের নিধন ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় মৃতদেহ সৎকার, আক্রান্ত প্রাণিদের ব্যবহৃত সকল সরঞ্জামাদি, বর্জ্য ইত্যাদি একই উপায়ে ধ্বংস, সিরোসারভেইল্যান্স, মনিটরিং প্রভৃতি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। আক্রান্ত প্রাণিদের বাসগৃহ ময়লা পরিষ্কারক দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করে কার্যকর জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। আক্রান্ত এলাকায় সঙ্গনিরোধ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। আক্রান্ত এলাকা থেকে কোন ছাগল বা ভেড়া বাইরে আনা বা হাট-বাজারে নেয়া যাবে না। সর্বোপরি যেটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা। এসব ব্যবস্থা গৃহীত হলে পিপিআর রোগও একসময় আমাদের দেশ থেকে নির্মূল হবে বলে আশা পোষণ করা যায়।

৮.১২ ইন্টেনসিভ পদ্ধতির ১০০ টি ছাগলের বাণিজ্যিক খামারে আয়-ব্যয়ের নমুনা

১। প্রকল্পের নাম: সোনালী গোট ফার্ম।

২। উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা: হাজী আব্দুস ছামাদ, পিতা- মৃত আজিম উদ্দিন, গ্রাম- বুড়াইল, উপজেলা- ফুলছড়ি, জেলা- গাইবান্ধা।

৩। প্রকল্পের অবস্থান: গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন উদাখালী ইউনিয়নের বুড়াইল গ্রামে যাহার জেএল নং ২২ দাগনং ৩১১৯ এবং জমির পরিমান ০.৩৫ একর।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। খামার স্থাপনের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়ন।

(খ) দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পুষ্টি উন্নয়ন ।

(গ) পারিবারিকভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।

৫। প্রকল্পের মালিকানা ও বাস্তবায়নকাল: ব্যক্তি মালিকানাধীন। ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ হতে ৫ বছর।

৬। অবকাঠামোগত অবস্থান: ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ উঁচু জায়গা ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়। ছাগল খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। জমির মালিকানা নিজস্ব।

৭। স্থায়ী খরচ/প্রয়োজনীয় মুলধন বিনিয়োগ:
(ক) প্রয়োজনীয় জমি নিজস্ব। তবে ছন ও বাঁশের ঘর তৈরি বাবদ ১,০০,০০০ টাকা।
(খ) আধা কেজি দুধ দেয় এমন ৯৫টি ছাগী ও ৫টি পাঁঠার প্রতিটি ৩,৬০০ টাকা দরে মোট ৩,৬০,০০০ টাকা।
(গ) খাবার পাত্র, পানির পাত্র, দুধের পাত্র ইত্যাদি সহ বিবিধ অন্যান্য খরচ বাবদ মোট ৪০,০০০ টাকা।
অতএব, বিনিয়োগকৃত সর্বমোট স্থায়ী খরচ বা মুলধন = (১,০০,০০০+৩,৬০,০০০+৪০,০০০) = ৫,০০,০০০ টাকা।

৮। বর্ষিক আবর্তক বা চলতি খরচ:
(ক) একটি বয়স্ক ছাগলের প্রতিদিনের দানাদার খাবার ০.৩ কেজি ধরে ১০০ টি ছাগলের জন্য বৎসরে দরকার ০.৩×১০০×৩৬৫ = ১০,৯৫০ কেজি। প্রতি কেজি ২০ টাকা হারে মোট দানাদার খাদ্য খরচ ২,১৯,০০০ টাকা।
(খ) প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার দানাদার খাবার প্রতিদিন ০.১৫ কেজি হিসেবে বৎসরে মোট দানাদার খাদ্য খরচ ৫৪,৭৫০ টাকা।
(গ) ২% হারে প্রয়োজনীয় চিটাগুড় ২,৭৩৭.৫ কেজি। প্রতি কেজি ২০ টাকা হারে মোট মূল্য ৫৪,৭৫০ টাকা।
(ঘ) ১ কেজি হারে প্রতিটি বয়স্ক ও বাড়ন্ত ছাগলের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস প্রতি কেজি ০.৪০ টাকা হারে বৎসরে মোট খরচ ০.৪×২০০×৩৬৫ = ২৯,২০০ টাকা।
(ঙ) ঔষধ ও আনুষঙ্গিক খরচ ৪০,০০০ টাকা।
অতএব, সর্বমোট বার্ষিক আবর্তক বা চলতি খরচ = (২,১৯,০০০ + ৫৪,৭৫০ + ৫৪,৭৫০ + ২৯,২০০ + ৪০,০০০) = ৩,৯৭,৭০০টাকা।

৯। আবর্তক বা চলতি আয়:
(ক) দৈনিক গড়ে ০.৫ লিটার হারে ২০০ দিনে ৯৫ টি ছাগীর দুধ লিটার প্রতি ৩২ টাকা দরে বিক্রি করে মোট আয় ০.৫×৯৫×৩২×২০০ = ৩,০৪,০০০ টাকা।
(খ) বছরে ১৫০টি বাড়ন্ত ছাগল ১৬০০ টাকা দরে বিক্রি করলে মোট আয় ২,৪০,০০০ টাকা।
(গ) খামারে উৎপাদিত জৈবসার বিক্রি করে বাৎসরিক আয় ১০,০০০ টাকা।
বার্ষিক সর্বমোট আয় = ৫,৫৪,০০০/=

১০। বাৎসরিক মুনাফা বা নীট আয়:
খামারের বাৎসরিক সর্বমোট আয় ৫,৫৪,০০০ টাকা থেকে বার্ষিক মোট আবর্তক খরচ ৩,৯৭,৭০০ টাকা বাদ দিলে বার্ষিক মুনাফা থাকবে মোট ১,৫৬,৩০০ টাকা।

১২। ব্যাংক ঋণ পরিশোধের খতিয়ান:

বছর	ঋণের পরিমান	সুদ	মোট	আবর্তক খরচ বাদে নীট আয়	পরিশোধ			মালিকের উদ্বৃত্ত নীট আয়
					মূল	সুদ*	মোট	
প্রথম	৫,০০,০০০	৫০,০০০	৫,৫০,০০০	১,৫৬,৩০০	১,০০,০০০	৫০,০০০	১,৫০,০০০	৬,৩০০
দ্বিতীয়	৪,০০,০০০	৪০,০০০	৪,৪০,০০০	১,৫৬,৩০০	১,০০,০০০	৪০,০০০	১,৪০,০০০	১৬,৩০০
তৃতীয়	৩,০০,০০০	৩০,০০০	৩,৩০,০০০	১,৫৬,৩০০	১,০০,০০০	৩০,০০০	১,৩০,০০০	২৬,৩০০
চতুর্থ	২,০০,০০০	২০,০০০	২,২০,০০০	১,৫৬,৩০০	১,০০,০০০	২০,০০০	১,২০,০০০	৩৬,৩০০
পঞ্চম	১,০০,০০০	১০,০০০	১,১০,০০০	১,৫৬,৩০০	১,০০,০০০	১০,০০০	১,১০,০০০	৪৬,৩০০
ষষ্ঠ				১,৫৬,৩০০				১,৫৬,৩০০

*এখানে সুদের হার ১০% ধরা হয়েছে।

১৩। মতামত: উদ্যোক্তা ৫ বৎসরে প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের পর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প চালু রাখবেন এবং আত্মকর্মস্থানের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ১,৫৬,৩০০ টাকা নীট আয় করে স্বাবলম্বী হবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, খামারের প্রয়োজনীয় ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্থিতাবস্থায় ধরা হয়েছে। [বিশেষ দ্রষ্টব্য: খামারে আয়-ব্যয়ের এই হিসাব ২০১০ সালের গড় বাজার দর অনুযায়ী প্রণীত; স্থান ও কাল ভেদে এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তনশীল।]

অধ্যায় ৯

হাঁস-মুরগি পালন

৯.১ পোল্ট্রির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

পোল্ট্রি বলতে বুঝায় পাখি জাতীয় যে সকল প্রজাতি মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে বংশ বৃদ্ধি করে এবং মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেমন- হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পোল্ট্রির সংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি ৬ লক্ষ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্য)। পালন পদ্ধতি অনুযায়ী এসকল পোল্ট্রির প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হল ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত পারিবারিক পদ্ধতি এবং অন্যটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি।

- পারিবারিক পোল্ট্রিঃ পারিবারিক পোল্ট্রি বলতে উন্মুক্ত (scavenging) বা অর্ধ-উন্মুক্ত (semi-scavenging) অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমে পালিত পোল্ট্রিকে বুঝায়, যা পরিবারের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- বাণিজ্যিক পোল্ট্রিঃ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি বলতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে (floor) অথবা খাঁচায় (cage) প্রতিপালিত অধিক উৎপাদনশীল (ডিম ও মাংস) বাণিজ্যিক প্রজাতির পোল্ট্রিকে বুঝায়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১০০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক পোল্ট্রি পালন বাণিজ্যিক পোল্ট্রি হিসেবে গণ্য হয়।

ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় সমান সমান এবং মাংস উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় ৬০ঃ৪০। গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৮০ ভাগ বাড়িতে পারিবারিক পদ্ধতিতে হাঁস ও মুরগি পালন করা হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রির জাত উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য (genetic trait) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন বলতে পোল্ট্রি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা বা বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে বুঝায়। খামারে কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, হরমোন, growth promoter/ feed additives বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার ব্যতিরেকে ক্লেশ ও পীড়নমুক্ত পরিবেশে জৈব খাদ্যে (genetically modified organism ব্যতিত) প্রতিপালিত খামারের পোল্ট্রিকে অর্গানিক পোল্ট্রি বুঝায়।

সারণি ৯.১ঃ বিগত এক দশকের বছরভিত্তিক বাংলাদেশে হাঁস-মুরগির পরিসংখ্যান।*

ক্রমিক	বছর	হাঁস (লক্ষ সংখ্যা)	মুরগি (লক্ষ সংখ্যা)	মোট (লক্ষ সংখ্যা)
১	২০০৪-০৫	৩৭২.৮০	১৮৩৬.৫০	২২০৭.৩০
২	২০০৫-০৬	৩৮১.৭০	১৯৪৮.২০	২৩২৯.৯০
৩	২০০৬-০৭	৩৯০.৮০	২০৬৮.৯০	২৪৫৯.৭০
৪	২০০৭-০৮	৩৯৮.৪০	২১২৪.৭০	২৫২৩.১০
৫	২০০৮-০৯	৪১২.৩৪	২২১৩.৯৪	২৬২৬.২৮
৬	২০০৯-১০	৪২৬.৭৭	২২৮০.৩৫	২৭০৭.১২
৭	২০১০-১১	৪৪১.২০	২৩৪৬.৮৬	২৭৮৮.০৬
৮	২০১১-১২	৪৫৭.০০	২৪২৮.৬৬	২৮৮৫.৬৬
৯	২০১২-১৩	৪৭২.৫৪	২৪৯০.১১	২৯৬২.৬৪
১০	২০১৩-১৪	৪৮৮.৬১	২৫৫৩.১১	৩০৪১.৭২
১১	২০১৪-১৫	৫০৫.২২	২৬১৭.৭০	৩১২২.৯২
১২	২০১৫-১৬	৫২২.৪০	২৬৮৩.৯৩	৩২০৬.৩৩

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য।

৯.২ পোল্ট্রি পালনের গুরুত্ব

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ বুনো পাখিদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখিতে পরিণত করেছে। বিভিন্ন ধরণের পোল্ট্রির মধ্যে মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস, টার্কি, তিতির ইত্যাদি প্রধান। যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এসব পোল্ট্রি পালন করে আসছে, তথাপি এদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে আধুনিক ব্যবস্থায় সুশৃংখলভাবে পালনের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। বর্তমানে পোল্ট্রি পালন বিশ্বে এক ধরণের শিল্প হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পোল্ট্রি শিল্প নামে খ্যাত এ শিল্প মানুষকে এনে দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি। হাঁস-মুরগি প্রাণিজ আমিষের একটি অন্যতম উৎস। আমাদের দেশে আগে হাঁস-মুরগি সাধারণত গৃহস্থের বাড়িতে পালন করতে দেখা যেত। গৃহস্থ বাড়ির উঠানে আর আনাচে কানাচে পরিত্যক্ত শস্যকণা, উচ্ছিষ্ট খাবার, পোকা মাকড়, কঁচি ঘাস ইত্যাদি খেয়ে হাঁস-মুরগি বছরে যে ডিম দিতো গৃহস্থের তাই ছিল বেশ লাভজনক। ক্রমশ মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে মুরগি গৃহস্থের উঠানেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলোনা- তা জায়গা করে নিলো সুপরিকল্পিত খামারে, শহরের পাকা বাড়ির বারান্দায় বা এক চিলতে উঠানের কোণে কিম্বা ছাদে। এখন হাঁস-মুরগি পালন একটা লাভজনক আয়ের উৎস হিসেবে স্বীকৃত। পোল্ট্রি শিল্পটি কম পুঁজি নির্ভর ও অধিক শ্রমঘন হওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পোল্ট্রিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পোল্ট্রির উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি সমান গুরুত্ব বহন করে। হাঁস-মুরগির গুরুত্ব নিম্নে দেয়া হল-

- মাংস ও ডিম (meat and eggs): হাঁস-মুরগির মাংস ও ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। সুস্বাস্থ্যের জন্য যে সমস্ত খাদ্য মানুষের প্রয়োজন যেমন- আমিষ, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন ইত্যাদি তা সবই পাওয়া যায় এই মাংস ও ডিম থেকে। আদর্শ খাদ্য হিসেবে দুধের পরই ডিমের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ডিম থেকে বিভিন্ন লোভনীয় খাবার (কেক, পুডিং ইত্যাদি) তৈরি হয়।
- কর্মসংস্থান ও আয় (employment and income): হাঁস-মুরগি পালন হতে পারে কর্মসংস্থান, আয় ও পুষ্টির উৎস। বাড়ীতে সামান্য সংখ্যায় হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমেও নিজ পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে অর্থ উপার্জনের সহজ পথ করে নেয়া যায়। হাঁস-মুরগি পালনের সম্যক জ্ঞান নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি খামার গড়লেতো কথাই নেই।
- বিষ্ঠা (droppings): পাখির বিষ্ঠা জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। হাঁস-মুরগির বিষ্ঠায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম রয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের উপর চাপ বহুলাংশে কমে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রেখে কম খরচে অধিক পরিমাণে ফসল ফলানো যায়।
- পালক (feathers): হাঁস-মুরগি পালকের ব্যবহার আমাদের দেশে খুব একটা প্রচলিত না থাকলেও শীত প্রধান দেশে পালকের তৈরি গদি, লেপ, বালিশ ও পোষাক বেশ জনপ্রিয়।

খাদ্য নিরাপত্তায় পোল্ট্রির ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তায় পোল্ট্রির গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও পোল্ট্রি যে সমস্ত অবদান রাখে তা হচ্ছে-

- সারা বছর উন্নতমানের খাদ্য (ডিম ও মাংস) পাওয়া যায়। কিন্তু ফসল, ফল বা সবজির উৎপাদন হয় মৌসুম ভিত্তিক।
- ডিম ও মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিকর ও মূল্যবান খাবার প্রস্তুত করা যায় এবং তা সংরক্ষণও করা যায়।
- হাঁস-মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রি প্রজাতি যখন প্রয়োজন হয় তখনই জবাই করে মাংস হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- প্রাণিজ খাদ্য (ডিম ও মাংস) বিক্রি করে নগদ অর্থ উপার্জনসহ অন্যান্য প্রয়োজনে সেই অর্থ ব্যয় করা যায়।

- বাণিজ্যিক খামারে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- পোল্ট্রির বিষ্ঠা বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- পোল্ট্রির বিষ্ঠা জৈব সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য অতি জরুরি।

৯.৩ পোল্ট্রির জাত পরিচিতি

হাঁসের জাত

বিশ্বে ২২ প্রকারের হাঁসের জাত আছে। পৃথিবীতে সর্বাধিক হাঁস পালন করা হয় চীন দেশে এবং বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। আমাদের গ্রাম গঞ্জের পুকুর বিল বা ডোবায় যে সমস্ত হাঁস চড়ে বেড়াতে দেখা যায় এগুলো দেশী জাতের পাতি হাঁস। এরা আকারে ছোট ও ডিম কম দেয়। দেশী হাঁস অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু চঞ্চল এবং সতর্ক। এদের পালকের রং বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। দেশী হাঁসের মধ্যে নাগেশ্বরী, মাটি হাঁস, সাদা হাঁস, রাজ হাঁস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাগেশ্বরী এবং মাটি হাঁস সিলেটে পাওয়া যায় এবং সাদা হাঁস বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যায়। রাজহাঁস কেহ কেহ সখ করে পালন করেন। রাজহাঁস খুব কম ডিম দেয়। এসকল দেশী হাঁস সহ বিদেশী খাঁটি জাতের উন্নত হাঁসও আমাদের দেশে পালন করা হয়। উন্নত জাতের হাঁস মাংস ও ডিমের জন্য পালন করা হয়। ডিমের জন্য ভাল জাত হল খাকি ক্যাম্বেল, জিংডিং, ইন্ডিয়ান রানার ইত্যাদি। আর মাংসের জন্য ভাল জাত হল- বেইজিং বা পেকিন এবং মাসকোভি। আমাদের দেশে উন্নত জাতের যে সব হাঁস পালন করা হয় নিম্নে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-

- **খাকি ক্যাম্বেল:** মালয়েশীয় জংলি হাস, ইন্ডিয়ান রানার ও রুয়েন হাঁসের সঙ্করায়নের ফলে এ জাতের উদ্ভব হয়েছে। ক্যাম্বেল হাঁস সাদা ও খাকি রংয়ের হয়। খাকি রংয়ের ক্যাম্বেল হাঁস ডিম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এরা বছরে প্রায় ২৫০-৩০০ টি ডিম দেয়।
- **জিংডিং হাঁস:** এ হাঁসের উৎপত্তিস্থল চীন দেশে। এদের গলা ও দেহ কিছুটা লম্বা। হাঁসের রং উজ্জল। ডিমের রং হালকা নীল ও সবুজাভ। এরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দেয়।
- **ইন্ডিয়ান রানার:** এদের ঘাড় লম্বা ও সুগঠিত এবং মাথা উপরের দিকে উঁচু। দেহ হালকা, লম্বা এবং সামান্য গোলাকার। এ জাতের হাঁসের পালকের রং উজ্জল সাদা। মাথার উপরিভাগ চ্যাপটা। এদের ডিমের রং সাদা, বছরে ২০০-২৫০ টি ডিম দেয়।

মুরগির জাত

গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে ছাড়া অবস্থায় যে সমস্ত মুরগি চড়ে বেড়ায় তারা দেশী জাতের মুরগি। এরা সধারণত ঘর দুয়ার ও বাড়ীর আশে পাশে ক্ষেতে খামারে চড়ে বেড়ায় ও খাদ্য কুড়িয়ে খায়। এরা আকারে ছোট, ডিম কম দেয়। এদের দেহ সুগঠিত ও শক্ত। এরা খুব চালাক ও সতর্ক। দেশী মুরগির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাত আছে। এদের মধ্যে আছিল বা লড়াইয়ের মুরগি, পালকশূন্য গ্রীবা বা গলা ছোলা মুরগি, চাটগাঁয়ের মুরগি এবং মাথায় পালকের গোল ঝুঁটি মুরগি প্রধান। আছিল বা লড়াইয়ের মুরগি দেখতে সুন্দর কিন্তু তারা চঞ্চল ও হিংস্র। এ জাতের মুরগির মধ্যে মোরগ লড়াইয়ের জন্য ব্যবহার হয়। লড়াইয়ের মোরগ বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। আছিল মুরগি ব্রাক্ষনবাড়িয়া জেলার সরাইল ও চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানায় দেখা যায়। গলা ছোলা মুরগির গলায় কোন পালক থাকে না। এরা আকারে বড়। গলার ফুল বেশ বড় এবং লাল রংয়ের। সিলেট জেলা ও বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে এ মুরগি দেখা যায়। খাঁটি চাটগায়ের মুরগি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানায় দেখা যায়। এরা আকারে বড়, গলা লম্বা, মাথা ছোট, মাথায় ঝুঁটি থাকে। মাথায় পালকের গোল ঝুঁটি মুরগি বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এদের মাথার পালক গোল হয়ে এক গুচ্ছ ঝুঁটি তৈরি করে। ঝুঁটি ও গলার ফুল খুব ছোট ও লাল রংয়ের।

উন্নত খাঁটি মুরগির উৎপত্তিস্থল অনুসারে এরা আমেরিকান, এশিয়াটিক, ইংলিশ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাত হিসেবে পরিচিত। হালকা জাত ও ভারী জাত- এ দু'শ্রেণীতে মোরগ-মুরগীকে ভাগ করা যায়। যে সব মুরগির ওজন কম তারা হালকা জাতের অন্তর্ভূক্ত; যেমন- লেগহর্ন এবং যে সব মুরগির ওজন বেশি তা হল ভারী জাত; যেমন- রোড আইল্যান্ড রেড। এদের মধ্যে যেসব জাত বাংলাদেশে পরিচিত তাদের সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল-

- **হোয়াইট লেগহর্ণ:** এটি ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। উৎপত্তিস্থল ইতালি। বর্তমানে বিশ্বের সব স্থানে প্রসার লাভ করছে। দেহের আকার আকৃতি ছোট। ডিমের আকার বড়, এদের সাদা, বাদামী, নীলাভ, হলুদ ও কাল জাত আছে। তবে সাদা রং-এর একক ঝুঁটি বিশিষ্ট উপজাত সবচেয়ে জনপ্রিয়।
- **রোড আইল্যান্ড রেড:** এটি আমেরিকান শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ভারী জাত। এটি সংক্ষেপে আরআইআর নামে পরিচিত। দেহের পালক লাল কিন্তু লেজের দিকের পালক, গলা এবং ডানার পালক কিছুটা কালো। ডিমের রং বাদামী। বাণিজ্যিক হাইব্রিড সৃষ্টির জন্য এ মুরগির ডিম ব্যবহার করা হয়। এরা আমাদের দেশে বছরে ১৫০-২০০ টি ডিম দেয়।
- **নিউ হ্যাম্পশায়ার:** আমেরিকার নিউহ্যাম্পশায়ার নামক স্থানে এর উৎপত্তি বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। অনেকটা গোলাকৃতি, বড় আকারের এবং হালকা হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট এ মুরগি প্রধাণত মাংস প্রদানকারী। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে হলুদ বর্ণের পা এবং একক ঝুঁটি। ডিমের রং বাদামী। বর্তমানে হাইব্রিড মুরগি তৈরি করতে এদের ব্যবহার করা হয়।
- **ফাইওমি:** এটি ভূমধ্যসাগরীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জাত। উৎপত্তিস্থল মিশর। এদের গলার দিকে ধুসর এবং সমস্ত শরীরে সাদাকালো রংয়ের মিশ্রণ আছে। এরা খুব চঞ্চল ও চালাক এবং দেশী মুরগির মত এদের ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। এদের কানের লতি সাদা। মাথার ঝুঁটি আকারে ছোট, বেজোর এবং লাল। আমাদের দেশে এরা বছরে ১৫০-২০০ টি ডিম দেয়।

আধুনিক বাণিজ্যিক জাতের মুরগি

বিশ্বে এ যাবৎকাল প্রায় ৩০০ প্রকারের খাঁটি জাতের (pure breed) মুরগি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সমস্ত জাতের মুরগির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্রিডিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার খাঁটি জাতের (pure breed) ডিম উৎপাদনকারী মুরগির মধ্যে প্রজনন করে বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার বা ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জাত (হাইব্রিড) উদ্ভাবন করা হয়। এক্ষেত্রে ২টি স্বতন্ত্র জাতের মুরগির মধ্যে প্রজননের এক পর্যায়ে হঠাৎ করে এক নতুন জিনের আবির্ভাব ঘটে। এই জিনের প্রভাবে উৎপাদিত মুরগি (progeny) তার পূর্বপুরুষের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ও বিশেষ গুণের অধিকারী হয়। এই মুরগিকে হাইব্রিড ভিগর (Hybrid Vigor) বলে। এই প্রজননের ফলে ২টি অসদৃশ (heterogygous) জিনের জোড় সৃষ্টি হয়। এই জাতের মুরগি বাণিজ্যিক জাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

লেয়ার মুরগির জাত: ডিমের প্রকৃতি বা রং অনুসারে বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগি দুই জাতে ভাগ করা হয়। যেমন-

- সাদা ডিম উৎপাদনকারী জাতের মুরগি: সাদা সিংগল কম্ব লেগ হর্ণ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ খাঁটি জাতের মুরগি। বর্তমানে ২ বা ততোধিক লাইনের সাথে ক্রস করে বাণিজ্যিক জাতের সাদা ডিম উৎপাদনকারী মুরগী উপন্ন করা হয়। এরা তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট, কম খাদ্য খায় এবং এদের ডিমের শেল সাদা। কয়েকটি সাদা ডিম উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক মুরগির জাত যেমন- ইসা হোয়াইট, লোহমেন হোয়াইট, হাইসেক্স হোয়াইট, হাইলাইন হোয়াইট, হাবার্ড হোয়াইট, শেভার ক্রস হোয়াইট ইত্যাদি।
- রঙ্গিন ডিম উৎপাদনকারী জাতের মুরগি: রোড আইল্যান্ড রেড (আরআইআর), নিউ হ্যাম্পশায়ার, ব্যারেড প্লাইমাউথ রক (বিপিআর) ইত্যাদি খাঁটি রঙিন ডিম উৎপাদনকারী জাতের মুরগী হতে বাণিজ্যিক রঙিন ডিম উৎপাদনকারী জাতের মুরগী উৎপাদন করা হয়। এই জাতের মুরগি আকারে বড়, খাদ্য বেশি খায়, ডিমের আকার বড় এবং ডিমের শেল বাদামী বা ঈষৎ লাল। এই জাতীয় মুরগির দেহের রং বাদামী/লাল/ঈষৎ লাল/কালো/সাদা কালো মিশ্রণ হয়ে থাকে। কয়েকটি রঙিন ডিম উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক জাতের মুরগী যেমন- ইসা ব্রাউন, ইসা রোজ, লোহমেন ব্রাউন, হাইসেক্স ব্রাউন, হাইলাইন ব্রাউন, শেভার ব্রাউন, হাবার্ড ব্রাউন, ষ্টারক্রস ব্রাউন ইত্যাদি।

ব্রয়লার মুরগির জাত: সাধারণত ভারী জাতের মুরগি যেমন- কর্ণিশ, সাসেক্স, বিপিআর, হোয়াইট প্লাইমাউথ রক (ডাব্লিউপিআর), নিউ হ্যাম্পশায়ার ইত্যাদি হতে মাংস উৎপাদনকারী জাত বা ব্রয়লার জাত উদ্ভাবন করা হয়। ব্রয়লার জাতের জন্য দুই বা ততোধিক লাইনের মোরগ-মুরগীর মধ্যে ক্রস করতে হয় এবং একাধিক লাইনের প্যারেন্ট মুরগি

তৈরি করতে হয়। সাধারণত ভোক্তা ব্রয়লার মুরগির চামড়ার রং সাদা অথবা হলুদ পছন্দ করে। চামড়ার রং সাদা অথবা হলুদ করার জন্য রক্তে অনুরুপ বৈশিষ্ট্যের জিনের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। কয়েকটি ব্রয়লার মুরগির জাত যেমন- ইসা ভেডেট, শেভার মাস্টার, এভিয়ার, ভেনকব, ষ্টার ব্রো, শেভার ব্রো, হাই ব্রো, হাবচিকস ইত্যাদি। সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী লাইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় করে ব্রয়লার ষ্টক তৈরি করা হয়। যেমন- মোরগের দেহ মাংসল হবে, আকারে বড় হবে, দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি হবে এবং দ্রুত খাদ্য রুপান্তর করতে পারবে।মুরগী বেশি ডিম পাড়বে, দেহ দ্রুত পালকে পরিপূর্ণ হবে এবং দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি হবে।

৯.৪ বাংলাদেশে পোল্ট্রি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইতিহাস

আবহমান কাল থেকে এ দেশের গ্রাম-গঞ্জে সনাতন পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি পালিত হয়। এ সমস্ত জাতের হাঁস-মুরগি আকারে ছোট এবং এদের ডিম উৎপাদনের হারও কম। বৃটিশ শাসনামলে হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য ঢাকার তেজগাঁও, নারায়নগঞ্জ, জামালগঞ্জ এবং সিলেটে একটি করে হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন করা হয়। এ সমস্ত খামার মূলত শাসক গোষ্ঠীর চাহিদা মিটানোর জন্য স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর জনসাধারণের মধ্যে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ সমস্ত খামার থেকে ডিম ও বাচ্চা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৫০ দশকের শেষে যশোর, পাহাড়তলী, সীতাকুন্ড, বরিশাল, কুমিল্লা, খুলনা এবং রংপুরে হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন করা হয়। এসব খামারে উন্নত জাতের বিদেশী মুরগি যেমন- হোয়াইট লেগহর্ন, আরআইআর, ব্ল্যাক মিনোরকা, নিউ হ্যাম্পশায়ার ইত্যাদি পালন করা হতো। উন্নত বিদেশী জাতের হাঁসের মধ্যে ছিল ইন্ডিয়ান রানার ও খাকী ক্যাম্পবেল। ১৯৬১ সালে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হলে ১১ টির মধ্যে ৯টি খামার কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এ সমস্ত খামার হানাদার বাহিনী কর্তৃক দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে খামারগুলো পুনর্গঠন করা হয় এবং বিদেশ থেকে ব্ল্যাক অষ্ট্রালপ, প্লাইমাউথ রক, হোয়াইট লেগহর্ন, আরআইআর ইত্যাদি পুনরায় আমদানি করা হয়। এই সময়ে গ্রামীণ জনগণের নিকট উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির চাষ জনপ্রিয় ও সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু থানায় পোল্ট্রি ইউনিট স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের খামার থেকে উন্নত মানের মুরগি ও বাচ্চা সংগ্রহ করে এ সমস্ত ইউনিটে প্রতিপালন করা হতো এবং উৎপাদিত ডিম স্বল্প মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ১৯৭৩ সালে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট থেকে খামারগুলো পুনরায় সরকারের নিকট ফেরৎ আনার পর থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত পোল্ট্রি ইউনিটগুলো তুলে নেয়া হয়। এ সময়ে সরকারি খামারে উৎপাদিত মোরগ দেশী মোরগের সাথে বিনিময় করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এভাবে উন্নত জাতের মোরগের সাথে দেশী মুরগীর সংকরায়ন করে জাত উন্নয়নের পরিকল্পনার সাথে সাথে উন্নতজাতের বাচ্চা ও ডিম বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়। আশির দশকের প্রথমে ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় এদেশে পারিবারিক হাঁস-মুরগি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যে উন্নত জাতের মুরগি জনসাধারণের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং চাহিদাও বেড়ে যায়। এ সময়ে পূর্বেকার জেলা পর্যায়ে ১১ টি খামারের সম্প্রসারণসহ মহকুমা পর্যায়ে আরো ১৫ টি খামার স্থাপন করা হয়। পূর্বেকার জেলা পর্যায়ের ১১ টি খামারে উন্নত জাতের মুরগি ছাড়াও উন্নত জাতের ইন্ডিয়ান রানার ও খাকী ক্যাম্পবেল হাঁস পালন করা হতো। এ সমস্ত উন্নত জাতের হাঁসের ডিম ও বাচ্চা স্বল্প মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া দেশী হাঁসের জাত উন্নয়নের জন্য খাকী ক্যাম্পবেল হাঁস বিনিময় কর্মসূচির প্রচলন করা হয়। দেশের উপকূল ও হাওড় অঞ্চলে এ সমস্ত উন্নত জাতের হাঁস পালন জনপ্রিয়তা পায়। ক্রমবর্ধমান হাঁসের চাহিদা মিটাতে ১৯৮৫ সালে নারায়নগঞ্জে সরকারি হাঁস-মুরগির খামারকে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার এবং দৌলতপুর সরকারি হাঁস-মুরগির খামারকে আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারে রুপান্তর করা হয়। এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী এবং অধিক উৎপাদনশীল হাঁস হিসেবে খাকী ক্যাম্পবেল ও জিনডিং হাঁস এবং মাংসের জন্য পিকিং ও মাসকোভী হাঁস পালন এবং জনসাধারণের মধ্যে বাচ্চা ও ডিম বিতরণ কর্মসূচি চালু আছে।

১৯৭৭-৭৮ সালে পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রকল্পের মাধ্যমে মিরপুর কেন্দ্রীয় মুরগির খামার ও রাজশাহীর রাজাবাড়ীহাটে আঞ্চলিক মুরগির খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে পাহাড়তলী মুরগির খামারকেও আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৬-৮৭ ও ১৯৯১-৯২ সালে গৃহীত সমন্বিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন খামারে লোকবল, যানবাহন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়। ৯০ দশকের প্রথমে পাকিস্তান ও মিশর থেকে ফাইওমী জাতের মুরগি আমদানি করা হয়। এই জাতের মুরগি গ্রামীণ পরিবেশে ছেড়ে সনাতন পদ্ধতিতে পালন করার জন্য বিশেষ উপযোগী। এদের ডিমের আকার ছোট হলেও ডিম উৎপাদনের হার অনেক বেশি। বর্তমানে হোয়াইট লেগহর্ন মোরগ ও ফাইওমী মুরগীর সংকরায়নে উৎপন্ন 'রুপালী' এবং আরআইআর মোরগ ও ফাইওমী মুরগী সংকরায়নে উৎপন্ন 'সোনালী' মুরগি এ দেশের গ্রামাঞ্চলে ছাড়া অবস্থায় পালনের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে (Hossen et al. 2012)।

এ দেশে বাণিজ্যিক জাতের মুরগির জনপ্রিয়তা সৃষ্টি এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আশির দশকের শেষে ও নব্বই দশকে 'লোম্যান' লেয়ার ও 'আরবার' ব্রয়লার মুরগির প্যারেন্ট ষ্টক আমদানি করা হয় এবং এগুলো মিরপুর কেন্দ্রীয় খামার ছাড়াও বগুড়া, জামালগঞ্জ পাহাড়তলী খামারে প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সমস্ত বাণিজ্যিক জাতের মুরগি দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়। বর্তমানে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে হ্যাচারীসহ অনেক বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য হারে ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি খামারগুলোতে ডিম, বাচ্চা উৎপাদন ও সরবরাহ ছাড়াও বিভিন্ন মেয়াদে হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে।

৯.৫ বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাতের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৬ শতাংশ। ইতোমধ্যে ডিম এবং মুরগির মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ ডিম ও মুরগি রপ্তানি শুরু করবে (প্রথম আলো ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)। নিম্নে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হল-

সারণি ৯.২ঃ বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের বর্তমান অবস্থা।

ক্রমিক	প্যারামিটার/উপাদান/সংখ্যা	পরিমাণ/অবস্থা
১	বাংলাদেশে পোল্ট্রি ফার্মের সংখ্যা	লক্ষাধিক
২	বাংলাদেশে হ্যাচারী ও ব্রিডার ফার্মের সংখ্যা	প্রায় ১৬০টি
৩	আত্মকর্মসংস্থান মূলক পেশায় নিয়োজিত	৪৫ লক্ষ নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ; এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় ৬ লক্ষ বেকার যুবক, যুবতী
৩	পোল্ট্রি সেক্টরে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৬১ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ শেষে পোল্ট্রি পেশায় যুক্ত হচ্ছে
৫	প্রতি বছর বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা	ব্রয়লার ১ দিনের বাচ্চা ১৮ কোটি; লেয়ার ১ দিনের বাচ্চা ৪ কোটি; ককরেল ১ দিনের বাচ্চা ৩ কোটি
৬	প্রতি চক্রে ব্রয়লার উৎপাদন (গড় ওজন ১.৮ কেজি)	প্রায় ১৮ কোটি
৭	ফার্মে বার্ষিক ডিম উৎপাদন	প্রায় ১০০০ কোটি
৮	বাংলাদেশে বর্তমানে ব্রয়লার প্যারেন্ট ষ্টকের সংখ্যা	প্রায় ৩৫ লক্ষ
৯	বাংলাদেশে বর্তমানে লেয়ার প্যারেন্ট ষ্টকের সংখ্যা	প্রায় ৩.৫ লক্ষ
১০	বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পোল্ট্রির খাদ্য উপাদান	ভুট্টা, সয়ামিল, গম, প্রিমিক্স, ভিটামিন, মিনারেল
১১	পোল্ট্রি শিল্পে বিনিয়োগ	সর্বমোট বিনিয়োগ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা

৯.৬ বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশ

পোল্ট্রি পালনের ইতিহাস এ উপমহাদেশের অনেক দিনের। আমাদের বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অনেক আগে থেকেই পোল্ট্রি পালন হয়ে আসছে। এমন একটা সময় ছিল বাংলাদেশে ডিমের চাহিদার ৮০ ভাগ অংশই আসত সেই গ্রামে-গঞ্জে পালিত মুরগী ও হাঁস থেকেই। ১৯৯০ সাল, ঠিক তখন থেকেই পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়নের ধারায় গতি পেয়েছে। স্থাপিত হয়েছে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার, হ্যাচারি, এমনকি ডিম ও মাংসের জন্য বিশেষ বিশেষ স্ট্রেইনের। ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে সময়। পরিবর্তিত হচ্ছে অনেক কিছু, সেই সাথে এ কথা সত্য যে পোল্ট্রি আজ শিল্পে রুপ নিয়েছে। আরও আশার ব্যাপার এটাই যে, বাংলাদেশে এখন প্যারেন্ট ও গ্রান্ড প্যারেন্ট ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে একটি সারণির মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত করা যাবে বলে মনে করি।

সারণি ৯.৩ঃ বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশে পোল্ট্রি উন্নয়নের গতিধারা।

বিষয়	সাল							
	১৯৮৫	১৯৯১	১৯৯৩	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫
লেয়ার								
হ্যাচারির সংখ্যা	২	৮	১৬	২০	৩০	৫০	৬০	৭০
প্যারেন্ট স্টক (লক্ষ সংখ্যা)	০.০২	০.২২৫	০.৬৫৫	০.৮০	১.২৫	২.৮	৩.২	৩.৫
লেয়ার মুরগী (লক্ষ সংখ্যা)	১.৬০	২০.২৫	৫৯.০	৭৮.০	১১৮.০	১৯৬.০	৩২৬.০	৩৭১
ডিম উৎপাদন (লক্ষ সংখ্যা)	৮৮০	৬২০০	১৫১০০	১৮৬৫০	৩২৫০০	৫৩৫০০	৮৮৫০০	১০১০০০
ব্রয়লার								
হ্যাচারির সংখ্যা	২	৬	১১	২৫	৫০	৭০	৮০	৯০
প্যারেন্ট স্টক (লক্ষ সংখ্যা)	০.০৫	০.৩০	০.৬৫	১.৫৫	৫.০	২৫.০	৩০	৩৫
ব্রয়লার মুরগী (লক্ষ সংখ্যা)	৬.০	৩৫.৪	৭৭.৫	১৮৮.৭	৬১০.০	১২৫০.০	১৭৫০.০	২১৮২
মাংস উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	৪.৭৫	৪৫.৪	৯৯.২	২৪৩.৭	৮২৩.৫	১৮২০.০	২৫৫০.০	৩২৪০

পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন অনেক সমস্যার মধ্যে ডুবে থেকেই হয়েছে। তাই উন্নয়নের ধারাকে আরো এগিয়ে নিতে করণীয় কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল-

- প্রতিনিয়তই বিভিন্ন পোল্ট্রি উন্নত দেশ হতে একদিনের বাচ্চা প্যারেন্ট গ্রান্ড-প্যারেন্ট স্টক আমদানি করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এসব পোল্ট্রি বা পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি ধারাবাহিকভাবে প্রবেশ করছে। বর্তমান বিশ্ব বার্ড ফ্লু/ইনফ্লুয়েঞ্জা ও আতঙ্কিত। এমন একটা অবস্থায় কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা অবশ্যই জোরদার করা প্রয়োজন। দেশের যে কোন কর্ণারে যেখানেই পোল্ট্রি প্রবেশ করবে সেখানেই তাদের জন্য কোয়ারেনটাইন ব্যবস্থায় রাখতে হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ঐ সমস্ত পোল্ট্রিকে দেশে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশে এমন কতগুলো পোল্ট্রি রোগ দেখা যাচ্ছে যেগুলো আগে পরিলক্ষিত হয়নি। তাই কোয়ারেনটাইন ব্যবস্থা জোরদার করলে এধরণের ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে যাবে।
- বাংলাদেশের নিজস্ব কোন স্ট্রেইন নেই। বাংলাদেশের আবহওয়ায় খাপ খাইতে পারে এমন একটা স্ট্রেইন তৈরি করা বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পোল্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞেরা আছেন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্তরে পোল্ট্রির জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ তাদেরকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে পোল্ট্রির চাহিদা। সঙ্গে সঙ্গে একদিনের বাচ্চার চাহিদাও বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে হ্যাচারির সংখ্যা আর হ্যাচারির ক্যাপাসিটিও। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা সেটা হল বাচ্চার গুণগত মান। হাতেগুণা দুই একটা হ্যাচারি ছাড়া বাচ্চার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। বাচ্চার মান নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে প্রথমত প্রয়োজন যে প্যারেন্ট স্টক থেকে ডিম সংগ্রহ করা হয় অবশ্যই সেই স্টককে ভাল ব্যবস্থাপনা দিতে হবে।

ভাল আধুনিক হ্যাচিং ইনকিউবেটরে উত্তম ব্যবস্থাপনায় ডিম ফুটাতে হবে। সালমোনেলা, মাইকোপ্লাজমার মত বিভিন্ন রোগ ফ্লক থেকে ডিম, ডিম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়াতে পারে। এ কারণেই ব্রিডিং ফ্লকের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মনোযোগ অবশ্যই রাখতে হবে। তবেই গুণগতমানের দিক থেকে ভাল বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়টিতে গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য ক্রেতাদের ভাল হ্যাচারি থেকে বাচ্চা ক্রয় করতে হবে এবং প্রয়োজনে বাচ্চার 'মেটারনাল কন্ডিশন' বুঝার জন্য বাচ্চাগুলোকে ভাল ল্যাব থেকে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

- যেহেতু ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেড়েই চলছে পোল্ট্রির সংখ্যা। সেই ক্রমবর্ধমান পোল্ট্রি খাদ্যের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন নতুন নতুন খাদ্যের উৎপাদন। এছাড়াও বিভিন্ন রকম দানাদার খাদ্য যেমন- গম, ভুট্রা, সরগম ইত্যাদি পোল্ট্রি খাদ্যের প্রায় ৫০% প্রয়োজন হয়। এগুলোর উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী হতে হবে। আবার সয়াবিন উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের উদ্যেগী করতে হবে। যাতে করে পুষ্টিমানের দিক থেকে গুণগতমানের খাদ্য তৈরিতে সমস্ত খাদ্যের উৎপাদন সহজলভ্য হয়।
  - ✓ ভেজাল মিশানো ও ছত্রাক আক্রান্ত খাদ্যেৎপাদন খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যাবে না।
  - ✓ খাদ্যের উপাদান সমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পুষ্টি সম্বন্ধে জানতে হবে।
  - ✓ নিউট্রিয়েন্ট রিকয়ারমেন্ট নির্ধারণ করতে হবে যা বিভিন্ন জাতের জন্য এবং বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ব্যবহার উপযোগী হয়।
  - ✓ কম্পিউটারের মাধ্যমে খাদ্য ফরমুলেট করতে হবে যাতে খরচ কম পরে।
  - ✓ খাদ্য তৈরিতে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে।
- চাহিদার সাথে তার মিলিয়ে বেড়েই চলছে ফিড মিল। কিন্তু ফিড মিলে উৎপাদিত খাদ্যের গুনগতমান সম্পর্কে অনেক ফিড মিল মালিকেরা এবং খামারিরাও সচেতন নয়। ফিড মিলে উৎপাদিত খাদ্যসমূহের গুণগতমানের দিকে অব্যই নজর দিতে হবে। উৎপাদনের প্রত্যেক ধাপে ধাপে যেমন- সংরক্ষণ, চুর্ণকরণ, মিশ্রণ, পিলেটিং বা মাস তৈরি, বস্তাজাতকরণ ইত্যাদিতে কড়া নজরদারীর মাধ্যমে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দু-একটি ফিড মিল ছাড়া আমাদের দেশে এটা করা হয় না, কেননা খামারিরাও ততটা সচেতন নয়। পোল্ট্রি শিল্প বা ব্যবসার সাথে জড়িত বা বিশেষজ্ঞরা যারা আছেন তাদেরকে দায়িত্ব সহকারে বিষয়গুলো চিন্তা করা উচিত।
- খামারে পোল্ট্রি থাকলে রোগ আসবে তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। আমাদেরকে নজরে রাখতে হবে যেন কোন রোগ সহজে খামারে প্রবেশ করতে না পারে। আর সেজন্য যথাযথভাবে বায়োসিকিউরিটির ব্যবস্থা পালন করতে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম সঠিকমত মোন চলতে হবে। কেননা পোল্ট্রি খামারিদের মনে রাখতে হবে যে prevention is better than cure, এরপর চিকিৎসা যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে তৎক্ষনাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পোল্ট্রি পালন করতে বেশ কয়েকটি ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয়। আর এ ভ্যাকসিনগুলোর অধিকাংশ বিদেশ হতে আমদানি করতে হয় এবং দামও অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশে কম মূল্যে গুণগতমানের ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে হবে যার জন্য দেশে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে। তবেই বাংলাদেশে পোল্ট্রিতে নতুন করে বিপ্লব আসবে।
- আমাদের দেশে যে সমস্ত ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে বা যে সমস্ত ভ্যাকসিন বিদেশ হতে আমদানি করা হচ্ছে সেগুলোর জন্য কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা প্রণয়ন করতে হবে। তাহলে গুণগতমানের ভ্যাকসিন উৎপাদন সম্ভব এবং আমদানিকৃত ভ্যাকসিনের মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া বাজারজাতকরার জন্য নির্ধারিত পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা থাকতে হবে ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। ভ্যাকসিন ব্যবহারের সঠিক স্বার্থকতা পেতে হলে কৃষকদেরর ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সঠিক ভাবে ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকার বাণিজ্যিক ভাবে পোল্ট্রি পালন করা হচ্ছে, সেখানে ডায়াগনস্টিক ল্যাব স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে ডায়াগনস্টিক ল্যাবগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ পূর্বক বিভিন্ন পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ইদানিং ব্যক্তিগত

উদ্যোগে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা পেলেও দু-একটা ছাড়া সবগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয় না, বা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সঠিক পন্থা অবলম্বন করা বা মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। তাই এসব বিষয়ে নীতিমালার প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সঠিক সেবা খামারিদের দোড়গোড়ায় পৌঁছায়।

- আমাদের দেশে অনেক সময় খামারিরা ইচ্ছেমত এন্টিবায়োটিকস ও বিভিন্ন ড্রাগ ক্রয় করে আর ব্যবহার করে। অথচ এগুলো ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। এ ধরণের যখন তখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর ভেটেরিনারি ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া এগুলো বিক্রয়ের ব্যাপারেও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। আর এটাও বুঝতে হবে যে, এমন অনেক এন্টিবায়োটিক আছে যা ব্যবহার করলে মানুষের শরীরেও বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সঠিক সময়, সঠিক ঔষধ, সঠিক মাত্রায় ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞদের মতামত অবশ্যই অপরিহার্য।

সারণি ৯.৪ঃ বাংলাদেশে পোল্ট্রি শিল্পের কতিপয় সমস্যাবলী ও সমাধানের সুপারিশসমূহ।

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশসমূহ
১	জাতীয় ভিত্তিক পোল্ট্রি নীতিমালা	জাতীয় পোল্ট্রি নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
২	পোল্ট্রি সাব সেক্টরকে স্বতন্ত্র সেক্টরে রুপায়ন	পোল্ট্রিকে সাব সেক্টর থেকে স্বতন্ত্র, মূল ও থ্রাস সেক্টর হিসেবে ঘোষণা করা।
৩	মূলধন (আর্থিক সমস্যা)	পোল্ট্রি ব্যাংক স্থাপন ও ব্যাংকের সুদের হার ৫% নির্ধারণ।
৪	বাজার ব্যবস্থাপনা	খামারিদের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদিত ডিম ও ব্রয়লারের স্থায়ী বাজার ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ও আশু পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫	পোল্ট্রি উৎপাদন ব্যয়	স্থানীয়ভাবে ভূট্রা ও সয়ামিল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ প্রদান। সয়াবিন শস্যের কর ও ভ্যাট প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ব্যাংক ঋণ ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ। ব্যাংক ঋণ ও উৎপাদিত ফসল গুদামজাত বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬	আমদানিকৃত পোল্ট্রি খাদ্যের শুল্ক	পোল্ট্রি শিল্পের প্রয়োজনে আমদানিকৃত উপাদান সমূহের পরিবহন খরচে সরকারি ভর্তূকি প্রদান ও এ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স প্রত্যাহার। পোল্ট্রি ফিডে ব্যবহৃত যাবতীয় প্রিমিক্স ও ফিড এ্যাডেটিভের জন্য আলাদা এইচএস কোড চালুকরণ।
৭	ডিম ও ব্রয়লার উৎপাদন বিপণন ও সংরক্ষণ	ডিম ও ব্রয়লার সংরক্ষণের জন্য কুলিং হাউস (কোল্ড স্টোরেজ) স্থাপন। বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার বাচ্চা, ডিম ও ব্রয়লার মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে উন্নত মানের প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।
৮	জাতীয় মাধ্যমে প্রচারনা, সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ	পোল্ট্রি অধ্যুষিত এলাকায় সরকার কর্তৃক পোল্ট্রি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন। জাতীয় মাধ্যমে প্রোটিন চাহিদা পূরণে ডিম ও ব্রয়লার মাংসের গুরুত্ব বিষয়ক প্রচারণা।
৯	পোল্ট্রিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান	পোল্ট্রিজাত খাদ্য ভেজালমুক্ত ও মান নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। ডিমের চোরাচালান বন্ধে সাদা ডিমের পরিবর্তে ব্রাউন ডিমের উৎপাদন।

- পোল্ট্রি খামার দেশে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যে যখন মনে করছে বস্তির বাড়ীর মত খামার স্থাপন করছে। একথা সত্য যে, পোল্ট্রি খামার বৃদ্ধি দেশের জন্য ভাল। কিন্তু সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সঠিক ভাবে স্থান নির্বাচন করে গড়ে তুলতে হবে। খামার অবশ্যই আবাসিক এলাকা থেকে দূরে, অন্য খামার থেকে ন্যূনতম দূরত্ব, হাইওয়ে থেকে দূরে তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা যেমন বিদ্যুৎ ও পানির সু-ব্যবস্থা, খাদ্য ও

শ্রমিকের প্রাপ্যতা, বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা ইত্যাদির দিকে নজর রাখতে হবে। নতুবা পরিবেশ দূষণ হবে, মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখীন হবে এবং পোল্ট্রির সু-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে না। সুতরাং পোল্ট্রি উন্নয়নের জন্য এদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

- পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি ক্রয় ও বিক্রয়ে খামারির বিভিন্ন রকমের সমস্যায় পড়ে। নেই কোন সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা। কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিজেদের মুনাফা লাভ করার জন্য সিন্ডিকেট গঠন করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু সরকারিভাবে কোন নীতিমালা না থাকায় এ রকম সমস্যা হচ্ছে। খামারি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে গেলে অধিক মূল্যে ক্রয় করছেন আর ডিম ব্রয়লার ইত্যাদি পোল্ট্রিজাত দ্রব্য বিক্রয় করতে গেলে সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। তাই এ ধরণের বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজ করলে পোল্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকারিভাবে এবং ব্যক্তিত্বদের এখনই এগিয়ে আসতে হবে পোল্ট্রি পৃষ্টপোষকতায় এগিয়ে আসার এখনই সময়।
- আমাদের দেশে গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, খামারি, শিল্পপতি প্রভৃতি পোল্ট্রি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার যথেষ্ট অভাব। তাই পোল্ট্রি শিল্পকে এগিয়ে নিতে পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞ গবেষক শিল্পপতি ডাক্তার খামারি প্রত্যেকের সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এটা এখন সময়ের দাবী।
- বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কে এগিয়ে আসতে হবে। পোল্ট্রি শিল্পকে এগিয়ে নিতে হলে স্বল্পসুদে খামারিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকতে হবে। তবেই পোল্ট্রি উন্নয়ন গতিধারা অব্যাহত থাকবে।

সর্বোপরি উপরের আলোচিত বিষয়গুলোকে সুসংগঠিত উপায়ে কার্যকরী করার জন্য দরকার দেশে একটি পোল্ট্রি বোর্ড। আর এ বোর্ডে থাকবে দেশের প্রখ্যাত পোল্ট্রি বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাবিদ ও শিল্পপতি যাদের নিরলস পরিশ্রমে দেশের পোল্ট্রি ব্যবস্থা আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আর দেরি না করে সবার সহযোগীতায় পোল্ট্রি বোর্ড গঠন করে পোল্ট্রি শিল্পকে আরো এগিয়ে নিতে সরকারসহ চিন্তাবিদদের এগিয়ে আসার আহবান জানাই। সবাই এগিয়ে আসুন, এ পোল্ট্রি শিল্প এগিয়ে যাক, আরো অনেক অজানা পথে।

৯.৭ পোল্ট্রির সাধারণ রোগব্যাধি

৯.৭.১ পোল্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ রোগব্যাধি ও তার ক্ষতিকর প্রভাব

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পোল্ট্রি শিল্প বাংলাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশে এ শিল্প যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল। তবে এখনো এদেশে এ শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পুঁজির অভাব, খাদ্য সমস্যা, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, বিপণন সমস্যা, রোগব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে রোগব্যাধির সমস্যাটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। পোল্ট্রি খামারে লোকসানের যতগুলো কারণ রয়েছে রোগব্যাধি তার অন্যতম। তাই রোগব্যাধি থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করতে না পারলে খামার থেকে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। কাজেই পোল্ট্রি খামার থেকে লাভ পেতে হলে অর্থাৎ পোল্ট্রি থেকে সঠিক উৎপাদন পেতে হলে এদের রোগব্যাধি সম্পর্কে খামারি বা পালনকারীকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। পোল্ট্রি নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যেমন জীবাণুঘটিত বা সংক্রামক রোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে পুষ্টিহীনতা, বিপাকীয়, বিষক্রিয়া বা ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সংক্রান্ত রোগ অর্থাৎ অসংক্রামক রোগ। সাধারণত বয়স্ক পোল্ট্রির তুলনায় বাচ্চাগুলো রোগব্যাধির প্রতি বেশি সংবেদনশীল। তাই বাচ্চাগুলো সহজেই নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পোল্ট্রির বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পুলোরাম, করাইজা, যক্ষা, মাইকোপ্লাজমোসিস, ব্রুডার নিউমোনিয়া, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি প্রধান। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পরজীবীঘটিত রোগ, যেমন- ককসিডিওসিস, বিভিন্ন ধরণের কৃমির আক্রমণ, বিভিন্ন ধরণের বহিঃপরজীবিঘটিত রোগ। অসংক্রামক রোগের মধ্যে অপুষ্টিজনিত, যেমন- নিউট্রিশনাল রোপ, রিকেট, কালর্ড-টো প্যারালাইসিস, পলিনিউরাইটিস, চিক ডার্মাটাইটিস, এনসেফালোম্যালাসিয়া ইত্যাদি এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সংক্রান্ত রোগের মধ্যে ক্যানিবালিজম, ডিম আটকে যাওয়া, ডিম্বনালি বের হয়ে যাওয়া, হিট স্ট্রেস, স্পর্শজনিত চর্মপ্রদাহ ইত্যাদি

অন্যতম। পোল্ট্রির রোগব্যাধি দূরীকরণে বা দমনে সাধারণত চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি কার্যকরী। তাই খামারকে রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজন উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা এবং পোল্ট্রিকে নিয়মিত টিকাদান।

সারণি ৯.৫ঃ হাঁস-মুরগির গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধি।

প্রজাতি	ব্যাকটেরিয়াজনিত	ভাইরাসজনিত	অন্যান্য
হাঁস	ডাক কলেরা	ডাকপ্লেগ	কক্সিডিওসিস
	এভিয়ান কলিব্যাসিলোসিস	ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস	
		এনাটি পেষ্টিফার	
মুরগি	পুলোরাম রোগ	রাণীক্ষেত	কক্সিডিওসিস
	ফাউল কলেরা	ফাউল পক্স	এসপারজিলোসিস বা ব্রুডার নিউমোনিয়া
	ফাউল টাইফয়েড	গামবোরো	
	কলিসেপ্টিসেমিয়া	ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস	
	ইনফেকশাস করাইজা	মুরগির বসন্ত	
	এভিয়ান কলিব্যাসিলোসিস	মারেক্স ডিজিস	

পোল্ট্রির ওপর রোগব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব

পোল্ট্রি থেকে সঠিক হারে উৎপাদন পাওয়ার প্রধান অন্তরায় হল রোগব্যাধি। বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি পোল্ট্রিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে। এতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। কাজেই রোগব্যাধির কারণে পোল্ট্রির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। হাঁস-মুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। এগুলো নানাভাবে পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। কিছু কিছু রোগ সরাসরি আক্রমণ করে। আবার কিছু কিছু রোগ, যেমন- স্পাইরোকিটোসিস ও অ্যাভিয়ান ম্যালেরিয়া কীটপতঙ্গ অর্থাৎ ভেক্টরের (vector) মাধ্যমে ছড়ায়। মুরগির কয়েকটি রোগ, যেমন- ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, পুলোরাম ইত্যাদি ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চায় ছড়ায়। এ রোগগুলো একদিকে যেমন দমন করা কঠিন, অন্যদিকে তেমনি ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন একেবারেই কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এসব রোগে আক্রান্ত মুরগির মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশি। খামার উন্নয়নে প্রোটোজোয়াজনিত ককসিডিওসিস রোগ একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগের ফলে বাচ্চা মুরগির মৃত্যু হার ১৫-২০% এ দাঁড়ায়। কোন খামারে একবার এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল হয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় এবং রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। মুরগির ডিম উৎপাদনে ভাইরাসঘটিত এগ ড্রপ সিন্ড্রোম নামক রোগটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ রোগে আক্রান্ত ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে। সঠিক সময়ে ও নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান করা না হলে পোল্ট্রিতে ভাইরাসঘটিত রোগ, যেমন- রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এসব রোগ একবার কোন এলাকায় বা খামারে মহামারি আকারে দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভাইরাসঘটিত রোগ হওয়ায় এখন পর্যন্ত এগুলোর কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এসব রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে ১০০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বা সর্দি রোগ বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা। ডিম ফোটানোর যন্ত্র বা ইনকিউবেটর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা না করলে বাচ্চায় ওমফ্যালাইটিস রোগ দমন করা যাবে না। কারণ, এ রোগের জীবাণু *Escherichia coli* এমনিতেই প্রকৃতিতে অবস্থান করে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে মুরগি সর্দি বা করাইজা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অত্যধিক ঠান্ডায় এ রোগের জীবাণু মুরগিকে আক্রান্ত করে। এ রোগগুলোর ফলে একদিকে যেমন মুরগির মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে বাড়ন্ত মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় ও উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সরবরাহ না করলে ভিটামিন ও খনিজের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশে এ সমস্যাটি ব্যাপক। এসব রোগের ফলে মুরগি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায়,

উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশে সঠিক নিয়মে খাদ্য সংরক্ষণ করা এক বিরাট সমস্যা। পোল্ট্রির খাদ্য সঠিক ভাবে সংরক্ষণ না করলে খাদ্যে এক ধরণের ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে। এ ছত্রাক এক ধরণের বিষ উৎপন্ন করে যা খেলে পোল্ট্রিতে মাইকোটক্সিকোসিস রোগ দেখা দেয়। ফলে এদের ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং মৃত্যুহার অত্যন্ত বেড়ে যায়।

সারণি ৯.৬ঃ হাঁস-মুরগি হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য এবং বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী সংক্রামক ব্যাধিসমূহ।

হাঁস-মুরগি হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরুপ রোগ	বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী সংক্রামক ব্যাধিসমূহ
○ বার্ড ফ্লু ○ রাণীক্ষেত ○ ফাউল পক্স	○ গামবোরো ○ চিকেন ইনফেকশাস এ্যানেমিয়া ○ হাইড্রো পেরিকারডিয়াম হেপাটাইটিস সিনড্রোম

৯.৭.২ পোল্ট্রিতে রোগজীবাণুর বিস্তার

পোল্ট্রিকে আক্রান্তকারী রোগজীবাণু বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটশিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি। এসব জীবাণুর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস অন্যতম। বিভিন্ন ধরণের জীবাণু ও পরজীবী পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। রোগজীবাণুর উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে সহজেই যে কোন জীবাণুঘটিত, পরজীবিঘটিত বা অন্যান্য রোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কাজেই পোল্ট্রি খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগের উৎস ও বিস্তার জানা একান্ত জরুরি। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

- বাহক পোল্ট্রির মাধ্যমে: রোগ থেকে সেরে ওঠা পোল্ট্রি অনেক সময় বহুদিন পর্যন্ত সে রোগের জীবাণু বহন করে। আবার অনেক পোল্ট্রি স্বাভাবিকভাবেও রোগের জীবাণু বহন করতে পারে। এ ধরণের পোল্ট্রি খাদ্য, পানি ও পরিবেশ দুষিত করে সুস্থ পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া এসব বাহক পোল্ট্রি এক খামার থেকে অন্য খামারে বা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। বাহক পোল্ট্রির মাধ্যমে সাধারণত পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, ককসিডিওসিস, হিস্টোমোনিয়াসিস ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে।
- ডিমের মাধ্যমে: কোন কোন রোগজীবাণু বাহক বা আক্রান্ত পোল্ট্রির ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া এসব জীবাণু কলুষিত মাটি থেকেও ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। এসব জীবাণুযুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর কাজে ব্যবহার করলে ডিমের ভিতরেই বাচ্চার মৃত্যু ঘটে। যেসব বাচ্চা ফুটে বের হয় সেগুলোও বাঁচে না। ডিমের মাধ্যমে পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, মারেক’স প্রভৃতি রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে।
- অন্যান্য পশুপাখির মাধ্যমে: সঠিকভাবে মৃত পোল্ট্রি সৎকার না করে যত্রতত্র ফেললে বিভিন্ন পশুপাখি, যেমন- কাক, চিল, শকুন, কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি এসব মৃত পোল্ট্রি ভক্ষণ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত বা বাহক বন্য পশুপাখি খামার বা পোল্ট্রি পালন এলাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করলে বা প্রবেশ করলেও বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।
- ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকির মাধ্যমে: এসব প্রাণির মাধ্যমে সহজেই খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। যেমন- *Salmonella* জীবাণু।
- কীটপতঙ্গের মাধ্যমে: বিভিন্ন ধরণের কীট-পতঙ্গ, যেমন- মশা, মাছি, ফ্লি, আটালি ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে। যেমন- বসন্ত, মারেক’স, পাইরোপ্লাজমোসিস, লিউকোসাইটোজোনিয়াসিস ইত্যাদি।
- বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাধ্যমে: এভাবে বহু রোগের জীবাণু পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে। যেমন- রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক’স ইত্যাদি।
- খাদ্য ও পানির মাধ্যমে: রোগজীবাণু দ্বারা খাদ্য ও পানি দূষিত হলে সে খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগ ছড়াতে পারে। যেমন- *Salmonella* জীবাণু। আবার খাদ্য ছত্রাক দ্বারা দূষিত হলেও পোল্ট্রি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- অ্যাসপারজিলোসিস, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি।

- পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমে: রোগজীবাণু দ্বারা লিটার দূষিত হলে সে লিটারে পালিত পোল্ট্রিও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- রাণীক্ষেত, গামবোরো, ককসিডিওসিস ইত্যাদি রোগের জীবাণু লিটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
- পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমে: এসবের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি একত্রে পালন করলে: বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি একত্রে পালন করা উচিত নয়। কারণ, এতে এক প্রজাতির পোল্ট্রির রোগজীবাণু অন্য প্রজাতির পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। যেমন- মুরগির হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ এভাবে টার্কিতে প্রবেশ করতে পারে।
- বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালনের মাধ্যমে: বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি একত্রে পালন করলে সহজেই বয়স্ক বাহক পোল্ট্রি থেকে বাচ্চায় রোগজীবাণু ছড়ায়। যেমন- *Salmonella* ও *Eimeria* প্রজাতির জীবাণু বা পরজীবী সহজেই এভাবে বাচ্চা মুরগিতে ছড়ায়।
- মানুষের মাধ্যমে: পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষও কম দায়ী নয়। খামারের শ্রমিক, কর্মচারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো প্রভৃতির সাথে রোগজীবাণু লেগে থাকলে কাজ করার সময় বা পরিদর্শনকালে অসাবধানতাবশত এ রোগ-জীবাণুগুলো খামারের পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে।

চিত্র ৯.১ঃ পোল্ট্রি খামারে রোগব্যাধির বিস্তার।

৯.৭.৩ পোল্ট্রিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ

পোল্ট্রি উৎপাদনে প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি। এসব রোগব্যাধি সংক্রামক বা অসংক্রামক ধরণের হতে পারে। তবে, যে ধরণেরই হোক না কেন রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি থেকে কখনোই ভাল উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নয়। কিছু কিছু রোগ শুধু উৎপাদনই ব্যহত করে না বরং পোল্ট্রির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু রোগ বাচ্চা পোল্ট্রিকে এবং কিছু কিছু রোগ বয়স্ক পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে। আবার কোন কোন রোগ ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চাকে আক্রান্ত করে থাকে। এসব রোগব্যাধির প্রকোপ পোল্ট্রিতে নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন- কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব, সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ না করা, মৃত পোল্ট্রি সঠিকভাবে সৎকার না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব ইত্যাদি। নিম্নলিখিত কারণে এদেশে পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। যেমন-

- কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব: এদেশে কোনো কার্যকর পোল্ট্রি নীতি না থাকায় পরিচিতি ছাড়াই অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে রোগাক্রান্ত ডিম, বাচ্চা, মুরগি ইত্যাদি আমদানি হচ্ছে।
- সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণের অভাব: বেশির ভাগ খামারেই সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে এতে নানা রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। তাছাড়া খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমিত মাত্রায় মিশিয়ে সরবরাহ না করার ফলে পাখি রোগাক্রান্ত হয়।
- মৃত পোল্ট্রি যত্রতত্র ফেলা: মৃত পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে কুকুর, শিয়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সেগুলো খায় ও পরিবেশে রোগজীবাণু ছড়ায়।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব: ইনকিউবেটর ও হ্যাচারির অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত না করলে এগুলো থেকে ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় রোগ ছড়াতে পারে। কীটপতঙ্গ এবং ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে। দূষিত পানি এবং বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও অনেক রোগের জীবাণু ছড়ায়। পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে। খামারে মানুষ অবাধে চলাফেরা করলে মানুষের জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

৯.৭.৪ পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়কে ও রোগব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়

রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই পোল্ট্রিকে রোগমুক্ত রাখতে না পারলে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোল্ট্রিকে আক্রমণ করে। পোল্ট্রি বা হাঁস-মুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। খামার উন্নয়নে ককসিডিওসিস একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল। নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান না করলে পোল্ট্রিতে রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা। খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ না করলে এসবের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এতে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে। পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- সুস্থ পোল্ট্রি থেকে সত্বর রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি পৃথক করে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত পাখির চিকিৎসা ও সুস্থ পোল্ট্রিকে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খামারে দর্শণার্থীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। রোগজীবাণুর উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূল করতে হবে।
- চিকিৎসাতেও যেসব পোল্ট্রি আরোগ্য লাভ করবে না বা রোগ থেকে সেরে ওঠার পরে বাহক পোল্ট্রিতে পরিণত হবে সেগুলোকে মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জ্য যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে। রোগাক্রান্ত পোল্ট্রির ঘর, খাঁচা, খাদ্য ও পানির পাত্র এবং অন্যান্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম উপযুক্ত জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।
- সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্য পালনীয়-

- পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং আশেপাশে অন্য কোন পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার না থাকলেই ভাল। আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন- আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- ডিম ফোটানোর পূর্বে সঠিকভাবে ফিউমিগেশনের মাধ্যমে তা জীবাণুমুক্ত করা।
- খামারে বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি পালন না করা। বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করা।

- রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহীন পোল্ট্রি সুস্থ পাখিদের থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথক করে ফেলা।
- খামার থেকে কোন একটি ব্যাচ বিক্রি করার পর বা ঘর থেকে স্থানান্তর করার পর সেখানে আরেকটি ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে অবশ্যই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এরপর পরবর্তী ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে ঘর কিছুদিন খালি অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত। তাছাড়া খামারের অন্যান্য ঘরদোর, জিনিসপত্র, সরঞ্জামও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।
- ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণী বা রডেন্ট (rodents), কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামার মুক্ত রাখতে হবে। এসব প্রাণী খাদ্য নষ্ট করা, খাদ্যে রোগজীবাণুর দূষণ ঘটানো ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। সে কারণে খামারে ইঁদুরের উপস্থিতি জেনে নিয়ে এদের দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে ঘরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে ভালভাবে পলেস্তরা (plaster) করতে হবে। তাছাড়া ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কোন ফাঁক-ফোকড় না থাকে। খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না। খামার বা শেডে (shed) সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে বিভিন্ন ধরণের পাখি সহজেই প্রবেশ করবে। তাই ভেন্টিলেটর, জানালা বা অন্যান্য খোলা জায়গায় চিকন তারজালির স্ক্রিন লাগিয়ে খামারে এদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাকে তাকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। যদি কারও প্রবেশের প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। কোন দর্শনার্থীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে তাকে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়।
- মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশেপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের ওপর নির্ভর করে করতে হবে। তাছাড়া সময়মতো কৃমির ঔষধও খাওয়াতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন- খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, ওষুধ বা টিকার খালি শিশি (vial) ইত্যাদি গর্ত করে মাটিচাপা দিতে হবে বা আগুনে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

পোল্ট্রির রোগব্যাধি প্রতিরোধে করণীয়

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়। তাই পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে দমন ও প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। পোল্ট্রি খামার তা ছোট হোক বা বড় হোক এবং মুরগি, হাঁস বা কোয়েল যে কোন প্রজাতির জন্যই হোক না কেন খামারে রোগব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কতকগুলো নিয়ম রয়েছে। এগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যেক খামারির একান্ত কর্তব্য। তবেই খামার হবে রোগমুক্ত। খামারে রোগব্যাধি প্রতিরোধের বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তবে এগুলোর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন- খামারের ভৌগলিক অবস্থান, টিকাদান কর্মসূচি, জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা, খামারের স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা ইত্যাদি।

- রোগ প্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কোনক্রমেই সময়োর্ত্তীণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না। টিকা গুলতে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভাল। টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে। মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরণের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী রয়েছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে ‘জৈবনিরাপত্তা’ বলে। যে কোন জৈবনিরাপত্তা কর্মসূচির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর। এটি সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে।

- সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' পদ্ধতি মেনে চলতে খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার দ্বারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে। খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না।
- খামারে কার্যকর নিরোধন ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সুস্থ পোল্ট্রি থেকে রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি পৃথক করে ফেলতে হবে।

৯.৭.৫ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি ও তা সফল করার উপায়

হাঁস-মুরগিকে ঠিক কত বয়সে কি ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন, কি পদ্ধতিতে মুরগির দেহে টিকা প্রয়োগ করা হবে, কি জাতীয় ভ্যাকসিন কত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে এবং মুরগির জীবনচক্রে কতবার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে এই সকল বিষয়গুলি বিবেচনা করে ভ্যাকসিন প্রয়োগের কর্মসূচি তৈরি করা প্রয়োজন। তাছাড়া খামারে হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান কর্মসূচি প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন- খামারে কোন মুরগির এক প্রকার টিকা প্রদান করা হলে ৭ দিনের ভিতর অন্য টিকা প্রদান করা হয় না। স্থানীয়ভাবে এলাকায় কোন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব আছে জানার পর টিকা প্রদান কর্মসূচি তৈরি করতে হয়। এলাকায় কোন রোগের প্রাদুর্ভাব না থাকলে টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ব্রয়লার মুরগির সাধারণত মারেক্স রাণীক্ষেত ও গামবোরো রোগের টিকা প্রদান করা হয়।

সারণি ৯.৭ঃ হাঁসের টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি।

ক্রমিক	ভ্যাকসিনের নাম	ভ্যাকসিন প্রয়োগের বয়স	মিশ্রণের নিয়ম	প্রয়োগ পদ্ধতি	ভ্যাকসিনের রং
১	ডাক প্লেগ	৩০ দিন ও ৪৫ দিনে। পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর।	১০০ মিলি পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	রানের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন	সাদাটে
২	ফাউল কলেরা	৭৫ দিন ও ৯০ দিন। পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর	তরল অবস্থায় পাওয়া যায়	বুকের চামড়ার নিচে ১ মিলি করে ইনজেকশন	সাদা তরল

পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায়

রোগ প্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এখানে টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

- টিকা উৎপাদনাকরী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়, ক্রম ও মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- টিকা সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত তাপমাত্রায় বরফসহ ফ্লাস্কে পরিবহণ করাই ভাল। কোনক্রমেই সময়োত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- সরাসরি সূর্যালোকে মিশ্রণ করলে টিকাবীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সব সময় ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে টিকা মিশ্রণ করতে হবে। টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- ৩০° সেন্টিগ্রেড এর অধিক তাপমাত্রায় টিকা প্রদান করা হলে তা সঠিকভাবে কাজ করবে না, তাই দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে অর্থাৎ সকাল ও বিকেলে টিকা প্রদান করা উচিত। অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত পোল্ট্রিকে টিকা দেয়া যাবে না।

- মুখের সাহায্যে পানির মাধ্যমে ব্যবহার্য টিকা পানির ভিতর গুলতে হবে। ট্যাপের পানিতে জীবাণুনাশক ক্লোরিন থাকায় টিকা গুলতে এ পানি ব্যবহার করা যাবে না। এ কাজে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভাল।
- টিকা গুলতে ধাতব পাত্র ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা ভাল। অনেক ওষুধ আছে যেগুলো ব্যবহার করার সময় টিকা দিলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। যেমন- হাইড্রোকর্টিসোন, টেস্টোসটেরন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়াল টিকার ক্ষেত্রে টিকা দেয়ার তিনদিন পূর্ব থেকে তিনদিন পর পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে।
- টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া বা বেঁচে যাওয়া টিকা এবং টিকার খালি বোতল শক্তিশালী জীবাণুনাশক দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে হবে। মুখের সাহায্যে ব্যবহার্য টিকা পান করানোর ২-৩ ঘন্টা পূর্বে পানি পান করানো বন্ধ রাখতে হবে যেন মিশ্রিত টিকা দেয়ার পর দ্রুত এরা এগুলো পান করে। অবশ্যই মিশ্রণের দু'ঘন্টার মধ্যে সমস্ত টিকা পান করাতে হবে।
- খাবার পানির সঙ্গে মিশিয়ে টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ মুরগির বয়স, আবহাওয়া এবং লেয়ার বা ব্রয়লার অর্থাৎ মুরগির টাইপের ওপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে।

সারণি ৯.৮ঃ দেশী মুরগির টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি।

ক্রমিক	ভ্যাকসিনের নাম	প্রয়োগের বয়স	মিশ্রণের নিয়ম	প্রয়োগ পদ্ধতি	ভ্যাকসিনের রং
১	বিসিআরডিভি	৭ দিন	প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন ১০০ ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	আই ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে ১ ফোঁটা	সবুজ
২	গামবোরো (ডি-৭৮)*	১৪ দিন	ভ্যাকসিনের সাথে প্রাপ্ত পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	আই ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে ১ ফোঁটা	সাদা
৩	বিসিআরডিভি	২১ দিন	প্রতি ভায়াল ভ্যাকসিন ১০০ ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	আই ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে ১ ফোঁটা	সবুজ
৪	গামবোরো (ডি-৭৮)*	২৮ দিন	ভ্যাকসিনের সাথে প্রাপ্ত পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	আই ড্রপারের সাহায্যে ১ চোখে ১ ফোঁটা	সাদা
৫	ফাউল পক্স	৩০ দিন	৩ মিলি পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	ডানার চামড়ায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে	খয়েরী বা ইটের রং
৬	আরডিভি	৬০ দিন ও পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর	১০০ মিলি পরিশ্রুত পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে	রানের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন	সাদা
৭	ফাউল কলেরা	৭৫ দিন ও ৯০ দিন। পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর	তরল অবস্থায় পাওয়া যায়	বুকের চামড়ার নিচে ১ মিলি করে ইনজেকশন	সাদা তরল

*গামবোরো ভ্যাকসিন শুধুমাত্র বাচ্চা পালনকারী ইউনিটে প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি ৯.৯ঃ বাণিজ্যিক মুরগির টিকা প্রয়োগ কর্মসূচি।

বয়স	রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা ব্যবহার পদ্ধতি
১ দিন	মারেক্স	মারেক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে ০.৫ সিসি ইনজেকশন
২ দিন	গামবোরো	গামবোরো ভ্যাকসিন	প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান না করা থাকলে চোখে ড্রপ
৩-৫ দিন	রাণীক্ষেত	বিসিআরডিভি	প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান না করা থাকলে উভয় চোখের ড্রপ
৭-১০ দিন	রাণীক্ষেত	বিসিআরডিভি	প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান করা থাকলে প্রাথমিক ডোজ উভয় চোখে ড্রপ
৭ দিন	ইনফেকাশাস ব্রংকাইটিস	আইবি ভ্যাকসিন	এক চোখে ড্রপ
১২-১৪ দিন	গামবোরো	গামবোরো ভ্যাকসিন	প্যারেন্ট মুরগির টিকা প্রদান করা থাকলে প্রাথমিক ডোজ চোখে ড্রপ
২৪-২৮ দিন	গামবোরো	গামবোরো ভ্যাকসিন	২য় ডোজ চোখে ড্রপ
২২-২৪ দিন	রাণীক্ষেত	বিসিআরডিভি	২য় ডোজ উভয় চোখে ড্রপ
৩০ দিন	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস	আইবি ভ্যাকসিন	২য় ডোজ চোখে ড্রপ
৩৫ দিন	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স ভ্যাকসিন	ডানার নিচে চামড়ায় টিকায় ভিজানো সুঁচ ফুটিয়ে
৬০ দিন	রাণীক্ষেত	আরডিভি	পায়ের উরুর মাংসে ইনজেকশন
৭০ দিন	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস	আইবি ভ্যাকসিন	চোখে ফোঁটা/পানির সাথে
৮০ দিন	কলেরা	কলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নিচে মাংসে ইনজেকশন
১৩৫ দিন	ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস, রাণীক্ষেত ও এগড্রপ সিনড্রম	সমন্বিত টিকা	চামড়ার নিচে/মাংসে ইনজেকশন

এই ভ্যাকসিন সিডিউল বাণিজ্যিক মুরগি উৎপাদন প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক থেকে নেয়া হয়েছে (মকবুলার রহমান ২০০১)।

৯.৭.৬ টিকা প্রয়োগের পরেও হাঁস-মুরগির রোগ হয় কেন?

বাণিজ্যিক মুরগি পালনে অন্যতম প্রধান অন্তরায় রোগ-বালাই। বিশেষ করে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মুরগির মহামারীতে খামার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই মহামারীর হাত থেকে মুরগি রক্ষা করার জন্য পোল্ট্রি বিজ্ঞানীগণ কঠোর পরিশ্রমে অধিকাংশ সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিষেধক টিকা বা ভ্যাকসিন আবিস্কার করেছেন। খামারে মুরগিকে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয় এবং খামারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে খামারে মুরগির মৃত্যুর হার কমানোর উপর। নিয়মিত ও ভাল ভ্যাকসিন প্রয়োগের পরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত খামার থেকে রাণীক্ষেত ও অন্যান্য কিছু রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর মাঝে মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল মুরগির রোগ প্রতিরোধে ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ভেঙ্গে পড়া। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে রাণীক্ষেত সহ সিআরডি করাইজা, ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস, সালমোনেলা ও ই-কলাই এর আক্রমণ

দেখা দিতে পারে। তাই কি কি কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অবদমন (immuno-suppression) ঘটছে তা আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

(ক) যে কারণ সমূহে মুরগির দেহে রোগ-প্রতিরেধ ক্ষমতার অবদমন (immuno-suppression) হয়:

- দৈহিক কারণগুলির ভিতর রয়েছে অতিরিক্ত শীত বা গরম, অল্প জায়গায় অধিক মুরগি পালন। রাসায়নিক কারণগুলির ভিতর মুরগির ঘরে অতিরিক্ত এ্যামোনিয়া গ্যাস, খাবারের উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য বা রোগ প্রতিরেধমূলক এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার, দানাদর খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কীটনাশক ব্যবহার। এ কারণসমূহ লিমফোসাইট (রক্তের শ্বেত কণিকা), বার্সা, থাইমাস ও প্লীহার উপর বিরুপ প্রভাব বিস্তার করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অবদমিত করে। এ ছাড়াও এ্যান্টিবায়োটিক মুরগির পরিপাকতন্ত্রের উপকারী জীবাণসমূহ ধ্বংস করে ফেলে; ফলে খাবার হজমে সমস্যা সৃষ্টি হয়। মাইকোটক্সিনের উপস্থিতি লিমফোসাইটের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- জৈবিক কারণগুলি হলো রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও কৃমি। ইফেকসাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাস, মারেক্স ডিজিজ ভাইরাস, এভিয়ান লিউকোসিস ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবদমন করে।
- প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলের অভাবে পর্যাপ্ত এ্যান্টিবডি তৈরিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। দৈহিক, রাসায়নিক বা জৈবিক যে কোন কারণেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অবদমন ঘটুক না কেন সর্বক্ষেত্রেই বার্সা, থাইমাস, প্লীহা ও লিমফোসাইটের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ফলে এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছোট হয়ে যায় এবং শরীরের এ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন তৈরি বাধাগ্রস্ত হয়।

(খ) যে কারণসমূহ সতর্কতার সহিত না মানলে ভ্যাকসিনেশন অকার্যকর হয়:

- ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকের নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করতে হবে।
- লাইভ এবং কিল্ড ভ্যাকসিন ২-৮° সে তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে, ডিপে নয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করার সময় অবশ্যই ভ্যাকসিন কেরিয়ার বা cool box বা থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে পরিবহন করতে হবে।
- লাইভ ভ্যাকসিন ফ্রিজ থেকে বের করে গুলার পর পাত্রটি অন্য একটি বরফের পাত্রে রেখে ব্যবহার করতে হবে এবং কিল্ড ভ্যাকসিন ফ্রিজ থেকে বের করে ১৫-২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আসার পর ব্যবহার করতে হবে।
- জীবাণু, আয়রণ ও ক্লোরিন মুক্ত পানিতে ভ্যাকসিন মিশ্রিত করতে হবে। খাবার পানির সাথে ভ্যাকসিনেশন করার সময় পাখিগুলোকে ২-৩ ঘন্টা পানি সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে এবং পরে ১ ঘন্টা পানি সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে এবং পরে ১ ঘন্টা সময়ে যে পানি খাবে সেই পরিমাণ পানিতে টিকাবীজ মিশ্রিত করতে হবে। প্রতিলিটার খাবার পানিতে ২ গ্রাম উন্নত মানের গুড়া দুধ ব্যবহার করলে টিকার গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। ভ্যাকসিন গুলার পর গ্রীষ্মকালে ১ ঘন্টা এবং শীতকালে ২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে তারপর ফ্রিজ-এ রাখলেও ব্যবহার করা যাবে না।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে না। ভ্যাকসিনেশন ঘরে বা ছায়ায় করতে হবে। ভ্যাকসিন ঠিকমত এবং পরিমাণমত শরীরে ঢোকাতে হবে। টিকায় পর্যাপ্ত পরিমান এন্টিজেন না থাকলে এবং অন্য strain এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে কাজ হবে না।
- ভ্যাকসিনেশনের সিরিঞ্জ, সুচ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ফুটন্ত পানিতে জবিাণুমুক্ত করতে হবে। রাসায়নিক জীবানুনাশক ব্যবহার করা যাবে না। টিকা প্রদানকারীর হাত, পা, জামা, জুতা বা সেন্ডল ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- প্রাথমিকভাবে জীবন্ত টিকা ঠিকভাবে প্রদানের পর নিষ্ক্রিয় টিকা (oil emulsion killed) প্রয়োগ করা হলে দ্রুত উচ্চ মাত্রায় প্রতিরোধ ক্ষমতা (hyper immunisation) তৈরি হয়। ব্রিডার মুরগিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ডিম পাড়াকালীন সময় রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পায় সেই সাথে পরবর্তী প্রজন্ম অর্থৎ বাচ্চার শরীরে ভ্যাকসিনেশনের প্রভাব থাকে যাকে এমডিএ (maternally derived antibody) বলে। এ ব্যবস্থা না করায় অবদমন ঘটে।

○ ভ্যাকসিন দেয়ার ২ সপ্তাহ পর ল্যাবরেটরিতে সিরাম টেষ্টের সাহায্যে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা জানা উচিত। 'রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অবদমন' পোল্ট্রি শিল্পের সমস্যা। পোল্ট্রি শিল্পকে টিকে রাখতে এ সমস্যা সমাধানে এবং ভ্যাকসিনেশন কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৯.৮ হাঁসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের পরিচিতি

রোগের নাম	রোগের বিবরণ	প্রধান প্রধান লক্ষণ	প্রতিরোধ ও প্রতিকার
হাঁসের কলেরা	ব্যাকটেরিয়া পাসচুরেলা মালটোসিডা। সংস্পর্শ, দূষিত খাদ্য, পানি, মশামাছি ও উকুনের আক্রমণে জীবাণু বিস্তার লাভ করে।	একিউট অবস্থা: কোন লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মারা যায়। চোখ ও মুখ খোলা থাকে। মৃত্যুহার শতকরা ৭০-৯০ ভাগ। সাব একিউট অবস্থা: ঘাড় বাঁক ও মুচড়ে যায়। শরীর দুর্বল এবং নিষ্প্রভ হয়। প্রচুর পানি পিপাসা থাকে। ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যায়। ডায়রিয়া দেখা দেয়। ক্রনিক অবস্থা: ডায়রিয়া থাকে। দীর্ঘদিন ভুগে দুর্বল হয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায়।	এন্টিবায়োটিক ও সালফার ড্রাগের সাহায্যে চিকিৎসা করলে ভাল হয়। তবে এ রোগ প্রতিকারের জন্য প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হয়। হাঁসের থাকার স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। লিটার শুকনা রাখতে হয়। পরিস্কার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হয়।
সালমোনেলোসিস	ব্যাকটেরিয়া সালমোনেলা সংস্পর্শ, দূষিত খাদ্য, পানি ইত্যাদির মাধ্যমে জীবাণু বিস্তার লাভ করে।	হঠাৎ অসুস্থ হয়। ডায়রিয়া দেখা দেয়। দেহ ডি-হাইড্রেশন হয়। পা ফুলে ওঠে। পালক উস্কো খুস্কো এবং অবিন্যস্ত হয়। চোখ শুকনা দেখায়।	এন্টিবায়োটিক সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যায়। সুষ্ঠু সেনিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা রাখতে হয়।
ডাক প্লেগ	হারপেস ভাইরাস; সংস্পর্শে, দূষিত পানি ও খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।	হঠাৎ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রচন্ড দুর্বলতা, খাদ্যের প্রতি অনীহা, পাতলা পায়খানা ও ডায়রিয়া থাকে। চোখ ও নাক হতে পানি ঝরে। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। দেহের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে প্রচুর রক্ত কণিকা থাকে। শতকরা ৪০-৮০ ভাগ আক্রান্ত হাঁসের মৃত্যু হয়।	চিকিৎসা ফলপ্রসু হয় না। প্রতিষেধক টিকা প্রদান করতে হয়। সেনিটেশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হয়।
প্যারাসাইটিক ইনফেকশন	আইওয়ার্ম, টেপওয়ার্ম, রাউন্ডওয়ার্ম, ইনটেসটিনাল ফ্লুক, উকুন, আঠালী ইত্যাদি।	সাধারণত আভ্যন্তরীন ওয়ার্ম ও কৃমি হাঁসের জন্য তেমন বড় সমস্যা নয়। উকুন ও আঠালী দেহের রক্ত শুষে খায়।	মাঝে মাঝে কৃমিনাশক ঔষধ পানির সাথে খাওয়ানো যায়। খালি ঘরে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করে উকুন ও আঠালী ধ্বংস করা যায়।

৯.৯ হাঁসের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

যে সমস্ত খামারে পূর্ব থেকে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সেখানে পূর্ব থেকে রোগ প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ। এই অংশটুকু হাঁস খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক হতে সংগৃহীত (ফাত্তাহ ২০০০)-

সারণি ৯.১০ঃ হাঁসের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি।

হাঁসের বয়স	গৃহীতব্য কার্যক্রম
১-৭ দিন বয়স	সালমোনেলা ও কলিব্যাসিলোসিস রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে খাবার পানির সাথে এন্টিবায়োটিক অথবা সালফোনামাইড ঔষধ ব্যবহার করা যায়।
৮-১৪ দিন বয়স	অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে খাবার পানির সাথে এন্টিবায়োটিক ও ভিটামিন এবং মিনারেল মিক্শ্চার ব্যবহার করা যায়।
১৫-২০ দিন বয়স	প্লেগ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বাচ্চার বুকের মাংসে ১ মিলি প্লেগ ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।
২১-২৮ দিন বয়স	খাবার পানির সাথে মাল্টিভিটামিন ব্যবহার করা যায়।
২৯-৩০ দিন বয়স	প্লেগ রোগের জন্য পুনরায় বুকের মাংসে প্লেগ ভ্যাকসিন বোষ্টার ডোজ প্রয়োগ করতে হয়।
৬০ দিন বয়সে	আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট ধকল বা পীড়ন প্রতিকারের জন্য খাবার পানির সাথে এন্টিবায়োটিক ভিটামিন ও মিনারেল মিক্শ্চার ব্যবহার করতে হয়।
৭০ দিন বয়সে	কলেরা রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য হাঁসের উরুর মাংসে অথবা চামড়ার নিচে ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হয়।
১২০ দিন বয়সে	ঘর পরিবর্তন বা আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে সৃষ্টি ধকল বা পীড়ন প্রতিকারের জন্য খাবার পানির সাথে এন্টিবায়োটিক ভিটামিন ও মিনারেল মিক্শ্চার ব্যবহার করা যায়।
১৩০ দিন বয়সে	ফাউল কলেরার বিরুদ্ধে পুনরায় বোষ্টার ডোজ কলেরা ভ্যাকসিন পায়ের মাংসে অথবা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়।
ডিম পাড়া অবস্থায়	ডিম পাড়া অবস্থায় প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে খাবার পানির সাথে ভিটামিন ও মিনারেল মিক্শ্চার ব্যবহার করা যায়। এই বয়সে বিশেষ প্রয়োজন না হলে এন্টিবায়োটিক অথবা সালফার ড্রাগ ব্যবহার করা ঠিক নয়। এন্টিবায়োটিক ও সালফার ড্রাগ সাময়িক ডিম উৎপাদন কমিয়ে দেয়।

৯.১০ বার্ড ফ্লু'র প্রাদুর্ভাব এবং করণীয় ব্যবস্থাদি

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। মুরগি, টার্কি, ফিজান্ট, কোয়েল, হাঁস, রাজহাঁস, গিনি ফাউল এবং আরো নানা জাতীয় পাখি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ধারণা করা যায় ভ্রমণশীল জলচর পাখিই এই ভাইরাস বহন করে এবং সাধারণত প্রকৃতিগতভাবেই এরা এ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের তিনটি শ্রেণী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে এ, বি এবং সি। ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ 'এ' ভাইরাস কেবলমাত্র পাখিতে রোগ সৃষ্টি করে তবে মানুষসহ ঘোড়া, শুকর, তিমি ইত্যাদি প্রাণিও আক্রান্ত হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা 'বি' ভাইরাস সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং এর দ্বারা মানুষের মহামারী সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য এদের প্রভাবে প্যানডেমিকস্ সূচিত হয়নি। ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ 'সি' দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হতে পারে তবে তা তেমন মারাত্মক হয় না এবং এর দ্বারা মহামারী বা প্যাডেমিকস্ও ঘটে না। এই ভাইরাসকে সাব-টাইপ অনুযায়ী ভাগ করা হয়নি।

ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ 'এ' ভাইরাস কেবলমাত্র পাখিতে রোগ সৃষ্টি করে। মুরগি, টার্কি ও অন্যান্য গৃহপালিত পাখি এই সাব-টাইপের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সহজেই আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বন্য পাখি এই ভাইরাসের পোষক হলেও এরা সাধারণত আক্রান্ত হয় না। তবে কোনো কোনো সাব-টাইপ দ্বারা বন্য পাখি আক্রান্ত ও মৃত্যু হবার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই ভাইরাসের যেসব সাব-টাইপ দ্বারা মানুষ সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হয় সেগুলো হচ্ছে- H1N1, H1N2 এবং

H3N2। অন্যান্য সাবটাইপগুলো বিভিন্ন প্রাণী যেমন ঘোড়া, শূকর, তিমি কে আক্রান্ত করে। যেমন H7N7 এবং H3N8 ভাইরাস ঘোড়াতে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-এ ভাইরাসের উপরিভাগে যে দু'টি প্রোটিন থাকে তারই ভিত্তিতে ভাইরাসকে বিভিন্ন সাবটাইপে বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রোটিন হিমাগুটিনিন (HA) এবং নিউরামিনিডেজ (NA) হিসাবে আখ্যায়িত। অদ্যাবধি ১৬ টি বিভিন্ন HA সাবটাইপ এবং ৯ টি বিভিন্ন NA সাবটাইপ সম্বন্ধে জানা গেছে। HA এবং NA প্রোটিনের বিভিন্ন ধরণের সংযোজন হতে পারে। ভাইরাসের জেনিটিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাসের সাব-টাইপ H5 এবং H7 কে হাইলি প্যাথজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (HPAI) অথবা লো প্যাথজেনিক এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (LPAI) স্ট্রেইনস্ হিসাবে বিভক্ত করা হয়। মুরগি HPAI দ্বারা আক্রান্ত হলে ৯০ থেকে ১০০% মুরগির ঘটে থাকে। LPAI ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত মুরগিতে রোগের মারাত্মকতা তেমন থাকে না। এমনকি অনেক সময় কোনো রোগ লক্ষণও প্রকাশ পায় না। যেহেতু LPAI ভাইরাসসমূহ HPAI তে রূপান্তরিত হতে পারে সেহেতু H5 এবং H7-এর LPAI-এর প্রাদুর্ভাবকে গভীরভাবে মনিটর করতে হয়।

ভাইরাসের বিবর্তন

এ্যান্টিজেনিক ড্রিফট এবং এ্যান্টিজেনিক শিফ্‌ট এর মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিবর্তন হয়ে থাকে। নিম্নে এ্যান্টিজেনিক ড্রিফট এবং এ্যান্টিজেনিক শিফ্‌ট এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

- এ্যান্টিজেনিক ড্রিফটঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাস মানুষ ও পশুপাখির দেহে বংশ বিস্তারকালে এদের জেনেটিক গঠনশৈলীর পরিবর্তন ঘটে থাকে। ফলে বিরাজমান স্ট্রেইন-এর পরিবর্তে একটি নতুন এ্যান্টিজেনিক ভ্যারিয়েন্ট-এর সৃষ্টি হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাসের ক্রমাগতভাবে এ জাতীয় সামান্য পরিবর্তনকে 'এ্যান্টিজেনিক ড্রিফট' বলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিবর্তন প্রবণতার জন্য তা নিয়মিত মনিটরিং করতে হয় এবং এই পরিবর্তন অনুযায়ী ভ্যাকসিন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পরিবর্ধন আনতে হয়।
- এ্যান্টিজেনিক শিফ্‌ট: ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আলোচ্য বৈশিষ্ট্য মানুষের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিভিন্ন প্রজাতির সাব-টাইপসহ ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাস তাদের জেনিটিক উপাদানসমূহ বদলাবদলি বা রকমারি সমাবেশ ঘটিয়ে একীভূত হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি নতুন সাব-টাইপের জন্ম হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'এ্যান্টিজেনিক শিফ্‌ট' বলে। যেহেতু শূকর মানুষের স্ট্রেইনসহ পাখি ও স্তন্যপায়ী উভয় প্রকার জীবের ভাইরাসের প্রতি সংবেদনশীল সেহেতু মানুষ ও পাখির ভাইরাস থেকে জেনিটিক উপাদান সংগ্রহ করে রকমারি সমাবেশ ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক সাব-টাইপ সৃষ্টির জন্য শূকর 'mixing vessel' হিসাবে কাজ করে। তবে সাম্প্রতিককালে ধারণা করা হচ্ছে, মানুষই এ ধরণের ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সাব-টাইপ তখন সহজেই মানুষের দেহে বিস্তারলাভ করে ও মানুষ থেকে মানুষে বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করে প্রাণঘাতী মহামারী রূপে (প্যানডেমিকস্) আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটায়। বিগত শতাব্দীতে সংঘটিত তিনটি প্যানডিমকস্-এ কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

রোগের বিস্তার পদ্ধতি

রোগাক্রান্ত মুরগির শ্লেষ্মা, লালা, বিষ্ঠা ও সাহচর্য থেকে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অতিথি পাখিদের সাহচর্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুরগি ও মুরগিজাত প্রোডাক্ট এবং মুরগির জন্য ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি আমদানি বা রপ্তানির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার করতে পারে। জৈব সার (মুরগির বিষ্ঠা/ গোবর), সরঞ্জামাদি, যানবাহন, ডিমের ট্রে, মুরগির খাঁচা, বন্য জীব-জন্তু, পাখি, গুবরে পোকা এবং মানুষ স্বয়ং তার পরিধেয় বস্ত্র ও জুতার মাধ্যমে খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ ঘটাতে পারে। জীবিত মুরগি বিক্রয়ের বাজার থেকেও এ ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। AI ভাইরাস স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পরিবেশ ও পানিতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারে। তাছাড়া হিমায়িত খাদ্য দ্রব্যের মাঝে অনির্দিষ্টকাল বেঁচে থাকে।

রোগ লক্ষণ

ঝাঁকের মুরগিতে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি। হাঁচি, কাশি, ঠোঁট খুলে শ্বাস গ্রহণ, নাসিকা থেকে শেষ্মা নির্গমন। তরল ও সবুজ বর্ণের ডায়রিয়া। ক্ষুধামান্দ্য ও অবসাদ। ডিম উৎপাদন হ্রাস/ডিমের খোসা পাতলা হওয়া। চোখের পাতা, মাথা, পায়ের সন্ধিস্থল (hock) ও ঘাড়ের পাশে ফুলে ওঠা। মাথার ঝুঁটি, কণ্ঠে ঝুলে থাকা লাল অংশ (wattles) ও পায়ের রং বেগুনি হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়হীনতা/স্নায়ুবিক বৈকল্য। কাঁপতে থাকে, পাখা ঝুলে যায় এবং মাথা ও ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়।

মহামারী প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলী

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লুর মহামারী প্রতিরোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলীকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- খামারের ক্ষেত্রে, শেডের ক্ষেত্রে এবং সরকারি পর্যায়ে। এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

(ক) খামারের ক্ষেত্রে

- খামারের মুরগিকে বন্য পাখি ও হাঁসের সান্নিধ্যি বা সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। অতিথি পাখিদের বিচরণ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে খামার স্থাপন করা উচিত। যদি খামারের সন্নিকটে কোন জলাশয় থাকে যেখানে অতিথি পাখিদের আগমন লক্ষ্য করা যায় তবে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। খামারের চতুস্পার্শ্ব সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। খামারে বন্য পাখি যেন আকৃষ্ট না হতে পারে সেজন্য শেডের পাশে কোন খাদ্যদ্রব্য রাখা বা ফেলা যাবে না।
- জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতে হবে। এজন্য যেসব করণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় তা হল- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কার্যকর জীবাণুনাশক নিয়মিত ব্যবহার, খামারে প্রবেশের পূর্বে পরিধেয় বস্ত্রাদি ও জুতা পরিবর্তন (সম্ভব হলে গোসল করা), জীবাণুনাশকের সলিউশনে পা ডুবানো, খামারের কর্মচারী ছাড়া বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, খাদ্যবাহী যানবাহন প্রবেশের পূর্বে চাকা (টায়ার) ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক স্প্রে করা, মুরগির খাঁচা ও সরঞ্জামাদি অনুরূপভাবে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ, অন্য কোন খামার থেকে কোন সরঞ্জামাদি আনা থেকে বিরত থাকা, অবাঞ্চিত প্রাণী (ইঁদুর, নিশাচর প্রাণী, গুবরে পোকা প্রভৃতি) থেকে খামার মুক্ত রাখা ইত্যাদি।
- দিনের কাজ শেষে যানবাহন অবশ্যই পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। দূষিত হতে পারে বা হয়েছে এমন সকল স্থানেও (চালকের আসনসহ) একই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মুরগি, হাঁস, কবুতর বা অন্য পোষা পাখি একত্রে পালন করা যাবে না এবং এদের সাথে মানুষের সাহচর্য সীমিত করতে হবে।
- All in-All out ব্যবস্থা প্রতিপালন বিশেষ জরুরি। খামারের জন্য বাচ্চা ক্রয়ের সময় যে খামারে বিগত ছয় মাসে এ ধরণের কোন রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়নি সেখান থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করা উচিত।
- বিদেশ থেকে বাচ্চা আমদানির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট খামার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জামুক্ত (ন্যূনপক্ষে ছয় মাস) এই মর্মে সরকারিভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। বাচ্চা দেশে পৌঁছানোর পর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী সব ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করতে হবে।

(খ) শেডের ক্ষেত্রে

- শেডের দরজা সবসময় তালাবন্ধ রাখতে হবে। শেডে প্রবেশের পূর্বে হাত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- সকল সরঞ্জামাদি ব্যবহারের পূর্বে ও পরে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। দূষণ প্রতিরোধের জন্য ফগিং চালু রাখতে হবে।
- অতিথি পাখি বা বন্য জীবজন্তু পানীয় জল এবং খাদ্য যেন দূষিত না করতে পারে সেজন্য সব ধরণের প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- মালামাল সরবরাহ ও খালাসের পর উক্ত স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

- পোষা কোনো জীব-জন্তুকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

(গ) সরকারি পর্যায়ে

- অবৈধ পথে মুরগীর ডিম, বাচ্চা, মুরগিজাত প্রোডাক্ট, খাদ্য উপাদান, খামারের সরঞ্জামাদি ইত্যাদির অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ।
- আক্রান্ত দেশ বা সন্দেহজনক দেশ হতে উলিখিত সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধকরণ।
- রোগমুক্ত দেশ থেকে একদিনের বাচ্চা আমদানির ক্ষেত্রেও উক্ত দেশের যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অবমুক্ত সনদপত্র থাকতে হবে এবং দেশে পৌঁছানোর পরও এতদ্বসংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পাদন করিয়ে সনদপত্র সংগ্রহ করতে হবে। রোগের সিরোসার্ভিলেন্স নিয়মিত পরিচালনা ও পর্যালোচনা এর প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা।
- প্রচার মাধ্যমসমূহ যেমন টেলিভিশন, রেডিও, দৈনিক সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধ ও প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত প্রচার। এছাড়াও এ বিষয়ে পুস্তিকা প্রণয়ন করে খামারি ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিলি করা প্রয়োজন। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি করে জনগণকে করণীয় বিষয়ে সজাগ করে তোলাও বিশেষ জরুরি।
- সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের (মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) সমন্বয়ে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- সংশিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদেরকে এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত করা।
- অতিথি পাখি নিধনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা। জলচর পাখিদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা এবং কোন মৃত্যু ঘটলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চেয়ারম্যানকে ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।
- মুরগির খামার বা উন্মুক্তভাবে পালিত মুরগিতে রোগের সংক্রমণ বা মৃত্যু ঘটলে তা গোপন না করে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে অবহিত করা। বার্ড ফ্লু-জাতীয় সন্দেহজনক রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই খবর প্রদানকারীকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা।
- জীবিত মুরগির বাজার থেকে রোগের সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে বলে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা।

মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে করণীয়

- খামার বা পারিবারিক ভিত্তিতে পালিত মুরগির ঝাঁকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই প্রাণিসম্পদ বিভাগের নিকট তা জানাতে হবে। উক্ত বিভাগ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- আক্রান্ত স্থানের ঘর, বিচরণ স্থান, খাবার ও পানির পাত্র, যানবাহন, সকল সরঞ্জামাদি প্রভৃতি পরিষ্কার করে কার্যকর জীবাণুনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- মৃত, অসুস্থ, সংস্পর্শে আসা এবং সন্দেহজনক সকল মুরগিকে আগুনে পুঁড়িয়ে অথবা মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। যে সমস্ত সরঞ্জামাদি পরিত্যাজ্য হিসেবে পণ্য করা হয় তা পলিথিনে ভরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত এলাকা ও এর চতুষ্পার্শ্বে surveillance ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
- খামারে কর্মরত সকল ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ানকে ফিল্টারসহ মাস্ক, টুপি, গগলস্, বহিরাবরণ (cover all), গ্লোভস্ ও বুটজুতা পরিধান করতে হবে। খামার পরিত্যাগের পূর্বে এসব পরিবর্তন করে জীবাণুমুক্তকরণের জন্য প্রযোজ্য সকল ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।
- আক্রান্ত খামারের ডিম, মুরগি বা মাংস ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোনক্রমেই বাইরে আনা যাবে না। উপদ্রুত এলাকায় যানবাহন, মানুষ ও জীবজন্তু চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ জু-স্যানিটারি ব্যবস্থা গ্রহণ ও 'বার্ড ফ্লু আক্রান্ত বিপদজনক এলাকা' সংবলিত সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।

- সরকার কর্তৃক উক্ত এলাকায় কোয়ারেনটাইন এ্যাক্ট জারি ও তা কঠোরভাবে পালন করতে হবে। বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত জোরদার করতে হবে এবং এরই অংশ হিসেবে খামারে প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য 'একটিমাত্র পথ' চালু রাখতে হবে।
- বার্ড ফ্লু প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন প্রদান বিশেষ জরুরি। ভ্যাকসিন শুধু রোগ প্রতিরোধই করে না বরং তা রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া পরিবেশের মাঝে ভাইরাস বিস্তারের সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে (এফএও ২০০৪)।

অর্থনীতিতে প্রতিফলিত বিরূপ প্রভাব

বার্ড ফ্লু পোল্ট্রি শিল্পের উপর যে মারাত্মক আঘাত হানে তাতে সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। পোল্ট্রি শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠি বেকার হয়ে যায়। পোল্ট্রি পণ্যের রপ্তানি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে পড়ে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় কার্যকর করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে 'মুক্ত অবস্থা (freedom status)' অর্জন করা অত্যন্ত দূরূহ কাজ। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাবে ক্ষতিকে যেভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে তা হচ্ছে-

- প্রায়ই একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মুরগি আক্রান্ত হওয়া ও মৃত্যু ঘটা।
- আক্রান্ত এলাকাসমূহের সমুদয় মুরগি নিধন ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় সৎকার।
- সংশ্লিষ্ট এলাকার সর্বত্র জীবাণুনাশকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।
- পোল্ট্রি পণ্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস এবং সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক জনবলের বেকারত্ব।
- খামারিদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি এবং খামারিদের ক্ষতিপূরণ ব্যয়।
- রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং কোয়ারেনটাইন ও সারর্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ভার।
- মহামারী দমণকল্পে বহু দক্ষ জনশক্তিকে উপদ্রুত এলাকাতে নিয়োগ।
- জীবাণুনাশক, ঔষধপত্র, সরঞ্জামাদি (যন্ত্রপাতিসহ), রিয়েজেন্টস্, কিট ইত্যাদির ব্যয়।
- প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি এবং পোল্ট্রি পণ্য গ্রহণের প্রতি ভোক্তাদের অনীহা।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠা- দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিরাজ করলে মুরগির ডিম ও মাংস গ্রহণের প্রতি জনসাধারণের 'অনাকাঙ্খিত ভীতি' প্রকৃতপক্ষে অহেতুক ও অনভিপ্রেত।

বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের তিনটি মহাদেশের প্রায় পঞ্চান্নটিরও বেশি দেশে বার্ড ফ্লু'র প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং এর মধ্যে সর্বশেষ সংযোজন হল বাংলাদেশের। ইতিমধ্যে ভাইরাসের করাল থাবার বিস্তার শুরু হয়েছে। যৌথবাহিনী ও প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বার্ড ফ্লু মোকাবিলাতে সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এসব কাজে জনসাধারণেরও স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ বিশেষ জরুরি। এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে বার্ড ফ্লু'র প্রাদুর্ভাব প্রশমিত হবে এবং পোল্ট্রি শিল্পের আকাশে দৃশ্যমান অশুভ ছায়ার অপসারণ ঘটবে এটা আশা করা যেতে পারে।

৯.১১ মুরগির রাণীক্ষেত রোগ এবং প্রতিকার

রাণীক্ষেত রোগটি মুরগি জাতীয় পাখিদের একটি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। দেশী চরে বেড়ানো এবং বাণিজ্যিক উভয় প্রকার মুরগিতে প্রতি বছর এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভাইরাসজনিত এই রোগটি সর্বপ্রথম ১৯২৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে সনাক্ত করা হয়। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের Newcastle এ রোগটি সনাক্ত করা হয় এবং তখন থেকে ইংল্যান্ড ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে এটি নিউক্যাসেল ডিজিজ নামে পরিচিতি। ১৯২৮ সালে ভারতের রাণীক্ষেত নামক স্থানে এ রোগটি দেখা যায় এবং এ স্থানের নামানুসারে এটি এতদ্বঞ্চলে 'রাণীক্ষেত' রোগ নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বহু আগেই এ রোগটি সনাক্ত করা হয়েছে। যে কোন বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে বাচ্চা মুরগিতে এ রোগের প্রবণতা বেশি এবং মৃত্যুহার প্রায় ৯০-১০০%। বয়স্ক মুরগিতে মৃত্যুহার কিছুটা কম।

বাংলাদেশে মুরগির মোট মৃত্যুর শতকরা ৪০-৬০ ভাগ মৃত্যু হয় রাণীক্ষেত রোগে। এ রোগ পোল্ট্রি শিল্পের জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ।

রোগের কারণ

রাণীক্ষেত রোগটি Paramyxoviridae গোত্রের Paramyxovirus দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইন রয়েছে। যেমন- ভেলোজেনিক স্ট্রেইন (মৃত্যুহার ৯০%), মেসোজেনিক স্ট্রেইন (মৃত্যুহার ৩০%) এবং ল্যানটোজেনিক স্ট্রেইন।

রোগ বিস্তার

রোগাক্রান্ত মুরগির চোখ, মুখ, নাক হতে নিঃসৃত তরল পদার্থ এবং পায়খানার সাথে এ রোগের ভাইরাস অবমুক্ত হয়ে খামারের অন্যান্য মুরগিকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত খামারের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, কর্মচারী বা খামারে আগত অন্যান্য লোকজন, বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত যানবাহন এবং বাতাসের ধূলিকণার মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু এক খামার হতে অন্য খামারে বিস্তারলাভ করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন বন্য এবং গৃহপালিত পাখি এ রোগের জীবাণুর বাহক হতে পারে। রোগ বিস্তারের কারণসমূহ নিম্নরুপ-

- নিয়মিত টিকা প্রদান না করলে এবং অপরিকল্পিতভাবে টিকা প্রদান করলে।
- মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে এবং ঘর বা আশেপাশের পরিবেশ অপরিষ্কার থাকলে।
- বিভিন্ন বয়সের মুরগি একসাথে পালন করলে এবং খামারে অবাধে বন্য পাখি প্রবেশ করলে।
- অসচেতনতা এবং পর্যাপ্ত পরীক্ষাগারের অভাবে মুরগিতে এন্টিবডির পরিমাণ নির্ণয় না করে টিকা ব্যবহার করলে।
- অল-ইন অল-আউট পদ্ধতি অনুসরণ না করলে এবং মৃত মুরগি যেখানে সেখানে ফেললে।

রোগের লক্ষণসমূহ

বিভিন্ন কারণে এ রোগের লক্ষণের মাঝে তারতম্য হতে পারে। যেমন- আক্রান্ত মুরগির বয়স, জাত, লিঙ্গ ভাইরাসের স্ট্রেইন, মিশ্র সংক্রমণ এবং খামারের সার্বিক পরিবেশ। সাধারণ লক্ষণসমূহ হল- ১) হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলার মধ্যে ঘড়ঘড় (Raleness) আওয়াজ এ রোগের প্রথম লক্ষণ; ২) আক্রান্ত মুরগি ঝিমাতে থাকে; ৩) ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়; ৪) চুনের মত সাদা পাতলা পায়খানা কওে; ৫) কখনো কখনো সবুজ বা রক্তের দানা মিশ্রিত পায়খানা করে; ৬) অনেক সময় হা করে লম্বা শ্বাস নেয়; ৭) ঘাড়, ডানা ও পা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয় এবং ৮) ডিম উৎপাদন আকস্মিকভাবে হ্রাস পায় বা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়

ওপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ দেখে সহজেই এ রোগ নির্ণয় করা যায়। ময়নাতদন্ত করেও এ রোগ নির্ণয় করা যায়। খাদ্যনালী বিশেষ করে প্রভেন্টিকুলাস, অন্ত্র, সিকাল টনসিল এবং শ্বাসনালী ও ডিম্বাশয়ে পিনের মাথার সমান রক্তক্ষরণ দেখা যায়। অন্ত্রে plug তৈরি হয়। প্লীহা ফুলে যায় এবং সাদা সাদা দাগ দেখা যায়। অন্ত্রে বিভিন্ন ধরণের দাগ (spot) দেখা যায় এবং অন্ত্রনালী পচে যায়।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। তবে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক যেমন সিপ্রোফ্লক্সাসিন অথবা এনরোফ্লক্সিন গ্রুপের যে কোন একটি ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ৫-৭ দিন খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা পানির সাথে মিশিয়ে হালকা বেগুনী রং হলে

উক্ত দ্রবণ খাদ্যে বা পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত ব্যাবস্থাদি গ্রহণ করতে হয়-

- খামারে নিয়মিত টিকা প্রদানসহ উচ্চমান সম্পন্ন জীবনিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের পথে ফুট বাথের ব্যবস্থা করতে হবে। গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। খামারের ভেতর এবং বাহিরের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে হবে। সর্বাবস্থায় অল-ইন অল-আউট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ খামারে একই বয়সের মুরগি একবারে প্রবেশ করাতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পালন করার পর একসাথে বের করে ফেলতে হবে।
- একটি খামার থেকে আরেকটি খামার কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করা প্রয়োজন যাতে রোগজীবাণুর ক্রস ট্রানসমিশন হতে না পারে। খামারে যেন বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য মূল খামারের চারিদিকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরত্বে ৫ ফুট উঁচু বেঁড়া দিতে হবে।
- আক্রান্ত বা মৃত মুরগি, এদের নাড়িভুঁড়ি ও মল পুড়িয়ে ফেলা উত্তম। তবে গভীর গর্ত করে এগুলো পুঁতে চুন বা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে গর্ত বন্ধ করে ফেলা উচিত। বন্যপ্রাণী যাতে এগুলো মাটির ওপরে তুলতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- খামার থেকে অসুস্থ ও মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটিতে পুঁতে বা পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে।

৯.১২ মুরগির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রোগের পরিচিতি

রোগের নাম	রোগের বিবরণ	যে বয়সে আক্রান্ত হয়	প্রধান প্রধান লক্ষণ	প্রতিরোধ ও প্রতিকার
গামবোরো	এটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগ মূলত মুরগির বার্সা নামক অঙ্গে আক্রমণ করে। তাই একে বার্সাল রোগ বলে। কলুষিত লিটার ও যন্ত্রপাতি, সংস্পর্শে এবং বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।	সাধারণত ৩-১২ সপ্তাহ বয়সের মুরগির বাচ্চা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।	সাদা পাতলা পায়খানা হয় এবং মলদ্বারের চতুস্পার্শ্বে পায়খানা লেগে থাকে। দেহে কাঁপুনি আসে, চলতে পারে না এবং পালক উসকু খুসকো হয়।	বাচ্চা অবস্থায় গামবোরো (লাইভ) টিকা এবং ব্রিডারের ডিম পাড়ার আগে গামবোরো ইন-অ্যাকটিভেটেড টিকা দিতে হয়।
মুরগির বসন্ত	এটি ভাইরাস জাতীয় রোগ। মশার মাধ্যমে অথবা সুস্থ মুরগি অসুস্থ মুরগির সংস্পর্শে আসলে এ রোগ ছড়ায়।	যে কোন বয়সের মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়।	ছোট ছোট দানাদার লালচে গুটি শরীরের পালক বিহীন স্থানে দেখা যায়।	ফাউল পক্স নামক টিকা দিতে হয়।
ফাউল কলেরা	পাসচিউরেলা মারটোসিডা নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। কলুষিত লিটার, মৃত মুরগি এবং বাহক মুরগির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।	প্রধানত ১০ সপ্তাহ বয়সের উর্ধ্বের মুরগি বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।	হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে মারা যায়। সাদা বা সবুজ পাতলা পায়খানা, মাথার ঝুঁটি এবং গলার ফুল নীলাভ হয়।	ফাউল কলেরা নামক টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

রোগের নাম	রোগের বিবরণ	যে বয়সে আক্রান্ত হয়	প্রধান প্রধান লক্ষণ	প্রতিরোধ ও প্রতিকার
ককসিডিওসিস	আইমেরিয়া গ্রুপের প্রটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট এটি মারাত্মক রোগ। আইমেরিয়া ট্যানেলা দ্বারা সৃষ্ট রোগ বেশি মারাত্মক যা সিকাল ককিসিডিওসিস নামে পরিচিত। তাছাড়া আইমেরিয়া নিকাট্রিক্স এবং ম্যাক্সিমা দ্বারা সৃষ্ট রোগই তীব্র।	সাধারণত ২-১২ সপ্তাহের বাচ্চা এবং বাড়ন্ত মুরগিতে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে। উচ্ছিষ্ট খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।	রক্ত মিশ্রিত পায়খানা এ রোগের লক্ষণ। তাছাড়া এ রোগে আক্রান্ত মুরগির পালক নিচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং ঝিমায়।	টিকা নেই। তবে ক্লোপিডল-১ গ্রাম, ৮ কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ২-১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়ালে রোগ হয় না।
কৃমি রোগ	সাধারণত খামারের স্বাস্থ্য-সম্মত ব্যবস্থাপনার অভাবে কৃমি রোগ হয়ে থাকে। মুরগি প্রধানত গোলকৃমি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। প্রধানত লিটার ব্যবস্থাপনার জন্যে এ রোগে মুরগি আক্রান্ত হয়।	সাধারণত ২ মাসের অধিক বয়সের মুরগি কৃমি রোগে আক্রান্ত হয়।	ডিমপাড়া মুরগির ডিম একেবারে কমে যায়, ক্ষুধা মন্দা, পালক উসকো খুসকো, মুরগির ওজন কমে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ।	নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ালে কৃমি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৯.১৩ ঠোকরাঠুকরি বা ক্যানিবালিজম এবং অপুষ্টিজনিত রোগসমূহ

মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির মধ্যে ঠোকরাঠুকরির (cannibalism) স্বভাব রয়েছে। কিন্তু এ স্বভাব যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় তখন তা বদঅভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে সবল মুরগি দুর্বল মুরগিকে ঠোকর দিয়ে পালক তুলে নেয়, রক্তাক্ত করে, ডিম ভেঙ্গে খেয়ে ফেলে এবং ঠুকরিয়ে পায়ুপথ নষ্ট করে দেয়। ক্যানিবালিজম একবার শুরু হলে পুরো খামারে অল্প দিনের মধ্যেই মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যানিবালিজমের প্রভাবে আক্রান্ত মুরগিতে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং মারা যায়। বিভিন্ন কারণে পাখিতে ক্যানিবালিজম হতে পারে। যেমন-

- জায়গা অনুপাতে মুরগির সংখ্যা বেশি হলে এবং খাদ্যের পাত্র বা খাদ্য সরবরাহ কম হলে।
- মুরগি পালন ঘরে আলো বা তাপমাত্রা অতিরিক্ত হলে এবং বাতাসের আর্দ্রতা কম হলে।
- খাদ্যে খনিজ পদার্থের পরিমাণ কম হলে এবং মুরগীর সংখ্যার চেয়ে মোরগের সংখ্যা বেশি হলে।

এ বদঅভ্যাসজনিত রোগটি প্রতিরোধ ও দমনের জন্য কারণ উদ্‌ঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, খাদ্যের মধ্যে পরিমাণমতো লবণ সরবরাহ করা এবং বাচ্চা মুরগির ঠোঁট কাটানো উচিত। যে কোনো বয়সে ঠোঁট কাটানো যায়। তবে, সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে ৬-১০ দিন বয়স। ঠোঁট কাটানোর যন্ত্র বা ডিবিকারের (debeaker) সাহায্যে মুরগির ঠোঁট কাটতে হয়। এ পদ্ধতির জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে যন্ত্রটির ব্লেডকে ৮১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করে নিতে হয় অর্থাৎ ব্লেড যখন একেবারে লাল টকটকে হবে তখনই বুঝতে হবে ব্লেড তৈরি। তারপর দুই ব্লেডের মাঝে মুরগির ঠোঁট রেখে পা দিয়ে মেশিনটি চাপ দিলে ঠোঁট কাটা হয়ে যায়। নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের চেয়ে কম কাটতে হয়। উপরের ঠোঁট নাসারন্ধ্রের ২ মিমি সামনে পর্যন্ত কাটতে হবে।

পাখির অপুষ্টিজনিত রোগসমূহ

পাখির স্বাভাবিক স্বাস্থ্যরক্ষা, মাংস ও ডিম উৎপাদন, বাচ্চার বৃদ্ধি সাধন, উর্বর ডিম এবং উৎপাদন দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। সুষম খাদ্যে পরিমিত পানি, শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে। এসব খাদ্য উপাদানের একটির বা একাধিক অভাব ঘটলে পাখি পালনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ পাখির বাড়ন ব্যাহত হবে, ডিম

উৎপাদন কমে যাবে এবং সেই সাথে বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দিয়ে পাখির মৃত্যু ঘটতে পারে। পাখির খাদ্যে পরিমিত পানি, শর্করা, আমিষ ও চর্বি থাকা আবশ্যক। পাখির এসব খাদ্য উপাদানের অভাবে বিভিন্ন রোগ উপসর্গ দেখা দেয়।

সারণি ৯.১১ঃ পাখির পানি, শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদানের কাজ, অভাবজনিত গোলযোগ ও উৎস।

ক্রমিক	খাদ্য উপাদান	অত্যাবশ্যকীয় কাজ	অভাবজনিত উপসর্গ	
(১)	পানি	দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য পরিপাক।	হজমে ব্যাঘাত, দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস।	স্বাভাবিক পানি।
(২)	শর্করা	দেহের তাপ ও শক্তির উৎস।	দেহের ওজন হ্রাস, বাড়ন ব্যাহত ও ডিম উৎপাদন হ্রাস।	গম, গমের ভূষি, ধান, ধানের কুড়া, ভূট্রা, যব ইত্যাদি।
(৩)	আমিষ	শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ এবং দেহের প্রতিরোধ শক্তি বজায় রাখে।	বাড়ন ব্যাহত, দুর্বলতা, দৈহিক ওজন হ্রাস, উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস।	শুটকি মাছের গুড়া, খৈল ইত্যাদি।

এই সারণির তথ্যাদি ‘লাভজনক পশুপাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা’ বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০২)।

ভিটামিন জীবনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দৈহিক বর্ধন, উৎপাদন ও দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ভিটামিনের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যান্য খাদ্য উপাদানের তুলনায় পাখির খাদ্যে অতি নগণ্য পরিমাণে ভিটামিনের প্রয়োজন। ভিটামিন-সি ছাড়া প্রায় সকল ভিটামিন পাখির খাদ্যে সরবরাহ করা উচিৎ। পাখিকে কি পরিমাণ ভিটামিন সরবরাহ করতে হবে তা নির্ভর করে পাখির জাত, বয়স ও উৎপাদন ক্ষমতার উপর। পাখির খাদ্যে তাই প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন সরবরাহ করতে হয়। নির্দিষ্ট ভিটামিনের অভাবে নির্দিষ্ট রোগ উপসর্গ দেখা দেয়। পাখির খাদ্যে পর্যাপ্ত বিভিন্ন ভিটামিন সরবরাহ করলে দেহের ভিটামিনের অভাব হয়না। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স পাওয়া যায়। প্রিমিক্সের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী পাখিকে কোম্পানির নির্দেশমত খাওয়ালে অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করা যায়।

সারণি ৯.১২ঃ পাখির প্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ উপসর্গ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ (মিলিগ্রাম/ কেজি খাদ্য)।

ক্রমিক	ভিটামিন	অভাবজনিত রোগ লক্ষণ	উৎস
(১)	ভিটামিন-এ	দৈহিক ওজন হ্রাস ও বাড়ন ব্যাহত। পালক উসকো-খুসকো ও দুর্বল। চোখের পাতা ফুলে।	শাক-সবজি, হলদে ভূট্রা, গাজর, কড মাছের তেল।
(২)	ভিটামিন-বি:		
(ক)	থায়ামিন (বি$_1$)	পলিনিউরাইটিস, ক্ষুধামান্দ্য, দুর্বলতা ইত্যাদি।	চাউল, গম, শাক-সবজি।
(খ)	রিবোফ্লাভিন	কার্লড-টো প্যারালাইসিস, ডায়রিয়া, দুর্বলতা, বাড়ন ব্যাহত, ডিম উৎপাদন হ্রাস।	শাক-সবজি, ছোলা, খৈল, আলফালফা ইত্যাদি।
(গ)	নিয়াসিন (নিকোটিনিক এসিড)	বাড়ন ব্যাহত, পালক গজানো হ্রাস, পেরেসিস ও শল্কাকার চর্মপ্রদাহ।	-
(ঘ)	পাইরিডক্সিন	ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, ডিম উৎপাদন ও উর্বরতা হ্রাস, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রমিক এনিমিয়া।	শস্য, মাছ, চাউল ও গমের গুড়া, আলফালফা, ঈস্ট ও প্রাণিজ খাদ্য।

(ঙ)	প্যান্টোথেনিক এসিড	চর্ম প্রদাহ, চোখের পাতায় ও চারিপার্শ্বে এবং পায়ে ক্ষত, ডিমের উর্বরতা হ্রাস।	আলফালফা, চীনাবাদাম, গুড়, চাউলের কুড়া ও গমের ভূষি।
(চ)	বায়োটিন	চর্মপ্রদাহ, পেরোসিস, ডিমের উর্বরতা হ্রাস।	শস্য, ঈস্ট, আলফালফা, দুগ্ধজাত দ্রব্য, সয়াবিন ও শাক-সবজি।
(ছ)	ফলিক এসিড	পালক গজানো হ্রাস, ওজন হ্রাস, পেরোসিস, মাইক্রোসাইটিক এনিমিয়া।	যকৃত, ঈস্ট, ফিস মিল, সয়াবিন মিল, গম ও সবুজ শাক-সবজি।
(জ)	ভিটামিন বি$_{১২}$	বাড়ন ব্যাহত, উর্বরতা হ্রাস ও এনিমিয়া।	যকৃত, মাংস, ফিস মিল, সবুজ শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি।
(ঝ)	কোলিন	পেরোসিস, স্লিপড-টেনডোন।	ফিস মিল, সয়াবিন মিল, চাউলের কুড়া ও গমের অঙ্কুর।
(৩)	ভিটামিন সি	সাধারণত পাখির প্রয়োজন হয় না।	-
(৪)	ভিটামিন ডি	বাড়ন্ত পাখিতে রিকেটস বা হাঁড় বাঁকা, ঠোট, নখ ও অস্থি নরম হয় এবং পাখি হাঁটতে চায়না।	সকালের সূর্য রশ্মির সহায়তায় দেহে ভিটামিন ডি তৈরি হয়।
(৫)	ভিটামিন ই	এনসেফালোম্যালাসিয়া (ক্রেজি চিক ডিজিজ), মস্তিস্ক নরম, পায়ের পক্ষাঘাত হয়। মাসকুলার ডিস্ট্রফি (পাখির বুক, উরু, গিজার্ড, হৃৎপিন্ড পেশীর পুষ্টিত্রুটি হয়)। এগজুডেটিভ ডায়াথেসিস (বুক ও পেটের নিচে এডিমা হয়)।	আলফালফা, চাউলের কূঁড়া, শুটকি মাছের কুড়া ইত্যাদি।
(৬)	ভিটামিন কে	রক্ত জমাট বাধার সময় দীর্ঘায়িত।	সবুজ শাক-সবজি, ফিস মিল।

এই সারণির তথ্যাদি ‘লাভজনক পশুপাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা’ বই থেকে নেয়া হয়েছে (সামাদ ২০০২)।

৯.১৪ বাণিজ্যিক মুরগি পালনের প্রস্তুতি

আমাদের দেশে আমিষের অভাব খুবই প্রকট। আমিষের এ অভাব মেটাতে মুরগি পালনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। খুব অল্প সময়ে অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে মুরগি পালন একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় কৃষি শিল্প হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পরিকল্পনায় মুরগি খামার স্থাপনের মাধ্যমে মুরগি পালনকে লাভজনক করে তোলা যায়। মুরগি খামার দু’ধরণের হতে পারে। যেমন- পারিবারিক মুরগি খামার ও বাণিজ্যিক মুরগি খামার। পারিবারিক মুরগি খামারে অল্পসংখ্যক মুরগি পালন করে সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে বাণিজ্যিক মুরগি খামার গড়ে তোলা যায়। উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে মুরগির খামার বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। মাংস উৎপাদনের জন্য মুরগি পালন করলে একে বলা হয় ব্রয়লার খামার। আবার ডিম উৎপাদনের জন্য খামার করলে একে বলা হয় লেয়ার মুরগির খামার। তবে যে খামারই স্থাপন করা হোক না কেন তা লাভজনক করতে চাইলে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা ও সঠিক পরিচালনা।

বাণিজ্যিক মুরগি খামারের জন্য স্থান নির্বাচন

মুরগির খামার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। খামার বলতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মুরগি প্রতিপালন করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। মুরগির খামার বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, যেমন ডিম উৎপাদন খামার, মাংস উৎপাদন খামার, প্রজনন খামার, ব্রিডার খামার, বাচ্চা উৎপাদন খামার। যে ধরণের মুরগি খামারই স্থাপন করা হোক না কেন সাফল্যজনকভাবে খামার

পরিচালনার জন্য এর স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কৌশল। খামারের জন্য স্থান নির্বাচনের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো এই বইয়ের ৪নং অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক মুরগি খামার পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

যে কোন খামার বা শিল্পে বাণিজ্যিকভাবে সফলতা লাভের জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বাণিজ্যিক মুরগি খামার ব্যবস্থাপনায় তিনটি মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়, যথা- ১. পাখির খাদ্য, ২. বাসস্থান ও ৩. রোগ দমন। মুরগির খামার একটি বিশেষ ধরণের শিল্প। তাই এ খামার প্রতিষ্ঠার জন্য মূল বিষয় ছাড়াও আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলো বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হয়। মুরগির খামার পরিকল্পনার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যথা-

(ক) মূলধন: মূলধনের অবস্থা কি? নিজের টাকা আছে না-কি তা ব্যাংক থেকে ঋণ করতে হবে? মূলধনের উপর ভিত্তি করেই খামার স্থাপনের জমি, বাসস্থানের আকার ও সংখ্যা, প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান অনুসারে গুদামের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানির পাত্র, ব্রুডিং যন্ত্রপাতি, খামার পরিচালনার লোকজনের জন্য অফিসসহ অন্যান্য সুবিধাসমূহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) জমি: বার্ষিক যত সংখ্যক ডিম/ব্রয়লার উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারন করা হবে তদনুযায়ী লেয়ার/ব্রয়লারের প্রতিপালনের ঘর এবং অন্যান্য সুবিধা, যেমন- অফিস, শ্রমিক ঘর, খাদ্য গুদাম, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের ঘর, সংরক্ষণাগার ইত্যাদি তৈরির জন্য জমি এবং এ সকল প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি তৈরির জন্য মোট জায়গার সঙ্গে আরও প্রায় ১.৫ গুণ ফাঁকা জায়গা যোগ করে খামারের মোট জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

(গ) মুরগির বাসস্থান: নিরাপদ ও আরামে থাকার জায়গার নাম বাসস্থান। বাসস্থান নিরাপদ রাখতে হলে নির্বাচিত স্থানের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে তা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে ঝড়বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহজে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। বাসস্থানের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, যেমন- পরিমাণমতো থাকার জায়গা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য ও পানির পাত্র, তাপ ও আলো এবং বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। পালনকারীর সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে ঘর পাকা, কাঁচা বা টিনের হতে পারে। প্রজাতি বা স্ট্রেইন অনুযায়ী যতগুলো মুরগি রাখা হবে তাদের মোট জায়গার পরিমাণ হিসেব করে ঘর তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি ঘরের মাঝে ২৫-৩০ ফুট বা ততোধিক জায়গা আলো ও মুক্ত বাতাস প্রবাহের জন্য খালি রাখা দরকার।

- ঘর তৈরি: বাজারজাত করার বয়স পর্যন্ত প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য ১ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। এভাবে হিসেব করে ব্রয়লার উৎপাদনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই ঘরের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। সাদা খোসার ডিম উৎপাদনকারী প্রতিটি মুরগির জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা এবং বাদামি খোসার ডিম উৎপাদনকারী মুরগির জন্য ৪ বর্গফুট জায়গা হিসেব করে থাকার ঘর তৈরি করতে হবে। এসব মুরগি খাঁচায়, মাচায় অথবা লিটার পদ্ধতিতে পালন করা যায়। পালন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ঘরের পরিমাণ ভিন্ন ধরণের হতে পারে। খাঁচা পদ্ধতিতে প্রতিটি উৎপাদনশীল মুরগির জন্য কেইজে ৬০-৭০ বর্গইঞ্চি জায়গা প্রয়োজন হবে। কাজেই এ হিসেবে খাঁচা তৈরি করা হয়। খাঁচার সারি লম্বালম্বিভাবে এক সারি বা একটার উপর আরেকটা রেখে ৩/৪ সারি করা যায়। আবার সিঁড়ির মতো করে সাজিয়ে উভয় পার্শ্বেও সারি করা যায়। প্রতিটি উৎপাদনশীল মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ মাচায় ১.২-১.৩ বর্গফুট এবং লিটারে ১.৫-১.৭৫ বর্গফুট। মুরগির দৈহিক ওজন এবং আবহাওয়াভেদে এই পরিমাপের মাত্রার পরিবর্তন হতে পারে। লিটার পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতি ১০ বর্গফুট মেঝের জন্য ৫ কেজি লিটার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতিতে পালন করতে মুরগির ঘরের মেঝে পাকা হলে ভালো হয়। কাঁচা মেঝের ক্ষেত্রে শক্ত এঁটেল মাটির মেঝে হলেও চলবে। তবে এ ধরণের মেঝে বর্ষাকালে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যেতে পারে। শুকনো বালির মেঝের ক্ষেত্রে বর্ষাকালে সমস্যা হতে পারে।
- ঘরের চালা ও বেড়ার নমুনা: বাংলাদেশের পরিবেশে দোচালা বা গেবল টাইপ চালই মুরগির জন্য বেশি আরামদায়ক। লেয়ারের ঘরের বেড়ার উচ্চতার পুরোটাই তারজালি দিয়ে তৈরি করতে হবে। বেশি বাতাস বা বেশি শীত হতে মুরগিকে রক্ষার জন্য বেড়ার ফাঁকা অংশ প্রয়োজনে ঢেকে দেয়ার জন্য চটের পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্রয়লার লালন-পালনের সুবিধার্থে প্রথম সপ্তাহের ৯৫$^\circ$ ফারেনহাইট থেকে কমাতে কমাতে ষষ্ঠ সপ্তাহে ৭০$^\circ$

ফারেনহাইট নামিয়ে আনার জন্য বেড়ায় বেশি ফাঁকা জায়গা রাখা যাবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এজন্য দেয়ালের উচ্চতার ৬০% তারজালি দিয়ে তৈরি করতে হয়। তবে শীতের দিনে তারজালির এ অংশটুকু চটের বস্তা দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

- ডিম পাড়ার বাসা: মাচা অথবা লিটারে পালন পদ্ধতিতে প্রতি ৫টি মুরগির জন্য ১টি করে ডিম পাড়ার বাসা সরবরাহ করতে হয়। প্রতিটি বাসা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট, প্রস্থে ১ ফুট ও গভীরতায় ১.৫ ফুট। খাঁচা পদ্ধতিতে পালন করলে আলাদাভাবে ডিম পাড়ার বাসা বা বাক্স লাগে না। খাঁচাগুলো ঢালসহ এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে করে মুরগি ডিম পাড়া মাত্রই ডিমগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে খাঁচার সামনে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে বর্ধিত অংশ এসে জড়ো হয়।
- আলোকায়ন: লেয়ারে দৈনিক (২৪ ঘন্টায়) আলোর প্রয়োজন হবে ১৬ ঘন্টা। কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা বছরের ছোট-বড় দিন অনুযায়ী দৈনিক ২.৫ ঘন্টা হতে ৪ ঘন্টা পর্যন্ত হবে। আলোর উৎস বৈদ্যুতিক বাল্ব। যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই সেখানে উজ্জ্বল হারিকেনের আলো দ্বারা ব্যবস্থা করতে হবে। বাল্বের শক্তি হবে ৪০ ওয়াট, আলোর রং স্বাভাবিক, আলোর তীব্রতা মৃদু (২০ লাক্স) হবে। ১টি বাল্বের আলোকায়ন এলাকা ১০০০ বর্গ ফুট। বাল্ব স্থাপনের এক পয়েন্ট হতে আরেক পয়েন্টের দূরত্ব হবে ২০ ফুট। প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যে কোন উৎস থেকেই ব্রয়লার গৃহে আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রথম সপ্তাহে ব্রয়লার গৃহে খাবার ও পানি দেখার জন্য সারারাত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে রাতের বেলায় মাঝে মাঝে আলো নিভিয়ে আবার জ্বালাতে হবে এবং এভাবে সারারাত মৃদু আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সাধারণত প্রতি ১০ বর্গফুটের জন্য ৫ ওয়াট পরিমাণ আলো প্রয়োজন।

(ঘ) মুরগির খাদ্য ব্যবস্থাপনা: খাদ্যের গুণগত মান, খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ, প্রতি কেজি খাদ্যের দাম, খাদ্য খাওয়ানোর দক্ষতা প্রভৃতি খাদ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভূক্ত। খাদ্য খরচ মোট উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৬০-৭৫% এবং খাদ্যের গুণাগুণ ও মূল্যের ওপর লাভ লোকসান নির্ভর করে। সেজন্য খামার ব্যবস্থাপনায় খাদ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু বাসস্থানের পরিবেশ অনুকূল ও আরামদায়ক না হলে শুধু খাদ্য দিয়ে তার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তেমনি খামার রোগমুক্ত না হলেও তা লাভজনক হবে না। তাই খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ কিনা এবং খাদ্যের মূল্য ন্যায্য কিনা তা বিবেচনা করে খামার স্থাপন করতে হবে। লেয়ার মুরগির সংখ্যা অনুসারে প্রতিটি মুরগির জন্য দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম খাদ্যের প্রয়োজন হিসেবে কমপক্ষে ২ মাসের খাদ্য সংরক্ষণাগার তৈরি করতে হয়। প্রতিটি ব্রয়লার ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪ কেজি খাদ্য খাবে। তাই এ পরিমাণকে ব্রয়লারের মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করে যে ফল দাড়াবে সেরূপ খাদ্য ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম তৈরি করতে হবে। বয়সভেদে ব্রয়লারের জন্য ২.৫-১০ সেন্টিমিটার লম্বা খাদ্যের পাত্র বা ফিড ট্রাফের প্রয়োজন। সাধারণত ৫০ টি বাচ্চার জন্য একটি খাদ্যের লম্বা ট্রে বা পাত্র এবং তদানুযায়ী পানির পাত্র প্রতি ১০০ টি বাচ্চার জন্য প্রবাহমান পানির ১টি ড্রিংকার প্রয়োজন হয়।

(ঙ) খামার স্থাপন ও পরিচালনার হিসাব: খামার স্থাপন ও পরিচালনার খরচ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

স্থায়ী খরচ: স্থায়ী খরচের খাতওয়ারী হিসেব নিম্নরুপ-

- খামারভূক্ত জমির মূল্য- এলাকা অনুযায়ী প্রতি বিঘা জমির মূল্য কমবেশি হবে।
- মুরগির গৃহায়ণ ব্যবস্থা বাবদ খরচ- ঘর তৈরির সাজ-সারঞ্জাম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যথা- বাঁশ, টিন বা বিচালী, মাটির ঘর, ইট, সিমেন্ট বা পাকা দালান ঘর। ঘর তৈরির সাজসরঞ্জাম অনুযায়ী প্রতি বর্গফুট ঘর তৈরির খরচ, তা যেভাবেই ঘর তৈরি করা হোক না কেন প্রতি বর্গফুট হিসেবে খরচ ধরে ঘরের মোট খরচ বের করতে হবে।
- ম্যানেজারের অফিস, ডিম/মাংস সংরক্ষণগার, খাদ্য গুদাম, খাদ্য ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার স্থান, শ্রমিকদের বিশ্রাম ঘর, অসুস্থ ও মৃত মুরগি রাখার জায়গা নির্মানবাবদ খরচ।
- আসবাবপত্র ক্রয় বা তৈরি ও যানবাহন ক্রয়বাবদ খরচ- খাবার ও পানির পাত্রের দাম, ডিম পাড়ার বাক্সের দাম ও ডিম রাখার ঝুড়ি কেনার জন্য খরচ।

আবর্তক বা চলমান বা চলতি খরচ: আবর্তক খরচের খাতওয়ারী হিসেব নিম্নরুপ -

- মুরগি সংক্রান্ত খরচ- ডিমের ব্যবহার অনুযায়ী ডিমপাড়া মুরগির খামার দু'প্রকার। যথা- নিষিক্ত বা বাচ্চা ফুটানোর ডিম উৎপাদন খামার এবং অনিষিক্ত বা খাবার ডিম উৎপাদন খামার। খাবার সাদা বা বাদামি খোসার ডিম বা বাচ্চা ফুটানোর ডিম উৎপাদনকারী মুরগি বা বাচ্চা কোথায় পাবেন, আপনি সেগুলো আনতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে। নিষিক্ত ডিম বা ডিমের জন্য প্রজননক্ষম পুলেট ও ককরেলের মূল্য, অনিষিক্ত বা খাওয়ার ডিম উৎপাদনের জন্য উন্নতমানের হাইব্রিড পুলেটের মূল্য অথবা একদিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয়ের খরচ।
- সুষম খাদ্যের মূল্য- মাথাপিছু দৈনিক ১১০-১২০ গ্রাম ধরে।
- লিটার কেনা বাবদ খরচ। খাঁচায় মুরগি পালন করলে মেঝে পাকা হলেই ভাল।
- প্রতিষেধক টিকা এবং চিকিৎসায় ঔষধপত্রের মূল্য।
- খামার পরিচালনায় জনবলের বেতনভাতা খরচ- ম্যানেজারের বার্ষিক বেতন ভাতা, অফিস স্টাফের বার্ষিক বেতনভাতা ও শ্রমিকদের বার্ষিক বেতন ভাতা।
- পরিবহন ও যাতায়াত খরচ- বিভিন্ন কাজে ম্যানেজারের যাতায়াত খরচ এবং খাদ্য সংগ্রহ, ডিম বাজারজাতকরণ ও ডিমপাড়া শেষে মুরগি বিক্রির জন্য পরিবহন খরচ।
- মূলধনের সুদ- ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে মূলধনের উপর বার্ষিক সুদ।
- ডিপ্রিসিয়েসন বা অপচয় খরচ- জমিবাদে স্থায়ী খরচের অপচয়ের শতকরা হার ইত্যাদি যত খরচ হয় সব যোগ করে বার্ষিক খরচ/ মোট খরচের হিসেব রাখতে হবে।
- মেরামত খরচ এবং বিদ্যুৎ ও পানির বিল বাবদ খরচ। এডভারটাইজিং বা বিজ্ঞাপন ব্যয়।
- নষ্ট বা বাদ যাওয়া ডিমের মূল্য- ডিম বাছাই ও ছাটাই খরচ- যতগুলো ডিম বিক্রির অনুপযুক্ত হলো তার মূল্য।
- অসুস্থ বা মৃত মুরগির মূল্য।

খামার হতে সম্ভাব্য বার্ষিক আয়-

- ডিম বিক্রি- লেয়ার খামারের ক্ষেত্রে বার্ষিক গড়ে ৭০-৭৫% হারে উৎপাদন ধরে বর্তমান বাজার দরে ডিমের মোট মূল্য।
- ডিম পাড়া শেষে মুরগীর মূল্য- শতকরা ৮৮ টি মুরগীর সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে এ হিসেবে ডিম পাড়া শেষে বাজার দরে মোট মূল্য।
- ব্রয়লার খামারের ক্ষেত্রে গড়ে ৮ সপ্তাহ পর পর মাংসের জন্য মুরগী বিক্রি।
- প্রতিটি মুরগী থেকে বছরে ৩০ কেজি বিষ্ঠা পাওয়া যাবে। এভাবে হিসেব করে বর্তমান বাজার দরে মোট বিষ্ঠা বা সারের মূল্য।
- অকোজো আসবাবপত্র বিক্রিবাবদ মোট আয়।

খামার হতে বার্ষিক কত টাকা লাভ করতে চাই তা স্থির করতে হবে। স্থিরকৃত পরিমাণ টাকা মুনাফা করতে হলে খামারজাত দ্রব্য হতে শতকরা ১০-১২ টাকা লাভের হারে মোট কত টাকা আয় করতে হবে তা হিসেব করতে হবে। বর্তমান বাজার দরে কতগুলো ডিম বিক্রি করলে এ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আয় করা যাবে তা হিসেব করতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। যেমন- বার্ষিক গড়ে ৭০-৭৫% হারে খাবার ডিম বা অনিষিক্ত ডিম উৎপাদন এবং ৬০-৬৫% হারে বাচ্চা ফুটানো বা নিষিক্ত ডিম উৎপাদন ধরে, প্রতিটি ডিম গড়ে ৮.০০ টাকা হিসেবে বিক্রি ধরে, বছর শেষে ৮৮% মুরগি সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকবে ধরে; আর বাকি পুরানো মুরগি বিক্রি করে ও উৎপাদন খরচ বাদে ১০-১২% লাভ থাকবে এ হিসেব করে পরিকল্পনা করতে হবে। এভাবে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে প্রকৃত লাভ-লোকসান হিসেব করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ চিন্তাভাবনা করে খামার স্থাপনের কাজে হাত দিতে হবে।

৯.১৫ বাণিজ্যিক লেয়ার খামার স্থাপনে আয়-ব্যয়ের নমুনা

১। প্রকল্পের নাম: হাজী লেয়ার কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রকল্প

২। উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা: হাজী আব্দুস ছামাদ; পিতা- মৃত আজিম উদ্দিন; গ্রাম- বুড়াইল; উপজেলা- ফুলছড়ি; জেলা- গাইবান্ধা।

৩। প্রকল্পের অবস্থান: গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন উদাখালী ইউনিয়নের বুড়াইল গ্রামে যাহার জে এল নং ২২ দাগনং ৩১১৯ এবং জমির পরিমান ০.৩৫ একর।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
(খ) বাদমী খোসার ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন।
(গ) পারিবারিক বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।

৫। প্রকল্পের মালিকানা: ব্যক্তি মালিকানাধীন।

৬। অবকাঠামোগত অবস্থান: ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ উঁচু জায়গা ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়। লেয়ার খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা (পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা, পাকা যাতায়াত ব্যবস্থা, উঁচু অবস্থান ইত্যাদি) বিদ্যমান। জমির মালিকানা নিজস্ব।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ৫ বছর।

৮। স্থায়ী খরচ:

খাঁচা পদ্ধতিতে প্রতিটি মুরগির জন্য জায়গার পরিমাণ ৪৩.৭ বর্গসেন্টিমিটার। একসঙ্গে প্রতিটি খাঁচায় মুরগির সংখ্যা ৫টি। প্রতি ইউনিট খাঁচায় আসর সংখ্যা ২১৮ বর্গসেন্টিমিটার। ৯০০টি মুরগির খাঁচার ইউনিট সংখ্যা ১৮০ টি। প্রতি ইউনিট খাঁচার দাম ৫০০ টাকা। খাঁচা স্থাপনের ঘরের আকার ১৮০ বর্গমিটার। প্রতি বর্গমিটার ঘর তৈরির খরচ ৭৫০ টাকা। এই পদ্ধতিতে ডিমের বাসা, খাবার পাত্র ও পানির পাত্র লাগবে না।

(ক) খাঁচা তৈরি বাবদ খরচ ১৮০টি × ৫০০ টাকা = ৯০,০০০ টাকা।

(খ) ঘর তৈরি বাবদ খরচ ১৮০ বর্গমিটার × ৭৫০ টাকা = ১,৩৫,০০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট স্থায়ী খরচ = (৯০,০০০ + ১,৩৫,০০০) = ২,২৫,০০০০ টাকা।

৯। বার্ষিক আবর্তক বা চলতি খরচ:

প্রতি বৎসর পুলেট মুরগি, মুরগির খাদ্য, ঔষধ ও টিকাবীজ খরচ এখানে দেখানো হয়েছে, তবে নিজস্ব শ্রম দেওয়া হবে বিধায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় দেখানো হয়নি। প্রতিটি পুলেটে দৈনিক ১০০ গ্রাম হিসাবে মোট খাদ্যের প্রয়োজন = (১০০ × ৯০০ × ৩৬৫) গ্রাম = ৩২,৮৫০ কেজি।

(ক) প্রতিটি ৯০ টাকা হিসাবে পুলেটের মূল্য = (৯০০ × ৯০.০০) টাকা = ৮১,০০০ টাকা।

(খ) প্রতি কেজি ১২ টাকা দরে মোট খাদ্য খরচ = (৩২,৮৫০ × ১২.০০) টাকা = ৩,৯৪,২০০ টাকা।

(গ) ঔষধ ও টিকাবীজ সহ বিবিধ খরচ ৯০০ টি × ৫ টাকা = ৪,৫০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট বার্ষিক আবর্তক বা চলতি খরচ = (৮১,০০০ + ৩,৯৪,২০০ + ৪,৫০০) টাকা = ৪,৭৯,৭০০ টাকা।

১০। সর্বমোট খরচ ও তার উৎস:

স্থায়ী এবং বার্ষিক আবর্তক খরচ মোট (২,২৫,০০০ + ৪,৭৯,৭০০) টাকা = ৭,০৪,৭০০০ টাকা হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে মোট ৫,০০,০০০০ টাকা মূলধন প্রয়োজন হবে যেহেতু ডিমের আয় হতে দ্বিতীয় মাস থেকে খাদ্য খরচ মেটানো যাবে।

১১। আবর্তক বা চলতি আয়:

মোট ৯০০টি মুরগির উৎপাদন গড়ে ৭৫% ধরে মোট বার্ষিক ডিম উৎপাদন হবে (৬৭৫ × ৩৬৫) টি = ২,৪৬,৩৭৫ টি। বছর শেষে ১০% মৃত্যুহার বাদে বিক্রিযোগ্য মুরগী থাকবে।

(ক) প্রতিটি ডিম থেকে ২.৫ টাকা হিসাবে মোট আয় ২,৪৬,৩৭৫ × ২.৫ = ৬,১৫,৯৩৭ টাকা।

(খ) প্রতিটি মুরগী থেকে ১০০ টাকা হিসাবে মোট আয় ৮১০ × ১০০ = ৮১,০০০ টাকা।

(গ) মুরগীর বিষ্ঠা থেকে মোট আয় = ৫,০০০ টাকা।

বার্ষিক সর্বমোট আয় = ৭,০১,৯৩৭ টাকা।

১২। বাৎসরিক মুনাফা বা নীট আয়:
বাৎসরিক সর্বমোট আয় ৭,০১,৯৩৭০০ টাকা থেকে বার্ষিক মোট আবর্তক খরচ ৪,৭৯,৭০০ টাকা বাদ দিলে বার্ষিক মুনাফা থাকবে মোট ২,২২,২৩৭ টাকা।

১৩। মতামত: উদ্যোক্তা ৫ বৎসরে প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের পর নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প চালু রাখবেন এবং আত্মকর্মস্থানের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ২,২২,০০০ টাকা নীট আয় করে স্বাবলম্বী হবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, খামারের প্রয়োজনীয় ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্থিতাবস্থায় ধরা হয়েছে। [বিশেষ দ্রষ্টব্য: খামারে আয়-ব্যয়ের এই হিসাব ২০১০ সালের গড় বাজার দর অনুযায়ী প্রণীত; স্থান ও কাল ভেদে এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তনশীল।]

৯.১৬ প্রতি ৮ সপ্তাহে ২০০০ ব্রয়লার উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের নমুনা

১। প্রকল্পের নাম: হাজী ব্রয়লার কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রকল্প
২। উদ্যোক্তার নাম ও ঠিকানা: হাজী আব্দুস ছামাদ; পিতা- মৃত আজিম উদ্দিন; গ্রাম- বুড়াইল; উপজেলা- ফুলছড়ি; জেলা- গাইবান্ধা।
৩। প্রকল্পের অবস্থান: গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন উদাখালী ইউনিয়নের বুড়াইল গ্রামে যাহার জেএল নং ২২ দাগনং ৩১১৯ এবং জমির পরিমান ০.৩৫ একর।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: (ক) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
(খ) মাংস উৎপাদন ও পুষ্টি উন্নয়ন।
(গ) পারিবারিক ভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন।
৫। প্রকল্পের মালিকানা: ব্যক্তি মালিকানাধীন।
৬। অবকাঠামোগত অবস্থান: ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ উঁচু জায়গা ও সার্বিক অন্যান্য অবস্থা সম্ভাবনাময়।
৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ৫ বছর।
৮। প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগ: প্রয়োজনীয় মূলধন (স্থায়ী ও চলতি) ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা নিজস্ব জমিতে বিনিয়োগ করা হবে অর্থাৎ উদ্যোক্তার নিজস্ব ০.৩৫ একর জমির উপর প্রস্তাবিত ব্রয়লার খামার স্থাপন করা হবে। উদ্যোক্তার নিজস্ব বাড়ীর অংশ বিশেষ অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং উদ্যোক্তা নিজে খামারের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯। স্থায়ী খরচ:
(ক) ব্রয়লার ঘর নির্মাণ: প্রতি বর্গফুট ১৫০ টাকা হিসেবে ৫০০ বর্গফুট আকারের ৪ টি টিনের ঘরের মূল্য = ৩,০০,০০০ টাকা।
(খ) গুদাম ঘর নির্মাণ: প্রতিবর্গ ফুট ১০০টাকা হিসেবে ১০০ বর্গফুটের গুদাম ঘরের মোট নির্মাণ খরচ = ১০,০০০ টাকা।
(গ) যন্ত্রপাতি: খামারের যন্ত্রপাতি ববদ মোট খরচ = ৪৯,২০০টাকা ।
(১) বাল্ব বা হিটার ব্রুডার- প্রতিটি ৫,০০০টাকা হিসেবে ৪ টির মূল্য = ২০,০০০ টাকা
(২) থার্মোমিটার- প্রতিটি ১০০ টাকা হিসেবে ২ টির (প্রতিঘরে মাত্র ৩/৪ সপ্তাহ ব্যবহার) মূল্য = ২০০ টাকা
(৩) হাইড্রোমিটার- প্রতিটি ৫০০ টাকা হিসেবে ৪ টির মূল্য = ২,০০০ টাকা।
(৪) খাদ্য পাত্র প্রতিটি ব্রয়লারের জন্য গড়ে ৫ সেন্টিমিটার জায়গা ধরে ৮০ টি খাদ্যপাত্রের (প্রতিটি ১০০ টাকা হিসেবে ৪ টি) মূল্য = ৮,০০০টাকা।
(৫) পানির পাত্র - খাদ্য পাত্রের অর্ধেক হিসেবে- প্রতিটি ১০০ টাকা হিসেবে ৪০ টি পাত্রের মোট মূল্য = ২০,০০০টাকা।
(৬) আসবাব পত্র, জেয়ার, টেবিল, ফাইল, কেবিনেট, রেক, ইত্যাদি ক্রয়বাবদ মোট খরচ = ১০,০০০ টাকা।
(৭) বিষ্ঠা সংরক্ষণ স্থান প্রতি ব্রয়লার হতে দুই মাসে ২ কেজি হিসেবে বছরে ৪ টনের জন্য সংরক্ষণ স্থান নির্মাণ খরচ = ৫,০০০টাকা ।
অতএব, সর্বমোট খরচ = (৩,০০,০০০ + ১০,০০০ + ৪৯,২০০) টাকা = ৩,৫৯,২০০ টাকা।

১০। আবর্তক বা চলতি খরচ (৮ সপ্তাহ চক্র):

(ক) বাচ্চার মূল্য- প্রতি ব্যাচে ২১০০ টি (৫% মৃত্যুহার সহ) হিসেবে এবং প্রতিটির মূল্য ১৮ টাকা ধরে ব্রয়লার বাচ্চার মোট মূল্য = ৩৭,৮০০টাকা ।

(খ) খাদ্য খরচ- ২,০০০ ব্রয়লারের ৮ সপ্তাহের খাদ্যের মূল্য (প্রতি ব্রয়লার ৪ কেজি হিসেবে মোট ৮,০০০ কেজি এবং প্রতি কেজি ১০ টাকা হিসেবে) = ৮০,০০০ টাকা।

(গ) জনশক্তি বাবদ খরচ- ৩ জন শ্রমিকের মোট বেতন = (জন প্রতি মাসিক ২,০০০ টাকা হিসেবে ২ মাস) = ১২,০০০ টাকা।

(ঘ) লিটার ক্রয় বাবদ খরচ- (প্রতি ব্রয়লারের জন্য ১ বস্তা হিসেবে মোট ২০ বস্তার মূল্য প্রতি বস্তা ৫০ টাকা হিসেবে) = ১,০০০ টাকা।

(ঙ) বিদ্যুৎ খরচ- প্রতি ৮ সপ্তাহে বা ২ মাসে বিদ্যুৎ খরচ = ২,০০০ টাকা।

(চ) রোগ প্রতিষেধক, পরিবহন, চিকিৎসা ও অন্যান্য মোট খরচ (প্রতি ২ মাসে) = ৮,০০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট আবর্তক বা চলতি খরচ (৮ সপ্তাহ চক্র) = (৩৭,৮০০ + ৮০,০০০ + ১২,০০০ + ১,০০০ + ২,০০০ + ৮,০০০) টাকা = ১,৪০,৮০০ টাকা।

১১। আবর্তক বা চলতি আয়:

(ক) ২০০০ জীবন্ত ব্রয়লার বিক্রি বাবদ আয় (প্রতিটি ২ কেজি ধরে এবং প্রতি কেজি ৫০ টাকা হিসেবে) = ২,০০,০০০ টাকা।

(খ) পোল্ট্রি বিষ্ঠা বিক্রি বাবদ আয় (প্রতি ব্রয়লার থেকে ২ কেজি হিসাবে মোট ৪,০০০ কেজি বা ৪ মেট্রিক টন এবং প্রতি মেট্রিক টন ৫০০ টাকা হিসেবে = ২,০০০ টাকা।

অতএব, সর্বমোট আবর্তক আয় = (২,০০০ + ২,০০০) টাকা = ২,০২,০০০ টাকা।

১২। বাৎসরিক মুনাফা বা নীট আয়:

বাৎসরিক সর্বমোট আবর্তক খরচ = (১,৪০,৮০০ × ৪) টাকা = ৫,৬৩,২০০ টাকা।

বাৎসরিক সর্বমোট আবর্তক আয় = (২,০২,০০০ × ৪) টাকা = ৮,০৮,০০০ টাকা।

বাৎসরিক মুনাফা বা নীচ আয় = (৮,০৮,০০০ - ৫,৬৩,২০০) টাকা = ২,৪৪,৮০০ টাকা।

১৩। মতামত: উদ্যোক্তা নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে প্রকল্প চালু রাখবেন এবং আত্মকর্মস্থানের মাধ্যমে বাৎসরিক প্রায় ২,৪৪,৮০০ টাকা নীট আয় করে স্বাবলম্বী হবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, খামারের প্রয়োজনীয় ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর দাম স্থিতাবস্থায় ধরা হয়েছে। [বিশেষ দ্রষ্টব্য: খামারে আয়-ব্যয়ের এই হিসাব ২০১০ সালের গড় বাজার দর অনুযায়ী প্রণীত; স্থান ও কাল ভেদে এই সংখ্যাগুলো পরিবর্তনশীল।]

৯.১৭ খামারের রেকর্ড পত্র ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন

খামার স্থাপনের উদ্দেশ্য অর্জন, লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ও সম্প্রসারণ করার জন্য খামার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবের নথিপত্র সংরক্ষণ এবং পর্যালোচনা করতে হয়।

খামারের নথিপত্র

- খামার স্থাপনের জন্য স্থায়ী বিনিয়োগের হিসাব: জমি ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র, অবকাঠামো স্থাপনের জন্য মাষ্টার প্ল্যান, অবকাঠামো নির্মাণ খরচ, জেনারেটর স্থাপন খরচ, পানি, বিদ্যুৎ ও সেনিটেশন খরচ এবং খামারের সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ খরচ ও নথিপত্র।
- ইনভেন্ট্রি লিষ্ট বা তালিকা: খামারে স্থাপিত শেড ও ঘরের তালিকা, খামারের যাবতীয় সম্পদের তালিকা এবং খামারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের তালিকা।

- খামার পরিচালনা সংক্রান্ত নথিপত্র ও হিসাব: খাদ্য ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র, খাদ্য মজুদ ও ব্যবহার রেজিষ্টার, বাচ্চা/পুলেট/লেয়ার/ব্রয়লার ইত্যাদি ক্রয়/উৎপাদন/প্রতিপালন বিক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র, লিটার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় ও ব্যবহার সংক্রান্ত নথিপত্র, শেড কার্ড, কর্মচারীদের ডিউটি রোষ্টার এবং কর্মচারীদের বেতন/ভাতা সংক্রান্ত নথিপত্র।
- উৎপাদন সংক্রান্ত নথিপত্র: ডিম উৎপাদনের হিসাব, লিটার উৎপাদনের হিসাব, জমিতে অন্যান্য ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপাদনের হিসাব, জৈব সার উৎপাদনের হিসাব, ব্রয়লার উৎপাদনের হিসাব, বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব এবং মুরগির উপজাত সংক্রান্ত হিসাব।
- বাজারজাত সংক্রান্ত হিসাবপত্র: ডিম বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাব, অন্যান্য খামার সামগ্রী বিক্রয়ের হিসাব এবং ব্রয়লার উৎপাদন ও বিক্রয়ের হিসাব।
- অন্যান্য হিসাবপত্র: রোগব্যাধি সংক্রান্ত নথিপত্র, ভ্যাকসিন সংক্রান্ত নথিপত্র এবং ঔষধ সংক্রান্ত নথিপত্র।

খামারে ডিম উৎপাদন হার নির্ণয়

- হেন হাউজ ডিম উৎপাদন হার: এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের শুরুতে লেয়ার হাউজে প্রদত্ত পুলেটের ডিম উৎপাদন হার নির্ণয় করা যায়। শুরুতে লেয়ার হাউজে প্রদত্ত পুলেটের মধ্য হতে বাতিল বা মৃত মুরগির সংখ্যা সহ এই হিসাব করা হয়। যেমন-

  হেন হাউজ ডিম উৎপাদন হার = {(দৈনিক ডিম উৎপাদন ÷ ঘরে প্রদত্ত পুলেটের সংখ্যা) × ১০০)}
- হেন ডে ডিম উৎপাদন হার: এই পদ্ধতিতে মোট জীবিত মুরগির ডিম উৎপাদন হার নির্ণয় করা হয়। যেমন-

  হেন ডে ডিম উৎপাদন হার = {(হিসাবের দিন মোট ডিম উৎপাদন ÷ হিসাবের দিন মোট মুরগির সংখ্যা) × ১০০)}
- মুরগি বাছাই বা মৃতের কারণে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ: হেন ডে ডিম উৎপাদন হার থেকে হেন হাউজ ডিম উৎপাদন হার বাদ দিলে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ জানা যায়। একই সাথে ঘরে মোট প্রদত্ত পুলেটের সংখ্যা হতে হিসাবের দিন ঘরে মুরগির সংখ্যা বাদ দিলে মোট বাতিল মুরগির সংখ্যা পাওয়া যায়।
- ডজন প্রতি ডিম উৎপাদনে খাদ্য রুপান্তরের অনুপাত: এক ডজন ডিম উৎপাদন করতে কত পরিমাণ খাদ্য ব্যবহার করা হয়েছে তার হিসাব নির্ণয়ের জন্য খাদ্য রুপান্তরের অনুপাত প্রয়োজন। যেমন-

  খাদ্য রুপান্তর অনুপাত (এফসিআর) = (খাদ্য প্রদানের পরিমাণ ÷ ডিম উৎপাদনের সংখ্যা) × ১২
- এগমাস: মুরগির খাদ্য ও মুরগির ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য এগমাস হিসাব করা হয়। যেমন-

  এগমাস = (হিসাবের দিন ডিম উৎপাদনের সংখ্যা × গড় ডিমের ওজন ÷ ১০০)

ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন উৎকর্ষতা নির্ণয়

$$\text{উৎপাদন নির্দেশক (Production Index)} = \frac{\text{মোট জীবিত ব্রয়লারের সংখ্যা} \times \text{গড় ওজন}}{\text{মোট প্রতিপালন সময় (দিন)} \times \text{খাদ্য রুপান্তর ক্রমপুষ্টি}}$$

- উৎপাদন নির্দেশক হার যত বেশি হয় খামারে ব্রয়লার উৎপাদন দক্ষতা তত সুষ্ঠু হয়।
- ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন উৎকর্ষতা অনুসারে খামারের ব্যবস্থাপনার স্বরুপ নির্ণয় করা যায়।
- খাদ্য প্রদান ও খাদ্য রুপান্তরের গুরুত্ব সহ ব্রয়লার মাংস বৃদ্ধি কার্যক্রম ৩ পর্যায়ে পরিমাপ করা হয় যেমন- ক) পরিপূর্ণ বয়সে ওজন, খ) সমগ্র প্রতিপালন সময়কালে খাদ্য রুপান্তরের অনুপাত, গ) কাঙ্খিত ওজন পুর্তির বয়স, সাধারণভাবে এ দক্ষতা বৃদ্ধি হলে খাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ কমে, খাদ্য রুপান্তর হার বাড়ে এবং কাঙ্খিত ওজন পুর্তির বয়স কমে।

অধ্যায় ১০

জীববৈচিত্র্য ও আমাদের প্রাণিসম্পদ

১০.১ জলবায়ুর পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

অসীম এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের বুকে বৈচিত্র্যময় অজস্র জীব আমাদের পৃথিবীকে নান্দনিক করে তুলেছে। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে একে বাসযোগ্য করে তোলার কৃতিত্বের দাবিদার বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের এই জীবকুল। এই জীবকুলের উদ্ভিদ সদস্যই হোক আর প্রাণী সদস্যই হোক এদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা আলাদা বৈচিত্র্য। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে সর্বমোট ১৪,১৩০০০ টি জীবিত জীবের অস্থিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। এদের প্রকরণ, গঠন, বাসস্থান, চলাচল, খাদ্য গ্রহণ, আচার-আচরণ, প্রজনন, মানুষ ও আন্যান্য জীবকুলকে সেবা প্রদান ইত্যাদিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এরা আমাদের সম্পদ এবং আমাদেরকে খাদ্য, পুষ্টি ও অর্থের যোগান দেয়। আমাদের জীবনে এ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ুর সাথে এ সম্পদের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-বৃষ্টিপাত এবং নদীর প্রবাহ না থাকলে ফসল হবে না, জলাভূমিতে পানি আসবে না। আলো না থাকলে উদ্ভিদ জন্মাবে না। ফলে পশুপাখি খাদ্য পাবে না। অপরদিকে তাপমাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে বা দেশে খরা অবস্থার সৃষ্টি হলে কোন শস্য, গাছপালা, মাছ, পশুপাখির উৎপাদন ভাল হবে না এবং আমাদের খাদ্য সঙ্কট দেখা দিবে ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হবে। তাই দেখা যায়, জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন- এদুটো একই সূত্রে গাঁথা। আর তাই আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মধ্যে রয়েছে। সাধারণ অর্থে একটি নির্দিষ্ট স্থানের জীবের প্রকরণ ও বিভিন্নতাকেই জীববৈচিত্র্য বলা হয়। জীবের বৈচিত্র্যময় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই হল জীববৈচিত্র্য, যাকে ইংরেজীতে Biodiversity বলা হয়।

মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন হল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের অফুরন্ত বৈচিত্র্যময় সম্পদ। অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য-চিকিৎসা ইত্যাদি সবই জীববৈচিত্র্যের বহুবিধ ব্যবহার। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে জীববৈচিত্র্য আজ হুমকীর সম্মুখীন। ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেয়েছে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণিদের প্রজাতি। অনেক প্রজাতি হুমকীর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের জীবন জীবিকাসহ অন্যান্য অনেক প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হবে। যেমন: ক) পরিবেশের ভারসাম্য ও বাস্ততন্ত্রের (Ecosystem) অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার প্রয়োজনে; খ) জিনগত মান বা গুণাগুণ; গ) চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার প্রয়োজনে; ঘ) নতুন পণ্য প্রাপ্তিতে; ঙ) রাসায়নিক ও ভেষজ গুরুত্ব; চ) দূষণ নিয়ন্ত্রণে; ছ) পর্যটন শিল্পে; জ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং ঝ) সারা বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্যের বন্ধন অটুট রাখার প্রয়োজনে জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হবে।

জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ ছাড়া পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখা সম্ভব নয়। এই চিরন্তন সত্যটিকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনুধাবন করতে পেরেছে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ৫ই অক্টোবর ফ্রান্স সরকার এবং ইউনেস্কো সম্মিলিতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গঠন করে IUCN (Internation Union for Conservation of Nature) নামক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই সংস্থার সদস্য। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশতন্ত্রের ওপর মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কি ধরণের প্রভাব পড়ে এগুলো খতিয়ে দেখাই এই কমিশনের কাজ। IUCN ছাড়াও WWF, UNEP এবং বায়োস্পোয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। USAID, DFID ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থাও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষার শপথ (পরশ), বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (BEN), কোয়ালিশন অব এনভায়রনমেন্ট এনজিও (CEN) ইত্যাদি সংস্থাসমূহ পরিবেশ রক্ষার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে ১৯৯২ সনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্মিলিতভাবে ‘ধরিত্রী’ সম্মেলন (Earth Summit) নামক এক ঐতিহাসিক সংম্মেলনে যোগ দান করে। এটি ছিল জাতিসংঘের বৃহত্তম সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে Agenda ২১;

Earth Action Plan নামে যে দলিলটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় তা ছিল ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় উক্ত দলিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে পৃথিবীর সকল দেশের জনসাধারণ মনে করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার উদ্যোকে ২০০০ সনে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। এ পরিবেশ সম্মেলনে দেশী, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের প্রায় ১৫০টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এ সম্মেলনে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও সর্ব সাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। সারা বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়কে সামনে নিয়ে ২০১০ সনে বেলজিয়ামে আন্তর্জাতিক Climate সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী অন্যান্য দেশ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে জোরালো দাবি উত্থাপন করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেন। সম্মেলনে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কার্বন সমন্বয়কারী দেশগুলোর জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করার ঘোষণা দেয়া হয়।

১০.১.১ জীবপ্রজাতির সমৃদ্ধি

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে ১০০ মিলিয়ন প্রজাতির জীব রয়েছে। এদের মধ্যে সারা পৃথিবী থেকে মাত্র ১.৪১ মিলিয়ন প্রজাতির উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন এবং এদের নামকরণ করেছেন। বাংলাদেশে রয়েছে ৬২৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ২৪ প্রজাতির মিঠা পানির চিংড়ি এবং ৩৬ প্রজাতির সামুদ্রিক চিংড়ি। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের তালিকা আজও প্রণীত হয়নি। উভচর প্রাণী রয়েছে ২২ প্রজাতির, সরীসৃপ ১০৯ প্রজাতির এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী ১১০ প্রজাতির। এছাড়াও ১২ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ ও ৫ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ রয়েছে। প্রায় ৭০টি গোত্রের ৬০০-এর বেশি রয়েছে পাখি। তবে এদের মধ্যে এ দেশে ডিম পাড়ে এমন প্রজাতির সংখ্যা হল প্রায় ৩৮৮ টি এবং বাকী ২৪০টি বিভিন্ন দেশ হতে আগত অতিথি পাখি। ৪২ প্রজাতির স্থন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির ব্যাঙ ও ৪ প্রজাতির বাঘ রয়েছে। অন্যদিকে এদেশের সমুদ্র সীমায় রয়েছে ৩৩টি গোত্রের নীল তিমি। উদ্ভিদ জগতের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫ হাজার প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শহরায়ন, বাসস্থান তৈরি, বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, জোরপূর্বক বনভূমি দখল, অগ্নিসংযোগ, খনিজ পদার্থ উত্তোলন, কলকারখানা থেকে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ, মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে উদ্ভিদ জগতে ঘটেছে মারাত্মক বিপর্যয়। কত প্রজাতির উদ্ভিদ যে হারিয়ে গেছে তার হিসাব আজও করা যায়নি।

১০.১.২ জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য

জলবায়ু বলতে ভূপৃষ্টের যে কোন স্থান, অঞ্চল, দেশ বা মহাদেশের দীর্ঘসময়ের (২৫-৩০ বছর) তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির গড় মান বা মাত্রাকে বুঝায়। জলবায়ুর প্রধান উপাদান হচ্ছে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ, বায়ুচাপ, মেঘ, বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীতে পানি প্রবাহ, তুষার বা বরফপাত ইত্যাদি। জলবায়ুর এ সকল উপাদানগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর জীব ও জীববৈচিত্র্যের জীবন-মৃত্যু নির্ভরশীল। তাই জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। খুব বেশি গরম স্থান বা মরুভূমিতে যেমন ফসল জন্মে না এবং জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না, আবার তেমনি খুব বেশি শীতপ্রধান দেশে বছরের ৪-৬ মাস বরফে ঢাকা থাকে। ফলে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। এ সকল দেশে জীবন ধারণ খুবই কষ্টসাধ্য। পৃথিবীর জন্মলগ্নের সময় ভূপৃষ্ঠ খুব বেশি গরম ছিল। তখন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। আবার এক সময় খুব বেশি শীত ছিল, তখন শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর জলবায়ু পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে সিডর, নার্গিস, আইলার মত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বেড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনাঞ্চল, পশুপাখি সহ সকল প্রকার সম্পদ। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ঘরবাড়ি, জমি ও জনপদ। তাই জীববৈচিত্র্যেকে টিকিয়ে রাখতে হলে জলবায়ুর মোকাবেলা করেই তা করতে হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে শিল্প কারাখানা ও যন্ত্রের ব্যবহৃত সকল প্রকার জ্বালানী থেকে নির্গত উত্তাপ, ধোঁয়া ও বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের প্রভাবে বিশ্ব পরিমন্ডলের তাপমাত্রা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে বিশ্ব পরিমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming) বলে। এ কারণে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল এবং বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বলে বিবেচিত হয়। বিশ্ব পরিমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর এবং উচ্চ পর্বতমালার জমাট বাধাঁ বরফ বা আইস বার্গ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দিন দিন বাড়ছে এবং বহু নীচু দ্বীপাঞ্চল ও উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। যার ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন ও জীবিকা ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশ গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এ দেশের আবহাওয়া মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হওয়ায় এখানে ঋতুবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। দেশের ছয়টি ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম, শীত ও বর্ষা সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এই ঋতু বৈচিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই দেশের কৃষি তথা পশুপাখির উৎপাদন ব্যবস্থা বিন্যস্ত। তবে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাবে বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা ও জলাবদ্ধতা; শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক খরা, টর্নেডো, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব ও মাত্রা বৃদ্ধি; শীত মৌসুমে হঠাৎ শৈত্য প্রবাহ এবং উষ্ণ প্রবাহ, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, ভূমিক্ষয় এবং নদীগর্ভ ভরাট হয়ে শুষ্ক মৌসুমে নদী প্রবাহ কমে গিয়ে উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি এ দেশের কৃষির (ধান, পাট, ইক্ষু, চা, বিভিন্ন ধরণের সবজি, রবিশস্য, গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি) সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বিপর্যস্ত করে তুলছে। এর ফলে আমাদের কৃষি তথা প্রাণিসম্পদ কিছু ঝুঁকির সম্মুখীন। যেমন: অতিবৃষ্টি, বন্যা ও জলাবদ্ধতা; নদী ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয়, খরা; লোনা পানির অনুপ্রবেশ ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি; উষ্ণতা বৃদ্ধি, উষ্ণ ও শৈত্য প্রবাহ এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেশ কিছু বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যেগুলো বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন: বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া; জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়া; খরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া; পানির প্রবাহ কমে যাওয়া; লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া; ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া; কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া; মৎস্য ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যাওয়া; প্রাণিসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; বনাঞ্চল নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাওয়া; জীববৈচিত্র্যের সদস্য ধ্বংস বা বিলুপ্ত হওয়া; রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া; ভৌত অবকাঠামো ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; নদীভাঙন বৃদ্ধি পাওয়া; জীবন-জীবিকা (লাইভলিহুড) ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি।

১০.১.৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতি

জীববৈচিত্র্যকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) প্রকৃতিক সংরক্ষণ: সুন্দরবনের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী সুন্দরী উদ্ভিদ ভেজা কর্দমাক্ত এবং লবণাক্ত পরিবেশেই জন্মে। তাই এ সুন্দরী উদ্ভিদকে সুন্দরবনের মূল ও প্রকৃত বাসস্থান সুন্দরবন, অর্থাৎ সুন্দরবনের এই পরিবেশতন্ত্রের সংরক্ষণ করাই হল প্রকৃতির সংরক্ষণ।

(২) কৃত্রিম পদ্ধতিতে: কৃত্রিম পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে জীবকুলকে সংরক্ষণ করা যায়। যথা-

- বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন: সুন্দরবনের সুন্দরী উদ্ভিদকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে যদি সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বলা যাবে।
- সীড ব্যাংক স্থাপন (Seed bank): Seed bank স্থাপনের মাধ্যমে শতাব্দির পর শতাব্দি অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসহ সংরক্ষণ করা যায়। প্রাণীদের ক্ষেত্রে Cryo-preservation এর মাধ্যমে পশুপাখির ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু সংরক্ষণ করা যায়।
- ফিল্ড জিন ব্যাংক স্থাপন: কোন প্রজাতির স্বাভাবিক এলাকা ছাড়া অন্য কোন স্থানে এসব প্রজাতির জীবন্ত নমুনা সংরক্ষণ করাই হলো ফিল্ড জিন ব্যাংক। শস্য প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। পশুপাখির ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার হচ্ছে।

- ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ পদ্ধতি: এ ক্ষেত্রে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে DNA পদ্ধতিতে কিছু প্রজাতির টিস্যু culture গবেষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে এগুলো প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম ভেড়া 'ডলি' জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য পশুপাখিতেও গবেষণা চলছে। তবে এ পদ্ধতিতে সময় এবং ব্যয় বেশি হয় এবং অধিক সর্তকতার প্রয়োজন হয়।
- পরাগরেণু সংরক্ষণ পদ্ধতি: বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগরেণুকে নিম্নতাপমাত্রায় অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং পরাগরেণু সংরক্ষণের মাধ্যমেই উদ্ভিদের শুধু পুরুষ দিকটি সংরক্ষণ করা হয়।

১০.১.৪ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের করণীয়

পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখার স্বার্থে এবং মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থে জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মানুষ প্রতিনিয়ত বনাঞ্চল কেটে, জলাশয় ভরাট করে বাড়ীঘর, মিল, কলকারখানা, শহর বন্দর নির্মাণ করছে যথেচ্ছভাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে এই অবস্থা দিন দিন আরো খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবী হতে চলেছে ভারসাম্যহীন। কিন্তু মানুষকে বাঁচতে হলে প্রকৃতির এই জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বন্ধ করতে হবে শিল্প-কল-কারখানা ও অন্যান্য সামগ্রীর মাধ্যমে উৎপাদিত ক্ষতিকর গ্যাস CO, CFC (ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন), CH_4 ইত্যাদির নিঃসরণ। এক কথায় বন্ধ করতে হবে গ্রীণ হাউজের ওপর এদের ক্ষতিকর প্রভাব। আর এ জন্যই প্রয়োজন জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ। বর্তমানে পৃথিবীর সকল পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কারণ ইতোমধ্যেই গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House Effect) দেখা দিতে শুরু করেছে। পর্বতের তুষার ও হিমবাহ বিগলিত হয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যেতে শুরু করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রকূলীয় অঞ্চলসহ সমুদ্র উপকূলীয় অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। দেশের চট্টগ্রাম জেলার বেশ কিছু স্থান যেমন কুতুবদিয়া, হাতিয়া, মহেশখালী ইত্যাদি দ্বীপের অনেক স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করতে হবে। জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে। যথা-

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের গুরুত্বকে ব্যাপক প্রচারের জন্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। যেমন- সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, পথনাট্য প্রদর্শনী, বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এ সম্পর্কে প্রচার এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- বর্তমানে প্রচলিত উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে বর্তমান আইনকে যুগপোযোগীকরণ। প্রয়োজনে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন এবং এই কমিটির মাধ্যমে সংরক্ষণকল্পে বিভিন্ন পরিবেশতন্ত্রের তালিকা প্রণয়ন এবং মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস তাত্ত্বিক তালিকা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন বিপন্ন প্রায় বা বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অঞ্চলভেদে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। বিভিন্ন পরিবেশতন্ত্রের ভৌত ও রাসায়নিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে এমন স্থানে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান উদ্ভিদ ও প্রাণির সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। এক্ষেত্রে কাঠ উৎপাদনকারী, ফল প্রদানকারী এবং ওষুধি উদ্ভিদের বিস্তারে এবং এদের সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- যে সকল উদ্ভিদ-প্রাণী আপাতদৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে তাদের ধ্বংস করা যাবে না বরং এদেরকে সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত বন, জাতীয় উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি আরও বেশি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্তিত গাছের সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যক গাছ লাগাতে হবে।

- সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জনসাধারণকে উদ্ধুদ্ধকরণ করতে হবে এবং এর সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি, বেসরকারি ও আধাসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে এক সাথে কাজ করতে হবে।
- বন্যপশু ও মাছের জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি সমৃদ্ধ দেশ। উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের কারণেই দেশের এই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। আবার এই ব-দ্বীপীয় দেশটির অবস্থানগত কারণেই প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু এই প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে দেশের জীববৈচিত্র্য, জান-মাল ও সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যক্তিখাত, এনজিওসহ, সরকারি/বে-সরকারি সংস্থা সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমিতে একদিকে যেমন প্রচলিত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা জরুরি তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক ঘটনা ও তার ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ, ঝুঁকি এবং তা মোকাবেলায় সুশীল সমাজ স্থানীয় জনগণকে প্রেরণা, তথ্য সহায়তা, যোগাযোগ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

১০.২ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

১০.২.১ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব

বন পশুপাখির নিরাপদ আবাসস্থল। বনে বিচিত্র রকমের পশুপাখি বসবাস করে। এসব বন্যপ্রাণী বনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক সৌন্দয্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বনাঞ্চলে ক্ষুদ্র থেকে বিশালকার প্রাণী রয়েছে। এসব প্রাণী পরিবেশকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বনাঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল একে অপরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। যেমন- সুন্দরবন না থাকলে বাঘ ও হরিণের অস্তিত্ব থাকবে না। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেলে হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বনের প্রয়োজনীয় গাছপালার যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তেমনিভাবে আবার হরিণের সংখ্যা কমে গেলে অপ্রয়োজনীয় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বাঘের খাদ্য সমস্যাও দেখা দিবে। সুতরাং সুন্দরবনে বাঘ, হরিণ ও গাছপালার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ফলে বনের কীটপতঙ্গ শস্যক্ষেতে আসছে এবং এসব কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে। কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ছাড়াও অনেক উপকারী প্রাণী ধ্বংস করছে। তাছাড়া বন উজাড়ের ফলে বনে বসবাসকারী পশুপাখি লোকালয়ে চলে এসে মানুষের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। মানুষ তার মানসিক ক্লান্তি দূর করার জন্য ছুলে চলে যায় লোকালয় থেকে বনাঞ্চলে। বনাঞ্চলের নির্মল বায়ু ছাড়াও বনের বিচিত্র রকমের পাখি ও জীবজন্তু মানুষকে নানাভাবে আনন্দ দেয় এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষ ভুলে যায় তার দুঃখ-কষ্ট। তাছাড়া বন্যপ্রাণীর চামড়া ও হাড় দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদি তৈরি হয় যা দিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। অতএব, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

১০.২.২ বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। তবুও একশ্রেণীর লোক নেশার ছলে বা লোভে বনের অমূল্য সম্পদ ও অপূর্ব সৌন্দর্য্য অবাধে নিধন করছে। তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে আইন প্রণয়ন করেন যা 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২' নামে অভিহিত। এ আইন বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে বিভিন্নভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া এ আইন বলে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন এলাকাকে বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থান হিসেবে ঘোষণা

করতে পারবেন। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোন উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোন প্রাণী শিকার, বিদেশী প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লজ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। এ আইন প্রণয়নের পরও অবাধে বন্যপ্রাণী নিধন বন্ধ হয়নি। তাই এই আইন আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য দেশের সচেতন মহল থেকে জোর দাবি ওঠেছে। ফলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি আরও কঠোরতর করার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

১০.৩ হাতিঃ এক বিশাল প্রাণী

জামালপুরের সরিষাবাড়িতে এক হাতি নিয়ে কম 'হইচই' হল না! গত ২৮ জুন ২০১৬ এর ঘটনা। বুনো হাতিটি ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বন্যার পানিতে ব্রহ্মপুত্র নদ বেয়ে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে বাংলাদেশে। এরপর শুরু হয় উদ্ধার অভিযান! অবশেষে হাটিটি মৃত্যুবরণ করে। এখানে হাতি নিয়ে জানা-অজানা মজার কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল (সূত্র: হ্যাপি এলিফেন্ট কনটেস্ট ডটকম):

- কেবল বিশাল শরীরই নয়, বিশাল হৃদয়েরও অধিকারী হাতি। এদের হৃৎপিন্ডের ওজন ২৭ থেকে ৪৬ পাউন্ড হতে পারে।
- এ পর্যন্ত রেকর্ড বইয়ে নাম লেখানো হাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওজন ছিল ২৪ হাজার পাউন্ড! আফ্রিকান প্রজাতির ওই হাতিটির উচ্চতা ছিল ১৩ ফুট!
- হাতির গড় আয়ু ৭০ বছরের বেশি। হাতিই একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী, যে লাফাতে পারে না।
- স্থলচর প্রাণিগুলোর মধ্যে হাতির মস্তিষ্কই আকারে সবচেয়ে বড়। যা মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ৩/৪ গুণ বড়। তবে মস্তিষ্ক এত বড় হলেও, হাতির শরীরের তুলনায় তা বেশ ছোট।
- মানুষের নাড়িস্পন্দন মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। মিনিটে এক হাজার নাড়িস্পন্দন ছোট্ট ক্যানারি পাখির! আর হাতির মাত্র ২৭!
- হাতির চামড়ার পুরুত্ব এক ইঞ্চি। দৃষ্টিশক্তি ভাল না হলেও হাতির ঘ্রাণশক্তি প্রখর।
- মেয়ে হাতি ৯.১৬ বছর বয়সে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। সারা জীবনে চারটির বেশি বাচ্চা দেওয়ার ঘটনা এদের ক্ষেত্রে বিরল। একটা সদ্য ভূমিষ্ঠ হাতির বাচ্চার ওজন হয় প্রায় ২৩০ পাউন্ড!
- পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে হাতির গর্ভাবস্থা সবচেয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয়। গর্ভধারণের ২২ মাস পর বাচ্চা প্রসব করে একটি মা হাতি।
- বিড়ালের সঙ্গে হাতির একটা মিল আছে। বিড়াল 'ঘড়ড়ড় ঘড়ড়ড়' জাতীয় শব্দ করে একে-অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। হাতিও ঠিক তেমনই করে 'কথা বলে'!
- হাতির বড় দাঁত দুটি আসলে ছেদক দন্ত। এই দুটি দাঁত হাতি ব্যবহার করে প্রতিরক্ষার জন্য, মাটির খুঁড়ে পানি বের করার জন্য কিংবা কিছু তোলার কাজে। হাতির পেষণ দন্ত (মাঢ়ির দাঁত) চারটি। একেকটি পেষক দন্তের ওজন পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে, যা কিনা একটা ইটের ওজনের সমান!
- হাতির শুঁড়ে ৪০ হাজারেরও বেশি মাংসপেশি থাকে! হাতি প্রায়ই জোরে জোরে শুঁড় নাড়ায়, যাতে করে আরও ভালভাবে গন্ধ শুঁকতে পারে। শুঁড় দিয়ে কোন কিছুর আকার, আকৃতি এবং তাপমাত্রা সম্পর্কে ধারণাও নেয় এরা! এ ছাড়া খাবার তুলে নেওয়া, পানি শুষে নিয়ে সেটা মুখে ঢেলে দেওয়ার মতো কাজ তো আছেই।
- হাতি কাঁদে, খেলাধুলা করে, এদের স্মৃতিশক্তিও বেশ ভাল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল হাতি হাসতেও জানে।
- হাতি সাঁতারে পটু। সাঁতার কাটার সময় এরা শুঁড়কে স্নোরকেল হিসেবে ব্যবহার করে।
- নিজের ওজন তো কম নয়! বিশাল এই বপু বহন করার জন্য হাতির পায়ের বিশেষ নরম প্যাড বিশেষ কাজে দেয়। এর ফলে হাতি পিছলে পড়ে না, কোন শব্দও হয় না হাঁটার সময়।

- পালের একটা হাতি দূরে থাকলে অন্য হাতিদের পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে এরা শুঁড়টা মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রেখে বোঝার চেষ্টা করে, সঙ্গী-সাথিরা কোথায়।
- দারুণ সংবেদনশীল ও যত্নবান প্রাণী এরা। একটা বাচ্চা হাতি যদি কোন বিষয়ে অভিযোগ করে, তাহলে পালের সব হাতি এককাট্টা হয়ে সমস্যার পেছনে লেগে পড়ে। বাচ্চা হাতিটাকে সবাই ছুঁয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করে বলে আমরা আছি, ভয় নেই তোমার!
- দূরে কোথায় গিয়ে আবার ফিরে এলে দলের বাকিরা একটা হাতিকে নিজেদের নিয়মে 'সংবর্ধনাও' দেয়!
- কুলার মতো কান হাতির। পাতলাও বটে। শরীরের রক্ত নালিকার জটিল নেটওয়ার্ক এই কান দুটি হাতির শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যা শুনি না, হাতি তা দিব্যি শুনতে পায়।
- হাতিও পরস্পরকে 'জড়িয়ে' ধরে। প্রক্রিয়াটা অবশ্য একটু অন্যরকম। এ ক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করে শুঁড়। পরস্পরকে শুঁড় জড়িয়ে ধরে ভালবাসা বা স্নেহের প্রকাশ করে এরা।
- চলতি পথে স্বজাতির হাড়গোড় কিংবা দাঁত দেখলে হাতি শ্রদ্ধা জানায়। শুঁড় এবং পা দিয়ে ছুঁয়ে দেয় মৃত স্বজাতির স্মৃতিচিহ্নে। কোন হাতি প্রিয় সঙ্গীর মৃত্যু ঘটার স্থানে গেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

১০.৪ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কুমীর খামারের গুরুত্ব

কুমীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের চতুষ্পদ জলজপ্রাণী। কুমীর ক্রোকোডাইলিয়া বর্গের অধীনে ক্রোকোডাইলিডি পরিবারের অধীনে ক্রোকোডাইলাসগণভুক্ত প্রাণী। এরা মূলত: চারটি প্রজাতিতে বিভক্ত। প্রজাতিগুলো হচ্ছে- (১) ক্রোকোডাইল (২) এ্যালিগেটর (৩) কেইমেনস (দক্ষিণ আমেরিকার কুমীর সদৃশ্য জলজ প্রাণী) এবং (৪) ঘড়িয়াল। ক্রোকোডাইল এবং এ্যালিগেটরের চেহারা প্রায় একই রকম, তবে ক্রোকোডাইল এর মুখের আকৃতি সরু লম্বাটে রকমের, পক্ষান্তরে এ্যালিগেটরের মুখের আকৃতি অনেকটা ইংরেজী ইউ বর্ণের মতো এবং কুমীরের মুখের আকৃতি ইংরেজী 'ভি' বর্ণের মতো। অপরদিকে ঘড়িয়ালের মুখ সরু লম্বা আকৃতির এবং ঠোঁটের মাথা গোলাকৃতি বিশিষ্ট। কুমীরকে আরো দু'ভাবে বিভক্ত করা হয় (১) লবণাক্ত পানির কুমীর (২) মিঠা পানির কুমীর। আমাদের দেশে বর্তমানে ঘড়িয়াল বিলুপ্তির পথে, তবে মিঠা ও লবণাক্ত প্রজাতির কুমীর এখনও দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে দেখা যায়। এ সমস্ত কুমীরের গড় ওজন প্রায় ১০০০ থেকে ১৫০০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কুমীরের ব্যবহার শুরু হয় মূলত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শুরুর দিকে। ফলে কুমীর শিকার শুরু হয় এদের মাংস ও চামড়ার প্রয়োজনে। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াও কুমীরের চামড়ার জুতা, ছোট ছোট কেস, বেল্ট, ঘরের বিভিন্ন সাজসজ্জা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যগত ওষুধ হিসেবেও কুমীরের দেহের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় উত্তর আমেরিকায়। ১৮৬১-১৮৬৫ সালে আমেরিকার জন যুদ্ধের পর ক্রমে ক্রমে কুমীরের মাংস, চামড়া ও হাড়ের কদর বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন অষ্ট্রেলিয়া, চীন, আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে বন্য কুমীর প্রজাতির ধ্বংসের ফলে ১৯৭০ এর দশকের শুরুর দিকে কুমীর সংরক্ষণের নিমিত্তে Convension on International Trade in Endangered Spoecies (CITES) নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থা ১৯৭৫ সালে বন্য কুমীরের ধ্বংস কমানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক আইন বলবদ করেন। ফলে ৭০ দশকের পর থেকে খামারে কুমীর প্রতিপালনের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু এরও বহু পূর্বে ১৮৬৩ সালে মূলত পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় কুমীর খামার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে (জাপান, চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালোয়েশিয়া ইত্যাদি) কুমীর খামারের প্রচলন হয়। চীন ও রাশিয়ায় কুমীরের মাংসের এবং চামড়ার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এ জলজ প্রাণী কেন্দ্রিক বড় বাণিজ্যিক বাজার এতদঞ্চলে বিকাশ লাভ করে।

৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বনবিভাগের ব্যবস্থাপনায় লবণাক্ত পানির কুমীরের প্রজনন অভয়াশ্রম বা প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র সুন্দরবনের করমজল নামক স্থানে গড়ে তোলা হয়। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে বেসরকারি কুমীর খামার ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার উথুরা ইউনিয়নের হাতিবেড়

গ্রামে। ওই সময় সুদূর মালোয়েশিয়া থেকে ৭৫টি কুমীর এনে জনাব মেজবাউল হক একক বিনিয়োগ ও প্রচেষ্টায় এ খামার শুরু করেন। বাংলাদেশের ভালুকায় রেপটাইলস ফার্ম ২০০৪ সালে শুরু হয়ে ১০ বছরের ব্যবধানে কুমীরের চামড়া রপ্তানির জন্য একেবারে প্রস্তুত। ইতোমধ্যে উক্ত খামারে নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় কুমরীরের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করাও শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্বে কুমীরের পাকা চামড়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক দর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার ২০ থেকে ২৫ ডলার। কুমীরের চামড়া ও মাংসের প্রচুর চাহিদা বর্তমানে চীন, রাশিয়া এবং হংকং-এ তৈরি হয়েছে। উল্লিখিত দেশগুলো বিশ্বে প্রথম সারির কুমীরের চামড়া ও মাংস আমদানিকারক দেশ। বর্তমানে প্রতি কেজি কুমীরের মাংস প্রায় ১৫-২০ ডলারে বিক্রি হয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে কুমীর খামার গড়ে তোলা যে একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত এতে কোন সন্ধেহ নেই। এর পাশাপাশি যদি সরকার সহযোগীতার হাত প্রসারিত করে, তবে ভবিষ্যতে অনেক উদ্যেক্তা এক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন তা নিশ্চিত করে বলা যায়। সুতরাং সরকারি পৃষ্ঠোপোষকতা এ ক্ষেত্রে বাড়ালে আগামী দিনে হয়তো বাংলাদেশ কুমীরের চামড়া, মাংস এবং জীবন্ত কুমীর রপ্তনীকারক দেশে পরিণত হতে পারে।

১০.৫ বাঘঃ সুন্দরবনের বিপন্ন পাহারাদার

প্রকৃতির অপরূপ রঙ আর শিল্পীর জলতুলির আঁচড়ে আঁকার মতো সুন্দরবন বৈচিত্র্যময় এক নিদর্শন। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী এই বনে রয়েছে ৪৪০টি বাঘ, দেড় লাখ হরিণ, ৫০ হাজার বানর, দেড়শ' থেকে ২শ' কুমিরসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদাচর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ছোট ছোট দ্বীপ। সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা বঙ্গোপসাগর সুন্দরবনের সৌন্দর্যকে আরেক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। যার কারণে ১৯৯৭ সালে ডিসেম্বর মাসে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কাউন্সিল এই বনকে বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে। আর ১৯৯২ সালের ২১ মে সুন্দরবন রামসার এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ৬০০০ বর্গ কিলোমিটারের সুন্দরবন আমাদের অর্থনীতিতে রাখছে অনেক বড় ভূমিকা। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে সুন্দরবন আজ বিপন্ন। হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির পাখি, উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণী। এমনকি বাংলাদেশের অহঙ্কার সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা। বন বিভাগের কাছে ৪৪০টি বাঘের হিসাব থাকলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিরুল এইচ খান ২০০৬ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে শুমারি করে ২০০ টির মতো বাঘ পান। বাঘের সংখ্যা কমার পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। বন উজাড় হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতায় সমুদ্রে পানির স্তর বেড়ে আবাসস্থল কমে যাচ্ছে। বাঘের খাবার কমে যাচ্ছে। সুন্দরবনের আশপাশের বন উজাড় করে ক্রমশ বেড়ে উঠছে মানুষের বসতি। আর বাঘ তার বসতি ছেড়ে বেরিয়ে আসছে লোকালয়ে। আতঙ্কেই হোক আর অর্থেও লোভেই হোক মানুষের শিকারে পরিণত হচ্ছে বাঘ। মানুষও যে বাঘের শিকারে পরিণত হচ্ছে না তা নয়। প্রতি বছর বাঘের কবলে পড়ে দেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, পঞ্চগড়, বাগেরহাট জেলাতে প্রায় ২০ জন মানুষের জীবন যায়। যুক্তরাষ্ট্রের বাঘ বিশারদ ম্যাক হন্টারের বক্তব্য থেকে জানা যায়- সুন্দরবনের বাঘ বন ছেড়ে লোকালয়ে আসছে ৫টি কারণে-

১. সুন্দরবনে সাম্প্রতিক সময়ে পানিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
২. ক্ষুধা অনুযায়ী খাবার মিলছে না,
৩. খাবার শিকারে বয়স্ক বাঘের অক্ষমতা,
৪. নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং
৫. শিকারীদের অত্যাচার।

অধ্যাপক ড. মনিরুল এইচ খানের গবেষণা তথ্যমতে, প্রতি বছর চোরা শিকারীদের হাতে গড়ে ৩ থেকে ৫টি বাঘ মারা পড়ে। তারা চামড়া আর হাড়ের জন্য বাঘ শিকার করে। এছাড়া বছরের প্রতি শীত মৌসুমে গোলপাতা, কাঠ আর মাছ ধরতে প্রায় ৫ লাখ মানুষের সমাগমে দিন দিন উজাড় হচ্ছে সুন্দরবন। বনে জেলেরা বছরের অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এবং বনজীবীরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থানের কারণে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না এই বন সুন্দরী। ব্যাপকহারে গোলপাতা আর গাছ উজাড়ের ফলে বনে বাঘের আশ্রয় নেবার অভাব পড়ছে। যে কারণে বাঘের বিচরণ এখন আর তার নিজস্ব অঞ্চলের মধ্যে থাকছে না। দিন দিন আশ্রয়ের অভাবের ফলে বন থেকে বাঘ চলে আসছে

লোকালয়ে। ঘটছে প্রাণহানী। মানুষ প্রকৃতিকে উজাড় করে ভোগ করার কারণে সুন্দরবন আর এখন সুন্দর নেই। গেল কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে গেল সিডর, আইলা, নার্গিস, মহাসেন। সুন্দরবনকে তছনছ করে দিয়েছে এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যে কারণে খাদ্যাভাবে একদিকে কমেছে বাঘের খাদ্য হরিণ অন্যদিকে বাঘের সংখ্যাও। জীবনচক্র পরিক্রমায় প্রাণী বেড়ে ওঠে অন্য প্রাণীকে হত্যা করে। সুন্দরবনে সেই জীবনচক্র আজ অনেকটাই কাজে আসছে না। প্রত্যেকটি বাঘেরই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল বনে তাদের আহার, বসবাস এবং শাসন সীমারেখা তৈরি থাকা। কেউ যদি সেই সীমা পেরিয়ে বা অন্যের সীমানায় ঢুকে পড়ে তাহলে বেধে যায় তীব্র লড়াই। ওই লড়াইয়ে বাঘ হেরে গিয়ে অনেক সময় বন ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে শুধু নিজেকে বাঁচানোর আশায়। এতসবের পরেও যে কারণটা বন্যপ্রাণীদের জন্য অসহনীয় তা হল সুন্দরবনের জলে লবণাক্ততার বিষ। বনে আসা মিষ্টি জলের চ্যানেল হিসেবে খ্যাত নদীগুলোতে পলি জমার কারণে নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় প্রয়োজনীয় মিষ্টি জল আসছে না বনে। যে কারণে প্রাণীকুল জীবন বাঁচাতে নতুন জায়গা খুঁজছে। বৈশ্বয়িক জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বাঘসহ অন্য প্রাণিকুলের বাসস্থান ও আচরণের ওপর প্রভাব পড়ছে। বাঘ না থাকলে সুন্দরবনের অস্তিত্ব কতটুকু থাকতো সেটা ভেবে দেখার বিষয়। আজ শুধু সুন্দবনের বাঘই নয়, সুন্দরবনই বিপন্ন। বিপন্ন এই বনের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। সুন্দরবনকে সুন্দর করতে সবার আগে দরকার সচেতনতা। কার্যকর সরকারি উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের জরিপে বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের মানুষের অজানা নেই যে সুন্দরবন দুর্যোগে মানুষ বাঁচাতে বুক পেতে দিয়েছে। আজ সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে। সুন্দরবন বাঁচলে বাঁচবে বাংলার অহঙ্কার সুন্দরবনের পাহারাদার রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

১০.৬ হরিণঃ অতি সুন্দর প্রাণী

প্রকৃতির এক সুন্দরতম বন্যপ্রাণী এর নাম হরিণ। ইহা ‘সার্ভিডি’ পরিবারভুক্ত একটি বন্যপ্রাণী। হরিণের মাংস বিভিন্ন দেশে বেশ সমাদৃত। বাংলাদেশের সুন্দরবনে চিত্রা ও মায়া হরিণ ছাড়াও পৃথিবীতে বহু প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এর রঙ-চঙা শরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট আকর্ষণীয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ যদিও হরিণ সচক্ষে দেখার সুযোগ পান না তবুও ছবির হরিণ প্রায় সকলেরই চেনা। যে শিশুটি সদ্য কথা বলতে শিখেছে সেও কিন্তু হরিণ নামের পশুটিকে শব্দে শব্দে চিনে নেয়। আর অক্ষর জ্ঞানের প্রারম্ভেই ‘হ’-তে হরিণ শিখে নেয় এবং রঙিন ছবির পশুটিকে তার আরো কাছে এনে দেয়। হরিণ আজ আর দেশের সকল বনে-জঙ্গলে নেই। এদের আবাসমূল এখন চিড়িয়াখানায় আর সুন্দরবনে। অতি কম সংখ্যায় হলেও, তবু কিন্তু কিছু কিছু সৌখিন ব্যক্তি বাড়ির আঙ্গিনায় হরিণ পালন করে থাকেন।

প্রাচীনকালে মানুষ তাদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য বন্য পশু শিকার করত। সে সময় বন্য পশু শিকার নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে ছিল, শখ বা বিনোদনের জন্য নয়। এক সাথে কয়েকটি প্রাণী ধরতে পারলে, প্রয়োজনমত জবাই করে বাকীগুলো ভবিষ্যতের জন্য গৃহে আবদ্ধ করে রাখতো। সেই ধ্যান-ধারনা থেকেই সম্ভবতঃ বন্যপ্রাণী নিজ গৃহে লালন পালনের সূত্রপাত ঘটে। গৃহে আবদ্ধ বন্য প্রাণিদের মধ্যে কিছু প্রজাতি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং মানুষের কাছে থেকেই বংশবিস্তার করতে থাকে। এ প্রসংঙ্গে পবিত্র আল কুরআনের সুরা ইয়াছিনে আলাহ পাক এরশাদ করেছেন। ‘আমি চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি; কতক তাদের খাদ্য আর কতক তাদের বাহন, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না’ গরু মহিষ ভেড়া ছাগল মাংসের জন্য আর ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী বোঝা বহনের কাজে লাগানোর জন্য জঙ্গল থেকে ধরে এনে গৃহপালিত করা হয়েছে। সঙ্গত কারনেই হরিণ পালন অবাস্তব একটা ধারনা নয়।

১০.৬.১ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী হরিণ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন গাছ-পালার প্রয়োজন, তেমনি গহীন অরণ্য আর বনাঞ্চলের নীরব-শান্ত পরিবেশও বনের জীব-জন্তুদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। অরণ্যের শোভা হচ্ছে নানা জাতীয় বৃক্ষ আর উদ্ভিদ। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় বৈচিত্র্যময় বনে নানা ধরণের পশুপাখির সমারোহ ঘটেছে। কিন্তু দূরদর্শীতার অভাব আর খামখেয়ালী চিন্তা-ভাবনার ফলে বনরাজিকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন করে চলেছে সেরা জীব মানুষরাই। এক সময় এ দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও সিলেটে ছিল মায়াভরা

ডাগর চোখের মনোমোহিন দৃষ্টির হরিণদলের ক্ষিপ্ত পদচারণা। আগে এদেশে বেশ কয়েক প্রজাতির হরিণ ছিল। তম্মধ্যে চিত্রা, সাম্বার, পারা, বারশিংগা ও মায়া হরিণ উল্লেখযোগ্য। অথচ বর্তমানে কেবল চিত্রা হরিণই চোখে পড়ে, তাও কেবল সুন্দরবন অথবা চিড়িয়াখানাগুলোতে। জানা যায় সিলেটের বনাঞ্চল ও চা বাগানে আগে মায়া হরিণ বিচরণ করতো। এরা নম্র স্বভাবের আর ভয় পেলেই কুকুরের মত 'ঘেউ ঘেউ' করতো। অথচ এখন আর বনের মাঝে বা চা বাগানের সঙ্কীর্ন আঁকা-বাঁকা পথে এদের দেখা যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেকেই সৌখিনতার বসে মায়া হরিণ পালন করতেন। হয়তো এমন হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, বর্তমানের চিত্রা হরিণও অন্যান্য প্রজাতির হরিণের মতো এ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু চিড়িয়াখানাগুলোতে চিত্রা হরিণ অত্যন্ত সহজে পোষা সম্ভব হচ্ছে সেহেতু বসতভিটায়ও হরিণ পোষা বাস্তব দিক থেকে সম্ভব।

১০.৬.২ অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় হরিণ পালন

হরিণ পালন বেশ লাভজনক। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং হাঁস-মুরগির মাংসের তুলনায় হরিণের মাংস অবশ্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল। সম্ভবতঃ সেটা অনেকটা দুস্প্র্যাপ্যতার কারণেই হবে। সে সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বসতভিটায় হরিণ পালনের মাধ্যমে আয়-রোজগার করার ধ্যান-ধারনা তাই হয়েতো অবাস্তব কিছু হবে না। হরিণ পালন আমাদের সমাজে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে বাড়ীতে হরিণ পালিত হয় সে বাড়ির মালিকের পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। এই পরিচিতিতে তিনি অবশ্যই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হন মনে মনে। সেই সাথে আগন্তুক বা জনসাধারনও বিনোদনের খোরাক পান। আর বিশেষ করে ছোট ছেলে মেয়েদেরতো সীমাহীন আনন্দের উৎস হয় এই হরিণ-হরিণী। পশমযুক্ত হরিণের চামড়া যা ফ্যানসি স্কিন (fancy skin) হিসাবে ঘরের দেয়ালে শোভা বর্ধন করে তার কিন্তু মূল্য যথেষ্ট। এছাড়া চামড়াজাত বিভিন্ন প্রকারের অতি মূল্যবান পণ্য তৈরিতে হরিণের চামড়া ব্যবহৃত হয়। দেশে বিদেশে ঘরের পরিবেশ সুশোভিত করতে হরিণের ফ্যানসি চামড়া অতি কাঙ্খিত একটি উপকরণ। হরিণের শিং যে কতো বৈচিত্রময় ও কাব্যিক হতে পারে তার একমাত্র দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে নিজেই। পুরুষ হরিণের এক জোড়া শিং ড্রয়িং রুমের অবরবকে আভিজাত্য আর সৌন্দর্যের আবরণে রূপময় করে তোলে। উলেখ্য যে, প্রজনন ঋতুতে হরিণের মাথায় শিং গজায় এবং এক সময় তা আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে খসে পড়ে। ফলে সখের বশে হরিণ পালন করা হলে তা থেকে প্রতি বছরই এক জোড়া শিং উপহার পাওয়া যায়।

১০.৬.৩ বসতবাড়ীতে হরিণ পালন ও পরিচর্যা

কৃষিভিত্তিক এদশের মানুষ বহুকাল ধরেই গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল পালন করে আসছে। তাদের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তৃনভোজী আলোচ্য এই আকার্ষণীয় প্রাণিটিকে লালন পালন ও পরিচর্যার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছাগল পালনের ন্যায় হরিণ পালনও একটি সহজসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের আবহাওয়া হরিণ পালনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। পরিচর্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতা না থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারি চিকিৎসক ও প্রাণী পুষ্টিবিদগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্ব এখন প্রযুক্তির চরম সীমায় উপস্থিত। এমতবস্থায় হরিণ পালনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় কি-না সেটা সম্ভবতঃ ভাববার সময় এসেছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করলে হয়তো একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। হরিণ তৃণভোজী প্রাণী। ঘাস, পত্রপল্লব, উদ্ভিদের বাকল ও ফলমূল এদের প্রিয় খাবার। আবদ্ধ অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে মুক্ত রাখা অবস্থায় এদের সহায়ক কিছু দানাদার খাবারের জোগান দেয়া হয়। শীতে এদের রুচি কমে যায়, তবে শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তা তারা খেয়ে থাকে। এদের দানাদার খাবারে ১২-১৪% ক্রুড প্রোটিন থাকা প্রয়োজন হয়। দানাদার খাবার প্রদানে যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। কেননা কোন কোন প্রজাতির হরিণ অধিক দানাদার খাবারে শুধু মোটাই হয় না বরং প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ে। যেমন পেরিডেভিড হরিণ।

১০.৬.৪ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হরিণ পালনের প্রতিবন্ধকতা

হরিণ বনের পশু হলেও এদেরকে যখন অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুর ন্যায় লালন-পালন করা হয় তখন এরাও পোষ মানে। হরিণ মূলতঃ শৌখিন ব্যক্তিদের গৃহের শোভা বর্ধনের জন্য পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু হরিণকে যদি বাণিজ্যিকভিত্তিতে পালন করা হয় তাহলে ছাগল পালনের ন্যায় হরিণ-পালন থেকেও প্রভূত অর্থ উপার্জন সম্ভব। ছাগলের ন্যায় হরিণও তৃণভোজী। এরা শান্তি প্রিয়। একটা পূর্ণ বয়স্ক হরিণের ওজন প্রায় ৮৫ কেজি হয়ে থাকে এবং আয়ুষ্কাল ২০-৩০ বছর হতে পারে। হরিণের চামড়া অতীব মূল্যবান। অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক জোড়া শিং যা পুরুষ হরিণের মাথায় প্রতি বছর গজায় ও খসে পড়ে, তার বাণিজ্যিক মূল্য বিপুল। হরিণের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ব্যয়বহুল। হরিণের মাংসের পরিচিতি 'ভেনিসন' (venision) হিসাবে। উল্লেখ্য, নিউজিল্যান্ড থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ 'ভেনিসন' যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। নিউজীল্যান্ডে ৩,৫০০-এর অধিক হরিণ খামার আছে যেখানে ৪ লক্ষেরও বেশি হরিণ পালিত হয়। এছাড়াও জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে কেবলমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে হরিণ পালিত হয়ে থাকে। অতি মূল্যবান সুগন্ধি 'কস্তুরী' (musk) পুরুষ হরিণ (musk deer) থেকে আহরণ করা হয় যা ঔষধ ও সুগন্ধি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হরিণের রোগ-ব্যাধিও তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য হরিণের বাণিজ্যিক মূল্য প্রকৃতপক্ষে আকর্ষণীয়।

আমাদের দেশের আবহাওয়া হরিণ পালনের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। পত্রিকান্তরে জানা গেছে, ঢাকার চিড়িয়াখানাতে হরিণের সংখ্যাধিক্যতার কারণে কর্তৃপক্ষ এদের লালন-পালনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে অথচ এগুলো বিক্রয় করাও সম্ভব হচ্ছে না নানাবিধ কারণে। আরো জানা গেছে, দেশের দুর্গম দ্বীপাঞ্চল-সমূহেও হরিণের সংখ্যাধিক্যতার জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। আইনগতভাবে, পূর্বে বন্য হরিণ আবদ্ধ অবস্থায় লালন-পালন নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে সরকার বন্য হরিণ লালন-পালনের জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে চিত্রা ও মায়া হরিণের খামার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যদি কোন উদ্যোক্তা এ বিষয়ে আগ্রহী হোন, তবে তাঁকে সরকার তথা বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জানতে হবে। এক জোড়া হরিণের মূল্য ৩০,০০০ টাকা হলেও আইনী শর্ত কঠিন বলে আগ্রহী ক্রেতা হ্রাস পেয়েছে। ব্যয়বহুল 'সত্বাধিকারী সার্টিফিকেট' (possession certificate) সংগ্রহ এবং বন বিভাগ কর্তৃক তা প্রতি বছর 'নবায়ন' প্রথা ক্রেতাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছে। উল্লেখ্য, এক জোড়া হরিণের জন্য সত্বাধিকারী সার্টিফিকেট এবং বাৎসরিক নবায়ন ফি বাবদ যথাক্রমে ১০,০০০ ও ৫,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়। আমি মনে করি, হরিণের বাণিজ্যিক মূল্য আকর্ষণীয় বলেই এজাতীয় আইনের শিথিলতার প্রয়োজন রয়েছে। হরিণকে যদি বাণিজ্যিকভিত্তিতে প্রতিপালনের সুযোগ দেয়া হয় তাহলে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১০.৬.৫ হরিণ সংরক্ষণে প্রয়োজন গণ সচেতনতা

হরিণ একটি দৃষ্টিনন্দন সৌখিন প্রাণী। সারা বিশ্বের রসনা বিলাসী ব্যক্তি বা পর্যটকগণের নিকট হরিণের মাংসের রোস্ট কাবার অত্যন্ত সমাদৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চিত্রা ও মায়া হরিণের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এক খাবার। সেই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশে এ প্রাণীর খামার স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে, অপ্রচলিত পণ্য হিসাবে এই মাংস বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও চামড়া, ক্ষুর ও শিং ওষুধের উপকরণ হিসেবে বহির্বিশ্বে রপ্তানি করার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। বন্যপ্রাণী হরিণ আমাদের জাতীয় সম্পদ। বর্তমানে পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হয়ে এ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। অর্থলোভী হিংস্র শিকারীদের দুর্বার আকর্ষণ এখন অসহায় মায়াবী হরিণ কুলের উপর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকহারে হরিণ শিকারের সংবাদ প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে যা আমাদের দেশের জন্য সত্যিই অত্যন্ত হতাশা ও উদ্বেগের বিষয়। পত্রিকান্তরে জানা যায় শীতের শুরুতেই সংঘবদ্ধ শিকারীদের তৎপরতা শুরু হয়। অহরহ উদ্ধার করা হয় জীবিত অথবা মৃত হরিণ ও হরিণের চামড়া। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত যারা শিকারী নামে অভিহিত মেতে ওঠে হরিণ শিকার যজ্ঞের। শিকারীদের ফাঁদে আটকে পড়া হরিণের পায়ের গোড়ালীতে মারাত্মক ক্ষত হয়। মাঝে মধ্যে এসব দুষ্কৃতকারীদের কেউ কেউ ধরা পাড়লেও অধিকাংশই রয়ে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুন্দরবনে অন্যায়ভাবে প্রতিদিন কত হরিণ শিকার হচ্ছে তার কোন খতিয়ান পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক গুরুত্বের কারণে সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষণা

করা হয়েছে। একটি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই, অবিলম্বে সুন্দরবনের হরিণ রক্ষার পাশাপাশি দেশের চিড়িয়াখানাগুলোতে ব্যাপকভাবে হরিণের প্রজনন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রের আদলে আভয়ারণ্যগুলোতে হরিণের প্রাকৃতিক বিচরণ ভূমি সৃষ্টি করতে হবে। উৎসাহী ও অভিজ্ঞ চাষীদের মাঝে হরিণ শাবক বিলির ব্যবস্থাও নেয়া প্রয়োজন। হয়তবা সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন কৃষকের বসতভিটা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের পাশে মায়াবী হরিণ-হরিণী কৃষক কূলের মনকে কাব্যিক করে তুলবে (রহমান সেলিম ডিডি, ২০০৯)।

১০.৭ কোয়েল পালনঃ বাংলাদেশে একটি লাভজনক ব্যবসা

আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি আদিকাল থেকে পারিবারিকভাবে পালিত হয়ে আসছে। অবশ্য এখন এদেরকে বাণিজ্যিকভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যা ইতোমধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে হাঁস-মুরগি ছাড়াও কবুতর ও কোয়েলও পালন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ইদানিং বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল পালন মোটামুটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জসহ অন্যান্য জেলাতেও কোয়েল খামার বা কোয়েলারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পোল্ট্রি জগতের ক্ষুদ্রতম সদস্য কোয়েল আকারে ছোট হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ন্যায় ঘন জন অধ্যুষিত দরিদ্র দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অল্প খরচে পারিবারিক বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। উল্লেখ্য অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস ও ডিম গুণগতভাবে অনেক শ্রেয়। আনুপাতিকহারে কোয়েলের ডিমে কেলেস্টেরল কম এবং আমিষ অধিক থাকে। কোয়েল পালন করে পারিবারিক পুষ্টি যোগানোর সাথে সাথে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। এভাবে পরিবারের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে উপকৃত হওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল পালনের জন্য উপযোগী। সুতরাং দেশে যদি আরো ব্যাপকভাবে কোয়েল পালন করা যায় তাহলে খামারিরা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন তেমনি দেশের পুষ্টি চাহিদার ঘাটতিও মোকাবিলা করা যাবে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা নব্বই-এর দশকে থাইল্যান্ড, জাপান ও মালয়েশিয়া থেকে কিছু কোয়েল সংগ্রহ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকেও কিছু বন্য কোয়েল সংগ্রহ করে যার নামকরণ করা হয় ঢাকাই কোয়েল। থাইল্যান্ড ও জাপান থেকে যেসব কোয়েল সংগ্রহ করা হয় সেগুলোর নামকরণ করা হয় জাপানীজ কোয়েল। মালয়েশিয়া থেকে যে ব্রাউন কোয়েল আনা হয় সেগুলোর নামকরণ করা হয় ব্রাউন কোয়েল। উল্লেখ্য, বিভিন্ন জাতের কোয়েলের প্রকৃত উৎস হচ্ছে জাপানীজ কোয়েল। বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানীগণ কোয়েলের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। কোয়েলের বিভিন্ন গুণ যেমন ছোট আকৃতি, দ্রুত বর্ধনশীল, অল্প স্থানে অধিক সংখ্যায় পালন, খাদ্য কম খাওয়া, অধিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা, অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ইত্যাদি কারণে কোয়েল একটি আদর্শ পাখি। কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য কোয়েলকে পাইলট পাখি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কোয়েলের ওপর গবেষণায় দ্রুত ফলাফল লাভ করা যায়। উল্লেখ্য ভারত ইতোমধ্যে অনেক ধরণের মিট-টাইপ কোয়েল স্ট্রেইন উদ্ভাবন করেছে। ৫ সপ্তাহ বয়সে একেকটি কোয়েলের ওজন হয় ১৪০-১৫০ গ্রাম। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরণের জাপানী কোয়েল উদ্ভাবন করেছেন যেগুলো ৬ সপ্তাহ বয়সে ২১০ গ্রাম হয়ে থাকে।

কোয়েল একটি দ্রুত বর্ধনশীল পাখি। এরা অল্প বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় কোয়েল ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিমপাড়া শুরু করে। ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে ৫০% ডিম পাড়ে এবং ১২ সপ্তাহের পর থেকে ৮০% ডিম পাড়ে। অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করা গেলে বছরে গড়ে প্রায় ২২৫-২৫০টি ডিম পাড়ে। জাত ভেদে প্রাপ্তবয়স্ক কোয়েলের দৈহিক ওজন ১২০-১৫০ গ্রাম। কোয়েলের উৎপাদন বয়সকাল গড়ে ১ বছর। ১৭-১৮ দিনে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। জীবনকাল গড়ে ১ থেকে দেড় বছর। সঠিক খামার ব্যবস্থাপনা ও যত্ন নিলে কোয়েল বছরে ২৫০-২৬০টি পর্যন্ত ডিম দেয়। ডিমে প্রোটিন তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোলেস্টেরল কম থাকে। বর্তমানে কোয়েল পালন পরিবারের পুষ্টি সরবরাহ এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোয়েল পালনে বিনিয়োগ কম লাগে এবং অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের

মাংস ও ডিম গুণগতভাবে উন্নত। শিক্ষিত বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা ছাড়াও যে কেউ ঘরে বসে অল্প পরিসরে কোয়েল পালন করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এদের প্রজননকাল সংক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্প সময়ে বাচ্চা ও ডিম বিক্রি থেকে আয় বেশি পাওয়া যায়। কোয়েলের রোগবালাই তুলানামূলকভাবে অনেক কম। অল্প জায়গায় বা বাড়ীর অঙ্গীনায় সহজেই কোয়েল পালন করা যায়। এদের পালন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল পালন করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদার একটি অংশ পূরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে তিন জাতের কোয়েল রয়েছে বলে তথ্য আছে। এক সময় আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ও বনে কোয়েল দেখা যেত। বর্তমানে বন্য কোয়েল গ্রামাঞ্চলে ও বনে আর তেমন দেখা যায় না।

১০.৭.১ বাংলাদেশে কোয়েলের জাত এবং প্রধান প্রধান এলাকা

কোয়েলের জাত বর্তমানে পৃথিবীতে কোয়েলের ১৮টির মত জাত আছে। এই জাতগুলির মধ্যে জাপানিজ জাতের কোয়েল বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। তবে অন্যান্য জাতগুলি প্রকৃতপক্ষে জাপানিজ কোয়েল থেকে উদ্ভাবিত। বাংলাদেশে তিন জাতের কোয়েল পাওয়া যায়-

(১) জাপানীজ কোয়েল: এটি একটি ছোটখাট জাতের কোয়েল। এদের ওজন ১১০-১৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। পালক এবং রং বাদামী।
(২) ব্রাউন কোয়েল: এই জাতের কোয়েলের পালকের রং বাদামী। এরা জাপানীজ কোয়েল থেকে কিছুটা বড় হয়।
(৩) ঢাকাই কোয়েল: এই জাতের কোয়েল দেখতে জাপানীজ কোয়েলের মত। বাংলাদেশের বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ঢাকাই কোয়েল।

জাপানীজ কোয়েল

ব্রাউন কোয়েল

ঢাকাই কোয়েল

বাংলাদেশে কোয়েল পালন খুব বেশি দিনের না, যদিও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বেশ আগে থেকেই এই পাখিটির পালন শুরু হয়। আমাদের দেশে ঢাকা শহরে এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভারে প্রথমে কোয়েল পালন শুরু হয়। বর্তমানে ঢাকা ছাড়াও, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নওগাঁও, যশোহর, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া জেলাতে প্রধানত কোয়েল পালন করা হয়। ঢাকার সাভারে কোয়েলের বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক খামার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জলবায়ু কোয়েল পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে কোয়েল পালন করা খুব সহজ। শহর এলাকার আশে-পাশে বেশি হারে কোয়েল পালন করতে দেখা যায়। তবে বর্তমানে সৌখিন এবং বাণিজ্যিক কোয়েল পালনকারীরা শহর অঞ্চলেও কোয়েল পালন করা শুরু করেছে। এ সকল খামারের ডিম ও মাংস প্রধানত শহরের হোটেল রেস্টুরেন্ট বা বাজারে বিক্রি হয়।

১০.৭.২ কোয়েল ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়

খামারে পালনের জন্য কোয়েল পরিচিত খামার থেকে সংগ্রহ করা ভাল। সংগ্রহের সময় কোয়েল ভালভাবে পরীক্ষা করে কিনতে হবে। পরিবহনের সময় পরিস্কার বাক্স বা ঝুড়ি ব্যবহার করা উচিত। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে বাক্স বা ঝুড়িতে

যেন পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে যাতে কোয়েল ভালভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। (ক) সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন চঞ্চল, সজীব কোয়েল কিনতে হবে। (খ) পালক এবং মলদ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। (গ) ঠোঁট বা মুখ দিয়ে কোনো লালা বা মিউকাস পড়বে না। (ঘ) যে কোন ধরণের আঘাত হতে মুক্ত হতে হবে।

স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল চেনার উপায় বাণিজ্যিকভিত্তিতে খামার পরিচালনা করতে হলে স্ত্রী ও পুরুষ কোয়েল পার্থক্য করা জরুরি। স্ত্রী ও পুরুষ কোয়েল দুই-তিন সপ্তাহের পূর্বে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে অনেকে কোয়েলের লিঙ্গ পার্থক্য করতে পারেন। কোয়েলের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েলকে পৃথক করা যায়। পুরুষ কোয়েলের বয়স দুই সপ্তাহ হলে পুরুষ কোয়েলের বুকের দিকের পালক অপেক্ষাকৃত গাড় বাদামি ও বড় থাকে। পুরুষ কোয়েলের পেটে হাত দিলে মলদ্বার (ভেন্ট) দিয়ে সাদা ফেনার মত তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। দুই-তিন সপ্তাহ বয়সে স্ত্রী কোয়েলের বুকের দিকে অপেক্ষাকৃত সাদা বা ডোরা কাটা পালক দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী কোয়েলের পেট নরম ও সেখানে ডিম অনুভূত হয়।

কোয়েলের বাসস্থান বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক কোয়েল পালন করতে হলে এর জন্য মানসম্পন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। খামারের স্থান নির্বাচন, আকার এবং ঘর তৈরির উপকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এ কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল খামার করতে হলে লিটার পদ্ধতির চেয়ে খাঁচায় পালন করা ভাল। তবে দুইটি পদ্ধতিতেই কোয়েল পালন করা সম্ভব।

স্থান নির্বাচন কোয়েলের খামার বা ঘরের জন্য উঁচু ভূমি নির্বাচন করতে হবে। মেঝে বেলে মাটির হওয়া উচিত এবং উত্তম পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোয়েলের ঘর মালিক বা খামারির আবাসস্থল থেকে অল্প (২০০-৩০০ ফুট) দূরে হওয়া উচিত। এর ফলে খামারি নিয়মিত যত্ন বা তদারকি করতে পারবেন। খামারে পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ঘর সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া ভাল।

কোয়েল পালন পদ্ধতি খাঁচায় পালন পদ্ধতি খাঁচায় পালিত কোয়েলের রোগব্যাধি তুলনামূলকভাবে কম। একটি খামারে যেখানে ৫০ টি কোয়েল পালন করা হবে, এরূপ খামারের খাঁচার মাপ হবে ১২০ সেমি × ৬০ সেমি এবং ৩০ সেমি উচ্চতা। খাঁচায় প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১৫০ বর্গসেন্টিমিটার জয়গা প্রয়োজন। খাঁচার দুই পার্শ্বে এক দিকে খাবার পাত্র এবং অন্য দিকে পানির পাত্র রাখতে হবে।

মেঝেতে পালন পদ্ধতি মেঝেতে পালিত কায়েলের রোগব্যাধি তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। মেঝেতে প্রতিটি কোয়েলের জন্য ২৫০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গা প্রয়োজন। সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র মেঝেতে রাখতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা কোয়েলের জন্য তৈরি খাদ্য বাজারে পাওয়া যায় না। তাই বাচ্চা, বাড়ন্ত ও লেয়ার বা প্রজননের জন্য ববহৃত বয়স্ক কোয়েলের জন্য খামারীকে আলাদা করে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের বাচ্চা কোয়েলের জন্য স্টাটার ম্যাশ প্রস্তুত করতে হবে যেখানে আমিষ থাকবে শতকরা ২৭ ভাগ এবং বিপাকীয় শক্তি থাকবে ২৮০০ কিলোক্যালোরী। ৪ থেকে ৫ সপ্তাহের বাড়ন্ত কোয়েলে খাদ্যে আমিষ থাকবে শতকরা ২৩ ভাগ এবং বিপাকীয় শক্তি থাকবে ২৭০০ কিলোক্যালোরী। ৬ সপ্তাহ থেতে কোয়েলকে লেয়ার বা ব্রিডার ম্যাশ খাদ্য দিতে হবে। এই খাদ্যে শতকরা ২২-২৪ ভাগ আমিষ এবং ২৫০০-২৬০০ কিলোক্যালোরী বিপাকীয় শক্তি থাকবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা কোয়েলের রোগ প্রতিরোধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া কোয়েলের ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সকল নীতিমালাসমূহ মেনে চলতে হবে। কোয়েল অসুস্থ হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কোয়েলকে বছরে দুই বার রাণীক্ষেত ও মাইকোপ্লাজমা রোগের টিকা দিলে এই দুইটি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি কোয়েল খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। অতএব এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য খামারের জীবনিরাপত্তা উন্নত করতে হবে।

বাংলাদেশে কোয়েল পালনে অসুবিধাসমূহ আমাদের দেশে দেশী বা বিদেশী জাতের উন্নত মানের কোয়েল সরবরাহ করার মত বিশ্বস্ত খামারের অভাব আছে। কোয়েল পালন বিষয়ক কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন জনবলেরও ঘাটতি আছে। ফলে খামারগুলি থেকে কাঙ্খিত কোয়েল উৎপাদন হচ্ছে না। কোয়েলের রোগব্যাধি নিয়ে দেশে গবেষণা বা অনুসন্ধান খুবই কম হয়েছে। কোয়েল ক্রয় বা বিক্রয় করার ভাল বাজারের অভাব আছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন এবং উৎপাদনের জন্য সরকারি খামার বা সহায়তা না থাকায় এই খাতে আশানুরূপ বিকাশ হচ্ছে না। মানসম্পন্ন ব্রিডিং খামার না থাকায় ইনব্রিডিং-এর সমস্যার কারণে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না।

উপসংহার বাংলাদেশে বর্তমানে কোয়েল পালন দিন দিন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোয়েল পালন করা হলে তা লাভজনক ব্যবসা হিসাবে জনপ্রিয় হতে পারে। বাণিজ্যিকভিত্তিতে কোয়েল পালন সম্প্রসারিত হলে দেশের পুষ্টি মিটাতে এবং একই সাথে কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

১০.৮ এভিয়ারি শিল্প দারিদ্রতা বিমোচনে অনন্য সম্ভাবনা

আমাদের দেশে বহুবিধ সমস্যার মাঝে দারিদ্রতা একটি বড় সমস্যা। দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩৫%) হতদারিদ্রের মধ্যে অবস্থান করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে যেমন-পোষাক শিল্প। তাছাড়া গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার, চামড়া শিল্প এবং হর্টিকালচার ও মৎস্য খামার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান তথা দারিদ্রতা বিমোচনের আরও একটি উপখাত হতে পারে এভিয়ারি শিল্প। আর্থাৎ সৌখিন পাখির প্রজনন খামার শিল্প। প্রায় ৪০০০ বছর পূর্ব থেকে মানুষ বর্ণিল এ পোষা পাখি পালন করে আসছে। ইদানিং ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপক হারে এ সৌখিন পাখি পালনের প্রচলন গড়ে উঠেছে। একই ভাবে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়ায় ও পাকিস্তানে অধুনা এ শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটছে। প্রতিবেশী এ দেশগুলো থেকে আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে এ পোষা পাখি রপ্তানীও করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের শুরু থেকে সৌখিন পোষা পাখি পালনের ছোট ছোট খামার তথা এভিয়ারী শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে কোন ধরণের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও, ব্যক্তি ও বিভিন্ন সমিতির প্রচেষ্টায় নব্বই দশকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশে বছরে ১/২ বার সৌখিন পাখির মেলার প্রচলনের মাধ্যমে এ শিল্পের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। এর সাথে যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা যোগ হয়, তবে এ শিল্প থেকে শুধু যুবসম্প্রদায়ের বেকারত্বই দূর হবে না পাশাপাশি পোষা পাখির ব্রিডিং খামার থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। তা ছাড়াও সৌখিন এ পাখি পালন দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং যুব সম্প্রদায়কে বর্তমান অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে সুদূর প্রসারি ভূমিকা রাখবে। দেশের তরুণ ও যুব সম্প্রদায় বর্তমানে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য, আকাশ অপসংস্কৃতির (বিদেশী টিভি চ্যালেন) আগ্রাসনে নাজেহাল অবস্থায় আছে। সৌখিন পোষা পাখি পালনের অভ্যাস তাদের শুধু বেকারত্বই দূর করবে না, পাশাপাশি তাদের মানসিক সমস্যা দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ফলে সমাজের অনেক দরিদ্র/মধ্যবিত্ত/ধনীক শ্রেণীর উঠতি বয়সের তরুণ ও তরুণীরা মাদকের করাল থাবা থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাবে এবং এদের অবসর সময় কাটানোর একটি উপযুক্ত মাধ্যম হবে এই বর্ণিল পোষা পাখির খামারগুলো। এই এভিয়ারী শিল্প প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে, বিশেষ করে এ সমস্ত সৌখিন পাখি চিকিৎসার উন্নত খাদ্য, যন্ত্রপাতি, ওষুধ, টিকা, রোগ নির্ণয় ও পুষ্টি সামগ্রী শুল্ক মুক্ত আমদানির অনুমোদন পেলে এভিয়ারী শিল্প বিকশিত হবে। সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ বিভাগের কিছু সংখ্যক চিকিৎসককে এভিয়ারী বিষয়ে উন্নত বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দ্বারা পাখি খামারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদের দেশ অচিরেই এই এভিয়ারি শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

পাখি পোষা এক বৈচিত্রময় সখ যা যুগ-যুগ ধরে মানুষকে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে। উন্নত বিশ্বে এক জোড়া পাখি হতে বৃহদাকার এভিয়ারি (পাখি পালন ও প্রজননের উদ্দেশ্যে স্থাপিত আবাসস্থল) স্থাপন করার অনেক নজির রয়েছে। বর্তমান

পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ৬.৪ মিলিয়ন পাখি পালক রয়েছে যারা গড়ে প্রায় ২.৬ টি করে পাখি পুষে থাকেন। সংখ্যার দিক থেকে কুকুর ও বিড়ালের পরপরই পাখি তৃতীয় জনপ্রিয় পোষা প্রাণী। বেশির ভাগ উন্নত দেশে নির্জন গৃহকোণ ছাড়াও গাছপালায় সাজানো আবৃত স্থানে পাখি পালন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিদেশী পাখি পালনের ব্যাপারটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধনবান পরিবারের ক্ষেত্রে নিছক সখের ব্যাপার হিসেবে পরিগণিত হতো। হাতে গোনা কিছু পাখিপ্রেমী বিগত তিন দশক যাবত এ শিল্প-মাধ্যমকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ইতিমধ্যে অনেকেই সখের পাশাপাশি ব্যবসা হিসেবে এভিয়ারি শিল্পকে বেছে নিয়ে, তা এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতি গঠন ও নিয়মিত প্রদর্শনী আয়োজনের মাধ্যমে দিনদিন এ শিল্পটি সারাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে জাতীয় পশু-পাখি প্রদর্শনীতে পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম জাতীয় স্বীকৃতি মিললেও তারও বেশ আগে ১৯৯০ সালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রথম পোষা পাখি প্রদর্শনীর আয়োজন অলিখিত স্বীকৃতির সমতূল্য। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে পাখিপ্রেমী এবং পাখি প্রজননকারীরা পোষা পাখি পালন খাতে ১৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে, যা পৃথিবীর বেশির ভাগ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মোট বার্ষিক ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তিন যুগেরও বেশি সময়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন অনেক উন্নত দেশের মতোই পোষা পাখি পালনের জ্ঞান রপ্ত করে পাখি রপ্তানি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বল্প সময়ে সহস্রাধিক এভিয়ারি স্থাপনের নজির প্রমাণ করে বাংলাদেশে পাখি পালন এখন শুধুমাত্র সখের ব্যাপার নয়। ১৯৯৮ সালে সমিতি গঠন ও নিয়মিত জাতীয় পর্যায়ে প্রদর্শনী আয়োজন প্রমাণ করে পাখি পালন এখন শুধুমাত্র সখ নয় বরং শিল্পমাধ্যমও। বাংলাদেশে প্রচলিত নিয়মে বিদেশী পোষা পাখি আমদানি করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধও নেই, অর্থাৎ আইনগতভাবে লালন-পালনেও বাধা নেই। নিজস্ব বন্য পাখি সংরক্ষণ করার জন্যে দেশে দেশে আইন হয়েছে। আইন হয়েছে পেস্ট বা ফসল ধ্বংসকারী হিসেবে আখ্যায়িত শত শত প্রজাতির প্যারোট ও অন্য কিছু প্রজাতির পাখি নিধনের। কড়াকড়ি আইন আছে বিলুপ্তপ্রায় ও স্থানীয় বন্য পাখি রপ্তানির ক্ষেত্রে। অথচ উন্নত বিশ্বে এভিয়ারিতে জন্ম নেয়া পাখির বাণিজ্য রমরমা। কারণ এদেরকে বন্য পাখি হিসেবে গণ্য করা হয় না।

১০.৮.১ পাখি পালনের ইতিহাস

খাঁচায় পাখি পালন, বিশেষ করে প্যারোট এবং প্যারাকিট জাতীয় পাখি পালনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে সখ হিসেবে পাখি পালনের প্রমাণ আবিস্কৃত হয়েছে যা খাদ্য হিসেবে পাখি পালন থেকে ভিন্ন ছিল। বর্তমানে জনপ্রিয় অনেক পোষা পাখি যেমন ময়না, টিয়া, ময়ূর প্রভৃতি প্রাচীন ভারতবর্ষে খাঁচায় পালিত হতো। প্রাচীন শিল্পকর্মে পোষ মানা পাখির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মিশর, গ্রীক ও রোমান অংকন শিল্পে, সাহিত্যকর্মে ও চিত্রলিপিতে ঘুঘু, প্যারোট, হাঁস এবং অন্যান্য পাখির বিবরণ পাওয়া গেছে। খৃষ্ট জন্মের ৪০০ বছর পূর্বের গ্রীক লেখাতেও প্যারোট প্রজাতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। মহাবীর আলেক্সান্ডার এর সেনাবাহিনী খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বছর পূর্বে উত্তর ভারত আগ্রাসনের সময় এই উপ-মহাদেশের টিয়া পাখি (Indian Ring-necked Parakeet) সংগ্রহ করেন। এসময় পোষা পাখি মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত খাঁচায় প্রতিপালন করা হতো।

কলম্বাস যখন অনিশ্চিত যাত্রাপথে নাবিক বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে স্পেনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন ঠিক তখনই আকাশে উড়ন্ত পাখি দেখে তাদের অনুসরণ করেন। তিনি নতুন এক মহাদেশ আবিস্কার করে আশ্চর্য সুন্দর পাখি দেখতে পান সেখানে। নতুন বিশ্ব আবিস্কার শেষে বিজয়ী কলম্বাস ১৪৯৩ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় তার পৃষ্ঠপোষক রাণী ইসাবেলার জন্যে একজোড়া কিউবান আমাজন প্যারোট নিয়ে আসেন। পঞ্চদম শতকে পর্তুগিজ নাবিকদের সৌজন্যে ক্যানারী পাখি ইউরোপে জনপ্রিয় হয়। রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে বৈঠকখানার এক কোনায় পিতলের খাঁচায় ক্যানারী পাখি শোভা না পেলে গৃহসজ্জা অসম্পূর্ণ বলে ভাবা হতো। বাজরিগার পাখি পোষ মানানোর ইতিহাস কিছুটা ক্ষুদ্র হলেও নতুন নতুন প্রজনন সাফল্যের কারণে আকর্ষণীয় ও পরিবর্তিত বর্ণবৈচিত্রের প্রচলন হয় এবং অল্প সময়েই বাজরিগার সবচেয়ে বেশি পালিত পাখি হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

পাখি পালন তথা প্রজনন চর্চার ইতিহাস খুজতে গেলে আমাদের উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে ফিরে যেতে হবে। পাখির বর্ণ প্রজনন শুরু হয় প্রায় একই সময়ে। এভিয়ারি স্থাপনের সবচেয়ে পুরোনো নজির খুঁজতে গেলে জানা যায় যে লন্ডন

চিড়িয়াখানায় ১৮২০ সালে পাখি প্রদর্শনের জন্যে এভিয়ারি নির্মিত হয়। এরপর একে একে ইউরোপ ও আমেরিকার চিড়িয়াখানা ও জুওলজিক্যাল গার্ডেনে নির্মিত হতে থাকে বিভিন্ন free flight এভিয়ারি। বিনোদনের জন্যে তৈরি হতে থাকে বার্ড পার্ক (যেমন জুরং বার্ডপার্ক, সিংগাপুর), যেখানে দর্শকরা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখির জীবনযাপন ও প্রজনন ব্যবস্থা দেখতে পারেন। Birds of Eden হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আচ্ছাদিত পাখির অভয়াশ্রম। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন কেপ অঞ্চলে নির্মিত এই এভিয়ারি ২00৫ সালে দর্শকদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। ২00 প্রজাতির প্রায় ৩000 পাখি আছে এই অভয়াশ্রমে যার মধ্যে অনেক পাখিই এখন অবলুপ্তপ্রায়। ২,৩৪,২৩০ বর্গফুট এলাকায় (১৩,২৫৬,১০০ ঘনফুট) বৃহৎ পরিবেশের এই এভিয়ারি এখন পাখিপ্রেমীর জন্যে এক অবশ্য দর্শনীয় স্থান। পাবলিক এভিয়ারি ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত এভিয়ারিকে হোম এভিয়ারি বলা যেতে পারে। হোম এভিয়ারি দুই ধরণের হতে পারে। প্রথমটি মাটিতে বা ছাদে কংক্রিট ভিত্তির ওপর (ইঁদুর বা অন্য জীব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে) নির্মিত এবং অন্যটি মাটি হতে উঁচুতে ঝুলন্ত অথবা খুঁটির ওপর নির্মিত।

পাখির মূল প্রয়োজন যেমন খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও সামাজিক বাঁধন ছাড়াও আরো প্রয়োজন পড়ে বুদ্ধি বিকাশের পরিবেশ যা শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার মাধ্যমে হয়ে থাকে। গবেষকরা জেনেছেন যে পাখিরা অন্তর্দৃষ্টি থেকে সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং মানব শিশুর মতই দেখে শিখতে পারে। এর কতটুকু সহজাত প্রবৃত্তি আর কতটুকু বিবেক-বুদ্ধিদীপ্ত তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। পাখি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী পাখি শুনতে পারে, বর্ণমালা চিনতে পারে ও নানা ধরণের দৌড়বাজি কৌশল শিখতে পারে। আফ্রিকান গ্রে, আমাজন ও বেশ কিছু পাখি নিবিড় প্রশিক্ষণ দিলে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়। বাক্য গঠন হতে শুরু করে অবিকল স্বর নকল করার সক্ষমতা আছে এধরণের পাখিতে। বাঁকা অথচ শক্তিশালী ঠোঁটযুক্ত প্যারোট পরিবারের সদস্যদের পাখিকূলে সবচেয়ে চট্‌পটে হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এদের প্রশিক্ষণ দিলে রং, আকৃতি, বস্তু এমনকি মানুষকে পৃথকভাবে চিনতে পারে। একটি আফ্রিকান গ্রে প্যারোট এর বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ-অনুভূতি একজন ৩-৪ বছর বয়সের মানব শিশুর সমতূল্য হিসেবে প্রমাণ পেয়েছেন গবেষকরা। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, বন্য পাখিরা রাস্তায় আখরোট ছড়িয়ে রাখে যাতে করে চলন্ত গাড়ির চাকায় তা ভেঙ্গে যায় এবং পরে তা খেতে পারে। বন্দি কাকাতুয়াকে কাঠের টুকরা ঠোঁট দিয়ে চিড়ে শরীর চুলকাতে দেখা গেছে। বন্য পাখিরা হাজার হাজার বীজ কয়েক শ' বর্গমাইল এলাকায় মাটির নিচে পুতে রেখে পরে প্রয়োজনের সময় তা বের করে খায়। ভাবা হয়ে থাকে যে পাখিরা তাদের মস্তিস্কের এক বিশেষ সংবেদনশীল অংশ ব্যবহার করে এ কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। আবেগ প্রকাশের জন্যে পাখিদের মস্তিস্কের আরেক অংশ ব্যবহৃত হয়। পাখি ছাড়া শুধুমাত্র উচ্চুর মেরুদন্ডী প্রাণী যেমন মানুষ এবং অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই এ ধরণের প্রত্যঙ্গ রয়েছে।

পোষা পাখিরা সামাজিক জীব। তারা দল বেঁধে বাস করতে ভালবাসে, একে অপরের সাথে মিলে মিশে থাকে এবং সঙ্গলাভ পছন্দ করে। সৌভাগ্যবশত, পাখি-পালক বন্ধুসুলভ আচরণ করলে পাখি সহজে পোষ মানে, সঙ্গী হিসেবে মানুষকে গ্রহণও তাদের সঙ্গলাভ পছন্দ করতে শুরু করে। বস্তুত পাখি তার মালিকের অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়ে। কোন কোন পাখি নতুন বাসস্থান ও মালিককে সহজেই গ্রহণ করে। আবার কিছু পাখির জন্যে তা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যায়। পাখিরা প্রথমিক অবস্থায় ঘাবড়ে গেলেও পরবর্তীতে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিছু ক্ষেত্রে বেশি ঘাবড়ানো পাখি সবচেয়ে বেশি ভক্ত হতে দেখা যায়। সহজে পোষ মানার অন্য শর্তগুলো হচ্ছে বয়স, ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পটভূমি এবং মালিকের নিজের গ্রহণযোগ্যতা পাখির সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পাখির ভীতি দূর করা। বন্ধুত্বের পরিবেশ পাখির আনুগত্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১০.৮.২ পোষা পাখি পালনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পছন্দের পোষা পাখি কি ধরণের হবে তার সিদ্ধান্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। পোষা পাখি ছোট আকারের সাজানো খাঁচায় পালন করা হলেও এভিয়ারিতে পালিত পাখির পালন পদ্ধতি ভিন্নতর। পাখি-পালক ও পাখির মধ্যে যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোন পদ্ধতি কখনোই ফলদায়ক হয় না। বৃহদাকার, উজ্জল, সহজে বায়ূ চলাচল করতে পারে এমন খাঁচা, এবং উন্নত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পোষা পাখির আয়ুস্কাল দীর্ঘায়িত করে এবং তাদের প্রজনন দক্ষতার

বৃদ্ধি ঘটায়। নিঃসঙ্গতা দূর করতে অথবা স্বল্প সময়ে ও খরচে অনুভূতিপ্রবণ ও বুদ্ধিমান সহচর পেতে আগ্রহী হতে চাইবেন অনেকেই। তাই আবেগপ্রবণ হয়ে পাখি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনোই সুফলদায়ক হবে না। পাখির প্রজাতিসমূহের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা, ক্রয়মূল্য সম্পর্কে জানা এবং স্বাস্থ্য ও প্রজনন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পরেই পাখি ক্রয় করতে হবে। অর্থাৎ কিছু গবেষণা/পরামর্শ গ্রহণ না করে পাখি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিলে পস্তাতে হয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ম্যাকাও এবং কাকাতুয়া প্রজাতির পাখি নবদীক্ষিতদের জন্যে নয়। বেশিরভাগ নবিসের জন্যে ফিঞ্চ, ডাভ (বিদেশী ঘুঘু), বাজরিগার (প্যারাকিট), লাভবার্ডস্ অথবা কশাটিয়েলই উপযোগী। যদিও পাখি ক্রয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত কোন নিয়ম প্রযোজ্য হয় না, তবুও নিম্নলিখিত বিবেচ্য ব্যাপারগুলো গুরুত্বের দাবিদার:

- পাখি পোষার উদ্দেশ্য একটি অন্যতম প্রধান বিষয়? উদ্দেশ্যে যদি সখের প্রধান্য থাকে তবে একক পাখি উত্তম। জোড়ায় রাখা পাখি আমাদের প্রতি মনোযোগী নাও হতে পারে। যদি প্রজননের জন্যে পাখি পোষা হয় তাহলে সহজে পালনযোগ্য পাখি পুষে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। প্রজননের শুরুটাও হতে হবে সহজে প্রজনন যোগ্য পাখি দিয়ে। কথা শেখানো বা অন্য উদ্দেশ্যে পাখি পোষা হলে কথা শেখানোর সর্বোত্তম বয়স বা পাখির অন্য সব কাঙ্খিত গুণাগুণ সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
- পাখিটি যদি পরিবারের অন্য সদস্যের জন্যে কেনা হয় তাহলে তার পছন্দকে সতর্কতার সাথে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। শিশুদের পছন্দের তালিকায় রং থাকবেই। তবে ছোট আকারের পাখিই তাদের জন্যে ভাল। বয়স্কদের জন্যে পাখির সঙ্গ পাওয়া বা পাখিকে সঙ্গ (ফিঞ্চ ব্যতীত) দেওয়ার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- পাখি ক্রয়ের মূখ্য কারণ চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না তা যাচাই করা দরকার। উদাহরণস্বরুপ কথা শেখাতে চাইলে পাখিটির কথা বলার সুপ্ত ক্ষমতা আছে কি না তা জানতে হবে।
- কেনার সময় পাখির মানসিক প্রকৃতি বিবেচনায় আনতে হবে। বুদ্ধিমান ও স্বাভাবিক প্রবণতাসম্পন্ন পাখিই কাম্য, কিন্তু ‘বিক্রয় হইবে’ এমন অস্থায়ী অবস্থার পাখি ধকলে আক্রান্ত হয় বিধায় সেই অবস্থায় পাখির আসল গুণাবলী দেখা ও জানা প্রায় অসম্ভব। নামী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ভাল পরামর্শ দিতে পারে। বিভিন্ন প্রজনন সংস্থা, বিক্রয়কেন্দ্র, পাখি রোগ বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রজাতি-বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।
- পাখির জীবনকাল (যা ৫ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত হতে পারে) বিবেচনায় আনা দরকার। কিছু প্রজাতির পাখি তার পালনকর্তার চেয়েও বেশি দিন বাঁচতে পারে এবং ছোট প্রজাতির কিছু পাখি ২০ বছরের চেয়েও বেশি দিন প্রজননক্ষম থাকে। প্যারাকিট, লাভবার্ডস ও ককাটিয়েল এর মতো ছোট পাখিও পোষা কুকুর অপেক্ষা বেশি দিন বাঁচতে পারে।
- পাখি পছন্দ হলে তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। কিছু কিছু প্রজাতি অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির আর তাই ভাববিনিময় ও প্রশিক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় দিতে হয়। পাখি হতে পাখির খাদ্যাভ্যাস ভিন্নতর। তাই যে পাখিটি ক্রয় করা হবে, তার খাবার যোগাড় করা যাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।
- বিক্রেতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পাখি-পালক ও রোগ বিশেষজ্ঞদের মনোভাব জানা প্রয়োজন। অনেক ক্রেতাই বিক্রেতার মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করেন এবং পরে ভুল বুঝতে পারেন। যারা সখ করে পাখি পালন শিখে পাখি বিক্রয়ে জড়িয়েছেন, তারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকেন এবং পালন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিতে পারেন।
- বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া যাবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ভাসমান বাজার থেকে পাখি কেনা উচিত নয়।
- পাখির উৎসস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে বাচ্চা উৎপাদিত হলে তা কেনাই উত্তম। বিক্রেতা পাখির স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তাপত্র দেন কি না তা দেখা উচিত।
- প্রজাতি ভিন্নতায় পাখির পুষ্টি প্রয়োজনও হয় ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে ময়না পাখির জন্যে নিম্নমাত্রায় লৌহ উপাদান প্রয়োজন পড়ে। অন্য যে বিষয়ে লক্ষ্য করতে হবে তা হল পাখিটি বর্তমানে কি খেতে অভ্যস্ত। দানা-বীজ

পাখির খাদ্যপুষ্টির প্রয়োজন সামান্যই মেটাতে পারে। পাখির আদর্শ পুষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করুন। মনে রাখা প্রয়োজন, বয়স্ক পাখির খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সহজ নয়।

- সুস্থ পাখি ক্রয় করা উচিত। পাখিটি স্বাভাবিক আচরণ করছে কি না এবং সতর্ক ও তৎপর কি না তা দেখে নেয়া প্রয়োজন।
- কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর হাঁ-বাচক হতে হবে, যেমন- পাখির বাসস্থান প্রস্তুত আছে কি? খাঁচাটি পাখির জন্যে যথোপযুক্ত কি না? খাঁচাটি আলো-বাতাসপূর্ণ অথচ ঠান্ডা স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না? খঁচায় পাখির বসার দাড়টি সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কি? প্রয়োজনীয় খেলনা ও আনুষঙ্গিক উপকরণ খাঁচায় সাজানো হয়েছে কি না?
- পাখি ক্রয়ের পূর্বেই জ্ঞানার্জন পাখি পালনের অভিজ্ঞতাকে সুখকর করে। প্রথমবারের মত পাখি পালনে উদ্যোগীদের জন্য ক্ষুদ্রাকৃতির ফিঞ্চ, প্যারাকিট (বাজরিগার) ক্যানারী লাভবার্ডস, অথবা ককাটিয়েল দিয়ে শুরু করা ভাল। ক্ষুদ্রাকৃতির পাখি অতি সহজেই পালন করা সম্ভব।
- একসাথে বেশি পাখি ক্রয় করা ঠিক না। ধীরে চলার নীতি অগ্রগতিকে সহজতর করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে যত্ন নিলে রত্ন মিলবে।
- পাখির জন্যে কতটুকু সময় বরাদ্দ দিতে পারবেন তার ওপরই নির্ভর করবে কতগুলি ও কোন প্রজাতির পাখি পুষবেন। ক্যানারী বা ফিঞ্চের জন্যে তুলনামূলকভাবে কম সময় বরাদ্দ করলে ততটা অসুবিধা হয় না যতটা অন্য প্রজাতির বেলায় ঘটে। প্যারোট প্রজাতির জন্যে সময়ের প্রয়োজন পড়ে বেশি। তাই পাখির জন্যে বরাদ্দযোগ্য সময়ও পাখি পালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।
- পাখি পালন করতে হলে আর কারো সাহায্য আশা করে থাকলে তার যোগ্যতা ও আগ্রহের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।
- পাখির প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করলে বা তার প্রতি মনোযোগী না হলে পাখি নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। তাই পরিবারের অন্য কেউ মানসিক বা শারিরিকভাবে পাখি পালন করতে প্রস্তুত কি না তা প্রথম থেকেই ভাবা প্রয়োজন।
- পাখিরা স্বাভাবিকভাবেই স্বগোত্রের পাখির সঙ্গলাভ পছন্দ করে। যদি প্রয়োজনীয় সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হন তাহলে কমপক্ষে এক জোড়া পাখি কিনুন।
- যদি বেজোড় বা সঙ্গী হারানো পাখির জন্যে সঙ্গীর ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তাদের পাশাপাশি খাঁচায় রেখে (সঙ্গরোধ বা quarantine ব্যবস্থার পর) তাদের একত্রে থাকার লক্ষণ দেখতে পেলে এক খাঁচায় রাখা যেতে পারে, অন্যথায় নয়। মনে রাখা দরকার যে কিছু কিছু পাখি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক স্বভাবের হতে পারে, বিশেষ করে প্রজননের সময়।
- নতুন কেনা পাখি যদি প্রথম কিছুদিন অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ থাকে তবে অবাক হওয়ার দরকার নেই। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে কোন কোন পাখির জন্যে সময়ের প্রয়োজন পড়ে। প্রয়োজনে প্রথম কয়েক দিন পাখিকে আড়াল রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

পাখি কেনার পূর্বে পাখি-পালক (হুমায়ুন আহমেদের ভাষায় ‘পাখাল’) হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। পাখি পোষা ও পাখির বাছাই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র আবেগকে স্থান দেয়া অনুচিত।

অধ্যায় ১১

গবাদিপশু ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

১১.১ ডেইরি টেকনোলজি

সকল স্তনপায়ী প্রাণী দুগ্ধক্ষরণ করে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক প্রাণির দুধ মানুষ খায়। প্রধানত গরু, মহিষ, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ও উটের দুধ মানুষ ব্যবহার করে। সাধারণত বাচ্চা প্রসবের পরই স্তন্যপায়ীর দুধ নিঃসৃত হয়। আর সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির নবজাত বাচ্চার জন্য দুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর দুধ উৎপাদন ক্ষমতার বেশ পার্থ্যক রয়েছে। এমনকি একই প্রজাতির ও জাতের পশুর মধ্যে বিভিন্ন কারণে দুধ উৎপাদনের তারতম্য রয়েছে। যেমন- গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহার, পশুর জাত ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার অবস্থা ইত্যাদির জন্য দুধ উৎপাদনের তারতম্য হয়। অঞ্চল বা দেশের আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকমের পশু পালন করা হয়। দুধ উৎপাদনের জন্য ইউরোপ, আরব ও স্পেনে গরু ও ছাগল, মধ্য-এশিয়ায় ঘোড়া ও গাভী এবং ভারত ও বাংলাদেশে গরু, মহিষ ও ছাগল পালন করা হয়। বাচ্চা প্রসবের পর প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণী একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দুধ দেয়। এই সময়কে দুধদান কাল (lactation period) বলা হয়। প্রজাতি ভেদে বিভিন্ন পশুর দুধ দান কালের তারতম্য হয়। যেমন- গাভী ৮-১০ মাস পর্যন্ত দুধ দেয়।

১১.১.১ দুধের উপাদান

প্রতিটি নবজাতকের প্রধান খাদ্য হল দুধ। দুধের মধ্যে নবজাতকের জন্য সব উপাদানই থাকে। এছাড়া দুধ মানুষের একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে সুপরিচিত। তবে দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ ও ভিটামিন-ডি থাকেনা। প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির দুধে প্রায় একই উপাদান থাকে। তবে প্রাণিভেদে এই উপাদানের পরিমাণের তারতম্য হয়। প্রধানত উপাদান গুলি প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণির দুধে বিদ্যমান। যেমন- পানি (water), চর্বি বা ফ্যাট (fat), প্রোটিন (protein), ল্যাকটোজ (lactose), খনিজ পদার্থ (minerals), ভিটামিন (vitamins), উৎসেচক (enzyme), সাইট্রিক এসিড (citric acid), অন্যান্য উপাদান (other components)। দুধের প্রধান উপাদানসমুহ নকশার মাধ্যমে দেখানো হল (সামাদ ২০০১)।

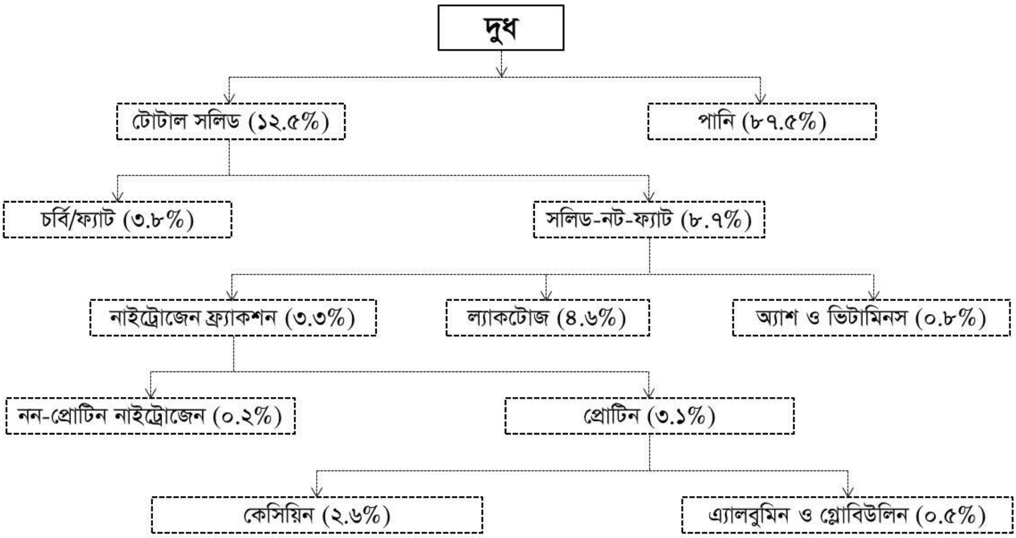

চিত্র ১১.১ঃ দুধের প্রধান উপাদানের গড় ওজন।

১১.১.২ দুধের উপাদান প্রভাবীকরণ

প্রধানত যেসব কারণে দুধের উপাদানের তারতম্য হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- প্রজাতি (species): বিভিন্ন প্রজাতির পশুর দুধের উপাদানের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সাধারণত গরুর দুধে শতকরা ৪.৬ ভাগ ও মহিষের দুধে ৭.২ ভাগ ফ্যাট থাকে।
- জাত (breed): একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতের পশুর দুধের উপাদানের পরিমাণে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- হারিয়ানা জাতের গাভীর দুধে শতকরা ৪.০ থেকে ৪.৮ ভাগ, সিন্ধি গাভীর দুধে ৪.০ থেকে ৫.০ ভাগ, শাহিওয়াল জাতের গাভীর দুধে ৪.০ থেকে ৬.০ ভাগ ফ্যাট থাকে। আবার জার্সি জাতের গাভীর দুধে ৫.৫ ভাগ এবং হলস্টিন জাতের গাভীর দুধে ৩.৫ ভাগ ফ্যাট থাকে। অন্যদিকে আমাদের দেশি জাতের গাভীর দুধে ফ্যাটের পরিমাণ অধিক। এছাড়াও গাভীর জাতভেদে দুধে অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য রয়েছে।
- বয়স (age): গাভীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার দুধ দানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেই সাথে দুধে ফ্যাটের পরিমাণও কমে যায়। এলবুমিন ছাড়া প্রায় দুধের অন্যান্য উপাদানও হ্রাস পায়।
- খাদ্য (feeds): গাভীর খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর দুধ উৎপাদনের তারতম্য হয়। গাভী পানি ও সবুজ কাঁচা ঘাস বেশি খেলে দুধের পরিমাণ বেশি হয় কিন্তু দুধ হয় পাতলা। পাতলা দুধে ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। অন্যদিকে গাভীকে ঘনীভূত সারবান খাদ্য খাওয়ালে দুধ ঘন হয়। ঘন দুধে স্বাভাবিক ভাবেই ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে।
- ঋতু (season): শীতকালে কাঁচা ঘাসের অভাবে গাভীর দুধ ঘন হয়। অপরদিকে বর্ষাকালে প্রচুর কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। তাই তখন গাভীর দুধ হয় পাতলা।
- দুধ দানের পর্যায় (lactation period): গাভীর দুধ দান কালের শেষ পর্যায়ে দুধ কমে যায়। তখন দুধে ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- গরম অবস্থা (heat or oestrus): গাভী গরম হলে চঞ্চল ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। এসময় দেহের কিছু শক্তি গরম হওয়ার জন্য ব্যয় হয়। সে কারণে সেসময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। তবে এ অবস্থা সাময়িক। গরম অবস্থা কেটে গেলে পুনরায় দুধ উৎপাদন স্বাভাবিক হয়।
- স্বাস্থ্য (health): অসুস্থ গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়। গাভীর ওলানে ম্যাস্টাইটিস রোগ হলে গাভীর দুধ কমে যায়।
- দুধ দোহনের সময় (time of milking): অধিক দুধ দানকারী বিদেশী ও সংকর জাতের গাভীর সকাল ও সন্ধ্যায় দুধ দোহন করা হয়। দেখা গেছে সকালের থেকে সন্ধ্যায় দুধে ফ্যাটের পরিমাণ অধিক থাকে।
- দুধ দোহনের পর্যায় (stage of milking): গাভীর দুধ দোহন প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়। দেখা গেছে প্রথম পর্যায়ের দুধ অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্যায়ের দুধের ঘনত্ব বেশী।

১১.১.৩ গাভীর দুধ দোহন পদ্ধতি

গাভীর ওলান থেকে দুধ বের করার পদ্ধতিকে দুধ দোহন বলে। গাভীর ওলান থেকে প্রধানত দুই পদ্ধতিতে দুধ দোহন করা হয়। যথা-হাতের সাহায্যে দুধ দোহন এবং মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহন। হাতের সাহায্যে দুধ দোহন পদ্ধতিতে দুধ দোহনকারী হাত দিয়ে ওলানের বাঁট টেনে দুধ দোহন করে। প্রাচীন কাল থেকে হাত দিয়ে গাভীর দুধ দোহন করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি বলে। এখনও বাংলাদেশে প্রধানত সনাতন পদ্ধতিতে গাভীর দুধ দোহন করা হয়। আর মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহন পদ্ধতিতে মেশিনের মাধ্যমে গাভীর ওলান থেকে দুধ দোহন করা হয়। তাই এই পদ্ধতিকে আধুনিক পদ্ধতি বলে। প্রধানত অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর দুধ দোহনের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে মেশিনের সাহায্যে দুধ দোহন বড় খামারগুলোতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানত সনাতন পদ্ধতিতে গাভরি দুধ দোহন করা হয়। তাই সে সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় করণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

- ভাল দেশী জাতের গাভী থেকে দিনে দুই বেলা দুধ দোহন করা যায়।

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মে একই ব্যক্তি দ্বারা গাভীর দুধ দ্রুত দোহন করা যেমন দোহনকারীর নিকট আনন্দদায়ক তেমনি গাভীর নিকট পছন্দনীয়।
- দুধ দোহনের ৬-৭ ঘন্টা আগে থেকে বাছুরকে তার মার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।
- দুধ দোহনের পূর্বে দোহালের হাত, গাভীর ওলান, বাঁট এবং দোহন পাত্র পরিষ্কার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। কারণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন না করলে একদিকে গাভীর ওলানে ক্ষতিকারক জীবাণু প্রবেশ করে ওলান প্রদাহ রোগ (ম্যাস্টাইটিস) সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, অন্যদিকে দোহনকৃত দুধ জীবাণু দ্বারা দূষিত হতে পারে।
- দুধ দোহনের পূর্বে বাছুরকে ওলানের বাঁটে দুধ টানতে দিতে হবে যেন গাভী দুধ নামায়।
- গাভীর বাঁটে দুধ নামানোর নাথে সাথে বাছুরকে টেনে গাভীর মুখের নিকট খুঁটিতে বেঁধে দিতে হবে।
- বৃদ্ধ আঙ্গুল ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে গাভীর দুধের বাঁট চাপ দিয়ে টেনে দুধ দোহন করতে হয়।
- ওলানের বাঁট টানার সুবিধার্থে সামান্য দুধের সর বা সয়াবিন তেল ব্যবহার করা যেতে পার।
- দুধ দোহনের সময় কুকুর বা অন্য কোন প্রাণী যেন গাভীকে বিরক্ত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১.১.৪ বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি

গাভীর বাচ্চা প্রসবের পরপরই দুধ উৎপাদন শুরু হয়। প্রতিটি নবজাতকের প্রধান খাদ্য হলো দুধ। তাই দুধের মধ্যে নবজাতকের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল খাদ্য উপাদানই থাকে। এছাড়া দুধ মানুষের একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে পরিচিত। আমাদের দেশে বছরে দুধের ঘাটতি প্রায় ৭.৪২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। দুধের এই ঘাটতির জন্য আমাদের দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে গুড়া দুধ আমদানি করা হয়। অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য যেমন সুস্থসবল উন্নত জাতের গাভী প্রয়োজন তেমনি দুগ্ধবতী গাভীকে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ ও সুষ্ঠু পরিচর্যা করা অত্যাবশ্যক। আর বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের জন্য গাভী ও দুধ দোহনকারী উভয়কে স্বাস্থ্যবান হওয়া প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বিশুদ্ধ দুধ উৎপাদনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

- রোগাক্রান্ত গাভীর দুধে ক্ষতিকারক জীবাণু থাকে। অন্যদিকে সে দুধ হয় নিম্নমানের। তাই বিশুদ্ধ দুধের জন্য গাভী সুস্থসবল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- গাভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পালন করতে হবে। এছাড়া দুধ দোহনের পূর্বে ওলান, বাঁট, পিছন ও পেটের তলদেশে ঈষৎ গরম পানি অথবা ডেটল বা সেভলন মিশ্রিত পানি দিয়ে মুছে নিয়ে দুধ দোহন করা উত্তম।
- গাভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পালনের উদ্দেশ্যে গোশালার মেঝে পাকা করা প্রয়োজন। কারণ পাকা মেঝে সহজেই শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখা যায়। গোশালার মেঝে ও দেয়াল পানি মিশ্রিত জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।
- দুধের পাত্রগুলোতে যাতে ময়লা না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- দুধ দোহনের পরপরই ঢাকনাযুক্ত পাত্রে দুধ নিয়ে চলাচলে সুবিধার জন্য দুধে কলাপাতা, বাঁশপাতা, খেজুরপাতা ইত্যাদি দিয়ে রাখে। এসব পাতা পরিষ্কার না হলে দুধ দূষিত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- কীট-পতঙ্গ, বিশেষ করে মশা-মাছি নানারকম রোগ জীবাণু বহন করে রোগ ছাড়ায়। তাই গোশালায় মশা মাছির উপদ্রব্য যেন না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- গাভীর পরিচর্যাকারী ও দুধ দোহনকারীর উত্তম স্বাস্থ্যর অধিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ রোগাক্রান্ত পরিচর্যাকারী ও দুধ দোহনকারী দ্বারা সহজেই দুধের মাধ্যমে মানুষে ও সরাসরি গাভীতে রোগ জীবাণু সংক্রমিত হয়। এ কারণে দুগ্ধ খামারের নিয়োজিত দুধ দোহনকারীসহ সকল কর্মচারীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।
- দুধে সাধারণত পানি, গুড়া দুধ, ময়দা ইত্যাদি ভেজাল মিশানো হয়। তবে দুধে যে কোন ভেজাল মিশানো একদিকে যেমন দুধের গুণগতমান হ্রাস করে অন্যদিক দুধ দূষিত হয়।
- গাভীর খাদ্য ও পানি অবশ্যই উন্নতমানের হওয়া প্রয়োজন। কারণ খাদ্য ও পানির মাধ্যমে অনেক রোগ জীবাণু সংক্রমিত হয়।

১১.১.৫ দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতি

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধকে পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলা হয়। প্রধানত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

- ফুটন্ত দুধ সংরক্ষণ- দুধকে ৪ ঘন্টা পরপর ২০ মিনিট করে ফুটালে দুধের প্রায় সব ধরণের জীবাণু ধ্বংস হয়। ফলে দুধ সংরক্ষণ হয়। তবে দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে এবং দুধের পুষ্টিমান কিছুটা হ্রাস পায়।
- রেফ্রিজারেটরে দুধ সংরক্ষণ- ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করলে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না। তবে দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙ্গে যায় ফলে দুধের গুণগত মান হ্রাস পায়।
- পাস্তুরীকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ- দুধের প্রায় সব ধরণের জীবাণু ধ্বংস হয় এবং পাস্তরাইজড করা দুধ সবচেয়ে অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায়।
- গুড়া দুধ করে সংরক্ষণ - দুধকে মেশিনের সাহায্যে শুকিয়ে গুড়া দুধ তৈরি করে বেশ অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতেও দুধের গুণগতমান কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়।
- রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে দুধ সংরক্ষণ- ০.০৫% হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দুধে মিশিয়ে দিলে দুধ ১৫-১৬ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। দুধ ফুটালে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিনষ্ট হয়ে যায়। দুধ ফুটিয়ে প্রায় ৭-৮ ঘন্টা পর্যন্ত রাখা যায়।

১১.২ বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

দুধ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাবার। ইহা সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর যা নিয়মিত পান করলে মেধা, মনন ও বল বৃদ্ধিসহ শারীরিক গঠন সুদৃঢ় হয়। শিশু, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক ও বৃদ্ধ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এটি আদর্শ খাদ্য। শিশুদের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। এটি সর্বজনস্বীকৃত এবং বিশ্বের সবদেশে এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি বয়সের সাথে সাথে গড়ে ওঠা শিশুর পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ও যেখানে মাতৃদুগ্ধের অভাব রয়েছে সেখানে এবং সেই সাথে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের চাহিদায় গবাদিপশুর দুগ্ধ প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে। দুধে রয়েছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ল্যাকটোজ যা শিশুর মস্তিষ্ক বর্ধণে সহায়তা করে থাকে। দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে ল্যাকটোজ নেই। জন্মের পর ছয়-সাত বছরের ভিতরেই মানব শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় ৯০% বর্ধন শেষ হয়ে যায়। তাই শিশু অবস্থায় দুধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া দুধে রয়েছে উন্নত মানের আমিষ যার মধ্যে সব অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বিদ্যমান থাকায় যে কোন আমিষের তুলনায় এটিকে শ্রেষ্ঠ আমিষ বলা যায়। উদ্ভিদ আমিষে লাইসিন, মিথিওনিন ও সিসটিনের অভাব রয়েছে বিধায় বাচ্চাদের সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত দুধ পান করানো উচিত। অনুরুপভাবে দুধের চর্বিতে অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিডসহ (লিনোলিক ও লিনোলেনিক এ্যাসিড) অন্যান্য ফ্যাটি এসিডগুলোও আছে। দুধের চর্বিতে প্রায় ৪০% অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং প্রচুর পরিমাণে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বিদ্যামান থাকার জন্য এটি গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগি ইত্যাদির মাংসের চর্বির তুলনায় প্রায় ৫০% নিরাপদ। তাছাড়া দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ। যার ফলে শিশুর সঠিক সময়ে দাঁত ওঠা, শরীরের অস্থির কাঠামো গঠন এবং বয়স্কদের অস্টিওপেরোসিস প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। রাত্রে ঘুমের আগে এক গ্লাস দুধ খেলে ভাল ঘুম হয় এবং হাইপারটেনশন কমাতে এটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন জাতের ভিটামিন যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া দুধে বিদ্যামান বিভিন্ন ধরণের বায়ো-এ্যাকটিভ উপাদান ও কনজুগেটেট লিনোলেনিক এসিড (CLA) যা মানব দেহে বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গবাদিপশুর মধ্যে আমাদের দেশে দুধের জন্য গাভী, মহিষ এবং ছাগল ও ভেড়া প্রসিদ্ধ। যদিও গবাদিপশুর জাত ও অবস্থান ভেদে দুধের উপাদান ভিন্ন হয় (Rahman et al. 2014), তবুও দুধে খাদ্যের সকল উপাদান সুষম অবস্থায় বিরাজ করায় এটিকে আদর্শ খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গাভী থেকে আমাদের দেশ থেকে সিংহভাগ দুধ সংগৃহীত হয়। গাভীকে মানব জাতির দুগ্ধমাতা বলা হয়। গাভীর দুধ থেকে পনির, মাখন, ঘি, কেক, বিস্কুট, পুডিং, মিষ্টি, সন্দেশ,

পায়েশ এবং আরও বহুবিধ সুস্বাদু খাবার তেরি করা যায়। ছাগলের দুধ সহজপাচ্য; বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী। ছাগল বাংলাদেশে গরীবের গাভী হিসেবে পরিচিত। দুঃস্থ মহিলা, বিত্তহীন, ভূমিহীন ও যাদের গাভী কেনার ক্ষমতা নেই তারা ছাগল পালন করে দুধের প্রয়োজন মেটায় অথবা দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাচ্চা প্রসবের পর থেকে ৩-৪ দিন পর্যন্ত উৎপন্ন পশুর দুধকে শালদুধ বা কলস্ট্রাম বলে। এতে খনিজ পদার্থ, ভিটামিন-এ ও রোগ প্রতিরোধক এন্টিবডি থাকে। স্বাভাবিক দুধের তুলনায় কলস্ট্রামে আমিষের পরিমাণ ৩-৫ গুণ, চর্বি প্রায় দ্বিগুণ এবং খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। তবে বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর সময়ের সাথে কলস্ট্রামের গঠন পরিবর্তিত হয়। মহিষের দুধে গরুর দুধ অপেক্ষা পানির পরিমাণ কম এবং চর্বির পরিমাণ বেশি। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য মহিষের দুধ থেকে ঘি, দধি, মাখন, পনির প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন পশুর দুধের মধ্যে সামান্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে গাভীর কলস্ট্রাম, দুধ এবং বিভিন্ন পশুর দুধের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সারণি ১১.১ঃ গাভীর করস্ট্রাম, দুধ এবং বিভিন্ন পশুর দুধে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানসমূহের হার।

বিভিন্ন পশুর দুধ	শুষ্ক পদার্থ (%)	আমিষ (%)	চর্বি (%)	শর্করা (%)	খনিজ ও অন্যান্য দ্রব্য (%)	পানি (%)
গাভীর কলস্ট্রাম	২৫.৯	১৭.৬	৫.১	২.২	১.০	৭৪.১
গাভীর দুধ	১২.৬	৩.৪	৩.৭	৪.৮	০.৭	৮৭.৪
ছাগলের দুধ	১৪.৩	৩.৭	৪.৮	৫.০	০.৮	৮৫.৭
মহিষের দুধ	১৫.৮	৩.৭	৬.৫	৪.৮	০.৮	৮৪.২

১১.২.১ বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের অবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশে দুধের পরিমাণগত উৎপাদন প্রায় ৭২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদিত এই দুধ প্রকৃত অর্থে একেবারেই অপ্রতুল এবং এ পরিমাণ দিয়ে দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির ব্যাপক চাহিদা পূরণ আদৌ সম্ভব নয়। এটা জনগণের চাহিদার (বার্ষিক ১৪৬.৯ লক্ষ মেট্রিক টন) মাত্র শতকরা ৪৯.৫ ভাগ। দুধ উৎপাদনের এই বিশাল ঘাটতি পূরণ করার জন্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঐকান্তিক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারণি ১১.২ঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন।*

ক্রমিক	বছর	দুধ উৎপাদন (লক্ষ টন)	ক্রমিক	বছর	দুধ উৎপাদন (লক্ষ টন)
১	২০০৪-০৫	২১.৪	৭	২০১০-১১	২৯.৫
২	২০০৫-০৬	২২.৭	৮	২০১১-১২	৩৪.৬
৩	২০০৬-০৭	২২.৮	৯	২০১২-১৩	৫০.৭
৪	২০০৭-০৮	২৬.৫	১০	২০১৩-১৪	৬০.৯
৫	২০০৮-০৯	২২.৯	১১	২০১৪-১৫	৬৯.৭
৬	২০০৯-১০	২৩.৭	১২	২০১৫-১৬	৭২.৭

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য।

জাতিসংঘের তথ্য মতে একজন মানুষের গড়ে প্রতিদিন ২৫০ মিলি লিটার দুধ প্রয়োজন, সেখানে আমাদের দেশের লোকেরা পাচ্ছেন গড়ে ১২৫.৬ মিলি লিটার মাত্র। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ১২৪.৪ মিলি/প্রতিদিন/প্রতিজন। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১ জন দারিদ্র সীমার নিচে আছেন যারা প্রতিদিন ২১০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করেন। আর এ ক্যালরির অধিকাংশই আসে উদ্ভিজ্জাত শর্করা থেকে। সুতরাং সহজভাবেই বোঝা যায়, যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছেন তারা সবাই এক রকম দুধ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। দুধ পানের ইচ্ছে থাকলেও তারা তা পাচ্ছেন না। আবার যারা দারিদ্র সীমার উপরে আছেন, তাদের অনেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দুধ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। তাই চাহিদা অনুযায়ী দুধের প্রাপ্যতা বাড়াতে বার্ষিক দুধের উৎপাদন আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

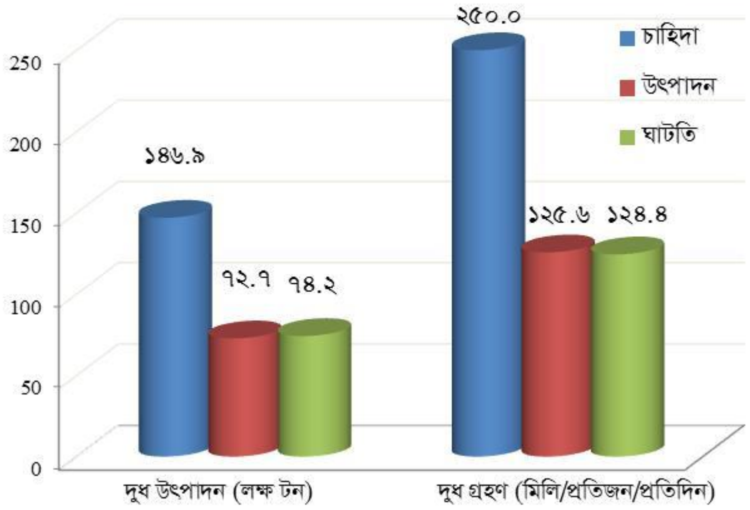

চিত্র ১১.২ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে দুধের চাহিদা, উৎপাদন ও ঘাটতি।

বাংলাদেশে দুধের পরিমাণগত উৎপাদন কম হওয়ার কারণে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আমদানি করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ১৬ টি দেশ থেকে ৫৭ হাজার ৫৩৭ মেট্রিক টন গুঁড়ো দুধ আমদানি করেছে (দৈনিক যুগান্তর, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪)। এই গুঁড়ো দুধের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করা হয় ভারত থেকে। অন্যান্য দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হল নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রেলিয়া।

১১.২.২ বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কতকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় একদিকে যেমন উৎপাদনকারী বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে ক্রেতা উচ্চমূল্যে ভেজাল দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ক্রয় করছে। এই সমস্যা দীর্ঘদিন পুঞ্জিভূত থাকার ফলে গবাদিপশু উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলশ্রুতিতে এখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়ছে না। অথচ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার একটি সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে ডেইরি শিল্প। প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে ১) দুধের অধিক উৎপাদন খরচ, ২) গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা কম, ৩) কাঁচা দুধের অপরিকল্পিত উৎপাদন ও ত্রুটিপূর্ণ বিপণন ব্যবস্থা, ৪) অবিকশিত দুগ্ধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ৫) গাভীর মারাত্মক রোগ বালাই ও প্রজনন ক্ষমতা এবং ৬) জনগণের দুধ পানের অনভ্যাস অন্যতম।

দুধের উৎপাদন খরচ: দুধের উচ্চ উৎপাদন খরচের প্রধান কারণ হচ্ছে গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন কম এবং গাভীর দুধ উৎপাদনের তুলনায় গো-খাদ্যের খরচ বেশি। অধিক দুধ উৎপাদনের প্রথম ও প্রধান শর্তই হচ্ছে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের যোগান। সুষম খাদ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে গ্রামীণ পর্যায়ে নিম্ন আয়ের কৃষক গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হিসাবে খড়কেই বেছে নিয়েছেন, যদিও পুষ্টিমানের বিবেচনায় খড়ে তেমন কিছু নেই বললেই চলে। সুষম খাদ্যের অপর্যাপ্ততা তাই দুগ্ধ উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। এদেশে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা মেটাতে আবাদী জমি হিমসিম খেলেও সুষম পশুখাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে অধিক পরিমাণে গো-খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে যদিও আপাত দৃষ্টিতে তা হাস্যকর মনে হয়। জনবহুল এদেশের মানুষের খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে পোল্ট্রি শিল্পের পুষ্টি হিসেবে যেমন প্রতিমাসে ৫০-৬০ হাজার টন ভুট্টা ব্যবহার হচ্ছে তেমনি দুধের বিকল্প হিসেবে প্রতি বছর ৪০ হাজার মেট্রিক টন

গুঁড়ো দুধ আমদানিতে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় না করে তা গো-খাদ্য উৎপাদনে ব্যয় করলে দেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। আবাদী জমিতে গো-খাদ্য উৎপাদন তাই মানুষের খাদ্য উৎপাদনের পরিপূরক। এজন্য ঋতুভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গো-খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ করলে পশুখাদ্যের পাশাপাশি মানুষের খাদ্যজনিত সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। উপরন্তু দেশের মানুষের প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে গবাদিপশুর উন্নয়নে আবিস্কৃত লাগসই প্রযুক্তি ও কৌশল সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন- খাদ্যে প্রোবায়োটিক, এনজাইম, ইষ্ট এর ব্যবহার, ইউরিয়া ও মোলাসেস সহযোগে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি, মিল্ক রিপ্লেসার ব্যবহার, কম্পিউটার গ্রোথ মনিটরিং প্রোগ্রাম এর ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়াও এদেশে পোল্ট্রির মত গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক ফিড মিল স্থাপনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারকে বিনা শুল্কে খাদ্য তৈরির কাঁচামাল ও মাইক্রো উপাদান আমদানি অনুমোদন ও সহযোগিতা দেয়াসহ শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধার মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে। এদেশে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন যে পরিমাণ কিচেন বাই প্রোডাক্ট ফেলে দেয়া হচ্ছে তা প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন পশুখাদ্যে রুপান্তর করা সম্ভব।

গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা ও ব্রিডিং পলিসি: সার্বিকভাবে বাংলাদেশে গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কম। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত গো-প্রজনন কর্মসূচি পরিচালিত হলেও সার্বিকভাবে দেশের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং গাভী প্রতি দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে তার ফলাফল আশানুরুপ নয়। শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় মিল্কভিটা এবং বেসরকারি উদ্যোগে ব্র্যাকসহ আর দু-একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে কাজ করছে সেখানে কিছুটা উন্নয়নের ছোঁয়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান গাভীর জাত উন্নয়নে Open Nucleus Breeding System (ONBS) মডেল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও দেশীয় জাতের উন্নয়ন এবং গাভীর বিভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করলেও মাঠপর্যায়ে এ সমস্ত বিষয়ের বাস্তবায়ন কল্পনায়-ই রয়ে গেছে। গো-প্রজনন কর্মসূচি সফল না হওয়ার পিছনে কারণগুলো হল ১) প্রজননে ব্যবহৃত ষাঁড় তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের (বকনার) দুধ উৎপাদন ক্ষমতার জন্য পরীক্ষিত নয়, ২) কৃত্রিম প্রজননে সরকারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় খামারি তার পছন্দমত ষাঁড়ের বীজ পাচ্ছেন না এবং ৩) কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির সাথে সেবামূলক ভেটেরিনারি সার্ভিস যুক্ত না থাকায় খামারিরা এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন না। সুতরাং সরকারের পাশাপাশি আরও বেসরকারি সংস্থার জবাবদিহিতার ব্যবস্থাসহ ব্যক্তিমালিকানাধীন কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন যাতে গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষকের চাহিদা অনুসারে জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে সকল সিমেন যথাযথ ভেটেরিনারি পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহৃত হতে হবে এবং সিমেন বাহিত কোন রোগ দেখা দিলে তা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম প্রজননকারী সংস্থাকে অর্থ ভর্তুকি দিতে হবে। পৃথিবীর উন্নত দেশে এ নিয়মই প্রচলিত। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে জেনেটিক ফার্ম ও সিমেন ব্যাংক গড়ে তোলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তাকে বিনাশুল্কে তরল নাইট্রোজেন ও সিমেনসহ প্রয়োজনে বিশুদ্ধ জাতের গাভী আমদানিতে সহায়তা দিতে হবে। এ ফার্মের উদ্দেশ্য হবে অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য উন্নত ষাঁড়ের সিমেন উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ। জেনেটিক ফার্মে উৎপাদিত বকনা বাছুর সমূহ জেলা পর্যায়ে গড়ে উঠা ডেইরি ফার্মে বাজারজাত করার সম্ভাবনাও থাকবে। সিমেন ব্যাংক তার নিজের কর্মীর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে গাভীর সংখ্যা, বয়স, জাত প্রভৃতি সমন্বয়ে ডাটা বেইজ তৈরি করবে। এলাকাভিত্তিক ডাটা বেইজ এর ভিত্তিতে সিডিউল অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পের মাধ্যমে Synchronization of Estrus and Artificial Insemination বা কৃত্রিম প্রজনন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের গাভীর জাত উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। এতে করে একদিকে যেমন কৃষক সহজেই ও বিনা ধকলে সেবা পাবে, অন্যদিকে সিমেন ব্যাংকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

কাঁচাদুধের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা: গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এবং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমাদের দেশে অনেক কৃষকই তাদের উৎপাদিত দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য (যেমন কাঁচা দুধ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যে তাৎক্ষণিকভাবে মধ্যস্থতাকারী ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় (Ghosh and Maharjan 2002)। ফলে উৎপাদনকারীর চেয়ে মধ্যস্থতাকারীরা বেশি লাভবান হচ্ছে। এসকল

ভ্রাম্যমান ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা অনেক কম দামে ক্ষেত্র বিশেষে বাকিতে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে দুধ ক্রয় করে অনেক বেশি দামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করছে। অথচ উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা থাকলে কৃষকরা পণ্যের সঠিক মূল্য পেত এবং বেশি লাভবান হয়ে গবাদিপশু পালনে বেশি উৎসাহ পেত। আবার দুগ্ধ উৎপাদনে স্থানীয় চাহিদার সাথে উৎপাদনের ভারসাম্য না থাকায় বিকৃত বাজার ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র এদেশে বিরাজ করছে। এদেশে দুধে ফরমালিন মেশানোর ঘটনাই প্রমাণ করে উৎপাদনের সাথে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতা এবং বিকৃত বাজার ব্যবস্থাপনা। অথচ এদেশে লক্ষ লক্ষ শিশু পর্যাপ্ত দুধের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভূগছে। দুধ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন স্বাস্থ্যসন্মত ব্যবস্থাপনা না থাকায় তা জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি স্বরুপ। এক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে চাহিদা মোতাবেক চিলিং স্টেশন গড়ে উঠার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। দুধ হতে দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন- দই, ঘি, মাখন, রসগোল্লা, পনির ইত্যাদি তৈরি করার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে 'সম্পদ ব্যক্তি' তৈরি করা যেতে পারে। সম্পদ ব্যক্তির কাজ হবে অতিরিক্ত দুধ খামারির কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে দুগ্ধজাত দব্য তৈরি করে শহরাঞ্চলে নির্দিষ্ট দোকানে সরবরাহ করা। অবিক্রিত দুধ হতে ক্রিম সেপারেটর মেশিনের সাহায্যে ক্রিম আলাদা করে সহজেই সংরক্ষণ করা যেতে পারে। দুধ হতে ক্রিম পৃথক করার পর অবশিষ্ট দুধ ফ্যাট ফ্রি দুধ হিসেবে বিক্রি অথবা বাছুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দুধে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা: দুগ্ধ উৎপাদনে স্থানীয় চাহিদার সাথে উৎপাদনের ভারসাম্য না থাকায় বিকৃত বাজার ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র এদেশে বিরাজ করছে। এদেশে দুধে ফরমালিন মেশানোর ঘটনাই প্রমাণ করে উৎপাদনের সাথে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতা এবং বিকৃত বাজার ব্যবস্থাপনা। অথচ এদেশে লক্ষ লক্ষ শিশু পর্যাপ্ত দুধের অভাবে পুষ্টিহীনতায় ভূগছে। দুধ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন স্বাস্থ্যসন্মত ব্যবস্থাপনা না থাকায় তা জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি স্বরুপ। দুধ যদিও বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্থদের জন্য অতি আবশ্যকীয় পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও আদর্শ খাদ্য তথাপি দুধে ভেজাল মিশ্রণ করার প্রবণতা অত্যধিক বেশি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ সম্ভবত এটি মূল্যবান, এর চাহিদা ব্যাপক এবং এর সাথে ভেজাল মিশ্রণ করা অতি সহজ বলেই অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের ভেজাল মিশিয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত যে সমস্ত ভেজাল মিশ্রণ করা হয় তা হচ্ছে- ১) পানি, ২) সোডিয়াম-বাই-কার্বোনেট, ৩) লবণ, ৪) গোল আলু, মিষ্টি আলু বা অনুরূপ শর্করা জাতীয় খাদ্যের রস, ৫) ফরমালিন, ৬) চিনি এবং সম্ভবত আরো কিছু সামগ্রী যেগুলোর বিষয়ে অদ্যাবধি জানা যায়নি। দুধের থেকে ফ্যাট তুলে নেয়া, পানি মিশিয়ে পরিমাণ বাড়ানো, ফরমালিন মিশিয়ে দুধের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত করা এবং এসব অপকর্ম করার পর দুধকে প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে বিপণনের উদ্দেশ্যে ভোক্তাদের প্রতারিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের ভেজাল (এমনকি মারাত্মক বিষাক্ত ফরমালিনসহ) মিশ্রণের ব্যবসা সম্ভবত সারা দেশব্যাপিই চালু রয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উদ্বেগজনক।

দুগ্ধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প: আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে দেশে বাণিজ্যিকভাবে দুগ্ধ সংরক্ষণের সম্ভাবনার দ্বার এমনকি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্যও উন্মোচিত হয়েছে (Hamid and Hossain et al. 2014)। দুগ্ধ সংরক্ষণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে সংগঠিতভাবে দুধ সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং টেষ্টিং সুবিধাদিসহ চিলিং প্লান্ট স্থাপন করতে হবে। মিল্ক চিলিং প্লান্টে ঠান্ডা দুধ সরবরাহের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা স্থাপন এবং উক্ত প্লান্ট থেকে বড় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সরবরাহের জন্য রেফ্রিজারেটেড ভ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত দুধ পাওয়া যায় এমন সব এলাকায় দুগ্ধ চিলিং ইউনিটগুলো স্থাপন করতে হবে। প্রধান প্রধান দুগ্ধ উৎপাদন অঞ্চলগুলোতে সমবায়ের মাধ্যমে তরল দুধ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দেশে দুগ্ধ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র খামারে এই ব্যবসা পরিচালিত হয় এবং স্বল্প পরিসরে বিচ্ছিন্নভাবে খামার পরিচালনার কারণে দুধ সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, গ্রামীণ সমবায়ীদের প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা ইতিমধ্যে সমবায়ীদের সংগঠিত করে দুগ্ধ সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে পুষ্টিকর স্বাস্থ্যসন্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য সরবরাহের একটি অবকাঠামো সার্থকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে (Haque 2007)। মিল্কভিটা অঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র কৃষকরা স্থিতিশীল বাজার মূল্যে কাঁচাদুধ বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা পাচ্ছেন এবং শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসন্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য সহজেই পাচ্ছেন। তাই পল্লী অঞ্চলে ডেইরি ভিলেজ স্থাপন করে মিল্ক চিলিং সেন্টার স্থাপন করা গেলে ডেইরি সেক্টর একটি লাভজনক শিল্প হিসাবে রুপ নিবে

(Ghosh and Maharjan 2001)। আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং অনুন্নত গ্রামীণ অবকাঠামোর জন্য দুধ সংরক্ষণ করা খুব কঠিন। এসব অসুবিধার জন্য সাধারণত বিপুল পরিমাণে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। এতে খামারিরা আর্থিকভাবে দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। দুধ সংক্ষণের জন্য ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ পদ্ধতিটি দুধে জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধের সংরক্ষণকালের উন্নয়ন ঘটায়। তাছাড়া, এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারি বিশেষত মহিলা যারা মূলত গবাদিপশু লালন-পালন করেন তারা আর্থিকভাবে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দুধ সংরক্ষণের এই পদ্ধতিটি দেশে চালু হলে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্পন্ন দুধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাবে। ফলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি, ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ পদ্ধতি অনুসরণ করে দুধের পচনরোধের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হবে।

গাভীর রোগবালাই ও প্রজনন ক্ষমতা: গাভীর প্রজনন ক্ষমতা কম থাকার কারণ মূলত ৩টি: পুষ্টিহীনতা, জননতন্ত্রের রোগ এবং কৃত্রিম প্রজনন অব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে গো-খাদ্যের প্রচুর ঘাটতি আছে। সনাতন পদ্ধতিতে খড় ও খৈল-ভূষি খাইয়ে গরু পালন করা হয়। উন্নত পুষ্টিমানসহ খড় উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর কোন ব্যাপক কর্মসূচি যেমন নেই তেমনি দানাদার খাদ্যের উচ্চমূল্য ও ভেজাল সমস্যা আছেই। বাছুরের পুষ্টিহীনতার ফলে বিলম্বে যৌবন প্রাপ্ত হওয়া একটি বড় সমস্যা। বাছুরের পুষ্টিহীনতার আর একটি বড় কারণ কৃমির আক্রমণ ও শৈশবকালীন রোগবালাই। কৃমির আক্রমণে গাভীর উৎপাদন এবং প্রজনন ক্ষমতাও বাধাগ্রস্থ হয়। তাই বয়সভিত্তিক বাছুরের খাদ্য চাহিদা ও খাদ্য পদ্ধতির উপর গবেষণাসহ কৃমির আক্রমণ থেকে বাচার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃমির প্রাদুর্ভাব ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের গবেষণা ফলাফল পর্যালোচনা করে কৌশলগত ও সমন্বিত কৃমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জননতন্ত্রের রোগের জন্য গাভী সঠিক সময়ে গরম হয় না এবং নির্ধারিত সময়ে (প্রতিবছর) বাচ্চা দেয় না। আবার অনেক সময় গরম হলেও পাল রাখে না। জননতন্ত্রের রোগ প্রতিরোগ প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি কার্যকর। তাই অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজননের সাথে প্রতিরোধক ভেটেরিনারি সেবা চালু করা প্রয়োজন।

জনগণের দুধ পানের অভ্যাস: গ্রামীণ সাধারণ জনগণের অবাধ দুধ পানের সচেতনতার অভাবে দুধের স্থানীয় বাজার সৃষ্টি না হওয়ায় শহরাঞ্চলের বাহিরে দুধের দাম অস্বাভাবিকভাবে কম থাকে। হিসাবকৃত চাহিদার সাথে প্রকৃত স্থানীয় চাহিদার ভারসাম্য না থাকায় এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অনেক কৃষকই উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যে মধ্যস্থতাকারীর কাছে কাঁচা দুধ বিক্রি করে গাভী পালনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এখানে উল্লেখ্য যে গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রায়ই দুধ বিক্রি করে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করে থাকেন। তাই দুধ সংরক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় বাজার সৃষ্টির জন্য দুধের পুষ্টিগুণ তুলে ধরে জাতীয় গণমাধ্যমসহ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন যাতে সাধারণ জনগোষ্ঠী তামাকজাতীয় দ্রব্য পরিহার করে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলে। এতে জাতির মেধা, মনন ও বল বৃদ্ধিসহ শারীরিক গঠন যেমন সুদৃঢ় হবে তেমনি দুধের স্থানীয় চাহিদা ও বাজার সৃষ্টির কারণে শহর ও গ্রামের দুধের দামের মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসবে।

১১.২.৩ বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সম্ভাবনা

দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে সম্ভাবনা
➢ দেশে এবং বিদেশে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ➢ গ্রামীণ পর্যায়ে প্রচুর দক্ষ জনশক্তি ও কৃষকদের দুগ্ধ উৎপাদনে আগ্রহ বিদ্যমান। ➢ গবাদিপশু লালন-পালন উপযোগী পর্যাপ্ত খাস জমি সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের সুযোগ। ➢ উপকূলীয় চরাঞ্চলে স্বল্প খরচে মহিষের লালন-পালন সুবিধা। ➢ সরকারের বাজেটে দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ রাখার সুযোগ। ➢ দাতা সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করার সুযোগ। ➢ গ্রামীণ কৃষকদের উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাতকরণের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য এনজিও'র সাথে মিল্ক ভিটার কার্যক্রমের সমন্বয়ের সুযোগ।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের দুধ উৎপাদন ছিল গৃহস্থালী ভিত্তিক একটি কর্মকান্ড। বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদন এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ বেশ বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্ভাবনাময় খাত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। কৃষি প্রধান এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ লোকের আবাদী জমি না থাকায় মৎস্য বা ফসল আবাদের কোন সুফল ভোগ করতে পারছে না। দুগ্ধ উৎপাদন তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। দুগ্ধ উৎপাদন কৃষির এমন একটি খাত যার মাধ্যমে ছোট বড় সকল শ্রেণীর কৃষকই উপকৃত হতে পারেন। ফলে পশুপাখি পালনই তাদের একমাত্র উপযোগী কৃষি খাত।

১১.২.৪ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের করণীয়

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ বছরের তথ্যানুযায়ী আমাদের দেশে মোট গরু-মহিষের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৫২ লক্ষ। এর মধ্যে প্রজননক্ষম গবাদিপশুর সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ। মোট গবাদিপশুর এর শতকরা ২৭-৩০ ভাগ দুগ্ধবতী গাভী ধরলে দেশে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্য প্রায় ৭০ লক্ষ। দেশে বেশি ও কম দুধ দেয়া উভয়ই প্রকৃতির গাভী আছে। তবে বেশি দুধ দেয়া গাভীর সংখ্যা অনেক কম। এক গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশের প্রতিটি গাভী গড়ে প্রতিদিন দুধ দেয় প্রায় ৩.৮২ লিটার। আর এই দুধ উৎপাদনের মেয়াদকাল হয়ে থাকে গড়ে প্রায় ২৭২ দিন। বিশেষণটি হল ৭০ লক্ষ টি গাভী × ৩.৮২ লিটার দুধ/দিন/গাভী × ২৭২ দিন বছরে = ৭২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন প্রতি বছর। কিন্তু আমাদের দুধের চাহিদা পূরণ করতে হলে বছরে প্রায় ১৪৬.৯ লক্ষ মেট্রিক টন প্রয়োজন। তাহলে এক্ষেত্রে বছর বিয়ানো ৭০ লক্ষ গাভী দিয়ে যদি এই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়, তবে এই গাভীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন গড়ে ৭.৭ লিটার করে দুধ দেয়ার উপযোগী হতে হবে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশের গাভী একবার বাচ্চা দেয়ার পর পুনরায় বাচ্চা দিতে সময় নেয় অনেক বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫৪০ দিন। তাই এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দুধ উৎপাদন মাত্রা গাভীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না বরং নানাবিধ মৌলিক ফ্যাক্টরসমূহের উপর তা নির্ভরশীল-

- গাভীর গুণগতমান অর্থাৎ গাভীর রক্তে শতকরা কত হারে গুণগত মানসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে তা মূল্যায়ন।
- পর পর ২ বাচ্চা প্রসবের মধ্যবর্তী সময়কাল বা কাভিং ইন্টারভাল।
- দুগ্ধদানকাল বা ল্যাক্টেশান পিরিয়ডের মোট সময়কাল।

বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উপরোক্ত বিষয়াবলীকে কিভাবে কারিগরি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে এনে দুধ উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে সে বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এজন্য অবশ্যই দক্ষ জনবল দরকার। এবিষয়ে করণীয় ব্যবস্থাদির বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে-

- উৎপাদনশীল প্রতিটি গাভীর উৎপাদনশীলতার তথ্য সংরক্ষণ। তথ্য সংগ্রহকারী, সংরক্ষণকারী ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেকটি গাভীর নম্বর প্রদান করে তার তথ্য সংগ্রহ এবং কম্পিউটারভূক্ত করে নিয়মিতভাবে সে সব বিশ্লেষণ।
- উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে গাভীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখা ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- গাভীর দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য এদের প্রত্যেকের সঠিক দৈহিক ওজন নির্ণয় বিশেষ জরুরি। পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস চাষ ও সরবরাহ এবং দানাদার খাদ্য সঠিক ফর্মূলায় প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে। যদি কাঁচা ঘাস অপর্যাপ্ত হয় তাহলে পুষ্টি বিজ্ঞানীর সহায়তা নিয়ে সুষম খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- খামারের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ। যথা- ক) গাভীর বাসস্থান স্বাস্থ্যসম্মত করতে হবে; খ) গাভীর গর্ভধারণ (ফার্টিলিটি) বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা ও তা সঠিকভাবে প্রয়োগ; গ) ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রায়োগিক কৌশল অবলম্বন; ঘ) দুগ্ধ গ্রন্থির উৎকর্ষতা সাধনের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা ও তার যথাযথ প্রয়োগ; ঙ) ওলান ও জরায়ুর পূর্ণ গঠণের বিষয়ে প্রকৃত ব্যবস্থা নেয়া; চ) নিরাপদ দুগ্ধদান নিশ্চিতকরণ। দোহনকালে গোয়ালাকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি ও আনুষাঙ্গিক সকল নিয়ম পালন করতে হবে; ছ)

বাছুরকে দুধপানের সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে দেয়া এবং জ) খামারের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা প্রতিপালনের জন্য বিশেষভাবে তৎপর থাকা।

- রোগব্যাধির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা এবং এসব প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সময়ানুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ। কর্মসূচি অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ভ্যাকসিন প্রদান এবং প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব দূর করার ব্যবস্থা নেয়া। জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে- ক) ওএনবিএস, (Open Nucleus Breeding System) বা ওএনসিএস (Open Nucleus Crossing System) সহ সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে ষাঁড়ের জাত উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে হিমায়িত বীজ উৎপাদন করে তার ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; খ) একই পদ্ধতি অবলম্বন করে পরবর্তী প্রজন্মের গাভীর জাত উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা সাধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা; গ) উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ উৎপাদন ও এর ব্যাপক ব্যবহার; ঘ) তরল বীজের পরিবর্তে হিমায়িত বীজ ব্যাপকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা; ঙ) হিমায়িত বীজ উৎপাদনকারী ও এজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করা; চ) এম্ব্রায়ো বা ভ্রূণ প্রতিস্থাপন বিষয়ে প্রকৃত ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ; ছ) ভ্রূণ ছেদন ও সংখ্যায় বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তার ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। ডেইরি সেক্টরকে দ্রুত অগ্রসরমান হতে হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদেরকে সক্রিয় হতে হবে এবং এক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরো বিস্তৃত করতে হবে।

১১.৩ দুগ্ধ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে দুধ উৎপাদন করা হয়। এর পর দুধ উৎপাদনের স্থান হতে সংগ্রহ করে ও পরিবহনের মাধ্যমে বিভিন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ও বিপণনের জন্য আনা হয়, যা দ্বারা ভোক্তাদের চাহিদা মিটানো হয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এবং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক কৃষকই তাদের উৎপাদিত দুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যে তাৎক্ষণিকভাবে মধ্যস্থতাকারী ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয় (Ghosh and Maharjan 2002)। ফলে উৎপাদনকারীর চেয়ে মধ্যস্থতাকারীরা বেশি লাভবান হচ্ছে। এসকল ভ্রাম্যমান ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা অনেক কম দামে ক্ষেত্র বিশেষে বাকিতে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে দুধ ক্রয় করে অনেক বেশি দামে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করছে। বাংলাদেশে দুধ বিপনণের চ্যানেলসমূহ দেখানো হল-

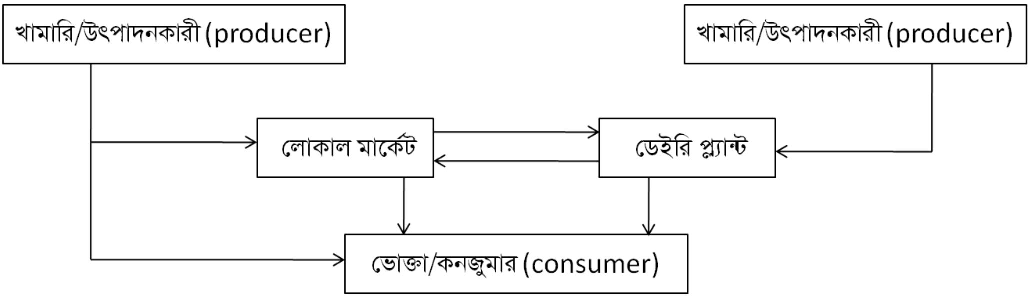

চিত্র ১১.৩ঃ বাংলাদেশে বর্তমান দুধ বিপণন চ্যানেল।

দুধ একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ খাদ্য হওয়ায় জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য এটি একটি উপযুক্ত মিডিয়া হিসাবে কাজ করে। তাই সঠিকভাবে দুধ দোহন, সংরক্ষণ এবং পরিবহন দুধের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুইভাবে দুধকে পরিবহন করা যেতে পারে যথা- মিল্ক ক্যানের সাহায্যে ও ট্রাক ট্যাংকের সাহায্যে। সকল খামারিদেরকে এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানা এবং মেনে চলা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ে সমবায় ভিত্তিতে চাহিদা মোতাবেক চিলিং স্টেশন গড়ে উঠার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

১১.৩.১ বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলসমূহের উৎপত্তি

গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করে মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ১৯৩৩ সালে তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের ভাইস রয় লর্ড লিনলিথগো উত্তর পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল থেকে কিছু হারিয়ানা ষাঁড় সংগ্রহ করে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। সেই থেকে বর্তমান বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের সূচনা। সেসব অঞ্চলে বিতরণকৃত হারিয়ানা ষাঁড়ের সাথে দেশীয় গাভীর মিলনের ফলে জেনেটিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুধ উৎপাদন ও পশুর আকার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর ভারত থেকে হারিয়ানা ষাঁড় প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। এজন্য সিলেট ও তেজগাঁয়ে অবস্থিত দু'টি গবাদিপশুর খামারকে প্রজনন খামার হিসেবে রুপান্তর করা হয়। এসব খামারে পাকিস্তান থেকে যথাক্রমে বস ইন্ডিকাস (*Bos indicus*) জাতের সিন্ধি, শাহীওয়াল, থারপারকার গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। খামার দু'টি থেকে উৎপাদিত ষাঁড়গুলো দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য বিতরণ করা হয়। পূর্ব থেকে অবস্থিত হারিয়ানা জাতের সাথে পরবর্তীতে আমদানিকৃত সিন্ধি, শাহিওয়াল ও থারপারকার জাতের শংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বস ইন্ডিকাস (*Bos indicus*) জাতের পশু দৈহিক আকারে অধিক বড় ও শক্তিশালী হয় এবং দুধ উৎপাদন অরো বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে অনুদান হিসাবে ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি জাতের ১২৫ টি গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর মিলন ও উৎপাদিত শংকর জাতের গবাদিপশুর উৎসাহ ব্যঞ্জক ফলাফলের ভিত্তিতে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে সমগ্র দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে যে সমস্ত এলাকার গরু পূর্ব থেকেই কিছুটা উন্নত হয়েছিল, যেখানে চারণভূমি ও কাঁচা ঘাস পাওয়া যেত এবং যেখানে দুধ বাজারজাতকরণের সুব্যাবস্থা বিদ্যমান সে সমস্ত এলাকা দুগ্ধ উদ্বৃত্ত বা মিল্ক পকেট অঞ্চলে পরিণত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মিল্ক পকেট অঞ্চলগুলোর মধ্যে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, চট্রগ্রাম উল্লেখযোগ্য (গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫ নং অধ্যায়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে)।

১১.৩.২ বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধ বাজারজাতকরণের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে কারখানাভিত্তিক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৪৬ সালে। পাবনা-সিরাজগঞ্জ জেলায় নামমাত্র মূল্যে দুধ বিক্রয় হতো, সেহেতু দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা কলকাতা-কে মার্কেট হিসাবে চিহ্নিত করে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন কোম্পানী' নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার অভিপ্রায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ী মোহনপুর এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করার জন্য মেশিনারীজ নিয়ে আসে। কারখানার স্থাপনা কার্যক্রম শুরু হলেও দেশ বিভক্তির কারণে ১৯৪৭ সালে এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে জনাব মুখলেছুর রহমান তাঁর নিজস্ব সম্পদ বিনিময় সূত্রে কারখানাটির মালিকানা গ্রহণ করেন। কারখানাটির নাম পরিবর্তন করে 'ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডাক্টস' দেয়া হয় এবং স্থাপনা কাজ ১৯৫২ সালে সমাপ্ত করা হয়। কারখানা হতে তখন দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে কলকাতা শহরে স্বল্প পরিসরে কিছু দিন মিল্ক ভিটা নামে বাজারজাত করা হতো ।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায় ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পুরানো নাম সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় 'ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ'। প্রাথমিকভাবে সমবায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক উক্ত কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। একই সময়ে আর্থিকভাবে দেউলিয়াত্বের কারণে ঢাকার তেজগাঁতে 'অষ্টো ডেইরি' নামে বোতলজাত দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সমবায় মার্কেটিং সোসাইটির প্রতিষ্ঠান দু'টোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠান দু'টি সীমিতভাবে কিছুদিন উৎপাদন ও বিপণন কর্মকান্ড পরিচালনা হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে কারখানা দু'টোর উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণীর মধ্যে নিরপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের 'আমূল' পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপনের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'র সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাস্ট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দু'টির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত মৌলিক দু'টি আদর্শের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয় এবং পুরাতন নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' বা মিল্ক ভিটা নামকরণ করা হয়। এই মিল্ক ভিটার ভিশন হল 'দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা'। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ২৫ টি জেলায় কর্মযোগ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারা দেশ ব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে।

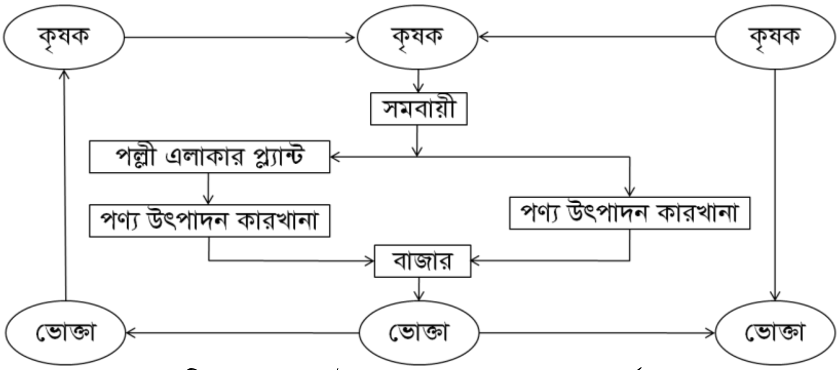

চিত্র ১১.৪ঃ দুধ উৎপাদনে কৃষক ভোক্তার সম্পর্ক।

সার্বিক বিশ্লেষণ: সমবায় পদ্ধতিতে দুগ্ধ বাজারজাতকরণে উদ্দেশ্য হল- মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণী কর্তৃক নিগৃহীত দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়'এর মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত মিল্ক ভিটা সরকারের আর্থিক সহযোগিতা কর্মকান্ড সুদৃঢ় করছে। তাই দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও অল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো বিস্তৃর্ণ করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখছে। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক সেতুবন্ধন। তাই মিল্ক ভিটার ন্যায় সারা দেশের দুগ্ধ উৎপাদন এলাকায় সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১১.৪ বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন

মানুষের খাদ্য উৎপাদনে গবাদিপশুর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, মাংস পৃথিবীর সব মানুষেরই অন্যতম প্রধান খাদ্য যা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া তথা গবাদিপশু থেকেই পাওয়া যায়। তবে হাঁস-মুরগিও আমাদের মাংস সরবরাহ করে থাকে। মাংস আমিষ জাতীয় খাদ্য। মানবদেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনের জন্য আমিষজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশে আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব প্রকট। এ অভাব দূরীকরণের জন্য গৃহপালিত পশুপালনে আমাদেরকে যত্নশীল হতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন পশুপালনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

১১.৪.১ মাংসের পুষ্টি

মাংস উচ্চমান সম্পন্ন সহজপাচ্য পুষ্টির উৎস। এতে বিভিন্ন পুষ্টি সাম্যাবস্থায় আছে। প্রতিদিন খাবারে ১০০ গ্রাম রান্না মাংস সরবরাহ করলে দিনের প্রয়োজনীয় আমিষ পাওয়া যায় এবং প্রায় ২০০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। গরু, ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য মাংসের তুলনায় মুরগির মাংসের গুণাবলী অনেক উন্নত মানের। মুরগির মাংসকে সাদা মাংস হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুরগির মাংসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অল্প পরিমাণে চর্বি থাকে যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

মাংসের আমিষ: মাংসে অপরিহার্য এমাইনো এসিডের পরিমাণ দ্বারা আমিষের পুষ্টির মান ধার্য করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, খাদ্য তালিকায় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংস সরবরাহ করা হয় তখন এর আমিষ অন্য কোন প্রতিস্থাপনার আমিষ ছাড়াই বর্ধন ও শরীর বৃদ্ধিতে কাজ চালাতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকা উচিত তা পূরণ করার জন্য মাংসে পর্যাপ্ত পরিমাণ আবশ্যকীয় এমাইনো এসিড আছে। রান্না করার ফলে খুব অল্প পরিমাণ এমাইনো এসিড ক্ষতি হয়।

মাংসের শর্করা: মাংসের যে শর্করা থাকে মূলত গ্লাইকোজেন। ইহা প্রধানত যকৃতে সঞ্চিত থাকে। দেহের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন অর্ধেক থাকে যকৃতে এবং বাকি অর্ধেক থাকে মাংস ও রক্তে।

মাংসের চর্বি: বিভিন্ন প্রজাতির চর্বিতে বিভিন্ন রকম পলি সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে যা মানবদেহের অপরিহার্য ফ্যাটি এসিডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন এ, ডি, ই এবং কে এর বাহক এবং দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। একই প্রাণির অথবা একই টুকরার বিভিন্ন রকম অংশে চর্বির পরিমাণ বিভিন্ন হয়। মাংসের চর্বি সহজপাচ্য এবং ৫০% শক্তি সরবরাহ করতে পারে। এছাড়া চর্বি মাংসের স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করে।

মাংসের খনিজ পদার্থ: মাংসের খনিজের উপর পরীক্ষা চালাতে গেলে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাংস ঠান্ডা করলে বা প্রক্রিয়াজাত করলে খনিজ এর গুণাগুণ বা পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। ভাল পুষ্টির সাথে যে সকল খনিজ পদার্থ থাকে বা থাকা প্রয়োজন তার সবই মাংসে বিদ্যমান। তাছাড়া মাংস লৌহের একটি উত্তম উৎস যা লোহিত রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে।

সারণি ১১.৩ঃ বিভিন্ন প্রজাতির মাংসের পুষ্টিমান।

পুষ্টি উপাদান	গরু	ছাগল	ভেড়া	মহিষ
পানি (%)	৭৪	৭৪	৭৫	৭৯
আমিষ (%)	২২	২২	২১	১৯
চর্বি (%)	৩	৩	৩	১
খনিজ (%)	১	১	১	১
ভিটামিন এ (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)	২০	১০	১০	- -
ভিটামিন সি (মাইক্রোগ্রাম/১০০ গ্রাম)	১৫০০	- -	১০০০	- -
ভিটামিন ই (মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম)	৪০০	৫০০	৫০০	- -

এই সারণির তথ্যাদি ভেড়া পালন ম্যানুয়াল থেকে নেয়া হয়েছে (বিএলআরআই ২০০৪)।

১১.৪.২ বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা

প্রাচীনকাল থেকেই গবাদিপশুর মাংস মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। আদিম গুহাবাসী মানুষ বেচে থাকার জন্য যেসব খাদ্য গ্রহণ করত তার মধ্যে মাংসই প্রধান ছিল। তারা অবশ্য ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাংস ভক্ষণ করত। এ যুগে ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়াও মাংসের পুষ্টিগুণের জন্য খাদ্য হিসেবে এটি গ্রহণ করা হয়। এটি উৎকৃষ্ট আমিষ ও খেতে সুস্বাদু যা দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও দেহ গঠনে সহায়তা করে। টাটকা মাংসে ১৫-২০% আমিষ থাকে। এতে অতি প্রয়োজনীয় সকল এমাইনো এসিড বিদ্যমান। মাংসের সঙ্গে লাগানো চর্বি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। মাংস খনিজ পদার্থের উৎস। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে যা দাঁত গঠনে সহায়ক কোষের অভ্যন্তরে ঢুকে তাতে রক্তের ক্ষারতা স্থিতিশীল করে এবং স্নায়ুশক্তি যোগায়। মাংসে লোহা থাকে যা রক্তশূন্যতা দুর করে। ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, ভিটামিন-বি$_{১২}$ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে মাংসকে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের উৎস বলে। মাংস থেকে নানাবিধ মজাদার খাবার, যেমন- চপ, কাটলেট, কাবাব, রোস্ট প্রভৃতি তৈরি করা যায়। সুস্থ থাকার জন্য একজন মানুষের প্রত্যহ ১২০ গ্রাম মাংস খাওয়া প্রয়োজন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক মাংসের চাহিদা ৬৭.৩ লক্ষ মেট্রিক টন (জুলাই ২০১৩ এর জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৩৬ লক্ষ ধরে হিসাব করা হয়েছে)। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন হয় বছরে ৪৫.২ লক্ষ মেট্রিক টন। সে হিসেবে আমাদের গড় মাংসের প্রাপ্যতা ৮০.৬ গ্রাম/প্রতিদিন/প্রতিজন। অর্থাৎ ঘাটতি রয়েছে ৩৯.৪ গ্রাম/প্রতিদিন/প্রতিজন। তাই চাহিদা অনুযায়ী মাংসের প্রাপ্যতা বাড়াতে বার্ষিক মাংসের উৎপাদন আরও ২২.১ লক্ষ মেট্রিক টন বাড়ানো প্রয়োজন। মাংস উৎপাদনের এই বিশাল পূরণ করার জন্য সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঐকান্তিক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সারণি ১১.৪ঃ বিগত এক যুগে বছরভিত্তিক বাংলাদেশে মাংস উৎপাদন।*

ক্রমিক	বছর	মাংস উৎপাদন (লক্ষ টন)	ক্রমিক	বছর	মাংস উৎপাদন (লক্ষ টন)
১	২০০৪-০৫	১০.৬	৭	২০১০-১১	১৯.৯
২	২০০৫-০৬	১১.৩	৮	২০১১-১২	২৩.৩
৩	২০০৬-০৭	১০.৪	৯	২০১২-১৩	৩৬.২
৪	২০০৭-০৮	১০.৪	১০	২০১৩-১৪	৪৫.২
৫	২০০৮-০৯	১০.৮	১১	২০১৪-১৫	৫৮.৬০
৬	২০০৯-১০	১২.৬	১২	২০১৫-১৬	৬১.৫২

*প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য।

৪.২.৫ গবাদিপশুর বহিরাবরণ (Integument)

পশুর বহিরাবরণ মূলত ত্বক। তবে ত্বক ছাড়াও লোম, শিং, ক্ষুর, ত্বক নিম্নস্থ কলা এবং দৃষ্টিগোচর শৈষ্মিক ঝিল্লী পশুর দেহের বহিরাবরণের অন্তর্গত। ত্বক সমস্ত দেহকে আবৃত করে রাখে। এছাড়াও ত্বকের গুরুত্বপুর্ণ ও সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী রয়েছে। আবার ত্বকের সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাবে নানান রোগ হয়। ত্বকের সুষ্ঠু যত্ন, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য ত্বক সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৪.২.৫ ত্বকের কার্যাবলী ও গঠন

ত্বকের কার্যাবলী: ত্বক পারিপার্শ্বিক তাপের অবস্থা অনুসারে কার্যসাধন করে তাপ রক্ষার কাজে সাহায্য করে। দেহকে আবৃত রেখে আঘাত, অনষ্টিকর পদার্থ ও ইরেডিয়েশন থেকে রক্ষা করে। দেহের পানি ও ইলেকট্রোলাইটের সমতা রক্ষা করে। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঘাম (sweat) ও সেবাম (sebum) ক্ষরণের মাধ্যমে নিঃস্রাবী (secretory) ও রেচন (excretory) অঙ্গ হিসেবে কার্যসম্পদান করে ঘাম দেহের দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। দেহের অনুভূতিবাহী (sensitive/sensory) হিসেবে ত্বকে ব্যথা, তাপ ঠান্ডা সহজেই অনুভুত হয়। ত্বক

সূর্যালোকের সহায়তায় ভিটামিন-ডি প্রস্তুত করে। ত্বকের জীবাণুরোধী (antibacterial) ও ছাত্রাকনিরোধী (antifungal) ধর্ম রয়েছে।

ত্বকের গঠন: ত্বক একটি স্তরীভূত কোষ কলা। ত্বক প্রধানত তিনটি স্তর দিয়ে গঠিত। যথা- বহিস্তক (epidermis), অন্তস্তক (dermis) এবং অধস্তক (hypodermis)। স্তরীভূত শল্কা সাদৃশ্য এপিথেলিয়াম (stratified squamous epithelium) কোষ দিয়ে ত্বকের বহিস্তক গঠিত। বহিস্তক প্রধানত দু'টি স্তরে বিভক্ত। বহিস্তক ও অধস্তকের মধ্যে অন্তস্তকের অবস্থান। এই স্তর বহিস্তকের রক্ষণধারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে। এটি মূলত ফ্রাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যুর একটি স্তর। তবে ঘনত্ব ও তন্তুর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে এই স্তরকে প্রধানত দু'টি স্তরে পৃথক করা যায়। অন্তস্তকের নিচের স্তরকে অধস্তর বলা হয়। এটি ত্বক নিম্নস্থ স্তর এবং সাবকিউটেনিয়াস পেশী অন্তস্তকের সাথে সংযুক্ত থাকে। একাণে ত্বককে টেনে ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

গরুর ত্বক ৩-৪ মিলিমিটার পুরু। ত্বকের লোমের বর্ণ, পরিমাণ ও ঘনত্ব পরিবর্তনশীল। গরুর ঘাড়ে কেশর থাকেনা। লেজের আগায় ব্রাস সদৃশ লম্বা এক গোছা লোম থাকে। গরুতে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় সোয়েট (sweat) ও সিবেশাস্ (sebaceous) গ্রন্থি থাকে। ত্বক একটি স্তরীভূত কোষ কলা। প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি স্তর দিয়ে ত্বক গঠিত।

বহিস্তক (epidermis): স্তরীভূত শল্কা সদৃশ এপিথেলিয়াম (stratified squamous epithelium) কোষ দিয়ে ত্বকের বহিস্তক গঠিত। এটি প্রধানত নিম্নোক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত।

ক) স্ট্র্যাটাম করনিয়াম (stratum corneum)- এটি দু'টি স্তরের মধ্যে বাহিরের দিকের স্তর। এ স্তর হর্নি স্তর যা কেরাটিনযুক্ত মৃত অবস্থায় থাকে। লম্বাকৃতির এসব কোষে কোন নিউক্লিয়াস থাকেনা এবং ত্বক থেকে এসব কোষ অনবরত খসে পড়ে।

খ) স্ট্রাটাম জারমিনেটিভাম (stratum germinativum)- দু'টি স্তরের মধ্যে এটি ভিতরের স্তর এবং অন্যান্য কোষসহ বাইরের হর্নি স্তরের কোষের উৎস। এই ভিতরের স্তর একটি বেসাল কোষ স্তর স্ট্র্যাটাম বেসালি এবং দু'টি সেকেন্ডারি সেলুলার অংশ স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম সমন্বয়ে গঠিত। স্ট্র্যাটাম জারমিনেটেভাম স্তরের বেসাল কোষ জনন কোষ হিসেবে ক্রমাগত কোষ সৃষ্টি করে। এটি কেরাটিন সৃষ্টিকারী কোষ ছাড়াও ত্বকের পিগমেন্ট (melanin) সৃষ্টিকারী কোষ (melanocytes) তৈরি করে। মেলানোসাইট কোষের সংখ্যার উপর ত্বকের রং নির্ভর করে। বহিস্তকে কোন রক্ত নালী ও স্নায়ু থাকেনা। এই স্তর প্রধানত দেহ রক্ষাকারী হিসেবে কার্য সম্পাদন করে। বহিস্তক ও অন্তস্তকের সংযোগ স্থানকে বেসমেন্ট মেমব্রেন বলা হয়।

অন্তস্তক (dermis): বহিস্তক ও অধস্তকের মধ্যে অন্তস্তকের অবস্থান। এই স্তর বহিস্তকের রক্ষণকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে। এটি মূলত ফাইব্রাস কনেকটিভ টিস্যুর (collagenous fibres, reticular & elastic fibres) একটি স্তর। তবে ঘনত্ব ও তন্তুর (fibres) বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে এই স্তরকে প্রধান দুটি স্তরে পৃথক করা যায়।

ক) প্যাপিলারি স্তর (papillary layer)- কতিপয় ফাইব্রো-ইলাস্টিক উপাদানসহ রেটিকুলার ও কলাজেনাস তন্তু সমন্বয়ে এই স্তর জালের ন্যায় গঠিত। লোমের শিকড়, পেশী, সোয়েট ও সিবেশাস (sebaceous) গ্রন্থি, স্নায়ু ও রক্ত নালী এই স্তর পৌঁছে। এই স্তরের সোয়েট গ্রন্থি ও লোমের ফলিকুল তাপ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

খ) রেটিকুলার স্তর (reticular layer)- প্রধানত কোলাজেন ফাইবারের পুরু বান্ডিল দিয়ে এই স্তর গঠিত। তবে এ স্তরে ইলাস্টিন ও রেটিকুলিন ফাইবারও থাকে। এছাড়া রোটকুলার স্তরে রক্ত নালী, স্নায়ু ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কোষ থাকে যা ফাইবার রক্ষণাবেক্ষণে ভূমিকা রাখে। লোমের ফলিকুল ও সিবেশাস গ্রন্থি ত্বক রক্ষণকারী তেল ক্ষরণ করে যেমন- মেষের ল্যালোলিন তেলের আবরণ ত্বককে পানি প্রবেশের কবল থেকে রক্ষা করে। সোয়েট গ্রন্থি ঘাম নিঃসরণ করে একদিকে দেহের দূষিত পদার্থ বের করে অন্যদিকে ঘাম শুকিয়ে ত্বককে ঠান্ডা রাখে। ছাগল ছাড়া প্রায় সকল গৃহপালিত পশুর সোয়েট গ্রন্থি থাকে। গরু ও শূকরের সোয়েট গ্রন্থি শুধুমাত্র নাক ও স্নাউট (snout) থাকে। কিন্তু মেষের সমগ্র দেহে এই গ্রন্থি পাতলাভাবে ছড়ানো থাকে।

অধস্তক (hypodermis): অন্তস্তকের নিচের স্তরকে অধস্তক বলা হয়। এটি ত্বক নিম্নস্থ স্তর (hoof and horns) এবং সাবকিউটিনাস নামও পরিচিত। অধস্তক চর্বি সংরক্ষণ করে যা তাপ অপরিবাহী। তাই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পশু অপেক্ষা গ্রীষ্মমন্ডল অঞ্চরের পশুর এই স্তর পাতলা হয়। এস্তরের কিউটেনিয়াস পেশী অন্তস্তকের সাথে সংযুক্ত থাকে। এ কারণে ত্বককে টানলে বা পেঁচিয়ে ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

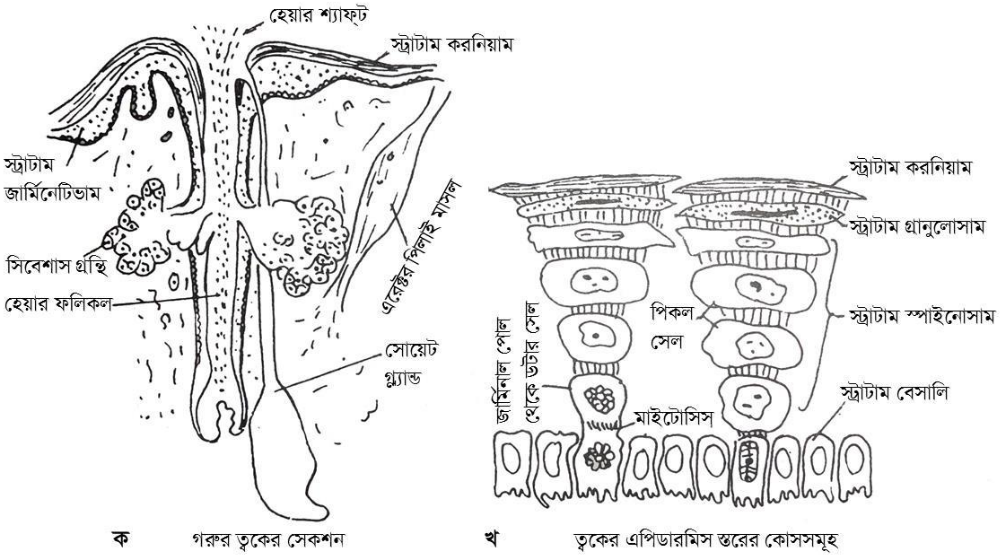

চিত্র ১১.৫ঃ গরুর ত্বকের গঠন। ক = ত্বকের সেকশন। খ = ত্বকের এপিডারমিস স্তরের কোসসমূহ।

১১.৫.২ চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণ

চামড়ার আকার এবং পুরুত্বের উপর নির্ভর করে হাইড এবং স্কীনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বড় এবং পুরু চামড়াকে হাইড বলে। হাইড শব্দটি দ্বারা বড় পশুর চামড়াকে বুঝায়, যেমন- গরু, ঘোড়া, মহিষ, উট ইত্যাদি। অপরদিকে স্কীন বলিতে ছোট পশুর চামড়াকে বুঝায় যেমন- বাছুর, ভেড়া, ছাগল, বাঘ, হরিণ ও সরিসৃপ। গবাদিপশু জবাই করে প্রাপ্ত চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে উচ্চ বাজারমূল্য পাওয়া যায়। চামড়া রপ্তানি করে আমরা প্রতি বৎসর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। কাজেই চামড়ার প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। গবাদিপশু জবাই করার পর থেকে চামড়ার প্রতি যত্ন নেয়া উচিত। রক্তক্ষরণের সময় যাতে চামড়ায় রক্ত না লাগে সেদিকে ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া চামড়াকে শুকানোর সময় সঠিক পদ্ধতিতে শুকাতে হবে।

পশু জবাই, পূর্ব প্রস্তুতি ও রক্তক্ষরণ

কোন কোন দেশে জবাই করার পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব, কারণ জবাই করার পদ্ধতি কোন ধর্মের অংশ বিশেষ অথবা ঐ দেশের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন হতে পারে। যেমন ইসলামিক বা অনুরুপ রাব্বিনিক পদ্ধতিতে জবাই করার সময় পশুর শ্বাসনালি এবং প্রধান রক্তবাহী নালি কেটে দেয়া হয়। সম্ভব হলে পশুকে কষ্ট কম দিয়ে জবাই করার জন্য হাতুড়ী, ক্যাপটিভ বোল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পশু যেন খুব তাড়াতাড়ি জবাই করা হয়। কোন কোন দেশে শ্বাসনালি কাটার পূর্বেই পশুকে বৈদ্যুতিক উপায়ে আঘাত করা হয় যাহাতে সহজে পশু অজ্ঞান হয়।

ক্লান্ত পশু বিশেষ করে রেলে বা পায়ে হেটে অনেক রাস্তা ভ্রমণ করেছে এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত জবাই করা যাবে না। অন্যথায় পশুর গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ফলে রক্তক্ষরণ সম্পূর্ণরুপে হবে না। যার জন্য মাংস ও চামড়ার সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং পশুর দেহ হতে চামড়া ছাড়াতে অসুবিধা হয়। জবাই করার কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে পশুকে প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়াতে হবে এবং সাথে সামান্য পরিমাণ খাবার অথবা না দিলেও চলবে। সম্ভব হলে পশু জবাই করার জন্য এবেটর ব্যবহার করতে হবে এবং এর নিকটে চামড়ায় লবণ দেয়ার জন্য ও শুকানোর জন্য ঘর থাকতে হবে। এবেটর না থাকলে পশু জবাই করার জন্য সতর্কতার সঙ্গে জায়গা বাছাই করতে হবে। জায়গা পরিষ্কার, ঢালু ছাদের নিচে হওয়া উচিৎ। জবাই করবার সময় রক্ত যাতে নির্গমন হতে পারে এবং চামড়া ছাড়াবার সময় পশু যাতে স্থির থাকে সে জন্য মাটিতে ২০ ফুট লম্বা ও ৩০ ইঞ্চি গভীর গর্ত করতে হবে। যখন অধিকাংশ রক্ত ক্ষরণ হবে তখন পশুর দেহকে না হেচড়ায়ে কিছু দূরে একটু উঁচু স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে মাঠের মধ্যে পশুকে ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়ানো যেতে পারে। মাংস এবং চামড়া যাতে বাজারজাত করা যায় সেজন্য খুব ভোরে পশুকে জবাই করা উচিৎ। একটি প্রাণির সামনে আর একটি জবাই করা যাবে না।

পশুর গলা কাটার নিমিত্তে, রক্ত ক্ষরণের জন্য অচেতন পশুর মাথা বাম হাত দিয়ে কসাই এর কাছাকাছি আনতে হবে এবং ডান হাতে রক্ষিত ছুরি দ্বারা মাথা ও গলা কাটতে হবে। যতটুকু সম্ভব মাথার নিকটে গলা কোনাকোনি ভাবে কাটতে হবে এবং ৫-৬ ইঞ্চি গভীর করে কাটতে হবে যাতে শিরা ও ধমনী ভালভাবে ছেদ হয়। গলায় মাত্র একটি কাটাচিহ্ন থাকবে। পশু জবাই করার জন্য ১৮-২০ ইঞ্চি লম্বা খুব ধারাল এবং চোখা ছুরি ব্যবহার করতে হবে। চামড়া ছাড়ানোর জন্য যে ছুরি ব্যবহার করা হয় তা জবাই কার্যের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ নয়। গলা বেশি গভীর করে কাটা যাবে না কারণ এতে পুরা কেটে যেতে পারে ফলে বক্ত গহ্বরে রক্ত প্রবেশ করতে পারে। এতে মাংসের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। ভাল আকারের চামড়া পেতে হলে গলকম্বল নিচের দিকে সোজাভাবে কাটতে হবে। জবাই করার পর পশুকে আস্তে ধীরে নাড়াচাড়া করা উচিৎ। যে সব দেশে জবাই করার পূর্বে পশুকে অচেতন করা হয় না সে সব দেশে মাটিতে বসানো আংটার ভিতর রশি দিয়ে পশুকে শোয়ান হয়। পশুগুলি যখন বাধা হয় তখন তার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না ফলে মাটিতে পড়ে যায় (যখন ইহাও সম্ভব না হয় তখন শিং ধরে রেখে পাগুলি বেধে দেয়া হয়)। তখন সাহায্যকারী পশুর শিং ধরে মাথার উপরের দিক মাটির সংগে চেপে ধরে। কাঁধ ও গলা টান করে ধরার পর রক্ত ক্ষরণের জন্য গলা ছেদন করা হয়। পশুর রক্ত মুরগি ও কুকুরের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার। তাই যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জবাই করা পশুর রক্তক্ষরণ একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। পশুকে ঝুলন্ত অবস্থায় ভালভাবে রক্তক্ষরণ করানো যায় এবং পিছনের পায়ের বাঁধা খুলে দিলে উহা সুবিধাজনকভাবে পা দ্বারা আঘাত করতে পারে ফলে রক্তক্ষরণ সহজ হয়। যে সকল পশুর ভালভাবে রক্তক্ষরণ হয় না তাদের চামড়ার সংরক্ষণ গুণাগুণ হ্রাস পায়। কোন কোন দেশে যেখানে ভাল কসাইখানা আছে সেখানেও রক্তক্ষরণ হয়। যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তখন চামড়া যাতে রক্ত দ্বারা কলুষিত না হয় সেজন্য সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঢালু মেঝে ব্যবহার করার মাধ্যমে ইহা করা যায়। সম্ভব হলে পশুর মাথাটি আলাদা রক্তবাহী নালা বা গর্তের নিকট রাখতে হবে যেন সেখানে রক্ত জমা হতে পারে। ছিটকে যাওয়া রক্ত আলাদা নালার মাধ্যমে পানি দ্বারা ধুতে হবে।

চামড়া ছাড়ানো

যখন রক্তক্ষরণ ও রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন পশুর দেহ হতে প্রথম বারের মত চামড়া ছাড়ানো কাজ আরম্ভ করতে হয়। পশুর জীবননাশ হয়েছে কিনা তা জানার প্রধান উপায় হচ্ছে জবাই করার পর চক্ষু স্পর্শ করা। স্পর্শ করিলে যদি কোন প্রতিক্রিয়া না দেখা যায় তবে বুঝা যাবে যে, উহার প্রাণনাশ হয়েছে। চামড়া ছাড়ানোর পূর্বে ইহা করতে হবে। রক্ত ক্ষরণের জন্য পশুকে যদি ঝুলিয়ে রাখা হয় তবে ইহা নামানোর পর এমনভাবে একটি নিচু জায়গায় পিঠের উপর রাখা হয় যাতে এক পার্শ্বে গড়িয়ে না পড়ে। সাধারনত কাঠ বা ধাতুর তৈরি দোলায় পশুকে শোয়ান হয় অথবা চামড়া ছাড়ানোর জন্য বিশেষ ধরণের বিছানার উপর শোয়ান হয়। মাঠে পূর্বে তৈরি এমন একটি গর্তে পশু স্থাপন করা হয় যার মধ্যে ইহার মেরুদন্ড সহজে স্থাপন করা যায়।

মাথার চামড়া ছাড়ান: ইহা যদিও সত্য যে মাথার চামড়া অন্যান্য অংশের তুলনায় কম মূল্যবান তবুও ইহা অযথা নষ্ট করা ঠিক নয়। মাথার চামড়া ছাড়াবার জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে রিপিং করতে হবে। যেহেতু মাথার চামড়া শক্তভাবে উহার সাথে লাগান থাকে তাই একে ছাড়ানোর জন্য খুব ধারাল ছুরি ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে স্পাইনাল কলাম কাটা হয়। এ পদ্ধতিতে জবাই করার জন্য যেখানে কাটা হয়েছে সেখান থেকে ছুরি চালিয়ে গলা হতে মাথা পৃথক করা হয়। এই অবস্থায় চামড়ার অবশিষ্ট অংশের সাথে মাথা সামান্য যুক্ত থাকে।

মেঝে চামড়া ছাড়ানো: এই ধাপে চামড়া রিপিং করার জন্য উপযুক্ত রিপিং ছুরি ব্যবহার করা হয়। জবাই করার সময় গলা যেখানে কাটা হয়েছে সেখান হতে গলকম্বলের মাঝখান দিয়ে ও পেটের মাঝ দিক দিয়ে লেজের শেষাংশ পর্যন্ত চামড়া রিপিং করা হয়। এই ধাপে খুর এবং হাটুর গিরার মাঝ খানের চামড়ায় রিপিং করা হয়। এরপর পায়ের ভিতরের পাশ দিয়ে উপরের দিকে রিপিং করা হয়। সামনের পায়ের রিপিং সিনা বরাবর পৌঁছে। পিছনের পায়েল রিপিং পায়ু এবং স্তন বা অন্ডকোষের মাঝ পথে বেকে অগ্রসর হয় ও পরে লেজের ভিতরের পাশ দিয়ে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যদি এই নিয়ম সতর্কতার সঙ্গে পালন করা হয় তবে সঠিক আকারের একটি চামড়া পাওয়া যাবে, যার রাম্প গোলাকৃতির হবে, পিঠের মাঝখানে হতে দু'পাশের পেটের প্রান্ত সমান দুরত্ব হবে। এই চামড়ার স্যাংক মধ্যম লম্বা হবে, গলকম্বলের আকার সঠিক হবে। সিনার নিম্নভাগ হতে গলা পর্যন্ত এবং নাভী পর্যন্ত যেখানে লাল মাংস দেখা যায় সেখান পর্যন্ত চামড়া ছাড়াতে হবে। এই স্থলে শুধু সংযোগ কলা কাটা হবে এবং যতটুকু সম্ভব মাংস ও চর্বি দেহে থেকে যাবে। পরবর্তী ধাপে চারিটি পা একত্রে আনা হয়। পিছনের বাম পা সামনের বাম পায়ের সাথে অনুরুপ সামনের ডান পা পিছনের ডান পায়ের সাথে আনা হয়। কাধের চামড়া কিছুটা কেটে এবং কিছুটা টেনে ছাড়াতে হয়। দেহের দুই পার্শ্বে চামড়া ছাড়াতে হলে সামনের স্যাংক হতে নিচের দিকে অথবা মাথার কাছ হতে সামনের স্যাংকের দিকে অগ্রসর হতে হবে। দেহের দু'পাশের চামড়া টেনে ছাড়ানো সুবিধাজনক তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন পাজরের উপরের লাল মাংস দেহে থেকে যায়। দেহের এই পার্শ্বের চামড়া ছাড়াবার জন্য বিরতিহীনভাবে একটানা অনেকটুকু কাটতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত লাল মাংস না দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত নিচের দিকে চামড়া ছাড়াতে হবে।

ঝুলিয়ে চামড়া ছাড়ানো: এই পদ্ধতিতে একটি গ্যামব্রেল অথবা প্রেডার এবং একটি টেইল গ্রিপ উভয়ই হয়েষ্টিং গিয়ারে এর হুকের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং পিছনের পা দুটো এর সাথে ঝুলানো হয়। এই অবস্থায় গ্যামব্রেল মাটি বা ভূমি হতে ৫ ফুট উপরে তোলা হয়। কিন্তু তখনও পশুর কাধ এবং মাথা ভূমির খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এই অবস্থায় টেইল গ্রীপ এর দাঁতের সাথে লেজের হাড় আটকিয়ে দেয়া হয় এবং লেজের অগ্রভাগ মজবুত করে ধরে লেজ ও রাম্পের চামড়া শক্ত করে নিচের দিকে টেনে ছাড়ানো হয়।

পরিপূর্ণভাবে চামড়া ছাড়ানোর জন্য পশুকে পুরোপুরিভাবে উপরে তোলা হয়, পরে চামড়া ছাড়ানকারী চামড়াকে পিঠ হতে হাম্পের দিকে টেনে ছাড়াতে থাকে ফলে চামড়ার মূল্যবান অংশ ছুরির আঘাত দ্বারা ক্ষত হয় না। হাম্প, কাধের উভয় পার্শ্ব এবং ঘাড়ের শক্ত ও লম্বা সাবকিউটেনিয়াস কলা ছাড়াবার জন্য ছুরির ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয়। চামড়াকে পুরিপূর্ণভাবে ছাড়ানোর জন্য পশু যে স্থানে জবাই করা হয়েছে ঠিক সেই লাইনে শিং এর পিছন দিকে আগাতে হবে যাতে কান দুটি মাথার সাথে থেকে যায়। শিং এর পিছন দিকে দেহ হতে ছাড়ানো চামড়াকে পৃথক করা হয়।

মরা পশুর চামড়া ছাড়ানো: ফলেন হাইড হলো খাদ্যভাব, খরা এবং রোগে আক্রান্ত মৃত পশু হতে ছাড়ানো চামড়া। এই চামড়া সাধারণত নিম্নমানের হয় কারণ অনুপযুক্ত ছুরি দ্বারা অদক্ষ ভাবে ছাড়ানো হয় এবং রক্তক্ষরণ পুরাপুরি হয় না। যে পাশে পশু শুয়ে থাকে সে পার্শ্বের চামড়া খুবই নিম্নমানের হয় কারণ ছোট ছোট রক্তনালির রক্ত বের হতে পারে না পরে চামড়া রক্তবর্ণ ধারণ করে, যাহা পচন ধরতে সাহায্য করে। অধিকন্তু সাবকিউটেনিয়াস কলা শক্ত হয়ে যায় ফলে চামড়া ছুরি দ্বারা ক্ষত হয়। এ ছাড়াও খাদ্যাভাব এবং রোগের কারণেও চামড়া পাতলা হয়ে যায়। পশু মরার সাথে সাথে সাবধানতার সঙ্গে চামড়া ছাড়ালে ক্ষত কমানোর জন্য পশুকে ছেচরিয়ে টানা যাবে না এবং পৃথক করার পর সম্ভব হলে পরিষ্কার পানিতে চামড়া ধুতে হবে। মরা পশুর চামড়ার ক্ষেত্রে জীবন্ত পশুর চামড়ার মতই চামড়ার রিপিং এবং ফ্লোয়িং হতে হোয়েস্টিং পর্যন্ত একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। প্রথমে গলা এবং শিং এর চারিদিকে রশি দ্বারা বেধে গাছ অথবা অন্য কোন অনড় খুটির সাথে আটকিয়ে রাখ হয়। তারপর পিছনের ডান পা সামনের ডান পায়ের সাথে এবং

পিছনের বাম পা সামনের বাম পায়ের সাথে বাধা হয়। এই অবস্থায় পশু মাটিতে এক পার্শ্বে শায়িত অবস্থানে থাকে। গলার চতুর্দিকের চামড়া ছাড়ানোর পর ছুরি দ্বারা কাধ এবং হাড়ের চামড়া ছাড়ানো হয় এবং বাকী চামড়া পিঠ হতে লেজের শেষ অংশ পর্যন্ত রশি টানা খেলার মত টেনে ছাড়াতে হবে। যদি এই সমস্ত নির্দেশাবলী মেনে চলা হয় তবে মরা চামড়ার মান উন্নত করা যেতে পারে।

হাতুড়ি দ্বারা চামড়া ছাড়ানো: চামড়া ছাড়ানোর এই পদ্ধতিতে গোল অগ্রভাগ বিশিষ্ট ব্রাশ অথবা কাঠের মালিট দ্বারা পিটিয়ে সাবকিউটেনিয়াস কলা কাটা হয়। এই পদ্ধতি কিছু কিছু এলাকায় ব্যবহার করা হয় কিন্তু সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। ছুরি ছাড়াই এই পদ্ধতিতে নির্ভুলভাবে চামড়া ছাড়ানো যায়। এই ক্ষেত্রে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত চামড়া রিপিং করতে হবে এবং পেটের কিছু অংশ ও পায়ের নিচের অংশ ছুরি দ্বারা ছাড়াতে হবে। দ্বিতীয় চামড়া ছাড়ানোর জন্য চামড়া ছাড়ানোকারীকে অধিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি চামড়ায় ছুরির আঘাত না থাকে তবে সেই চামড়া ভাল মূল্যে বিক্রয় করা যায়।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চামড়া ছাড়ানো: যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হস্তচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যাহা বিদ্যুৎ বা সংকুচিত বায়ু দ্বারা চলিত হয়। এই পদ্ধতি বিশ্বের বড় বড় কসাইখানায় এবং মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ক্রমান্বয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু ইহা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়। এই পদ্ধতিতে যথাযথভাবে চামড়া ছাড়ানো যায় এবং ক্রটিমুক্ত মাংসপৃষ্ঠ পাওয়া যায়। কারণ এগুলোর দাঁত খুব ধারালো। হস্তচালিত ছুরি মতই এই যন্ত্র চালনা করা হয়। ধারাল পার্শ্ব চামড়ার বিপরীত দিকে রেখে যন্ত্রকে সামনে ও পিছনে চালনা করা হয়। একজন দক্ষ ব্যক্তি ছুরি দ্বারা যে সময়ে একটি চামড়া ছাড়াতে পারে তার অর্ধেক সময়ে একজন দক্ষ ব্যক্তি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই চামড়া ছাড়াতে পারে এবং ইহা চালনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

চামড়া ধৌতকরণ

পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকলে চামড়া ছাড়ানোর পর রক্ত জমাট হওয়ার পূর্বেই ধুতে হবে। পানিতে চামড়া ডুবিয়ে ধোয়া যায় অথবা বড় টেবিল বা মাটিতে চামড়া বিছিয়ে ব্রাশের সাহায্যে ঘষে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধোয়া হয়। পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকলে প্রথম পদ্ধতি সুবিধাজনক কিন্তু পানিতে ডুবানোর সময় চামড়া নাড়াচাড়া করা অত্যাবশ্যক। যেহেতু রক্ত এবং মল দ্বারা পানি ময়লাযুক্ত হয় তাই সম্ভব হলে মাঝে মাঝে পানি পরিবর্তন করতে হবে। প্রবাহমান পানিতে চামড়া ধোয়া সুবিধাজনক। বড় বড় কসাইখানায় এবং মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারাখানায় যেখানে অবাধ পানি সরবরাহ আছে সেখানে চামড়া ব্রাশের সাহায্যে ঘষা পদ্ধতি সন্তোষজনক। প্রতিটি চামড়ার মাংসল এবং পশম পার্শ্ব ঝর্ণা পদ্ধতি অথবা হোস পাইপ দ্বারা পানি ছিটাইয়া দেয়া হয় এবং ব্রাশের সাহায্যে ঘষা হয়। হোস পাইপ দ্বারা পানি নির্গমন করে চামড়ার অতিরিক্ত জলীয় অপসারণ হয় এবং চামড়াকে তার পূর্ব ওজনে ফিরাইয়া আনা হয়। যে সকল ক্রেতাগণ ওজনের উপর নির্ভর করে চামড়া ক্রয় করে তাদের জন্য এই কার্যক্রম খুবই প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়াও লবণ প্রয়োগের পূর্বে চামড়ায় পরিমিত পানি রাখার জন্য এই কার্যক্রম দরকারী।

মাংস ও চর্বি ছাড়ান

পাজর, কাঁধ এবং বিশেষত লেজের চারিদিকে আবৃত কিছু চামড়ায় অধিক চর্বি ও মাংস থাকে। চামড়া ধুয়ে ফেলার পর পরই এই সমস্ত অতিরিক্ত পদার্থ অপসারণ করতে হবে। চামড়ার ক্ষতি কমানোর জন্য মসৃণ টেবিলের উপর রেখে এই সকল পদার্থ অপসারণ করতে হবে এবং ফ্রেমে ঝুলানো অবস্থায় পরিষ্কার করা যাবে না। ইহার জন্য খুব ধারাল এবং বক্র ধারাল পৃষ্ঠ বিশিষ্ট ছুরি ব্যবহার করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চামাড়র খুব গভীরে মাংস কাটা যাবে না। কিছু কিছু মাংস চামড়ার সাথে থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে ইহা পরিষ্কার করার লক্ষ্যে চামড়া কাটা যাবে না।

চামড়া ছাঁটা ও অন্যান্য বিষয়াদি

ভালভাবে মাংস ছাড়াবার পর একে শুকাবার পূর্বে ছাঁটতে হবে। এই পদ্ধতিতে চামড়ার চোখা প্রান্ত এবং অতিরিক্ত লম্বা স্যাংক কেটে ফেলা হয়। চামড়ার আকৃতি সুন্দর করার জন্য শুকাবার পর পুনরায় তা ছাঁটা যেতে পারে। চামড়াকে ময়লার হাত হতে রক্ষা করার জন্য উহা ছাড়াবার পরে পাকস্থলী এবং পরিপাকতন্ত্র অপসারণ করা হয়। এছাড়া চামড়ার উপর অপসারিত মাংসের টুকরাগুলি স্তূপাকারে সাজানো যাবে না।

সারমর্মঃ ভাল মানের চামড়া উৎপাদনের জন্য পশু জবাই থেকে শুরু করে চামড়া ছাড়ানো, চামড়া শুকানো প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশু জবাই এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তবে যে পদ্ধতিতেই পশু জবাই করা হোক না কেন তা যেন দ্রুত হয় এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পশু জবাই এর ২৪ ঘন্টা পূর্ব হতে পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে। কয়েক ঘন্টা পূর্ব হতে খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। পশু জবাই এর পর ভালমত রক্তক্ষরণ হতে দিতে হবে। অতপর সুবিধাজনক পদ্ধতি ব্যবহার করে চামড়া ছাড়াতে হবে।

১১.৫.৩ চামড়ার কিউরিং

উষ্ণ আবহাওয়ায় পশুর শরীর থেকে চামড়া অপসারণ করার পর এতে দ্রুত পচন শুরু হয়। বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ধূলাবালি এবং পানির সাহায্যে এ পচন ক্রিয়া ঘটে থাকে। সাধারণত ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে এবং উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে ৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১২ ঘন্টার মধ্যে চামড়ার পচন শুরু হয়। সুতরাং চামড়াকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকেই কিউরিং বলে। তিনটি পদ্ধতিতে কিউরিং করা হয়ে থাকে-

ক) বাতাসে শুষ্ককরণ (air-drying)
খ) লবণ দিয়ে কিউরিং (salt curing)
গ) পিকলিং (pickling)

ক. বাতাসে শুষ্ককরণ

যে এলাকায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকে অর্থাৎ বাতাস শুষ্ক থাকে বা বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে, সেখানে চামড়া তাড়াতাড়ি বাতাসে শুকিয়ে যায়। এ ধরণের আবহাওয়ায় ছাগল ও ভেড়ার চামড়া শুকোতে ৩ ঘন্টা বা তারও কম সময়ের প্রয়োজন হয়। গরম পরিবেশে যদি বাতাস স্থির না থেকে প্রবাহমান থাকে তবে তা দ্রুত চামড়া শুকোতে সাহায্য করে। এমনকি যদি আবহাওয়া ভেজা থাকে কিন্তু বাতাস প্রবাহমান থাকে তবে সেটাও চামড়া শুকোতে সাহায্য করবে। বাতাসে চামড়া শুকানোর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যখন শুকনো চামড়া কয়েক সপ্তাহের জন্য রেখে দেয়া হয় তখন এতে বিটলস, মথ বা অন্যান্য পোকা মাকড়ের সংক্রামণ ঘটতে পারে। অথচ শুষ্ক লবণ দিয়ে কিউরিং করা চামড়াতে এ ধরণের সংক্রামণ ঘটে না। এ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শুকানোর পূর্বে চামড়ার উপর সোডিয়াম আরসিনেট দ্রবণ স্প্রে করা উচিত বা চামড়াকে এ দ্রবণে ডুবানো উচিত। বাতাসে চামড়াকে শুকানোর ৪টি পদ্ধতি রয়েছে।

- মাটির উপরে শুষ্ককরণ
- ফ্রেমে শুষ্ককরণ বা ঝুলিয়ে শুষ্ককরণ
- রশি বা তারে শুষ্ককরণ
- তাবু বা পেরাসল পদ্ধতিতে শুষ্ককরণ

মাটির উপরে শুষ্ককরণ: কোন কোন এলাকায় চামড়া শুকানোর জন্য এটিই সবচেয়ে সহজ এবং প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠকে উপর দিকে রেখে মাটিতে বিছিয়ে চামড়া শুকানো হয়। চামড়া শুকানোর সময় যাতে কুঁচকিয়ে না যায় তাই মাটির সাথে খুটি দিয়ে পুতে রাখা হয় অথবা চারকোণায় পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্লিস্টার, টেইন্ট এবং হেয়ারস্লিপ নাম ক্রটি দেখা যায়। এছাড়া মাংসল দিক উপরে রেখে

শুকানোর ফলে নিচের দিক অর্থাৎ পশমের দিক থেকে পানি অপসারিত হতে পারে না। সূর্যকিরণের ফলে মাংসল পৃষ্ঠ গরম হয়ে যায় এবং শুকানোর পরিবর্তে সেদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পচনের সৃষ্টি হয়। সন্তোষজনকভাবে চামড়া শুকোতে হলে চামড়ার উভয় পার্শ্বে বায়ু প্রবাহ নিশ্চিত করা উচিত। কাজেই সন্তোষজনকভাবে চামড়া শুকানোর জন্য এই পদ্ধতিটি উপর্যুক্ত নয়।

ফ্রেমে শুষ্ককরণ বা ঝুলিয়ে শুষ্ককরণ: এ পদ্ধতিতে চামড়ার আকার অনুয়ায়ী মাটি থেকে ১.৫ মিটির বা তারও বেশি উঁচুতে একটি দন্ড পূর্ব-পশ্চিম বরাবর অনুভূমিকভাবে ঝোলানো হয়। চামড়ার লেজের বাট এবং পেছনের পা দড়ি দিয়ে দন্ডটির সাথে বাঁধা হয় এবং মাথা ও সামনের পা মাটিতে পোঁতা খুটির সাথে দড়ি দিয়ে বাধা হয়। নিচের প্রান্ত কোন অবস্থাতেই যেন মাটির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চামড়া মাটির সাথে এমন কোণ করে বাঁধা হয় যাতে মাংসল পৃষ্ঠ উপরের দিকে থাকে। এ পদ্ধতিতে চামড়ার উভয় পার্শ্ব শুকানোর জন্য উপযুক্ত অবস্থায় থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চামড়ার সব জায়গায় সমভাবে টান থাকে।

রশি বা তারে শুষ্ক করণ: যেখানে ফ্রেম তৈরি করার জন্য কাঠ পাওয়া কষ্টকর সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। চামড়ার পশম পৃষ্ঠ নিচের দিক রেখে মেরুদন্ড বরাবর তারে বা রশিতে ঝুলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। তার বা রশি কনিষ্ট তালের চেয়ে মোটা হওয়া উচিত নয়, পেট এবং শ্যাংকের উভয় পার্শ্ব যাতে পরস্পরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্যাংক যাতে ভিতরের দিকে ভাজ হতে না পারে সেজন্য কাঠি ব্যবহার করতে হবে। অতএব চামড়ার প্রতিটি অংশ বাতাসে উন্মুক্ত থাকবে। যদি মোটা খুটির উপর ঝুলিয়ে চামড়া শুকানো হয়, তবে খুটি বরাবর চামড়ার পচন ধরে।

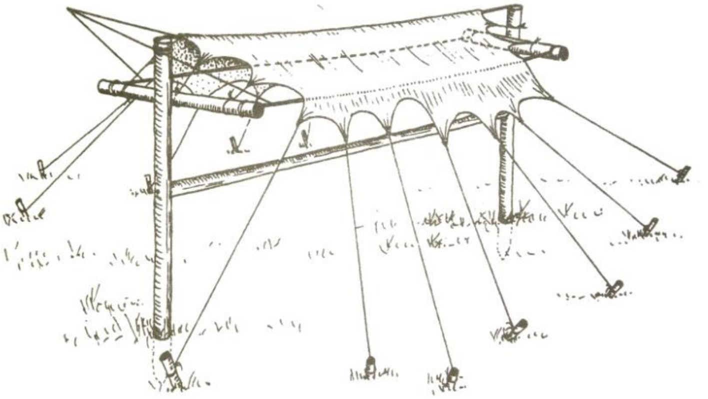

চিত্র ১১.৬ঃ তারের তাকে চামড়া শুকানো।

তাবু বা পেরাসল পদ্ধতিতে শুষ্ককরণ: তাবু পদ্ধতিতে প্রায় ৩ ফুট দূরত্বে দুটো দন্ড মাটিতে পোঁতা হয় এবং একটি তার টান করে দন্ড দুটোর সাথে বাঁধা হয়। তারের উপর মেরুদন্ড বরাবর চামড়া ঝুলিয়ে দিয়ে এর দুপাশের প্রান্তগুলো তাবুর মতো করে মাটিতে খুঁটির সাথে টান করে বেঁধে দিতে হয়।

খ. লবণ দিয়ে কিউরিং

যে সমস্ত এলাকায় এবং বর্ষা ঋতুতে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০% এর উপরে থাকে সেখানে চামড়া শুকোতে বেশি সময় লাগে। ফলে এক থেকে দুই দিন পরে আর্দ্র গরম চামড়ার পচন ধরে। তাই এ ধরণের পরিবেশে লবণ দ্বারা শুষ্ককরণ অতীব উপযোগী। লবণ দ্বারা কিউরিং এর সুবিধা হলো লবণ পানি অপসারণ করে এবং পচন প্রতিরোধ করে। লবণ দ্বারা কিউরিং নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায়।

- শুষ্ক আবহাওয়ায় সাধারণ বাণিজ্যিক লবণ দিয়ে শুষ্ক লবণায়ন
- শুষ্ক লবণায়ন (আর্দ্র আবহাওয়ায়)
- সিক্ত লবণায়ন

শুষ্ক আবহাওয়ায় সাধারণ বাণিজ্যিক লবণ দিয়ে শুষ্ক লবণায়ন: শুষ্ক আবহাওয়া যদি কাঁচা চামড়ায় সাধারণ শুষ্ক বাণিজ্যিক লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হয় তবে কায়েক মিনিটের মধ্যে চামড়া থেকে পানি শোষণ করে লবণ ভিজে যাবে। লবণ যোগ করার ফলে একদিকে চামড়া থেকে পানি অপসারিত হয় এবং অপরদিকে পচন শুরু হতেও দেরী হয়। বাছুর, ছাগল এবং ভেড়ার চামড়া মোট ওজনের ৪০-৫০% এবং গরু-মহিষের চামড়ার মোট ওজনের ৩০-৪০% লবণ যোগ করতে হয়। বাতাসে চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠ পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হয়। অতপর পানি ভালভাবে অপসারিত হওয়ায় পর মাংসল পৃষ্ঠ উপরের দিকে রেখে সামান্য ঢালু অবস্থায় মেঝেতে কাঠের পিড়ি বা র‌্যাকের উপর ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ওজনের অর্ধেক পরিমাণ বাণিজ্যিক লবণ ছড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে ২য়, ৩য় চামড়ার মাংসল স্তর ১ম চামড়ার উপর রেখে নির্দিষ্ট সুবিধাজনক উচ্চতা পর্যন্ত করা হয়। এইভাবে চামড়াকে স্তুপের মধ্যে ১-৪ দিন পর্যন্ত রাখা হয়। তারপর চামড়া থেকে আর্দ্র লবণ অপসারণ করা হয়। এই অর্ধ শুকানো চামড়াকে রশি বা তার দিয়ে ঝুলিয়ে শুকানো হয়। যদি চামড়াকে লবণায়ন করার পর ৩০-৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৬ দিন রাখা হয় তবে এর গুণগতমান কমে যায়। যদি লবণায়নের এক বা দুই দিন পর লবণ সম্পুর্ণ দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং শোষিত হয়, তখন পুনরায় লবণ প্রয়োগ করতে হয়। উষ্ণ বাতাসের কারণে মাংসল দিক অতি শুষ্ক হয়ে যায় তবে শুষ্ক টিসুর আবরণ পড়ে। তাই সামান্য পরিমাণ পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

শুষ্ক লবণায়ন (আর্দ্র আবহাওয়ায়): আর্দ্র আবহাওয়ায় শুষ্ক বাণিজ্যিক লবণ দ্বারা কিউরিং করা উচিত নয়। কারণ আর্দ্রতা ৭৫% এর উপরে হলে বাতাস থেকে পানি শোষণ করে পূর্বেই দ্রবীভূত হয়ে যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় শুষ্ক লবণ দ্বারা কিউরিং করা চামড়া মজুত করা হলে চামড়া থেকে লবণ সিক্ত পানি ফোটা আকারে নির্গত হয়। বাংলাদেশে এই অসুবিধা দুর করার জন্য সাধারণ লবণের সাথে অ্যানহাইড্রাস সোডিয়াম সালফেট মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। অতপর চামড়া কোন ঝুঁকি ছাড়াই যে কোন পদ্ধতিতে শুকানো যায়।

সিক্ত লবণায়ন: প্রথমে চামড়াকে জলীয় বাষ্প দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। অতপর লবণ দেয়ার পূর্বে ২৪ ঘন্টার জন্য ১৩-১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ব্রাইন দ্রবণে ডুবানো হয়। দ্রবণ সহিষ্ণু ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লবণের সাথে নিম্নলিখিতহারে জীবাণু নাশক ব্যবহার করা হয়। যেমন- সোর্ডিাম ক্লোরাইড-২%, সোডিয়াম সিলিকো ক্লোরাইড-২%, সোয়িাম পেন্টা ক্লোরোফিনেট -০.২%, জিংক ক্লোরাইড-০.৫%, সোডা অ্যাশ মিশ্রণ-২%, এবং ন্যাপথ্যালিন-১%।

গ. পিকলিং (Pickling)

পিকলিং প্রক্রিয়াটি দুটো ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা-
ক. চামড়া থেকে পশম অপসারণ এবং
খ. চামড়াতে লবণ ও এসিড প্রয়োগ।

ক. চামড়া থেকে পশম অপসারণ: সোডিয়াম সালফাইডের শক্তিশালী দ্রবণে চুন যোগ করে পেইন্ট তৈরি করা হয়। এ পেইন্ট চামড়ার মাংসল পৃষ্টে প্রয়োগ করা হয়। পেইন্ট চামড়ার সাথে লেগে যায় এবং চামড়ার পানি শোষণ করে নেয়। পেইন্টিং শেষ হবার পর মাংসল পৃষ্ঠ ভেতরের দিকে রেখে মেরুদন্ড বরাবর চামড়া ভাঁজ করা হয় অথবা একটি চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠ অন্য একটি চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠের সাথে লাগিয়ে ২৪ ঘন্টার জন্য রেখে দেয়া হয়। অতপর পশম টেনে তুলে ফেলা হয়। সবশেষে চামড়া ধুয়ে, চুন লাগিয়ে এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা সালফেটের দ্রবণ দিয়ে চুন অপসারণ করা হয়।

খ. চামড়াতে লবণ ও এসিড প্রয়োগ: এ ধাপে লবণ এবং সালফিউরিক এসিড এর পিকল দ্রবণে চামড়াকে ছেড়ে দেয়া হয়। পিকল দ্রবণে লবণ থাকবে প্রায় ১২% এবং সালফিউরিক এসিড এমন পরিমাণে থাকবে যাতে চামড়া পিকল দ্রবণ থেকে তোলার সময় দ্রবণে এসিডের মাত্রা ০.০১ বা ০.৫% থাকে। পিকল দ্রবণে কমপক্ষে ৩ ঘন্টা চামড়া নড়াচড়া করে সারারাত ঐ দ্রবণে রেখে দিতে হবে। দ্রবণ থেকে চামড়া তোলার পূর্বে আবারো কয়েক ঘন্টা নড়াচড়া করতে হবে।

সবশেষে চামড়া তুলে পানি অপসারণ করে কাঠের বাক্সে প্যাক করা হয় এবং ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা হয়। পোকা ধ্বংসকারী ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে এ চামড়াকে এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

সারমর্মঃ চামড়া পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এবং সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত বাতাসে শুকিয়ে, লবণ লাগিয়ে এবং পিকলিং করে চামড়া পচন ক্রিয়া রোধ করা সম্ভব। বাতাসের সাহায্যে চামড়াকে চারটি পদ্ধতিতে শুকানো যায় যেমন- মাটির উপরে শুষ্ককরণ, ঝুলিয়ে শুষ্ককরণ, তারে শুষ্ককরণ ও তাবু পদ্ধতিতে শুষ্ককরণ। এগুলোর মধ্যে মাটির উপরে চামড়া শুকানো পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত। লবণ দিয়ে চামড়ার কিউরিংও বেশ প্রচলিত তবে খরচ বেশি। পিকলিং প্রক্রিয়াটি দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয় যেমন- চামড়া থেকে পশম অপরারণ করে এবং চামড়াতে লবণ ও এসিড প্রয়োগ করে।

১১.৫.৪ চামড়া বাজারজাতকরণ

চামড়া শুকানোর পর গ্রেডিং করতে হয় এবং গ্রেডিং অনুযায়ী ভাঁজ করে গাইট আকারে বাধতে হয়। চিত্র-১১.৭ এবং অনুযায়ী চামড়া ভাজ করে স্তুপ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাল বাজার পাওয়ায় জন্য চামড়া সঠিক ভাবে ভাঁজ করা এবং গাইট বাধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চামড়া ভাঁজ করার নিয়ম

- চামড়ার প্রথম ভাঁজে ক-ক-দাগ এবং খ-খ-দাগ বরাবর হবে যাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১.৩ মিটারের অধিক হবে না। চামড়ার ভাঁজ যাতে সুষম হয় এজন্য লাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- চামড়ার পরবর্তী ভাঁজ হবে গ-গ দাগ বরাবর যা লেজের গোড়া হতে ১.৫ মিটারের বেশি হবে না।
- চামড়ার পৃষ্ঠদেশের ভাঁজ ঘ-ঘ দাগ বরাবর হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন ইহা আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

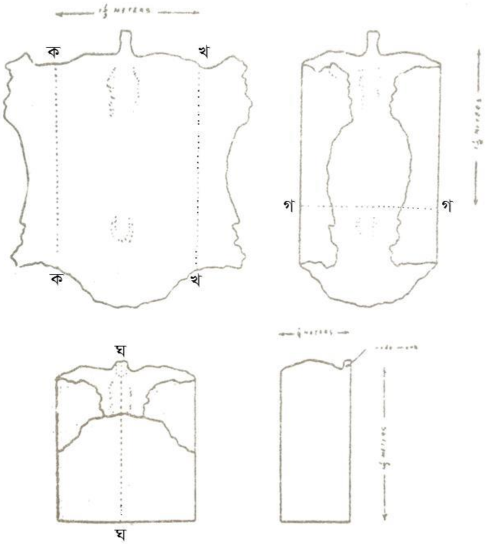

চিত্র ১১.৭ঃ সঠিকভাবে চামড়া ভাঁজ করার নিয়ম।

চামড়ার গ্রেডিংঃ চামড়ার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে বাণিজ্যিক মূল্য নির্ধারণ কল্পে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা কে গ্রেডিং বলে। যেমন- প্রথম গ্রেড, দ্বিতীয় গ্রেড ও তৃতীয় গ্রেড, অথবা বাংলা-১, বাংলা-২ ইত্যাদি। গ্রেডিং এর সুবিধা-

- চামড়ার আপত্তিকর ও পরিতাজ্য দ্রব্যাদি হ্রাস করে।
- সহজেই মূল্য নির্ধারণ করা যায়। পরিবহণ খরচ কমায়।
- দ্রব্যের প্রতি আস্থা আনে, ব্যবসা বৃদ্ধি করে এবং নির্ভরযোগ্য বাজার সৃষ্টি করে।
- ভেজাল দ্রব্যাদি উৎপাদন প্রতিরোধ করে।

পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই চামড়া ছাড়ানোর সময় যে সমস্ত ক্ষত দেখা দেয় এর উপর ভিত্তি করে চামড়ার গ্রেডিং করে থাকে। এগুলোর মধ্যে-

- প্রথম গ্রেডের চামড়া- এ ধরণের চামড়াতে কোন ক্ষত থাকে না। এ চামড়ার আকৃতি ও নমুনা নিয়মিত ও সুষম।
- দ্বিতীয় গ্রেডের চামড়া- এর আকৃতি ও নমুনা ভালো এবং পরিমিত একটি বা দুটির ছুরির দাগ থাকে।
- তৃতীয় গ্রেডের চামড়া- এ ধরণের প্রায় অর্ধেক অংশে বিভিন্ন ধরণের ক্ষত দেখা যায় যেমন- ফ্লেয়িং কাট, স্কোর ও গজ।

আমাদের দেশে চামড়া গ্রেডিং এর জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম বাংলা গ্রেড। একে বাংলা-১, বাংলা-২, বাংলা-৩ ও বাংলা-৪ এ চারটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে। এখানে চার ধরণের গ্রেডিং আলোচনা করা হয়েছে।

ছাগলের চামড়ার গ্রেডিং

বাংলা-১: এধরণের চামড়াতে কোন ধরণের যান্ত্রিক ও পরজীবি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত গ্রহণযোগ্য হবে না। অসুস্থ ও এলোমেলো লোম বিশিষ্ট চামড়া এ গ্রেডের অন্তর্ভূক্ত নয়। ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নিচে কোন চামড়ার ভিতর কাটা দাগ বা ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের উপরে কোন চামড়ার প্রান্তদেশ ২.৫ ইঞ্চি কাটা দাগ বা গভীর ক্ষত থাকলে তা বাংলা-১ গ্রেডের চামড়া বলে বিবেচিত হবে না। আবার ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নিচে কোন চামড়ার ভিতর কোন গজ মার্ক থাকলে তাহা গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু ২৪ ইঞ্চির উপরে কোন চামড়ায় দুটি গজ মার্ক থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

বাংলা-২: বাংলা ২ গ্রেডের চামড়া মোট এলাকার ৯৫% ক্ষত মুক্ত হতে হবে। এ ধরণের চামড়ায় ১ ইঞ্চি পর্যন্ত যান্ত্রিক ক্ষত গ্রহণযোগ্য। ছোট ও মধ্যম ধরণের চামাড়র ক্ষেত্রে পরজীবির ক্ষত ২ বর্গইঞ্চির বেশি এবং বড় চামড়ার ক্ষেত্রে ৪ বর্গইঞ্চির বেশি না হলে তা বাংলা-২ এর অন্তর্ভূক্ত হবে। কোন রিব মার্ক এ ধরণের গ্রেডে থাকবে না। এছাড়া ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নিচে কোন চামড়ার ভিতর ১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি কাটা দাগ বা একটি গভীর ক্ষত থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের উপরে কোন চামড়ায় ৩ টি কাটা দাগ বা গভীর ক্ষত থাকলে তা গ্রহণ যোগ্য হবে যদি ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত চামড়ার ভিতরে মোট কাটা দাগ ২ ইঞ্চি এর বেশি না হয়। অবশ্য ২৪ ইঞ্চি এর কম দৈর্ঘ্যের কোন চামড়ায় গজ মার্জ থাকলে তা গ্রেড-২ এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। তবে ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের এর বেশি হলে এতে ৪ টি গজ মার্ক থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে।

বাংলা-৩: মোট চামড়া ৮০% ক্ষতমুক্ত হতে হবে। এধরণের চামড়ায় গ্রেইন ভাঙ্গা ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। এ অতিরিক্ত রিব মার্ক গ্রহণযোগ্য নয়। ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নিচের কোন চামড়ার ভিতর ১ টি গভীর কাটা যার দৈর্ঘ্য ৩ ইঞ্চি এর বেশি না হলে বাংলা-৩ গ্রেডের অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের উপরে কোন চামড়ার ভিতর ১০ ইঞ্চি এর বেশি কাটা গ্রহণযোগ্য নয়। ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের নিচে কোন চামড়াতে কোন এলাকায় কোন কাট গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলা-৪: মোট চামড়ার ৬০% ক্ষতমুক্ত হতে হবে।

গরুর চামড়ার গ্রেডিং

বাংলা-১: হালকা এবং মধ্যম চামড়াতে ১.৫ ইঞ্চি এর বেশি গ্রেইন ভাঙ্গা থাকবে না এবং একটু বড় চামড়ার ক্ষেত্রে গ্রেইন ভাঙ্গা ১ ইঞ্চি এর বেশি হতে পারে। কোন প্রকার গজ মার্ক থাকবে না। এছাড়া রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বাছুরের চামড়ায় একটি কাটা বা গভীর স্কোর থাকবে যা ২ ইঞ্চি এর বেশি লম্বা হবে না এবং প্রান্ত ৩ ইঞ্চি ক্ষত গ্রহণযোগ্য। খুব বড় চামড়ায় প্রান্ত ৬ ইঞ্চি ক্ষত গ্রহণযোগ্য।

বাংলা-২: চামড়ার মোট এলাকার ৯৫% ক্ষতমুক্ত থাকবে। হালকা ও মধ্যম আকৃতির চামড়ার ক্ষেত্রে ৩ ইঞ্চি এবং একটু বড় চামড়াতে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত গ্রেইন ভাঙ্গা গ্রহণযোগ্য। একটি ব্র্যান্ড মার্ক গ্রহণযোগ্য যদি তা ৯ বর্গ ইঞ্চির বেশি না হয়, কোন গজ মার্ক থাকবে না। চামড়ার পুরা এলাকায় ৪ টি কাটা বা গভীর স্কোর গ্রহণযোগ্য। হালকা এবং মধ্যম হাইডের ক্ষেত্রে ৪ ইঞ্চি এর বেশি নয় এবং খুব বেশি বড় হাইডে ৬ ইঞ্চি এর বেশি নয়। বেন্ড এলাকায় ২ টি কাটা গ্রহণযোগ্য যা

হালকা বা মধ্যম হাইডের ক্ষেত্রে ২ ইঞ্চি এর বেশি নয় এবং খুব বড় হাইডের ক্ষেত্রে ৩ ইঞ্চি এর বেশি নয়। ভার্টিক্যাল কাট বেন্ড এলাকায় গ্রহণযোগ্য হবে যখন হালকা ও মধ্যম চামড়ার ক্ষেত্রে ১ ইঞ্চি এর বেশি নয় এবং বড় বা খুব ভারী হাইডের ক্ষেত্রে ২ ইঞ্চি বেশি নয়।

বাংলা-৩: চামড়ার মোট এলাকার ৮০% ক্ষতমুক্ত থাকবে। ছোট ও মাঝারি চামড়াতে ৪ ইঞ্চি এবং বড় চামড়াতে ৮ ইঞ্চি এর বেশি গ্রেইন ভাঙ্গা থাকবে না। সামান্য বিব মার্সস ও ইয়ক মার্কস গ্রহণযোগ্য। দৈর্ঘেও উপর ভিত্তি কওে ৮টি কাট বা গভীর স্কোর গ্রহণযোগ্য তবে তা হালকা ও মধ্যম চামড়ার ক্ষেত্রে ৮ ইঞ্চি এবং ভারী বা খুব ভারী হাইডের ক্ষেত্রে ১২ ইঞ্চি এর বেশি নয় আবার বেন্ড এলাকায় ৪ ইঞ্চি এর বেশি গ্রহণযোগ্য। হালকা বা মধ্যম চামড়ায় ২ ইঞ্চি এবং ভারী অতিরিক্ত ভারী হাইডের ক্ষেত্রে ৪ ইঞ্চি এর বেশি নয়।

বাংলা-৪: চামড়ার মোট আয়তনের ৬০% ক্ষতমুক্ত হতে হবে।

সারমর্মঃ চামড়ার ভাল বাজার পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে ভাঁজ করে গাইট বাধতে হয়। অবশ্য চামড়ার বাজার এর গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে নির্ণিত হয়। চামড়ার এ গুণাগুণ চামড়াকে বিভিন্ন গ্রেডে বিভক্ত করে থাকে একে চামড়ার গ্রেডিং বলে। যেমন- প্রথম গ্রেড, দ্বিতীয় গ্রেড এবং বাংলা-১, বাংলা-২ ইত্যাদি।

১১.৫.৫ চামড়ার বিভিন্ন ত্রুটি

পশুর চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু পশুর জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস, ছত্রাক ও পরজীবি ঘটিত রোগের কারণে, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে, সংরক্ষণ ও পরিবহনের সময় চামড়াতে বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি দেখা যায় বা অন্যকথায় চামড়ার ক্ষতি হয়। এসব ত্রুটির কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়। চামড়াতে সাধারণত যে সব ত্রুটি গুলো দেখা যায় সেগুলো হলো-

ক. জীবিত অবস্থায় পশুর চামাড়র ত্রুটি (damage while the animal is living)

- আচড় বা ছেঁড়া (seratches)
- চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহৃত ব্র্যান্ডিং এর দাগ (branding)
- শিং দ্বারা ক্ষতি (mechanical damage from catlle horns)
- কাঁটা দ্বারা ক্ষতি (thorn' and `stick-grass' lesions)

খ. পরজীবি, ছত্রাক এবং ভাইরাস ঘটিত রোগের কারণে সৃষ্টি ত্রুটি (damage caused by parasites and by fungal and virus diseases)

- মেঞ্জ (mange)
- চুলকানি (scabies)
- আঠালি (ticks)
- উকুন (lice)
- জোক (leeches)
- মাছি (warble fly)
- দাদ (Ringworm)
- গো বসন্ত (Rindcrpest)
- ট্রাইপানোসোমিয়াসিস (Trypanosomiasis)
- এনথ্রাক্স (Anthrax)
- হাম্পসার (Humpsore)

গ. পশুর মৃত্যুর পর চামড়া ছাড়ানো, শুকানো বা লবণ দিয়ে কিউরিং এর সময় ক্ষতি (damage following death or during flaying, drying or salt curing)

- রক্ত ও গোবর দিয়ে ময়লা হওয়া (fouling with blood and dung)
- থেতলিয়ে যাওয়া (bruises)
- অসম্পূর্ণ রক্তক্ষরণ (inadeaquates sbleeding)
- ঘর্ষণ বা টানাহেঁচড়ার ফলে ত্রুটি (rubbed or dragged grain)

- চামড়া ছাড়ানোর সময় চাকু দিয়ে সৃষ্ট ত্রুটি (flay cuts, gouge marks and scores)
- আকৃতিগত ত্রুটি (bad pattern)
- দেরীতে চামড়া পরিষ্কার করা, শুকানো বা কিউরিং করা (delay in deaming, drying or curing)
- শক্তভাবে টান করা এবং মোচড়ানো (overstretching and distortion)
- ভাঁজ করা (folding)

গ. সংরক্ষণ ও পরিবহণের সময় ত্রুটি (damage during storage and transport)

- পরিবহণের সময় ঘর্ষণজনিত ত্রুটি (rubbing during transport)
- চামড়া ভিজে যাওয়া (wetting)
- ইঁদুর, চিকা ইত্যাদির কারণে ত্রুটি (vermin damage)
- পোকামাকড়ের কারণে ত্রুটি (inseet damage)

ক. পশুর জীবিত অবস্থায় চামড়ার ত্রুটি

আচড় বা ছেঁড়া (seratches): চামড়ার একটি অতি সাধারণ ত্রুটি যা কাঁটা, শিং বা কাঁটা তারের মাধ্যমে হয়ে থাকে। লাঠির অগ্রভাগের সূচালো ধাতব অংশের আঘাতের ফলে প্রধানত পশুর দেহের পেছনের অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এসব কারণে চামড়াতে যে ত্রুটির সৃষ্টি হয় তা চামড়ার মূল্য কমিয়ে দেয়।

চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহৃত ব্র্যান্ডিং এর দাগ (branding): পশুকে চিহ্নিত করার জন্য লোহার পাত উত্তপ্ত করে পশুর দেহে দেয়া হয়, যা পশুর জীবিত অবস্থায় চামড়ায় ক্ষতির অন্যতম করণ। যদি এ পদ্ধতিতে চিহ্নিকরণ অতীব জরুরী হয়ে থাকে তবে চামড়ার মূল্যবান অংশে দাগ না দিয়ে চুট, চোয়াল, খুর, শিং পায়ের নিম্নাংশ প্রভৃতি স্থানে দাগ দেয়া উচিত। চামড়ার কোন ক্ষতি না করে পশুকে চিহ্নিত করণের উত্তম উপায় হচ্ছে কানে নাম্বার যুক্ত রিং লাগানো। আবার অনেক সময় পশুকে রোগ- বালাই থেকে রক্ষা করার জন্য এধরণের লোহার দাগ দেয়া হয়ে থাকে, যা অত্যন্ত আপত্তিকর।

শিং দ্বারা ক্ষতি (mechanical damage from cattle horns)ঃ যে সকল অঞ্চলের গবাদিপশুর শিং বেশ বড় সেখানে এ ধরণের ক্ষতি দেখা যায়। সাধারণত পেট, সামনের ও পিছনের কোয়াটারে এ ধরণের ক্ষত দেখা যায়। ফলে অতি সহজেই ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবি দ্বারা ক্ষত স্থানটি আক্রান্ত হয় এবং চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

কাঁটা দ্বারা ক্ষতি (thorn' and `stick-grass' lesions): পৃথিবীর কিছু কিছু নির্দিষ্ট এলাকার চামড়াতে, বিশেষ করে ভেড়ার চামড়াতে এ ধরণের ত্রুটি দেখা যায় যাকে থর্ন (thorn) বলে। পশুর জীবিত অবস্থায় কাঁটা বা কাঁটাযুক্ত বীজ বা ঘাসের বীজ চামড়ার ভেতরে ঢুকে এবং সেখানে থেকে যায়। ঐ পশুর চামড়া যখন ট্যানিং করা হয় তখন চামড়ার উভয় পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত এবং ক্ষত দেখা যায়।

খ. পরজীবি, ছত্রাক এবং ভাইরাস ঘটিত রোগের কারণে সৃষ্ট ত্রুটি

মেঞ্জ (mange)ঃ মেঞ্জ হলো মাইট নামক এক ধরণের অনুবীক্ষণিক পরজীবি দ্বারা সৃষ্ট চর্মরোগ। মাইট দ্বারা আক্রান্ত চামড়া যখন বাতাসে শুকানো হয় তখন চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠে পনিরের মতো হলুদ রঙের গোলাকৃতির দাগ দেখা যায়। ট্যানিং এর সময় প্রথমদিকে এ হলুদ দাগ দূরীভূত হয় কিন্তু পরবর্তীতে চামড়ায় ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়।

চুলকানি (scabies)ঃ যে সমস্ত পশুতে চুলকানি রোগ থাকে, ঘষাঘষির ফলে তাদের চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো চামড়া ছিঁড়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে চামড়ায় ক্ষত পাওয়া যায়।

আঠালি (ticks)ঃ এসমস্ত রক্তচোষা পরজীবি চামড়ার নরম ও পাতলা অংশে (যেমন- গলকম্বল, উরুর ভেতরের অংশ ইত্যাদি) বেশি দেখা যায়। যদি জবাই করার পূর্বে আঠালি পশুকে কামড়ায় তাহলে চামড়ায় ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়। অবশ্য পূর্বে কামড়ানো চামড়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগের সৃষ্টি হয়।

উকুন (lice): চামড়ার যেখানে উকুন আঁকড়িয়ে থাকে সেখানে ফুলে যায় এবং চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

জোক (leeches): কোন কারণে পশু পানিতে নামলে জোক দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। জোক দ্বারা আক্রান্ত পশুর চামড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায় এবং আঁচড় দেয়ার মতো দাগের সৃষ্টি হয়।

ওয়ার্বল মাছির লার্ভা (wafble fly larvae): ওয়ার্বল মাছি বোলতা বা ভীমরুলের ন্যায়। ওয়ার্বল মাছির ডিম থেকে লার্ভার সৃষ্টি হয়। এই লার্ভা যখন তার জীবনের শেষ স্তরে পোঁছায় তখন পশুর শরীরে কামড় দেয়। ফরে চামড়ায় গর্তের সৃষ্টি হয়। এই লার্ভা যখন তার জীবনের শেষ স্তরে পৌছায় তখন পশুর শরীরে কামড় দেয়। ফরে চামড়ায় গর্তের সৃষ্টি হয়। চামড়া শুকানোর পর এ গর্ত আরো বড় হয়। একটি চামড়ায় এধরণের ৬০০-৭০০ টি গর্ত সৃষ্টি হওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

দাদ (ring worm): দাদ ছত্রাকঘটিত একটি অতি সাধারণ রোগ। এ রোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে বিস্তার লাভ করে। ছত্রাক পশম এবং পশমের গোড়াতে আক্রমণ করে এবং এসব স্থানের সংবহনতন্ত্রে প্রদাহ সৃষ্টি করে। সবশেষে ঐ স্থানগুলোতে খোসপাচড়া বা চুলকানির সৃষ্টি হয়। ট্যানিং এর সময় চামড়ায় অত্যান্ত স্পষ্ট গোল গোল দাগ দেখা যায়।

গো বসন্ত (cow pox): গোবসন্ত একটি সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশুর ওলান এবং চামড়ার নরম অংশগুলোতে প্রথমে প্রদাহজনিত ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে ফুসকুড়ির সৃষ্টি হয় এবং এর মধ্যে পুঁজ জমে। চামড়াতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ঘষাঘষির ফলে একদিকে যেমন চামড়ার ক্ষতি হয় অপরদিকে পরবর্তী সময়ে রোগ সংক্রমণে সাহায্য করে।

রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest): এ রোগে আক্রান্ত পশুর চামড়া হালকা এবং পাতলা, কালো ও বর্ণহীন হয়ে যায়। চামড়ায় যদিও কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয় না কিন্তু অতি পাতলা চামড়া দিয়ে শুধুমাত্র জুতার তলি তৈরির উপযোগী হালকা লেদার তৈরি করা সম্ভব হয়।

ট্রাইপ্যানোসোমিয়াসিস (Trypanosomiasis): এ রোগে মৃত্যুবরণকারী পশুর চামড়া হালকা এবং পাতলা হয়, পশম ঝরে যায় এবং পুরোনো ঘা ও ক্ষতের প্রসারণ ঘটে।

এনথ্রাক্স (Anthrax): এটি একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। এই রোগে মৃত্যুবরণকারী পশুর চামড়া ছাড়ানো কখনোই উচিত নয়।

গ. পশুর মৃত্যুর পর চামড়া ছাড়ানো, শুকানো এবং লবণ দিয়ে কিউরিং এর সময় ত্রুটি

হাম্পসোর: আমাদের দেশে ভার বহনকারী বা হলের গরুর ঘাড়ে সাধারণত হাম্পসোর দেখা যায়। এই রোগ একটি পরজীবি ছত্রাকজনিত রোগ। এর ফলে চামড়ার ঘাড়ের অংশে প্রদাহজনিত ক্ষত হয়।

রক্ত এবং গোবার দিয়ে চামড়া ময়লা হওয়া (fouling with blood and dung): পশুর শরীরের পশম বা লোম থেকে রক্ত অপসারণ করা অত্যন্ত জটিল। পশম বা লোমের সাথে লেগে থাকা রক্ত কিউরিং-এ বাধার সৃষ্টি করে। এ কারণেই কসাইখানার মেঝে পড়ে থাকা রক্ত বা গোবর যাতে চামড়ায় না লাগতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

থেতলিয়ে যাওয়া (bruises): জবাইয়ের পূর্বে পশুকে লাঠি দিয়ে পেটানো হলে পেটানো অংশের মাংস থেতলিয়ে যায় এবং অংশের চামড়ার ভেতরকার ছোট ছোট রক্তনালি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চামড়ার মাংসল পৃষ্ঠ লাল হয়ে যায়। এ ধরণের চামড়া যদি সতর্কতার সাথে পরিষ্কার করা না হয় এবং তাড়াতাড়ি শুকানো না হয় তবে চামড়ায় দ্রুত পচন ধরে এবং শুকানো চামড়ায় ত্রুটি পূর্ণ দাগ দেখা যায়। আবার জবাইয়ের সময় পশুকে যদি পাকা মেঝেতে জোরে শোয়ানো হয় তাবে একই ধরণের ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

অসম্পূর্ণ রক্তরক্ষণ (inadequate bleeding): জবাইয়ের পর পশুর শরীর থেকে যদি সম্পূর্ণ ভাবে রক্ত বের না হয় তবে চামড়ার রক্তনালিতে রক্ত থেকে যায়। পরবর্তীতে চামড়া পরিষ্কার করতে এবং শুকোতে দেরী হলে ব্যাকটেরিয়া খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং চামড়ার ক্ষতি সাধন করে।

ঘর্ষণ বা টানাহেঁচড়া জনিত ক্ষতি (rubbed or dragged grain): পশুকে জীবিত অবস্থায় বা জবাইয়ের পর যদি অমসৃণ জায়গার উপর টানাহেঁচড়া করা হয় তবে ঘর্ষনের ফলে চামড়ার ক্ষতি সাধিত হয়।

চামড়া ছাড়ানোর সময় চাকু দিয়ে সৃষ্ট ক্ষতি (flay cuts, gouge marks and scores): পশুর চামড়া থেকে চামড়া ছাড়ানোর সময় এবং চামড়াতে লেগে থাকা চর্বি এবং মাংস অপসারণ করার সময় অসতর্ক ভাবে ছুরি চালানোর ফলে বা ছুরির মাথা ধারালো হওয়ায় চামড়াতে ক্ষতির সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে শতকরা ২০ ভাগ গরু মহিষের চামড়াতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ ছাগল ভেড়ার চামড়াতে এ ধরণের ক্ষতি হয়ে থাকে।

আকৃতিগত ত্রুটি (bad pattern): সঠিকভাবে চামড়া না ছাড়ালে এধরণের ত্রুটি দেখা যায়। ফলে বিষম আকৃতির চামড়া পাওয়া যায়, যা চামড়ার মূল্য কমিয়ে দেয়।

দেরীতে পরিষ্কার করা, শুকানো, বা কিউরিং (delay in cleaning, dryling, or curing): চামড়া ভালভাবে পরিষ্কার না করলে, না শুকালে বা সঠিকভাবে কিউরিং না করলে চামড়াতে পচন ধরে। এ ধরণের চামড়া থেকে কখনোই ভাল লেদার তৈরি করা সম্ভব হয় না।

শক্তভাবে টান করা এবং মোচড়ানো (overstretching and distortion): যখন চামড়াকে ফ্রেমে আটকিয়ে শুকানো হয় তখন এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে চামড়ার স্বাভাবিক আকৃতি বজায় থাকে। যদি বেশি রকম টান করে বাঁধা হয় তবে শুকানোর সময় সংকোচনের ফলে চামড়ার পাতলা অংশ ফেটে যাবে। ফলে এ ধরণের চামড়া থেকে তৈরিকৃত লেদার মজবুত হবে না। আবার যদি চামড়ার যে কোন দিক বেশি টান করে বাঁধা হয় তবে চামড়া মুচড়িয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হয়ে যাবে।

ভাঁজ করা (folding): যদি ফ্রেমে বা তারে শুকানোর পরপরই চামড়া খুব দ্রুত মেরুদন্ড বরাবর ভাঁজ করা হয় তবে চামড়াতে সামান্য ত্রুটি দেখা দিতে পারে। কিন্তু যদি চামড়া মাটিতে বিছিয়ে খুব বেশি শুকানো হয় এবং এপর ভাঁজ করা হয় তবে চামড়াতে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে লেদার ভেঙ্গে যায়।

ঘ. সংরক্ষণ ও পরিবহণের সময় ত্রুটি

পরিবহণের সময় ঘর্ষনজনিত ক্ষতি (rubbing during transport)

উষ্ণমন্ডলীয় এবং আধা উষ্ণ মন্ডলীয় দেশগুলোতে বিভিন্ন ভাবে চামড়া পরিবহণ করা হয়ে থাকে। পরিবহণের সময় সাধারণত চামড়া খোলা রাখা হয় এবং ঢিলেঢালা করে বাঁধা হয়। ঘর্ষণের ফলে চামড়ার ভাঁজ করা অংশে এবং কোণগুলোতে ত্রুটি দেখা যায়। সুতরাং পরিবহণের সময় চামড়া চট দিয়ে ঢেকে নিয়ে ভালভাবে বাঁধা উচিত।

ভিজে যাওয়া (wetting): চামড়া যদি হঠাৎ কোন কারণে ভিজে যায় এবং সাথে সাথে শুকানো না হয় তবে চামড়া থেকে লবণ বের হয়ে যাওয়ার ফলে চামড়াতে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ঘটে। যদি লবণ দিয়ে কিউরিং না করে চামড়া শুধু রোদে শুকানো হয় হবে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ আরো দ্রুত এবং বেশি করে ঘটবে। তাই চামড়া যাতে ভিজে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

ইঁদুর ও চিকা দ্বারা ক্ষতি (vermin damage): চামড়া সংরক্ষণের সময় ইঁদুর বা চিকার আক্রমণে ভাল মানের চামড়াও অত্যন্ত নিচুমানের চামড়াতে পরিণত হতে পারে। এজন্য চামড়া সংরক্ষণ ঘর পরিষ্কার রাখতে হবে। মাঝে মাঝে চামড়ায় স্তুপ নড়াচড়া করতে হবে। প্রয়োজনবোধে ঘরে বিষ রাখতে হবে, ফাঁদ পাততে হবে, বিড়াল রাখতে হবে।

পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতি (insect damage): যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং আর্দ্রতা বেশি থাকে সেসব এলাকায় পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি ঘটে থাকে। এসব এলাকায় পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিভিন্ন ইনসেকটিসাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারমর্মঃ পশুর চামড়া মূল্যবান যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য পশুর চামড়া যাতে ত্রুটি মুক্ত থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চামড়াতে বিভিন্ন ধরণের ভাইরাস, ছত্রাক ও পরজীবিঘটিত রোগের কারণে, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে, সংরক্ষণ ও পরিবহণের সময় ত্রুটি দেখা দেয়।

১১.৬ চামড়া শিল্পের সমস্যা এবং ভাল চামড়া উৎপাদনে করণীয়

বাংলাদেশে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির একটি সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে চামড়া শিল্প। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এই খাতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.৫%। বিশ্বের চামড়ার বাজার শতকরা ২ ভাগ দখল করে আছে বাংলাদেশ। আমাদের দেশের চামড়া উচ্চ মানসম্মত বিধায় বিদেশীদের কাছে এর চাহিদা অনেক বেশি। পৃথিবীর অনেক দেশ বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী। বর্তমানে পৃথিবীর ৩০ টি দেশে চামড়া রপ্তানীও হচ্ছে। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত চামড়ার ৫০% বিদেশে রপ্তানী হয়। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত একটি জন বহুল দেশ বিধায় এখানে সারা বছরই গরুসহ অন্যান্য মাংসের চাহিদা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবেও গবাদিপশু জবাইয়ের কারণে চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্রতি বছর মোট উৎপাদিত চামড়ার ৪০% উৎপাদিত হয় পবিত্র ঈদ-উল-আযহার সময়। সর্বশেষ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে গরুর সংখ্যা ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার, ছাগলের সংখ্যা ২ কোটি ২৪ লাখ। তাই বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা কখনও ম্লান হবে না। এই শিল্পকে আরো বেগবান ও লাভজনক করতে চাইলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং কসাইদের চামড়া ছাড়ানো, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রটিতে দেশের প্রাণিসম্পদ বিভাগ অবদান রাখতে পারে।

চামড়া শিল্পের সমস্যা

- অপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থাপনা।
- চামড়া উৎপাদনে সঠিকভাবে চামড়া ছাড়ানোর নিয়ম-কানুন না মানা।
- কসাইদের চামড়া উৎপাদন ও সঠিকভাবে চামড়া ছাড়ানোর প্রশিক্ষণের অভাব।
- চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রশিক্ষণসহ পর্যপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব।
- উন্নত মানের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যের অপ্রাপ্যতা ও আধুনিক কসাইখানার অভাব ও
- বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাব।

পশুর চামড়ার গুণাগুণ ভাল রাখার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ

চামড়া পশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপজাত। তাই কেবল ভাল উচ্চ গুণসম্পন্ন চামড়া থেকেই উচ্চমানের লেদার উৎপাদন করা সম্ভব। উচ্চমানের চামড়া উৎপাদনে পাঁচটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। যথা- পশু পালন কৌশল, পশু পরিবহন, চামড়া ছাড়ানো সল্টিং এবং কিউরিং। এই পাঁচটি পদক্ষেপ মেনে চলা বা পরিচালনার জন্য করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে দেওয়া হল-

- খমারে পশু পালনের সময় ঘন ঘন ব্র্যান্ডিং বা মর্কিং করা যাবে না। পশু চামড়া যেন কোনভাবেই কোন অংশ কেটে বা ছিড়ে না যায় সেইদিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। পশুর শরীরে এলার্জি বা ক্ষত হয় এমন ধরণের খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পশু পরিবহনের সময় পশু রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকা উচিত যাতে একে অন্যকে শিং দ্বারা আহত করতে না পারে। পরিবহনের সময় পরিবহনের ত্রুটির কারণে যেন পশু আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।
- পশু জবাইয়ের পূর্বে যত্নসহকারে নাড়াচাড়া করতে হবে। জবাই এর আগে পশু ভয় পেয়ে উত্তেজিত হলে জবাই এর সময় অত্যধিক নড়াচড়া করতে পাওে, ফলে চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- জবাইয়ের পূর্বে পশুকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং গা না শুকিয়ে জবাই করা উচিত নয়।
- ইচ ও পাথরযুক্ত, ধুলাবালি, কাদায় পশু জবাই করা যাবে না।
- জবাই এর পর পশুকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া যাবে কারণ এত চামড়ার গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

- চামড়া ছাড়ানোর সময় ধারালো ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। তবে ধারালো ছুরি বা কাঁচি দ্বারা চামড়ার মাঝের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেন কেটে না যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে ধারালো বাঁকা ছুরি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ছাড়ানোর সময় যাতে চামড়ায় মাংস, চর্বি, রক্ত ইত্যাদি লেগে না থাকে সেই দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ মাংস, চর্বি ও রক্তের কারণে চামড়াতে পচন ধরতে পারে।
- জবাইয়ের পূর্বে পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে এবং জবাইয়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে থেকে খাবার বন্ধ করতে হবে। এতে শরীর থেকে চামড়া ছাড়ানো সহজ হবে এবং মাংসের গুণাগুণ ভাল হবে।
- চামড়া ছাড়ানোর ১/২ ঘন্টা পর চামড়া ঠান্ডা হলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করে তাতে লবণ দিতে হবে এবং লোমশ অংশ বাহিরে মাটির উপর রাখতে হবে।

১১.৭ কোরবানীর পশু নির্বাচন, জবাই, চামড়া ছাড়ানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়

ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় গুরুত্ব বিষয়। প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমকে নবী ইব্রাহীম (আ:) সুন্নাত পালনের জন্য গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উট, ইত্যাদি কোরবানী দিতে হয়। কোরবানী মানে ত্যাগ তাই যে যত ভাল ও সুস্থ পশু ক্রয় করে সে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। পবিত্র ধর্ম পালন করতে গিয়ে কোরবানীর ঈদ আসার পূর্বে থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভানা শুরু হয়। কোন প্রজাতির পশু কোরবানী দিবে, একা না অনেক কয়েকজন মিলে, কেমন দাম হবে, কোন বাজার থেকে ক্রয় করা হবে, ক্রয়কৃত পশু কোথায় রাখা হবে, কোথায় জবাই করা হবে, কাকে দিয়ে জবাই করা হবে, কারা চামড়া ছাড়াবে, কারা মাংস প্রস্তুত করবে, মাংস কিভাবে সংরক্ষণ করে ঈদ পরবর্তী সময় দীর্ঘ দিন রাখা যাবে এবং চামড়া কোথায় বিক্রয় করা হবে, জবাইকৃত পশুর রক্ত, নাড়িভুঁড়ি ও মল কোথায় রাখবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ঈদ-উল-আযহার ১৫-২০ পূর্বে শুরু হয় এসব জল্পনা কল্পনা। এর মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে তা হল পশু সুস্থ না অসুস্থ। সুস্থ হলে পশুকে মোটাতাজা করা হয়েছে স্টেরোয়েড ব্যবহার করে না ইউরিয়া সার খাওয়ায়ে ইত্যাদি বিষয় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। আবার এনথ্রাক্সসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ভয়ও থাকে। ইসলামের শরিয়ত মোতাবেক কোরবানীর পশু অবশ্যই হতে হবে সুস্থ সবল ও রোগ-মুক্ত। আবার ছাগল ভেড়ার ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে স্থায়ী দুই দাঁত বা ১ বছর বয়সী এবং গরুর ক্ষেত্রেও নিচের চোয়ালে স্থায়ী দুইটি দাঁত বা ২-৩ বছর হতে হবে। আরেকটি বিষয় হল শিং ভাংগা, কান কাটা, চামড়া কাটা, খুর ভাংগা, ইত্যাদি থাকলে সে পশু কোরবানীর অযোগ্য। এমনিতেই বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে কোরবানীর সময় গরু-ছাগলের মূল্য অনেকটা বেশি থাকে। কারণ মাংসের দামে বিক্রয় হয় না বিক্রয় হয় অনেকটা সৌন্দর্য, রং ও চেহারা দেখে। গরু-ছাগলের দাম যাই হোক না কেন? প্রশ্ন হল পশু সুস্থ কিনা একটি বড় কথা। তাই সুস্থ পশু নির্বাচন করতে গেলে একটি সুস্থ পশুর কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলো জানা আবশ্যক।

পশু নির্বাচন (animal selection): নিম্নবর্ণিত পশুর বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ দেখে সুস্থ ও সবল পশু কোরবানীর জন্য নির্বাচন করা হয়-

- পশুর নাকের অগ্রভাগ খাড়া ও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমবে ও চকচকে হবে।
- নাক, মুখ ও কান পরিষ্কার থাকবে।
- শরীরের পশম মসৃণ ও তেলতেলে থাকবে অর্থাৎ পশুর শরীরের লোম উজ্জ্বল, মসৃণ ও চকচকে থাকবে।
- পশু সব সময় লেজ ও কান নাড়াচাড়া করবে।
- পশু পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে অর্থাৎ পশুর নিকট কেই আসলে বা শব্দ হলে সেই মুহূর্তে ওই দিকে দৃষ্টি দিবে বা কান খাড়া করে সাড়া দিবে।
- পশুর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে যেমন- গরুর ক্ষেত্রে ১২-৩০ এবং ছাগল ভেড়া ৪০-৬০ বার হতে হবে।
- শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। পশুর শরীরে জ্বর আছে কিনা তা জানার জন্য ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করা যায়। গরু ও মহিষের স্বাভাবিক তাপমাত্রা- ১০০-১০২ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং ছাগল ভেড়ার

১০৩-১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের ব্যবস্থা না থাকলে পশুর কান ধরে অনুভব করা যায়। যদি অত্যধিক গরম মনে হয় তবে বুঝতে হবে পশুটি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। আর জ্বর থাকলে তেমন খাওয়া রুচি থাকবে না।

- খাওয়া-দাওয়ার রুচি থাকবে ও পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে। খাওয়ার রুচি পরীক্ষা করার জন্য সামনে ভাল ও সুস্বাদু খাবার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।
- পশু দিনে ৭/৮ বার জাবর কাটবে।
- পশুর প্রস্রাব পায়খানা স্বাভাবিক এবং সঠিক রং থাকবে।
- পশুর স্বাস্থ্য ভাল বা সবল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য পশুর পেটের উপরের লাম্বার কশেরুকা প্রসেসগুলো দেখে অনুমান করা যায় পশুটির স্বাস্থ্য কেমন? লাম্বার কশেরুকার প্রসেসসমূহ যদি অতি সহজেই দূর থেকে ভেসে উঠা দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পশুর স্বাস্থ্য খুব খারাপ, আর সবল পশুর সমস্ত শরীর মাংসে পূর্ণ থাকে, শরীরের হাড্ডি তেমন দেখা যাবে না।
- ত্রুটিমুক্ত পশু কেনার জন্য পশুর নিকট গিয়ে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। তার শিং ভাংগা কিনা, কান কাটা কিনা, চামড়া কোথাও ক্ষত কিনা, পা ভাঙ্গা কিনা, লেজ ভাল কিনা নিখুঁতভাবে দেখে শুনে কোরবানীর পশু নির্বাচন করতে হবে।
- পশু অন্ধ কিনা তা দেখার জন্য পশুর চোখের সামনে আঙ্গুল উঠা-নামা করার সময় যদি পশুর চোখের পাতা টিমিসটিমিস করে তবে বুঝা যাবে পশু অন্ধ নয়।
- পশু ল্যাংড়া বা খোড়া কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য হাঁটিয়ে দেখতে হবে।
- পশুর শরীরে কোন অসুখ আছে কিনা তার জন্য পশুর সামনে খাবার দিয়ে যাচাই করতে হবে। যদি পশু মুখ দিয়ে শুঁকে এবং খাবার চেষ্টা করে তবে বুঝতে হবে পশু সুস্থ।
- পশু সুস্থ ও সবল হওয়ার পাশাপাশি কোরবানীর পশু বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দাঁত দেখে পশুর বয়স নির্ণয় করা যায়। গবাদিপশুর যখন দুটি স্থায়ী ইনসিজর দাঁত ওঠে তখন পশুটির বয়স হবে ১৯-২৪ মাস অর্থাৎ গরুর বয়স প্রায় ২ বছর। এর পর প্রতি ৬-৯ মাস অন্তর অন্তর এক জোড়া করে স্থায়ী দাঁত উঠে। দেখা গেছে ৩.৫-৪.০ বছরের গরুর সামনের নিচের পাটিতে প্রতি পার্শ্বে ৪ টি করে মোট ৮ টি স্থায়ী দাঁত উঠবে। তবে স্থায়ী দাঁত গজানোর পূর্বে গরুর বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় অথবা বাছুরের ১ সপ্তাহ বয়সে সামনের অস্থায়ী দাঁত গজায় এবং ৫-৬ মাসের মধ্যে অস্তায়ী দাঁত সবগুলো উঠে যায়। অস্থায়ী ও স্থায়ী দাঁতের মধ্যে পার্থক্য হল অস্থায়ী দাঁতগুলো কিছুটা সরু, দুই দাঁতের মাঝে ফাঁকা থাকে এবং স্থায়ী দাঁত মোটা হয়ে ওঠে এবং দুই দাঁতের গোড়ায় কোন ফাঁকা থাকে না।
- আবার ছাগল-ভেড়ার সামনের ইনসিজর দাঁত ১ বছরে মাড়ীর নীচের পাটিতে উঠে। এইভাবে প্রতি ছয়মাস পর পর পরবর্তী আরো ৩ জোড়া ইনসিজর দাঁত উঠে। ২ দাঁত হলে বয়স হবে ১ বছর, ৪ দাঁত হলে বয়স হবে ১.৫ বছর এবং ৮ দাঁত হলে বয়স হবে ২.৫ বছর।

পশুর দাম শুধু তার চেহারা ও সুস্থতার উপর নির্ভর করে না। পশুর মূল্য নির্ভর করে তার ওজনের উপর। তাই পশুর ওজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশুর ওজন নির্ণয় করতে পারলে পশুর মূল্য নির্ধারণ করা সহজ হয়।

পশু জবাইয়ের পূর্বে করণীয়

কোরবানীর পশুকে ক্রয় করার সময় সম্ভব হলে পশুর মালিকের নিকট থেকে পশুকে কি কি খাওয়ানো হতো তা জেনে নিতে হয় এবং সেই সেই অনুপাতে পশুকে খাবার দিতে হয়। পশুকে নিরাপদ স্থানে রেখে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কোরবানীর পশুকে অবশ্যই শান্ত পরিবেশ রাখতে হবে। কেউ যেন তাকে উত্যক্ত না করে বা কোন কিছু খেতে না দেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কোরবানীর পশু যেহেতু খুব পরিশ্রান্ত থাকে (দূরবর্তী স্থান থেকে পরিবহনজনিত কারণে) সেহেতু পশুকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে দিতে হবে। পরিষ্কার স্থান বা ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। রাত্রে পশু যেন নিরুপদ্রব ও শান্ত পরিবেশে থাকতে পারে তার সব ব্যবস্থা নিতে হবে। পশু স্বতন্ত্রভাবে রাখা উচিত। কারণ বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রয়কৃত কয়েকটি প্রাণী একত্রে রাখলে তাদের মধ্যে মারামারি লাগতে পারে এবং এর ফলে এরা

যে কোন সময় দূর্ঘটনায় পড়তে পারে। তাছাড়া এরা পরিপূর্ণ বিশ্রামও নিতে পারে না। পশুকে কুরবানীর দিনের আগের রাত থেকে সব ধরণের খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। শুধুমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করতে দিতে হবে।

পশু জবেহ (slaughtering)

কোরবানীর দিন ভোরবেলা পশুকে উত্তমরূপে গোসল করাতে হবে। শরীরের কোথাও ময়লা লেগে থাকলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে সারা শরীর মুছে দিয়ে শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে। যদি শীতকাল হয় তাহলে ঠান্ডা পানির সাথে উষ্ণ পানি মিশ্রিত করে নেয়া উচিত। এত পশু আরাম বোধ করবে। কোরবানীর দিন সকালে পশুকে যথেষ্ট পানি পান করতে দেয়া উচিত। এর ফলে জবাইয়ের সময় চামড়া ছাড়ানো সহজতর হয় এবং মাংসের গুণাগুণ ভাল হবে। পশুকে জবাইকালে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী মতে গরু-ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে মাটিতে ফেলে ভালভাবে চেপে ধরে রাখতে হয়। ফেলতে গিয়ে পশু যেন বেশি কষ্ট না পায় সেই দিকে খেয়াল করতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত হে-রোপ পদ্ধতিতে গবাদিপশুকে মাটিতে ফেলানো হয়। শিং/মাথা থেকে সামনে ৩০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি মোটা দড়ি দিয়ে প্রথমে পশুর মাথায়/গলায় বেঁধে নিতে হবে এবং গলায় যেন ফাঁস না লাগে। গরুর সামনের দুই পায়ের পিছনে বুকে একটি দড়ির প্যাঁচ দিতে হবে এবং ওই দড়ি দিয়ে পেছনের দুই পায়ের সামনে আকেরটি প্যাঁচ দিয়ে পশুর সামনে একটি দড়ি দিয়ে টানতে হবে এবং পিছনের একটি প্রান্ত টান দিলে পশু মাটিতে পড়ে যাবে এবং পড়ে যাবার পর সামনের এক পা ও পেছনের ২ পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এভাবে সহজেই গরুকে নিয়ন্ত্রণ করে মাটিতে ফেলা যায়। এই প্রক্রিয়ায় গরু উঠে দৌড় দেবার সুযোগ পায় না অথচ অনভিঙ্গ কসাইরা গরুকে মাটিতে ফেলার জন্য ধাক্কাধাক্কি করে ও সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে ইসলামসম্মতভাবে সঠিক পদ্ধতিতে প্রায়শ জবাই করা যায় না। এর ফলে পশু নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে পতিত হয় এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এতে চামড়ায় ক্ষত হয়ে চামড়া ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। পশুকে কখনও পাকা বা শক্ত স্থানে শোয়ানোর চেষ্ট করা উচিত নয় কারণ তাতে পশু নির্দিষ্ট স্থান থেকে দূরে পতিত হয় এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এতে চামড়ায় ক্ষত হয়ে চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পশু মাটিতে ফেলার কয়েকটি শর্ত তা হল-

- পশুকে মাটিতে ফেলার ১২ ঘন্টা পূর্বে থেকে অনাহারে রাখা উচিত। কারণ ভরা পেটে পশুকে মাটিতে ফেলতে গেলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে পশু মারা যেতে পারে;
- পশুকে যেখানে ফেলানো হবে সে স্থানটি যেন সমতল হয়;
- যেখানে পশুকে মাটিতে ফেলা হবে সেই স্থান কোন প্রকার ইটের খোয়া, পাথর, গোজা, ঢিলা, কাঁটা, তারকাটা, কাঠের টুকরা বা ধারালো কোন জিনিস হতে মুক্ত হতে হবে। যদি এগুলোর যে কোন একটি থাকে তাহলে পশুর শরীরের চামড়া কেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হবে;
- পশুকে বাম পার্শ্বে শোয়াতে হবে। যেহেতু ডান পার্শ্বে লিভার বা যকৃত থাকে তাই ডান কাতে শোয়ানোর পরে শরীরের চাপে লিভার আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে এবং এতে পশু মারাও যেতে পারে;
- শোয়ানো অবস্থায় পেটে চাপ দেয়া যাবে না;
- পশু যেন খুব জোরে মাটিতে না পড়ে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পশু জবাই করার জন্য মাথা দক্ষিণ দিকে এবং লেজ উত্তর দিকে, মুখ থাকবে পশ্চিমদিকে এবং যিনি জবাই করবেন তিনি পশুর গলার পিছনে দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে যতদূর সম্ভব ছুরি দিয়ে মাথার কাছাকাছি গলার শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ও প্রধান রক্ত সঞ্চালন শিরা কাটার সময় বিসমিল্লাহে আল্লাহ আকবর বলে পশু জবাই করতে হয়। ছুড়ি চালানোর নিয়ম উপর থেকে নিচে পর পর তিন বার। জবাই এর জন্য ছুরি অত্যন্ত ধারাল এবং লম্বা হতে হবে যেন সমস্ত গলা ছুরির ধারের মধ্যে থাকে। জবেহ করার সময় মাথার কাছে মাটিতে গর্ত করে নিলে রক্ত তার মধ্যে জমা হয়। অথবা জবেহ করার স্থানে যদি পাকা ড্রেন থাকে তার ভিতর দিয়ে রক্ত একটা নির্দিষ্ট স্থানে জমা হয়। রক্ত ফেলে না দিলে হাঁস-মুরগির খাদ্য প্রস্তুত করতে তা ব্যবহার করা যায়। খুব দ্রুত এবং হঠাৎ করে কাটলে প্রাণীটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে কিন্তু তার হৃদপিন্ড কর্মক্ষম থেকে শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে দিতে সাহায্য করে। অনভিজ্ঞ লোক জবেহ করলে এবং ছুরিতে ধার না থাকলে জাবেহ করতে অহেতুক সময় লাগে ফলে প্রাণী কষ্ট পায় এবং বেশি দাপাদাপি করে।

পশুর চামড়া ছাড়ানো (skining of hide from animals)

মুসলমানরা ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ সমগ্র দেশে অতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রতিপালন করে। দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক প্রাণী কোরবানী দেয়া হয়। প্রধানত একই দিনে এতো বিপুল সংখ্যক প্রাণীর চামড়া ছাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষিত কসাই-এর মারাত্মক অভাব দেখা হয়। এর ফলে প্রায়শ অদক্ষ এবং এ বিষয়ে সঠিক ধ্যান-ধারণা না থাকা ব্যক্তিরাই এসব কাজ করে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে মূল্যবান চামড়া কেটে গিয়ে খুঁতযুক্ত হয়ে যায়। এছাড়াও চামড়ার সাথে অতিরিক্ত মাংস ও চর্বি লেগে থাকে যা চামড়া সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। চামড়া ছাড়ানোর ক্ষেত্রে খুঁত সৃষ্টি হলে এই মূল্যবান রপ্তানীযোগ্য পণ্যের মূল্য স্বভাবতই কমে যায়। ফলে দেশ আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোরবানীর দিনে সমগ্র দেশে যেহেতু অজস্র গবাদিপশু জবাই করা হয় সেহেতু এক দিনে ওই সময়ে উৎপাদিত চামড়ার পরিমাণও বছরের সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। এজন্য এ সময়ে যদি ক্রুটিপূর্ণভাবে চামড়া ছাড়ানো হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়। অবশ্য এ অবস্থা থেকে উত্তরণ বা এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও প্রকৃতপক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তবুও কোরবানীর পশুর পরিচর্যা ও চামড়া ছাড়ানোর ব্যাপারে নির্দেশিত পদক্ষেপসমূহ যথাযথভাবে অনুসৃত হলে উদ্ভুত ক্ষতির পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে।

- জবাইয়ের পর চামড়া ছাড়ানোর জন্য কখনও তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। প্রায়শ দেখা যায় প্রাণ বহির্গত হবার পূর্বেই কসাইরা চামড়া ছাড়াতে শুরু কওে যা ধর্মীয় দিক থেকে অনুমোদিত নয়। জবাইয়ের পর পশুর শরীর থেকে সম্পূর্ণ রক্ত বের হয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রাণী যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায় তখন চামড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পশুর দেহের প্রাণস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলে চামড়া ছাড়ানো শুরু করা উচিত। পশুকে চিৎ করে শুয়িয়ে দিয়ে দেহের দু'পাশে কোন কিছু দিয়ে ঠেস দিতে হবে।
- এবারে ছুরির মাথা দিয়ে জবাই করার স্থান থেকে গলা, সিনা ও পেটের ওপর দিয়ে সোজাভাবে হালকা করে কাটতে হবে।
- সামনের পায়ের হাঁটু থেকে সিনা বরাবর সোজাভাবে ধীরে ধীরে চামড়া কেটে পূর্বে কাটা দাগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। পেছনের দু'পায়ের ক্ষেত্রে অনুরুপ পদ্ধতিতে চামড়া কাটতে হবে।
- স্বাভাবিক অবস্থায় পরিপাকতন্ত্রের জীবাণু কর্তৃক বিক্রিয়ার ফলে গ্যাস সৃষ্টি ও পচন শুরু হয়। এজন্য জবাইয়ের পর খাদ্যনালীর প্রান্তদেশ শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে পাকান্ত্রের খাদ্যবস্তু দ্বারা মাংস দূষিত হবে না।
- সারা দেহ হতে সন্তর্পনে চামড়া ছাড়াতে হবে। এতে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু সেজন্য কখনই তাড়াহুড়া করা যাবে না। কারণ অনভিজ্ঞতা ও তাড়াহুড়া এই দু'য়ের ফলে যে কোন সময় চামড়ায় ক্ষত হতে পারে। অনেক সময় চামড়ার বিভিন্ন স্থানে মাংস ও চর্বি লেগে থাকে যা তুলতে গেলে চামড়া কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ছাগল ও ভেড়ার চামড়া ছাড়ানোর সময় পশুকে যদি কিছুটা উঁচুতে যেমন গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া যায় তাহলে চামড়া ছাড়ানো সহজ ও সুবিধাজনক হয়।

চামড়া ছাড়ানোর পর মাংস কর্তন (meat procuring after skining of the hide)

চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেলে দেহ থেকে মাংস কেটে পৃথক স্থানে রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি যেমন ফুসফুস ও শ্বাসনালী, হৃৎপিন্ড, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক, থাইমাস ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে রাখতে হবে। চর্বিও স্বতন্ত্র করে রাখা প্রয়োজন। এছাড়া রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেসাম, এবোমেসাম, ক্ষুদ্রান্ত, বৃহদান্ত্র ইত্যাদি পৃকভাবে সাবধানে রাখতে হবে যাতে মাংস দূষিত না হয়।

ষাঁড়ের ক্ষেত্রে অন্তকোষ, জননাঙ্গ ও গাভীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় যোনিনালি, জরায়ু, ওলান, ইত্যাদি আলাদা করে বর্জ্যের সাথে রাখতে হবে। এছাড়াও যে সমস্ত হাড় খাদ্যের জন্য গ্রহণ করা হয় না সেগুলো বর্জ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। মাংস কাটাকাটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার। মাংস বেশি নাড়াচাড়া করলে মাংসের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং এতে

ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে থাকে। মাংস কাটাকাটি ছায়াযুক্ত স্থানে করা উচিত কারণ তাপমাত্রা বেশি হলে মাংসে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়।

মাংস সংরক্ষণ (meat preservation)

কোরবানীর মাংস যেহেতু সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় সেহেতু তা সঠিকভাবে প্যাকেটজাত করে হিমায়িত (ডীপ ফ্রিজ/আইস চেম্বার) করতে হয়। মাংসের মোড়কের কাগজ ও মোড়ানোর পদ্ধতির ওপর মাংসের গুণগত মান নির্ভর করে। ক্রটিপূর্ণভাবে মোড়ানো মাংস ফ্রীজে শুকিয়ে যায় ও মাংসের চেহারা এবং গন্ধের পরিবর্তন ঘটায়। যদি প্যাকেট তা না পাওয়া যায় তাহলে পরিষ্কার শক্ত কাগজ বা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। আদর্শ মোড়ক হলে তা আর্দ্রতা ও বাষ্প বা তাপ প্রতিরোধক হয়। এগুলো নাড়াচাড়া সহজ হয় ও মোড়কে মার্কার কমল দ্বারা লেখা যায়। যাদের মাংস সংরক্ষণ করার জন্য ফ্রিজ নেই তারা মাংস সিদ্ধ করে ও লবণ দিয়ে কিছু দিন সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন।

পশুর চামড়া (hide of animals)

জুতা, বেল্ট, মানিব্যাগ, সুটকেস, তাবু ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে রপ্তানী বাণিজ্যে চামড়ার স্থান তৃতীয়। রপ্তানী খাতে চামড়া শিল্পের অবদান ৯ থেকে ১০ শতাংশ। দেশে উৎপাদতি চামড়ার ৮০ শতাংশ রপ্তানী হয়ে থাকে। আমাদের দেশের গরু চামড়ার গড় আয়তন ২২-২৪ বর্গফুট এবং ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার গড় আয়তন ৩.০-৩.৫ বর্গফুট। সারা বছর গরু মহিষ জবাই করে চামড়া পাওয়া যায় ৭০ লাখ পিস। ছাগল ও ভেড়া হতে পাওয়া যায় ২ কোটির উর্ধ্বে। প্রতি বছর দেশে ১৮-১৯ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হয়। তবে দেশে চামড়ার চাহিদা আছে মাত্র ২.০-২.৫ কোটি বর্গফুট। বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় ২০০ টি ট্যানারি শিল্প ঢাকার হাজারীবাগে অবস্থিত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশে প্রায় ৮১৮ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে শুধু জবাইপূর্বে জীবিত পশুর চামড়া নষ্ট হওয়ার ফলে। গবাদি পশুর উঁকুন, আটালি, মাইটস ইত্যাদি পরজীবী ও অন্যান্য রোগের আক্রমণে এ পরিমাণ চামড়া নষ্ট হচ্ছে। পশুর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যকে ঘিরে বিদেশের বাজারে আমাদের রয়েছে অনেক সুনাম। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করে দেশের মোট আয় আসে ৫৫%। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের এক হিসেবে থেকে দেখা যায় চামড়া শিল্প থেকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ৩২০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এসেছে প্রায় ৩৭০০ কোটি টাকা যা আমাদের জিডিপিতে অবদান রাখছে প্রায় ১.৪%। কোরবানী দেওয়ার পর অযত্ন আর অবহেলার কারণে এই মূল্যবান চামড়া আমরা নানাভাবে নষ্ট করি। চামড়া ছাড়ানোর পর প্রথমেই দেখতে হবে কোন প্রকার মাংস বা চর্বি চামড়ার সাথে লেগে আছে কি না। যদি থাকে তাহলে খুব আস্তে ধারালো ছুরি দিয়ে গুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। এরপর পরিষ্কার করে পানি দিয়ে খুব ভাল করে ধুয়ে হালকা রোদে শুকাতে হবে। পানি ঝরে গেলে তা গাট বেঁধে নির্দিষ্ট স্থানে বা পাইকারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। ব্যাকটেরিয়া থেকে পশুর চামড়াকে রক্ষা করতে বর্তমান বিশ্ব শুকানো পদ্ধতি, লবণ পদ্ধতি ও হিমাগারে রেখে চামড়া সংরক্ষণ করা হয়। তবে আমাদের দেশে অধিকাংশ জায়গাগুলোতে লবণ পদ্ধতিতে চামড়া সংরক্ষণ করা হয়। লবণ পদ্ধতি গরু বা মহিষের চামড়ার ক্ষেত্রে নাগরা সোল চামড়ায় তিন থেকে পাঁচ কেজি, ঢিলা চামড়ায় দুই থেকে চার কেজি এবং কুরুম চামড়ায় দেড় থেকে তিন কেজি লবণ লাগতে হবে। ছাগল বা ভেড়ার চামড়ার ক্ষেত্রে স্টার চামড়ায় আধা কেজি, হেভি ও মেল চামড়ায় ২৫০ গ্রাম লবণ দিতে হবে। এভাবে লবণ মাখিয়ে চামড়াগুলো ভাঁজ করে একটির ওপর আরেকটি স্তূপাকারে রাখতে হবে।

মাংস ও চামড়া

বাংলাদেশে শহর ছাড়া গ্রামাঞ্চলে পশু জবাই করার কোন নির্দিষ্ট স্থান বা ঘর নাই। ফলে এদেশের অধিকাংশ পশু মাংসের জন্য যেখানে সেখানে জবাই করা হয়। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদক্ষ লোকজন পশু জবাই ও চামড়া ছাড়ানোর কারণে প্রচুর সংখ্যায় চামড়া নষ্ট হয়। আমাদের দেশে কোনবানীর ঈদে হাজার হাজার পশু জবাই হয় এবং এই সময় অদক্ষতার কারণে প্রচুর চামড়া নষ্ট হয়। এমনকি অজ্ঞতার কারণে পশুর অনেক উপজাত বিনষ্ট হয়। তাই বিজ্ঞানসম্মত উন্নত পদ্ধতিতে পশু জবাই, চামড়া ছাড়ানো, স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মাংস উৎপাদন ও পশুর অন্যান্য উপজাত সংগ্রহ সম্পর্কে

সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রধানত নিম্নে উল্লিখিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পশু জবাই করে উন্নত মানের চামড়া, পরিচ্ছন্ন মাংস ও জবাইকৃত পশুর বিভিন্ন উপজাত সংগ্রহ করা যায়।

- সুস্থ সবল জবাই করা উচিত। একদিকে জবাইকৃত অসুস্থ পশুর মাংসের উৎপাদন কম হয়। অন্যদিকে রোগ জীবাণু ছড়ায়।
- পশু জবাইয়র ২৪ ঘন্টা পূর্বে থেকে পশুকে পূর্ণ বিশ্রাম ও ১২ ঘন্টা পূর্ব থেকে দানাদার খাদ্য বন্ধ রেখে পানি ও কাঁচা ঘাস খাওয়ানো উচিত। এতে জবাইকৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো সহজ হয়।
- কোরবানীর পশুসহ যে কোন পশু সকালে জবাই করা উত্তম।
- পশু জবাই করার জন্য সমতল পরিষ্কার জায়গা বেছে নিতে হয়। জবাইয়ের সময় পশুর মাথার দিকটা একটি ঢালু দিকে রাখা প্রয়োজন যাতে সব রক্ত দেহ থেকে সহজে বের হয়ে যায়।
- জবাই করার পর রক্ত পড়া বন্ধ হলে ছায়ায় বা ঘরের মধ্যে দ্রুত চামড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা করাতে হবে।
- চামড়া ছাড়ানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে চামড়ায় মাংস এবং মাংসে রক্ত, গোবর, কাদা-মাটি মেখে না যায়।
- পশু জবাই ও মাংস কাটার স্থানে কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য কোন জন্তু যাতে মাংস ও তার উপজাত ভক্ষণের জন্য আসতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।
- পশুর চামড়া ছাড়ানোর পর বেশী সময় চামড়া ফেলে না রেখে সাথে সাথে বিক্রি বা চামড়া পাকা করার কারখানায় পাঠাতে হবে। চামড়ার ব্যবস্থা দ্রুত না করলে পচন ধরে নষ্ট হতে পারে।
- চামড়া দ্রুত বিক্রি করা বা কারখানায় পাঠানোর ব্যবস্থা না থাকলে চামড়ার গায়ে লেগে থাকা চর্বি, রক্ত, মাংস পর্দা ইত্যাদি পরিষ্কার করে লবণ ঘসে লাগাতে হবে।
- প্রতি গরু ও মহিষের চামড়ায় ৫-৬ কেজি এবং প্রতিটি মেষ ও ছাগলের চামড়ায় ১-২ কেজি লবণ লাগাতে হয়।
- চামড়ার লবণ মাখানোর দিক ভিতরে রেখে শিরদাঁড়া বরাবর এমনভাবে ভাঁজ করে দিতে হবে যাতে লবণ ঝরে না যায়।
- লবণ মাখানো চামড়া মাটিতে না রেখে কাঠের তৈরি মাচার উপর একটি উপর একটি করে সাজিয়ে রাখতে হবে। ভালভাবে লবণ মাখানো চামড়া নষ্ট হয়না।
- সুযোগ সময় হলেই চামড়া বিক্রি বা কারখানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (waste management)

কোরবানীর ঈদে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ। কোরবানীর ঈদ আমাদের ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় এবং আনন্দ পাওয়া যায়। ঈদের আনন্দে দেশের বেশির ভাগ লোকজন নিজেদের পরিবেশ রক্ষার কথা একেবারে ভুলে যায়। অন্যদিকে নষ্ট করে ফেলে কিছু মূল্যবান সম্পদ। অথচ একটু সচেতন হলেই আমরা আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে পারি। সাথে রক্ষা করতে পারি আরো কিছু মূল্যবান সম্পদ যেমন- পশুর রক্ত থেকে উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার পাওয়া যায়। এতে শতকরা প্রায় ১০% নাইট্রোজেন থাকে যা ইউরিয়া সারের মত কাজ করে। এছাড়াও এতে আছে ফসফরাস ও পটাসিয়াম। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য এ সার খুবই উপযোগী। তাই পশুর রক্তকে তুচ্ছ না মনে করে মোটেও অপচয় করা উচিত নয়। যেখানে সেখানে পশু জবাই না করে যে জমিতে কিছুদিনের মধ্যে ফসল করা হবে এমন জমিতে পশু জবাই করা যেতে পারে। রক্তের উপর সামান্য মাটি চাপা দিয়ে দিতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই তা পঁচে উন্নতমানের জৈবসারে পরিণত হবে। পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি ও মল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। অথচ এগুলোকে এক জায়গায় গর্ত করে পঁচালে তা থেকে মূল্যবান সার পাওয়া যায়। তাই এ কাজটি আমাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা উচিত। রক্ত বা নাড়িভুঁড়ি থেকে প্রাপ্ত ও এ মূল্যবান জৈব সার ব্যবহারে সবাই সচেতন হই। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে সব বর্জ্য আমাদের পরিবেশ বিপর্যরের কারণ সেসব বর্জ্য যোগাড় এবং নিদিষ্ট স্থানে পুতে রেখে পঁচিয়ে আমরা উৎকৃষ্ট জৈব সার তৈরি করতে পারবো। একই দিনে যেখানে সেখানে অজস্য পশু জবাই, চামড়া ছাড়ানো, মাংস কাটাকাটি ও পশুর বিক্ষিপ্ত

বর্জ্যের কারণে পরিবেশ স্বভাবতই দূষিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য হচ্ছে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করা বা রাখার কাজটি কিন্তু মোটেও জটিল নয়। যেহেতু সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্তৃপক্ষ বৈর্জ্য অপসারণ ও বর্জ্য পরিষ্কারের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকলে যদি এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিত নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে সকল বর্জ্য জমা করেন তাহলে সকল বর্জ্য অপসারণ সুচারুরুপে সম্পন্ন হবে এবং এর ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে।

বর্জ্য পরিষ্কার ও অন্যান্য করণীয় ব্যবস্থাদি

- কুরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেলেই তা দ্রুত বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বেশি দেরি হলে তা বিক্রি করা খুবই কঠিন ও সমস্যাপূর্ণ হয়। মনে রাখা দরকার যে বাড়ীতে চামড়া সংরক্ষণ করা কঠিন। তাই কোরবানীর দিনে নানা ব্যস্ততার মাঝে এ কাজটিও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা বিশেষ জরুরি।
- কোরবানীর পশুর মাংসের সব প্রক্রিয়া শেষ হলেই প্রথম কর্তব্য হচ্ছে উক্ত স্থান খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা। সকল বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণের পর উক্ত স্থানের রক্ত ও ময়লা পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে সেখানে ব্লিচিং পাউডার অথবা অন্য কার্যকর জীবাণুনাশক প্রয়োগ করতে হবে। জৈব পদার্থে খুব দ্রুত পচন ধরে বলে জবাই ও মাংস কাটার স্থান ভালভাবে পরিষ্কার করে সেখানে জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সেখান থেকে কোন প্রকারের দুর্গন্ধ বের হবে না।
- ঈদ-উল-আযহার দিনে কোরবানীর পর পরিবেশ পরিষ্কার, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখাও ঈমানের অঙ্গ। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগ-ব্যাধির বিস্তারও নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

পরিশেষে বলা যায়, পবিত্র ঈদের দিন নামাজ আদয়, কোরবানী করা, পশুর চামড়া ছাড়ানো, মাংস প্রক্রিয়া ইত্যাদি সব কাজ করার পর সংশ্লিষ্ট স্থান পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ এবং সঠিকভাবে বর্জ্য অপসারণও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সকল ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অংশ গ্রহণ এই পবিত্র দিনের কর্মসূচির মাঝেই নিহিত আছে আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধি।

১১.৮ ডিম ও ডিমজাত দ্রব্য

ডিমের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ডিম শুধু বাচ্চা উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হয় না বরং এর উচ্চ খাদ্যমানের জন্য সকলের নিকট সমভাবে পছন্দনীয়। ডিম থেকে বিভিন্ন ধরণের দ্রব্যাদি তৈরি করা হয় যাদের খাদ্যমানও ডিমের মতোই। ডিমজাত দ্রব্যের মধ্যে ডিমের পাউডার, ডিমের পিকল ও ফ্রাইড কোয়েল এগ উল্লেখযোগ্য। এসকল দ্রব্যের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

১১.৮.১ ডিমের গঠন ও খাদ্যমান

প্রকৃতিপ্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ডিম হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও উপাদেয়। এর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। পাখির ডিম একটি বিস্ময়কর বস্তু। এটি একটি বিশেষ ধরণের ধরণের জনন কোষ। যে কোন প্রাণী কোষের মধ্যে ডিম বৃহত্তম। শুধু খাদ্যবস্তু হিসেবেই নয়, উপযুক্ত পরিবেশের ডিম একটি স্বাধীন জীবের সৃষ্টি করতে পারে।

ডিমের গঠন

ডিমের আকার অনিয়মিত উপবৃত্তাকার অর্থাৎ এর এক প্রান্ত চওড়া ও অন্য প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সরু ও সুচালো। ডিমের ভিতর বাচ্চা উৎপাদন ও ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার ক্ষেত্রে ডিমের দুই প্রান্তের এ ভিন্নতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ডিম প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন- খোসা (shell), খোসাপর্দা (shell membrane), শ্বেত অংশ (albumen), চ্যালাজি (chalazae) ও কুসুম (yolk)। সারণি- ৩.১২ এ ডিমের বিভিন্ন অংশের ওজনের শতকরা হার দেয়া হয়েছে। এখানে ডিমের বিভিন্ন অংশের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১১.৫ : ডিমের বিভিন্ন অংশের ওজন

ডিমের বিভিন্ন অংশ	ওজন (%)
খোসা ও খোসা পর্দা	১২
শ্বেত অংশ ও চ্যালাজি	৫৬
কুসুম	৩২
সর্বমোট	১০০

খোসা ও খোসাপর্দা: ডিমের উপরের শক্ত ও ভঙ্গুর সাদা বা বাদামি কোন কোন হাঁসের ডিমের ক্ষেত্রে নীলচে এবং কোয়েলের ক্ষেত্রে রঙিন কারুকাজযুক্ত রঙের আবরণটিই ডিমের খোসা। এ খোসা প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে গঠিত এবং ভিতরের নরম অংশের সংরক্ষণমূলক আবরক। ডিমের খোসায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্রপথের মাধ্যমে বাইরের পরিবেশ বা বায়ুমন্ডল ও ডিমের ভিতরের অংশের মধ্যে পানি ও গ্যাসের (যেমন- অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড) চলাচল ঘটে। অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সাধারণত ডিমের চওড়া অংশে অধিক সংখ্যক ছিদ্র থাকে। খোসাকে ধীরে ধীরে অপসারণ করলে খোসার নিচে একটি শক্ত অথচ নরম বস্তু দেখা যায়। একে পর্দা বা খোসাপর্দা বলে। এটি আবার বহিস্থ খোসাপর্দা (outer shell membrane) ও অন্তস্থ খোসা পর্দা (inner shel membrane) এ দুভাবে বিভক্ত। খোসা ও খোসাপর্দা মিলে ডিমের মোট ওজনের ১২% হয়ে থাকে।

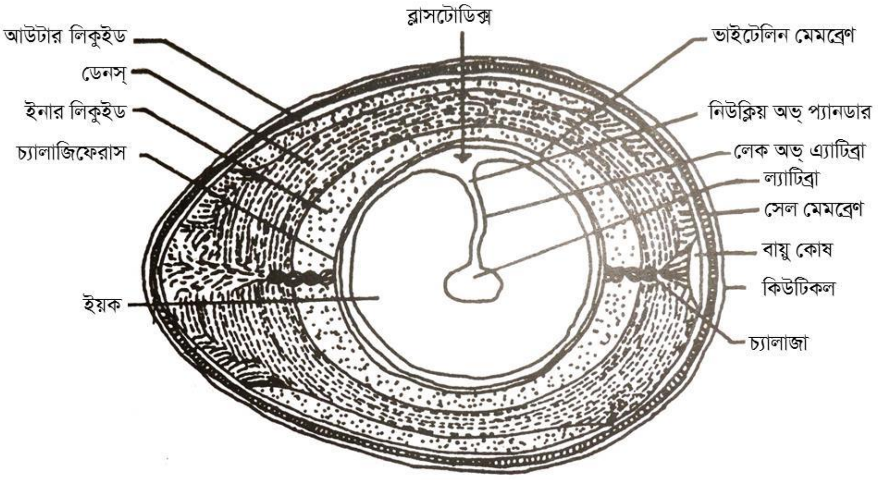

চিত্র ১১.৯ঃ একটি ডিমের গঠন।

এলবুমেন ও চ্যালাজি: ডিমের শ্বেত বা সাদা অংশ অর্থাৎ এলবুমেন ডিমের সর্বত্র সমানভাবে থাকে না। এর চারটি স্তর রয়েছে। অন্তস্থ খোসাপর্দার ভিতরের দিকে থাকে বহিস্থ পাতলা সাদা অংশ (outer thin white) যা মোট অ্যালবুমেনের ২০% সৃষ্টি করে। একে পুরু শ্বেত অংশ (thick white) বলে। এটি মোট এলবুমেনের ৫০% গঠন করে। পুরো শ্বেত অংশের ভিতরে থাকে অন্তস্থ পাতলা শ্বেত অংশ (inner thin white), চ্যালাজি ও চ্যালিজিফেরাস স্তর। এলবুমেনের প্রধান কাজ দুটো। যথা- এটি আঘাত শোষণ করে এবং ভ্রূণ ও কুসুমকে আঘাত জনিত দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। বর্ধনশীল ভ্রূণের খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। চ্যালাজি হচ্ছে এক ধরণের পুরু শ্বেত অংশ যা কয়েলের মতো পাঁচানো থাকে। চ্যালাজি পুরু শ্বেত অংশের উভয় প্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয় এবং চ্যালাজিফেরাস স্তরে যেয়ে শেষ হয়। চ্যালাজিফেরাস স্তর হচ্ছে পুরু এলবুমেনেরই একটি পাতলা স্তর যা কুসুম ও কুসুমপর্দা (vitelline membrane) ধারণ করে থাকে। চ্যালাজি অতিরিক্ত আঘাত শোষক হিসেবে কাজ করে এবং অন্তস্থ পাতলা এলবুমেনের মধ্যে কুসুমকে ঠিকভাবে রাখতে সাহায্য করে।

কুসুম: ডিমের মাঝখানে যে হলদে অংশ থাকে, তাকেই কুসুম বলে। কুসুম কয়েকটি গোলাকার সমকেন্দ্রিক সাদা ও কালো পর্দা দিয়ে গঠিত। ডিম্বাশয়ই কুসুমের উৎপত্তিস্থল এবং ডিম্বনালি দিয়ে যাওয়ার সময় এলবুমেন, খোসার আবরণ ও খোসায় একের পর এক যুক্ত হয়। স্ত্রীজনন কোষ (female germcell) দ্বারা কুসুম ঘটিত। কুসুম খাদ্যবস্তুতে সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে সবই কুসুমপর্দা বা ভাইটেলাইন আবরণে আবৃত থাকে। সকল ডিমেই স্ত্রীজনন কোষ থাকে এবং শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষিক্ত হলে কার্যকরী হয় ও বৃদ্ধি পায়। নিষিক্ত ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কিন্তু অনিষিক্ত ডিম থেকৈ বাচ্চা উৎপন্ন হয় না। কুসুমই ভ্রূণকে খাদ্য সরবরাহ করে। অনেক সময় অস্বাভাবিক ডিম দেখা যায়। যেমন- কখনো কখনো ডিম কুসুমবর্জিত বা দুটো কুসুমযুক্ত হয়। ডিমের ভিতর কখনো কখনো রক্তের বা মাংসের ছিটও দেখা যায়। অনেক সময় একটি ডিমের মধ্যে আর একটি ডিম দেখা যায়। এ ধরণের অস্বাভাবিক ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে না।

ডিমের খাদ্যমান (food value of egg)

ডিমের প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের এবং সহজপাচ্য আমিষ আছে। আমিষ স্বয়ং সম্পূর্ণ, ডিম সকল প্রকারের অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড ধারণ করে। এ সমস্ত এমাইনো এসিড বিভিন্ন জৈবিক কার্য সম্পাদনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, পোচ্ করা ডিম ৪০ মিনিটের মধ্যে হজম হয় এবং যখন ডিম ভাজা বা পুরো পুরি সিদ্ধ করা হয় তখন হজম হতে ৫০ মিনিটের বেশি সময় লাগে। এখানে ডিমের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ডিমের অ্যালবুমেন: কাঁচা ডিমের এলবুমেনের মধ্যে এক প্রকার ট্রিপসিন বাঁধাদানকারী আছে যা হজম শক্তি নষ্ট করে এবং প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়ে দেয়। উপরন্ত কিছু এলবুমেন অপরিবর্তিত অবস্থায় অন্ত্রের দেয়ালের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং অত্যন্ত অনুভূতিশীল মানুষের ক্ষেত্রে যা বিষাক্ত উপসর্গ সৃষ্টি করে। রান্নার ফলে এ ট্রিপসিন নষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ খাদ্যের হজম ক্ষমতা প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগ হয়। রান্নকৃত ডিম সাদারণত খাদ্য সামগ্রীর একটি অংশ হিসেবে থাকে এবং যখন এরূপ হয় তখন হজম ক্ষমতা সম্পূর্ণ হয়। ডিমের অ্যালবুমিনের প্রায় সব অংশই পানি এবং আমিষ এবং এর সঙ্গে খুব অল্প পরিমান শর্করা থাকে। এখানে সম্পূর্ণ ডিমের প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ আমিষ থাকে।

ডিমের কুসুম: ডিমের কুসুম এত সহজে হজম হয় যে, এটা দুইমাস বয়স হতেই শিশুদের খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা যায়। খাওয়ার ফলে চর্বি এবং আমিষ প্রায় সম্পুর্ণরূপে হজম হয়। ডিমের কুসুমের শতকরা ৫০ ভাগ পানি। এখানে চর্বি ও আমিষের অনুপাত ২ : ১।

ডিমের আমিষ: একটি ডিম মানুষের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড চাহিদার শতকরা ৬ থেকে ১৫ ভাগ সরবরাহ করতে পারে। ডিমের আমিষ বা প্রোটিন মিথিওনিন, ট্রিপটোফেন এবং আংশিক অত্যাবশ্যকীয় আরজিনিনের একটি অত্যন্ত ভাল উৎস। ডিমের আমিষ এবং দুধ ব্যতীত মানুষের অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী এ সকল এমাইনো এসিডের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়।

ডিমের চর্বি বা ফ্যাট: ফ্যাট ডিমের কুসুমেই একমাত্র এবং খুব সুন্দরভাবে বিস্তৃত থাকে। এজন্য তারা খুব সহজে নির্যাসিত (emulsify) ও হজম হয়। দেখা গেছে যে, চর্বির শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ একমাত্র পাকস্থলীতেই হজম হয়। ডিমের চর্বি হচ্ছে প্রকৃত ফ্যাট ও ফসফোলিপিডের মিশ্রণ। মোট চর্বির শতকরা ৬২ ভাগ প্রকৃত ফ্যাট এবং ফসফোলিপিডের (হজম ক্ষমতা ৯১%) চেয়ে অধিক হজম ক্ষমতাসম্পন্ন (শতকরা হজম ক্ষমতা ৯৮%)। সাধারণত তিন ধরণের ফসফোলিপিড পাওয়া যায়। যেমন- লেসিথিন, সেফালিন এবং স্ফিংগনোমাইলিন। লেসিথিন ডিমের কুসুমের শতকরা ৮.৫ ভাগ গঠন করে। লেসিথিন মুরগির ডিমের ফসফোলিপিডের শতকরা ৬৯ ভাগ এবং হাঁসের ডিমের শতকরা ৮২ ভাগ গঠন করে। মুরগির ডিমের ফসফোলিপিডের শতকরা ২৫ ভাগ সেফালিন এবং ৩ ভাগ স্ফিংগনোমাইলিন। ডিমে কোলেস্টেরল পাওয়া যায়, যা অধিকাংশ পরিমাণে স্নায়ু কলায় থাকে এবং যা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যৌন হরমোনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শক্তিমান (energy value): যেহেতু অন্যান্য সাদা খাদ্য সামগ্রীকে যেমন- রুটি, ভাত মানুষ শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। তাই ডিম সাধারণত মানুষের খাদ্য সামগ্রীতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। বরং এরা খাদ্য

সামগ্রীকে আনন্দদায়ক বা রুচিদায়ক করে। যেমন- রুটি ও ডিম। ডিম পরিপাক রসকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ খাদ্যের হজম ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

খনিজ: ডিম হচ্ছে জৈব ফসফরাস, সালফার এবং পরবর্তীতে মিথিওনিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পটাশিয়াম ও লৌহসমৃদ্ধ। সিদ্ধ ডিমের কাটা অংশ বায়ুতে উন্মুক্ত হলে যে বিবর্ণ অংশ দেখা যায় তা মিথিওনিনের বিকৃতি এবং মৌলিক সালফার গঠনের জন্য হয়ে থাকে। পঁচা ডিমের ক্ষেত্রে মিথিওনিনের প্রায় সমস্ত অংশই হাইড্রোজেন সালফাইডে পরিণত হয় যা একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং যার গন্ধের জন্য পঁচা ডিমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পন্ধ হয়ে থাকে। ডিমে লৌহের পরিমাণ মুরগির খাদ্রসামগ্রীর উপর নির্ভর করে।

ভিটামিন: ডিমের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ মুরগির খাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুরগির ডিমে দুই ধরণের ভিটামিন পাওয়া যায়। যেমন- পানিতে দ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো- এ, ডি, ই এবং কে এগুলো ডিমের কুসুমে পাওয় যায়। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো- থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নিকোটিনিক এসিড, ইনোসিল, প্যান্টোথেনিক এসিড, পাইরোডক্সিন, ফলিক এসিড এবং ভিটামিন বি$_{১২}$ এগুলো ডিমের কুসুম এবং অ্যালবুমিন উভয়তেই পাওয়া যায়।

সারণি ১১.৬ঃ মুরগি ও জাপানি কোয়েলের ডিমে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার

পুষ্টি উপাদান	মুরগির ডিম	কোয়েলের ডিম
পানি (%)	৭৪.০০	৭৩.৮০
আমিষ (%)	১২.৮০	১৩.২৩
চর্বি (%)	১১.৫০	১০.৮৩
ছাই (%)	১.০০	১০৩
শর্করা (%)	০.৯০	১.০২

উৎস ঃ Panda, B.ct al. 1987 quail Production Technology. CARI, India.

সারণি ১১.৭ ঃ মুরগি ও জাপানি কোয়েলের ডিমের প্রতি ১০০ গ্রাম তরল অংশে খনিজ, ভিটামিন ও শক্তির পরিমাণ

উপাদান	মুরগির ডিম	কোয়েলের ডিম
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	৫৬-৬১	৫৯
ফসফরাস (মি. গ্রাম)	১২৪-২৩৮	২২০
লোহা (মি. গ্রাম)	২.১০-২.৯০	৩.৮০
ভিটামিন এ (আন্তর্জাতিক একক)	২০০-৫২০	৩০০
ভিটামিন বি$_{১}$ (মি. গ্রাম)	০.০৭-০.০৯	০.১২
ভিটামিন বি$_{২}$ (মি. গ্রাম)	০.২৭-০.৩২	০.৮৫
নিয়াসিন (মি. গ্রাম)	০.০৫-০.৩২	০.১০
শক্তি (ক্যালরি)	১৫৬-১৮৩	১৫৮

উৎস ঃ Panda, B.ct al. 1987 Quail Production Technology. CARI, India.

সারমর্মঃ ডিম এমন একটি প্রকৃতি প্রদত্ত খাদ্য যার গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সকল বয়সের কাছে এটি একটি উপাদেয় ও পুষ্টিকর বস্তু। ডিমে প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের ও সহজপাচ্য আমিষ আছে। এছাড়া দেহের জৈবিক কার্যাবলীর জন্য যে সকল এমাইনো এসিড প্রয়োজন তা ডিমে বিদ্যমান। ডিম মানুষের খাদ্য সামগ্রীতে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বরং এরা খাদ্যসামগ্রীকে আনন্দদায়ক ও রুচিদায়ক করে।

১১.৮.২ ডিমের বিশেষ পুষ্টি

সাধারণত প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন অবশ্যই ৬টি পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ ও পানি) খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এ সকল পুষ্টি উপাদান যাতে থাকে সেদিকে খেয়াল

রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ উক্ত পুষ্টি উপাদানগুলি একক কোন খাদ্যে পাওয়া দুস্কর। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে ডিমই একমাত্র খাদ্য যার মধ্যে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। এ জন্যই ডিমকে একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য (a complete food) বলা হয়।

ডিমের প্রোটিন ও এমাইনো এসিড: মানব দেহে খাদ্য বিপাক প্রক্রিয়ায়, দেহের বৃদ্ধি, গঠন, সংরক্ষণ ও দৈহিক ক্রিয়া সংগঠনে এমাইনো এসিডের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। এমাইনো এসিড ছাড়া উপরোক্ত কার্যক্রম সংগঠন ও সম্পন্ন হয় না। এর কিছু মানব দেহেই উৎপন্ন হয় (সিনথেসিস) আর বাকী এমাইনো এসিডগুলো (Tryptophan, Threonine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Histidine,Valine) খাদ্যের মাধ্যমে দেহে সংগৃহীত হয়। মজার ব্যপার হল এই এমাইনো এসিড গুলোর সবকটিই ডিমে বিদ্যমান যা অন্য কোন প্রাকৃতিক খাদ্যে এককভাবে নেই। ফলে ডিমকে একটি পরিপূর্ণ আমিষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য ডিমের প্রেটিন অন্য যে কোন প্রোটিনের চেয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের।

ডিমের ফ্যাট ও ফ্যাটি এসিড: এটি সত্যি যে ডিমের কুসুমে ফ্যাট আছে। তবে সব ফ্যাট মানুষের জন্য অপকারী নয়। ডিমের কুসুমের মোট ফ্যাটের মধ্যে ১৬% পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড, এর মধ্যে লিনোলিক এসিডের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য, কারণ মানবদেহ এই এসিড উৎপন্ন করতে পারে না। লিনোলিক এসিড মানবদেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি শরীরের জন্য অন্যান্য দরকারি ফ্যাটি এসিড (এরাকোডনিক এসিড) উৎপন্ন করে। এরাকোডনিক এসিড হতে আবার প্রোস্টাগ্লানডিন উৎপন্ন হয়। এই প্রোস্টাগ্লানডিন আবার মানবদেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের মত কাজ করে। প্রোস্টাগ্লানডিন একদিকে যেমন কিডনীকে স্বাভাবিক রাখে অন্যদিকে পাকস্থলীর প্রদাহ/ঘা (gastritis/ulcer), ইত্যাদি হাত থেকে মানবদেহকে রক্ষা করে। প্রোস্টাগ্লানডিন থেকে থ্রম্বোক্স্যান নামক পদার্থের উৎপত্তি ঘটে যা রক্তের অণুচক্রিকা ও অন্যান্য কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ডিমের কুসুমে মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডও (ওলিয়িক এসিড) পাওয়া যায়।

ডিম কেন খাবেন?
➢ মায়ের বুকের দুধ সবেমাত্র ছাড়া শিশুদের জন্য ডিমের কুসুম একটি আর্দশ আয়রনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ডিম বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য উপাদান, কারণ উচ্চমানের প্রোটিন থাকার জন্য শারীরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ➢ ডিমের লিউটিন এবং জিয়ায্যানথিন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের চোখ ভাল রাখতে সাহায্য করে। ডিমের মধ্যস্থিত কোলিন মানবদেহের মস্তিষ্কের উদ্দীপনা ও গঠন, স্মৃতি রক্ষাকারী কোষ রক্ষা করে। ➢ ডিমের মধ্যে উচ্চ মানের প্রোটিন এবং নিম্নমানের স্যাচুরেট ফ্যাট থাকার জন্য এটা অতিরিক্ত চর্বি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আইরিশ হার্ট ফাউন্ডেশন এবং ব্রিটিশ নিউট্রিশন ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ডিম খেয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ➢ উচ্চমানের প্রোটিন (যেমন- ডিম) খেলে মাংসপেশীর ক্ষয় কম হয়। বয়স্ক লোকদের জন্য সব সময় উচ্চমানের প্রোটিন কিন্তু ফ্যাটের পরিমান কম এমন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন, সে জন্য ডিম একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য উপাদান হিসেবে বয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয়। ➢ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলাদের জন্য প্রতিদিন একটি ডিম খাওয়া খুবই প্রয়োজনীয় কারণ এতে যে কোলিন রয়েছে তা অধিক পরিমাণে বাচ্চার নিউরন কোষ তৈরিতে সহায়তা করে। কারণ ডিমই হল কোলিনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ➢ ডিমে আছে 'disease fighting protein' যা মানবদেহে এন্টিবডি তৈরিতে সাহায্য করে। ডিমের সাদা অংশে থাকে লুইফ্লাভিন ও লুসিক্রোম নামক উপাদান। এই উপাদানদ্বয় ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে দেহের ভেতর সাধারণ জীবকোষ ক্যান্সারের সংক্রমণ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

কোলেস্টেরল ভীতি ও ডিমের কোলেস্টেরল: সাধারণভাবে কোলেস্টেরল বলতে প্রাণিদেহের রক্তে ও কোষে বিদ্যমান এক ধরণের চর্বি জাতীয় পদার্থকে বুঝায়। ডিম উচ্চ পুষ্টির আধার হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেকেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক সুপারিশকৃত ন্যূনতম ১৮৩ টি ডিম/ব্যক্তি/বছর ভক্ষণ করি না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে ডিমে উচ্চহারে কোলেস্টেরল থাকার ধারণাকে দায়ী করা হয়। পুষ্টিবিদগণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, রক্তের সিরামে ক্ষতিকর লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL)-এর বৃদ্ধির মাত্র ২০-২৫% খাদ্যজনিত। বাকী ৭৫-৮০%-এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন নিয়ামককে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ দেহের জন্য কোলেস্টেরল অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু তা খাদ্যের সাথে যোগান দেয়ার প্রয়োজন হয় না। শরীর প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত কোলেস্টেরল সিনথেসিস করতে সক্ষম। তবুও একজন মানুষের জন্য খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক সর্বোচ্চ কোলেস্টেরল গ্রহণের মাত্রা হল ৩০০ মিলিগ্রাম (FAO, NRC)। একজন সুস্থ দেহের মানুষের ক্ষেত্রে কেবল দৈনিক মোট কোলেস্টেরলের চাহিদা ও খাদ্য কর্তৃক কোলেস্টেরল যোগান এ দুইয়ের পার্থক্যের পরিমাণ কোলেস্টেরল সিনথেসিস হয়। যেমন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক গড়ে প্রায় ১২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল প্রয়োজন। যদি একজন মানুষ দিনে একটি ডিম খায় যা ২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল সরবরাহ করে এবং অন্যান্য উৎস হতে ১০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল সরবরাহ পায় তবে আরও ৯০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল শরীর কর্তৃক সিনথেসিস হওয়া চাই। হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষের দেহে উপরোল্লিখিত ম্যাকানিজম মূলত বিকল হয়ে পড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ডিমের কোলেস্টেরল মানবদেহে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ডিমের ভেতর থেকে লেসিথিন নামক উপাদান যা রক্তনালীর গায়ে কোলেস্টেরোল জমতে বাধা সৃষ্টি করে অথবা জমাট বাঁধা কোলেস্টেরল অবমুক্ত করে দেয়, ফলে বয়স্ক ব্যক্তিদের বা যারা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন তাদের শরীরে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

ডিমের ভিটামিন ও মিনের‍্যালস: ডিমে প্রচুর পরিমাণ ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন এ, ডি এবং ই সহ সকল প্রকার ভিটামিন (ভিটামিন সি ব্যতীত) বিদ্যমান যা অন্যান্য প্রোটিন উৎস যেমন দুধ, মাছ ও মাংসে নেই বললেই চলে। তাছাড়া ডিমে প্রচুর পরিমাণে ফলিক এসিড এবং খনিজসমূহ যেমন আয়রন, ক্যালসিয়াম, কপার, সোডিয়াম, ফসফরাসসমূহ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। একটি ডিমে রয়েছে সমমূল্যের দুধের চেয়ে ৪ গুণ বেশি আয়রন ও ফসফরাস।

১১.৮.১ ডিম সংরক্ষণ

ডিম প্রকৃতি প্রদত্ত বিশুদ্ধ খাদ্য হলেও সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এটি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই পারিবারিকভাবে বা খামারে ডিম সংগ্রহের পরই তা সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। আবার যাদের খামার কিছুটা বড় অর্থাৎ পুরোপুরি বাণিজ্যিকভিত্তিক তারা তাদের উৎপন্ন অতিরিক্ত ডিম সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করে পরে বাজারে বিক্রি করতে পারেন। এতে খামারি লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এখানে কম ও অধিক সংখ্যক ডিম সংরক্ষণের কটি পদ্ধটি আলোচনা করা হয়েছে।

পারিবারিক পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ

তেল প্রয়োগের মাধ্যম: ডিমের খোসায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। গরমকালে ঐ ছিদ্রের মাধ্যমে গরম বাতাস ডিমের ভিতরে প্রবেশ করে ও ডিমকে নষ্ট করে দেয়। ডিমের উপর তেল প্রয়োগ করলে ডিমের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং এতে ডিমের বাষ্পীভবন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের অপচয় বন্ধ হয়। পাখি ডিম পাড়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তেল মাখাতে হবে। বর্ণহীন, উগ্র গন্ধ ও স্বাদবিহীন যে কোন তেল হলেই চলবে। তেলে ডিম ডুবিয়ে নিয়ে বা কোন তেল ছিটানো যন্ত্রের সাহায্যে তেল ছিটিয়ে ডিম রেখে দিলে ডিমের গুণাগুল বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

চুনের পানির মাধ্যমে: চুনের পানির মাধ্যমে ডিমের খোসার ছিদ্রপথ বন্ধ করে ডিম বেশ কিছুদিন ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়। চুনের পানি তৈরি করার জন্য একটি মাটির পাত্রে ফুটানো পানি নিয়ে তাতে এক কেজি কলিচুন (quick lime) মিশানো হয়। এরপর ঘরের তাপমাত্রায় এ পানি ঠাণ্ডা করে তাতে ৪-৫ লিটার ঠাণ্ডা পানি ও ২২৫ গ্রাম খাবার লবণ যোগ

করা হয়। মিশ্রণটি একদিন এভাবে রেখে দেয়া হয়। একদিন পর তলানি বাদ দিয়ে উপরের স্বচ্ছ চুনের পানি অন্য একটি মাটির পাত্রে সংগ্রহ করা হয় ও ডিমগুলো তাতে ১৬-১৮ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর ডিমগুলো তুরে নিয়ে ঘরের তাপমাত্রায় শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরের তাপমাত্রায় ডিম ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

ওয়াটার গ্লাস পদ্ধতি: ডিম সংরক্ষণের ওয়াটার গ্লাস পদ্ধতি সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। প্রথমে চীনা মাটি বা কাঁচের পাত্রে ১০ লিটার ফুটানো পানি ঠান্ডা করে নিতে হয়। অতঃপর তাতে ১ কেজি সোডিয়াম বা পটাশিয়াম সিলিকেট মিশিয়ে কাঠি দিয়ে ভালভাবে নেড়ে ওয়াটার গ্লাস তৈরি করা হয়। সংরক্ষণ করার জন্য আনা ডিমগুলোর খোসায় লেগে থাকা ময়লা ভালভাবে পরিষ্কার করে তা এ মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ডুবানো ডিমের ২.৫-৩.৭ সে.মি উপর পর্যন্ত এ মিশ্রণ থাকে। এ অবস্থায় প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত ডিমের গুণাগুণ ভাল থাকে। কারণ, ডিমের খোসার উপর সিলিকার একটি পাতলা আবরণ পড়ে তা খোসার ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেয়। তাই এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ডিম সিদ্ধ করা ছাড়া অন্য যে কোনভাবেই সহজে খাওয়া যায়। তবে, সিদ্ধ করে খেতে হলে আগে থেকে আলপিন বা চোখা কাঠি দিয়ে ডিমের খোসায় ছিদ্র করে নিতে হবে, তা না হলে সিদ্ধ করার সময় বিকট শব্দ করে ডিম ফেটে যেতে পারে।

থার্মোস্ট্যাবিলাইজেশন (thermostabilization) পদ্ধতির মাধ্যমে: এ পদ্ধতিতে ডিমকে ৫৪ ডিগ্রি সে. এ ১৫ মিনিট অথবা ৫৬ ডিগ্রি সে. এ ১০ মিনিট বা ৬০ ডিগ্রী সে. এ ৫ মিনিট পানিতে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে ডিমের এলবুমিনের (সাদা অংশ) ভারি অংশ জমে যায়। বাদবাকি অংশ মোটামোটি অপরিবর্তিত থাকে। এ পদ্ধতির সুবিধা হলো- ডিমের খোসার উপরের জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়, যাকে ডিমের পাস্তুরাইজোশন বলা হয়। ডিমের গুণগতমান ভাল থাকে। নিষিক্ত ডিম থাকলে ভ্রূণ মারা পড়ে, ফলে ভ্রূণ নষ্টের মাধ্যমে ডিম সংরক্ষণ করা যায়।

বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ডিম সংরক্ষণ

বাণিজ্যিকভাবে ডিম সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঠান্ডায় ডিম সংরক্ষণ: ডিম সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো হিমাগার, ডিম শীতলীকরণ যন্ত্র (egg cooler) বা রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা । সংরক্ষণ স্থানের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথাক্রমে ১৩-১৫ ডিগ্রি সে. (৫৫.৪-৬৬.২ ডিগ্রি ফা.) ও ৭৫-৮৫% হওয়া উচিত। এভাবে সংরক্ষণ কররে ডিম প্রায় মাস খানেক ভাল থাকে। তবে, সংরক্ষণ স্থান থেকে বের করার অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়র সম্ভবনা থাকে।

শুকিয়ে সংরক্ষণ: এ পদ্ধতিতে ডিম ভেঙ্গে তা থেকে তরল অংশগুলো সংগ্রহ করে স্প্রে ড্রাইড (sray dried) পদ্ধতিতে শুকিয়ে ডিমের পাউডার তৈরি করা হয়। এতে উৎপন্ন পাউডারের উপাদান, জীবাণুতাত্ত্বিক মান, পুনর্গঠন ধর্ম ঠিকভাবেই বজায় থাকে। এ পাউডার দিয়ে ওমলেট (omellet) তৈরি করা যায় সহজেই। ওমলেট তৈরি করার জন্য একভাগ পাউডারের সঙ্গে তিনভাগ কুসুম গরম পানি যোগ করতে হবে এবং ওমলেটের স্বাদ সঠিক রাখার জন্য এতে পরিমাণমতো লবণ, মরিচ ও অন্যান্য মশলা মিশাতে হবে। ডিম শুকিয়ে পাউডার তৈরির মাধ্যমে সংরক্ষণ করলে বহুদিন পর্যন্ত ভাল থাকে। তবে, এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি হওয়ায় এদেশে এখনও চালু হয় নি।

হিমায়িত করে সংরক্ষণ: ডিমের তরল অংশ হিমায়িত (freezing) করে সংরক্ষণ করলে বহুদিন পর্যন্ত ভাল থাকে। ডিমের তরল অংশ শূণ্যের নিচে ১০-৩০ ডিগ্রি ফা. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

সারমর্মঃ ডিম সংগ্রহের পর তা সঠিকভাবে সংগ্রহ না কররে নষ্ট হয়ে যায়। ডিম সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু পারিবারিকভাবে এবং কিছু বাণিজ্যিক খামারে ব্যবহার করা হয়। তবে ডিম যেভাবে সংরক্ষণ করা হোক না কেন এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।

১১.৮.১ ডিম বাজারজাতকরণ

গ্রেডিং: ডিমের আকার, ওজন, ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে ডিম বাছাইয়ের একটি পদ্ধতিই হলো গ্রেডিং। বিভিন্ন মাপের মেশিন ব্যবহার করে ডিমের আকার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ডিমের গ্রেডিং সাধারণত প্রতিষ্ঠিত

কোন আদর্শ (standards) অনুসারে করা হয়ে থাকে। যেমন- ইউএসডিএ (USDA) আদর্শ যা ডিমের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তবে আমাদের দেশে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠিত গ্রেডিং পদ্ধপিত চালু হয় নি। গ্রেডিং এর সুবিধা-

- ক্রেতা একই মানের দ্রব্য (product) পেতে পারেন।
- আলাদাভাবে দ্রব্যের মান পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
- ভালমানের দ্রব্য তৈরিতে খামারিদের উৎসাহিত করে।
- উচ্চ বাজার মূল্য পাওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্যের নাম প্রতিষ্ঠিত করতে সহজ হয়।

প্যাকেজিং: প্যাকেজিং বলতে ভোক্তার নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে ছোট ছোট প্যাকেট, বাক্স, কার্টুন, বোতল ও ক্যানে ডিম স্থাপন করাকে বুঝায়। ডিমের পরিবহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের সময় প্যাকেজিং এগ সেল ও ডিমের আভ্যন্তরীণ তরল পদার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্যাকেজিং এর সুবিধা নিম্নে বর্ণিত হলো-

- প্যাকেজিং দ্রব্যকে (product) পরিবহণের সময় ভেঙ্গে যাওয়া রোধ করে।
- দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং দ্রব্যের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে।
- দ্রব্য ব্যবহারের সুবিধা বৃদ্ধি করে।
- দ্রব্যের নড়াচড়ায় (handling) সুবিধা হয়।

ডিমের পরিবহণ: আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁশের ঝুড়িতে খড় রেখে এর মধ্যে ডিম বসিয়ে পরিবহণ করা হয়। তবে বর্তমানে অনেক বাণিজ্যিক খামার ডিমের ট্রে ব্যবহার করে। এগুলো প্লাস্টিকের তৈরি। ট্রেগুলো সহজেই পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু এগুলো প্যাকেজিং পদার্থ হিসেবে তেমন সুবিধা নয়।

ডিম বাজারজাতকরণ: আমাদের দেশে গ্রামীন পর্যায়ে প্রতি বাড়িতেই হাঁস-মুরগি পালন করতে দেখা যায়। এরা অবশ্য খুব অল্প সংখ্যক হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেক পোল্ট্রি খামার গড়ে উঠেছে। খাওয়ার ডিমের (table egg) ৮০% গ্রামীন এলাকা থেকে এসে থাকে। বর্তমানে ডিম গ্রহণের চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে এদেশে পোল্ট্রি পালনের সম্ভবনা উজ্জ্বল।

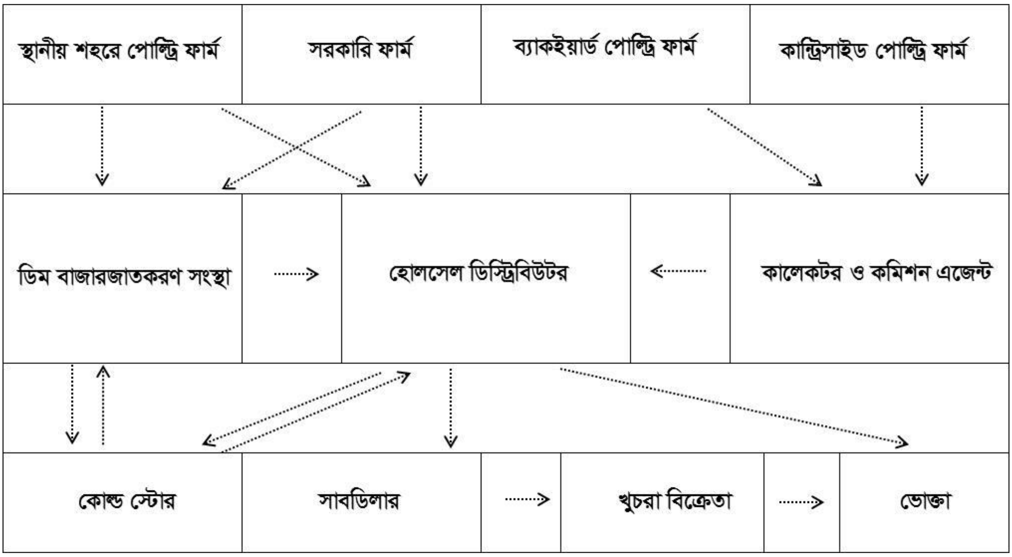

চিত্র ১১.১০ঃ ডিম বাজারজাতকরণ চ্যানেল।

ডিম উৎপাদনকারী ও ভোক্তার অবস্থান যত বেশি দূরে হবে বাজারজাতকরণ তত জটিল হবে অর্থাৎ ভোক্তার নিকট তার চাহিদানুরূপ দ্রব্য ঠিক সময়ে পেতে অসুবিধা হবে। নিম্নে এ ডিম বাজারজাতকরণ চ্যানেল দেখানো হলো- পারিবারিক পর্যায়ে মালিক সুবিধাজনক বাজারে বা হাটে ডিম সরাসরি বিক্রি করে থাকে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বাড়ি থেকে ডিম সংগ্রহ করে থাকে এবং এগুলো বাস বা ট্রেন যোগে দূরবর্তী শহরে নিয়ে পাইকারী বিক্রি করে। এখান থেকে ডিম ব্যবসায়ী সাব ডিলার, খুচরা ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট ডিম বিক্রি করে থাকে। এছাড়া কোল্ড ষ্টোরোজেও ডিম সংরক্ষণ করে থাকে। অনেক সময় ক্রেতা ডিম উৎপাদনকারীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এতে করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটু কম মূল্যে ডিম সরবরাহ করতে হয়। এ চুক্তি অবশ্যই উৎপাদনকারীর নিয়মিত ডিম সরবরাহের জন্যই করে থাকে।

ডিম বাজারজাতকরণ উন্নয়ন: ডিম বাজারজাতকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই দেখা যাবে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ডিমের চাহিদা বাড়ছে এবং উন্নত দেশগুলোতে কমছে। সাধারণত ডিম গ্রহণে রক্তের মধ্যে বেশি মাত্রায় কোলেষ্টেরল, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা এবং ডিমের খাদ্যমান সম্পর্কে অজ্ঞতা ডিম বাজারজাতকরণের প্রধান অন্তরায়। আমাদের দেশে ডিম উৎপাদনকারীরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ফরিয়াদের হাত হতে সহজ, সরল গ্রামীণ মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। এছাড়া ডিম বাজারজাতকরণের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সারমর্মঃ ডিম পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের পূর্বে গ্রেডিং ও প্যাকেজিং করা হয়। গ্রেডিং এর মাধ্যমে ডিমের আকার, ওজন ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাছাই করা হয়। গ্রেডিং করার পর ডিম প্যাকেজিং করে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। ডিম বাজারজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত বাজারজাত চ্যানেল (marketing channel) যা আমাদের দেশে এখনো গড়ে উঠেনি।

অধ্যায় ১২
গবাদিপশু ও পোল্ট্রি উপজাত

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপাখি পালনের মূল উদ্দেশ্য পশুপাখির উৎপাদিত দ্রব্য ও উপজাত বাজারে বিক্রি করে লাভবান হওয়া। সুস্থসবল পশুপাখি থেকে যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত দ্রব্য পাওয়া যায় তেমনি উপজাতও হয় উন্নতমানের। পশু থেকে দুধ ও মাংস ছাড়াও চামড়া, গোবর, পশম, চর্বি, হাড়, রক্ত, নাড়ি-ভুঁড়ি, ক্ষুর শিং ইত্যাদি পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য সম্মতভাবে পশুর এসব উৎপাদিত দ্রব্য ও উপজাত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত না করা হলে একদিকে যেমন উৎপাদন হ্রাস হবার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে উৎপাদিত দ্রব্য নিম্নমানের হয়। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়না। তাই দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা পশুজাত দ্রব্য ও উপজাত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করা প্রয়োজন।

১২.১ গবাদিপশু ও পোল্ট্রির বিভিন্ন উপজাত

পশু জবাইয়ের পর থেকে বিতরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত খাদ্য-অনুপযোগী দ্রব্য কসাইখানাতে বা কসাইদের দোকানে সঞ্চিত হয় সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে উপজাত বলা হয়। এসব উপজাত একদিকে যেমন আহার উপযোগী মাংস ও মাংস দ্রব্যাদির কলুষিতকরণের আধার হিসেবে বিবেচিত, তেমনি অন্যদিকে এগুলো স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে দ্রুত অপসারণ ও পরবর্তীতে ব্যবহার উপযোগী করা অপরিসীম অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে সরকার অনুমোদিত কসাইখানা ছাড়াও হাটে, বাজারে, রাস্তার মোড়ে, আঙ্গিনায় স্বীকৃত কসাইখানা গড়ে উঠায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ উপজাত নষ্ট হয়। জনসাধরণের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে পশুপাখির রক্ত, হাড়, চর্বি, নাড়িভুড়ি, মলমূত্র ইত্যাদি যত কমই পুঞ্জীভূত হোক না কেন তা কাজে লাগাবার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু উন্নত দেশের সব কসাইখানাতে উপজাত সযত্নে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলো পুনঃ উৎপাদন কারখানায় বা প্রতিষ্ঠানে (rendering plant) পাঠানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিরাট ক্ষতি আমাদের উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরী এবং তা নিবারণকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। একটি পশুকে কেবল মাংসের উৎস হিসেবে বিবেচনা করলে অত্যন্ত ভুল হবে, বরং মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি উপজাত দ্রব্য যত অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হোক না কেন সমগ্র দেশের সংগ্রহ নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিরাট অবদান রাখতে পারে। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতি সাধনে জবাইকৃত পশু থেকে উদ্ভূত উপজাতের যথোপযুক্ত অপসারণ ও পরবর্তীতে সেগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত অপরিহার্য কাজ।

গোবর (cow-dung): পশুর গোবর প্রধানত জ্বালানি, জৈব সার ও জৈব গ্যাস তৈরির জন্য ব্যবহার হয়। জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধির জন্য পশুর মল-মূত্র একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। সুতরাং জ্বালানি হিসেবে গোবরের ব্যবহার বন্ধ করে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার অধিক লাভজনক। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রটিপূর্ণভাবে গোবর সার সংরক্ষণের ফলে উদ্ভিদ খাদ্যের অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নিম্নে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে গোবর সার সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা প্রয়োজন।

- জ্বালানি হিসেবে গোবরের ব্যবহার বন্ধ করে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার অধিক লাভজনক।
- পশুর মল-মূত্র থেকে উৎকৃষ্ট জৈব সার সংরক্ষণের জন্য উঁচু জায়গা পাকা করে সারের গর্ত তৈরি করা প্রয়োজন।
- গোশালার মেঝে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করে গোশালার নালাটি জমাকৃত সারের গর্তের সাথে যোগ করে দিলে পশুর মল-মূত্রে অপচয় না হয়ে সরাসরি গর্তে পড়বে।
- পশুর মেঝেতে শুকনো খড় বিছিয়ে দিলে শুষ্ক খড় পশুর মল-মূত্র শোষণ করে। পরে এই মলমূত্র মিশ্রিত খড় গর্তে পঁচিয়ে ভাল জৈব সার তৈরি হয়।

পশুর অন্যান্য উপজাত (other animal by-products): পশুর রক্ত, চর্বি, নাড়ী-ভুড়ি, পশম, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি উপজাতগুলি সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা যায়।

- রক্ত ও হাড়ের গুড়া পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। হাঁড় দিয়ে সারও তৈরি হয়।

- চর্বি সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।
- মেষের পশম দিয়ে কম্বল ও পোষাক তৈরি হয়।
- গরু ও মহিষের শিং দিয়ে চিরুনি তৈরি করা হয়।
- পশুর নাড়ীভূড়ি পোল্ট্রি ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশে পশুর এসব উপজাতগুলোর ব্যবহারের জন্য তেমন শিল্প কারখানা গড়ে উঠে নাই। তই এসব উপজাত সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হয়না। ফলে এসব উপজাতগুলো যেখানে সেখানে ফেলে দিয়ে পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা হয়। যতদিন পর্যন্ত পশু উপজাত আমাদের দেশে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের শিল্প গড়ে না উঠে ততদিন পর্যন্ত এসব উপজাত মাটির নিচে পুঁতে রাখলে পরিবেশ নোংরা বা দূষিত হবে না।

১২.২ গবাদিপশুর মলমূত্র সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার

গো-মলমূত্র মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশে মোট প্রাপ্ত গোবরের শতকরা ৫০ ভাগ শুকিয়ে গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়। এছাড়া জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গোবর একটা উৎকৃষ্ট জৈবসার। গবাদিপশুর মলমূত্রকে একসঙ্গে মিশিয়ে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়। একটি গরু থেকে গড়ে দৈনিক প্রায় ১০ কেজি এবং মহিষ থেকে প্রায় ২০ কেজি গোবর পাওয়া যায়। তাজা গোবরের শতকরা ০.৩-০.৪ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.১-০.২ ভাগ ফসফরাস ও ০.১-০.৩ ভাগ পটাসিয়াম থাকে। আমাদের দেশে ক্রটিপূর্ণ গোবর সার সংরক্ষণের ফলে উদ্ভিদ খাদ্যের অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। গবাদিপশুর মলমূত্র পঁচিয়ে জৈব সার তৈরি করে জমিতে প্রয়োগ করলে নিম্নোক্ত উপকার হয় -

- গোবর সারে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম থাকে যা উদ্ভিদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।
- এই সারের উপাদানগুলো অদ্রবণীয় ও কঠিন অবস্থায় থাকে, তাই বৃষ্টির পানি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয় না।
- এই সার থেকে মৃত্তিকায় অবস্থিত জীবাণু গুলো খাদ্য প্রায়, এতে মৃত্তিকার জীবাণুর কার্যকারিতা বাড়ে ও মৃত্তিকার ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটায়।
- গোবর সার মাটির নিরপেক্ষতা সৃষ্টি ক্ষমতা (buffering capacity) বাড়ায়, মাটির গঠনের উন্নতি সাধন করে এবং এর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

উপরন্তু, গো-মলমূত্র হতে বায়োগ্যাস (biogas) তৈরি করা যায়। পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে উৎসোচক (fermentation) পদ্ধতিতে সহজ দাহ্য যে বায়বীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় তাই বায়োগ্যাস। বর্তমানে গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা সংরক্ষণের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা। গোবর প্ল্যান্ট তৈরির মাধ্যমে এক সঙ্গে জৈব গ্যাস ও জমির উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। সাধারণত জৈব গ্যাসে শতকরা ৬০ ভাগ মিথেন এবং ৪০ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে। এই গ্যাসের তাপ উৎপন্ন ক্ষমতা প্রতি ঘন মিটারে ৫০০০ কিলো ক্যালরি যা প্রায় ৬০০ মিলি কেরোসিন এক ঘনমিটার গ্যাসের সমতুল্য। গ্রাম অঞ্চলে জ্বালানীর পরিপূরক হিসেবে রান্না ও আলো জ্বালানোর কাজে এ গ্যাস ব্যবহার হতে পারে।

১২.২.১ বায়োগ্যাস কি? এবং বায়োগ্যাস কেন?

গোবর ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচানোর ফলে যে রং বিহীন জ্বালানি গ্যাস তৈরি হয় তাকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এতে শতকরা ৫০-৮০ ভাগ মিথেন (CH_4) থাকে যা জ্বালানি গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকীটা মূলত কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গ্যাস উৎপাদনের পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা উন্নতমানের জৈব সার। প্রাকৃতিক উপায়ে যে সকল প্রাণী জাবর কাটে (যেমন- গো-মহিষ, ছাগল) তাদের অন্ত্রে এবং অক্সিজেন বিবর্জিত ইকোলজিক্যাল এলাকা যেমন- জলাবদ্ধ ভূমি, স্যাঁতসেঁতে ভেজা জায়গা, ময়লাযুক্ত পানির আধার প্রভৃতি স্থান থেকেও মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রংবিহীন এবং খুব সহজেই দাহ্য। জৈব উৎস থেকে উৎপন্ন বলে এই গ্যাসকে বায়োগ্যাস বলা হয়।

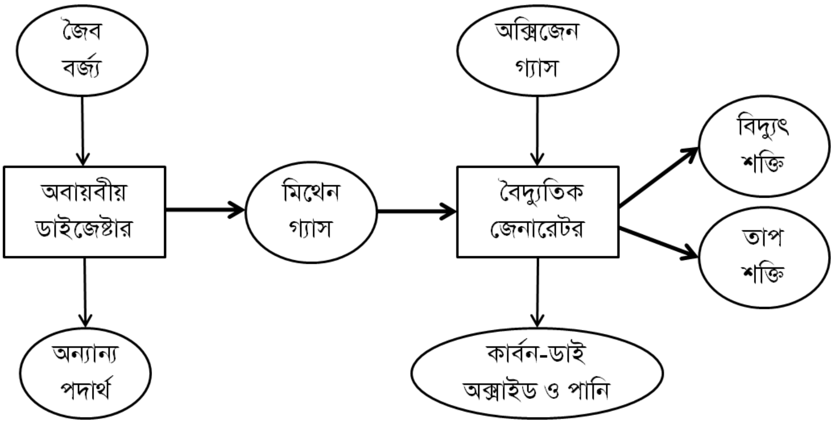

চিত্র ১২.১ঃ বায়োগ্যাস তৈরির প্রবাহ ছক।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক জ্বালানির উৎস খুব সীমিত। এ দেশে উত্তোলন যোগ্য যে গ্যাস রয়েছে তা বর্তমান হারে ব্যবহার করতে থাকলে আগামী ২০-২২ বছরে শেষ হয়ে যাবে। এছাড়া প্রতি বছর শুধু রান্নার জন্য এদেশে প্রায় ৪ কোটি টন প্রচলিত খড়-কুটা, লতাপাতা, গোবর, আবর্জনা ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থকে শুকিয়ে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব বায়োমাস (biomas) জ্বালানি ব্যবহারও বেড়ে যাচ্ছে। তদুপরি, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাবে এসব বায়োমাস জ্বালানির প্রচুর অপচয় হচ্ছে। উপরোক্ত পদার্থেগুলো থেকে যে মূল্যবান সার কৃষি কাজে ব্যবহার করার জন্য পাওয়া যেত, তা পোড়ানোর ফলে নষ্ট হয়ে যায়। বায়োমাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারে যে ধোঁয়া হয় তা রান্না ঘরের আবহাওয়া কলুষিত করে। উক্ত ধোঁয়ার ফলে কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-পাতিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ময়লা হয় এবং রান্না-বান্নায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এতে চোখ জ্বালা, শিশু ও মহিলাদের শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এ সমস্ত পদার্থকেই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে পচিয়ে গ্যাস পাওয়া যায় এবং এটাকে সহজেই জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে হাঁড়ি-পাতিল, কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্র ময়লা হয় না এবং রান্না-বান্নার সময় ও শ্রম কম লাগে। রাতে বাতি জ্বালাবার জন্য কেরোসিনের দরকার হয় না, ম্যান্টল জ্বালিয়ে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়। উপরন্তু গ্যাস উৎপাদনের পর প্ল্যান্ট থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থকে ভাল সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের বনজ সম্পদ রক্ষা করতে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজন বায়োমাস জ্বালানির অপচয় রোধ করা, এসব জ্বালানির সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বিকল্প কোন জ্বালানির সন্ধান করা। এক্ষেত্রে বায়োগ্যাস প্রযুক্তি বিকল্প জ্বালানি ও সুষম জৈব সারের চাহিদা মেটাতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

১২.২.২ বাংলাদেশে বায়োগ্যাসের সম্ভাবনা

জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট গোবর, মুরগির বিষ্ঠা ও অন্যান্য পচনশীল বায়োমাস থেকে বায়োগ্যাস তৈরির গবেষণা শুরু করে। ১৯৭৬ সালে এ ইনস্টিটিউটে প্রথম তিন ঘনমিটার গ্যাস উৎপাদনক্ষম একটি ভাসমান ডোম মডেলের প্ল্যান্ট স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তৎপরবর্তীকালে এ ইনস্টিটিউটের কারিগরি সহযোগীতায় সম্পূর্ণ মালিকের খরচে সারাদেশে দুই শতাধিক ভাসমান ডোম মডেলের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। ভাসমান ডোম প্ল্যান্টের গ্যাস হোল্ডারগুলো এসএস সীটে তৈরি বিধায় তা ৩-৫ বছরের মধ্যে লিক হয়ে যায়। এ অসুবিধা বিবেচনা করে এ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আশির দশকে দেশোপযোগী স্থির ডোম মডেল প্ল্যান্ট উদ্ভাবন করেন। স্থির ডোম মডেলের প্ল্যান্ট প্রায় সম্পূর্ণ মাটির নিচে থাকে এবং তাতে আলাদা কোন গ্যাস হোল্ডার নেই। কাজেই জায়গার কোন অপচয় হয় না। ইট, সিমেন্ট, বালু দিয়ে এই প্ল্যান্ট

তৈরি করা যায় এবং এর স্থায়িত্ব ৩০ বছরেরও অধিক। তৈরি খরচও একই আয়তনের ভাসমান ডোম মডেলের তুলনায় কম। উদ্ভাবিত স্থির ডোম মডেলের বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সফলতার সাথে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতিটি এলাকায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করে একদিকে যেমন জ্বালানি চাহিদা মেটানো যায় অন্যদিকে তেমনি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ গাছ রক্ষা করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে গরু-মহিষের সংখ্যা প্রায় ২৫ মিলিয়ন। এ গরু-মহিষ থেকে দৈনিক প্রাপ্ত গোবরের পরিমাণ প্রায় ২২০ মিলিয়ন কেজি। প্রতি কেজি গোবর হতে ১.৩ ঘনফুট বা ০.০৩৭ ঘনমিটার গ্যাস হিসেবে বৎসরে ২.৯৭×১০৯ ঘনমিটার গ্যাস পাওয়া সম্ভব, যা ১.৫২×১০৬ টন কেরোসিন বা ৩.০৪×১০৬ টন কয়লার সমান। এছাড়া মানুষ, হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, আবর্জনা, কুচুরীপানা বা জলজ উদ্ভিদ থেকেও উল্লেযোগ্য পরিমাণ বায়োগ্যাস পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে প্রতিটি এলাকায় যে পরিমাণ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে তার মলমূত্র দ্বারা গ্যাসের বিপ্লব ঘটানো যেতে পারে। সাধারণত ৭-৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের দৈনিক রান্নাবান্না ও রাতে হ্যাজাক লাইট জ্বালাবার জন্য দিনে ৩ ঘনমিটার (১০৫ ঘনফুট) গ্যাস উৎপাদনক্ষম একটি স্থির ডোম প্ল্যান্টের তৈরি খরচ (হ্যাজাক লাইট, বার্নার হত্যাদি সহ) প্রায় ১৭,০০০ টাকা। প্ল্যান্টের সাথে জৈব সার সংরক্ষণের জন্য একটি পাকা বায়োফার্টিলাইজার পিট তৈরি করলে অতিরিক্ত আরও ৩,০০০ টাকা ব্যয় হবে। এই প্ল্যান্টের জন্য দৈনিক প্রায় ৬০-৭০ কেজি গোবরের প্রয়োজন, যা ৫-৬ টি বড় গরু অথবা ৩-৪ টি মহিষ থেকে পাওয়া যায় অথবা দৈনিক ৩০-৪০ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োজন যা ৩৫০-৪০০ টি হাঁস-মুরগি থেকে পাওয়া যায়।

১২.২.৩ বায়োগ্যাসের ব্যবহার ও সুবিধা

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে একসাথে নিম্নবর্ণিত সুফলসমূহ পাওয়া যায়-

পরিচ্ছন্ন জ্বলানি গ্যাস: বায়োগ্যাস দিয়ে তিতাস গ্যাসের মতই এই গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়। ব্যবহারের ফলে হাড়ি-পাতিল, বাড়ি-ঘর ও কাপড়-চোপড়ে ময়লা পড়ে না। এই গ্যাস দিয়ে ম্যান্টল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়। জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ফ্যান, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিডি ইত্যাদি চালানো যায় এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো যায়। পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয়। রসায়নাগারে কোলগ্যাস, এ্যারোজেন গ্যাস বা পেট্রোল গ্যাসের বিকল্প হিসেবে কম খরচে এই গ্যাস ব্যবহারযোগ্য।

উন্নতমানের জৈব সার: গোবর ও অন্যান্য পচনশীল জৈব পদার্থ থেকে বায়োগ্যাস উপরি হিসেবে পাওয়া যায়। গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা একটি উন্নত মানের জৈব সার। এই সারে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংরক্ষিত হয়। জৈব গ্যাস প্ল্যান্টে থেকে প্রাপ্ত জৈব সারে শতকরা ১.৬-১.৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ১.১-২.০ ভাগ ফসফরাস এবং ০.৮-১.২ ভাগ পটাসিয়াম থাকে। বায়োগ্যাস রেসিডিউ উন্নমানের জৈব সার হিসেবে মাশরুম চাষ, মাছের চাষ, মুক্তো চাষ, কেঁচো চাষ (হাঁস-মুরগির খাদ্য), বীজ অংকুরোদগম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। তাই বায়োগ্যাস প্রযুক্তি জৈব চক্র সংরক্ষণে সহায়তা করে। তাছাড়া জৈব-দহন প্রক্রিয়ার কারণে সকল আগাছার বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে এই সার ব্যবহারে জমিতে আগাছার পরিমাণওহ্রাস পায়।

স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ: বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক হল স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনাই হোক অথবা মানুষ বা পশুপাখির মল-মূত্রই হোক, যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকলে দূর্গন্ধ ছড়ায়, মশা-মাছি আকৃষ্ট করে, রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়তা করে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে এ সব দ্রব্য পঁচনের ফলে দূর্গন্ধ ছড়ায় না, মশা-মাছি আকৃষ্ট হয় না এবং রোগজীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়। বায়ুরোধী অবস্থায় পচন প্রক্রিয়া সম্ভব হয় বলে কোন দুর্গন্ধ ছড়ায় না এবং মশামাছির উপদ্রবও থাকে না। এই গ্যাস পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে উদ্ভিদ জ্বালানির উপর চাপ কমে যায়। একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্বল্প পরিসর স্থানে এমনকি জনবহুল এলাকাতেও তৈরি করা সম্ভব। এর প্রস্তুত প্রণালী ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ এবং খরচও কম।

১২.২.৪ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ কৌশল

একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের প্রধান অংশ হচ্ছে ডাইজেস্টার বা ফারমেন্টেশন ট্যাঙ্ক এবং গ্যাস হোল্ডার। এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে ইনলেট ট্যাঙ্ক বা খাদকনালী (feeding channel), নিগর্মণ নালী ও আউটলেট কূপ এবং গ্যাস সরবরাহ লাইন। একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বিভিন্ন অংশের আকার আকৃতি নির্ভর করে গ্যাসের চাহিদা, ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ, ধরন ইত্যাদির উপর। এখানে ৪-৫ টি গরু বা মহিষ আছে এমন বাড়ীতে ৬-৭ জন পারিবারিক সদস্যের জ্বালানি চাহিদা মেটানো উপযোগী একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বর্ণনা দেয়া হল। প্রথমে ৮ ফুট গভীর ও ৭ ফুট ব্যাসের একটি কূপ খনন করতে হবে। খননকৃত কূপের তলায় ৩″ আরসিসি ঢালাই দিতে হবে। এই ঢালাইয়ের উপরে ৬ ফুট অভ্যন্তরীণ ব্যাস ও ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৫ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনি দিয়ে একটি গোলাকার নিশ্ছিদ্র কূপ তৈরি করতে হবে। দেয়ালের ৫ ফুট উচ্চতায় ভেতরে ও বাইরে ৩ ইঞ্চি ইটের একটি বর্ধিত গাঁথুনি চতুর্দিকে দিতে হবে। খালি অবস্থায় গ্যাস হোল্ডারটি এর উপরে অবস্থান করবে। বর্ধিত গাঁথুনীর ঠিক নিচ দিয়ে ৪-৬ ফুট ব্যাসের ৮-১০ ফুট লম্বা একটি আরসিসি পাইপ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে এর নিম্নাংশ কূপের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে তলদেশ থেকে ১ ফুট উপরে অবস্থান করে। অপর অংশ ২′×২′×২′ মাপের ইটের তৈরি ইনলেট বা ফিডিং ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত থাকবে। ডাইজেস্টারের উপরের দিকে দেয়ালের গায়ে সুবিধা মতো স্থানে একটি ছিদ্র করে তার সাথে ৪″-৬″ ব্যাসের ৩′-৪′ দীর্ঘ একটি আরসিসি পাইপ জুড়ে দিয়ে নির্গমন কূপের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। এই পথেই গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবার পরপরই (পানি মিশ্রিত গোবর) ডাইজেস্টারের বাইরে চলে আসবে। ডাইজেস্টারের তলায় ঠিক কেন্দ্র বিন্দুতে ১′×১′×১′ ঢালাই এর মাধ্যমে ৮ ফুট লম্বা ২″ ব্যাসের একটি রড খাড়া ভাবে বসাতে হবে। এই রডের উপরেই গ্যাস হোল্ডার বসানো থাকে।

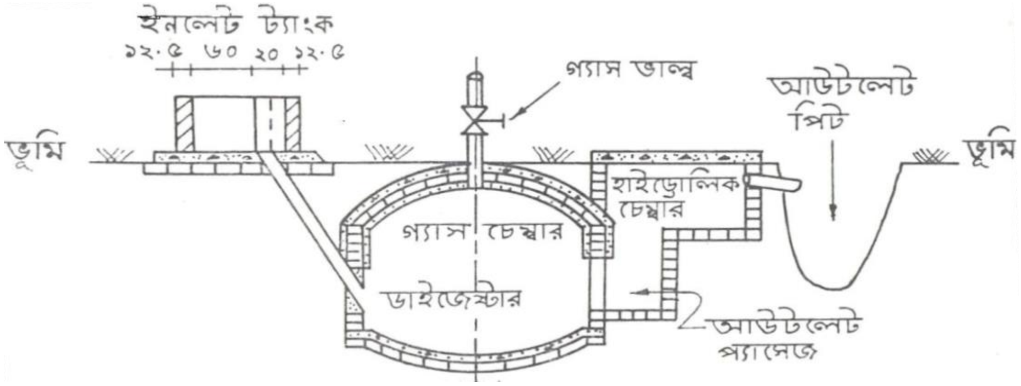

চিত্র ১২.২ঃ বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ডায়াগ্রাম।

গ্যাস হোল্ডারের ব্যাস অবশ্যই ডাইজেস্টারের ব্যাস অপেক্ষা সামান্য (প্রায় ৩″) কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এটি সহজে ডাইজেস্টারের কূপের ভেতরে ঘুরানো বা উঠানামা করানো যাবে না। প্রায় ১০০ ঘনফুট গ্যাস ধারণক্ষম একটি ডাইজেস্টারের জন্য ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গ্যাস হোল্ডার প্রয়োজন। এটি ১৬ থেকে ২৪ গজী এমএস সিট ওয়েল্ডিং করে তৈরি করা যায়। গ্যাস হোল্ডারের অভ্যন্তরে আড়াআড়িভাবে দু'টো রড এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে গ্যাস হোল্ডারটি সহজে উপরে নিচে উঠা নামা করতে পারে এবং চারদিকে ঘুরতে পারে। গ্যাস হোল্ডারের এক মুখ খোলা এবং অপর মুখ বন্ধ থাকবে। বন্ধ মুখের কেন্দ্রস্থল থেকে খোলা মুখের শেষ প্রান্ত পযর্ন্ত লম্বা একটি জিআই পাইপ সোজাভাবে আড়াআড়ি রডের সাথে ওয়েল্ডিং করে লাগাতে হবে। ডাইজেস্টারের কেন্দ্রে অবস্থিত রডটি জিআই পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে গ্যাস হোল্ডারটি ডাইজেস্টারের উপরে স্থাপন করতে হবে। গ্যাস হোল্ডারের উপরে ভালভ্সহ ১ ইঞ্চি ব্যাসের একটি গ্যাস ট্যাপের সংযোজন দিতে হবে। এই সংযোগস্থল থেকে জিআই পাইপের সাহায্যে ব্যবহার স্থলে গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

১২.২.৫ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালুকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ

নির্মাণ শেষে এ ধরণের গ্যাস প্ল্যান্ট প্রথম চালু করার জন্য ১.৫-২ টন কাঁচামাল যথা- গোবর, হাঁস-মুরগির মল ইত্যাদি পঁচনশীল পদার্থের প্রয়োজন। প্ল্যান্ট চালু করার সময় প্ল্যান্ট তৈরির শুরু থেকে এগুলো জমা করে রাখলে প্ল্যান্ট চালুর সময় এগুলো ব্যবহার করা যাবে। জমাকৃত কাঁচামাল এবং পরিস্কার পানি গোবরের ক্ষেত্রে ১:১ এবং হাঁস-মুরগির মলের ক্ষেত্রে ১:২ অনুপাতে মিশিয়ে ইনলেট পাইপ দিয়ে আস্তে আস্তে ডাইজেষ্টারে ঢালতে হবে। কাঁচামাল ও পানির মিশ্রণ (স্লারি) এই পরিমাণ প্ল্যান্টের মধ্যে ঢালতে হবে যাতে করে স্লারির লেভেল হাইড্রোলিক চেম্বারের তলদেশ পর্যন্ত পৌছায়। ফিডিং এর সময় গ্যাস হোল্ডার বায়ুশূন্য করার জন্য গ্যাস লাইন খোলা রাখতে হয়। ডাইজেস্টার ট্যাঙ্ক ভর্তি হবার পর হুইল কর্ক বন্ধ করে গ্যাস লাইনের সংযোগ দিতে হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই গ্যাস জমা হয়ে গ্যাস হোল্ডার উপরের দিকে উঠে যাবে। প্রথম দিকে গ্যাস হোল্ডারে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হবার কারণে তা নাও জ্বলতে পারে। সে ক্ষেত্রে গ্যাস হোল্ডারে জমাকৃত সম্পূর্ণ গ্যাস বের করে দিতে হবে। প্রথমেই স্লারির সাথে কিছু পরিমাণ লাইম বা চুন (CaO) মিশিয়ে দিলে বায়োগ্যাস উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপাদন হ্রাস পায়। নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিদিন ৪-৫ বালতি গোবর ও সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে ফিডার চ্যানেলের মাধ্যমে ডাইজেস্টারে প্রবেশ করাতে হবে। এখানে উলেখযোগ্য যে, used up slurry বা effluent গ্যাস উৎপাদনের পর যা বের হয়ে আসে তা অত্যন্ত উন্নত মানের জৈব সার হিসেবে মাটিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সারে ১.৫৮% নাইট্রোজেন, ১.২% ফসফেট (P_2O_5) এবং ০.৭% পটাশ (K_2O) থাকে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণের তেমন কোন ঝামেলা নেই। তথাপি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পালন করলে সুষ্ঠুভাবে গ্যাস উৎপাদনে সহায়ক হবে।

- ডাইজেস্টারে যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকে তার জন্য ফিডিং ট্যাঙ্ক ডাইজেস্টার থেকে সামান্য উপরে থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে উপরে শেড তৈরি করা যেতে পারে।
- চার্জিং (স্লারি ঢেলে দেয়া) এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন ইট, পাথর বা কাঠের টুকরা, ইত্যাদি প্ল্যান্টে ঢুকতে না পারে। তা হলে ইনলেট পাইপ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- গ্যাস হোল্ডারটি মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় পাইপের চারদিকে ঘুরিয়ে দিলে উপরে গোবর ও পানির মিশ্রণ শক্ত হতে পারবে না। কোন কারণে ইনলেট বা আউটলেট পাইপ বন্ধ হয়ে গেলে সোজা সরু কাঠি দিয়ে তা ছাড়িয়ে দিতে হবে।
- গ্যাস পাইপ লাইনে পানি জমেছে কিনা দেখে নিতে হবে। পানি জমলে যে মাথায় পানি জমেছে সে মাথা খুলে পানি বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে পানির ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে।
- প্ল্যান্ট প্রতিদিন চার্জ করতে হবে নতুবা গ্যাস উৎপাদন কমে যাবে। বেশ কিছুদিন চার্জ না করা হলে ইনলেট পাইপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জে, হাট-বাজারে ছোট ছোট বিকেন্দ্রীক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। গ্রামের কৃষিজ বর্জ্য, আবর্জনা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও গবাদিপশুর মল-মূত্রের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি উদ্যোগ/কোঅপারেটিভ/ক্লাষ্টার হাউজ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছান সহ জাতীয় গ্রীডে চাপ কমানো যাবে।

১২.৩ গবাদিপশুর রক্তের ব্যবহার

রক্ত অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের আমিষের উৎস। রক্ত থেকে তৈরি ব্লাডমিলে প্রায় ৮০-৮৫% আমিষ থাকে। অথচ প্রতিবছর বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত কোরবানীর ঈদে, বিপুল পরিমাণ জবাইকৃত পশুর রক্ত নষ্ট হয়। সঠিকভাবে রক্ত কাজে না লাগানোর কারণে একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি দেশ বঞ্চিত হয় মূল্যবান অর্থ থেকে। কাজেই রক্তের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একদিকে যেমন অর্থ উপার্জন করা যায়, অন্যদিকে পরিবেশও থাকে দুগর্ন্ধহীন,

বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত। কোন একটি পশুর দৈহিক ওজনের প্রায় ৭.১-৯.১% রক্ত। যাহোক, জবাইয়ের পর কোন না কোন কারণে নষ্ট হওয়ায় এ পরিমাণ রক্তের সবটুকুই পাওয়া সম্ভব হয় না। সাধরণত ৪৫৪.৫ কেজি (১০০০ পাউন্ড) ওজনের একটি গরু থেকে ২.৭-৩.২ কেজি (৬-৭ পা.) ব্লাডমিল পাওয়া যায়। আবার ছাগল, ভেড়া বা বাছুরের ক্ষেত্রে এ পরিমাণ ওজনের ভিত্তিতে ২.৩-২.৭ কেজি (৫-৬ পা.) ব্লাডমিল পাওয়া যেতে পারে। রক্তে প্রায় ২০% শুষ্ক পদার্থ থাকে। কাজেই ২.৩ কেজি (৫ পা.) তাজা রক্ত থেকে ০.৪৫ কেজি (১ পা.) ব্লাডমিল পাওয়া যায়। এ ব্লাডমিল মিলে ১২% এর মতো পানি থাকে।

গবাদিপশুর রক্তের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। কোন কোন দেশে জীবাণুমুক্ত ও সঠিকভাবে সংগৃহীত রক্ত থেকে মানুষের জন্য বিভিন্ন খাদ্য তৈরি করা হয়। এর মধ্যে কালো পুডিং (black pudding) ও সসেজ (saugage) অন্যতম। তবে, আমাদের দেশে রক্ত মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তবে আমাদের দেশে রক্ত নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যথা-

- রক্তের ফাইব্রিন থেকে পোল্ট্রি ফিড তৈরি করা যায়।
- রক্তের ফাইব্রিন দিয়ে পেপটোন (peptone) বা লেসিথিন (lecithin) তৈরি করা যেতে পারে।
- শিল্পক্ষেত্রে রক্তের ব্যবহার রয়েছে।
- রক্ত এলবুমিনের উৎকৃষ্ট উৎস। এ অ্যালবুমিন ডিমের এলবুমিনের মতোই ব্যবহৃত হতে পারে। এ এলবুমিন আইসক্রিম তৈরিতে, বেকারিতে এবং পনিরোধী আঠা তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সিংহভাগ রক্তই ব্যবহৃত হয় পশুপাখির খাদ্য অর্থাৎ ব্লাডমিল তৈরিতে।

রক্ত সংগ্রহ

রক্ত যে কাজেই ব্যবহার করা হোক না কেন তা সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কোন দূষণ না ঘটে। কারণ রক্তে অতি দ্রুত পচন ধরে। মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ সহজে আকর্ষিত হয়। কাজেই রক্ত থেকে সঠিক ও জীবাণুমুক্তভাবে ব্লাডমিল তৈরি না করলে তা পশুপাখির দেহে রোগ সৃষ্টি করবে। তাছাড়া পচা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া রক্ত থেকে তৈরি ব্লাড মিলে আমিষের পরিমাণ কমে যায় ও তা গবাদিপশুর জন্য অরুচিকর হয়। নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। যথা-

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষ করে, এদেশে যে পদ্ধতিতে পশু জবাই করা হয় তাতে রক্তে পাকস্থলীর অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য মিশে যেতে পারে।
- কম সংখ্যক পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে খাদ্যনালি হাতে চেপে ধরলেই হবে। কিন্তু একসঙ্গে বেশি পশু জবাই করলে খাদ্যনালী হালকা লোহার ক্ল্যাম্পের মাধ্যমে আটকালে ভাল হয়।
- এলবুমিন তৈরির জন্য রক্ত সংগ্রহ করতে হলে বিশেষ ধরণের ছুরি ব্যবহার করতে হবে যার হাতল হবে টিউবাকৃতির। এ টিউবের মাধ্যমে রক্ত একটি বিশেষ ধরণের পাত্রে সংগ্রহীত হয় যেখানে রক্ত জমাটরোধী (anticoagulant) রাখা থাকে।
- রক্ত সংগ্রহের প্যানে (blood pan) রক্ত সংগ্রহ করতে হবে। এ প্যানের ব্যাস হবে ৫০.৮ সেন্টিমিটার (২০ ইঞ্চি), গভীরতা ১৫.২ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) এবং এর দুপাশে দুটো কড়া লাগানো থাকবে।
- কসাইখানা হলে সেখানে রক্ত সংগ্রহের ট্যাংক থাকা উচিত।

রক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ

তাপসহযোগে অথবা তাপ ছাড়া রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা যায়। যেখানে একসঙ্গে বহুসংখ্যক গবাদিপশু জবাই করা হয় সেখানে বাণিজ্যিকভিত্তিতে রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

বাণিজ্যিকভাবে রক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ: এতে অনেক যন্ত্রপাতির দরকার হয়। এজন্য আলাদা শিল্পই গড়ে ওঠে। সেখানে আধুনিক উপায়ে রক্ত থেকে ব্লাডমিল তৈরি করা হয়। প্রথমে সংগৃহীত রক্ত জামাট বাঁধানো হয়। অতপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে এ জমাটকৃত রক্ত থেকে ৪০-৪৫% পানি বের করে ফেলা হয়। এরপর এ রক্ত শুকানো হয়। শুকানোর জন্য খোলা পদ্ধতি ছাড়াও ড্রায়ারও (dryer) ব্যবহৃত হয়। এসব ড্রায়ারের মধ্যে রয়েছে ক্যাবিনেট ড্রায়ার, টানেল ড্রায়ার, রোটারি ড্রায়ার প্রভৃতি। ড্রায়ার কারখানার উপযোগিতা ও মালিকের পছন্দ বা সামর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। রোদে শুকানো হলে এগুলো সঙ্গে সঙ্গেই প্যাকেটজাত করা যায়। কিন্তু ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকালে অন্তত ঘন্টাখানেক ঠান্ডা হতে দেয়া উচিত। তাছাড়া এসব ব্লাডমিল আরও মিহি করার জন্য কোন হ্যামার মিল গ্রাইন্ডারের মাধ্যমে মিহি করে প্যাকেটজাত করলে ভাল হয়।

অল্প পরিমাণ রক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ: গ্রামের কসাইখানায়, যেখানে একসঙ্গে একটি, দুটি অথবা অল্প সংখ্যক পশু জবাই করা হয় সেখানে স্থানীয়ভাবে রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা হয়। দু'ভাবে এ রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা যায়। যথা- তাপছাড়া ও তাপসহযোগে। তবে, তাপছাড়া রক্ত প্রক্রিয়াজাত করলে পশুকে খাওয়ানোর পূর্বে তা উত্তাপের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে নেয়া উচিত।

কাঁচা অবস্থায় রক্ত (raw blood) প্রক্রিয়াজাতকরণ: নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে কাঁচা অবস্থায় রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা যায়। যেমন-

১। তাজা রক্ত: তাজা রক্ত যেহেতু সহজেই পচে যায় তাই এগুলো ব্যবহার করতে হলে সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই আনুপাতিক হারে পোল্ট্রি খাদ্যে যোগ করে খাওয়ানো উচিত।

২। শোষণের মাধ্যমে: যে কোন একটি গুঁড়ো খাদ্য, যেমন- কুঁড়ো বা কাসাভার ময়দা দিয়ে রক্ত শোষণ করানো যায়। রক্ত ও ময়দা সমপরিমাণে একত্রে মিশিয়ে তা শুকিয়ে ব্লাডমিল তৈরি করা যায়। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কোনভাবেই পানির পরিমাণ খুব বেশি না থাকে। এ ধরণের প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকৃত রক্তে আমিষের হার বেশি থাকে।

৩। চুন সহযোগে: যেখানে রক্ত শুকানোর যন্ত্র পাওয়া কষ্টকর সেখানকার জন্য চুন প্রয়োগ করে রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ১% কালিচুন (quick lime) ব্যবহারের মাধ্যমে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে কালো রাবারের মাতো তৈরি করা হয়। এভাবে রক্তকে ৭ দিন পর্যন্ত রেখে দেয়া যায়। অতঃপর এ রক্ত শুকানো হয়। তারপর গুঁড়ো করে ব্লাডমিল হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

তাপসহযোগে রক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ: উপরে বর্ণিত তাপছাড়া রক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রধান সমস্যা হলো তাতে জীবাণু দুষণের সম্ভাবনা থাকে। তবে, পশুপাখিকে খাওয়ানোর পূর্বে তা গরম করে জীবাণুমুক্ত করে নিলেই হয়। তবে, তাপ সহযোগে রক্ত প্রক্রিয়াজাত করলে এ সমস্যা থাকে না। এধরণের ব্লাডমিল সংরক্ষণ করা কঠিন। এগুলো তৈরির সঙ্গে সঙ্গে গবাদিপশু বা পোল্ট্রিকে সরবারহ করতে হবে। নিম্নোক্তভাবে এটি করা যায়। যেমন-

- প্রথমে একটি পাত্রে রক্ত জ্বাল দেয়া হয় এবং সবসময় একটি নাড়ানির সাহায্যে এগুলো নাড়তে হয়।
- এরপর উক্ত রক্তে সমপরিমাণ গরম পানি ঢালা হয় এবং পুরো মিশ্রণটি উত্তপ্ত করা হয়। ১.৮-২.৩ কেজি তাজা রক্ত অথবা ৩.৬ কেজি এরূপ মিশ্রণ ০.৪৫ কেজি শুকানো ব্লাডমিলের সমপরিমাণ পুষ্টি ধারণ করে।
- কুঁড়ো বা অন্য ভূষি গুঁড়ো মিশিয়ে এ ব্লাড মিলের ঘনত্ব বাড়ানো যেতে পারে।

সারমর্মঃ রক্ত অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের আমিষের উৎস। কোন একটি পশুদেহের ৭.১-৯.১% রক্ত। ২.৩ কেজি রক্ত থেকে ০.৪৫ কেজি ব্লাডমিল তৈরি করা যায়। ব্লাডমিল ছাড়া শিল্পক্ষেত্রে এবং ব্যাকারিতে রক্ত ব্যবহৃত হয়। রক্ত সংগ্রহে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন তাতে জীবাণুর দুষণ না ঘটে। রক্তের পরিমাণ খুব বেশি হলে তা বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অল্প হলে স্থানীয়ভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা যায়। এর মধ্যে তাপছাড়া বা তাপ সহযোগে রক্ত প্রক্রিয়াজাত করা যায়।

১২.৪ গবাদিপশুর হাড়, খুর ও শিংয়ের ব্যবহার

হাড়ের গঠন ও ব্যবহার

অস্থি দেহের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় জীবন্ত অঙ্গ। পূর্ণ বয়স্ক পশুর কঙ্কাল প্রধানত অস্থি বা হাড় দিয়ে গঠিত। অস্থি হলো খনিজ দ্রব্যে পরিণত সংযোজক কলা (mineralized connective tissue) এবং পশুর বয়স ও দেহের স্থানের উপর ইহার গঠন পরিবর্তনশীল। অস্থির ওজনের এক তৃতীয়াংশ জৈব পদার্থযুক্ত ফাইব্রাস টিস্যু (organic matters) এবং দুই তৃতীয়াংশ অজৈব খনিজ পদার্থ (inorganic mineral salts) দ্বারা গঠিত। বাচ্চা অবস্থায় অস্থিতে জৈব পদার্থ অধিক থাকে ফলে তখন অস্থি ভাঙ্গার পরিবর্তে বেঁকে যায়। অপরদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক অস্থিতে খনিজ পদার্থ অধিক থাকে ফলে অস্থি অধিক ভঙ্গুর হয়। অস্থি প্রধানত ফাইব্রাস টিস্যু ও খনিজ পদার্থ বিশেষ করে ক্যারসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম সমন্বয়ে গঠিত। যদিও অস্থির গঠন (composition) পরিবর্তনশীল তবে গরুর অস্থি ক্যালসিয়াম ফসফেট ৮৬%, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ৫.৮%, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ৩.০% এবং সোডিয়াম কার্বনেট ও সোডিয়াম ফ্লুরাইড ইত্যাদি ৫.২% দিয়ে গঠিত। দেহের সব চেয়ে শক্ত জিনিস হল দাঁত, তারপরই অস্থির স্থান। অস্থি প্রায় লোহার মত শক্ত যা মাংসপেশীর ভারোত্তোলক দন্ড হিসেবে কাজ করে। ঘোড়ার প্রায় ২০০টি, গরুর ২০৮ টি, কুকুরের প্রায় ২৯১ টি এবং মানুষের ৩১৩ টি অস্থি সমন্বয়ে কঙ্কাল গঠিত (Ghosh 1998)।

প্রতিটি অস্থি প্রধানত দু'ধরণের পদার্থ দিয়ে গঠিত। যথা-শক্ত আঁটসাঁট (compact) এবং স্পঞ্জতুল্য (spongy)। তবে অস্থির ধরন অনুয়ায়ী গঠনে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। লম্বা অস্থিল মধ্যে নলের মত একটি গহ্বর থাকে যাকে মিডুলারি বা ম্যারো ক্যাভিটি (marrow cavity) বলা হয় এবং এই ক্যাভিটি অস্থি মজ্জা (bone marrow) দ্বারা পূর্ণ থাকে। অপরদিকে অনিয়মিত ছোট বা স্পঞ্জতুল্য অস্থির মধ্যে এরুপ গহ্বর থাকেনা। এ গহ্বরের পরিবর্তে সুতার জালের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ফাঁকা জায়গা থাকে। এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গা লাল অস্থি মজ্জা (red marrow) দ্বারা পূর্ণ থাকে। কর্টিলেজের অংশ ছাড়া অস্থির বহিরাবরণকে অস্থিআবারক (periosteum) বলা হয়। অস্থি আবারকের দু'টি স্তর থাকে। বাহিরের স্তরটি তন্তুময় (fibrous/collagen) এবং ভিতরের স্তরটি কৌষিক (cellular)। কৌষিক স্তরে থাকে অস্টিওব্রাস্ট কোষ যা অস্থি গঠনে (ossification) সাহায্য করে তাই এই স্তরকে অস্টিওজেনিক স্তর (osteogenic layer) বলা হয়। উল্লেখ্য, অস্থি আবারক সিস্যামেয়েড অস্থিতে থাকেনা। অস্থিআবারক প্রধানত তিনটি কার্যসম্পাদন করে। যেমন- ক) অস্থিকে আবৃত রেখে রক্ষা করে। খ) অস্থিবৃদ্ধি ও মেরামতে (repair) সাহায্য করে এবং গ) অস্থির বাহির অংশে পুষ্টি সরবরাহ করে। ম্যারো ক্যাভিটি ও বিভিন্ন ম্যারো স্পেসে যে সূক্ষ্ম রক্ত নালিকাযুক্ত এরিওলার টিস্যু (areolar tissue) বিশিষ্ট স্তরটি আবৃত রাখে তাকে অন্তস্থিকা (endosteum) বলে। একটি অস্থির সান্ধিক তলে (articular surface) যে কর্টিলেজ দিয়ে আবৃত থাকে তাকে সান্ধিক কর্টিলেজ (articular cartilage) বলা হয়। প্রতিটি অস্থিতে ছিদ্র (Haversian canal) রয়েছে যার মাধ্যমে রক্ত নালী, স্নায়ু, লসিকা নালি ইত্যাদি সরবরাহ হয়ে অস্থির বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও পুর্নগঠনে সহায়তা করে। অস্থি মজ্জায় পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ রয়েছে যা রক্ত কনিকা প্রস্তুত করে।

সাধারণত ড্রেসড অবস্থায় (অর্থাৎ চামড়া, নাড়িভূঁড়ি ইত্যাদি সরানোর পরে) একটি গরুর মোট হাড়ের ওজন পুরো দেহের প্রায় ১৫% হয়ে থাকে। তবে, জাত, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, বয়স ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে এ ওজন ১২-৩০% পর্যন্ত হতে পারে। ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে এ ওজন গড়ে ২০-৩০% হয়ে থাকে। হাড়ে প্রায় ৫০% পানি এবং ১৫% সাদা ও হলুদ মজ্জা (marrow) থাকে। মজ্জায় ৯৬% পর্যন্ত চর্বি থাকতে পারে। চর্বি ছাড়ানো ও শুকানোর পর হাড়ে জৈব পদার্থ ও অজৈব লবণ ১ ঃ ২ অনুপাতে থাকে। জৈব পদার্থের মূল উপাদান অর্থাৎ হাড়ের কোলাজেন (bone collagen) বা ওসসিন (ossein) নামে পরিচিত তা থাকে ৩৩-৩৬%। হাড় সিদ্ধ করলে এ ওসসিন থেকেই জিলেটিন (gelatine) তৈরি হয়। অজৈব পদার্থের মধ্যে ৩২.৬% ক্যালসিয়াম, ১৫.২% ফসফরাস, অল্প পরিমাণে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম এবং অতি অল্প পরিমাণে কপার, কোবাল্ট, জিঙ্ক, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ সালফার ইত্যাদি থাকে। সদ্য জবাইকৃত পশু থেকে সংগৃহীত হাড়কে তাজা হাড় (Green bone) নামে অভিহিত করা হয়। তাজা হাড়ে পানি, আমিষ ও চর্বির

পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে। এ হাড়ের সঙ্গে মাংস ও টেন্ডনও লেগে থাকে। যে হাড়গুলো বহুদিন ধরে মুক্ত পরিবেশে পড়ে থেকে ব্যাকটেরিয়া, কীপটতঙ্গ প্রভৃতির আক্রমণের শিকার হয় ও শুকিয়ে যায় সেগুলোই শুষ্ক হাড়। এগুলোর ওজন অনেক কম হয় এবং শুষ্ক ওসসিনের সঙ্গে শুধু ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও অন্যঅন্য খনিজ দ্রব্য থাকে। এতে কোন মাংস চর্বি, পেরিওস্টিয়াম বা টেন্ডন পাওয়া যায় না।

অতীতে গবাদিপশুর হাড় বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন- ছাঁচ বা ডাইস (dice) বোতাম ও চাকুর বাট তৈরিতে ব্যাপক চাহিদা ছিল হাড়ের। কিন্তু বর্তমানে প্লাষ্টিক শিল্পের সম্প্রসারণের কারণে এক্ষেত্রে হাড়ের ব্যবহার একেবারেই কমে গেছে। তবে বর্তমানে জিলেটিন, আঠা (glue) ও গবাদিপশুর খাদ্য (livestock feed) তৈরিতে ব্যাপকভাবে হাড় ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও এ থেকে ফসফেট খাদ্য (phosphate fertilizer) তৈরি করা যায়। জিলেটিন তৈরি ও আঠা তৈরিতে হাড় জিলেটিন অত্যন্ত মূল্যবান। ভালমানের জিলেটিন ফটোগ্রাফিক ও অন্যান্য টেকনিক্যাল সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। হাড়ের কোলাজেন হচ্ছে জিলেটিন ও আঠার কাঁচামাল। আঠা ও জিলেটিন একই জিনিস। সাধারণত নিম্নমানের জিলেটিনকেই আঠা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জিলেটিন তৈরির জন্য প্রথমে হাড়কে (যেসব হাড়ে মজ্জা রয়েছে) দূর্বল এসিড দ্রবণে ঢোকানো হয়। এতে ওসসিন বাদে হাড়ের অন্যান্য অজৈব পদার্থগুলো গলে যায়। এখান থেকে ওসসিন সংগ্রহ করে পানিতে ফুটিয়ে জিলেটিন বের করা হয়।

জিলেটিন তৈরিতে সব ধরণের হাড়ই ব্যবহার করা যায় না। এজন্য দরকার মজ্জাসম্পন্ন হাড় যেমন- টিবিয়া (Tibia), ফিমার (Femur), মেটাটারসাস (Metatarsus) ও মেটাকারপাস (Metacarpus), রেডিয়াস, আলনা ইত্যাদি। জিলেটিন তৈরির জন্য উৎকৃষ্ট মানের হাড়ের বৈশিষ্ট্য নিম্নরুপ-

- এ হাড় মজ্জা সমৃদ্ধ হবে।
- এ হাড়, চর্বি, টেন্ডন, মাংস, পেশিতন্ত্র, রক্ত ইত্যাদি মুক্ত হবে।
- হাড় ভালভাবে শুকোনো থাকবে।

সাধারণত পাঁচটি ধাপে জিলেটিন তৈরির জন্য হাড় প্রসেস করা হয়। প্রথমে এগুলো ভালভাবে করাত দিয়ে কাটতে হবে। এরপর ৮৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (১৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় পানিসহ নির্দিষ্ট সময় ধরে ফুটাতে হবে। এর পরের ধাপে ধৌতকরণ। অতপর শুকানো এবং সবশেষে চূর্ণকরণ বা ক্রাশিং (crushing)। এই চূর্নিত হাড় যা ১ সেন্টিমিটার এর বেশি বড় হবে না তা থেকেই জিলেটিন তৈরি করা হবে।

গবাদিপশুর খাদ্য তৈরিতে হাড়

গবাদিপশুর হাড় থেকে উৎকৃষ্টমানের পশু খাদ্য তৈরি করা যায়। হাড় থেকে পশুখাদ্যকে বোন মিল (bone meal) বলে। এ বোন মিল দুধরণের। যেমন- কাঁচা বোন মিল (raw bone meal) ও স্টিমড বোন মিল (steamed bone meal)।

র বোন মিল (raw bone meal): শাব্দিক অর্থে যদিও মনে হয় র বোন মিল অর্থ কাঁচা বোন মিল অর্থাৎ যা কাঁচা হাড় থেকে কোন প্রসেসিং ছাড়াই তৈরি হয়েছে। আসলে তা নয়। প্রকৃত পক্ষে কাঁচা বোন মিল হলো কোন স্টিম প্রেসার বা বাষ্পীয় চাপ ছাড়া খোলা ড্রাম বা পাত্রে দীর্ঘক্ষণ সিদ্ধ করার পর যে বোন মিল তৈরি হয় তাই কাঁচা বোন মিল। এ ধরণের বোন মিলে আমিষের হার খুব বেশি থাকে (প্রায় ২৩%)। এ বোন মিল প্রধানত পোল্ট্রির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে গড়ে নিম্নলিখিত হারে খাদ্যোপাদান থাকে। যথা-আমিষ ২৬%, ক্যালসিয়াম ২৩%, ফসফরাস ১১% এবং কিছু পরিমাণ চর্বি।

স্টিমড বোন মিল (steamed bone meal): বর্তমানে বেমির ভাগ বোন মিলই বাষ্প প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। এতে শুষ্ক বা ভোজা বাষ্প চালনা করা হয়। বাষ্প বেশিরভাগ আমিষ ও চর্বি হাড় থেকে সরিয়ে ফেলে। ফলে উৎপাদিত বোন মিলে খাদ্যোপাদান গড়ে নিম্নলিখিত হারে থাকে। যথা- আমিষ ৭%, ক্যালসিয়াম ৩২.৫% ফসফরাস ১৫.১%। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে কোন ধরণের বোন মিলই তৈরি করা হোক না কেন সংগৃহীত হাড় যেন

কোন সংক্রামক রোগে মৃত এমন গরু থেকে নেয়া না হয়। কারণ রোগজীবাণুমুক্ত হাড় এ কাজে ব্যবহার না করলে তা পশু স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকী হয়ে দেখা দেবে। কোন গরু এনথাক্সে মারা গেলে এর হাড়ে এনথ্রাক্স (Anthrax) এর স্পোর থেকে যায়। এই জীবাণু ভালভাবে সিদ্ধ করা ছাড়া ধ্বংস হয় না। এক্ষেত্রে স্টিমড প্রসেসিং করাই উত্তম। তাছাড়া পশুকে বোন মিল খাওয়ানোর পূর্বে দুটো বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। যেমন-

- তৈরি বোন মিল বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত হবে।
- বোন মিল পাউডারের মতো গুড়ো হবে।

বোন অ্যাশ: বোন মিল তৈরি করার মতো ব্যবস্থা না থাকলে হাড়কে পুড়িয়ে ছাইয়ে রুপান্তরিত করা যায়। এ ছাই ফসফরাসের ভাল উৎস। এতে ১৫.৩-১৬.৬% পর্যন্ত ফসফরাস থাকতে পারে।

শিং ও খুরের ব্যবহার

ডিজিট (digit) এর প্রান্তের শক্ত ও হর্নি আবরণকে খুর বলা হয়। রোমন্থক পশুর প্রতি পায়ের প্রান্তে দু'টি প্রধান এবং দু'টি অতিরিক্ত (accessory) খুর থাকে। মূল খুরে তিনটি (perople wall & sole) অংশ থাকে। রোমান্থক পশুর খুর বিভক্ত হলেও ঘোড়ার খুর বিভক্ত নয়। রোমন্থক পশুর শিং থাকে কিন্তু ঘোড়ার শিং থাকেনা। গবাদিপশুর হাড়, খুর ও শিং অত্যন্ত মূল্যবান উপজাত। এসব উপজাত থেকে জিলাটিন, আঠা বোতাম, চাকুর বাট, বোন মিল ইত্যাদি তৈরি হয়। তবে, বর্তমানে প্লাস্টিকের ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়ার কারণে বোতাম, চাকুর বাট বা এ জাতীয় জিনিস হাড়, খুর ও শিং থেকে খুব একট তৈরি হয় না। তবে, প্লাস্টিকের তুলনায় এগুলো অনেক মজবুত ও টেকসই হয়। বোতাম বা চাকুর বাটের জন্য গবাদিপশুর এসব উপজাতের চাহিদা কমলেও জিলাটিন, আঠা ও বোন মিল তৈরিতে এগুলো এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাড়ের মতো শিং ও খুরের মূল্যমানও কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি। এখানে এগুলোর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

শিং: গবাদিপশুর শিং বিভিন্ন আকার-আকৃতি ও বর্ণের হতে পারে। শিংয়ের দুটো অংশ থাকে। যেমন-উপরের আবরণ (horn proper) ও ভিতরের মজ্জাপূর্ণ অংশ বা হর্ণ পিথ (horn pith)। শিংয়ের শক্ত উপরের অংশ থেকে বোতাম, চিরুনি, হ্যান্ডল বা বাট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। তাছাড়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিংয়ের এ অংশ গুলো থেকে পাউডার বানানো হয় যা প্লাস্টিক সামগ্রীর কাঁচামালের মতো ব্যবহৃত হতে পারে। শিংয়ের মান যতো ভাল হবে তৈরি সামগ্রীর মানও তাত ভাল হবে। হর্ণ পিথ থেকে মূল্যবান জিলেটিন তৈরি হয়। তাই এ হর্ণ পিথ শিংয়ের শক্ত আবরণ থেকে অতি সাবধানে খুলতে হবে যাতে নষ্ট না হয়। শিংকে কয়েক মিনিট ধরে বাষ্পয়িত করলেই হর্ণ পিথ আলগা হয়ে বের হয়ে আসে।

খুর: শিংয়ের মতো খুর থেকেও বোতাম, চিরুনি, বাট ইত্যাদি তৈরি করা যায়। গবাদিপশুর পা থেকে সাবধানতার সঙ্গে খুর খুলতে হবে। শিং খোলার পদ্ধতির মতোই খুর খোলা যায়। খুর ভাল করে ধৌত করে শুকোতে হবে। তবে, সরাসরি তাপ বা সূর্যালোকে এগুলো শুকানো যাবে না। সাধারণত খুরের রঙ ও ওজনের ওপর এগুলোর দাম নির্ভর করে। যেমন-সাদা রঙের খুর সবচেয়ে দামী, এরপর ডোরাকাটাগুলো এবং বানেটগুলো মোটেও দামী নয়।

শিং ও খুর মিল: বোন মিলের শিং ও খুর থেকে গবাদিপশুর খাদ্য তৈরি করা যায়। এ গুলোকে শিং ও খুর মিল বলে। এগুলো নাইট্রোজেনের উৎকৃষ্ট উৎস। সাধরণ বোন মিলের চেয়ে এগুলো ৫০% বেশি মূল্যবান। তৈরির পদ্ধতি একই। তবে, গবাদিপশুকে শিং ও খুর একত্রে না খাওয়ানোই ভাল। কারণ এগুলো মোটেও সুস্বাদু ও সুপাচ্য নয়। কারণ এতে রয়েছে কেরাটিন (keratin) যা অরুচিকর ও সুপাচ্য নয়।

সারমর্মঃ জিলেটিন, আঠা, বোতাম, চাকুর বাট, হাড়, খুর ও শিং প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে, প্লাষ্টিকের প্রচলন হওয়ায় বর্তমানে এ জাতীয় জিনিস হাড়, খুর ও শিং থেকে খুব একটা তৈরি হয় না। বর্তমানে হাড়, খুর ও শিং গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১২.৫ উল, পশম ও পালকের ব্যবহার

সাধারণত ভেড়ার পশমই উল নামে পরিচিত। যদিও সব ভেড়ার পশমকেই উল বলে গণ্য করা যায় না। আবার কোন কোন ছাগল থেকে উন্নত মানের উল পাওয়া যায়। উল (wool) ও চুলের (hair) গাঠনিক উপাদান একই রকম। কিন্তু, উল বেশি স্থিতিস্থাপক (elastic) নমনীয় (flexible) ও কোঁকড়ানো (curly)। প্রকৃত উল অর্থাৎ সঠিকভাবে বললে যাকে উল ফাইবার (wool fibre) বলা হয় তা দুটো ভিন্ন ধরণের স্তর নিয়ে গঠিত। উল ফাইবারের বাইরের দিকে একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ থাকে যা কতকগুলো চ্যাপ্টা, অনিয়মিত আকারের আঁইশ (wool fibre) দিয়ে গঠিত। এ আঁইশগুলো মাছ বা সাপের আঁইশের মতোই যদিও এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। চুল বা লোমের ক্ষেত্রে এ আঁইশগুলো দ্বিতীয় স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। এ কারণেই উল দিয়ে সহজেই কাপড় বোনা যায়। সহজে পিছলে যায় না এবং একসঙ্গে লেগে থাকে। উল ফাইবারের অগ্রভাগ সবসময় সূচালো থাকে। আঁইশগুলোর ওপর আংশিকভাবে উলের মান নির্ভর করে। উলকে ভেড়ার গায়ে ভাল অবস্থায় রাখার জন্য উলের আঁইশগুলোকে সবসময় পিচ্ছিল রাখতে হয়। আর তা এক বিশেষ ধরণের গ্রন্থি নিঃসৃত চর্বি জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে রক্ষা হয়। এ চর্বি জাতীয় পদার্থকে উল ঘাম (wool sweat), উল সাবান (wool soap), কুসুম (yolk) বা সুইন্ট (suint) বলে। তবে, অতিরিক্ত পরিমাণে এ পদার্থ ক্ষরিত হলে উল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আঁইশযুক্ত বাইরের আবরণের আসল কাজ হলো উল ফাইবারের ভিতরের স্ট্রাকচার বা কর্টেক্স (cortex) রক্ষা করা। কর্টেক্স লম্বা কতকগুলো ফাইব্রিল (fibril) সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো একসঙ্গে লাগানো থাকে।

উলে দুটো স্তর থাকলেও চুল বা পশমে তৃতীয় একটি স্তর থাকে যা মেডুলা (medulla) নামে পরিচিত। মেডুলা এক ধরণের স্পঞ্জের মতো মজ্জা নিয়ে গঠিত যেখানে বায়ুপূর্ণ কোষ থাকে। মেডুলার পরিমাণ যত বাড়বে ততই পশমের মান কমবে ও আঁশ রক্ষা হবে। সাধারণ চুল বা পশমে মেডুলা বড় হয়, আর কার্পেট উল বা নিম্নমানের উলেও মেডুলা থাকে। কিন্তু সত্যিকারের উলে কোন মেডুলা থাকে না।

উলের ধরণ

উল বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। বিভিন্নভাবে এর শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উলকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- পোষাক তৈরির উল (apparel wool) ও কার্পেট উল (carpet wool)। প্রাথমিকভাবে উলের ব্যাস ও দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে উলকে এভাবে ভাগ করা হয়। উলেন ও মিহি পশমী পোষাক তৈরির জন্য যে উল ফাইবার ব্যবহার করা হয় তার ব্যাস অত্যন্ত সরু। অন্যদিকে, কার্পেট উল ফাইবার, সাধারণত স্থূল ও লম্বা। সূক্ষ্ম উল ২.৫৪ সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) পর্যন্ত ছোট হতে পারে। পক্ষান্তরে স্থূল উল ২৫.৪ সেন্টিমিটার (১০ ইঞ্চি) পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সাধারণভাবে ব্যাস, দৈর্ঘ্য ও ভাঁজ (wariness or crimp) হলো উলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সূক্ষ্ম উলের প্রতি ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে একটি ভাঁজও নাও থাকতে পারে। এছাড়াও নিম্নলিখিতভাবে উলের শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। যেমন- (১০ উল, (২) মোহেয়ার ও (৩) পশমিনা।

উল: ভেড়ার পশমকে উল বলে। যথা- পোষাক তৈরির উল ও কার্পেট উল।

মোহেয়ার: অ্যাংগলা জাতের ছাগল থেকে প্রাপ্ত সাদা, নরম, উজ্জ্বল ও উন্নত গুণাবলীর সুতোর মতো পশমই মোহেয়ার নামে পরিচিত। এগুলো ১০-২৫ সেন্টিমিটার (৪-১০ ইঞ্চি) লম্বা হয়। দামি চাদর ও কম্বল তৈরিতে মোহেয়ার ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ছাগল থেকে বছরে ২.৫-৪.৫ কেজি মোহেয়ার পাওয়া যায়।

পশমিনা: কাশ্মিরি ছাগলের পশমকে কাশমেয়ার বা পশমিনা বলা হয়। পশমিনা মোটা ও রঙিন হতে পারে। এগুলো দেখতে উলের মতোই। এগুলোর দৈর্ঘ্য গড়ে ২.৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। প্রতিটি ছাগল থেকে বছরে গড়ে ১০০-১২০ গ্রাম পশমিনা উৎপন্ন হয়। উৎপাদন কম বলে দাম অনেক বেশি। পশমিনা মিহিত্বের জন্য বিখ্যাত।

উল প্রক্রিয়াজাতকরণ

ভেড়া থেকে যে উল পাওয়া যায় তাকে কাঁচা উল বা পিচ্ছিল উল (raw wool or grease wool) বলে। এ কাঁচা উল থেকে পিচ্ছিল পদার্থ সরিয়ে প্রকৃত উল বের করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রথমেই উল বাছাই করা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বাছাই করা উল একত্রে মিশানো হয়। এরপরের পদক্ষেপকে বলে পরিষ্কারকরণ বা স্কাউরিং (scowring)। স্কাউরিংয়ের মাধ্যমে উপরের গ্রিজ বা পিচ্ছিল পদার্থ ও ময়লা পরিষ্কার করা হয়। এরপর এগুলো আচঁড়িয়ে (carded) আলাদা করা হয় এবং আবার একত্রে মিশিয়ে আরেকবার ময়লা পরিষ্কার করা হয়। আচঁড়ানো বা পেজাঁনো উল থেকে উলের মতো (woolen yarn) ও পশমী সুতো (worsted yarn) তৈরি করা হয়। উলেন সুতো থেকে ফ্লানেল কাপড়, টুইড (tweed) কম্বল ইত্যাদি তৈরি হয়। অন্যদিকে, পশমী সুতো যা কিছুটা শক্ত এবং মসৃণ তা থেকে সুটিংয়ের বস্ত্র তৈরি হয়। পশমী সুতো সরাসরি আঁচড়ানো যন্ত্র থেকে আসে না। বরং এটি তৈরিতে বেশ কয়েকটি ধাপ পার হতে হয়। এ সময়ে ছোট ছোট ফাইবারগুলো সরিয়ে লম্বা ফাইবারগুলো বাছাই করা হয়।

পশমের ব্যবহার

গবাদিপশুর পশম বা লোম (hair) সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে একদিকে যেমন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। অন্যদিকে তেমনি আয়ের উৎসে পরিণত হয়। প্রধানত গরুর লেজ, কান ও দেহের পশম ব্যবহার করা হয়। গরুর লম্বা পশম থেকে কার্পেট ও শেভিং ব্রাশ তৈরি করা হয়। আর ছোট পশম দিয়ে তৈরি হয় এক ধরণের পশমি বস্ত্র বা ফেল্ট (felt) যা টুপি বা এজাতীয় বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দেহের চুল সাধারণত ট্যানারি থেকে সংগ্রহ করা হয়। আর নাক ও কানের চুল সহজেই কসাইখানা থেকেই সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহের পর এগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয় যাতে এতে কোন ময়লা না থাকে। প্রথমে ঠান্ডা পানিতে পশমগুলো কয়েকবার ধুতে হয়। অতপর সোডা বা যে কোন ডিটারজেন্ট দিয়ে গরম পানিতে ধোয়া হয়। পরবর্তীতে ঠান্ডা পানিতে আলতোভাবে ধোয়া হয়। এরপর এগুলো শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়।

পশম থেকে সার: প্রায় ১৮ কেজি চাপে ১২ ঘন্টা সিদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে শুকিয়ে গবাদিপশুর পশম থেকে এ ধরণের সার তৈরি করা যায়। যাতে ৭০% এমোনিয়া থাকে। অনেক সময় পশমের সঙ্গে রক্ত, পালক ও অন্যান্য খাদ্য অনুপযোগী নাড়িভুঁড়ি একত্রে সিদ্ধ করেও সার বানানো হয়। সব ধরণের পশম বা চুলই কম্পোস্ট তৈরির ভাল উপাদান।

পালকের ব্যবহার

পোল্ট্রির পালকের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে বালিশ বা এ জাতীয় জিনিস অর্থাৎ স্টাফিং বেডিং (stuffing bedding) তৈরিতে। এছাড়াও ফিদার মিল তৈরি করা যায়। তাছাড়া এ থেকে উন্নতমানের সারও তৈরি হয়। শুধু দেহের ছোট পালকগুলোই (body feather) বেডিং শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো থেকে ভাল আয় করা যায়। পালক সংগ্রহের সময় চারটি কথা মনে রাখতে হবে। যেমন-

- প্রত্যেক প্রজাতির পাখি বা পোল্ট্রির পালক আলাদাভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- কুইল ও লেজের পালক দেহের পালকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা যাবে না।
- রঙিন পালক সাদাগুলোর সঙ্গে মিশানো যাবে না।
- সব পালক সঠিকভাবে পরিষ্কার, শুকনো, ময়লা ও দুর্গন্ধমুক্ত করতে হবে।

ফিদার মিল: পালকের উচ্চ চাপে পানি বিভাজন করলে তা পরিপাকযোগে পদার্থে পরিণত হয় যা পোল্ট্রি ফিড হিসেবে উৎকৃষ্ট। এ ফিদার মিল পোল্ট্রির আমিষের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। পোল্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় আমিষের এক চতুর্থাংশ এ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়।

সার তৈরিতে পালক: ডানা ও লেজের কুইল পালক যেগুলো বেডিং শিল্পে ব্যবহৃত হয় তা থেকে উন্নতমানের সার তৈরি করা যায়। এ সারে প্রায় ১৪.৯% এর মতো নাইট্রোজেন হয়। অর্থাৎ প্রায় ৯৩% অশোধিত আমিষ যা ব্লাডমিল থেকেও বেশি। কুইল ও অন্যান্য বাজে পালক কম্পোস্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

সারমর্মঃ উল, পশম ও পালকের ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে অনেক দিন থেকেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে এগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার ইদানিংকালে শুরু হয়েছে। উল, পশম ও পালকের যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করা যাবে।

১২.৬ নড়িভুঁড়ির ব্যবহার

কসাইখানার উচ্ছিস্টাংশ অর্থাৎ নাভিভুঁড়ি বা ওফালকে (offal) প্রধানত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন- ভক্ষণ উপযোগী (edible) ও ভক্ষণ অনুপযোগী (inedible)। তবে, দেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথা, মানুষের খাদ্যাভাস, ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে কোনটি ভক্ষণ উপযোগী কোনটি ভক্ষণ অনুপযোগী। কাজেই কারোও কাছে বা কোন জায়গায় হয়তো একটি ওফাল ভক্ষণ উপযোগী। কিন্তু আরেকজনের কাছে বা অন্য জায়গায় তা ভক্ষণ অনুপেযোগী। উন্নত দেশে ভক্ষণ অনুপেযোগী নাড়িভুঁড়ি বা ওফাল বলতে যেখানে রক্ত, পা, মাথা, ফুসফুস, বায়ুনালি, প্লীহা, অন্ত্র, যৌনাঙ্গ, বাটযুক্ত স্তন (udder), গর্ভস্থ অপরিণত বাচ্চা (featus) এবং কখনো পুরো পাকস্থলী। কিন্তু অনুন্নত দেশে এগুলোর বেশিরভাই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাড়িভুঁড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ

উন্নত দেশে যেখানে এসব নাড়িভুড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ (processing) করার জন্য উন্নতমানের বড় বড় কারখানা রয়েছে সেখানে তারা শুধু ব্লাড মিল, মিট মিল, বোন মিল বা লিভার মিল এগুলোর যে কোন একটি তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকে। আর ছোট কারখানাগুলো রক্ত, হাঁড় ও উচ্ছিস্ট মাংস একত্রে মিশিয়ে এক ধরণের মিল তৈরি করে যা কারকাস মিল (careass meal processing) নামে অভিহিত। বাতিলকৃত পশুদেহ বা মৃত পশুদেহ, মৃত পশুদেহের অংশ বিশেষ এবং বাতিলকৃত অঙ্গ অনেক সময় ভক্ষণ অনুপযোগী ওফালের সঙ্গে একত্রে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অনুন্নত দেশের ছোট কসাইখানাগুলোতে প্রকৃতপক্ষে ভক্ষণ অনুপযোগী নাড়িভুঁড়ি খুব একট পাওয়া যায় না। নাড়িভুঁড়ি বা ওফাল ব্যবহার বা প্রক্রিয়াজাত করার বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন-

- এতে আর্থিক সুবিধা হয়।
- কসাইখানা ও আশেপাশের পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত থাকে।
- এগুলো গবাদিপশুর খাদ্যের উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে কাজ করে।

নাড়িভুঁড়ির ব্যবহার

প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশে নাড়িভুঁড়ির সংজ্ঞা যে কোন উন্নত দেশের থেকে ভিন্নতর। এদেশে গবাদিপশুর, মাথা, কলিজা, প্লীহা, বৃক্ক ফুসফুস প্রভৃতি মাংসের মতোই মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। তাছাড়া অন্ত্রের (intestine) এক বিরাট অংশ অনেকেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। তবে বাকি অংশগুলো সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গায় অনিয়ন্ত্রিত ভাবে পশু জবাই হওয়ায় এসব ভক্ষণ অনুপযোগী নাড়িভুঁড়ি যত্রতত্র ফেলা হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি অর্থের অপচয় হয়। অথচ এগুলো সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করতে পারলে এ থেকে ভাল অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। পাশাপাশি গবাদিপশুর খাদ্য ঘাটতিও কিছুটা পূরণ হয়। নিম্নে এসব ওফালের কিছু ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- এগুলো কারকাস মিল হিসাবে পশু খাদ্যের উৎস খাদ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

- লিভার মিল তৈরি করা যেতে পারে যা অত্যন্ত মূল্যবান এবং ভিটামিন বি$_2$ বা রাইবোফ্লাভিন এবং অমিষের উৎকৃষ্ট উৎস।
- অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন- ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, মলাশয় এবং খাদ্যনালি, শ্বাসনালি, কণ্ঠনালি, মূত্রাশয়, পাকস্থলী প্রভৃতি যা ক্যাসিংস (casings) নামে পরিচিত তা থেকে বিভিন্ন ধরণের সসেজ (sausage- পাতলা নলাকার লেচির ক্যাসিংয়ের মধ্যে মাংসের পুর দেয়া খাদ্য বিশেষ) তৈরি হয়। এগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার।
- গবাদিপশুর পাকস্থলীর অপরিপাককৃত বা অর্ধপরিপাককৃত খাদ্য যেগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী তা থেকে উন্নতমানের কম্পোস্ট সার বানানো হয়। তাছাড়া শুকানোর পর এগুলো পোল্ট্রি এবং বাছুরের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

লিভার মিল (liver meal)ঃ জবাইকৃত পশুর কলিজা সংগ্রহ করে তা শুকিয়ে চূর্ণ করে লিভার মিল তৈরি করা হয়। যেহেতু কলিজা এদেশের মানুষের প্রিয় খাবার। তাই একাজে ভক্ষণ অনুপযোগী বাতিল কলিজা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ মিলের প্রতি ০.৪৫ কেজিতে অন্তত ২৭ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন থাকে। তাছাড়া এটি আমিষেরও উৎকৃষ্ট উৎস।

কারকাস মিল (carcass meal)ঃ সাধারণত মৃত পশু দেহ বা মৃতপশু দেহের অংশ বিশেষ এবং বাতিলকৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও নাড়িভুঁড়ি একত্রে প্রক্রিয়াজাত করে কারকাস মিল তৈরি করা হয়। এগুলো গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কারকাস মিলে সাধারণত আমিষ ৫৫% এর নিচে এবং ফসফরাস ৪.৫% এর উপরে থাকে।

খাওয়ার উপযোগী গরুর নাড়িভুঁড়ি আমাদের দেশে ফুসফুস, বৃক্ক, পাকস্থলীর অংশ বিশেষ, মস্তিষ্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভক্ষণ উপযোগী ওফাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারণি-১২.১ এ এগুলোর মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের হার দেখানো হয়েছে।

সারণি-১২.১ ঃ গরুর খাদ্যেপযোগী ওফালের গড় পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান	ফুসফুস (%)	বৃক্ক (%)	পাকস্থলীর অংশ বিশেষ (%)	মস্তিক (%)
পানি	৭৯.৭	৭৭.৪	৭৯.৫	৮০.৬
চর্বি	৩.২	৪.৮	১০.০	৯.৩
আমিষ	১৬.৪	১৬.৬	১০.০	৮.৮
ছাই বা খনিজ	১.৬	১.২	০.৫	১.১

উৎস্য ঃ Mann. I. (1962) Animal By-producs : Processing and Utilization, FAO, Italy.P.10.

ক্যাসিংস

ক্যাসিংস অর্থ হলো নলাকার খাদ্য ধারক। স্মরণাতীতকাল থেকেই গবাদিপশুর খাদ্যতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ক্যাসিংস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ পদ্ধতিতে অন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে মাপমতো কেটে পরিষ্কার করে তা উল্টিয়ে দেয়া হয় এবং মধ্যে সাধারণত মাংসের পুর দিয়ে সসেজ তৈরি করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলোর বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের সসেজ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, ককটেইল সসেজ (cocktail sauage) তৈরিতে অন্ত্রের সরু অংশ ব্যবহার করা হয় যার ওজন ১/২ আউন্সের বেশি হয় না। আবার মরটাডেলা (mortadella) তৈরি করতে প্রায় ৯ কেজি ওজনের সিকামের (cecum) দরকার হয়। আবার ভেড়ার চতুর্থ পাকস্থলী দিয়ে তৈরি করা হয় হ্যাগিস (haggis)। উন্নত দেশে ক্যাসিংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সসেজ তৈরির জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে, অনুন্নত দেশে এগুলো বলতে গেলে হাতেই তৈরি করা হয়।

রুমেন মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্য (ruminal Contents)

জবাইকৃত গবাদিপশুর পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ বা রুমেন মধ্যস্থ অপরিপাককৃত খাদ্যদ্রব্যকে রুমিনাল কনটেন্ট বলা হয়। এগুলো পরিবেশ দূষণে অত্যন্ত ভাল রাখতে পারে। তবে, এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে একদিকে যেমন-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে অন্যদিকে তেমনি কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়। ভূষির পরিবর্তে পোল্ট্রি রেশনে এ খাদ্যে ১০% হারে যোগ করা যায়। তাছাড়া অল্প তাপে শুকিয়ে এগুলো ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে বাছুরে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এগুলো উপকারী অণুজীবের উৎস হয়ে বাছুরের স্বাভাবিক রুমিনাল ফ্লোরা বা রুমেনের অণুজীবের (ruminal flora) ঘাটতি পূরণ করে। এছাড়াও এগুলো দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। সারণি-১২.২ এ রুমিনাল কনটেন্টে উপস্থিত পুষ্টির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-১২.২ রুমেন মধ্যস্থ অপরিপাককৃত খাদ্যে উপস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের হার

পুষ্টি উপাদান	শতকরা হার (%)
পানি	৯.৫
ছাই	৮.৪
অশোধিত আমিষ	১৩.৯
আঁশ	২৭.৫
শর্করা	৩৬.৫

সূত্র ঃ Mann, I. (1962), Animal By-products : Processing and Utilization, FAO, Italy, P. 219.

সারমর্মঃ কসাইখানার উচ্ছিস্টাংশ অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ি বা ওফালকে (offal) প্রধানত দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন-ভক্ষণ উপযোগী (edible) ও ভক্ষণ অনুপযোগী (inedible)। তবে, দেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রথা, মানুষের খাদ্যাভাস, ব্যক্তিগত অভিরুচি প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে কোনটি ভক্ষণ উপযোগী কোনটি ভক্ষণ অনুপযোগী। কাজেই কারোও কাছে বা কোন জায়গায় হয়তো একটি ওফাল ভক্ষণ উপযোগী। কিন্তু আরেকজনের কাছে বা অন্য জায়গায় তা ভক্ষণ অনুপযোগী।

১২.৭ বিভিন্ন গ্রন্থির ব্যবহার

গবাদিপশুর দেহমধ্যস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড (gland) অত্যন্ত মূল্যবান পশু উপজাত। কারণ, এগুলো থেকে অত্যন্ত দরকারী ওষুধ, হরমোন, এনজাইম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাই এগুলোর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। কিন্তু এ ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থির প্রাপ্যতা, চাহিদা, উপযোগিতা, কারিগরি দক্ষতা, যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা, শিল্প গড়ে ওঠা, সঠিক বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর। তাছাড়াও এক সময় গ্রন্থির খুব চাহিদা থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত বহু ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়। বিধায় এসবের চাহিদা কমে গেছে। তথাপি কিছু কিছু গ্রন্থির চাহিদা এখনও ব্যাপক।

গ্রন্থি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গ্রন্থির সঠিক সংগ্রহের ওপর এর থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের মান নির্ভর করে। সাধারণত বড় বড় কসাইখানা ছাড়া গ্রন্থির পর্যাপ্ত সরবরাহ পাওয়া যায় না। গ্রন্থি সংগ্রহ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এগুলো সুস্থ ও দেখতে স্বাভাবিক হয় এবং এগুলো যেন সুস্থ সবল পশু থেকে সংগ্রহ করা হয়। গ্রন্থি কখনোই পানির সংস্পর্শে আনা যাবে না। তাছাড়া এগুলো অনেকক্ষণ ধরে খোলা বাতাসেও রাখা যাবে না। এতে এদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থি অবশ্যই কারিগরিভাবে দক্ষ লোক দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। গ্রন্থির সংগ্রহের পর তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গ্রন্থি সংরক্ষণের জন্য তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- ১. ফ্রিজিং, ২. রাসায়নিক মাধ্যম ও ৩. ভ্যাকুয়াম গ্রন্থি।

১. ফ্রিজিং: সব ধরণের গ্রন্থির জন্যই ফ্রিজিং একটি অত্যন্ত ভাল সংরক্ষণ পদ্ধতি। এজন্য একটি সাধারণ আকৃতির ফ্রিজারই (freezer) যথেষ্ট। ফ্রিজার বা রেফ্রিজারেটরের আকৃতি যাই হোক না কেন তা সঠিকভাবে কাজ করলেই হলো। গ্রন্থি সংগ্রহের এক ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই এগুলো ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে ফ্রোজেন (frozen) অবস্থায় সরবরাহ করতে হবে।

২. রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে: কোন কোন গ্রন্থি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১ কেজি এসিটোনে (acetone) ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। ২৪ ঘন্টা পর উক্ত গ্রন্থি ঐ এসিটোন থেকে তুলে নতুন এসিটোনে ডুবাতে হবে। ব্যবহৃত এসিটোন বিশুদ্ধ করার পর আবার ব্যবহার করা যাবে। তবে, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রন্থি সংরক্ষণ করতে তা অবশ্যই ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পূর্বে আলোচনা করতে হবে। কারণ, তারা কিভাবে ও কোন দ্রব্য ব্যবহারে গ্রন্থি সংরক্ষণ করতে চায় এটা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় ১% ফেনল (phenol) বা ২% ফরমালিন (formalin) এ কাজে ব্যবহার করা হয়।

৩. ভ্যাকুয়াম ড্রাইং (vacuum-drying): বায়ুশূন্য অবস্থায় শুকানোর মাধ্যমেও কোন কোন গ্রন্থি সংরক্ষণ করা হয়। এতে এমন তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয় যাতে গ্রন্থিগুলোর একটিভ প্রিন্সিপাল নষ্ট না হয়। তবে, মনে রাখতে হবে এভাবে সংরক্ষণেও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে দ্রুত এগুলো পৌঁছাতে হবে। তাছাড়া প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহকৃত যন্ত্রের মাধ্যমে বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভ্যাকুয়াম ড্রাইং পদ্ধতিতে গ্রন্থি সংরক্ষণ করতে হবে। একটি কথা মনে রাখা উচিত, গ্রন্থি সংগ্রহ করা ঝামেলাপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এদের সংরক্ষণ জটিল এবং সে তুলনায় আয় কম। তারপরও স্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন কোন গ্রন্থি সরবরাহ করতে হয়। কারণ, এসব গ্রন্থি থেকে মুল্যবান ওষুধ তৈরি হয় যা বিদেশ থেকে আনতে হলে অনেক সময়ই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সারণি-১২.৩ এ গ্রন্থির ধরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-১২.৩ঃ গবাদিপশুর গ্রন্থির ধরণ এবং উৎপাদিত দ্রব্য নাম।

গ্রন্থির ধরণ	উৎপাদিত দ্রব্য		গ্রন্থির ধরণ	উৎপাদিত দ্রব্য
অগ্নাশয়	ইনসুলি (প্রধান) গুকাপন		পিটুইটারি	এলএইচ (LH) ও এফএসএইচ (FSH)
ডিম্বাময়	ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন		অ্যাড্রেনাল	অ্যাড্রেনালিন ও ননঅ্যাড্রনালিন
থাইরয়েড	থাইরক্সিন		ঘণীভূত ও তরল পিত্ত	পিত্ত লবণ
প্যারাথাইরয়েড	প্যারাথইরমোন		শুক্রাশয়	টেসটোসটেরণ

বিভিন্ন গ্রন্থির ব্যবহার

গ্রন্থির বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। এগুলো থেকে প্রধানত মূল্যবান ওষুধ তৈরি করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য কাজেও লাগে। নিম্নে বিভিন্ন গ্রন্থির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

- গবাদিপশুর অগ্নাশয় (pancreas) অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থি। এ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় যা ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এছাড়াও অগ্নাশয় থেকে এনজাইম তৈরি হয় যা শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষত চামড়া ক্লিনিং ও ট্যানিংয়ের কাজে লাগে।
- থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন তৈরি হয়।
- প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে প্যারাথহরমোন তৈরি হয়।
- অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে প্রধানত অ্যাড্রোনালিন হরমোন তৈরি হয়।
- ডিম্বাশয় থেকে প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরি হয়। এ গ্রন্থি অবশ্যই বয়স্ক গাভী থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- শুক্রাশয় থেকে টেসটোসটেরন নামক স্টেরয়েড হরমোন তৈরি হয়।

- পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে লিউটিনাইজিং হরমোন (এলএইচ) ও ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন (এফএসএইচ) তৈরি হয়।
- গরুর পিত্ত মানুষের পিত্ত সমস্যা চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ডিটারজেন্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
- বাছুরের পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ থেকে উৎপাদিত হয় রেরিন যা চিজ বা পনির শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

সারমর্ম ঃ গবাদিপশুর দেহমধ্যস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড (gland) অত্যন্ত মূল্যবান পশু উপজাত। কারণ, এগুলো থেকে অত্যন্ত দরকারী ওষুধ, হরমোন, এনজাইম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাই এগুলোর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। কিন্তু , এ ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থির প্রাপ্যতা, চাহিদা, উপযোগিতা, কারিগরি দক্ষতা, যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা, শিল্প গড়ে ওঠা, সঠিক বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর।

১২.৮ মৃত পোল্ট্রি ও বিভিন্ন বর্জ্যের ব্যবহার

পোল্ট্রি শিল্প থেকে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু পোল্ট্রি খামার উপজাত, যেমন- মৃত পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি বর্জ্য (লিটার, পোল্ট্রির মলমূত্র, বিছানা ইত্যাদি) যেগুলো সাধারণত ফেলে দেয়া হয় সেগুলোও নানাভাবে কাজে লাগানো যায়। এগুলো যত্রতত্র ফেললে একদিকে যেমন পরিবেশ দুষিত হয় অন্যদিকে বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে। তাই এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোল্ট্রি খামারে উন্নত আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি দেশকে আরও অনেক কিছু দিতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে মৃত পোল্ট্রি বর্জ্য আজকের দিনে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব দেশে পুনরুৎপাদন শিল্প (rendering industry) আছে সেখানে মৃত পোল্ট্রি (হাঁস-মুরগি ইত্যাদি) ও পোল্ট্রি বর্জ্য নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যেসব দেশে পুনরুৎপাদন শিল্প নেই সেখানে মৃত পোল্ট্রি বা পাখি ও পোল্ট্রি বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহার একটি বড় সমস্যা। তথাপি আমাদের মতো উন্নয়শীল দেশে মৃত পোল্ট্রি বা পাখি ও পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবহারের অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে রয়েছে। মৃত হাঁস-মুরগি, পোল্ট্রি বর্জ্য ও হ্যাচারি বর্জ্য (যেমন- খোসায় মৃত ছানা, পঁচা বা না-ফোটা ডিম, ফোটানো ডিমের খোসা ইত্যাদি) সাধারণত পোল্ট্রি খাদ্য তৈরিতে জমিতে সার ও কম্পোস্ট হিসেবে, মাছের খাদ্য হিসেবে এবং বায়োগ্যাস তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

পোল্ট্রি খাদ্য তৈরিতে

যেখানে পুনরুৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে মৃত পাখি এবং হ্যাচারি বর্জ্য থেকে হাঁস-মুরগির খাদ্য উৎপাদন করা হয়। হাঁস-মুরগির রেশন তৈরিতে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৃত পোল্ট্রি বা পাখি থেকে সংগৃহীত চর্বিও খাদ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। মৃত পাখির নাড়িভূড়ি, মাংস ও অন্যান্য উপজাতে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পরিমাণ সারণি-১২.৪ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উভয় উপজাতই (বাইপ্রডাক্ট মিল ও অফার মিল) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলো আমিষ ও শক্তির উৎকৃষ্ট উৎস।

সারণি-১২.৪ ঃ মৃত পোল্ট্রি বা পাখির নাড়িভূড়ি, মাংস ও অন্যান্য উপজাত খাদ্য উপাদানের পরিমাণ

খাদ্য	বাই প্রডাক্ট মিলে (%)	অফাল মিলে (%)
আমিষ	৬৫	৬০
তৈল ও চর্বি	১২.৮	১৯
আঁশ	২.৩	১.৮
ক্যালসিয়াম	৩.৩	২.৩
উসফরাস	১.৭৫	১.২
বিপাকীয় শক্তি (ক্যালরি/কেজি)	৩০০৩	৩৩২৬

সার হিসেবে

পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবহারের একটি ভাল পথ হলো একে সারে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা। এ সার তৈরির জন্য পোল্ট্রি লিটার, মৃত পাখি এবং হ্যাচারি বর্জ্য একসঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে এ নিয়ে যথেষ্ট কাজ হয়েছে ; অপ্রক্রিয়াজাত পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে সার তৈরির এ পদ্ধতিটি 'ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি' নামে সুপরিচিত।

কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত

পচন কাজ চালানোর জন্য জীবাণুর যে পরিমাণ ফসফেট দরকার পোল্ট্রিজাত সার তা সহজেই সরবরাহ করতে পারে। সার তৈরি করার জন্য এগুলো স্তুপীকৃত করা হয়। এরোবিক (অক্সিজেনের উপস্থিতিতে) বা এনরোবিক (অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে) উভয় পদ্ধতিতেই পঁচানো যেতে পারে। 'এরোবিক পদ্ধতিতে স্তুপগুলো ছোট এবং খোলা রাখা হয় যাতে তাড়াতাড়ি শুঁকিয়ে যায়। এনরোবিক পদ্ধতিতে স্তুপগুলো উঁচু এবং নিবিড় (compact) করে তৈরি করা হয়। সাধারণত ৩/৪ ফুট (৯২-১২২ সেন্টিমিটার) উচ্চতাই উপযুক্ত। স্তুপগুলোকে মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। এরোবিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত বায়ু চলাচল ও আর্দ্রতা পেলে তিন মাসের মধ্যে স্তুপীকৃত দ্রব্যগুলো ভেঙ্গে আকারবিহীন মিহি সারে রূপান্তরিত হবে যেখানে কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত হবে ১০ : ১৫।

কম্পোস্ট তৈরি

কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের তলায় প্রথমে ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পুরু লিটারের স্তর দিতে হয়, অতপর, একস্তর মৃত পাখি ও একস্তর হ্যাচারি স্লারি (slurry) বা অর্ধতরল মলমূত্রের মিশ্রণ দিয়ে সবশেষে পাতলা একস্তর লিটার দিতে হয়। এ প্রক্রিয়া গর্ত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বারবার করতে হয়। প্রতি গর্তে ৫/৬ স্তর পূর্ণ করে ২ ইঞ্চি (৫ সেন্টিমিটার) মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে গর্তে এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যেন আর্দ্রতা ৬০% থাকে। আর্দ্রতা কম্পোস্টিং ক্রিয়া ত্বারন্বিত করে। প্রত্যেক গর্তের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে মুখ করে দুটো খোলা প্লাস্টিক টিউব ঢুকিয়ে দেয়া হয় যেগুলো চিমনি ভেন্টিলেটর হিসেবে কাজ করে। ৬/৭ মাস পরে কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেলে গর্ত থেকে তোলা হয় এবং সমরূপ মিহি কণায় চূর্ণ করার আগে শুকানো হয়। অতপর ব্যাগে ভরে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খামার পর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এ সার শস্যদানা ছাড়াও টমেটো, সালাদ তৈরিতে ব্যবহৃত শাকসবজি, বেগুন প্রভৃতি উৎপাদনে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে কাজ করে।

জলীয় জৈব পরিবর্তন

পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবহারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পথ হলো জলীয় জৈব পরিবর্তনের মাধ্যমে পুকুরে মাচের সার হিসেবে ব্যবহার করা। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং আশেপাশের অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য এ পদ্ধতিটি বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এসব বর্জ্যের কিছু অংশ মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে (কার্প এবং এ জাতীয় অন্যান্য মাছ)। কিন্তু বেশিরভাগ বর্জ্যই জলজ শৈবাল এবং ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে এবং মাছ জলীয় খাদ্য শিকলের (aquatic food chain) মাধ্যমে এদের থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল বলে শুধু উষ্ণ অঞ্চলের জন্য উপযোগী। বর্তমানে পোল্ট্রি বর্জ্য ব্যবহারের জন্য নতুন জলীয় প্রযুক্তি সৃষ্টির জন্য গবেষণা চলছে।

বায়োগ্যাস রুপান্তর

গবাদিপশু ও পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাস উৎপান গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশসমূহের জন্য একটি উৎকৃষ্ঠ পদ্ধতি। এতে বর্জ্যকে এনরোবিক পরিপাকের মাধ্যমে জৈব পরিবর্তন করে মিথেন গ্যাস উৎপাদন করা হয়। এজন্য একটি মিশ্রণযন্ত্র, একটি ডাইজেস্টর ট্যাংক বা পরিপাক আধার এবং একটি পাম্প লাগবে যা দিয়ে বর্জ্যকে ডাইজেস্টর ট্যাংকে নেয়া হবে। এতে

নিত ধরণের দ্রব্য উৎপন্ন হবে। যাথা- (১) বায়োগ্যাস, (২) একটি তরল পদার্থের প্রবাহ (liquid effluent) এবং (৩) কঠিন পদার্থ বা আঠালো কাদা।

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সঠিক তাপে জীবাণুর কার্যকলাপে গ্যাস তৈরি হয়। ৪০ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। ক্রমাগত বর্জ্য সরবরাহ ও যুগপৎভাবে গাঁজানো বস্তুকে নড়াচড়া করা এবং প্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থিতিকাল গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সরবরাহকৃত বর্জ্যে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে প্রতি ঘনমিটার বর্জ্য থেকে ২০-৪০ ঘনমিটার গ্যাস উৎপন্ন হয়। তৈরি গ্যাস জমা করার জন্য বর্জ্যেরই জলীয় অংশের উপরিতলে একটি ড্রামের খোলামুখ উপুড় করে রাখা হয়। ড্রামটি স্টোরেজ চেম্বার বা গ্যাসধারক হিসেবে কাজ করে। এতে একটি তথাকথিত ফিক্সড টপ জেনারেটর থাকে। গ্যাসধারক সীমিত মাত্রিক; এতে গ্যাস বের হওয়ার পথও থাকে।

জমাকৃত গ্যাসের ৫০-৮০% মিথেন, বাকি অংশ প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড। উৎপন্ন মিথেন তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তরল প্রবাহ পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কঠিন পদার্থ বা আঠালো কাদা শুকিয়ে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কঠিন পদার্থ আমিষ, খনিজ এবং ভিটামিন $বি_{১২}$ পোল্ট্রির একটি উৎকৃষ্ট উৎস। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে পোল্ট্রি খামার যেমন প্রভাব ফেলছে তেমনি প্রভাব ফেলবে খামার উপজাত মৃত পাখি ও পোল্ট্রি বর্জ্য। কাজেই মৃত পাখি ও পোল্ট্রি বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহার এদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ করবে।

সারমর্ম ঃ মৃত পোল্ট্রি বা পাখি, বিভিন্ন বর্জ্য, যেমন- পোল্ট্রি বর্জ্য অর্থাৎ লিটার, মলমূত্র হ্যাচারি বর্জ্য অর্থাৎ খোসায় মৃত ছানা, পঁচা বা না ফোটা ডিম, ফোটানো ডিমের খোসা ইত্যাদি নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। এগুলো থেকে উৎকৃষ্টমানের পোল্ট্রি খাদ্য, সার, কম্পোস্ট, সার মাছের খাদ্য বায়োগ্যাস ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। কাজেই এসবের সদ্ব্যবহারে দেশ অর্থনৈতিকবারে আর সমৃদ্ধ হতে পারে।

অধ্যায় ১৩
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

১৩.১ প্রকল্প, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা

১৩.১.১ প্রকল্প ও কর্মসূচির সংজ্ঞা ও পার্থক্য

প্রকল্প

প্রকল্প বা project হচ্ছে বিনিয়োগ কর্মকান্ডের ক্ষুদ্রতম একক এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামোগত অংশ (building block)। প্রকল্পের মাধ্যম অর্থসম্পদকে মূল সম্পদে রুপান্তরিত করা হয়। প্রকল্প শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে প্রকল্প একটি ধারণা, কারো মতে স্কীম আবার কারো মতে প্রকল্প হচ্ছে পরিকল্পিত এন্টারপ্রাইজ। প্রকল্প শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'projicare' হতে উদ্ভূত যার অর্থ to throw forth অর্থাৎ অগ্রে নিক্ষেপ করা। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ম্যানেজমেন্ট অনুসারে 'প্রকল্প হল একটি সংগঠিত ইউনিট যা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্দিষ্ট বাজেট ও সঠিক সময়ে উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পাদনে মনোনিবেশ করে।' অন্যভাবে বলা যায়, প্রকল্প হল একটি প্রাক্কলিত অর্থ বরাদ্দ ও সময়সীমার মধ্যে কতকগুলো উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত অঙ্গীকার যা এক সমষ্টি আন্তঃসম্পর্কীয় ও সমন্বিত কার্যাবলী রচনা করে। উপরন্তু, কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে কর্মপরিকল্পনা বহন করা হয় তাহাকে প্রকল্প বলা হয়। উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রকল্পের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যা নিম্নরুপ-

- প্রকল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এবং এতে আয় ও ব্যয়ের একটি সুস্পষ্ট বিবরণী থাকে।
- নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে অর্থাৎ প্রকল্প শুরু এবং শেষ করার একটি সময় বাঁধা থাকে।
- প্রকল্পের একটি ভৌগোলিক এলাকা ও সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকে এবং কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যমালা থাকে।

কর্মসূচি

কর্মসূচি (programme) হচ্ছে এক সমষ্টি (set) সংগঠিত কর্মতৎপরতা, প্রকল্প, প্রক্রিয়া ও সেবাসামগ্রী যা বিশেষ উদ্দেশ্যবলী অর্জনে পরিচালিত হয়। তাই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য কর্মসূচির মেয়াদ ৩ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর মেয়াদী হতে পারে। সংক্ষেপে কর্মসূচিকে বলা যায় একগুচ্ছ 'প্রকল্প'।

সারণি ১০.১ঃ প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য।

প্রকল্প	কর্মসূচি
একটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট শুরু ও শেষ করার দিক রয়েছে।	কর্মসূচি অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে।
প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট বাজেট থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে সীমিত বাজেটে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করাই প্রকল্পের কাজ।	কর্মসূচির লক্ষ্য সাধারণত ব্যাপক।
প্রকল্পের কাজের পরিধি সীমিত।	একটি কর্মসূচির অধীনে অনেকগুলো প্রকল্পের অস্তিত্ব থাকতে পারে।
প্রকল্প কর্মসূচির অংশ তাই প্রকল্পকে উপ-কর্মসূচি বলা যায়।	কর্মসূচি পরিকল্পনার অংশ তাই কর্মসূচিকে উপ-প্ল্যান বলা যায়।

১৩.১.২ বাংলাদেশে প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

পরিকল্পনা কমিশন চারটি ভিন্ন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রকল্পকে শ্রেণীবিভাগ করে।

(ক) বিনিয়োগের ব্যপ্তি অনুযায়ী প্রকল্পকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- A যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ১০০ কোটি টাকার ওপরে খরচ হয় সেগুলো এই ক্যাটাগরির আওতাভূক্ত। যেমন- যমুনা বহুমুখী সেতু, যমুনা সার কারখানা ইত্যাদি।
- B যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা খরচ হয় সেই সমস্ত প্রকল্পগুলো এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। যেমন- ইষ্টার্ণ টিউবস, বিআরবি কেবল, এটলাস বাংলাদেশ।
- C ক্যাটাগরি প্রকল্প হচ্ছে সেইগুলো যা বাস্তবায়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। যেমন- আকিজ বিড়ি, কোকোলা লজেন্স ফ্যাক্টরি, বিভিন্ন ধরণের কুটির শিল্প ইত্যাদি।

(খ) প্রকল্পের উৎপাদিত সুবিধা পরিমাপের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

- X শ্রেণী: প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল ও রাজস্ব আয়কারী প্রকল্পগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এসব প্রকল্প তার উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা বিক্রি করে অর্থোপার্জন করে বলে এগুলো আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ, বহির্ভূত কোন সমর্থন ছাড়াই উহার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এ শ্রেণীভূক্ত প্রকল্পের খরচ ও সুবিধা পরিমাপযোগ্য। শিল্পখাতের প্রকল্পসমূহ এই শ্রেণীভূক্ত।
- Y শ্রেণী: উৎপাদনশীল অথচ রাজস্ব উপার্জনকারী নয় এমন প্রকল্পগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এ শ্রেণীর প্রকল্পগুলো দৃশ্যমান সুবিধা (tangible benefit) উৎপাদন করে কিন্তু এ সুবিধা থেকে প্রকল্পগুলো নিজে কোন রাজস্ব উপার্জন করে না বরং অন্যদের রাজস্ব অর্জনের সুযোগ করে দেয়। এ শ্রেণীর প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুবিধা পরিমাপ করা যায়। উদাহরণস্বরুপ, সেচ প্রকল্পের উল্লেখ করা যায় যেখানে কৃষক শ্রেণী বেশি সুবিধা পেয়ে থাকে।
- Z শ্রেণী: সেবাধর্মী প্রকল্পগুলো এই শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত। এই সকল প্রকল্প সমাজের মানুষকে সেবা সুবিধা সরবরাহ করে তাই এই সকল প্রকল্পের আউটপুট থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, এ প্রকল্পগুলোর সুবিধা সাধারণত টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে সুবিধা পাওয়া যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট প্রভৃতি প্রকল্পগুলো এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ, সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং মানুষের মৌলিক চাহিদার উন্নয়ন এই সকল সেবাধর্মী প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পগুলো সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়ে থাকে।

(গ) সরকার কর্তৃক বিবেচিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্পকে দু'শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়:

- কোর প্রকল্প: এ শ্রেণীর প্রকল্পগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হয়। X শ্রেণীভূক্ত ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং স্বল্প বাস্তবায়নকাল সম্পন্ন এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলো এ শ্রেণীভূক্ত।
- নন-কোর প্রকল্প: এ ধরণের প্রকল্পগুলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো কোন প্রকল্পের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অনেক সময় কোর প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে নন কোর প্রকল্পগুলোর আর প্রয়োজন পড়ে না।

(ঘ) প্রকল্পের পর্যায়গত বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পকে চারভাগে ভাগ করা যায়:

- পরীক্ষামূলক প্রকল্প (Experimental project): কোন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বলে। পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির, উচ্চ উদ্ভাবনমূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ যা সব সময় তাৎক্ষণিক বা সরাসরি অর্থনৈতিক ফল বা দৃশ্যমান ফল প্রদান করে না। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এ ধরণের প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন উন্নয়ন সমস্যার সংজ্ঞায়ন, সমাজের মৌলিক চাহিদা পূরণে অধিকতর উপযোগী পথ আবিস্কারে পরীক্ষামূলক প্রকল্প খুবই উপযোগী।
- সারথী প্রকল্প (Pilot project): পরীক্ষামূলক প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় হল সারথী প্রকল্প। পরীক্ষামূলক প্রকল্প পর্যায় থেকে সারথী প্রকল্প পর্যায় অধিকতর বিস্তৃত হওয়ায় সারথী প্রকল্পে অধিক অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষামূলক পর্যায়ে উদ্ভাবিত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা এবং উপযোগীতা সারথী প্রকল্পের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।
- প্রদর্শনী প্রকল্প (Demonstration project): প্রদর্শনী প্রকল্প বলতে সাধারণত আমরা মেলা বা উৎসবকে বুঝি। জনসাধারণকে উন্নত কলাকৌশল, কলাকৌশলের ব্যবহার প্রণালী ও ফলাফল, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণের

নমুনা, মডেল, চার্ট, বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদি দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থাকে প্রদর্শনী বলা হয়। এ ধরণের প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য উপকারভোগীদের নতুন আবিস্কারের সুবিধা বা লাভ প্রদর্শন করা।

- পুনরাবৃত্তি, বিস্তার এবং সেবা বিতরণ প্রকল্প (Replication, Dissemination and Service delivery project): পুনরাবৃত্তি, বিস্তার এবং সেবা বিতরণ প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষিত পদ্ধতি, কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ বিস্তার লাভ করে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রকল্পকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন যেমন-

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) প্রকল্পকে বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে। যেমন- বিশ্বব্যাংক, UNDP, CIDA, USAID ইত্যাদি।
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে প্রকল্পকে শ্রেণীকরণ করে। যেমন- সামাজিক, শিক্ষাগত, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি।

১৩.১.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (project management) হচ্ছে প্রকল্পসমূহকে সঠিকভাবে নির্বাহ বা পরিচালনার জন্য একটি সংগঠিত উদ্যোগ বা দুঃসাহসিক কাজ। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ-

- নির্দিষ্ট পরিব্যয়ে প্রকল্পটি সন্তোষজনকভাবে সমাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্পটির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার জন্য দেয়া বাজেট এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এর সমাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্পটি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ করা।
- সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার করা এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য কাঙ্খিত গুণগত উৎপাদন অর্জন করা।

১৩.২ প্রকল্প চক্র (project cycle)

যে কোন প্রকল্পের একটি প্রারম্ভ, একটি পরমায়ু, একটি সমাপনী আছে। এটা জন্মলাভ করে, কর্মকান্ড শুরু করে, বিকাশ লাভ করে এবং পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পর্যায়গুলোকেই সাধারণত 'প্রকল্প চক্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রকল্প চক্রের উদ্ভাবক হলেন ওয়ারেন সি বম (১৯৬৮)। বম বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিকোন থেকে প্রকল্প চক্রের ৬টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে বমের প্রকল্প চক্র উপস্থাপন করা হল।

১৩.২.১ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ (project identification)

প্রকল্প হচ্ছে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রথম সোপান। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই প্রকল্প রচনা করা হয়। তাই এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর কিনা তার প্রতি সবসময়ই সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায় প্রকল্প প্রণয়নের পরেই জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এর কার্যকারিতা শূন্য বলাই যথার্থ। কারণ প্রকল্প যাদের জন্য প্রণীত হচ্ছে তাদের জন্য প্রকল্প জানাটাই যথেষ্ট নয়। কারণ সে প্রকল্প তাদের জন্য যথার্থ ও কাঙ্খিত নাও হতে পারে; সেখানে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ রক্ষিত নাও হতে পারে। এমনকি প্রকল্পটি যথাযথভাবে প্রণীত নাও হতে পারে। কোন প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ যদি প্রকল্প

চিত্র ১০.১ঃ বম এর প্রকল্প চক্র।

চিহ্নিতকরণে সক্রিয়ভাবে থাকে তাহলে তারা বাস্তবায়নে অধিকতর সক্রিয় হয়। প্রকল্প নির্ণয়ের কোনক্ষেত্রেই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন পেশাজীবি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক শ্রেণী এদের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১৩.২.২ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রকল্প প্রণয়ন (project preparation)

প্রকল্প প্রণয়নের অন্যতম পদক্ষেপ হল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা। এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় খুটিনাটি বিষয়াদি একেবারে গোড়াতেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় ফলে প্রকল্পকে তার গাঠনিক (physical) এবং সামাজিক (social) পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করা খুবই সহজ হয়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকৃতপক্ষে পৃথক সমীক্ষাসমূহের একটি সংশ্লেষ যা সাধারণত বাজার, কারিগরি, আর্থিক, অর্থনৈতিক, আর্থসামাজিক এবং ব্যবস্থাপনার দিকগুলো বর্ণনা করে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পদোৎসর (resources) দুষ্প্রাপ্যতার কথা বিবেচনা করে সহজ বা বিকল্প পথে পৌঁছাতে প্রচেষ্টা চালায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় একটি পদ্ধতির যোগান দেয় এবং একই সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সমর্থ হয়।

১৩.২.৩ প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ (project appraisal)

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ হল একটি প্রাক-বিনিয়োগ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এটা এমন একটি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রকল্পের মূলধন বিনিয়োগ করা হবে কিনা বা প্রকল্পটি আদৌ তহবিল বরাদ্দের উপযোগী কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসলে মূল্য নিরুপণ পদ্ধতি এক প্রকার গবেষণা যা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, ব্যবস্থাপনাগত প্রভৃতি দিক থেকে প্রকল্পের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকল্পটি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে কিনা, সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত কিনা, কারিগরি দিক থেকে যথার্থ কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষিত হয়। X ও Y শ্রেণীর প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের জন্য সাধারণত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা- ক) নীট বর্তমান মূল্য, খ) সুবিধা-খরচ অনুপাত ও গ) অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তির হার।

প্রকল্পের মূল্য নিরুপনের উদ্দেশ্য

কোন প্রকল্প প্রণীত হওয়ার পর এর বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা বা বাস্তবায়নযোগ্যতা নিরুপণ করা হয়। এ জাতীয় প্রাক-বিনিয়োগ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলো হতে পারে নিম্নরুপ-

- প্রকল্পের কৌশলিক এবং অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দেয়া।
- প্রকল্পটির নির্মাণকাল এবং নির্মাণকাল শেষে চালু অবস্থায় অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিচার করা; যেমন কর্মসংস্থান, সামাজিক ক্ষমতা, জনশক্তির দক্ষতা, আর্থসামাজিক অবকাঠামো কতখানি বৃদ্ধি পেতে পারে তা নির্দেশ করা।
- বিবেচিত প্রকল্পটির প্রত্যক্ষ (নিজস্ব) উৎপাদন ফলাফল এবং পরোক্ষভাবে অপরাপর প্রকল্পের ওপর এর প্রভাব নিরুপণ।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পে আর কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করতে হবে কিনা তা নিরুপণ করা।
- পরস্পর প্রতিযোগী বিকল্প প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের জন্য নির্ণায়ক প্রণয়ন।
- প্রকল্পটির বিভিন্ন দিকের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সার্বিক বিবেচনায় প্রকল্পটি লাভজনক কিনা তা দেখা।

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের প্রয়োজনীয়তা

যে কোন প্রকল্পের পিছনে থাকে সরকার বা কোন একটি বা একাধিক সংস্থার অর্থ, সম্পদ, থাকে মেধা, সময় ও সমন্বিত কর্ম প্রচেষ্টা। এজন্য প্রকল্পটি যাতে সর্বাধিক সুফল (optimum benefit) প্রদানে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ

সতর্কতার প্রয়োজন হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো যদি পরিকল্পনায় উপেক্ষিত থেকে যায় তাহলে সাফল্যের অঙ্গীকার ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন সত্ত্বেও ঐ পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার আশঙ্কা থাকে। এই ব্যর্থতার দায়ভার থেকে মুক্তি ও সাফল্যজনক পরিকল্পনার সূচনা করার জন্য প্রয়োজন প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ। কেননা প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের মাধ্যমেই একটি প্রকল্পের অবস্থান, বাস্তবায়নযোগ্যতা তথা সার্বিক দিকগুলো সুস্পষ্ট হয়। তাই প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ প্রকল্প চক্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও প্রায়োগিক দিক। প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ তার কৌশলগত দিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা তা সুস্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি তার লক্ষ্য পূরণে সক্ষম কিনা তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এই মূল্য নিরুপণের মাধ্যমে। প্রকল্পের মেধা, শ্রম, সম্পদ ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা বা অপচয় রোধ কল্পে প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের পরিধি

প্রকল্পের সার্বিক মূল্য নিরুপণকল্পে যে অংশগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তা নিম্নে একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল-

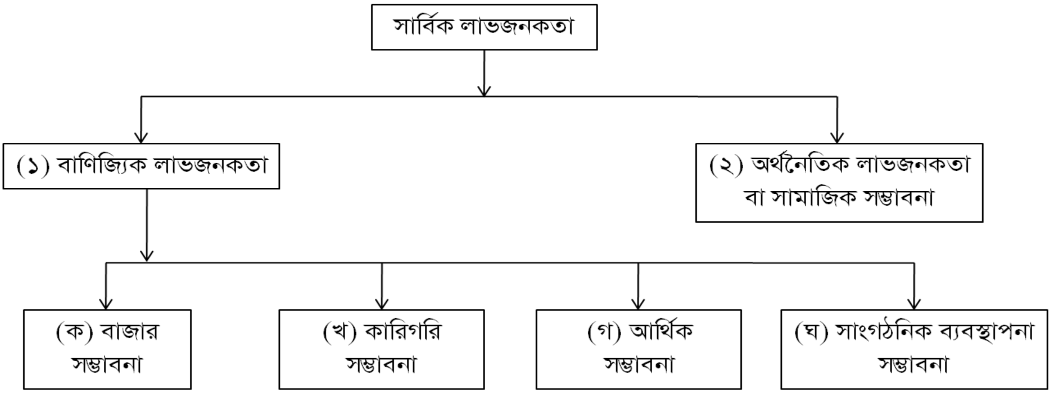

চিত্র ১০.২ঃ মূল্য নিরুপণ প্রতিবেদন তৈরির সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ।

প্রকল্পের চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা (project negotiation)

সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নেগোশিয়শনের মাধ্যমে সাহায্যদাতা ও সাহায্যগ্রহীতা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে একমত হন। এ ঐক্যমত্য পরবর্তী সময়ে আইনগত বাধ্যবাধকতায় রুপান্তরিত হয় যা ঋণ দলিলে প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্দেশ্য যেমন- তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী; প্রকল্পের মেয়াদকাল, প্রকল্প বাস্তবায়নের পন্থা এবং এ সম্পর্কিত কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্পের কাঠামো, লোকবল, ইত্যাকার সমস্ত বিষয় নিয়ে দুপক্ষই ঐকমত্যে উপনীত হয়।

১৩.২.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান (project implementation and supervision)

প্রকল্প বাস্তবায়ন স্তর বলতে প্রকল্পের প্রকৃত উন্নয়ন বা নির্মাণ থেকে প্রকল্প চালুকরণ পর্যায় পর্যন্ত বুঝায়। প্রকল্পের এ পর্যায়ে যে কার্যক্রমগুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেগুলো হচ্ছে ভূমি তৈরি, দ্রব্য সামগ্রী ও সেবাগ্রহণ, গৃহ নির্মাণ, যন্ত্রাদি স্থাপন ইত্যাদি। সমন্বয় সাধন, নির্দেশনা প্রদান এবং বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রণ করা এ পর্যায়ের কাজ। প্রকল্পের কাজ সূচি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানও এর অন্তর্ভূক্ত। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নানাবিধ আর্থসামাজিক জটিলতার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক

পরিলক্ষিত হয়। দ্রুত দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এমন কিছু প্রতিকুলতা রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র বাস্তবায়ন পর্যায়েই ধরা পড়ে। এজন্য প্রকল্প প্রণেতাদেরকে অত্যন্ত দূরদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞাবান হতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিনিয়োগের তুলনায় বাস্তব অগ্রগতি কম হয়েছে। এর কারণ হিসেবে প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় দুর্বলতাকে দায়ী করা হয়।

১৩.২.৫ প্রকল্প পরিবীক্ষণ (project monitoring)

পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার এমন একটি দলিল যেখানে অসংগঠিত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন সর্বোপরি সমস্যা সমাধানে ও ব্যবহারের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রক্রিয়াজাত তথ্যাদি উপস্থাপন করাই প্রকল্প পরিবীক্ষণ। প্রকল্প মনিটরিং বা পরিবীক্ষণকে নিম্নলিখিত চার্টে দেখানো যায়-

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (চলতি/প্রয়োজনীয়) → বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন (সময়মত) → উপাত্তকে প্রতিবেদনে আনয়ন বা উপস্থাপন (অর্থপূর্ণ/ব্যবহার উপযোগী) → ○ নিয়ন্ত্রণ ○ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, গ্রহণ

প্রকল্পের পরিবীক্ষণ (project monitoring) পদ্ধতি উন্নতির জন্য মূল নির্দেশকসমূহ-

- মূল কর্মসূচি এবং আর্থিক পরিকল্পনাসমূহ: কার্যের সময়সূচি এবং উৎপাদন পরিব্যয় অনুসারে কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা দেখাতে সচেষ্ট হওয়া।
- জ্যান্ট চার্ট অথবা বার চার্ট: এ পদ্ধতি লৈখিক অগ্রগামী দূত যা সর্বদাই সময় মাত্রা দেখায় কিন্তু প্রকল্পের কর্মতৎপরতা সমূহের আন্তঃসম্পর্ক দেখাতে অসমর্থ হয়।
- নেটওয়ার্ক (PERT & CPM): কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা বিশ্লেষণে এবং অগ্রগতির আলোকে যা কিছু অর্জিত হয় সেই প্ল্যান পর্যালোচনায় যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
- এস. রেখা (S. Curve): কাজের ভৌত অগ্রগতির সঙ্গে সময় অথবা খরচের সঙ্গে সময়ের যে সম্পর্ক প্রকাশ পায় তা চিত্রের মাধ্যমে নির্দেশ করে।
- বিভিন্ন মান সম্পন্ন রিপোর্ট: যে কোন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন যেমন মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়।

১৩.২.৬ প্রকল্প মূল্যায়ন (project evaluation)

প্রকল্পের সর্বশেষ ধাপ হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক কর্মতৎপরতাসমূহের প্রভাব নির্ধারণের জন্য (উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে) পর্যালোচনা করা হয়। তাই মূল্যায়ন হল উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে প্রকল্পের সফলতা, বিফলতা, দোষ, ত্রুটি ইত্যাদির পরিমাপ। প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় অর্জিত ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় বা বাস্তবায়নের পর উদ্দেশ্য অর্জনের বাধাগুলো চিহ্নিত করা ও পরবর্তী সময়ে সেগুলো অতিক্রমের উপায় বের করা হয়। সুতরাং এ পদ্ধতি কর্মতৎপরতাগুলোকে উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনাকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই নিম্নলিখিত ৪টি বিষয় থাকতে হবে-

- প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থা।
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পরের অবস্থা।
- প্রকল্প উদ্দেশ্য বা অগ্রগতির প্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থার সাথে পরের অবস্থার সম্পর্ক।

সারণি ১০.২ঃ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ (monitoring)	প্রকল্প মূল্যায়ন (evaluation)
প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের একটি পদ্ধতি।	মনিটরিং এর মাধ্যমে উদ্ভূত উপাত্তগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার।
প্রকল্প সম্পদের সদ্ব্যবহার, সরবরাহ, সংগ্রহের বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত।	প্রকল্পের কার্যদক্ষতা, প্রভাব ও ইমপেক্ট নির্ধরণ করা।
দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কার্যাবলী/সময়সূচির উন্নয়ন পরিমাপ করে।	নির্বাচিত চলকসমূহের পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের কর্মতৎপরতা পরিমাপ করে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উপকারিতা/কার্যকারিতা-

- লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা।
- সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সমাধানের জন্য সুপারিশ করা। বাস্তবায়ন পদক্ষেপ ঠিক করা।
- প্রধান সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে মূল তথ্যাদিসহ সুপারিশ পেশকরণ।
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং নীতিসমূহের জন্য অভিজ্ঞতা ও প্রক্রিয়াসমূহের সঠিকভাবে সংরক্ষণ।
- পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সম্পাদনা দেখে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীর কাছে ফিডব্যাক তথ্যাদি সরবরাহ করা।

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ ও প্রকল্প মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ ও প্রকল্প মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিম্নের সারণিতে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

সারণি ১০.৩ঃ প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ ও প্রকল্প মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য

প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ (project appaisal)	প্রকল্প মূল্যায়ন (project evaluation)
১. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ হল কোন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পূর্বে সেই প্রকল্পটি আর্থিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি দিক দিয়ে লাভজনক কিনা তা যাচাই করা।	১. প্রকল্প মূল্যায়ন হল উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে কোন প্রকল্পের সফলতা, বিফলতা, দোষ-ত্রুটি ইত্যাদির পরিমাপ করা।
২. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ হল প্রকল্পের বিনিয়োগ পূর্ব মূল্যায়ন।	২. প্রকল্প মূল্যায়ন হল প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরবর্তী মূল্যায়ন।
৩. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ এর মাধ্যমে কোন প্রকল্পের বিনিয়োগ যোগ্যতা যাচাই করা হয়।	৩. প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে কোন প্রকল্পের কার্যদক্ষতা, প্রভাব ও ইমপ্যাক্ট নির্ধারণ করা হয়।
৪. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ এর মাধ্যমে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	৪. প্রকল্প মূল্যায়নের মাধ্যমে পরবর্তীতে অনুরুপ প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও কৌশলগত পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৩.৩ প্রকল্পের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের নির্দেশিকা বা investment criteria

প্রকল্পে বিনিয়োগ করে তা থেকে কি পরিমাণ সুবিধা কত সময়ে ফেরত আসবে সে বিষয়টি বিবেচনা করেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তব ভিত্তিক ভবিষ্যৎ উপাত্তের ওপর নির্ভরতার মাধ্যমে নগদ অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ নিরুপণ করে পুরো জীবনকালের প্রতিবছরে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ কতটা হবে তা বের করতে হয়। এরুপ নীট নগদ অর্থপ্রবাহ প্রকল্পের আর্থিক শক্তি বা অর্জন ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। আর্থিক শক্তি নির্ণয়কল্পে যে সব কৌশল প্রয়োগ করা হয়, সেগুলোকে সাধারণত দুটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(ক) প্রথম অংশ হচ্ছে অবাট্টাকৃত নগদ অর্থপ্রবাহ পদ্ধতিসমূহ: সময়ের প্রেক্ষিতে টাকার মূল্যমান বিবেচনা না করে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা নিরুপনকল্পে এই পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়। অবাট্টাকৃত নগদ অর্থপ্রবাহ পদ্ধতিসমূহ হল পুঁজি ফেরৎকাল এবং পুঁজির উপর মুনাফার শতকরা গড় হার (Return of Investment)।

- পুঁজি ফেরৎকাল: পুঁজি ফেরৎকাল বলতে আমরা বুঝি কোন প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত পুঁজি কত বৎসরে ফেরৎ আসে; অর্থাৎ পুঁজি ফেরৎকাল = বিনিয়োগকৃত মূলধন ÷ বাৎসরিক নগদ অর্থপ্রবাহ। যে প্রকল্পে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন উঠে আসে সেই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। একাধিক প্রকল্প থেকে উত্তম প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য।
- পুঁজির উপর মুনাফার শতকরা গড় হার (Return of Investment): এ পদ্ধতির অধীনে হিসাব খাতায় লিপিবদ্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর মুনাফার শতকরা গড় হার নিরুপণ করা হয়; অর্থাৎ পুঁজির উপর মুনাফার শতকরা গড় হার = (গড় মুনাফা × ১০০) ÷ গড় বিনিয়োগকৃত মূলধন। মুনাফার শতকরা হার যে প্রকল্পে যত বেশি সে প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতাও তত বেশি।

(খ) দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে বাট্টাকৃত নগদ অর্থ প্রবাহ পদ্ধতিসমূহ: এই পদ্ধতিসমূহ সময়ের প্রেক্ষিতে টাকার মূল্যমান বিষয়টি বিবেচনা করে থাকে; অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের নীট নগদ অর্থ প্রবাহকে নির্দিষ্ট হারে বাট্টা করে বর্তমান মূল্য বের করে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সাথে তুলনা করা হয়। বাট্টাকৃত নগদ অর্থ প্রবাহ পদ্ধতি গুলো হল নীট বর্তমান মূল্য বা Net Present Value (NPV), সুবিধা-খরচের অনুপাত বা Benefit-Cost Ratio (BCR) এবং অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতকরা হার বা Internal Rate of Return (IRR)। এই পদ্ধতি গুলো X এবং Y টাইপ প্রকল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করে কিন্তু যে সকল প্রকল্পের সুফল গণনা করা যায় না সেক্ষেত্রে এগুলো কার্যকরী নয়।

১৩.৩.১ নীট বর্তমান মূল্য বা Net Present Value (NPV)

আজ এক টাকার যে মূল্য আছে আগামী এক বছর পর ঐ এক টাকার সে মূল্য থাকবে না। কারণ টাকার একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। যেমন- এ বছর ১০০ টাকা ১৫% সুদে খাটিয়ে পরের বছর সুদে মূলে পাওয়া যাবে ১১৫ টাকা। অতএব পরবর্তী বছরের ১১৫ টাকার বর্তমান মূল্য ১০০ টাকা। এখানে পার্থক্য হল (১১৫-১০০) = ১৫ টাকা। ইহাই টাকার সময়ের মূল্য। বাট্টার হার বিবেচনা করে একটি প্রকল্পের মোট বাট্টাকৃত সুবিধা হতে মোট বাট্টাকৃত খরচ বাদ দিলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে ঐ প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য বা NPV বলে; অর্থাৎ

NPV = DPVB-DPVC

এখানে DPVB = Discounted Present Value of Benefit
DPVC = Discounted Present Value of Cost
NPV = Net Present Value

প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়-

- কোন প্রকল্পের NPV শূন্য অপেক্ষা বেশি (অর্থাৎ NPV>0) হলে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য হবে।
- কোন প্রকল্পের NPV শূন্য অপেক্ষা ছোট (অর্থাৎ NPV<0) হলে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাবে।
- কোন প্রকল্পের NPV শূন্য (অর্থাৎ NPV=0) হলে সে প্রকল্প গ্রহণও করা যায় আবার বাতিলও করা যায়।

যে সকল প্রকল্পের NPV শূন্য (অর্থাৎ NPV=0) সে সকল প্রকল্প কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা নিম্নে আলোচিত হল-

- প্রকল্পের উদ্দেশ্যই যদি থাকে social benefit.
- Export promotion industry যখন করা হয় তখন প্রাথমিকভাবে লাভ বা ক্ষতি না দেখে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রকল্প নেয়ার মুহূর্তে খুব একটা লাভজনক না হলেও প্রকল্প গৃহীত হয়।
- আমদানির বিকল্প হিসেবে যখন কিছু উৎপাদন করা হয় তখন NPV কম হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়।

- অনেক সময় নির্দিষ্ট এলাকার (অনুন্নত এলাকার) উন্নয়নকল্পে প্রকল্প নেয়া হয় এক্ষেত্রে NPV খুব একটা চিন্তা করা হয় না।
- পূর্ব নির্ধারিত commitment অনুযায়ী রাজনৈতিকভাবে অনেক প্রকল্প নেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে NPV=0 হলেও প্রকল্পকে গ্রহণ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় প্রকল্পে লোকসান যেন না হয়।

১৩.৩.২ সুবিধা-খরচের অনুপাত বা Benefit-Cost Ratio (BCR)

প্রয়োজনীয় বাট্টার হারে একটি বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নগদ সুবিধার বর্তমান মূল্য ও খরচের অনুপাতকে সুবিধা ও খরচ (BCR) অনুপাত বলে। অর্থাৎ-

$$BCR = \frac{DPVB}{DPVC}$$

এখানে DPVB = Discounted Present Value of Benefit
DPVC = Discounted Present Value of Cost
BCR = Benefit-Cost Ratio

প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়-

- কোন প্রকল্পের BCR এক অপেক্ষা বেশি (অর্থাৎ BCR>1) হলে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য হবে।
- কোন প্রকল্পের BCR এক অপেক্ষা ছোট (অর্থাৎ BCR<1) হলে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাবে।
- কোন প্রকল্পের BCR এক (অর্থাৎ BCR=1) হলে সে প্রকল্প গ্রহণও করা যায় আবার বাতিলও করা যায়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যে সকল পরিস্থিতিতে প্রকল্পের NPV=0 হলেও প্রকল্প গ্রহণ করা হয় একই পরিস্থিতিতে BCR=1 হলেও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

১৩.৩.৩ অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতকরা হার বা Internal Rate of Return (IRR)

অভ্যন্তরীণ মুনাফার শতকরা হার বা IRR বলতে এমন একটি হার বুঝায় যার দ্বারা কোন প্রকল্পের ভবিষ্যতের সমুদয় খরচ ও সুবিধাদিকে বর্তমান মূল্যে পরিবর্তিত করলে উহারা পরস্পর সমান হয়। অন্যভাবে উহা এমন একটি বাট্টার হার যাতে বিনিয়োগের NPV শূন্য হয়।

প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়-

- কোন প্রকল্পের IRR যদি Market Rate of Interest অপেক্ষা বেশি হয় তবে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য হবে।
- কোন প্রকল্পের IRR যদি Market Rate of Interest অপেক্ষা ছোট হয় তবে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যাবে।
- কোন প্রকল্পের IRR যদি Market Rate of Interest এর সমান হয় সে প্রকল্প গ্রহণ বা বাতিল করা যায়।

কোন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে IRR একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। প্রকল্প শুরু করার পূর্বে যেমন প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তেমনিভাবে প্রকল্পের লাভজনকতা দেখার জন্য কতকগুলো criteria ব্যবহার করা হয় এবং এর ভিত্তিতে কোন প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে যে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এই সবগুলো criteria check করতে হয়, তবে বিশ্ব ব্যাংক কোন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের শুধুমাত্র IRR'ই গভীরভাবে বিবেচনা করে থাকে।

১৩.৩.৪ Z শ্রেণীর প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের কৌশল

Z শ্রেণীর প্রকল্প যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামোগত প্রকল্প মূলত সেবা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ধরণের প্রকল্প অস্পর্শযোগ্য সুবিধা প্রদান করে থাকে যাকে অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় না। তাই Z শ্রেণীর প্রকল্পসমূহ নির্বাচনে cost-effectiveness analysis এর মাধ্যমে গুণগত ব্যাখ্যা বা qualitative statement আকারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ধরণের প্রকল্পের মূল্য নিরুপণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প প্রকল্পের ব্যয়সমূহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক সুবিধা প্রদানকারী প্রকল্প নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে cost-effectiveness analysis বলে। নিম্নে প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের বিশ্লেষণ উদাহরণস্বরুপ দেয়া হল-

Z শ্রেণীর প্রকল্প বিশ্লেষণ

Z শ্রেণীর প্রকল্প উদাহরণস্বরুপ 'কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প' যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪৪.২৩ লক্ষ টাকা।
মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হলে প্রাণিজ আমিষের বিকল্প নেই। দুধ ও মাংস আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। অথচ পর্যাপ্ত দুধ ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। তাই দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের দেশের দেশীয় গাভীর জাত উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। উক্ত কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদার করার বিকল্প নেই। আলোচ্য কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বাড়ানোসহ তার আধুনিকায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিক সংখ্যক গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের ফলে স্বভাবতই উন্নত কৌলিকমান (genetic make-up) সম্পন্ন গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। গবাদিপশুর কৌলিকমান উন্নয়নের ফলে দুধ ও মাংসের উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু প্রকল্পের আওতায় মোট ১০০০ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে ৩ মাস ব্যাপী কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের পর উক্ত ১০০০ জন স্বেচ্ছাসেবী নিজ ইউনিয়নে উপ-পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন ও ঘাস উৎপাদনের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টে কার্যক্রম শুরু করবেন। শিক্ষিত বেকার যুব সমাজ যারা সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতো তারা কাজের সুযোগ পেয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীগণ সকলেই ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিবে। ফলে অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের বাচ্চা উৎপাদন হবে এবং গবাদিপশু পালনে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছাসেবীরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করবে এবং সামাজিকভাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট স্থাপিত হওয়ায় উন্নতজাতের ষাঁড়ের বীজপ্রাপ্তি কৃষকের জন্য সহজলভ্য হয়েছে। এ সকল দিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.৪ প্রকল্প নেটওয়ার্ক

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে Programme Evaluation and Review Technique (PERT) এবং Critical Path Method (CPM) এই দুটি পদ্ধতিই এক অপরিহার্য উপাদান ও কৌশল। উভয়ই একই মৌলিক ধারণাকে কাজে লাগান যা হচ্ছে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সময়সূচি নির্ধারণের জন্য নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের ব্যবহার।

১৩.৪.১ পার্ট (PERT) এর নীতি ও ব্যবহার

PERT এর পুরো অর্থ হলো Programme Evaluation and Review Technique. PERT কে বংলায় কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা কৌশল বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতি প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা সমূহের সংজ্ঞা ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী সময়মতো সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করার দিক নির্দেশনা দেয়। PERT মূলত বিভিন্ন প্রকারের কর্মতৎপরতার সময় স্থিতিকালের (time duration) সম্ভাব্য প্রাক্কলনের উপর

প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতি খুব বেশি সম্ভাব্য ইভেন্টের (event) সঙ্গে জড়িত বিধায় এটি সম্ভাব্য ঘটনাবহনকারী পদ্ধতি বা কৌশল। PERT প্রকল্পে প্রয়োগ করা হয় যেখানে কর্মতৎপরতাসমূহ অনিশ্চিত হতে পারে কিন্তু অর্থসহ প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহ সর্বদাই প্রস্তুত রাখা বাঞ্চনীয়।

১৩.৪.২ সংকটজনক পথ পদ্ধতি বা Critical Path Method (CPM) এর নীতি ও ব্যবহার

Critical Path Method বা সংকটজনক পথ পদ্ধতিও PERT এর ন্যায় প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা সমূহের সংজ্ঞা ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী সময়মতো সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করার দিক নির্দেশনা দেয়। সংকটজনক পথ পদ্ধতি (CPM) প্রতিটি কর্মতৎপরতার জন্য সময় স্থিতিকালের একটি প্রাক্কলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূল ধারণা হচ্ছে প্রকল্পের স্থিতিকাল গণনা করা যাতে ন্যূনতম মোট পরিব্যয়ে প্রকল্প কিছু ফল যদি উৎপন্ন করবে বলে অনুমান করা হয় যে, প্রতিটি কর্মতৎপরতার প্রত্যক্ষ পরিব্যয় এবং সময়ের মধ্যে এখানে একটা মোটামুটি সরল (linear) এবং পরিমাপযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে। এ পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে কর্মতৎপরতা সমূহের সঙ্গে জড়িত বিধায় একে কর্মতৎপরতা বিষয়ক পদ্ধতি বলা চলে। CPM প্রকল্পে প্রয়োগ করা হয় যেখানে কর্মতৎপরতাসমূহ সংজ্ঞায়িত এবং মোটামুটি ন্যূনতম পরিব্যয়কে (minimum overall cost) গুরুত্ব প্রদান করে।

১৩.৪.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা MIS

তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মূল উপাত্ত অথবা তথ্যাদি সংগ্রহ সংগঠিত করে ও প্রক্রিয়াজাত তথ্যাদি ব্যবহারকারীর কাছে সরবরাহ করা হয়। এ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মালামাল, টাকা এবং মানুষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাহায্য করে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (MIS) প্রধান বিষয়সমূহ এবং ব্যবস্থাপনা ধারণাটির বিবর্তনে যে পদ্ধতি উন্নয়ন হয় তা হল-

- ব্যবস্থাপনাগত হিসাবপত্র- এমন একটি ওরিয়েন্টেড তথ্য পদ্ধতি যা আন্তঃব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেয় এবং কাজেই ঘনিষ্টভাবে (MIS) এর সাথে সম্পৃক্ত।
- ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং ব্যবস্থাপনা সমস্যাদির প্রতি পরিমাণমূলক বিশ্লেষণ কৌশল।

১৩.৪.৪ প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা PMIS

প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) এভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে ‘একটি কানেকটিং টিস্যু অথবা নেটওয়ার্ক যা পরিধানের মাধ্যমে সংগঠনের বিভিন্ন প্রকার কার্মিক ইউনিট এবং তথ্য প্রবাহের নিয়ামনের মাধ্যমে কথিত ইউনিটসমূহের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে’। সংক্ষেপে প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PMIS) হচ্ছে একটি যোগাযোগ চ্যানেল যে দুটো বিষয়ে কাজ করে-

- শুধুমাত্র প্রাপ্ত উপাত্তগুলো গঠনের দ্বারা এটি তথ্য প্রবাহ নিয়মিত করে ফলে সিদ্ধান্তকারী বুদ্ধি সম্পন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন।
- প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের দ্বারা এটি তথ্য প্রবাহ নিয়মিত করে এবং এমন একটি ফরমে উপস্থাপন করা হয় যা সিদ্ধান্তকারীকে প্রকল্পের স্টেটাস এবং অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে এবং এগুলো তাদেরকে একশনে যেতে উদ্দীপ্ত করে।

১৩.৫ প্রকল্প সারপত্র

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নির্ধারিত কর্মে ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করাকে প্রকল্প সারপত্র বা Project Proforma (PP) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, একটি প্রকল্পের মৌল ধারণা এবং খরচের ম্যাক্রো বিবরণকে প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার বা পিসিপি বলা হয়। একটি প্রকল্প সারপত্রের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হল-

সারণি ১০.৪ঃ একটি প্রকল্প সারপত্রের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ।

প্রথম অংশ: প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	দ্বিতীয় অংশ: প্রকল্পের বর্ণনা
১. প্রকল্পের নাম ২. ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৪. প্রকল্প এলাকা ৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬. এলাকা অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন ৭. প্রকল্পে অর্থায়নের উৎস ও ধরন ৮. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ খ) প্রকল্প শেষ হওয়ার তারিখ ৯. প্রকল্পের অঙ্গসমূহ এবং ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার ১০. লগ ফ্রেম ক) প্রকল্প শেষের নির্ধারিত তারিখ খ) এই সারপত্র তৈরির তারিখ ১১. ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো খ) সংগ্রহ/ক্রয় পরিকল্পনা ১২. বছর-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার পরিকল্পনা ১৩. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা	১৪. সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলসহ (যদি থাকে) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অগ্রগণ্যতা, যৌক্তিকতা, লক্ষ্যমাত্রা এবং কাংখিত ফলাফল ১৫. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা করা হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল ও সুপারিশের সারমর্ম ১৬. নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করুন ক) নীট বর্তমান মূল্য (NPV) খ) সুবিধা-খরচ অনুপাত (BCR) গ) অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তির হার (IRR) ১৭. তুল্য বা একই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ হতে শিক্ষণীয় বিষয় ১৮. মোট এবং অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুতের ভিত্তি এবং সিডিউলের হার তৈরির তারিখ ১৯. অনুরুপ প্রকল্পে প্রধান অঙ্গসমূহে তুলনামূলক ব্যয় ২০. বিস্তারিত বার্ষিক খরচের বর্ণনা ২১. প্রধান অংগসমূহের স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন ২২. সরকারের কাছ থেকে ঋণের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যামোরটাইজেশন ২৩. সংক্ষিপ্তাকারে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ২৪. পিআরএস বা এমডিজি এর সাথে সুনির্দিষ্ট লিংকেজ ২৫. ব্যক্তিগত, স্থানীয় সরকার বা বেসরকারি সংস্থা কে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল কিনা ২৬. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শর্তসমূহ ২৭. প্রকল্পটিতে পুনর্বাসন অন্তর্ভূক্ত আছে কিনা ২৮. প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ঝুঁকি এবং তা মোকাবেলার ২৯. অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারিগরি দিক ও অন্যান্য

১৩.৫.১ প্রকল্প সারপত্র তৈরি এবং আকারভেদে তা অনুমোদনের ধাপ

বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে দেশের সমস্ত উন্নয়ন কর্মকান্ডের রুপরেখা তুলে ধরা হয়ে থাকে। এতে সেক্টর অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকল্পসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেখানো হয়। পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের সাথে পরামর্শক্রমে সেক্টরাল প্রায়োরিটির ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল কাঠামো তৈরি করে এবং এর কাঠামোতে যে সমস্ত কর্মসূচি ও প্রকল্প সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে জানানো হয় এবং এর ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাব পাঠানোর জন্য বলা হয়। সংশ্লিষ্ট/উদ্যেগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ 'প্রকল্প সারপত্র' আকারে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

একটি প্রকল্প সারপত্র (পিপি) তৈরির বিভন্ন ধাপ এবং তা অনুমোদনের ধাপসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল-
ধাপ-১: সংশ্লিষ্ট/উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র প্রণয়ন।
ধাপ-২: সংশ্লিষ্ট/উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র বিবেচনা ও ছাড়পত্র প্রদান।
ধাপ-৩: প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র পরীক্ষণ ও বিবেচনা।

ধাপ-৪: প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র সংশোধন।

ধাপ-৫: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্প সারপত্র পরিকল্পনা কমিশন এর সেক্টর বিভাগে প্রেরণ/জমাদান।

ধাপ-৬: পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র পরীক্ষণ ও উর্দ্ধতন যথাযথ কর্তৃপক্ষের (একনেক/পরিকল্পনা মন্ত্রী) বিবেচনা ও অনুমোদনের নিমিত্তে সেক্টর বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সারপত্রের সার-সংক্ষেপ (সামারি) প্রস্তুতকরণ।

ধাপ-৭: সেক্টর বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প সারপত্রের সার-সংক্ষেপ (সামারি) একনেক সচিবালয় (১০ কোটি টাকার উর্দ্ধের প্রকল্পের ক্ষেত্রে)/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে (১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে) জমাদান।

ধাপ-৮: একনেক (১০ কোটি টাকার উর্দ্ধের প্রকল্পের ক্ষেত্রে) / পরিকল্পনা মন্ত্রী (১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে) কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন।

ধাপ-৯: অনুমোদিত প্রকল্প সারপত্রের ভিত্তিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র চুড়ান্তকরণ।

ধাপ-১০: বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (DPEC, যার সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিব) এর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট/উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প সারপত্র চুড়ান্ত অনুমোদন।

ধাপ-১১: অনুমোদিত প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রী করবেন। অনুমোদিত প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৫% এর অধিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশোধিত প্রকল্পের অনুমোদন একনেক প্রদান করবে।

ধাপ-১১: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির নিমিত্তে পরিকল্পনা কমিশনসহ সকলের নিকট অনুমোদিত পিপির অনুলিপি প্রেরণ।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে: উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব বা Preliminary Project Proposal (পিপিপি) প্রণয়ন করে যুগপৎভাবে তা পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ERD) পাঠাবে। প্রস্তাব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন তাদের মতামত উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও ইআরডি-তে পাঠাবে। প্রস্তাবটি নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ইআরডি এর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী দেশ (development partner)/সংস্থার সাথে প্রাথমিক আলোচনা করবে। যদি বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে Development Project Proposal (ডিপিপি) প্রণয়ন করে তা পরিকল্পনা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পাঠাবে। এরপর উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে: এক কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ফলে ভবিষ্যতে কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের সৃষ্টি হবে না। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় কার্য গ্রহণের জন্য অনুমোদিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাবের (টিএপিপি) অনুলিপি পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ ও ইআরডি-তে পাঠাবে। এক কোটি টাকার অধিক ব্যয় সম্বলিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (এসপিইসি) এর সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হবে। যে সকল কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ফলে ভবিষ্যতে কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের সৃষ্টি হবে তা যে কোন আকারেরই হোক না কেন পরিকল্পনা কমিশনের এসপিইসি'র সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

১৩.৫.২ প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা কি এবং কেন?

যখন কোন সংস্থার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, কারিগরি জ্ঞান, যন্ত্রপাতি বা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি থাকেনা বা এই গুলিকে সরবরাহ করিতে অক্ষম, কেবল সেই ক্ষেত্রেই কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কারিগরি সহায়তা যেখানেই প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, এটা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিবে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: কারিগরি সহায়তা প্রকল্প মূলত কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের, দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনই কারিগরি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের উপাদান: কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মূল তিনটি উপাদান হচ্ছে- বিশেষজ্ঞ (দেশী ও বিদেশী), প্রশিক্ষণ (দেশী ও বিদেশী) এবং যন্ত্রপাতি (গাড়ী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি)।

১৩.৫.৩ একটি ক, খ ও গ শ্রেণীর প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা

একটি ক, খ ও গ শ্রেণীর প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হল-

সারণি ১০.৫ঃ একটি ক, খ ও গ শ্রেণীর প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা।

কাজের ধরণ	প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা		
	ক শ্রেণীর প্রকল্প (৫০ কোটির উর্দ্ধে)	খ শ্রেণীর প্রকল্প (২০-৫০ কোটি টাকা)	গ শ্রেণীর প্রকল্প (২০ কোটির নিচে)
১. প্রকল্পের কাজ করার প্রশাসনিক অনুমোদন	অনাবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ২ কোটি টাকা এবং আবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	অনাবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ২ কোটি টাকা এবং আবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	অনাবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ২ কোটি টাকা এবং আবাসিক ভবন ও পূর্ত কাজের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
২. প্রকল্পের গাড়ী/ যানবাহন মেরামত	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে একটি গাড়ীর জন্য ৩০,০০০ টাকা	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে একটি গাড়ীর জন্য ৩০,০০০ টাকা	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে একটি গাড়ীর জন্য ৩০,০০০ টাকা
৩. প্রকল্পের গাড়ীর পেট্রোল/ ডিজেল/লব্রিক্যান্ট ক্রয়	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
৪. ষ্টেশনারি/ মনোহরি দ্রব্যাদি ক্রয়	৫০,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা	২৫,০০০ টাকা
৫. অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
৬. মটর সাইকেল ও বাইসাইকেল মেরামত	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
৭. মটর সাইকেল ক্রয়	৫ লক্ষ টাকা	৩ লক্ষ টাকা	২ লক্ষ টাকা
৮. মটর গাড়ী ক্রয়	৭৫ লক্ষ টাকা	৩৫ লক্ষ টাকা	কোন ক্ষমতা নেই
৯. বিদ্যুৎ, পানির বিল এবং অন্যান্য কর পরিশোধ	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
১০. ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ই-মেইল এবং টেলিফোন বিল পরিশোধ	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
১১. অনাবাসিক ভবন ভাড়া	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের অগ্রীম ভাড়া মঞ্জুর করতে পারেন	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের অগ্রীম ভাড়া মঞ্জুর করতে পারেন	বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের অগ্রীম ভাড়া মঞ্জুর করতে পারেন
১২. টেন্ডার ও কোটেশন ব্যতীত সরাসরি ক্রয়	প্রতি ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	প্রতি ক্ষেত্রে ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত	প্রতি ক্ষেত্রে ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত

কাজের ধরণ	প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা		
	ক শ্রেণীর প্রকল্প (৫০ কোটির উর্দ্ধে)	খ শ্রেণীর প্রকল্প (২০-৫০ কোটি টাকা)	গ শ্রেণীর প্রকল্প (২০ কোটির নিচে)
১৩. প্রশিক্ষণ, সেমিনার, গবেষণা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে ব্যয়	৩০ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	২০ লক্ষ টাকা
১৪. টেন্ডার বিজ্ঞাপন	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা
১৫. প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়/নিষ্পত্তি	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা	জারীকৃত পূর্ণ ক্ষমতা

১৩.৫.৪ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জটিলতম সমস্যার ওপর প্রকল্প সারপত্রের নমুনা

পশুখাদ্য বর্তমান সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু। দেশের অভ্যন্তরের কাঁচামাল ব্যবহার করে একটি 'পশুখাদ্য কারখানা স্থাপনের প্রকল্প সারপত্র' তৈরি করা হল-

১. প্রকল্পের নাম	ঃ	ঢাকা পশুখাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্প
২. ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ঃ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	ক) দেশের বেসরকারি খামার সমূহে গবাদিপশু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য সরবরাহ করা। খ) সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও আধুনিক মেশিনারিজ স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। গ) সুষম খাদ্যের কাঁচামাল ও উপকরণসমূহ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সুষম খাদ্য মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে সম্পদকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। ঘ) বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত অনুরুপ পশুখাদ্য কারখানাগুলির একছত্র ব্যবসা রোধকল্পে পশুখাদ্যের বাজারদর ও গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা		প্রকল্পটির উপর আনুষ্ঠানিক কোন সমীক্ষা হয়নি।
৫. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেক্টরাল বরাদ্দ এবং কর্ম পদ্ধতির সাথে সংগতি	ঃ	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হল কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি করা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং তা প্রতিপালনের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খামারি, ভূমিহীন কৃষক ও দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান তথা আয়ের উৎস সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা তথা জাতীয় উন্নয়ন সাধন করা। আলোচ্য প্রকল্পটির উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাণিসম্পদ খাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ৫৪৩৫.৬ লক্ষ টাকা।
৬. মোট প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৭৪২.৩১ লক্ষ টাকা।
৭. প্রকল্পের অর্থয়ন (লক্ষ টাকা)	ঃ	স্থানীয় সম্পদ ১৭৪২.৩১ লক্ষ টাকা। বৈদেশিক সাহায্য ০.০০ লক্ষ টাকা।

		বৈদেশিক ঋণ ০.০০ লক্ষ টাকা।		
৮. প্রকল্পের বিনিয়োগ ফলাফল (আর্থিক ও অর্থনৈতিক)	ঃ	ইহা একটি পরোক্ষ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প। তবুও, ৩ বৎসর মেয়াদি এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫% সুদের হার বাট্টাকৃত খরচ ও সুদ যাচাই করে দেখা যায় IRR গ্রহণযোগ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্রায়াত্ত খাত একটি আধুনিক পশুখাদ্য কারখানার মালিক হবে। এর ফলে দেশের সরকারি ও বেসরকারি খামারি, ভূমিহীন কৃষক ও দুঃস্থ মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থের উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে জনগণের আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে ইহা সরকারের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে।		
৯. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংশসমূহ ও উহার জন্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				
ক) জনবল (সংযোজনী-ক)	ঃ	কর্মকর্তা	ঃ	১৭.৯৬ লক্ষ টাকা
		কর্মচারী	ঃ	৫.২০ লক্ষ টাকা
		এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ	২৩.১৬ লক্ষ টাকা
		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ	১.৩৩%
খ) ভৌত নির্মাণ ব্যয়	ঃ	ষ্টীল কারখানা ভবন নির্মাণ	ঃ	১৫০.০০ লক্ষ টাকা
		প্রশাসনিক ভবন	ঃ	৫০.০০ লক্ষ টাকা
		মিনি ল্যাবরেটরি	ঃ	১০০.০০ লক্ষ টাকা
		সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	ঃ	৭৫.০০ লক্ষ টাকা
		রাস্তা, গাড়ী পার্কিং ও ড্রেনেজ	ঃ	৫০.০০ লক্ষ টাকা
		গুদাম নির্মাণ	ঃ	৪৪.০০ লক্ষ টাকা
		এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ	৪৬৯.০০ লক্ষ টাকা
		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ	২৬.৯২%
গ) মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি	ঃ	সাইলো (২ টি) ২০০০ টন ক্ষমতা	ঃ	২৭০.০০ লক্ষ টাকা
		মূল কারখানা (ম্যাশ ও পিলেট)	ঃ	৫০০.০০ লক্ষ টাকা
		ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল প্যানেল	ঃ	২.০০ লক্ষ টাকা
		ওয়েব্রিজ	ঃ	১২৫.০০ লক্ষ টাকা
		ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও তদারকি	ঃ	২০.০০ লক্ষ টাকা
		এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ	৯১৭.০০ লক্ষ টাকা
		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ	৫২.৬৩%
ঘ) যানবাহন	ঃ	পাজেরো জীপ (১ টি)	ঃ	৩৬.০০ লক্ষ টাকা
		ডাবল কেবিন পিক আপ (২ টি)	ঃ	৩৫.০০ লক্ষ টাকা
		ট্রাক (৫ টি)	ঃ	১২৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোটর সাইকেল (৫ টি)	ঃ	৩.৫০ লক্ষ টাকা
		এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ	১৯৯.৫০ লক্ষ টাকা
		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ	১১.৪৫%
ঙ) আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	ঃ	মোট ব্যয়	ঃ	১৩.৬৫ লক্ষ টাকা
		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ	০.৭৮%
চ) পরামর্শক	ঃ	বিদেশী	ঃ	০.০০ লক্ষ টাকা

	দেশী	ঃ ২৪.০০ লক্ষ টাকা
	এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ ২৪.০০ লক্ষ টাকা
	মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ ১.৩৮%
ছ) অন্যান্য ব্যয়	ঃ ভ্রমণ ভাতা	ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা
	উৎসাহী কৃষকের প্রশিক্ষণ	ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা
	বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা
	প্রচারের জন্য বুকলেট/পোস্টার	ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা
	জ্বালানি ও যানবাহন মেরামত	ঃ ১৫.০০ লক্ষ টাকা
	টেলিফোন	ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা
	আনুষঙ্গিক ব্যয়	ঃ ৩৬.০০ লক্ষ টাকা
	এই খাতে মোট ব্যয়	ঃ ৯৬.০০ লক্ষ টাকা
	মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা অংশ	ঃ ৬.৩৫%

১০. বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিচালনার জন্য উপকরণ, আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি ব্যয় ঃ প্রযোজ্য নহে।

১১. প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ঃ প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে হবে। এই প্রকল্পে আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টিসহ যাবতীয় পরোক্ষ সেবামূলক কর্মকান্ড আরও জোরদার হবে।

খ) উৎপাদনমূলক ঃ যেহেতু প্রকল্পটি আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ অতএব এর উৎপাদন অবশ্যই বেশি হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল সরকারি খামারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সুষম খাদ্য সমস্যা অনেকাংশে দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া জাতীয়ভাবে মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

গ) আয় ও কর্মসংস্থানমূলক ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আয় ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পশুখাদ্য কৃষকের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মধ্য-ব্যবসায়ী হিসেবে ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে।

ঘ) আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে সমাজের দরিদ্রতম অংশগুলির উপর প্রভাব ঃ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সুষম খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে পশুপাখির স্বাস্থের উন্নতিসহ তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমিহীন ক্ষুদ্র প্রান্তিক ও দুঃস্থ মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ঙ) মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রভাব ঃ যেসব মহিলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে অথবা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে ইচ্ছুক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ফলে গ্রামীণ মহিলারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে।

চ) পরিবেশগত প্রভাব ঃ প্রকল্পটির সকল কর্মকান্ড পরিবেশ বান্ধব হিসেবে সমাদৃত হবে। বিশেষ করে পশুখাদ্য তৈরির জন্য প্রধান কাঁচামাল ভূট্রার জন্য কৃষকরা ভূট্রা চাষে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের মাধ্যমে উৎসাহী করে তোলা হবে। ফলে একদিকে যেমন ভূট্রার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও কৃষকরা ভূট্রার ন্যায্য মূল্য পাবে অন্যদিকে তেমনি সারাদেশে ব্যাপক ভূট্রা চাষের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

১২. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর বার্ষিক		
ক) মোট রাজস্ব ব্যয়	ঃ	প্রযোজ্য নহে।
খ) মোট আয়	ঃ	সমগ্র দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১-০৭-২০১৫ ইং হতে ৩০-০৬-২০১৮ ইং পর্যন্ত।
১৪. প্রকল্প এলাকা	ঃ	ঢাকা, বাংলাদেশ।
১৫. তুল্য বা একই উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং তাদের মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ	ঃ	প্রযোজ্য নহে।
১৬. অন্যান্য বিশেষ কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য থাকিলে	ঃ	- প্রকল্পটির সারপত্রে আর্থিক প্রাক্কলন লক্ষ টাকায় আছে। - IRR গণনায় Trial and Error method follow করা হয়েছে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের সুপারিশ ও স্বাক্ষর	ঃ	
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ	ঃ	

১৩.৬ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

১৩.৬.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং বিশেষ করে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন নীতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন রাষ্ট্রীয় কর্মধারার একটি প্রধান দিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগের জন্য প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর মতে 'উন্নয়ন হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অর্থাৎ যিনি অন্যের তুলনায় যত বেশি নিচে, তিনি তত বেশি অগ্রাধিকার পাবেন'। উন্নয়নের সংজ্ঞা যেভাবেই প্রণীত হোক না কেন সাধারণভাবে উন্নয়ন হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশ যেখানে সম্পদ সীমিত এবং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ অনুসরণ করা হচ্ছে সেখানে প্রকল্প হল উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি অন্যতম হাতিয়ার। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। এ দুর্বলতার কারণে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে যথাযথ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে অকার্যকর বলে বিবেচিত হয় যা অর্থনীতিতে সুবিধা প্রদান করার চেয়ে বরং বোঝাস্বরুপ চেপে বসে।

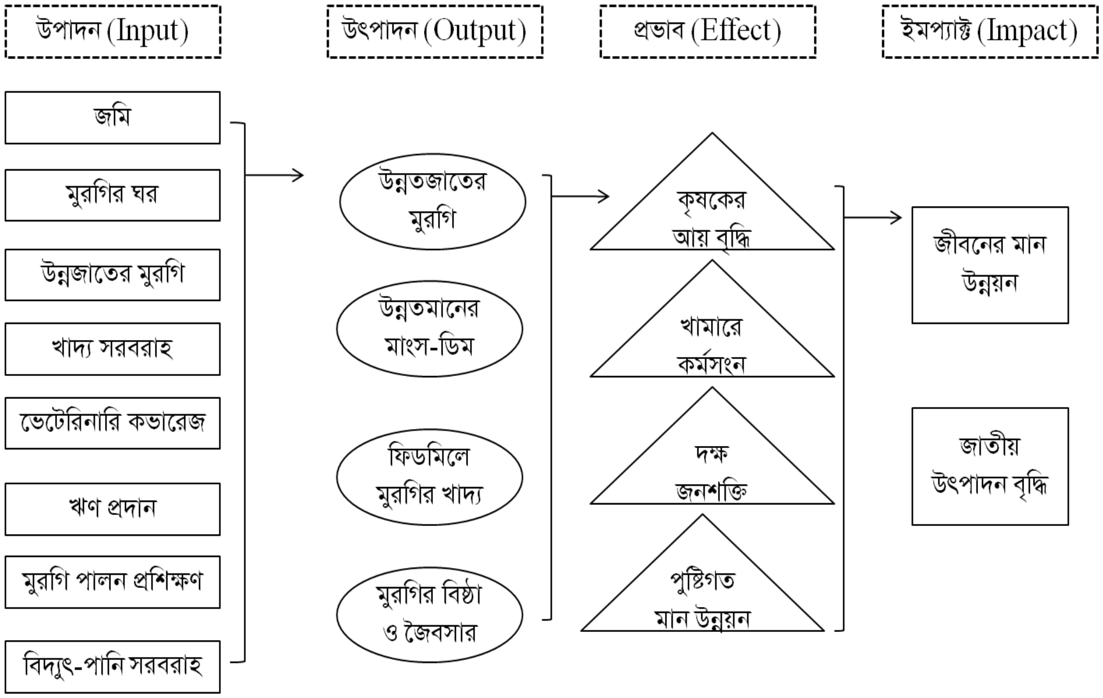

চিত্র ১০.৩ঃ প্রকল্প উপকারিতা পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিষয়ক মডেল। এখানে গ্রামীণ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবনের গুণগতমানের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১৩.৬.২ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার উপাদান ও সাংগঠনিক পদক্ষেপ

পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য অগ্রিম কল্পনা করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দেশের সম্পদের যথোপযুক্ত নিয়োগ পদ্ধতিকে পরিকল্পনা বলা হয়। তাই পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত উপাদান পাই-

- পরিকল্পনাকে রুপ দেয়ার জন্য পন্থাসমূহ নির্ধারণ করা।
- সম্পদোৎস (resources) বরাদ্দের উপায়গুলো খোঁজা।
- উদ্দেশসমূহ অর্জনের জন্য পন্থাগুলো বের করা।
- অগ্রাধিকারসমূহ (priorities) ও সময়কাল নির্ধারণ করা।
- বিভিন্ন প্রকার পছন্দ (types of choices) বের করা।
- বিকল্পসমূহ (alternatives) নির্বাচন করা।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলোর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বাস্তবায়ন উপযোগী পরিকল্পনার মেয়াদ ৫, ১০, ১৫, ২০ বছর হতে পারে। কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এটি পরিচালিত হয়। সংক্ষেপে পরিকল্পনাকে বলা হয় একগুচ্ছ 'কর্মসূচি'। বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যে সাংগঠনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তা নিম্নের সারণিতে (মজিদ ১৯৯৫) দেখানো হল। এখানে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় করণীয় কার্যাবলী ও তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণি ১০.৬ঃ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক পদক্ষেপ।

করণীয় কার্যাবলী	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. প্রকল্প সণাক্তকরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বিভাগ, কর্পোরেশন, পরিকল্পনা কমিশন (কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহায্যদাতা সংস্থা সুপারিশ করে) স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহ।
২. কারিগরি নিরীক্ষা	সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা শাখা/ লাইন, মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন।
৩. প্রকল্পের মূল্য নিরুপণ ও অনুমোদন	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি, জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি।
৪. তহবিল বিষয়ক	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে তহবিল সঞ্চালন (অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্মসূচি রচনা করে পরিকল্পনা কমিশন) প্রকল্প সাহায্য লাইন্ড আপ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)।
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন	লাইন সংস্থাসমূহ, মন্ত্রণালয়, কর্পোরেশন।
৬. জাতীয় নীতি প্রণয়ন	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদকে সহায়তা দেয় একনেক (ECNEC), পরিকল্পনা কমিশন একনেকের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে, জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ/অনুমোদিত হয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি; যেমন- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাজেট, প্ল্যান ও অন্যান্য নীতি।

১৩.৬.৩ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী

বাংলাদেশে পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাঠামো (Chadha and Skylark 1989) নিম্নের চিত্রে দেখানো পূর্বক সংক্ষিপ্তভাবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হল।

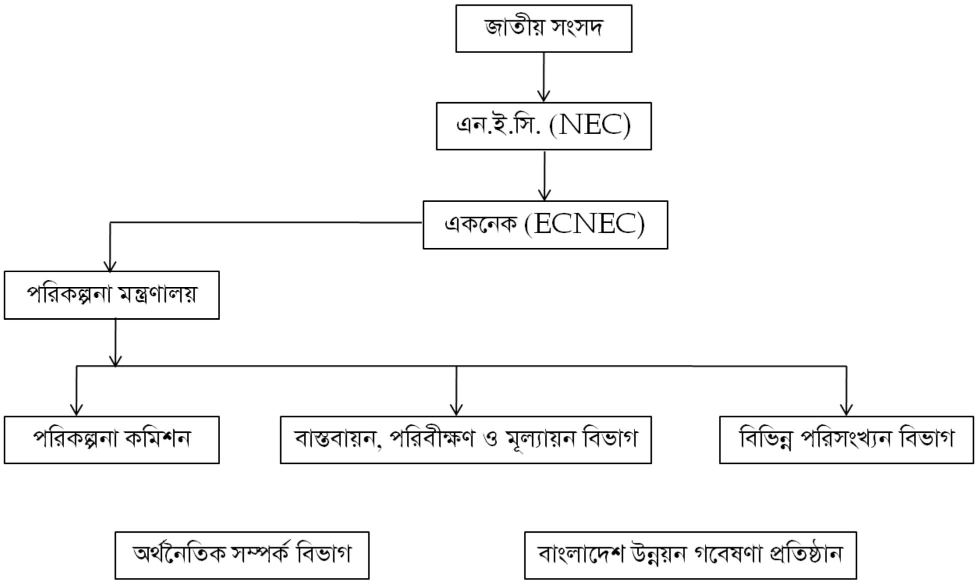

চিত্র ১০.৪ঃ বাংলাদেশে পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাঠামো।

(ক) জাতীয় সংসদ (National Parliament)

যদিও বাংলদেশে পরিকল্পনার সাধারণ দিক-নির্দেশনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ থেকে এসেছে তবুও জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সেই দিক নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই দিক নির্দেশনা আসত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীপরিষদ থেকে কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করত বলে চূড়ান্ত দিক নির্দেশনা দেওয়ার আইনসম্মত কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদই ছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে প্রথমে একদলীয় শাসন এবং পরে রাষ্ট্রপতি স্বাশিত সরকার প্রবর্তন হওয়ায় পরিকল্পনার সাধারণ দিক-নির্দেশনা আসতো রাষ্ট্রপ্রধান থেকে। এই সময়ের মধ্যে কখনো কখনো জাতীয় সংসদ কার্যকর থাকলেও পরিকল্পনার দিক নির্দেশনায় সংসদের ভূমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত। ১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর থেকে দেশে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তির পর থেকে এই ক্ষমতা পুণরায় জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মূল নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় সংসদ তার ভূমিকা পালন করছে।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ

জাতীয় সংসদ কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ বা দিক নির্দেশনা লাভের পর পরবর্তী পর্যায়ের কতকগুলো প্রতিষ্ঠান এই নীতির আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সাংগঠনিকভাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের। এর অধীনে তিনটি প্রতিষ্ঠান- যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, এবং পরিসংখ্যান বিভাগ যথাক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং পরিসংখ্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এই কার্যগত (functional) দিকটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের হলেও জাতীয় সংসদের দিক-নির্দেশনাকে চূড়ান্ত নীতিতে রুপদানের ক্ষেত্রে আরো দু'টি সাংগঠনিক কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দুটো হচ্ছে যথাক্রমে 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)' ও 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (ECNEC)'। পর্যায়ক্রমে এসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বা National Economic Council (NEC)

NEC বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এ পরিষদের প্রধান হলেন সরকার প্রধান (বর্তমান সরকার পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী)। পরিকল্পনা বিভাগ NEC এর সচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য এই পরিষদের সদস্য। পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এই পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য এবং সকল মন্ত্রণালয়-যুক্ত বিভাগসমূহের সচিবগণ এ পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকেন। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দাপ্তরিক কাজ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগই করে থাকে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে-

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নকালে সামগ্রিক নীতি নির্দেশনা প্রদান;
- পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নীতিমালা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন দান;
- উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অন্য কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং
- NEC কে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনমত কমিটি নিযুক্ত করা।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (একনেক)

Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) হল NEC কর্তৃক নির্ধারিত নীতি বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ পরিষদ। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন একনেকের কাছ

থেকেই আসে। একনেকের সভাপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই এই কমিটির আহবায়ক। পরিকল্পনা বিভাগ NEC এর সচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প, অর্থ, বাণিজ্য, পূর্তসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে (পেশকৃত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট) একনেকের সদস্য। উল্লেখযোগ্য যে একনেক নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে-

- ১০ কোটি টাকার উর্দ্ধের সকল প্রকল্প প্রস্তাবের বিবেচনা ও অনুমোদন;
- বেসরকারি খাতের বৃহত্তর প্রকল্প অনুমোদন ও বিবেচনা;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত বা যৌথ বিনিয়োগ কিংবা বিদেশী বিনিয়োগকারী হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব বিবেচনা;
- অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ এবং অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন (performance) এবং সম্পৃক্ত নীতি ও ইস্যুগুলো পর্যালোচনা;
- সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনসমূহের ভূমিকা বিশেষ করে তাদের আর্থিক ফলাফলের বিবেচনা ও পর্যালোচনা;
- পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের দাম অথবা সরকারি ইন্টারপ্রাইজগুলোর উৎপাদনের দাম, রেট, ফিস নির্ধারণ বা বিবেচনা।

গ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Planning)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও সমন্বয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন একজন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগসমূহ হচ্ছে-

- পরিকল্পনা বিভাগ;
- বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি);
- পরিসংখ্যান বিভাগ (যার প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)।

এ ছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা।

পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালনরত একটি প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবে প্রকল্পগুলোর সাথে এর সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সংস্থার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী (সরকার প্রধান) এবং তার অধীনে পরিকল্পনামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী উভয়েই ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও রয়েছে চারজন সদস্য। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা কমিশন তিন ধরণের দায়িত্ব পালন করে। এগুলো হচ্ছে আদেশমূলক, নির্বাহীমূলক এবং সমন্বয়মূলক। নীতি প্রণয়নে এই কমিশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক দায়িত্ব পালন করে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ বা আইএমইডি

Implementation, Monitoring and Evaluation Division (IMED) হল দেশের কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও মূল্যায়ন সংস্থা (মজিদ ১৯৯৫)। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ ব্যুরোকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে রুপান্তরিত করা হয়। এটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। আইএমইডি-র প্রধান নির্বাহী হলেন একজন সচিব। কাজের সুবিধার্থে এটিকে কয়েকটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে। মহাপরিচালক বিভাগীয় সেক্টরের প্রধান। তাঁকে সাহায্য করার জন্য পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারি পরিচালক রয়েছেন। সংক্ষেপে আইএমইডি-র কার্যাবলী হচ্ছে নিম্নরুপ-

- উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

- উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সংস্থা/ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বাস্তবায়ন সমস্যাসমূহ এনইসি বা একনেকের কাছে উপস্থাপন;
- একনেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পের সমস্যা ও ত্রুটিগুলো সমাধানের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা;
- প্রয়োজন হলে সূচি অনুযায়ী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে উপদেষ্টামূলক সেবা প্রদান করা;
- প্রকল্প তদন্তের পরে সমস্যা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের বা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করে তা একনেক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কাছে দাখিল করা;
- প্রকল্পের পরিবহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন রচনা ও তার অগ্রগতি পর্যালোচন করা; এবং
- উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistical Division)

পরিসংখ্যান বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অপর একটি প্রধান বিভাগ। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, তার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ব্যাপক। এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭৫ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। সাধারণভাবে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এক পরিসংখ্যান ও তার উন্নয়ন সম্পর্কে সাহায্য প্রদান করে পরিসংখ্যান বিভাগ। জাতীয় পর্যায়ে রয়েছে 'জাতীয় পরিসংখ্যান পরিষদ'। এ পরিষদের প্রধান হলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসে ছয়টি বিভাগ রয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে পরিসংখ্যান বিভাগের প্রায়োগিক প্রশাসনিক একক। তাছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো জেলা এবং উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

এখন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত দুটি প্রতিষ্ঠান 'অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ' ও 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়া যাক।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা Economic Relations Division (ERD)

এক সময় এ প্রতিষ্ঠানের নাম বহিঃসম্পদ বিভাগ থাকলেও বর্তমানে এর নামকরণ করা হয়েছে 'অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ' এবং এটিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কারিগরি সাহায্যসহ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং চুক্তি সম্পাদন করে (মজিদ ১৯৯৫)। তাই প্রকৃত জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ণয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেশের প্রখ্যাত গবেষকদের সমন্বয়ে গঠি দেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞানের নানা দিকের উপর গবেষণা চালায়। বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে সংসদীয় চার্টার বলে দৃঢ় আইনগত ভিত্তি লাভ করে।

এই বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও আরো কতকগুলো খাতওয়ারী প্যানেল ইনষ্টিটিউট রয়েছে যারা পরিকল্পনা কমিশনকে বিভিন্নভাবে মূল্যবান পরামর্শ, মতামত এবং মন্তব্য প্রদান করতে পারে। যেমন- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি, কৃষিবিদ

ইনষ্টিটিউশন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞান সমিতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি। পরিকল্পনা কমিশন এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারলে বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ যেমন বাড়বে তেমনি গৃহীত পরিকল্পনাগুলো আরো বেশি জীবনঘনিষ্ট, লাগসই ও উন্নয়নমুখী হবে।

১৩.৬.৪ বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। পরিকল্পনাগুলোর এই ব্যর্থতার পিছনে অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রভাব জড়িত। বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়ে গেছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো সমস্যা বা সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হল-

- প্রথাগত পরিকল্পনা কৌশল।
- স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের অভাব।
- সরকার ও রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতার অভাব।
- সম্পদের অপ্রতুলতা ও অত্যধিক বৈদেশিক নির্ভরতা।
- উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমস্যা।
- পরিকল্পনা দলিলে বারবার রদবদল।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় শহরমুখীনতার ব্যাপক প্রভাব।
- দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অঙ্গীকারের অভাব।
- প্রশাসনিক অদক্ষতা ও ব্যর্থতা।
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ও সংস্থাসমূহের কাজের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার অভাব।

এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি দেশী-বিদেশী কিছু ঘটনাপ্রবাহ যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ (খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস), গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বারবার ব্যহত হওয়া, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি নানবিধ কারণে বাংলাদেশে পরিকল্পনাসমূহ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৩.৬.৫ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে ওঠার উপায়

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে ওঠা এক কথায় অত্যন্ত দুরুহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্গীকারসহ যোগ্য নেতৃত্ব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ধাপে ধাপে অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এখানে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কতকগুলো সুপারিশ তুলে ধরা হল-

- পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণ।
- বৈদেশিক নির্ভরতা কমিয়ে স্বয়ংভর পরিকল্পনা কাঠামো গড়ে তোলা।
- স্থানীয় সরকার কাঠামোর উন্নয়ন সাধন এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার মূল দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া।
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন শক্তিশালীকরণ এবং পরিকল্পনা সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা।
- পরিকল্পনা দলিলে বারবার রদবদলের ঐতিহ্য পরিহার।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।

সব মিলিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য চাই গণমুখী, বাস্তবসম্মত, দক্ষ এবং যে কোন ধরণের অসঙ্গত প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রশাসনিক উদ্যোগ- যার সাথে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত্য, সহযোগিতা এবং সমর্থন থাকবে। আর এর সাথে যুক্ত হবে যাদের জন্য পরিকল্পনা সেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সম্পৃক্ততা। পুরো বিষয়টিকে দেখতে হবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল ও শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে এসে অতি জরুরী জাতীয় ইস্যু হিসেবে। তা'হলেই একটি কার্যকর পরিকল্পনা ব্যবস্থায় উপনীত হতে আমরা সক্ষম হবো।

অধ্যায় ১৪

প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা

১৪.১ পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে প্রাণিসম্পদ

সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র সেই আদিসত্তার জন্যই যিনি ইসলামকে একটি সুন্দর ধর্ম হিসেবে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন দিক নেই যেটা ইসলাম তথা কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়নি। প্রাণিসম্পদ আমাদের দেশের সম্পদ এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য একটি বিরাট নেয়ামত। মানুষের খাদ্য যোগান, প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্র ও জুতা তৈরি, হাল চাষ, পরিবহন ও অন্যান্য কাজে প্রাণিসম্পদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত। তাই আদিকাল থেকেই পশুপাখি মানুষের নিত্য সহচর এবং এগুলো পালনে মানুষ অভ্যস্ত। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা এবং সূরা আনআম এ দুটো সুরার নামকরণ করা হয়েছে পশুর নাম অনুসারে। এ থেকে ইসলামে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব বোঝা যায়। সেজন্য এ সম্পদের উন্নয়ন করে আমাদের জীবিকাকে প্রসারিত করা হলে আমরা আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করা যায়। কাজেই পশুপাখি পালন হালাল রুজী অর্জনের অন্যতম একটি ব্যবস্থা। আর হালাল উপার্জন শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীগণকে পশুপাখি পালনের পরামর্শ দিতেন এবং নিজেও মেষ চরিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ নবীরাই মেষ চরাতেন। উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের অর্থবহ ইঙ্গিত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবীগণ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন তার দ্বারা কেবল আরব নয় বরং মুসলিম অধ্যুষিত অনারব দেশগুলোর প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রাণিসম্পদ তথা জন্তুর পেটে আমাদের জন্য পাক-সাফ দুধ তৈরি করেছেন, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। চিন্তা করলে দেখা যায় শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুদের দেহের প্রতিটি অংশ যেমন পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং অন্যান্য অংশ মানুষের কাজে আসে এবং তা দিয়ে মানুষের জীবন ধারনের জন্য নানা প্রকারের সরঞ্জামাদি তৈরি হয়। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুদের মাংসও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। শুধু দুনিয়ার জিন্দেগীতে নয়, প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের জন্যও অনাবিল আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন দুধের নহর, পাখির ভুনা গোশত ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন অসংখ্য নেয়ামত যাতে মানুষ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার অপারশক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও এবাদতে নিয়োজিত হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার কিছু নমুনা এখানে পেশ করা হল।

১৪.১.১ কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা দয়া করে পশুপাখিকে সৃষ্টি পূর্বক আমাদের পোষ মানিয়ে দিয়েছেন। সূরা ইয়াসীনের আয়াত ৭১-৭৩ নং আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং অসাধারণ কারিগরির দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুরা ইয়াসীনের ৭১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তু এবং তারা এগুলোর অধিকারী?' সুরা ইয়াসীনের ৭২ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে, 'আমি এগুলো তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলো তাদের বাহন ও কতক তাদের খাদ্য।' দুধের পুষ্টিকারীতার বিষয়ে সূরা ইয়াসীনের ৭৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,'পশুর মধ্যে পানীয় বস্তু অর্থাৎ দুধ আছে এবং তাতে রয়েছে তাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?' আল্লাহ তায়ালা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোর উপর মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এখানে আরো একটি অনুগ্রহ ও নেয়ামতের দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতি, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীবজন্তু মানুষ অপেক্ষা

অধিক শক্তিশালী। তাদের কাছে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দান।

- পবিত্র কুরআনে মুসা (আঃ) এর ছাগল পালন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সুরা ত্বোহার ১৭-১৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘হে মুসা (আঃ) তোমার ডান হাতে ওঁটা কি? তিনি বললেন ‘এটা আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগল পালনের জন্য বৃক্ষের পাতা ঝেড়ে দেই এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে’। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে হযরত মুসা (আঃ) ছাগল পালন করতেন এবং তিনি নিজেই তাদের যত্ন নিতেন।
- বিনোদন, ভারবহন এবং পশুজাত দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা নাহলে উল্লেখ আছে। সূরা নাহলের ৫ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্যে ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকরণ রয়েছে এবং ওদের হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।’ এ প্রসংগে সূরা নাহলের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘আর যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওদের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর।’ সূরা নাহলের ৭ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘আর ওরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।’ সূরা নাহলের ৮ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘তোমাদের আরোহণের জন্যে এবং শোভার জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।’ সুরা নাহলের ৬৬ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘অবশ্যই গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদিগকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়।’ সুরা নাহলের ৮০ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের জন্যে তাবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে পাও। আর তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছুকালের গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।’
- আল্লাহ আমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করি এবং কোনটিকে ভক্ষণ করি। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে আমরা আমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে সূরা আল মুমিনুনের ২১-২২ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘আর তোমাদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে; তোমাদেরকে আমি পান করাই ওগুলোর উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা হতে ভক্ষণ করে থাকো। এবং তোমরা তাতে আরোহণও করে থাকো।’
- প্রাণিসম্পদের প্রতি ভাল আচরণের বিষয়ে কুরআনের সুরা হুদে বর্ণনা রয়েছে। সুরা হুদের ৬৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ‘হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব তাকে আল্লাহর জমিনে বিচরণ করে খেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করো না’।
- হালাল জন্তুদের মাংস মানুষের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী আমরা এগুলোকে যবেহ করে খেতে পারি। সুরা মায়েদাহর ১ নং আয়াতে ইরশাদ রয়েছে ‘--- তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে ---’ ।
- শুধু দুনিয়ার জিন্দেগীতে নয়, প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন নেয়ামত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের জন্যও অনাবিল আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা রেখেছেন। আখিরাতে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন নেয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদের সুরা মুহাম্মদের ১৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে ‘মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো

সেখানে থাকবে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর ---- ।'

মানুষের সুস্থ সবল দেহের জন্য ডিম, দুধ ও মাংসের বিকল্প নেই। এগুলো পশুপাখি পালনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এজন্য গাভীকে দুধের কল, হাঁস-মুরগিকে ডিমের ভান্ডার এবং মোরগকে গরীবের এলার্ম ঘড়ি হিসেবে অভিহিত করা হয়। এছাড়া দান-সদকা হিসেবে, মেহমানের মেহমানদারী করার জন্য এবং আকীকার মত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্যও পশুপাখির প্রয়োজন হয়। দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য পাখির মাংস ও ডিম পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নবী হযরত ইউনুস (আঃ) এর ৪০ দিন মাছের পেটে অবস্থান সকলেরই জানা আছে। তিনি যখন মাছের পেট হতে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বের হয়ে আসেন তখন তিনি সমূদ্র উপকূলে এক বালুচরে অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন। সে সময় নিকটস্থ জঙ্গল হতে একটি বকরী এসে দুধ পান করানোর পরে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেন। তাছাড়া নূহ (আঃ) এর সময় যে বিরাট প্লাবন হয় সে সময় কিশতীতে জোড়ায় পশুপাখি উঠানো হয়। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ও অর্থ ছিল পশুপাখিকে রক্ষা ও তাদের বংশ বিস্তারের অবস্থা অব্যাহত রাখা। পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পশুপাখি পালনের মাঝে যে অফুরন্ত নিয়ামত রয়েছে তা আমরা জানতে পারি। অতএব দেখা যায়, পবিত্র কোরআন ও হাদিসে পশুপাখি পালন সম্বন্ধে বিশেষ তাগিদ আছে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যই পশুপাখি পালন করা উচিত এবং মানুষের জন্য এটা করণীয়, বরণীয় ও অবশ্য পালনীয় কাজ।

১৪.১.২ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পশুপাখির অধিকার

মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি মানবজাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যান্য পশুপাখি সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতির ন্যায় পশুপাখিও আল্লাহর সৃষ্ট পরিবারে সদস্য। মানবজাতি প্রয়োজনে তাদের ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। কেননা পশুপাখির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা, তাদের ব্যবহারও করতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী। ইসলামী আইনে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানবজাতির বিভিন্ন অধিকার প্রদানের পাশাপাশি পশুপাখির অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পশুপাখির প্রতিও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আর পশুপাখির প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর তা হল তাদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশ্রাম নিশ্চিত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। আর আল্লাহর বিধান ব্যতীত তাদেরকে হত্যা না করা এবং তাদের কোন প্রকার জুলুম না করা। আর এ সকল বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করতে পারলে মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পশুপাখি থেকে কাঙ্খিত উপকার লাভ করতে পারবে। মানবজাতির ন্যায় পশুপাখি আল্লাহর পরিবারের সদস্য (আল-কোরআন, ৬:৩৮)। তাদেরও এ পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আছে। অধিকার আছে আল্লাহর প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণের, অধিকার রয়েছে সুন্দরভাবে বসবাসের। আর আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে পশুপাখি থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন (চতুষ্পদ জন্তুর মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে আল-কোরআন ২২ নং সুরা আল হাজ্জ এর ৩৬ নং আয়াতে; চতুষ্পদ জন্তুর দুধ পানে বিষয়টি উল্লেখ আছে আল-কোরআন ২৩ নং সুরা মু'মিনুন এর ২১ নং আয়াতে; জীবজন্তুর চামড়ার ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ আছে আল-কোরআন ১৬ নং সুরা নাহাল এর ৮০ নং আয়াতে; জীবজন্তুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে আল-কোরআন ১৬ নং সূরা নাহাল এর ০৭ নং আয়াতে)। আর তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মানবজাতিকে পশুপাখির প্রাপ্য অধিকার প্রদান কতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন (আল-কোরআন, ৬ নং সুরা আন'আম, আয়াত ১৬৫)। আর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের দায়িত্ব সকলের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা। ইসলাম মানবজাতির ন্যায় পশুপাখিকেও বিভিন্ন অধিকার প্রদান করেছে। তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার দিয়েছে, খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং সকল প্রকার কষ্ট থেকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। নিম্নে তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

পশুপাখিকে খাদ্য প্রদান: মহান আল্লাহ তায়াল আকাশ, জমীন, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালার মাধ্যমে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণির খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানবজাতির অব্যবস্থাপনার জন্য তার দেয়া জীবিকা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। তাই মানবজাতির অধীনে যে সকল পশুপাখি রয়েছে, তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন যা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় (আল-কোরআন, ২০ নং সুরা ত্বা-হা, আয়াত ৫৩)। তোমরা নিজেরা তা খাও এবং তাতে তোমাদের গবাদিপশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে (আল-কোরআন, ২০ নং সুরা ত্বা-হা, আয়াত ৫৪)। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা তার সকল সৃষ্টির খাদ্য উৎপাদনের জন্য বাতাস প্রেরণ করেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন (আল-কোরআন, ২৫ নং সুরা ফুরকান, আয়াত ৪৮-৪৯) এবং তার মাধ্যমে শস্য, শাক-সবজি, ফল-মূল, গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ঘাস ও ঘন উদ্যান সৃষ্টি করেন (আল-কোরআন, ৮০ নং সুরা আ'বাসা, আয়াত ২৪-৩২)। পশুপাখিকে খাদ্য প্রদান প্রসঙ্গে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। সাহল ইবনুল হানযালিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার অনাহারে পেট-পিঠ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, নির্বাক পশুদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। এদেরকে দানাপানি দিয়ে সুস্থ-সবল রাখ ও সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহন কর এবং খাওয়ার সময় সুস্থ-সবল পশুর মাংস খাও (ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: জিহাদ, পরিচ্ছেদ: মা'য়ূ'মারুবিহি মিনাল মিয়াম আলা দাওয়াইবি আল বাহাইম, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৫৫০)।

ইসলামী আইনে পশুপাখিদেরকে খাদ্য প্রদান করলে তার জন্য পুরস্কার (ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৫০)। আর খাদ্য প্রদান না করে কষ্ট দিলে শাস্তির ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে (ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, অধ্যায়: আস সালাম, পরিচ্ছেদ: তাহরীম কাতালা আল হিররাতু, বৈরূত: দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি.,হাদীস নং-৫৯৮৯)। পশুপাখির খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লখ করা যায় যে, আমরা অধিক ফলনশীল গম, ধান, কুমড়া, টমেটো, গেলআলু ইত্যাদির বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করি এবং দেশে গবেষণা করে উন্নয়নের চেষ্টা করছি। অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হয়েছে। বিদেশে বহু ঘাস ও পশুপাখির খাদ্য গবেষণা করে বের করা হয়েছে যাতে কম খরচে অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। আমাদের দেশে পশুর প্রধান খাদ্য হল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্বা জাতীয় ঘাস। দুর্বা ঘাসের উৎপাদন হয় কম ও ঘাসের বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থর। একমাসে দুর্বা ঘাস দুই ইঞ্চি বাড়ে না। নেপিয়ার নামীয় এক প্রকার ঘাস বের হয়েছে যা প্রতিমাসে তিন ফুটের বেশি বৃদ্ধি পায়। ট্রেন, বাস ও এরোপ্লেনের যুগে ঘোড়া বা গাধায় চড়ে হজ করতে রওয়ানা হওয়া যেমন অনভিপ্রেত, বর্তমানে নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন চেষ্টা না করে দুর্বা ঘাসের উপর নির্ভর করে থাকা তেমনি বোকামি। অথচ এ বোকামি আমরা সমগ্র জাতি মিলে করছি। পশুখাদ্য এবং ঘাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা জাহিলিয়াত অতিক্রম করে আলোর জগতে আসতে পারি। এজন্য আমাদের সনাতন পশুখাদ্য দুর্বাঘাস উৎপাদনের উপর নির্ভর না করে অধিক ফলনশীল ঘাস যেমন নেপিয়ার, পারা, গিনি ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

পশুপাখি পবিত্র অবস্থায় ভক্ষণ করা: পশুপাখি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরুপ। যদি তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করতে হয় তাহলে অবশ্যই সুস্থ-সবল অবস্থায় গ্রহণ করতে হবে। কেননা খাদ্য যদি পুত-পবিত্র না হয়, তবে তা শরীরের জন্যও ক্ষতির কারণ হবে এবং তার দ্বারা মানবিক তৃপ্তিও আসবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে রাসুলগণ! পবিত্র আহার করুন এবং সৎকাজ করুন; আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত (আল-কোরআন, ২৩ নং সুরা মু'মিনুন, আয়াত ৫১)। 'ত্বায়িবাতি'-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'ত্বায়িবাতি' অর্থ পবিত্র, হালালদ সুস্বাদু ও বৈধ। অর্থাৎ তোমরা হারাম ও অপবিত্র আহার্য ভক্ষণ করো না (কাজী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাজহারী, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১৩২)। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তারই ইবাদতকারী হয়ে থাক (আল-কোরআন, ১৬ নং সুরা নাহাল, আয়াত ১১৪)। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে

আরো ইরশাদ করেন, হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (আল-কোরআন, ২ নং সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৮)। পশুপাখি জবেহ-এর সময় অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে (আল-কোরআন, ২২ নং সুরা হাজ্জ, আয়াত ৩৪) এবং ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে, যাতে পশুপাখির কষ্ট কম হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হতে পারে (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আস সায়্যিদু আয-যাবাহি, পরিচ্ছেদ: আল আমরি বিইহসানি আয যাবহি আল কাতলি ওয়া তাহদিদি আশ শাফরাতি, প্রাগুক্ত, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭২, হাদীস নং ৫১৬৭)। আর শিকারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর মাধ্যমে শিকার করতে হবে (আল-কোরআন, ৫ নং সুরা মায়িদা, আয়াত ৪)।

১৪.২ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও নীতিমালা

বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল। প্রতিটির উল্লেযোগ্য অংশ তুলে ধরার পর সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালা হুবহু সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণার জন্য এই হুবহু সন্নিবেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার হুবহু সন্নিবেশনে মুদ্রণজনিত কোন ভুল হয়ে থাকলে সরকারের মূল প্রকাশনা (http://bdlaws.minlaw.gov.bd) অনুসরণের অনুরোধ করা হলো। তাছাড়া, এ সমস্ত আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

- The Cruelty to Animals Act, 1920
- The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962
- The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982
- পশুরোগ আইন, ২০০৫ এবং পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫
- National Livestock Development Policy, 2007
- জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০
- পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩

১৪.২.১ The Cruelty to Animals Act, 1920

This is an Act, number 1 of 1920. After several revision, the last revision of this Act has been made by Act number 8 of 1973. This Act is to consolidate and amend the law relating to the prevention of cruelty to animals in Bangladesh.

Government of the People's Republic of Bangladesh

The Cruelty to Animals Act, 1920

(Act No. I of 1920)

[*25th February, 1920*]

[1]An Act to consolidate and amend the law relating to the prevention of cruelty to animals in Bangladesh. WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to the prevention of cruelty to animals in Bangladesh; It is hereby enacted as follows:-

Preliminary

Short title, commencement and extent	1. (1) This Act may be called the [2][***] Cruelty to Animals Act, 1920. (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, direct. (3) Except as otherwise hereinafter provided, this Act may be extended by the Government by notification, to any town or place in Bangladesh.
[Repealed]	2. [Omitted by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).]
Definitions	3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,- (1) 'animal' means any domestic or captured animal; [3][***] (4) 'notification' means a notification published in the Official Gazette.

Offences

Penalty for cruelty to animals and for sale of animals killed with unnecessary cruelty	4. If any person- (a) overdrives, cruelty or unnecessarily beats, or otherwise ill-treats any animal, or (b) binds, keeps or carries any animal in such a manner or position as to subject the animal to unnecessary pain or suffering, or (c) offers, exposes or has in his possession for sale any live animal which is suffering pain by reason of mutilation, starvation, thirst, overcrowding or other ill-treatment, or any dead animal which he has reason to believe to have been killed in an unnecessarily cruel manner, he shall be punished for every such offence with fine which may extend to one hundred Taka, or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both.
Penalty for overloading animals	5. If any person overloads any animal he shall be punished with fine which may extend to one hundred Taka, or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both, and (1) if the owner of that animal, and (2) if any person who, as a trader, carrier or contractor, or who, in virtue of his employment by a trader, carrier or contractor, is in possession of that animal or in control over the loading of it, permits such overloading, he shall be punished with fine which may extend to one hundred Taka. Explanation- For the purposes of this section an owner or other person referred to in clauses (1) and (2) above shall be deemed to have permitted overloading if he shall have failed to exercise reasonable care

	and supervision in respect of the protection of the animal therefrom.
Penalty for practising phuka	6. If any person performs upon any cow or other milch animal the operation called phuka he shall be deemed to have committed a cognizable offence and, shall be punished with fine which may extend to five hundred Taka, or with imprisonment for a term which may extend to two years, or with both, and the owner of the cow or other milch animal and any person in possession of or control over it shall be liable to the same punishment and the cow or the milch animal on which the operation of phuka was performed shall be forfeited to Government: Provided that in the case of a second or subsequent conviction of a person under this section, such person shall be punished both with fine which may extend to five hundred Taka and with imprisonment which may extend to two years.
Disposal of portion of fine	[4][6A. A portion of the fine if realized from the person convicted under section 6 may be given to the person whose information led to the detection of the crime against section 6.
Condition for granting licences for cattle-sheds	6B. It shall be lawful for [5][a Paurashava] in towns or places where this Act applies to refuse to grant or renew licenses for cattle-sheds in buildings with boundary walls or when granting or renewing such licences to insist upon the licensees to keep the cattle-sheds open on all sides to facilitate the detection of any offence against section 6.]
Penalty for killing animals with unnecessary cruelty	7. If any person kills any animal in an unnecessarily cruel manner he shall be punished with fine which may extend to two hundred Taka, or with imprisonment for a term which may extend to six months, or with both: Provided that nothing in this section shall render it an offence to kill any animal in a manner required by the religion or religious rites and usages of any race, sect, tribe or class, or for any bona fide scientific purpose or for the preparation of any medicinal drug.
Penalty for being in possession of the skin of a goat killed with unnecessary cruelty	8. If any person has in his possession the skin of a goat, and has reason to believe that the goat has been killed in an unnecessarily cruel manner so as to constitute an offence under section 7, he shall be punished with fine which may extend to one hundred Taka, or with imprisonment which may extend to three months, or with both, and the skin shall be confiscated.
Presumptions as to possession of the skin of a goat	9. (1) If any person is charged with the offence of killing a goat contrary to the provisions of section 7, and it is proved that such person had in his possession, after the offence was alleged to have been committed, the skin of a goat with any part of the skin of the head attached thereto, it shall be presumed, until the contrary be proved, that such goat was killed in an unnecessarily cruel manner.

	(2) If any person is charged with an offence against section 8, and it is proved that such person had in his possession, at the time of the alleged offence, the skin of a goat with any part of the skin of the head attached thereto, it shall be presumed, until the contrary be proved, that such goat was killed in an unnecessarily cruel manner, and that the person in possession of such skin had reason so to believe.
Penalty for employing animals unfit for labour	10. If any person employs in any work or labour any animal which by reason of any disease, infirmity, wound, sore or other cause is unfit to be so employed, he shall be punished with fine which may extend to one hundred Taka, and (1) if the owner of that animal, and (2) if any person who, as a trader, carrier or contractor, or who, in virtue of his employment by a trader, carrier or contractor, is in possession of that animal or in control over the employment of it, permits such employment, he shall be liable to the same punishment. Explanation- For the purposes of this section an owner or other person referred to in clauses (1) and (2) above shall be deemed to have permitted such employment if he shall have failed to exercise reasonable care and supervision in respect of the protection of the animal therefrom.
Penalty for baiting animals, or inciting them to fight	11. If any person- (a) incites any animal to fight, or (b) baits any animal, or (c) aids or abets any one in such incitement or baiting, he shall be punished with fine which may extend to fifty Taka.
Penalty for allowing diseased animals to go at large or to die in public places	12. If any person wilfully allows any animal of which he is the owner or of which he is in charge to go at large in any public place while the animal is affected with contagious or infectious disease, or without reasonable excuse, allows any diseased or disabled animal of which he is the owner or of which he is in charge to go at large or die in any public place, he shall be punished with fine which may extend to one hundred Taka.
Penalty for working buffaloes during prohibited period	[6][12A If any person employs a buffalo for draught purposes between such hours during such period as may be prescribed he shall be punished for every such offence with fine which may extend to fifty Taka.]

Weighbridges and Infirmaries

Weighbridges	13.(1) The Government may appoint the places which weighbridges shall be established for the detection of cases of overloading of animals,

	and may also declare, by notification, the limits of the areas for which such weighbridges are established. (2) The Government may erect weighbridges at the places so appointed, and may acquire, by purchase or otherwise, existing weighbridges erected by any person and maintain them for the purposes of sub-section (1).
Infirmaries	14. The Government may, by general or special order, appoint places to be infirmaries for the treatment and care of animals in respect of which offences against this Act are believed to have been committed.
Power of Government to appoint Veterinary Inspectors and weighbridge-officers	15. The Government may appoint such persons as they think fit,- (a) to be Veterinary Inspectors for carrying into effect the provisions of this Act, and may declare the areas within which such officers shall exercise their powers under this Act and the areas of which they shall be in charge; (b) to be weighbridge-officers, to have charge of any weighbridge or weighbridges established under section 13.
Animal, etc, to be taken to weighbridge in case of overloading	16. Within the limits of any area for which a weighbridge has been established under section 13, any Police-officer, or any other person duly authorized by the Government in this behalf, who has reason to believe that an offence against section 5 is being committed in respect of any animal, shall seize and take it, together with its load and the person in charge of the animal, to such weighbridge, and shall cause the load to be weighed on the weighbridge in the presence of such person.
Excess load to be removed in case of overloading	17. (1) If the weighbridge-officer is not satisfied that an offence against section 5 has been committed, he shall inform the police-officer or person who seized the animal accordingly, and that officer or person shall forthwith release the animal and load. (2) If the weighbridge-officer is satisfied that an offence against section 5 has been committed, he shall cause the excess load to be removed.
Unfit animal to be taken to Veterinary Inspector	18. Any Police-officer, or any other person duly authorized by the Government in this behalf, who has reason to believe that an offence against section 10 is being committed in respect of any animal shall seize and take it, together with its load, if any, and the person in charge of the animal, to the weighbridge, if any, appointed for the area, within which such seizure is made, or in the case of there being no weighbridge appointed for the area, to the nearest police station, and shall remove the load forthwith and report the fact of such seizure to the Veterinary Inspector in charge of that area.
Excess load to be treated as unclaimed property in	19. (1) Any excess load removed from an animal under section 17, sub-section (2) and any load which was being carried by an animal seized under section 18, and taken to the weighbridge, shall be kept by the weighbridge-officer, at the risk of the owner of such load, at the

certain circumstances	weighbridge, or at any other place appointed by the Government for the purpose, and, the weighbridge-officer shall by written notice direct the owner of the load to remove it form the weighbridge within a period to be specified in such notice. (1a) At any time before the expiration of the period referred to in sub-section (1) the owner of the load may remove it free of charge from the weighbridge. (1b) the weighbridge-officer may, at the request of the owner of the load referred to in sub-section (1), forward the load to its destination on payment by the owner of all costs incurred or liable to be incurred in its removal, detention and forwarding. (1c) If the load is not removed from the weighbridge within the period referred to in sub-section (1) it shall be made over by the weighbridge-officer to the police or any person duly authorized by the Government in this behalf. (2) Any load which was being carried by an animal seized under section 18 and taken to a police-station, shall be kept by the officer in charge of the police-station, at the police-station, or at any other place appointed by the Government for this purpose. The said load shall be kept during the first forty-eight hours of such detention at the risk of the owner thereof, and he may remove the same during that period free of charge. (3) (a) The officer in charge of the police-station or the person authorized under sub-section (1), in the case of any load made over to him by the weighbridge officer, and (b) the officer in charge of the police-station, in the case of any load kept by him under sub-section (2) which has not been removed by the owner within forty-eight hours, shall enter, in a register to be kept for the purpose, such particulars of the load as may be prescribed by rules made under section 29 and the load shall thereafter be returned to the person who proves to the satisfaction of the person authorized by the Government in this behalf that the same belongs to him, on payment of all costs incurred in the removal and detention of such load: Provided that if the load, or any part thereof, consisted of articles which are subject to speedy and natural decay, or consists of livestock, that load, or part thereof, may forthwith be sold or otherwise disposed of under the orders of the person authorized by the Government in this behalf in accordance with rules made under section 29; and the sale-proceeds, after deducting therefrom all expenses incurred in the removal, detention and sale of the entire load, shall be made over to the owner, on proof of his ownership, within six months from the date of entry in the Register. (4) All costs for the removal, detention and forwarding of all loads

	under this section shall be payable by the owner of the goods according to such scale of rates as the Government may prescribe by rules made under section 29.
Disposal of sale-proceeds	20. If within six months from the date of entry in the register no person satisfies the person authorized under sub-section (3) of section 19 that he is the owner of the load, the person authorized, may cause it to be sold or otherwise disposed of in accordance with rules made under section 29, and the proceeds of the sale under this section, or of the sale under the proviso to sub-section (3) of section 19, after deducting therefrom all expenses, shall be applied in such manner as the Government may prescribe by rules made under section 29.
Production of animal for examination by Veterinary Inspector	21. (1) Any police-officer, or any other person duly authorized by the Government in this behalf, who has reason to believe that an offence against this Act has been or is being committed in respect of any animal, may, if the circumstances so require, seize the animal and produce the same for examination by the Veterinary Inspector in charge of the area in which the animal is seized. (2) The police-officer or person who seizes any animal under sub-section (1) may require the person in charge of the animal to accompany it to the place of examination.
Examination of animals by Veterinary Inspector	22. (1) For the purposes of the examination of an animal sent to a Veterinary Inspector in accordance with the provisions of section 21, he may submit the animal to any test which the Government may prescribe by rules made under section 29. (2) If on such examination, the Veterinary Inspector is of opinion that the animal is unfit to be employed on the work or labour on which it was employed at the time of its seizure, he shall either send the animal for treatment and care to an infirmary appointed under section 14, and inform the owner of the animal of his having done so, or (if he considers that a prosecution is necessary, or if the owner of the animal so elects) direct the prosecution of the offender and produce the animal before the Magistrate.
Power of Magistrate to send animal to infirmary	23. The Magistrate before whom a prosecution for any offence under this Act has been instituted may, if he thinks fit, direct that the animal, in respect of which the offence is alleged or proved to have been committed, shall be sent for treatment and care to an infirmary appointed under section 14.
Detention and cost of treatment of animals at	Power of Magistrate to send animal to infirmary 24. (1) When any animal has been sent to an infirmary in accordance with the provisions of section 22, sub-section (2), or of section 23, it shall be detained there until, in the opinion of the officer in charge of

infirmaries	the infirmary, it is cured, or again fit for the work or labour on which it is the intention of the owner to employ it. Detention and cost of treatment of animals at infirmaries (2) The cost of the treatment, feeding and watering of the animal in the infirmary shall be payable by the owner of the animal, according to such scale of rates as the Government may prescribe. (3) If the owner refuses or neglects to pay such cost, or to remove the animal within such time as the officer in charge of the infirmary may prescribe, that officer may direct that the animal be sold and the proceeds of the sale be applied to the payment of such cost. (4) The surplus, if any, of the proceeds of the sale shall, on application to be made by the owner within two months after the date of the sale, be paid to him; but the owner shall not be liable to make any payment in excess of the proceeds of the sale. (5) If no application is made by the owner for the surplus sale-proceeds within the period prescribed under sub-section (4), these proceeds shall be applied in such manner as the Government may prescribe by rules made under section 29. (6) if an animal cannot be sold under sub-section (3) the officer in charge of the infirmary may dispose of it in such manner as the Government may prescribe by rules made under section 29.
Destruction of suffering or unfit animals	25. (1) When any Magistrate has reason to believe that an offence against this Act has been committed in respect of any animal, the Magistrate, may direct the immediate destruction of the animal, if, in his opinion, its physical condition is such as to render such a direction proper. (2) When any animal is sent to an infirmary in accordance with the provisions of section 22, sub-section (2), or of section 23, the officer in charge of the infirmary may direct the immediate destruction of the animal, if, in his opinion, its physical condition is such as to render such direction proper, or if he considers it to be permanently unfit for work by reason of old age or some incurable disease: Provided that no order directing destruction shall be made in respect of any bull, bullock or cow which is unfit for work by reason only of old age. (3) Any police-officer who finds any animal so diseased, or so severely injured, or in such a physical condition, that it cannot without cruelty be removed, shall, if the owner is absent or refuses to consent to the destruction of the animal, at once summon the Veterinary Inspector in charge of the area in which the animal is found and, if the Veterinary Inspector certifies that the animal is mortally injured, or so severely injured, or so diseased, or in such a physical condition, that it is cruel to

	keep it alive, the police-officer may, without the consent of the owner, kill the animal or cause it to be killed.

Procedure

Arrest of offenders	26. (1) Any police-officer may arrest without a warrant any person committing in his view any offence against this Act, or any person against whom he has received credible information of having committed an offence against this Act, if the name and address of the accused person is unknown to the officer, and if such person, on demand, declines to give his name and address or gives a name and address which such officer has reason to believe to be false. (2) When the true name and address of a person arrested under sub-section (1) have been ascertained, he shall be released on his executing a bond, with or without sureties, to appear before a Magistrate if so required: Provided that if such person is not resident in Bangladesh, the bond shall be secured by a surety or sureties resident in Bangladesh. (3) If the true name and address of such person is not ascertained within twenty-four hours from the time of arrest, or if he fails to execute the bond, or if so required, to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest Magistrate having jurisdiction.
Special power of search and seizure in respect of certain offences	27. If a police-officer, not below the rank of Sub-Inspectors, has reason to believe that an offence against section 7 in respect of a goat is being or is about to be, or has been, committed in any place, or that any person has in his possession the skin of a goat with any part of the skin of the head attached thereto, he may enter and search such place or any place in which he has reason to believe any such skin to be, and may seize any such skin and any article or thing used or intended to be used in the commission of such offence.
Search warrants	28. (1) If a Magistrate of the first class upon information in writing and after such inquiry as he thinks necessary, has reason to believe that an offence against section 6, section 7 or section 10 is being or is about to be, or has been, committed in any place, he may, at any time by day or by night, without notice, either himself enter and search, or, by his warrant, authorize any police-officer above the rank of a constable to enter and search, the place. (2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, relating to searches under that Code shall, so far as those provisions can be made applicable, apply to a search made under sub-section (1) or under section 27.

Rules

Power of Government to make rules	29. (1) The Government may, from time to time, make rules to carry out the purposes of this Act. (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Government may make rules- (a) prescribing the maximum weight of the loads to be carried on or drawn by animals; (b) for preventing the overcrowding of animals; [7][(bb) prescribing the period during which and hours between which buffaloes shall not be used for draught purposes;] (c) for regulating the use of tests and the manner of examination of animals; (d) prescribing the qualifications of persons to be appointed to be Veterinary Inspectors an weighbridge-officers; (e) prescribing the procedure to be followed after removal of a load under section 17, sub-section (2), or under section 18; (f) prescribing the particulars to be entered in the register maintained under section 19, sub-section (3); (g) prescribing such other forms or registers as may be required for carrying out the purposes of this Act; (h) for carrying out the provisions of the proviso to sub-section (3) of section 19 and of section 20 in regard to the disposal of loads; [8][(hh) prescribing the scale of rates of all costs and charges payable under section 19;] (i) prescribing the manner in which fines realized under this Act and sale-proceeds realized under section 20 and section 24, sub-section (5), shall be applied; (j) for carrying out the provisions of section 24, sub-section (6), in regard to the disposal of animals; and (k) for regulating the destruction of animals under section 25.

Miscellaneous

Delegation of powers	30. The Government may delegate, under such restrictions as they consider fit, any of the powers conferred upon them by sections 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 and 24 , sub-section (2), of this Act to any person or local authority.
Appointments made by local	31. Every appointment made by a local authority under section 15, in exercise of the power delegated to it under section 30, shall be deemed

authority	to be an appointment made under the Act by which such local authority is constituted.
Limitation of time for prosecutions	32. A prosecution for an offence against this Act shall not be instituted after the expiration of three months from the date of the commission of such offence.
Persons appointed under sections 15, 16, 18 or 21 to be public servants	33. Every person appointed under section 15, 16, 18 or 21 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the [9][Penal Code].
Indemnity	34. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person who is, or who has been declared to be , a public servant within the meaning of section 21 of the [10][Penal Code] for anything which is, in good faith, done or intended to be done under this Act.
Power of local authority to pay certain expenses	35. Notwithstanding anything contained in the Municipal Administration Ordinance, 1960, or the Basic Democracies Order, 1959, the [11][Paurashava or the Zilla Board] may provide from the funds at their disposal such sums as may be necessary for paying the expenses incidental to the exercise of any of the powers delegated to them under section 30.
Effect when Act is extended	36. Whenever this Act is extended to any town or place under section 1, sub-section (3), the Government may, by notification, appoint persons, either by name or by official designation, to exercise and perform in such town or place the powers and duties as are conferred or imposed by sections 19, 20, 25 and 28 of this Act.

[1] Throughout this Act, except otherwise provided, the words `Bangladesh`, `Government` and `Taka` were substituted, for the words `East Pakistan` or `Pakistan`, `Provincial Government` and `rupees` or `Rs.` respectively by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)
[2] The word `Bengal` was omitted by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision and Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)
[3] Clauses (2) and (3) were omitted by East Pakistan Repealing and Amending Ordinance, 1962 (Ordinance No. XIII of 1962)
[4] Sections 6A and 6B were inserted by the Bengal Cruelty to Animals (Amendment) Act, 1938 (Act No. I of 1938)
[5] The words `a Paurashava` were substituted, for the words and comma `a Municipal Committee or Town Committee, as the case may be` by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)
[6] Section 12A was inserted by the Bengal Cruelty to Animals (Amendment) Act, 1926 (Act No. VII of 1926)
[7] Clause (bb) was inserted by section 6 of the Bengal Cruelty to Animals (Amendment) Act, 1926 (Act No. VII of 1926)
[8] Clause (hh) was inserted by section 6 of the Bengal Cruelty to Animals (Amendment) Act, 1926 (Act No. VII of 1926)
[9] The words `Penal Code` were substituted, for the words `Pakistan Penal Code` by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)
[10] The words `Penal Code` were substituted, for the words `Pakistan Penal Code` by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

[11] The words `Paurashava or the Zilla Board` were substituted, for the words `Municipal Committee or the District Council` by section 3 and 2nd Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

১৪.২.২ The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962

This is an East Pakistan ordinance, number 15 of 1962. It is revised by Bangladesh President's Order number 48 of 1972. This ordinance is for the constitution of the Bangladesh society for the prevention of cruelty to animals.

Government of the People's Republic of Bangladesh

The Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962

(East Pakistan Ordinance No. XV of 1962)

[*19th May, 1962*]

An Ordinance for the constitution of the Bangladesh Society for the Prevention of Cruelty to Animals.[1] Whereas it is expedient to constitute a [2][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals, for the purpose and in the manner hereinafter appearing; Now, Therefore, in pursuance of the Presidential Proclamation of the seventh day of October, 1958, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Governor is pleased to make and promulgate the following Ordinance, namely:-

Short title, extent and commencement	1. (1) This Ordinance may be called the [3][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, 1962. (2) It extends to the whole of Bangladesh. (3) It shall come into force at once.
Definitions	2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) 'animal' means any domestic or captured animal except poultry; (b) "Branch Society" means the Branch of the [4][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals for a district constituted under section 11; and (c) "Society" means the [5][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals constituted under section 3.
Constitution of the [6][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals	3. (1) There shall be constituted a Society to be known as 'the [7][***] Society for the Prevention of Cruelty to animals'. (2) [8][The President of the People's Republic of Bangladesh] shall be the Chairman of the Society and the first members thereof shall be appointed either by name or by office by the Government. (3) The headquarters of the Society shall be at Dacca.
Incorporation	4. The first members of the Society and all persons who may hereafter become members thereof so long as they continue so to be, shall be a body corporate under the name of the [9][***] Society for the Prevention

	of Cruelty to Animals, and the said body shall have perpetual succession and a common seal with powers to hold and acquire property, movable or immovable, and shall sue and be sued by the said name.
Functions of the Society	5. Subject to the provisions of this Ordinance, and of the Bengal Cruelty to Animals Act, 1920, the functions of the Society shall include, (a) the exercise of such powers as may be delegated to it under section 30 of the Bengal Cruelty to Animals Act, 1920; (b) the arrangement for the proper treatment and care of animals; (c) the education of the general public in the proper care, treatment and destruction of animals; and (d) the exercise of such powers and performance of such duties as may be prescribed by rules.
Appointment of Executive Committee	6. (1) Until such time as an Executive Committee of the Society is constituted in accordance with the regulations made under section 7, the Executive Committee shall consist of such persons from among the members of the Society as may be nominated by the Government. (2) The Government may nominate as office-bearers of the first Executive Committee such persons as it may select for the purpose: Provided that the Government may reconstitute the first Executive Committee as and when it is deemed necessary
Power to make regulation	7. The first Executive Committee shall, subject to the previous approval of the Government, make regulations for the management, control and procedure of the Society. Such regulations may, among other matters, provide for the following, namely:- (a) the conditions of membership of the Society; (b) the constitution and functions of the Executive Committee; and (c) the regulation of the procedure generally of the Society and the Executive Committee.
[10][Repealed]	8. [Dissolution and transfer of property of the E.P. Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Dacca.- Repealed by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).]
Fund	9. (1) There shall be a fund to be known as the Society Fund which shall vest in and be administered by the Society. (2) The Society Fund shall consist of- (a) grants and subsidies from Government, Local Authorities and other bodies; (b) donations from the public; (c) subscriptions from members; and (d) contributions from Branch Societies.
Purposes to which the funds of the society may be applied	10. The funds of the Society may be applied to all or any of the following purposes, namely:- (a) the acquisition of lands, buildings and other properties necessary for the proper working of the Society;

	(b) the payment of establishment charges, contingent charges and all other working charges of the Society; (c) the meeting of all expenses that are necessary for the proper discharge of the functions of the Society under this Ordinance; and (d) the making of grants to the Branch Societies when considered necessary.
Branch Society	11. (1) There shall be a branch of the [11][***] Society for the Prevention of Cruelty to Animals for every district [12][***]. (2) The Deputy Commissioner of the district shall be the Chairman of the Branch Society, and the first members thereof shall be appointed either by name or by office by the Deputy Commissioner.
[13][Repealed]	12. [Distribution of income among Branch Societies.- Repealed by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973).]
Decision of Executive Committee as to purposes final	13. The Executive Committee of the Society shall have authority to determine in all cases what matters properly fall within the scope of section 10, and its decision in all such matters shall be binding on all the Branch Societies.
Receipt and use of gifts	14. The Executive Committee of the Society may also receive and hold gifts of whatever description either for the general purposes of the Society, and [14][***] on receipt of such gifts, may, subject to such conditions as may be prescribed, apply the same to such purposes either directly or through the Branch Societies.
Powers of Branch Societies	15. Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, and subject to the regulations of the Society made under section 7, each Branch Society shall have all powers to regulate its own procedure and constitution, to receive gifts and donations, and to expend all monies received by it for its purposes: Provided that 10 per cent of cash donations received by any Branch Society for any of the objects set out in section 10 shall be placed at the disposal of the Executive Committee of the Society to be applied by it for the general purposes of the Society.
Audit	16. (1) The accounts of the Society and of the Branch Societies shall be audited annually by an Auditor to be appointed by the Executive Committee of the Society with the prior approval of the Government. (2) The Society and the Branch Societies shall produce all accounts, books and connected documents and furnish such other information and explanations as the Auditor or any officer authorised by him in this behalf may require at the time of the audit. (3) A statement of accounts audited by the Auditor referred to in sub section (1), and containing such particulars as may be prescribed by

	rules shall be furnished to the Government as soon as possible after the end of every financial year. (4) The Government shall examine the Auditor's Report and take such action thereon as it may deem fit.
Power to make rules	17. (1) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance. (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:- (a) the powers and duties to be exercised and performed by the Society; (b) the distribution of the income of the Society amongst the Branch Societies; (c) the application of gifts received by the Executive Committee of the Society; (d) the audit of the accounts of the Society and of the Branch Societies; and (e) the extent and control of the supervision of the Branch Societies by the Society.

[1] Throughout this Ordinance, the words "Bangladesh" and "Government" were substituted for the words "East Pakistan" and "Provincial Government" respectively by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

[2] The words "East Pakistan" were omitted by Article 5 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[3] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[4] The words "East Pakistan" were omitted by Article 5 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[5] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[6] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[7] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[8] The words "The President of the People's Republic of Bangladesh" were substituted for the words "The Governor of East Pakistan" by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

[9] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[10] The words "East Pakistan" were omitted by Article 5 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[11] The words "East Pakistan" were omitted by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

[12] The words "in East Pakistan" were omitted by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

[13] The words "East Pakistan" were omitted by Article 6 of the Bangladesh (Adaptation of Existing Laws) Order, 1972 (President's Order No. 48 of 1972)

[14] The words, figures and commas "or for any particular purpose for which the corpus or income of the property vested in it under section 8 may be applied under the provisions of section 10, and," were omitted by section 3 and the Second Schedule of the Bangladesh Laws (Revision And Declaration) Act, 1973 (Act No. VIII of 1973)

১৪.২.৩ The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982

This is an ordinance, number 30 of 1982. This ordinance is to make provision for the regulation, control and registration of veterinary practitioners in Bangladesh and for the constitution fo a veterinary council and for matters connected therewtih.

Government of the People's Republic of Bangladesh

The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982

(Ordinance No. XXX of 1982)

[*7th September, 1982*]

An Ordinance to make provision for the regulation, control and registration of Veterinary practitioners in Bangladesh and for the constitution of a Veterinary Council and for matters connected therewith. Whereas it is expedient to make provision for the regulation, control and registration of veterinary practitioners in Bangladesh and for the constitution of a Veterinary Council and for matters connected therewith; Now, Therefore, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Chief Martial Law Administrator is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

Short title	1. This Ordinance may be called the Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982.
Definitions	2. In this Ordinance unless there is anything repugnant in the subject or context,- (a) 'Council' means the Bangladesh Veterinary Council constituted under this Ordinance; (b) 'member means a member of the Council; (c) 'Prescribed' means prescribed by regulations made under this Ordinance; (d) 'President' means the President of the Council; (e) 'recognised Veterinary qualification" means any of the veterinary qualification included in the schedule; (f) 'register' means the register of veterinary practitioners maintained under this Ordinance; (g) 'registered veterinary practitioners' means a person whose name is for the time being entered in the register; (h) 'Registrar' means the person appointed as Registrar by the Council;

	and (i) 'Veterinary Institution' means any Institution which trains for, or grants, or both trains for and grants, degrees, diplomas or licence in Veterinary Science
Constitution of the Council	3. (1) There shall be constituted a Council which shall consist of the following members, namely:- (a) the Director of Livestock Services, ex-officio; (b) one Registered Veterinary Practitioner from each of the Administrative Divisions of Bangladesh, to be elected in the manner prescribed: Provided that the President shall have power to nominate a registered veterinary practitioner if no such practitioner is elected from any division under this clause; (c) one Registered Veterinary Practitioner, to be nominated by the Bangladesh Agricultural University; (d) the Dean of the Faculty of Veterinary Science of the Bangladesh Agricultural University, ex-officio; (e) the President of the Bangladesh Veterinary Association, ex-officio; (f) one member, belonging to the legal profession, to be nominated by the Chief Justice of Bangladesh; and (g) one member of the defence services possessing recognised veterinary qualification, to be nominated by the Bangladesh Army: Provided that for the constitution of the Council for the first time, all the members, other than the ex-officio members, shall be appointed by the Government. (2) The members shall elect a President from amongst themselves in such manner as may be prescribed: Provided that for the constitution of the Council for the first time, the President shall be appointed by the Government.
Incorporation of the Council	4. The Council shall be a body corporate by the name of the Bangladesh Veterinary Council, having perpetual succession and common seal with power to acquire and hold property, both movable and immovable and to contract, and shall, by the said name, sue and be sued.
Term of office	5. (1) The President shall hold office for a term not exceeding four years and not extending beyond the expiry of his term as member, and shall be eligible for re-election. (2) The President shall be deemed to have vacated office on the day the Council holds its meeting after its re-constitution. (3) The President may resign his office by notice in writing addressed to the Government and shall be deemed to have vacated office on such resignation being accepted by the Government. (4) A member, other than an ex-officio member, shall hold office for a term of four years from the date of his nomination or, as the case may be, election, or until his successor has been nominated or elected. (5) A member shall be eligible for re-election or, as the case may be, re-nomination.

	(6) A member, other than an ex-officio member shall vacate office if he- (a) resigns his office by notice in writing addressed to the President and the resignation is accepted by the President; (b) fails to attend three consecutive meetings of the Council without leave of absence granted by the Council; (c) remains out of Bangladesh for a continuous period exceeding one and a half year; (d) ceases to represent the particular interest for which he was elected or, as the case may be, nominated. (7) Any casual vacancy in the office of member, including the President caused by death, resignation, removal or otherwise shall be filled by election or, as the case may be, nomination and the person so elected or nominated shall hold office for the unexpired period of the term of office of his predecessor.
Meeting of the Council	6. (1) The Council shall meet at least twice in a year at such time and place, and shall be summoned in such manner, as may be prescribed: Provided that until regulations are made, the President may call a meeting of the Council by sending notice to each member. (2) To constitute a quorum at a meeting of the Council not less than five members shall be present. (3) All meetings of the Council shall be presided by the President and in his absence, by a member who is a Registered Veterinary Practitioner elected by the members present at the meeting. (4) All questions at a meeting of the Council shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the case of an equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote. (5) No act done by the Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Council.
Appointment of officers, etc	7. (1) The Council shall appoint a Registrar and such other officers and employees as it may consider necessary on such terms and conditions as may be prescribed. (2) The Registrar shall act as Secretary to the Council and shall, until another person is appointed as treasurer, also act as treasurer. (3) All persons appointed under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Penal Code (Act XLV of 1860).
Fund of the Council	8. (1) There shall be a fund of the Council to which shall be credited- (a) grants and loans from the Government; (b registration fees and other fees; (c) income from investments and properties; (d) aids and grants, if any, received from foreign countries with the prior approval of the Government. (2) The fund of the Council shall be utilised by the Council to meet the

	charges in connection with the functions of the Council and payment of salaries and allowances to its officers and employees. (3) The fund of the Council shall be kept in such bank or banks as may be approved by the Council. (4) The Council may invest its funds in such securities as may be approved by the Government.
Accounts and audit	9. (1) The Council shall maintain regular accounts of all moneys received and expended by it. (2) The accounts shall be audited every year by the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, hereinafter in this section referred to as the Auditor-General, in such manner as he deems fit. (3) For the purpose of an audit under sub-section (2), the Auditor-General or any person authorised by him in this behalf shall have access to all records, books, documents, cash, securities and other properties of the Council and may examine the President or any member officer or employee of the Council. (4) The Auditor-General shall, as soon as possible after the completion of the audit, send to the Council his audit report and the Council shall forward it, with its comments thereon, to the Government. (5) The Council shall take steps forthwith to remedy any defects or irregularities pointed out in the audit report.
Register of Veterinary Practitioner	10. (1) The Council shall, as soon as may be after its constitution, arrange for the registration of veterinary practitioners and, for that purpose, shall, by notification in the official Gazette and publishing notice in at least two daily newspapers of wide circulation, one in the Bengali Language and the other in the English Language, appoint a date on or before which applications for registration of names shall be made by veterinary practitioners possessing recognised veterinary qualification. (2) The names and addresses, the recognised veterinary qualification together with the dates on which such qualifications were acquired and the dates of registration of all veterinary practitioners registered under this Ordinance shall be entered in a register to be maintained by the Council for the purpose.
Custody and maintenance of register	11. (1) The Registrar shall maintain the register in such from and in such manner as may be prescribed and shall make form time to time such entries, corrections, alterations and modifications in the entries therein as may be necessary or as may be directed by the Council. (2) The Registrar may, for the purpose of carrying out his duties imposed under sub-section (1), call for any information he may require from any registered veterinary practitioner or a veterinary practitioner applying for registration.

Persons entitled to be registered	12. (1) Every person possessing a recognised veterinary qualification may, subject to the provisions of this Ordinance and on payment of such fees as may be prescribed, apply to the Council to have his name entered in the register. (2) Every person making an application under sub-section (1) shall- (a) satisfy the Council that he is in possession of a recognised veterinary qualification; (b) specify in his application the date on which he acquired the qualification which entitles him to claim registration; and (c) furnish such other information as the Council may require for the purpose of registration.
Registration	13. (1) The Council may on being satisfied that a person applying for registration possesses a recognised veterinary qualification and has paid the prescribed fee, allow the application and direct the Registrar to enter his name in the register. (2) The Registrar shall, on the registration of the person's name, give him a certificate of registration signed by him and countersigned by the President. (3) The Council may after giving the person concerned an opportunity of being heard, refuse to permit the registration, or cancel the registration of the name of any person,- (a) who has been convicted by any Court for any offence involving moral turpitude; (b) whom the Council, after due enquiry, finds guilty of infamous conduct in his professional capacity. (4) The Council may, on its own motion or upon an application made to it by any person, direct, after giving the person concerned an opportunity of being heard- (a) for the purpose of rectification of any error, amendment or any entry in the register; (b) cancellation of any registration which has been fraudulently made or effected. (5) Where the name of a registered veterinary practitioner is removed for any reason under this Ordinance, the Council may, on its own motion or upon an application made to it by the concerned veterinary practitioner, allow the name of the veterinary practitioner to be registered again in the register. (6) The Registrar shall by letter sent by registered post inform the veterinary practitioner of his registration, any amendment or cancellation of his registration or restoration of his name in the register. (7) If any person whose name is entered in the register obtains any recognised veterinary qualification other than the qualification in respect of which his name has been registered, he shall, on payment of such fee as may be prescribed, be entitled to have such additional qualification entered against his name in the register either in substitution of or in addition to, any entry previously made.

Appeal	14. If any person is dissatisfied with the decision of the Council refusing or cancelling the registration of his name or directing the correction or cancellation of any entry in the register, he may, at any time within sixty days from the date of such decision and on payment of such fees as may be prescribed, prefer an appeal to the Government and the decision of the Government shall be final.
Amendment of the Schedule	15. The Government, after consultation with the Council, may, if it thinks fit, by notification in the official Gazette amend the schedule so as to include therein, or omit therefrom, any veterinary qualification granted by any veterinary institution.
Power to call for information, etc	16. The Council shall have power to call on the authorities of any veterinary institution in Bangladesh to furnish such particulars as the Council may require of any courses of study and examinations to be undergone in order to obtain the degree, diploma or licence granted by that veterinary institution, as to the minimum age at which such courses of study can be undertaken, examinations required to be undergone prior to such degree, diploma or licence being granted, and generally as to the requisites for obtaining such degree, diploma or licence.
Notice of deaths and removal of names from register	17. On receipt of any reliable information regarding the death of any registered veterinary practitioner, the Registrar shall, after making such enquiry as he deems fit, remove the name of the deceased from the register.
Publication of and presumption as to entries in the list of registered veterinary practitioners	18. (1) The Registrar shall once in every four years, on or before such date as may be determined by the Council, cause to be published in the official Gazette a list in alphabetical order the names of all persons who are registered in the register together with their addresses and recognised veterinary qualification and the date on which such qualifications were obtained. (2) The Registrar shall also cause to be published in the official Gazette in the month of January every year an annual supplement to the list published under sub-section (1) showing therein the additions, alternations or corrections made in the entries in the register during the preceding year. (3) The Register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Evidence Act, 1872 (I of 1872).
Responsibility of Registered Veterinary Practitioner	19. (1) Every registered veterinary practitioner shall inform the Council any change of his address within sixty days of such change and, on receipt of the information, the Registrar shall make the necessary corrections in the register. (2) No registered veterinary practitioner shall use or publish in any way whatsoever any name, title, description or symbol indicating or calculated

	to lead persons to infer that he possesses any recognised veterinary qualification higher than that he or other professional qualification unless the same has been conferred upon him by a legally constituted authority within or outside Bangladesh.
Privileges of registered veterinary practitioner	20. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no one, other than a registered veterinary practitioner, shall be competent to hold any veterinary appointment in a veterinary institution, hospital, dispensary or abattoir maintained or aided by the Government or any local authority. (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no certificate required by any such law to be signed by a veterinary practitioner shall be valid unless it is signed by a registered veterinary practitioner. (3) No person shall be entitled to recover any fee or nichargeany Court for any veterinary advice or attendance, or for the performance of any operation, or for any medicine supplied, unless he shall prove upon the trial that he is a duly registered veterinary practitioner.
Persons not registered under the Ordinance not to practise	21. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no one, other than a registered veterinary practitioner, shall practise, or hold himself out as practising, the veterinary medicine or surgery. (2) Whoever, after the date fixed in this behalf by notification in the official Gazette by the Council, contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to Taka five hundred; (3) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any person who performs any of the following acts, namely:- (a) Rendering to any animal first aid for the purpose of saving life or relieving pain; (b) destruction of any animal by painless method; (c) castration of any animal or caponising of any poultry or bird; (d) docking of the cattle or dog before its eyes are open; (e) amputation of the claws of a dog before its eyes are open; (f) inoculation or vaccination of any animal, poultry or bird
Proceedings in inquiries	22. For the purpose of any enquiry under this Ordinance, the Council shall be deemed to be a Court within the meaning of Evidence Act, 1872 and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servant's (Inquiries) Act, 1850 (XXXVII of 1850).
Indemnity	23. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be against the Council or any officer or employee thereof for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.
Power to make regulations	24. The Council may, with the previous approval of the Government, make regulations for the purpose of giving effect to the provisions of this Ordinance.

১৪.২.৪ পশুরোগ আইন, ২০০৫

ইহা ২০০৫ সনের ৫ নং আইন। পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে এই আইন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পশুরোগ আইন, ২০০৫

(২০০৫ সনের ৫ নং আইন)

[২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫]

পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন। যেহেতু পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন পশুরোগ আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (ক) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (খ) 'নিবন্ধন' অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন নিবন্ধন; (গ) 'পশু' অর্থ নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:- (অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী; (আ) পাখি; (ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; (ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং (উ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশু; (ঘ) 'পশুজাত পণ্য' অর্থ পশু বা পশুর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে কোন পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হইতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পশুদেহের অন্য যে কোন অংশ বা পশুজাত পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ঙ) 'রোগ' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত যে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন রোগ; (চ) 'পশুর মৃতদেহ' অর্থে কোন পশুর মৃতদেহ বা উহার কোন অংশ বিশেষ এবং উহার মাংস, হাড় (সম্পূর্ণ, খন্ডিত বা চূর্ণ), চামড়া, লোম, চুল, পালক, শিং, ক্ষুর, রক্ত, বা উহার অন্য কোন অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ছ) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898); (জ) 'ভেটেরিনারি কর্মকর্তা' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (Ord. XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner; (ঝ) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (ঞ) 'সংক্রমিত এলাকা' অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকা; (ট) 'তফসিল' অর্থ এই আইনের তফসিল; (ঠ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং (ড) 'রোগাক্রান্ত' অর্থ কোন রোগে আক্রান্ত।

পশুর রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদান	৩। (১) প্রত্যেক পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক বা কোন পশুর চিকিৎসাকালে বা অন্য কোন ভাবে কোন পশু চিকিৎসক (veterinarian) বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীর নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত, তাহা হইলে উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, চিকিৎসক বা মাঠ কর্মী অনতিবিলম্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে পশুর উক্ত রোগ সম্পর্কিত তথ্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পশুর কোন রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির পর, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা সংক্রমিত পশু ও উহা রাখিবার স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও অনুসন্ধানক্রমে যদি নিশ্চিত হন যে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণ	৪। কোন পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত পশু রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশুকে অন্যান্য পশু হইতে পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং রোগাক্রান্ত নহে এমন পশু উক্ত রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে বা নিকটে যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য, যতদূর সম্ভব, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা	৫। (১) মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, বা উক্ত রোগের বিস্তার লাভের আশংকা বা সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিতব্য প্রজ্ঞাপনে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের তথ্য এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য তথ্যের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিতে হইবে, যথা:- (ক) সংক্রমিত এলাকার সীমা; (খ) সংক্রমিত এলাকা ঘোষণার মেয়াদ; (গ) সংক্রমিত এলাকায় বিস্তারলাভকারী রোগের বিবরণ; (ঘ) সংক্রমিত হইতে পারে এইরূপ পশুর বিবরণ; এবং (ঙ) পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য ব্যবস্থা। (৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উহা সাধারণতঃ সরকারি গেজেটে প্রকাশের অনধিক তিন মাস মেয়াদে কার্যকর থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তাররোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময় অনধিক আরো তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইলে, উক্ত এলাকার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
সংক্রমিত এলাকায় পশু ও পশুজাত পণ্য স্থানান্তরে বিধি-নিষেধ	৬। (১) ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকার- (ক) কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকা বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন পশু, জীবিত বা মৃত, বা পশুজাত পণ্য, পশুর অংশ বিশেষ বা পশু সংশ্লিষ্ট অন্য কোন পণ্য স্থানান্তর করিতে বা উক্ত ব্যক্তির মালিকানা বা তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পশু চলাচল করাইতে পারিবে না বা সংক্রমণ বহির্ভূত কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন পশু স্থানান্তর করিতে বা চলাচল করাইতে পারিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:- (অ) ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান প্রতিপালনের প্রয়োজনে পশু আনয়ন; (আ) সরকারি পশু পালন খামারে পশু আনয়ন; এবং (ই) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন ক্ষেত্রে পশু আনয়ন; (খ) রোগাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত বলিয়া গণ্য বা রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন কোন পশুর

	মাংস, দুধ, ডিম বা উক্ত পশু হইতে উৎপাদিত অন্য কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না; (গ) পশু বর্জ্য, পশু খাদ্য বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী উক্ত এলাকা বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেলওয়ে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন ধরণের যানবাহনের মাধ্যমে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত পশু, পশুজাত পণ্য, পশুখাদ্য, পশু বর্জ্য, বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী কোন সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে পরিবহন করা যাইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ পশু, বা অন্য কোন সামগ্রী রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহনের কোন পর্যায়ে সংক্রমিত এলাকায় নামানো (unloaded) হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহা উক্ত এলাকা হইতে পুনরায় স্থানান্তর করা যাইবে না।
সংক্রমিত এলাকায় প্রতিষেধক টিকা প্রদান	৭। (১) যে রোগের জন্য ধারা ৫ এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেই রোগ প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা বাস্তবানুগ হইলে, মহাপরিচালক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত এলাকার এইরূপ সকল প্রকার বা শ্রেণীর পশুকে প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষেধক টিকা প্রদানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সকল ধরণের সুবিধাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।
জীবাণুমুক্তকরণ, ইত্যাদি	৮। (১) মহাপরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিতরূপে সংক্রমিত পশু রাখা হইয়াছিল বা সংরক্ষিত ছিল এইরূপ কোন সেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশু পালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের জন্য উহার মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পশুসেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশুপালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের কোন আদেশ জারি করা হইলে, উক্ত আদেশ মোতাবেক জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা পুনঃব্যবহার না করিতে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
পশু পরীক্ষা	৯। (১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত যে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রোগাক্রান্ত পশু হইতে রক্ত, দুধ, মলমূত্র বা অন্য কোন পদার্থ সংগ্রহ করা যাইবে। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে,- (ক) তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থান ও সময়ে কোন পশুকে উপস্থিত করাইতে হইবে; এবং (খ) এইরূপ পশুকে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত স্থান হইতে স্থানান্তর করা যাইবে না। (৪) এই ধারার অধীন কোন পরীক্ষা বা টেস্টের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।
পোস্টমর্টেম পরীক্ষা	১০। (১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহযুক্ত কোন পশুর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম পরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং প্রযোজ্য

	ক্ষেত্রে, উক্ত মৃত পশুর দেহের কোন অংশবিশেষ পরীক্ষাগারের পরীক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। (২) পোস্টমর্টেম পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কোন পশুর মৃতদেহ মাটি খুঁড়িয়া উত্তোলনের আদেশ প্রদানসহ তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে এমন পশু অপসারণ	১১। (১) রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহযুক্ত কোন পশুর মৃতদেহ উহার চামড়াসহ অন্যুন ছয় ফুট মাটির নিচে পুঁতিয়া বা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবার মাধ্যমে ধ্বংস বা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে উক্তরূপ মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। (২) ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা বা অন্য কোনভাবে অপসারিত কোন পশুর মৃতদেহ উত্তোলন বা পুনঃ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। (৩) কোন ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত পশুর মৃতদেহ বা উক্তরূপ রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ খড়কুটা, ঘাস, বর্জ্য বা অন্য বস্তু জনস্বাস্থ্য বা পশু স্বাস্থ্যের হুমকির কারণ হইতে পারে এমন কোন স্থানে নিক্ষেপ করিতে বা নিক্ষেপের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন না।
সংক্রমিত পশু বাজারজাতকরণের বিধি-নিষেধ	১২। ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন সংক্রমিত এলাকার পশু বা উক্ত পশু হইতে উৎপাদিত পণ্য এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত এলাকায় উহা বাজারজাত করা যাইবে না।
ডিম ফুটানোর কাজে নিয়োজিত খামার পরিদর্শন	১৩। (১) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ডিম হইতে হাঁস-মুরগির বাচ্চা ফুটানোর পূর্বে উক্ত ডিম পুলোরাম বা অন্য কোন ডিমবাহিত রোগজীবাণু বহন করে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ডিম ফুটানোর কাজে নিয়োজিত হাঁস-মুরগির খামার পরিদর্শন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ডিম বা হাঁস-মুরগি পরীক্ষা করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরীক্ষার সময় ডিম বা হাঁস-মুরগিতে পুলোরাম বা ডিমবাহিত অন্য কোন রোগের জীবাণু পাওয়া গেলে উক্ত ডিম বা হাঁস-মুরগি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা উক্ত বিধির অবর্তমানে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ধ্বংস করা যাইবে।
সংক্রমিত এলাকার পশুকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথকীকরণ ও চিকিৎসাকরণ	১৪। (১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যথাযথ তদন্তপূর্বক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন পশু সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে লিখিতভাবে উক্ত পশু সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:- (ক) কোন নির্দিষ্ট স্থানে উহা রাখিবার, উহা অপসারণ করিবার বা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উহা পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং (খ) উহার চিকিৎসাকরণ। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক কোন আদেশ প্রদান করা হইলে সকল পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত আদেশ মানিয়া চলিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উক্ত পশুর কোন মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক না থাকে বা উহার মালিক অজ্ঞাত থাকে বা কোন প্রকার অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ব্যতিরেকে মালিক সনাক্ত করা না যায় বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তার আদেশ মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব না হয় কিংবা মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু জব্দ করিতে পারিবেন, এবং উহাকে আলাদা একটি স্থানে রাখিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী জব্দকৃত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাঁহার নিকট হইতে

	ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মালিকানা প্রমাণ সাপেক্ষ, যদি উক্ত পশু নিজ দখলে ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উক্ত পশু তাহার দখলে ফেরত প্রদানের সময় পর্যন্ত উক্ত পশুর জব্দকালীন ব্যয়িত সকল অর্থ প্রদান করিলে উহা তাহার বরাবরে ফেরত প্রদান করা যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট পশু ফেরত প্রদানের সময় ভেটেরিনারি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পশু সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনায় যথাযথ বলিয়া বিবেচিত যে কোন আদেশ দিতে পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জব্দকৃত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক উক্ত পশু ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন না করেন এবং উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, যে রোগের কারণে পশুটিকে জব্দ করা হইয়াছিল উক্ত পশুটি দ্বারা বর্তমানে অন্য কোন পশু সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা পশুটিকে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্ধারিত কোন স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি উক্ত পশু ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন না করেন, তাহা হইলে উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু সম্পর্কে তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। (৫) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন পশু যথাযথ পরীক্ষার পর যদি এই মর্মে লিখিতভাবে সনদ প্রদান করেন যে, উক্ত পশু কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং উক্ত পশু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত পশু ধ্বংস, অপসারণ বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।
সংক্রমিত এলাকায় বাজার, মেলা ইত্যাদির উপর বিধি-নিষেধ	১৫। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ভেটেরিনারি কর্মকর্তার লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন সংক্রমিত এলাকায় খেলাধুলা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, কোন পশুবাজার, পশুমেলা, পশুপ্রদর্শনী বা অন্য কোনভাবে পশুর কেন্দ্রীভূতকরণ, সংঘবদ্ধকরণ বা সমাবেশ ঘটাইতে বা উক্ত উদ্দেশ্যে কাহাকেও উৎসাহিত করিতে পারিবে না।
পশু খামার, পশুজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা ইত্যাদির জন্য নিবন্ধন	১৬। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষ, নিবন্ধন ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি- (ক) কোন স্থান বা আঙ্গিনায় পশু হাসপাতাল স্থাপন, পরিচালনা বা চিকিৎসা সেবা প্রদান করিবেন না; (খ) গবাদিপশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ও পরিচালনা করিবেন না; (গ) পশুজাত পণ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিবেন না; (ঘ) প্রজননের উদ্দেশ্যে শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিবেন না; এবং (ঙ) প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন গরু বা মহিষের ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন এবং ভ্রূণ উৎপাদন ও প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী, ছাগী বা অন্য কোন পশু পালন করিবেন না। (২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধন প্রয়োজন হইবে না, যথা:- (ক) সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত কোন পশু হাসপাতাল, গবাদিপশু খামার, হাঁস মুরগির খামার বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা; (খ) সরকার কর্তৃক প্রজননের উদ্দেশ্যে শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন, ভ্রূণ উৎপাদন ও ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী বা ছাগী বা অন্য কোন পশু পালন; এবং (গ) পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হাঁস-মুরগির খামার বা পশুখামার এবং উক্ত খামারে প্রজননের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সংখ্যক ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন।

নিবন্ধন প্রদান-পূর্ব পরিদর্শন, ইত্যাদি	১৭। ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিবন্ধন প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের স্থান, গবাদিপশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার এবং পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজতকরণ কারখানা পরিদর্শন বা আবেদনকারীর নিকট হইতে অন্য কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।
নিবন্ধন প্রদান, ইত্যাদি	১৮। (১) ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নির্ধারিত নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন। (২) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি আবেদন মহাপরিচালক বা উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত এবং ফিস প্রদানক্রমে দাখিল করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে, মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা যাইবে, এইরূপ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন, যথা:- (ক) আবেদনে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা; (খ) আবেদনে উল্লিখিত কার্যাবলী ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা; এবং (গ) নিবন্ধন প্রদান করা হইলে উহা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে কিনা। (৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদে উহার মেয়াদ, নবায়নের সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে। (৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত প্রতিটি নিবন্ধন সনদ নবায়নযোগ্য হইবে এবং নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিতে হইবে। (৬) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা- (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করার বা নামঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন; এবং (অ) মঞ্জুর করিবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন; (আ) নামঞ্জুর করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসহ উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন; এবং (খ) ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক, বিলম্বের বিষয়টি যথাশীঘ্র সম্ভব আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।
নিবন্ধন সনদের অনুলিপি সংরক্ষণ	১৯। ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত প্রতিটি নিবন্ধন সনদের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।
নিবন্ধন বাতিলকরণ, ইত্যাদি	২০। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি মনে করেন যে, নিবন্ধন গ্রহীতা- (ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান ভঙ্গ করিয়াছেন; এবং (খ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়াছেন। (২) নিবন্ধন গ্রহীতাকে অন্যূন ১৫ (পনের) দিনের কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে না। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন নিবন্ধন গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আদেশটি যদি- (ক) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট; এবং (খ) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট, আপীল করিতে

	পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন দাখিলের সময় হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৬) এই ধারার অধীন নিবন্ধন বাতিল করা হইলে উক্তরূপ বাতিলের কারণে কোন প্রকার ক্ষতি হইলে নিবন্ধন গ্রহীতা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না।
বিদ্যমান গবাদি পশুর খামার, হাঁস মুরগির খামার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিবন্ধন	২১। এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় বিদ্যমান পশু হাসপাতাল, গবাদি পশুর খামার, হাঁস মুরগির খামার বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, গরু বা মহিষের ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন এবং ভ্রূণ উৎপাদন ও প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী, ছাগী বা অন্য কোন পশু পালনের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই আইনের বিধান অনুসারে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।
কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	২২। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা- এই ধারায়- (ক) 'কোম্পানী' বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার	২৩। (১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না। (২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
অপরাধের আমলঅযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	২৪। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলঅযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।
দন্ড	২৫। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ ও নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লংঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব দুই বজসর কারাদন্ড, বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
আপীল	২৬। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট দায়রা আদালতে আপীল করা যাইবে।
ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ	২৭। এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষ, ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।
দায়মুক্তি	২৮। এই আইন বা বিধির অধীন মহাপরিচালক বা তাহার অধস্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা	২৯। মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষ, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে যে কোন খামার, পশু রাখিবার স্থান, ভূমি, দালান-কোঠা বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা, অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথাঃ- (ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন; (খ) রোগাক্রান্ত পশু পরীক্ষা; (গ) রোগাক্রান্ত পশু দ্বারা সংক্রমিত হইয়াছে এইরূপ পশু পরীক্ষা; (ঘ) পশু হইতে উৎপাদিত পণ্য পরীক্ষা; (ঙ) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খড়, ঘাস ইত্যাদি পরীক্ষা; এবং (চ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন।
ক্ষমতার্পণ	৩০। মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, প্রয়োজনবোধে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধস্তন যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৩১ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
ইংরেজী অনূদিত পাঠ প্রকাশ	৩২। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (authentic english text) নামে অভিহিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।
রহিতকরণ ও হেফাজত	৩৩। (১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে- (ক) The Glanders and Farcy Act, 1899 (Act XIII of 1899); এবং (খ) The Diseases of Animals Act (Ben. Act VI of 1944), রহিত হইবে। (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে রহিতকৃত কোন আইনের অধীন কোন কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিতকৃত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুসারেই এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

তফসিল

[ধারা ২(ঙ) দ্রষ্টব্য]

পশু রোগের বিবরণ

এ্যানথ্রাক্স (Anthrax), হিমোরেজিক সেপ্টেসেমিয়া (Haemorrhagic Septicaemia), ব্ল্যাক কোয়ার্টার (Black Quarter), ব্রুসেলোসিস (Brucellosis), টিউবারকোলোসিস (Tuberculosis), জোনস ডিজিজ (Johne’s Disease), কন্টাজিয়াস বোভাইন প্লুরোনিউমোনিয়া (Contagious Bovine Pleuropneumonia), ম্যালিওডিওসিস (Melioiodosis), বোভাইন জেনিটাল ক্যামফাইলোব্যাকটেরিওসিস (Bovine Genital Campylobactoriosis), ভিব্রিওসিস (Vibriosis), লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis), ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ (Foot and Mouth Disease), রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest), রেবিস (Rabies), বোভাইন ভাইরাল ডাইরিয়া (Bovine Viral Diarrhoea), মালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার (Malignant Catarrhal Fever), ভেসিকিউলার স্টোমাটাইটিস (Vesicular Stomatitis), লাম্পি স্কীন ডিজিজ (Lumpy Skin Disease), ইনফেকসাস বোভাইন রাইনোট্রাকিয়াইটিস (আইবিআর/আইপিএম) (Infectious Bovine Rhinotracheitis, (IBR/IPM), প্রলিফারেটিভ স্টোমাটাইটিস (Proliferative Stomatitis), বোভাইন ভাইরাল লিউকোসিস (Bovine Viral Leucosis), ট্রিপেনোসোমিয়াসিস (Trypanosomiasis), ট্রাইকোমোনিয়াসিস

(Trichomoniasis), বেবেসিওসিস (Babesiosis), এনাপাজমোসিস (Anaplasmosis), থাইলেরিয়াসিস (Theileriasis), ওয়ার্বল ফ্লাই (হাইপোডার্মা বোভিস এন্ড ব্লিনেটাম) (Warble Fly) (Hypoderma Bovis and Blineatum), ডার্মাটোমাইকোসিস (Dermatomycosis), গ্ল্যান্ডার্স (Glanders), আফ্রিকান হর্স সিকনেস (African Horse Sickness), ইনফেকসাস ইকোয়াইন এনসেফালোমাইলাইটিস (Infectious Equine Encephalomyelitis), ইপিজোয়াটিক লিমফেনজাইটিস (Epizootic Encephalomyelities), Lymphangitis), ইকোয়াইন ইনফেকসাস এনিমিয়া (Equine Infectious Anaemia), জাপানিজ বি এনসেফালাইটিস (Japaness B. Encephalitis), পাসচোরেলোসিস (Pasteurollosis), কন্টাজিয়াস ক্যাপরাইন প্লুরোনিউমোনিয়া Copyright (Foot rot), (Contagious Caprine Pleuropneumonia), ফুটরট ভিবরোফিটাস (Vibriofoetus), কিউ ফিভার (Q. Fever), কন্টাজিয়াস পাসচোলার ডার্মাটাইটিস (Contagious Pustular Dermatitis), ব্লু টাং (Blue Tongue), মিডা (ভিস্না) (Maeda) (Visna), এডিনোম্যাটোসিস (Adenomatosis), স্ক্র্যাপি (Scrapie), পেস্ট ডেস পেটিটস রুমিনেন্টস্ (পিপিআর) (Peste des Petits Ruminants (PPR), ভেড়ার পকস (Sheep Pox), গোট পক্স (Goat Pox), সোয়াইন ইরিসিপেলাস (Swine Erysipelas), ইনটেসটাইনাল সালমোনেলা ইনফেকশন (Intestinal salmonella infection), ভেসিকিউলার এক্সেথিয়া (Vesicular Exanthea), ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার (Classical Swine Fever), আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার (African Swine Fever), ওয়েজেসকিস ডিজিজ (Aujesky’s Disease), এ্যাট্রোফিক গ্যাসট্রোএনটারাইটিস (Atrophic Gastroenteritis), ক্যানাইন পারভোভাইরা ইনফেকশন (Canine Parvovirus Infection), ক্যানাইন পারভোভাইরাস ইনফেকশন (Canine Parvovirus Infection) ক্যানাইন হারপেসভাইরাল ইনফেকশন (Canine Herpesviral Infection), ফেলাইন ইনফেকসাস এনিমিয়া (Feline Infectious Anaemia), ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস এন্ড রিলেটিভ ডিজিজ (Feline Leukemia Virus and Related Disease), ফেলাইন প্যান লিউকোপেনিয়া (Feline Panleukopenia), ইনফেকশাস ক্যানাইন হেপাটাইটিস (Infectious Canine Hepatitis), ক্যানাইন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস Parliamentary (Canine (Canine Influenza Virus), ক্যানাইন প্যারা-ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস Parainfluenza Virus), ফেলাইন এন্টারাইটিস (Feline Enteritis), ক্যানাইন ডিসটেম্পার (Canine Distemper), পোলেরাম ডিজিজ (Pullorum Disease), ফাউল টাইফয়েড (Fowl Typhoid), ফাউল কলেরা (Fowl Cholera), এভিয়ান টিবারকোলোসিস (Avian Tuberculosis), ফাউল প্লেগ (Fowl Plague), নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত) (NewcastleDisease) (Ranikhet), মারেক্স ডিজিজ (Marek’s Disease), এভিয়ান লিওকোসিস (Avain Lucosis), গামবোরো ডিজিজ (Gumboro Disease), ইনফেকসাস এভিয়ান এনসেফালোমাইলাইটিস (Infectious Avian Encepalomyelitis), ইনফেকসাস ল্যারিন জেট্রাকিয়াইটিস (Infectious Laryngotra Cheitis), এভিয়ান ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস (Avian MinistryInfectious Bronchitis), ডাক ভাইরাস এন্টারাইটিস (ডাক প্লেগ) (Duck Virus Enteritis (Dug Plague), ফাউল পক্স (Fowl Pox), মাইকোপ্লাজমোসিস (Mycoplasmosis), চিকেন এ্যানিমিয়া ভাইরাস ইনফেকশন (Chicken Anemia Virus Infection), ইনক্লুশান বডি হিপাটাইটিস (Inclusion Body Hepatitis), ডাক ভাইরাল হিপাটাইটিস (Duck Viral Hepatitis), নেকরোটিক এন্টারাইটিস (Necrotic Enteritis), রোটা ভাইরাল ইনফেকশানস ইন চিকেন (Rotaviral Infections in Chicken), থ্রাস (কেনডিডিয়াসিস) Thrush (Candidiasis), এভিয়ান স্পাইরোকিটোসিস (Avian Spirochetosis), কোলিবেসিলোসিস (Colibacillosis), গুস্, ভাইরাল হিপাটাইটিস (Goose Viral Hepatitis), লিমফয়েড লিউকোসিস (Lymphoid Leukosis), মাইলয়েড লিউকোসিস (Myeloid Leukosis), অমফ্যালাইটিস (Omphalitis), প্যারাটাইফয়েড ইনফেকশনস (Paratyphoid Infections), স্টেফাইলোকক্কোসিস (Staphylococcosis), স্ট্রেপ্টোকক্কোসিস (Streptococcosis), ভাইরাল আরথ্রাইটিস (Viral Arthritise), এনসেথালোমাইলাইটিস (Encethalomyelitis), এ্যাগ ড্রপ সিনড্রম (Egg Drop Syndrome), এ্যাসপারজোলোসিস (Aspergillosis), ইনফেকশাস করাইজা (Infectious Coryza), এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza), কোয়েল ব্রংকাইটিস (Quail Bronchities), সোলেন হেড সিনড্রম (Swollen Head Syndrome), সিটাকোসিস (Psittacosis)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা
মঙ্গলবার, নভেম্বর ৪, ২০০৮

প্রজ্ঞাপন। তারিখ, ১৫ কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯২-আইন/২০০৮। পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। (১) এই বিধিমালা পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়
(ক) 'অনুমোদিত যানবাহন' অর্থ পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের সুবিধা সম্পন্ন আবৃত যানবাহন (well ventilated covered van) বা কীটপতঙ্গ নিরোধক জাল বা মশারি দ্বারা উপযুক্তভাবে আবৃত যানবাহন বা জলযান; এবং
(খ) 'আইন' অর্থ পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন);
(গ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;
(ঘ) 'দুধ' অর্থ সুস্থ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চা জন্মের প্রম চার দিনের দুধ ব্যতীত নিঃসরিত স্বাভাবিক মানসম্পন্ন পরিস্কার এবং ভেজালমুক্ত দুধ;
(ঙ) 'নিবন্ধন' অর্থ আইনের ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন নিবন্ধন;
(চ) 'পশু' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (গ) তে সংজ্ঞায়িত পশু;
(ছ) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম; এবং
(জ) 'রোগ' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঙ) তে সংজ্ঞায়িত রোগ।

৩। **পশুরোগসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ও অবহিতকরণ, ইত্যাদি**। (১) পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে রোগের প্রাদুর্ভাবের হার এবং জনস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্যের উপর উহার প্রভাব বিবেচনাক্রমে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত পশুরোগসমূহ যথাক্রমে ক, খ ও গ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।
(২) বাংলাদেশের কোন এলাকায় এই বিধিমালার তফসিল-১ এ উল্লিখিত শ্রেণীর পশুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পশুরোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন, যথাঃ (অ) ক শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক ২ ঘন্টা; (আ) খ শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক ১২ ঘন্টা; এবং (ই) গ শ্রেণী- রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার সময় হইতে অনধিক ২৪ ঘন্টা।
(৩) কোন রোগের প্রাদুর্ভাব যদি প্রায়শঃ না হয় এবং স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় বেশি না হয়, কিন্তু সীমিত সংখ্যক পশুর ক্ষেত্রে উহার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিতে মহাপরিচালকের নিকট একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।
(৪) যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত রোগটির অস্তিত্ব বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে নাই, তাহা হইলে রোগটির প্রাদুর্ভাবের অনধিক দুই ঘন্টার মধ্যে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক সময় সময়, পূর্বের পাঁচ বৎসরের রোগের ইতিহাস বিশ্লেষণপূর্বক বা উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশ্লেষণ করাইয়া বিভিন্ন রোগের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রাদুর্ভাবের হার নির্ধারণপূর্বক উক্ত রোগ সম্পর্কে সকল ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।
৪। **পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কিত তথ্য**। বিধি ৩ এর অধীন পশুরোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত ফরম-১ এর একটি কপি মহাপরিচালকের নিকট জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করিবেন।

৫। **রোগাক্রান্ত পশু পৃকীকরণ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা।** ভেটেরিনারি কর্মকর্তা তফসিল-২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগাক্রান্ত পশু পৃকীকরণের জন্য পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৬। **সংক্রমিত এলাকা ঘোষণার বহুল প্রচার।** (১) মহাপরিচালক, কোন এলাকা সংক্রমিত ঘোষণা করিবার পর রেডিও, টেলিভিশন, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ইন্টারনেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, কিংবা পোস্টার, চিহ্ন প্রদর্শন, মাইকিং করিয়া বা জনসংযোগ করিয়া বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রচারকালে সংক্রমিত এলাকায় করণীয়, নিষিদ্ধ এবং সাধারণভাবে খেলাধুলা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন পশু বাজার, পশুমেলা, পশু প্রদর্শনী বা অন্য কোনভাবে পশুর কেন্দ্রীভূতকরণ, সংঘবদ্ধকরণ বা সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ করিবেন।

৭। **সংক্রমিত এলাকার ভিতরে রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনে পশু বা পশুজাত পণ্য পরিবহনের শর্তাবলী।** সংক্রমিত এলাকার ভিতরে রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনে পশু বা পশুজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ (ক) সকল পণ্য নিশ্ছিদ্র ভ্যান বা কন্টেইনারে পরিবহন করিতে হইবে; (খ) যে সমস্ত পণ্য পচনশীল তাহা শীতলীকৃত (cool) ভ্যান বা কন্টেইনারে শীতল অবস্থায় পরিবহন করিতে হইবে; (গ) পশু পণ্য বোঝাই করিবার পূর্বে ভ্যান বা কন্টেইনার উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে; তবে জীবাণুমুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় যাহাতে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট না হয় বা পণ্যটি জনস্বাস্থ্য, পশুস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পণ্যটি যাহাতে কোনভাবেই জীবাণুনাশকের সংস্পর্শে না আসে তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে; (ঘ) যে সকল রোগের কারণে কোন অঞ্চলকে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই সকল রোগ বা রোগসমূহের বিরুদ্ধে যদি দেশে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে, তবে পশু পরিবহনের পূর্বে টিকা প্রদান করিতে হইবে এবং টিকা প্রদানের দিবসটি এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যেন পরিবহনের সময় উক্ত পশুর মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়; (ঙ) যে রোগ বা যে সকল রোগের বিরুদ্ধে টিকাদানের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকার মধ্য দিয়া ঐ রোগের বাহক হিসাবে কাজ করিতে পারে এইরূপ পশু পরিবহন করা যাইবে না; (চ) সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পরিবহনের সময় উক্ত এলাকা হইতে কোন পশু খাদ্য বা পানীয় বা অন্য কোন ব্যবহার্য সংগ্রহ করা যাইবে না; (ছ) পশু পরিবহনকারী যানবাহন সংক্রমিত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে সংক্রমিত এলাকা হইতে রোগমুক্ত এলাকায় প্রবেশের পূর্বে যানবাহন জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে; (জ) সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পশু পরিবহন করা হইলে উক্ত পশুকে আলাদা শেডে রাখিয়া পশুর গন্তব্য স্থলের ভেটেরিনারি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সঙ্গনিরোধ করিতে হইবে; (ঝ) যে এলাকায় পশু বোঝাই করা হইয়াছে সেই এলাকার ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, তদ্কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক ফরম-২ এ একটি স্বাস্থ্য সনদপত্র প্রদান করিবেন, যাহা যানবাহনের চালক পরিবহনকালে সংরক্ষণ করিবেন এবং পশু অবতরণের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করিবেন; এবং (ঞ) দায়িত্বপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যাবতীয় কাগজপত্র ও পশু পরীক্ষার পর সঙ্গনিরোধের নির্দেশনাসহ ফরম-৩ এ একটি ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

৮। **টিকা প্রদান পদ্ধতি।** মহাপরিচালক রোগের প্রকৃতি ও প্রাদুর্ভাবের হার বিবেচনাপূর্বক তফসিল-১ এ বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর রোগ সম্পর্কে টিকা দানের পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **পশুরোগ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ।** (১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পশুরোগ পরীক্ষার জন্য তফসিল-৩ এ বর্ণিত রোগের পার্শ্বে বিধৃত নমুনা সংগ্রহ করিবেন, বা ক্ষেত্রমত, করাইবার আদেশ প্রদান করিবেন। (২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী সংগৃহীত নমুনা তফসিল-৪ এ বর্ণিত রোগের বিপরীতে উল্লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ বর্ণিত পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রেরণ ও পরীক্ষার ব্যয় সরকার কর্তৃক বহন করা হইবে।

১০। **পোস্টমর্টেম পরীক্ষা।** (১) কোন রোগাক্রান্ত পশু মারা গেলে উক্ত পশুররোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পশুর পোস্টমর্টেম সম্পন্ন করিতে হইবে। (২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা পোস্টমর্টেম পরীক্ষার ফলাফল ফরম-৪ এ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পোস্টমর্টেমে কোন রোগের নমুনা পাওয়া গেলে এবং উক্ত নমুনা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করিলে, তিনি সংশ্লিষ্ট নমুনাসহ এতদ্সঙ্গে পূরণকৃত ফরম-৪ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করিবেন। (৩) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পূরণকৃত ফরম-৪ এর একটি কপি স্বীয় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

১১। **রোগাক্রান্ত মৃত অথবা জীবিত পশু অপসারণ**। রোগাক্রান্ত মৃত অথবা জীবিত পশু অপসারণের জন্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, যথাঃ

(অ) পুঁতিয়া ফেলার পদ্ধতিঃ

(ক) পুঁতিয়া ফেলার স্থানটি এমন জায়গায় হইতে হইবে যাহাতে গর্ত খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি, পশুর মৃতদেহসহ অন্যান্য জিনিসপত্র রোগ বিস্তারের আশংকা সৃষ্টি না করিয়া উক্ত স্থানে নেওয়া যায়; (খ) পুঁতিয়া ফেলার স্থানটি অবশ্যই পানির উৎস, নলকূপ বা পানির কুয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে হইতে হইবে; (গ) গর্ত খুঁড়িবার স্থান নির্বাচনের পূর্বে পানির স্তর, বায়ু প্রবাহ, জন বসতি, রাস্তাঘাট, মৃত্তিকার ধরণ বিবেচনা করিতে হইবে এবং গর্ত খুঁড়িবার জায়গা এমন স্থানে হইতে হইবে, যাহাতে গর্ত খুঁড়িবার পর গর্তে পানি উঠিয়া না যায়; (ঘ) গর্তটি খামারের ভিতরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তবে, খামারে গর্ত খুঁড়িবার স্থান না থাকিলে খামারের বাহিরে উপযুক্ত জায়গায়ও গর্ত করা যাইবে; (ঙ) গর্তটি জনবসতি হইতে ন্যূনতম ২৫০ মিটার দূরে হইতে হইবে; (চ) গর্তের চারপাশে প্রয়োজন অনুযায়ী বেষ্টনী দিতে হইবে; (ছ) মাটি অপসারণের জন্য গর্তের আকার অনুযায়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিতে হইবে এবং যে সব ক্ষেত্রে খনন যন্ত্র ব্যবহার করা আর্থিক ও অন্যান্য বিবেচনায় সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে খনন যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে; (জ) খনন যন্ত্র ব্যবহার সম্ভব না হইলে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে; এবং (ঝ) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি উপযুক্ত জীবাণুনাশক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করিবার পর অন্যত্র স্থানান্তর করিতে হইবে; এবং

(আ) গর্তের আকার ঃ

(ক) পশুভেদে প্রতিটি গর্তের আয়তন ১-৫ কিউবিক মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়; (খ) মৃত পশুর উপরিভাগ ২ মিটার বা ৬ ফুট মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং গ্যাসে ফুলিয়া যাইবার কারণে মৃত পশু গর্তের মাটি ভেদ করিয়া যাহাতে উপরে উঠিয়া না আসে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং (গ) পশুর বর্জ্য, বিছানা ইত্যাদি সম্ভব হইলে একই গর্তে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

(ই) পোড়ানোর মাধ্যমে অপসারণ ঃ

(ক) পশু যদি গর্তে অপসারণ করা সম্ভব না হয় তবে ইনসিনারেটর বা জনপদ হইতে দূরে কোন স্থানে উহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। (খ) আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন বিছানা ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পুঁতিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

১২। **সংক্রমিত এলাকায় পশু বাজারজাতকরণ পদ্ধতি**। যে রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে, যদি কোন পশুকে উক্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হইয়া থাকে এবং টিকা প্রদানের ফলে উক্ত পশুর মধ্যে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে, এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু পরীক্ষার পর যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, পশুটি বাজারজাত করা যাইবে, তাহা হইলে তিনি সংক্রমিত এলাকার ভিতরে পশুটি বাজারজাতকরণের নির্দেশ দিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, পশু বাজারজাতকরণের পূর্বে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক ফরম-৫ এ প্রদত্ত টিকা প্রদানের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্ত পশুকে কোন অবস্থায়ই সংক্রমিত এলাকার বাহিরে বাজারজাত করা যাইবে না।

১৩। **সংক্রমিত এলাকায় পশুজাত পণ্য বাজারজাতকরণ**। যে ক্ষেত্রে পশু রোগাক্রান্ত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংক্রমিত এলাকার কোন পশু হইতে কোন পণ্য বাজারজাত করা ঝুঁকিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে তিনি সংক্রমিত এলাকায় উক্ত পশুজাত পণ্য বাজারজাতকরণের অনুমতি দিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পণ্য সংক্রমিত এলাকার বাহিরে বাজারজাত করা যাইবে না।

১৪। **কাঁচা বাজারে পশু, পাখি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়**। (১) কোন ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত পাখি, হাঁস-মুরগি ও উহার ডিম, কাঁচা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। (২) বিক্রেতা কোন খামার হইতে পাখি, হাঁস-মুরগি বা ডিম ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়াছে তাহার মূল রশিদ বা চালান সংরক্ষণ করিবেন। (৩) কোন ব্যক্তি ফেরি করিয়া কোন রোগাক্রান্ত পাখি বিক্রয় করিতে পারিবে না। (৪) বিক্রেতা প্রতিদিন পাখি, হাঁস-মুরগি, ডিম বিক্রয় শেষে উহার বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করিবেন এবং বিক্রয়স্থল ও ব্যবহৃত পোল্ট্রি ইকুইপমেন্ট পরিষ্কারপূর্বক জীবাণুনাশকের মাধ্যমে স্প্রে করিবেন।

১৫। **রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি ও উহার ডিম, বা উহার বাচ্চা ধ্বংসকরণ পদ্ধতি**। আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা তফসিল-৫ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক রোগাক্রান্ত পাখি, হাঁস-মুরগি, উহার ডিম, বাচ্চা বা অন্য কোন সামগ্রী ধ্বংস করিতে বা করাইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৬। **পশু জব্দকরণ পদ্ধতি।** (১) আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুসারে জব্দকৃত পশুর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ফরম-৬ এ জব্দকৃত পশুর বিবরণ সম্বলিত একটি রেজিস্টার এবং ফরম-৭ এ জব্দকৃত পশুর ব্যয় নির্বাহের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন। (২) পশু জব্দকরণের ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি জব্দকৃত পশুর মালিকানা দাবী না করে বা মালিক খুঁজিয়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে, উক্ত পশু প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রিত অর্থ হইতে উক্ত পশু বাবদ খরচকৃত সমুদয় ব্যয় সমন্বয়পূর্বক অব্যয়িত অংশ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৭। **মালিকের নিকট জব্দকৃত পশু ফেরত প্রদানের পদ্ধতি।** (১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক জব্দকৃত পশুর মালিকানা দাবীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরের নিকট হইতে দাবীকৃত পশুর বর্ণনাসহ একটি সার্টিফিকেট ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। (২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত বর্ণনার সহিত যদি উক্ত জব্দকৃত পশুর মিল থাকে এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যদি সাক্ষ্য প্রমাণে এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, জব্দকৃত পশুটির মালিক দাবীকারী ব্যক্তি, তাহা হইলে উক্ত জব্দকৃত পশু উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা যাইবে। (৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন জব্দকৃত পশু ফেরত প্রদানের সময় উহার মালিকের নিকট হইতে একশত পঞ্চাশ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে উপযুক্ত দুইজন সাক্ষীসহ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহাতে পশুর মালিকের নাম, ঠিকানা ও পশুর বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে। (৪) জব্দকৃত পশু, উহার মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাহার নিকট হইতে প্রতিনিধির নিকট ফেরত প্রদানের সময়, সংশ্লিষ্ট পশু গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে উক্ত পশুর জব্দকালীন ব্যয়িত সকল অর্থ পরিশোধের রশিদ প্রদর্শন ও জমাদান করিতে হইবে এবং ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্তরূপ রশিদ স্বীয় কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন।

১৮। **পশু হাসপাতাল, গবাদি পশুর খামার ইত্যাদি নিবন্ধনের পদ্ধতি ও শর্তাবলী।** (১) পশু হাসপাতাল, গবাদিপশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, প্রজননের উদ্দেশ্যে রক্তাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন গরু, মহিষ, ষাঁড়, পাঁঠা, ছাগী ইত্যাদি নিবন্ধনের জন্য তফসিল-৬ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণের নিকট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফরম ৮ক, ৮খ, ৮গ, ৮ঘ, ৮ঙ, ৮চ, ৮ছ, ৮জ বা ৮ঝ পূরণপূর্বক আবেদন করিতে হইবে। (২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধন প্রাপ্তির লক্ষ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট তে উল্লিখিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে। (৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ভেটেরিনারি কর্মকর্তা আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট এ উল্লিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবেন। (৪) যদি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান তফসিল ৭ক, ৭খ, ৭গ, ৭ঘ, ৭ঙ, ৭চ, ৭ছ, ৭জ, ৭ঝ, ৭ঞ বা ৭ট তে, ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য, শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির ফরম-৯ এ নিবন্ধন করা যাইবে।

১৯। **নিবন্ধনের মেয়াদ, নবায়ন, ফিস ইত্যাদি।** (১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন এর মেয়াদ হইবে নিবন্ধনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর। (২) নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যূন তিন মাস পূর্বে নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিলে তিনি নবায়নের জন্য জরিমানাসহ অনধিক তিন মাস সময় সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৪) নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস সরকার সময় সময় গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারণ করিবে।

২০। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময়।** (১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, আইনের ধারা ২৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জরুরী ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন খামার, পশু রাখিবার স্থান, ভূমি, দালানকোঠা, পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা বা অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করিতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন সময় উপরি-উল্লিখিত এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত এলাকায় প্রবেশের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করিবেন। (৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত এলাকায় প্রবেশ করিবার পূর্বে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, তাহার সহকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন।

২১। **অর্থ জমাদান**। এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত অর্থ, ক্ষেত্রমত, সমন্বয়ের পর সরকারি বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হইবে।

তফসিল এবং ফরম সমূহ

পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ বিধিমালার তফসিল ও ফরম সমূহের তালিকা নিম্নে দেয়া হল। স্থানাভাবে এখানে বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই বিধিমালা থেকে তফসিল ও ফরম সমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

তফসিল-১: পশুরোগের শ্রেণীবিন্যাস [বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য]
তফসিল-২: রোগের কারণ, বিস্তার, সুপ্তিকাল এবং পৃথকীকরণের ধরন ও সময় [বিধি-৫ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৩: বিভিন্ন রোগ পরীক্ষার জন্য সংগৃহীতব্য নমুনা [বিধি-৯(১) দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৪: বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত পরীক্ষা [বিধি-৯(২) দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৫: হাঁস-মুরগির ব্রিডিং ও হ্যাচারীর বিভিন্ন রোগ ও আক্রান্ত পশু ধ্বংসের পদ্ধতি [বিধি-১৫ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৬: নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ক): দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খুচরা বিক্রয় স্থাপনা পরিচালনার শর্তাবলী ঃ [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(খ): গবাদিপশুর রক্তাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্রূণ উৎপাদন ও স্থানান্তর, দাতা গাভী, ষাঁড়, পাঁঠা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্রিডিং সেন্টার পরিচালনার জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের শর্তাবলী ঃ [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(গ): গ্রান্ড গ্র্যান্ড/গ্রান্ড প্যারেন্ট (জিজিপি/জিপি) স্টক খামার স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ঘ): প্যারেন্ট খামার স্থাপন এর শর্তাবলী ঃ [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ঙ): বাণিজ্যিক খামার (জিপি ও পিএস বাদে) স্থাপন এর শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭ (চ): বেসরকারি ভেটেরিনারি ল্যাবরেটরী স্থাপন এর শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ছ): মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(জ): মাংসের হাড় ছাড়ানো (deborning) ও প্যাকিং (packing) প্ল্যান্ট পরিচালনার শর্তাবলী ঃ [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ঝ): বেসরকারি ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপনের শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ঞ): বেসরকারি সাপের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
তফসিল-৭(ট): বেসরকারি কুমিরের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলী [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-১: রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী [বিধি-৪ দ্রষ্টব্য]
ফরম-২: সংক্রমিত এলাকার ভিতর দিয়া পশু পরিবহনের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সনদপত্র [বিধি-৭(ঝ) দ্রষ্টব্য]
ফরম-৩: সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া পরিবহনকৃত পশুর ছাড়পত্র [বিধি-৭(ঞ) দ্রষ্টব্য]
ফরম-৪: পোস্ট মর্টেম [বিধি-১০ (২ ও ৩) দ্রষ্টব্য]
ফরম-৫: টিকা প্রদানের সনদপত্র [বিধি-১২ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৬: জব্দকৃত পশুর রেজিস্টার [বিধি-১৬(১) দ্রষ্টব্য]
ফরম-৭: জব্দকৃত পশুর জন্য ব্যয় রেজিস্টার [বিধি-১৬ (১) দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(ক): পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(খ): নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(গ): গ্রান্ড গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক/গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(ঘ): হাঁস-মুরগির প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(ঙ): বেসরকারি পশু রোগ নির্ণয় গবেষণাগারের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(চ): বেসরকারি পশু হাসপাতালের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(ছ): গরু/মহিষ/ছাগল/ভেড়া সহ বিভিন্ন রোমন্থক পশুর বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদনপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(জ): কৃত্রিম প্রজনন কার্যে ব্যবহারের ষাঁড়ের প্রজনন স্বাস্থ্য উপযুক্তার (breed soundness) অনুমোদন ফরম [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৮(ঝ): বেসরকারি সাপ/কুমির-এর বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন পত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]
ফরম-৯: নিবন্ধন সনদপত্র [বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ২৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য-২ (আইন) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১০-আইন/২০১৫- পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **সরকার, পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল**, যথাঃ-
উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ১৯ এর উপ-বিধি-
(অ) (১) এ উল্লিখিত ‘৫’ সংখ্যাটির পরিবর্তে ‘১ (এক)’ সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি;
(আ) (২) এ উল্লিখিত ‘তিন’ শব্দটির পরিবর্তে ‘১ (এক)’ সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি; এবং
(ই) (৩) এ উল্লিখিত ‘তিন’ শব্দটির পরিবর্তে ‘১ (এক)’ সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি;
প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) ফরম-৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ফরম-৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

‘ফরম-৯

নিবন্ধন সনদপত্র

[বিধি-১৮ দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধন নং .... তারিখ ....
জনাব/মেসার্স .... এর .... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে .... কে .... স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিবন্ধন প্রদান করা হইল।

এই নিবন্ধনের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে এবং .... তারিখের মধ্যে নবায়ন করিতে হইবে।

নিবন্ধন প্রদানকারী ভেটেরিনারি কর্মকর্তা
স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ:

(দাপ্তরিক সীল)

নবায়ন তারিখ
ও
কর্মকর্তার স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
একেএম মুখলেছুর রহমান
উপ-সচিব।

১৪.২.৫ বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫

ইহা ২০০৫ সনের ৬ নং আইন। পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে এই আইনটি প্রণীত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'প্রাণিসম্পদ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প' এর আওতায় সারাদেশে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। এই নবনির্মিত কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলো দেশের পশুপাখির রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। নিম্নে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোর নাম দেয়া হল।

- হযরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা
- আইসিডির, তেজগাঁও, ঢাকা
- কামালপুর স্থল বন্দর, বক্সীগঞ্জ, জামালপুর
- বেনাপোল স্থল বন্দর, শার্শা, যশোর
- দর্শনা স্থল বন্দর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
- ভোমরা স্থল বন্দর, সাতক্ষীরা
- মংলা সমুদ্র বন্দর, মংলা, বাগেরহাট
- সোনা মসজিদ স্থল বন্দর, শিবগঞ্জ, রাজশাহী
- রোহনপুর স্থল বন্দর, গোমস্তাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
- হিলি স্থল বন্দর, হাকিমপুর, দিনাজপুর
- বিরল স্থল বন্দর, বিরল, দিনাজপুর
- বাংলাবান্দা স্থল বন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
- বুড়িমারী স্থল বন্দর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
- ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট
- তামাবিল স্থল বন্দর, গোয়াইনঘাট, সিলেট
- জকিগঞ্জ স্থল বন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট
- সুতারকান্দি স্থল বন্দর, বিয়ানিবাজার, সিলেট
- বিটুলী স্থল বন্দর, মৌলভীবাজার
- শাহ আমানত বিমান বন্দর, চট্রগ্রাম
- চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দর, চট্রগ্রাম
- টেকনাফ স্থল বন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার
- বিবিরবাজার স্থল বন্দর, কুমিল্লা
- বেলুনিয়া স্থল বন্দর, পরশুরাম, ফেনী
- আখাউড়া স্থল বন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫

(২০০৫ সনের ৬ নং আইন)

[২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫]

পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রণীত আইন। যেহেতু পশু রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (ক) 'আমদানি' অর্থ কোন পশু বা পশুজাত পণ্য জল, স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশে আনয়ন; (খ) 'উপযুক্ততা সনদ' অর্থ কোন পশুজাত পণ্য মানুষ বা পশুর খাদ্য বা ব্যবহারের উপযুক্ততা সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত উপযুক্ততা সনদ; (গ) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (ঘ) 'পশু' অর্থে নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ- (অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী; (আ) পাখি; (ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; (ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং (উ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশু। (ঙ) 'পশুজাত পণ্য' অর্থ পশু বা পশুর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরুপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে কোন পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হইতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত পশুদেহের অন্য যে কোন অংশ বা পশুজাত পণ্যও

	উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (চ) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898); (ছ) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (জ) 'মৃতদেহ' অর্থ কোন পশুর মৃতদেহ এবং ইহার যে কোন অংশও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (ঝ) 'স্বাস্থ্যসনদ' অর্থ পশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য সনদ; (ঞ) 'রপ্তানি' অর্থ কোন পশু বা পশুজাত পণ্য জল, স্থল ও আকাশপথে বাংলাদেশ হইতে বিদেশে প্রেরণ; (ট) 'রোগাক্রান্ত' অর্থ কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন রোগে আক্রান্ত; (ঠ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; (ড) 'সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা' অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা; এবং (ঢ) 'সঙ্গনিরোধ' অর্থ পশু রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধকল্পে পশু বা পশুজাত পণ্য স্বতন্ত্রীকরণ (isolation) এবং পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন স্থান বা আঙ্গিনায় আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে উক্ত পশু বা পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরীণ রাখা।
পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি	৩। The Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর অধীন সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত আমদানি বা রপ্তানি নীতি আদেশে বিধৃত শর্তে কোন পশু বা মানুষের রোগের কারণ হইতে পারে এইরূপ কোন পশু বা পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ, আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমিত বা অন্য কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।
ধারা ৩ এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের কার্যকরতা	৪। ধারা ৩ এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা The Customs Act, 1969 (IV of 1969), অতঃপর এই ধারায় উক্ত অপঃ বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা-১৬ এর অধীন জারী করা হইয়াছে, এবং উক্ত অপঃ এর অধীন কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক কর্মকর্তাদের, সময় সময়, বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার যেই ক্ষমতা রহিয়াছে সেই একই ক্ষমতা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পশু বা পশুজাত পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে, এবং উক্ত অপঃ এর বিধানাবলী একইরূপে এই আইনের ক্ষেত্রেও বলবৎ থাকিবে।
আগমন বা বহির্গমন স্থান নির্ধারণ	৫। এই আইনের অধীন সঙ্গনিরোধের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পশু বা পশুজাত পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে আগমন বা বহির্গমন স্থান এবং উহার সীমা নির্ধারণ করিবে।
সঙ্গনিরোধের জন্য পশু এবং পশুজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ	৬। সঙ্গনিরোধের জন্য আটক সকল পশু এবং পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, এবং তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত পশু এবং পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী	৭। এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:- (ক) সঙ্গনিরোধের জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য আটক; (খ) সঙ্গনিরোধের জন্য আটক পশু ও পশুজাত পণ্য পরিদর্শন; (গ) সঙ্গনিরোধের সময়সীমা নির্ধারণ; (ঘ) সঙ্গনিরোধাবস্থা হইতে পশু ও পশুজাত পণ্য মুক্তকরণ; (ঙ) নির্ধারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্নের জন্য যথাযথ আদেশ দান; (চ) সঙ্গনিরোধের জন্য আটক পশুর স্বাস্থ্যসনদ ইস্যুকরণ; (ছ) নির্ধারিত পরীক্ষা সম্পন্নের পর রোগাক্রান্ত বলিয়া সনাক্তকৃত পশু বা সংক্রমিত পশুজাত পণ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধ্বংসকরণ বা অন্যকোনভাবে নিষ্পত্তির আদেশ দান; (জ) রোগাক্রান্ত পশু ও পশুজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন পশুর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড় ও খাঁচা অপসারণের আদেশ দান; (ঝ) পশু ও পশুজাত পণ্য পরিবহনের কার্যে ব্যবহৃত কোন যানবাহন বা আঙ্গিনা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঞ) ভ্রমণের অযোগ্য পশু রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ; (ট) আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে পরিবহনকালে ভ্রমণ বিরতির সময় পশু বা পশুজাত পণ্য পরিদর্শন ও তৎসংক্রান্ত সনদপত্র প্রদান; (ঠ) সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পশু বা পশুজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পশু বা পশুজাত পণ্য আমদানিকারকের নিজ খরচে উহা ফেরত প্রদান বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির আদেশ দান; এবং (ড) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ।

সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি	৮। (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন করিবে।
আমদানিকারক কর্তৃক আমদানির বিষয়ে অবহিতকরণ	৯। প্রত্যেক আমদানিকারক কোন পশু ও পশুজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত আমদানির অন্যুন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উক্ত আমদানিতব্য পশু বা পশুজাত পণ্য সম্পর্কে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবে।
বাজেয়াপ্তযোগ্য পশু ও পশুজাত পণ্য, ইত্যাদি	১০। যদি আমদানিকৃত কোন পশু বা পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক সঙ্গনিরোধের সময় নির্ধারিত পরীক্ষা সম্পাদনের পর- (ক) উক্ত পশু রোগাক্রান্ত বলিয়া সনাক্ত হয়, এবং উক্ত রোগ চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে রোগমুক্ত করা সম্ভব না হয়; বা (খ) উক্ত পশুজাত পণ্য সংক্রমিত বলিয়া সনাক্ত হয় এবং উহা মানুষের বা পশুর খাদ্য বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়; তাহা হইলে রোগাক্রান্ত বলিয়া সনাক্তকৃত উক্ত পশু বা রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ পশুর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড়, খাঁচা বা অন্যান্য দ্রব্য বা উক্ত পশুজাত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
বাজেয়াপ্তকৃত পশু, ইত্যাদির নিষ্পত্তি বা বিলি-বন্দেজ	১১। ধারা ১০ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য পশু ও পশুজাত পণ্য বা পশুর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড় ও খাঁচা বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উহা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অপসারণের বা অন্য কোন পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি বা বিলি-বন্দেজের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
পশু বা পশুজাত পণ্যের রপ্তানির বিধান	১২। কোন পশু বা পশুজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সঙ্গনিরোধের জন্য পালনীয় শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
বৈধ আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকে আমদানিকৃত পশু বা পশুজাত পণ্য সম্পর্কিত বিধান	১৩। যদি বৈধ আমদানি লাইসেন্স এবং স্বাস্থ্য সনদ ব্যতিরেকে কোন পশু বা পশুজাত পণ্য আমদানি করা হয় এবং যদি উক্ত পশু সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত না হয়, বা পশুজাত পণ্য যদি সংক্রমিত না হয়, তাহা হইলে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।
প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, ইত্যাদি	১৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে- (ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট; এবং (খ) আদেশটি যদি সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দাখিল হইলে, উহা দাখিলের অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।
দায়মুক্তি	১৫। এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক, সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বা তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।
অব্যাহতি	১৬। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন পশু শ্রেণী বা পশু বা পশুজাত পণ্যকে এই আইনের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকরতা হইতে, উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্তে, অব্যাহতি দিতে পারিবে।
কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ	১৭। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার,

সংঘটন	কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা-এই ধারায়- (ক) 'কোম্পানী' বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত; এবং (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ	১৮। সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।
ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ বিচার, ইত্যাদি	১৯। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।
দন্ড	২০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা বিধির কোন বিধান লংঘন করেন বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রাপ্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লংঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড, বা অনূর্ধ্ব ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
আপীল	২১। এই আইনের অধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন দায়রা আদালতে আপীল করা যাইবে।
ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ	২২। এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।
অপরাধের আমল অযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	২৩। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমল-অযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইতে পারে, যথা:- (ক) পশু ও পশুজাত পণ্য আমদানির পূর্বে, আমদানিকালে বা আমদানির পরে পালনীয় শর্তাবলী নির্ধারণ; (খ) পশু ও পশুজাত পণ্যের অবতরণ, পরিদর্শন, সঙ্গনিরোধ, বাজেয়াপ্তকরণ, আটক এবং পশুর চিকিৎসা সেবার পদ্ধতি নির্ধারণ; (গ) রোগ সনাক্তকরণের নিমিত্ত যথাযথ পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ; (ঘ) পশু আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসনদের জন্য ফরম ও ফিস নির্ধারণসহ স্বাস্থ্যসনদ প্রদানের প্রয়োজনে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবা বা প্রতিষেধক টিকাদানের ফিস নির্ধারণ; (ঙ) পশুজাত পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে উপযুক্ততার সনদের জন্য ফরম ও ফিস নির্ধারণ; (চ) আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে আগমন ও বহির্গমন স্থানের সীমা নির্ধারণ; (ছ) পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গনিরোধ ব্যয়ের হার ও উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ; (জ) সঙ্গনিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল আঙ্গিনা, যানবাহন ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ; এবং (ঝ) আমদানিকৃত পশু সনাক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ।
ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	২৫। এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (authentic english text) নামে অভিহিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।
রহিতকরণ ও হেফাজত	২৬। (১) The Livestock Importation Act, 1898 (Act IX of 1898) এতদ্বারা রহিত করা হইল। (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইন কার্যকর হওয়ার অব্যবহিতপূর্বে রহিতকৃত অপঃ এর অধীন কোন কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত অপঃ এর বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন কার্যকর হয় নাই।

১৪.২.৬ National Livestock Development Policy, 2007

The National Livestock Development Policy is an important policy for livestock development in Bangladesh.

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Fisheries and Livestock

National Livestock Development Policy, 2007

www.dls.gov.bd

1. Introduction

Livestock plays an important role in the national economy of Bangladesh with a direct contribution of around 3 % percent to the agricultural GDP and providing 15 percent of total employment in the economy. The livestock sub-sector that includes poultry offers important employment and livelihood opportunities particularly for the rural poor, including the functionally landless, many of whom regard livestock as a main livelihood option. About 75 percent people rely on livestock to some extent for their livelihood, which clearly indicates that the poverty reduction potential of the livestock sub-sector is high. According to Bangladesh Economic Review, (2006), the growth rate in GDP in 2004-05 for livestock was the highest of any sub-sector at 7.23%, compared to 0.15% for crops, and 3.65% for fisheries sub-sector. These changes have been prompted by a rapid growth in demand for livestock products due to increase in income, rising population, and urban growth.

It is an established fact that high quality animal protein in the form of milk, meat and eggs is extremely important for the proper physical and mental growth of human being. In Bangladesh, around 8% of total protein for human consumption comes from livestock. Hides and skin of cattle, buffaloes, goats and sheep are valuable export items, ranked third in earnings after RMG and shrimp. Surprisingly, Bangladesh has one of the highest cattle densities: 145 large ruminants/km2 compared with 90 for India, 30 for Ethiopia, and 20 for Brazil. But most of them trace their origin to a poor genetic base. The average weight of local cattle ranges from 125 to 150 kg for cows and from 200 to 250 kg for bulls that falls 25-35% short of the average weight of all-purpose cattle in India. Milk yields are extremely low: 200-250 litre during a 10-month lactation period in contrast to 800 litre for Pakistan, 500 litre for India, and 700 litre for all Asia. Despite highest cattle densities in Bangladesh, the current production of milk, meat and eggs are inadequate to meet the current requirement and the deficits are 85.9, 77.4 and 73.1% respectively. If 5% GDP growth rate is considered then the current production of these commodities need to be increased 2.5 to 3.0 times by the year 2020 to feed the growing population in the country. This illustrates how urgent is the need to increase the production of milk, meat and eggs. The PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper) stresses the importance of the livestock sub-sector in

sustaining the acceleration of poverty reduction in the country. The dynamic potential of this emerging sub-sector thus requires critical policy attention.

In the past, due importance was not given to the development of the livestock sub-sector despite its significant contribution to the national economy. In the Financial Year 2006-07 the livestock sub-sector received only about 1.0 percent of the total budget allocation, or only about 3.5 percent of the agricultural sector budget. Though production of animal protein has maintained an upward trend, per capita availability of animal protein presently stands at around 21 gm meat/day, 43 ml milk/day and 41 eggs/year vis-a-vis the recommended intakes of 120 gm meat/day, 250 ml milk/day and 104 eggs/year. Shortage of quality inputs, inadequate services and physical infrastructure, institutional weaknesses in terms of weak regulatory framework and enforcement, limited skilled manpower and resources, and inadequate research and technological advancement are all continuing to act as constraints to livestock development.

The growth opportunities in the livestock sub-sector vary significantly among the species. Qualitative rather than quantitative development of large ruminants (cattle and buffalo), a parallel increase of the productivity and population size of the small ruminants (goat and sheep), and poultry keeping emerges as promising to offer substantial growth potentials with a positive impact on nutrition, employment and poverty alleviation. Research and technological development merit priority to counteract allied problems in the fields of feed, breed and disease and meet the challenge of the country's livestock sector in the 21st century.

National Livestock Development Policy has been prepared to address the key challenges and opportunity for a comprehensive sustainable development of the Livestock sub-sector through creating an enabling policy framework.

2. Objectives of the National Livestock Development Policy

The general objective of the National Livestock Development Policy:

To provide the enabling environment, opening up opportunities, and reducing risks and vulnerability for harnessing the full potential of livestock sub-sector to accelerate economic growth for reduction of rural poverty in which the private sector will remain the main actor, while the public sector will play facilitating and supportive role.

The specific objectives of the National Livestock Development Policy:

1. To promote sustainable improvements in productivity of milk, meat and egg production including processing and value addition;
2. To promote sustained improvements in income, nutrition, and employment for the landless, small and marginal farmers; and
3. To facilitate increased private sector participation and investments in livestock production, livestock services, market development and export of livestock products and by-products.

3. Legal Status of the National Livestock Development Policy

All the government and autonomous organizations, multi-national institutions, NGOs, CBOs (community based organizations), and persons who are working within the geographical territory of Bangladesh for the management, development and conservation of Livestock resources, import-export or other business related to the livestock sub-sector will be under the perview of National livestock Development Policy.

4. Scope of the National Livestock Development Policy

The following ten critical areas have been identified for formulating the National livestock Development policy:

i. Dairy Development and Meat Production;
ii. Poultry Development;
iii. Veterinary Services and Animal Health;
iv. Feeds and Fodder Management;
v. Breeds Development;
vi. Hides and Skins;
vii. Marketing of Livestock Products;
vii. International Trade Management
viii. Access to Credit and Insurance; and
ix. Institutional Development for Research and Extension

The key policy issues for each of these critical areas are outlined in the following section:

4.1 Dairy Development and Meat Production

Dairy Development

The opportunity for development of large-scale dairy is limited in Bangladesh due to scarcity of land. However, the potential for development of smallholder dairy is high. Over the last few years, small-scale dairy farming has increased significantly with the support of credit, feed, veterinary services and provision of self-insurance systems. Small-scale dairy farming provides employment for the poorer segments of the population. The availability of this form of traditional self-employment to rural dwellers, particularly women, is important where there is scarcity of alternative income generating opportunities. Smallholder dairy thus widens the scope for the poor with limited access to land to enhance their income. Dairy animals can play a crucial role in household food security, through improved income and nutrition of the low-income groups. Daily farming in Bangladesh is affected by myriads of constraints such as: (i) limited knowledge and technical skills of smallholder dairy farmers; (ii) scarcity of feeds and fodder; (iii) poor quality of feeds; (iv) frequent occurrence of diseases; (v) limited coverage of veterinary services including poor diagnostic facilities; (vi) lack of credit support; (vii) limited milk collection and processing facilities and low

prices at collection points; (viii) lack of insurance coverage; (ix) absence of market information; (x) lack of appropriate breeds; and (xi) absence of a regulatory body.

Policy framework for dairy development is:

1. Cooperative dairy development (Milk Vita model) would be expanded in potential areas of the country;
2. Successful pro-poor models for community-based smallholder dairy development including appropriate contact farming schemes would be replicated;
3. Smallholder dairy farming, integrated with crop and fish culture would be promoted;
4. Supply chain based production, processing and marketing of milk and milk products would be promoted;
5. A National Dairy Development Board would be established as a regulatory body to promote dairy development;
6. “National Dairy Research Institute” would be established to carry out research in various aspects of dairying.

Meat Production

Around 3.5 million cattle are slaughtered annually in the country of which 40 percent are imported through cross-border trade. Around 15 million goats are slaughtered annually mostly of local origin. Of the total slaughter of cattle and goats, around 40 percent is performed during Eid-ul-Azha. Increased demand for quality meat, beef production has become an important income generating activity for small fanners, and a potentially important tool for reducing poverty. Beef production is considered to have high income generating potential, but faces constraints such as lack of appropriate breeds, knowledge gaps of farmers, lack of proper veterinary services and quality feeds. Most meat is handled under unsatisfactory sanitary conditions in both rural and urban areas. Enforcement of legislation relating to slaughtering or meat inspection is weak. There is generally poor pre-slaughter conditions, sanitation, removal of waste materials, and disposal of offal. The Black Bengal goat is a highly prolific native breed that can be easily raised on low quality feed and with little investments. Rearing of Black Bengal goat is an appropriate option for many subsistence farmers. Its demand is growing in both domestic meat markets and internationally for its skins and high quality leather goods.

Policy framework for meat production:

1. Animal Slaughter Act and Animal Feed Act would be approved and enforced in order to promote hygienic production of quality meat;
2. Butchers would be trained on scientific methods of slaughtering, meat processing and preservation techniques;
3. Development of beef breeds for increased productivity at farm level;
4. Development of backward and forward linkage system to help improvement of existing cattle fattening system into private enterprises;

5. Private sector would be encouraged to establish mechanized slaughter houses with Static Flaying Frame around big cities; and Local Government would be encouraged to establish slaughter slabs in municipality and Upazila headquarters;
6. Production of Black Bengal Goats would be promoted by ensuring disease prevention, availability of quality bucks and semen for artificial insemination, and knowledge transfer through special projects;
7. Buffalo and sheep farming would be developed in selected high potential areas through special projects.

4.2 Poultry Development

The backyard poultry units require minimum inputs and are often part of integrated crop-aquaculture-livestock farming systems. Their level of production is relatively low but profitability can be high due to low inputs costs and recycling of on-farm by-products. Commercial production systems use birds of improved genetic stock and reared under semi-intensive or intensive management. There are currently an estimated around 100,000 commercial poultry farms in Bangladesh, supported by 08 Grand Parent Farms and 130 Parent Stock Farms. While the growth of the poultry industry has contributed to economic growth and income of commercial farmers, indiscriminate and unplanned growth of breeder farms and commercial poultry farms, particularly in and around cities and towns is creating environmental hazards. There are at present no guidelines for environmental protection and bio-security when establishing poultry farms. The use of antibiotics in feeds is thought to be common and a cause of public health concern.

The constraints facing the sector in general include: (i) lack of infrastructure beyond the Upazila Head Quarters for providing services to poultry farmers; (ii) shortage of skilled manpower; (iii) shortage of quality chicks and breeding materials; (iv) shortage of poultry , feed/feed ingredients and high prices; (v) poor quality of inputs; (vi) lack of quality control facilities for medicine, vaccines and biological products, feed and feed ingredients, chicks, eggs and birds; (vii) drug and vaccine residues in poultry meat; (viii) shortage of vaccines; (ix) lack of organized marketing systems; (x) poor provision of veterinary services; and (xi) insufficient credit and capital especially for the poor. The possible threat of Avian Influenza exacerbates some of these concerns and shortcomings and would require additional measures to be taken.

Policy framework or Poultry Development:

1. Successful pro-poor models would be replicated for semi-scavenging poultry development;
2. Formation of poultry smallholder groups, CBOs, and producers associations would be facilitated;
3. Quality control of poultry feeds and feed ingredients would be ensured through establishment of a legal body and enforcement of regulations;
4. Production and consumption of safe meat, milk and eggs would be ensured;

5. Organic meat, milk and eggs production would be promoted;
6. Criteria and guidelines would be established to ensure supply of quality day-old chicks;
7. Specific guidelines would be developed and enforced for establishing environment-friendly commercial poultry farms. Small commercial farms would be converted into profit oriented large farms following cooperative system;
8. Poultry farms of the DLS would be utilized as breeding and multiplication farms / centres for smallholder training, technology testing and demonstration etc;
9. Smallholder production and marketing of ducks and minor poultry species (e.g.Quail, Goose, Pigeon, Guinea fowl) in selected areas would be promoted;
10. Government has already declared BLRI as National Reference Laboratory for detection of Avian Influenza virus and other emerging diseases. It would be strengthened at International standard;
11. National Avian Flu Preparedness Plan would be implemented;
12. All Commercial Poultry farms will be registered with DLS;
13. Bio safety protocol developed by the MoFL should be followed by the concern stakeholders.

4.3 Veterinary Services and Animal Health

Inadequate veterinary services are one of the major obstacles for livestock development in Bangladesh. The ratio of Veterinary Surgeons to farm animals and birds was estimated at I: 1.7 million and only 15-20 percent of farm animals receive routine vaccination. Private sector investment in the animal health sector remains low and is expanding gradully. The quality and quantity of vaccines produced and delivered by the DLS are inadequate. The use of subsidies in vaccine production in present form is a possible deterrent to private investors. There is no independent authority to check the quality of domestically produced or imported vaccines. Vaccination is done in a haphazard manner without any strategic plan for controlling the targeted diseases. There are no provisions for movement control and quarantine during disease outbreak or epidemics.

No registration is required for feed additives such as toxins binder, antibiotics, and vitamin-mineral premixes, animal protein, many of which are potentially detrimental to human health. Most of the drugs traders and shop keepers have no formal training on drug handling, transportation, storing and dispensing, and readily sell drugs such as antibiotics, hormones, and sedatives across the counter without prescription. Disease diagnostic facilities are limited. The DVH (District Veterinary Hospitals), Regional FDIL (Field Diseases Investigation Laboratories), and the CDIL (Central Disease Investigation Laboratory of DLS are responsible for providing diagnostic services. However, due to shortage of skilled manpower and non-availability of funds they cannot provide the intended services. There is no provision for residue analysis of drugs, heavy metals, hormones, pesticides and toxins in foods of animal origin. There are only few local veterinarians trained in clinical pathology to diagnose diseases properly.

The disease surveillance system is almost non-existent. 'The Veterinary Public Health Unit in the DLS has the mandate to perform diagnosis, surveillance and control of zoonotic diseases, ensure food safety of animal origin, and liaison with the Health Department. The Unit is however, suffering from serious shortages of human capital, funding and laboratory facilities. It has no legal framework to implement its mandate. Coordination between animal and human health bodies is virtually non-existent. Veterinary research is similarly constrained due to shortages of staff and funds. Very limited fund is available for veterinary research. There are important areas of public goods services like veterinary epidemiology, veterinary public health, food safety and diagnostic techniques within which research needs to be expanded urgently. The Animal Quarantine Act enacted (Act no-VI of 2005) by the Parliament, but quarantine stations, manpower and funds to enforce the Act are not in place yet. Laws and Regulations are essential for high quality service delivery and quality assurance of products for trade. Some laws and regulations are in place but overall regulatory framework and implementation remain very weak.

Policy framework for Veterinary Services and Animal Health:

1. Soft loans would be provided to accelerate the development of private veterinary services;
2. Community-based veterinary service would be developed through special projects;
3. Mobile veterinary services will be provided by DLS;
4. An autonomous Quality Control Agency would be established to ensure quality of veterinary drugs, vaccines, feeds, feed ingredients and breeding tools and materials;
5. A licensing system for veterinary pharmacists and a quality monitoring system of veterinary services would be introduced;
6. Veterinary research would be strengthened in critical areas, particularly those related to provision of public goods and services;
7. Veterinary public health services would be strengthened and closer linkages with the Department of Health would be established;
8. Capacities of disease investigation network of DLS would be strengthened for disease surveillance, quarantine services and emergency planning to manage major disease outbreaks including Avian Influenza and other emerging diseases;
9. Specific strategy would be developed for controlling economically important trans-boundary animal diseases;
10. Veterinary Council would be strengthened to help ensure quality veterinary services;
11. "National Livestock Health Disaster Committee" would be formed including all trade organizations to combat crises related to animal and human health;
12. A separate "Veterinary Cell" would be established in Department of Drug Administration for facilitating decision making on veterinary drug registration and approval in Bangladesh. Animal Health Companies Association and related trade association would be included in the committee to represent the private sector.
13. Promote and encourage private sector to set-up compliant veterinary diagnostic center, clinics and hospitals to cater the needs of the farmers and other beneficiaries.

4.4 Feeds and Fodder Management

The acute shortage of feeds and fodder is one of the single most important obstacles to livestock development in Bangladesh. The main constraints for feeds and feed management include: (i) shortage of feeds and fodder; (ii) scarcity of land for fodder production; (iii) seasonal fluctuations in supply of feeds and fodder; (iv) low quality feed; (v) high feed prices; and (vi) poor husbandry practices. Feed resources for large livestock are primarily derived from crop residues and cereal by-products as well as grasses, tree leaves and aquatic plants. Very little grain is available for animals. Feed concentrates contribute only a small portion of the feed. Feed resources for scavenging rural poultry comprise scattered grains from threshing floors, left over grains, pulses, broken rice, kitchen wastes, green grasses, insects, worms, left over boiled rice, etc. Because of increasing demand for human food land is intensively used for cereal production. Neither sufficient grazing land, nor spare land is available for growing fodder. This has resulted in shortages of quality forage for ruminant livestock, causing stunted growth, reproduction problems, reduced lactation, working inability, lower growth rates, and reduced productivity.

Most of the dairy and poultry farmers are facing the problem of adulterated and inferior quality of commercial feeds and feed ingredients. Feed labeling and control is inadequate. Most feed millers do not disclose the necessary information on the packaging with regards to feed composition, ingredients, date of manufacturing, date of expiry, storage guidelines, energy levels, and protein and vitamin contents. Feed millers are widely suspected of minimizing feed production costs either by use of inferior quality ingredients and/or inclusion of lower proportions of high value ingredients. Poor packaging materials contribute to reduced quality and shelf life.
Policy framework for Feeds and Animal Management:

1. Feed and fodder development strategy would be developed for community- based fodder cultivation along roads and highways, rivers and embankments, in Khas lands, and in combinations with crops;
2. Necessary support would be provided to the private sector for utilization and promotion of crop residues, agro-industrial by-products and unconventional feed resources as animal feed;
3. An Animal Feed Act would be approved and implemented to ensure feed quality; and
4. Resources would be provided for training of dairy farmers on improved animal management and husbandry practices.
5. Market driven industries should be developed on feed, feed additive, forage seed and forages;
6. Human resource should be developed for feed and fodder production.

4.5 Breeds Development

Livestock development through the application of science-led methods of breeds and breeding in Bangladesh is still at a rudimentary stage. There is, however, enthusiasm for

applying breeds and breeding interventions to enhance livestock performance. Lack of a national breeding policy, use of inappropriate breeds, weak infrastructure (human capacity, national service delivery, breeding farms), and limited technical knowledge has constrained the development of improved breeds. Available high yielding seed materials (in cattle and chicken industry) are mostly exotic and imported. However, not all of these imported exotic species adapt well under Bangladesh climatic conditions.

There are a number of promising well-adapted native livestock breeds in the country (e.g. Red Chittagong cattle, Black Bengal goat, Bengal sheep, Naked Neck chicken etc), which could be developed into high yielding breeds through cross breeding in a systematic manner. Importation of inappropriate genetic material coupled with indiscriminate crossbreeding and a clear neglect of indigenous breeds has created a situation, where a number of native breeds of livestock are under threat of extinction. Unplanned and sporadic attempts that were made for breed improvement of various species failed, because the initiatives were not based on thorough breed/ genotype testing results and not based on well-thought out and sound breeding goals, breeding criteria, animal recording systems, animal evaluation procedures, and animal selection and mating plans. Breeds and breeding program inherently requires heavy initial investments and regular and timely flow of resources. Sustained funding support for breeding work has not been forthcoming. As a result, the limited expertise available in this field remains underutilized.

There is no regulatory body or National Breeding Act to regulate breed imports, prices of breeding materials, merits and quality of breeds, breeding materials and breeding services. Within the existing cattle breeding services (including artificial insemination), farmers have little or no idea of the merit and quality of the semen being provided for insemination. The same is true for other species such as goats and buffaloes, and applies also to imported germplasm (live animals, semen, embryos, etc).

Policy framework for Breeds Development:

1. Conservation and utilization program of potential indigenous breeds for subsistence farming would be developed;
2. A comprehensive human resource development program in animal breeding would be developed;
3. Frozen semen production unit would be established/extended for wide scale artificial insemination of Cattle, Buffalo and Goats to face the challenges of service shortage of proven buck throughout the country;
4. ‘Breeders Association’ would be established for monitoring and coordination of livestock breeding activities in the country.

Breeds and Breeding:
Policy Recommendations

Rapid improvement in animal productivity for food security and livelihood leading to poverty reduction is needed in Bangladesh. The need for planning to intensify livestock

productivity is a crying need of the time. In order to maximize overall profitability, the herd/ flock must have appropriate combination of genetically high potential breeds along with good health care, feeding and management system. Appropriate breeding program is an important part of livestock development strategy. Breeding strategy usually aims at maximizing production per animal / bird. Conventional animal breeding techniques are based on quantitative genetics, essentially a statistical science and this approach has been very successful in temperate part of the globe. However, pre-requisites for breeds and breeding program are (a) accurate recording, (b) large herds / flocks or cooperation between small herds / flocks, (c) efficient artificial insemination and breeding organizations, and (d) a well-trained extension service. Very few developing countries including Bangladesh can afford to have such an infrastructure for animal breeding program. But one can always proceed in gradual fashion with priority needs.

It is essential to understand that implementation of a breeding program is a joint function of all pre-requisites mentioned above. The scientific rationale of designing a livestock breeding program encompasses:

i) Identification of production and marketing system
ii) Defining economic merit i.e. breeding objective
iii) Evaluation of available breeding stocks & crosses for economic merit (to choose the best stocks)
iv) Choice of appropriate breeding tools (pure breeding and crossbreeding)
v) Application of breeding tools:
   a) Development of animal recording system (pedigree & performance)
   b) Estimation of genetic parameters for at least target traits
   c) Development of genetic evaluation system (breeding value estimation)
   d) Application of rigorous selection on the basis of higher estimated breeding values (EBV)
   e) Designing mating plan (semen distribution strategy)
   f) Sound AI program (quality of semen and actual AI)
   g) Continuation of steps a to f generation after generation
vi) Development of testing and selection systems for further improvement
vii) Dissemination of improved stock to the industry or whole country
viii) System for production of superior breeding males including better samples arising in the industrial layers of the livestock population.

Breeding policy for increasing Milk, Meat and Egg Production

The main aim of livestock development programme in Bangladesh should be to assist farmers to produce and sustain livestock of high economic potential. As mentioned before only a small proportion of cattle and poultry industry are under commercial operation, the rest of the livestock breeds / types are predominantly indigenous and are under traditional subsistence mixed farming systems. The future efforts should, therefore, be focused on the

in situ development and conservation of potential breeds / types. Taking account the human population growth rate, socio-economic trend of the country and land available for agricultural operation of the country in future, the following cattle, buffalo, goat, sheep and duck & poultry breeding program is being recommended.

General consideration

To achieve the immediate and long-term goal, the implementation strategy should be partitioned into 3 action plans only for cattle and buffalo Viz.,

- Short-term activities (up to 5 years) for immediate effect on the existing production system
- Medium-term activities (6-10 years) for evaluating and intensifying the programme undertaken during the short-term period
- Long-term activities (11 years and beyond) for final evaluation and continuing the intensification process for sustainable development of the livestock industry

The total population (cattle and buffalo) should be categorized into 3 groups depending upon the management system:

- High level of input in which animals are confined full time in stall fed condition
- Medium level of input in which animals are confined partially in stall and are allowed for partial supplementary feed.
- Low level of input in which animals are maintained traditionally on crop residues and grazing with minimum supplement.

The following tools and techniques should be implemented:

- The breeding policy will be based on proper animal identification system
- Animal recording systems approved by ICAR (International Committee of Animal Recording) should be implemented and the semen of proven bulls/ pedigree bulls should be used.
- Attempts should be taken to produce bulls that are tested for growth, semen and are free from vertically transmissible infectious and hereditary diseases, and have quality and quantity semen, and finally have desired milk yield capacity.
- All stakeholders(GO, NGOs and private entrepreneurs) should follow this policy

1. Cattle

A. Short term policy (Up to 5 years)

1A(i) *For cows reared under intensive system i.e. high level of inputs supply and zero grazing*

Target/Goal: To produce dairy cattle that will yield more than 6000 kg milk per lactation (305 days lactation period) at the end of 5 years.

Policy: Inseminate the top most cross bred Holstein-Friesian cows (daily yield 10 kg or more) reared under intensive management system with imported semen of progeny tested

bulls of Holstein- Friesian cattle having milk yield capacity of 9,500 – 10,000 kg in 305 days lactation period. 1 million doses of such semen should be imported by DLS and inseminated maintaining proper records. Private sector should be encouraged to import such semen.

Action to be taken: The farmers should be selected from 10% top farmers depending on the production performance of the registered farms of DLS, who wish to maintain animal identification and recording system, be trained on modern techniques and intensive management of dairy farming including recycling of farm wastages and environmentally friendly farming. The herd size of the farm should be 5 breedable cows or more.

1A(ii) *For cows reared under semi intensive system i.e. medium level of inputs supply and minimum grazing*

Target/Goal: To produce dairy cattle that will yield more than 3000 kg milk per lactation (305 days lactation period) at the end of 5 years.

Policy: Inseminate cross bred Holstein- Friesian cows (yielding 6-10 kg milk a day) reared under semi intensive management system with semen of progeny tested 50 % Holstein-Friesian bulls (50% Holstein-Friesian X 50% Local) having milk yield capacity of about 4,500 kg in 305 days lactation period. The sahiwal or sahiwal cross bred cows should be inseminated with semen of Sahiwal bulls having at least 2,500 kg or more milk production potential per lactation.

Action to be taken: The farmers should be selected from the registered farms of DLS, BMPCUL, CLDDP and NGOs who maintain animal identification and recording system, wish to be trained on modern techniques and management of dairy farming and interested to practice recycling of farm wastages.

1A (iii) *For cows reared under low input production system*

Target/Goal: To produce native dairy cattle that will yield more than 1000 kg milk per lactation (305 days lactation period) at the end of 5 years.

Policy: Inseminate native cows reared under low input production system with semen of progeny tested/ pedigree bulls of Sahiwal, Pabna cattle, RCC, Munshigong, other improved deshi cattle.

Action to be taken: The farmers should be selected from the registered farms of DLS, BMPCUL, CLDDP and NGOs who maintain animal identification and recording system, wish to be trained on modern techniques and management of dairy farming and interested to practice recycling of farm wastages.

1A (iv) *Special breed test program for Jersey imported by BMPCUL (Milk Vita)*

The performance of Jersey should be tested by BLRI and BAU at Baghabari and in another operational area OF BMPCUL. If found suitable, this breed should be introduced under semi-intensive system.

1A (v) *Special conservation and improvement program for RCC, Pabna cattle and local variety*

The existing conservation and improvement program on RCC run by BAU, BLRI and DLS should be continued. Another conservation and improvement program on Pabna cattle should be undertaken immediately by BLRI, DLS, BMPCUL and BAU. All local variety should be preserved.

B. Medium term policy (6 -10 years)

1B(i) *For cows reared under high level of inputs supply and zero grazing*
Target/Goal: To produce dairy cattle that will yield more than 4500 kg milk per lactation (305 days lactation period) at the end of 10 years.
Policy: Inseminate the top most cross bred Holstein-Friesian cows reared under intensive management system with imported semen of progeny tested bull of Holstein-Friesian cattle having milk yield capacity of 9,500 – 10,000 kg in 305 days lactation period. The herd size of the farm should be 10 breedable cows or more.

1B(ii) *For cows reared under medium inputs production system*
Target/Goal: To produce dairy cattle that will yield more than 15 kg milk daily in 305 days lactation period (4,500 kg per lactation) at the end of 10 years.
Policy: Inseminate cross bred Holstein- Friesian cows (yielding 6-10 kg milk a day) reared under semi intensive management system with semen of progeny tested 50 % Holstein-Friesian bulls (50% Holstein-Friesian X 50% Local) having milk yield capacity of 6,000 kg in 305 days lactation period. The sahiwal or sahiwal cross bred cows should be inseminated with semen of Sahiwal bulls having at least 2,500 kg or more milk production potential per lactation.

1B(iii) *For cows reared under low inputs production system*
Target/Goal: To produce native dairy cattle that will yield more than 1500 kg milk per lactation (305 days lactation period) at the end of 10 years.
Policy: Inseminate the native cows reared under semi intensive management system with semen of progeny tested Pabna cattle, RCC and improved deshi bull etc.

1B (iv) *Special breeding program for Jersey imported by BMPCUL (Milk Vita)*
A decision will be taken from the field trail (to be carried out by BLRI and BAU) whether jersey breed will be used for breeding purpose in Bangladesh as 4th breeding line.

1B(v) *Special conservation and improvement program for RCC, Pabna cattle and local variety*
The conservation and improvement program on RCC run by BAU, BLRI and DLS should be continued. Another conservation and improvement program on Pabna cattle should be continued. All local variety should be preserved.

C. Long term policy (10 years and beyond)

A national seminar involving all concerned institutes will be organized to review the results of implementation of short and medium term breeding policy. Decision will be taken accordingly.

2. Buffalo For more Milk

2(i) *For buffaloes reared under intensive system i.e. high level of inputs supply and zero grazing*
Continuous up gradation of dairy buffaloes in the plain land with imported semen of Murrah, Nili-Ravi or Mediterranean Breed having milk yield production potentiality of 3,000 kg per lactation.

2(ii) *For buffaloes reared under semi- intensive system i.e. medium level of inputs system*
Use and fixed 50% gene of Murrah or Nili-Ravi 50% genes of native buffaloes. Practice of inter se mating.

2(iii) *For buffaloes reared under low input production system*
Fix and use 50% gene of Murrah or Nili-Ravi Breed and 50% genes of native buffaloes. Practice inter se mating.

2(iv) *For swamp buffaloes of greater Sylhet and Chittagong districts*
Special conservation program should be undertaken to conserve the swamp buffaloes of greater Sylhet and Chittagong districts through establishment of farms in respective regions.

3. Cattle for more meat-
- (i) Use dual purpose crossbred males (Friesian x Deshi) in the high input production system
- (ii) Use up-graded Brahman x Deshi (50% - 50%) germplasm under research trial
- (iii) Procure small doses of high merit Brahman semen from beef rich countries
- (iv) Use only improved Deshi males (Red Chittagong, Pabna and typical indigenous) in the subsistence low input production system

Suggested Breeding Policy for other species of Livestocks :

1. Goat for more meat -
- (i) Use high merit purebred Black Bengal buck or semen all over the country
- (ii) Ensure steady production of consistently superior pure Black Bengal buck or semen by government or other stakeholders

2. Sheep for more meat -
- (i) Use and fix up crossbred(Lohi/Romney Marsh x Deshi (50% X 50%) in the sheep pocket areas of the country
- (ii) Ensure steady production of consistently superior Lohi/Romney Marsh xDeshi ram or semen by government or other stakeholders

3. Chicken for more egg
- (i) Use of specialized germ lines for high input production system
- (ii) Initiate programme for in–country strain development using exotic and Deshi chicken genetic resources (e.g.improved Deshi)

4. Chicken for more meat

(i) Use of specialized germ lines for high input production system

(ii) Initiate programme for in-country strain development using exotic and Deshi chicken genetic resources (e.g. Naked Neck, Aseel, improved Deshi)

5. Duck for more egg-

(i) Use of specialized germ lines for high input production system

(ii) Initiate programme for in–country strain development using exotic and Deshi duck genetic resources (e.g. Khaki Campbell and Deshi)

6. Duck for more meat-

(i) Use of specialized germ lines for high input production system

(ii) Initiate programme for in-country strain development using exotic and Deshi duck genetic resources (e.g. Khaki Campbell and Deshi)

D. Plan of action in supporting breeding policy

Tools and techniques

The following steps should be adopted and implemented in order to achieve desired results:

1. The mechanism for implementation of aforesaid breeding policy be developed and monitored by an independent National Breeding Task Force to be formed by MOFL.
2. A technical regulatory committee be formed to certify the breeding establishment, stud animals, release of breeding materials for use in public and private sectors.
3. To implement this policy necessary funds and development projects should be provided by the government with most priority basis.
4. The existing dairy herd in Central Cattle Breeding & Dairy Farm, Savar, Dhaka and herds in other Govt. dairy farms should be reformed to match with this policy.
5. A suitable animal identification system should be developed and applied for all farmers.
6. ICAR approved animal recording system should be implemented in all registered herds.
7. All the bulls under breeding programme should be screened for transmissible infectious (FMD, Brucellosis, Trichochomonasis, Tuberculosis, BVD, MD) and hereditary (Translocation, Bovine leukemia) diseases.
8. Mass castration program should be in operation to inactivate the unused weaned male calves.
9. Advanced animal biotechnologies in the field of livestock breeding and reproduction particularly in the focal areas of embryo transfer, genetic engineering, production and use of sexed semen should be encouraged and implemented both at public and private sectors.
10. National gene bank for the conservation of genetic materials of local breeds / types of livestock species may be established. The national herd replacement system be introduced.

11. A defined roadmap of central and local semen distribution ensuring quantity and quality should be streamlined to match with the Policy.
12. The culled cows and bulls must be slaughtered to avoid negative effect on production.
13. Modern herd health and fertility management system should be implemented.
14. Modern feeding system should be introduced.
15. A special human resource development programme be developed for creating a pool of graduate with in-country M.S. and Ph.D. programmes in different areas of animal genetics, animal breeding, and animal reproduction to provide technical support to the breeding programs.
16. Export of cattle feeds should be banned.

E. Special Program for characterization of all livestock species

a. There should be a data base center under BLRI in cooperation of DLS and BAU to document the characteristics of all livestock species.
b. Concern scientists from DLS,BLRI and BAU should come together to form a scientific team for such compilation.

4.6 Hides and Skins

Leather including crust as well as finished leather and leather goods is an important export earner contributing about 6 to 7 percent of total export earnings. A large proportion of leather materials are however downgraded and rejected due to poor quality. Leather defects are reported to be responsible for a more than 50 percent cut in the value of leather. Cattle and goats are the major skin and hide producing species followed by buffalo and sheep. Most slaughtering takes place with inadequate facilities for electricity, water, and sewerage. There are an estimated 192 improvised slaughter houses at district level, 1215 at Upazila level and more than 3,000 slaughtering points in hats and bazaars as well as by road sides of cities and towns. Hides are in most cases removed by unskilled persons using inappropriate tools, giving rise to irregular shapes and flay cuts. Defects in goat and sheep skins have been significantly reduced in recent years with the introduction of hang and pull systems of flaying. Besides hides and skins, the slaughtering of animals generates potentially valuable by- products including blood, bones, hoofs, rumen and visceral contents, hairs, etc. Only a part of certain by-products, generated mainly in organized slaughter houses, are collected and processed by cottage level factories. Most of these by-products are discarded and thrown away, resulting in large economic losses and environmental pollution. Tannery operations are further impacting negatively on the environment.

Financing is a major problem, particularly the primary market intermediaries like farias and beparis suffer due to lack of adequate working capital and inadequate access to finance. The shortage of capital reduces the purchasing capacity of intermediaries and consequently, a large quantity of hides and skins are pilfered in the neighbouring country, especially during

Eid-ul-Azha. Ful1hennore, prices drop during Eid-ul-Azha, when large quantities of hides and skins are produced. The low prices in turn provide little incentive for proper flaying, handling and preservation.

Policy framework for Hides and Skins:

1. Butchers and merchants (Farias, Beparis and Aratdars) would be trained on basic knowledge of flaying, curing and storing for improved management and quality of hides and skins;
2. An autonomous agency would be established for quality control and certification of hides and skins;
3. Environmental legislation on slaughter and tannery operations would be framed and enforced;
4. Private sector would be encouraged to establish small to medium scale industries to utilize slaughter and tannery by-products for producing high quality feed supplement for animal feeds; and
5. Access to micro-finance and banking facilities would be improved for intermediaries.

4.7 Marketing of Livestock Products

Milk: There is no systematic marketing network and market information system for milk and milk products to support smallholder dairy farmers in the rural areas. Farmers sell milk either in the local market or to goal as (traditional milk collectors) who continue to render useful services to the rural community, and sometimes work as supplying agents to private firms. Commercial marketing of milk started in the late 1970s by Milk Vita. Milk Vita has established milk-processing plants in various places and collects milk from its cooperatives members. BRAC, Pran and CLDDP (Community Livestock and Dairy Development Project) have also recently installed milk processing, and a small number of other private farms are dealing with pasteurized milk. These enterprises however, only cover a part of the country. Most small-scale dairy farmers in rural areas sell their milk in local markets at around a third to half of the price at which milk is sold in the cities. Low prices and price fluctuations are found to be important constraints to increased production and higher income of milk producers. Milk production costs are largely determined by feed prices (wheat and rice bran), which are increasing, in some cases rapidly.

Meat: There is a high demand for meat in the local markets. In the past, the beef price was relatively low due the ready supply of cattle from neighbouring country. The supply has recently been restricted and as a result meat prices have increased sharply. Constraints to long-term development of the beef industry include lack of improved breeds, low meat quality, and limited access to credit and insurance amongst smallholders.

Eggs: The egg marketing system can be characterized as oligopolistic, under control of the Aratdars who extend credit to the poultry farmers who in turn are obliged to sell through the Aratdars for loan repayment. The price of eggs in large city markets is usually not known to

the rural poultry farmers The time and distance from collection to marketing is often long with traditional means of transportation. Spoilage and broken eggs are common

Policy framework for Marketing of Livestock Products:

1. Farmers groups and cooperatives formation would be encouraged and supported for collective marketing of livestock products by community based organizations and associations;
2. Organized marketing system should be established.
   c. Access to micro-finance and insurance schemes would be introduced / improved with emphasis on smallholder and women entrepreneurs;
   d. Farmer's information network for price data and processing of trade related information would be established with private sector support;
   e. An Internet-based communication system would be established alongside regular broadcasting of trade related information and monitoring and forecasting of prices of livestock products;
   f. Management Information Systems (MIS) would be established in the DLS on livestock product marketing;
   g. Government if required will intervene the market to ensure minimum price of egg and meat for farmers;
   h. Private sector would be encouraged to be involved in milk, meat and egg processing and other value added product manufacturing industries.

4.8 International Trade Management

In order to derive the full benefits of globalization and trade liberalization, Bangladesh must further develop its export products to satisfy product standard requirements of importing countries and obtain up-to-date information from different markets. Bangladesh is signatory of the WTO (World Trade Organization) Agreement on Agriculture (AOA). The AOA provides a framework for the long-term reforms of agriculture trade and domestic policies to move forwards market orientation in agricultural trade. The obligations and disciplines incorporated in the AOA relate to four aspects, viz, i) agreement on market access; ii) agreement on domestic support; iii) agreement on export competition/subsidy; and iv) agreement on SPS (sanitary and phytosanitary) measures. Bangladesh is not fully able to meet the recommended safety and quality standards for livestock products consistent with the SPS guidelines as regulated by the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Codex Alimentarius Commission. The main problem stem from: (i) inadequate veterinary services; (ii) lack of skilled human resources; (iii) lack of diagnostic facilities; (iv) lack of financial support; (v) lack of disease surveillance and monitoring of animal health; (vi) lack of updated food legislation; and (vii) need for an improved national food export inspection and certification program.

Incidences of TADs (trans-boundary animal diseases), such as foot and mouth disease, are preventing Bangladesh from entering potential markets for livestock products. As the

problem of TADs is being addressed on a larger scale, regional initiatives are becoming important and Bangladesh will seek the opportunity to enter into regional agreements to control TADs. This will necessitate significant changes in the veterinary service system, particularly within diagnostic services and veterinary public health. Most export-oriented enterprises are small and medium size, with limited capacity to undertake market research, invest in technologies, and collect, store, and process trade information. Other important challenges relate to meeting labour and environmental standards, improving design and packaging, and accessing and using up-to-date information on consumer preferences and trends in global markets. Many enterprises have neither the in-house capacity to gather the necessary trade-related information nor the networks to access such information.

Policy framework for International Trade Management:

1. Focal points would be set up in the DLS (Department of Livestock Services) and the MoFL (Ministry of Fisheries and Livestock) to deal with the international and regional trade agreements and ensure implementation of notifications and obligations;
2. Training would be provided to the officials in the DLS, MoFL and livestock related industries to enable them to fully appreciate and deal effectively with international and regional trade agreements;
3. Requirements of trade related technical assistance for the DLS, MoFL and private exporters would be assessed and required assistance would be provided;
4. The capacity of DLS would be developed through institutional reform to address SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) and HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) requirements;
5. An Internet-based communication system would be established to facilitate international market networking for livestock products;
6. MIS (Management Information Systems) would be established in the DLS and MoFL for international trade management of livestock products; and
7. Private sector participation would be ensured in all activities of international trade management.

4.9 Access to Credit and Insurance Credit

The effective coverage of micro credit programs in Bangladesh was around II million households in 2002 of which around 80% were below poverty line. It is estimated that less than a fifth of the total micro credit disbursed by NGOs till June 2001, was given to the livestock sub-sector mostly to poor women in rural areas. Financing of agricultural and other rural economic activities have not in the past attracted adequate interest of banks and institutional lenders. As recently as 2003 livestock attracted less than 5% of the total credit disbursed in the agricultural sector by state-owned lending institutions, although the trend in recent years has been sharply upwards.

The livestock development has accelerated the demand for concentrate feeds, drugs, vaccines, and veterinary services. These trends are expected to continue in the coming years

with resultant increases in demand for credit support. Expansion of livestock operations among poor smallholders and commercial livestock producers, as well as input suppliers (feed mills, drug producers, etc.) and processors of livestock products is thus expected to increase the demand for finance throughout the sub-sector, and will be needed to help facilitate continued horizontal and vertical integration.

The following constraints and challenges in particular characterize the micro-credit sector: (i) insufficient funds; (ii) inappropriately packaged loans for production cycles of livestock; (iii) red tape and collateral requirements effectively reducing credit access for smallholders, notably the poor; (iv) inadequate loan supervision; (v) insufficient training in financial management and business planning (applies to both loan providers and takers); (vi) inadequate technical support; (vi) inappropriate interest rate policies and practices; (vii) conflicts of interest within NGOs providing both technical and credit support often to the detriment of the former; (viii) smallholder vulnerability and risk from natural and man-made disasters; and (ix) better servicing of the hard-core poor.

Policy framework for Increasing Access to Credit:

1. Formation of CBOs (Community Based Organisations) linking them with DLS, NGOs, commercial banks, and insurance companies would be encouraged for delivery of appropriate livestock credit packages to the doorstep of smallscale livestock farmers including poor women;
2. A Livestock Credit Fund would be established in the Bangladesh Bank for distribution of subsidized credit to smallscale livestock farmers through CBOs;
3. Micro-finance packages better tailored to the production cycles of various livestock species would be promoted;
4. Micro-finance packages targeted towards and appropriate for the hard-core poor including women would be promoted;
5. Training would be provided to smallholder groups in livestock-related business planning and financial management;
6. Monitoring and supervision of micro finance institutions would be enhanced for adherence to international best practice; and
7. Micro-finance services would be separated from technical services where necessary for clearer regulation.

Insurance

Livestock production is subject to the risks of animal disease, accident, and death. The result is often a serious decline in farm income and consequent failure on the pa11 of especially poorer farmers to maintain their livelihoods. Livestock insurance can: i) provide protection against loss of livestock from accident or disease, stabilizing income; ii) raise credit worthiness; iii) contribute to a reduction in the incidences of animal death and accident by requiring certification of a minimum standard of animal husbandry practices; and iv) encourage development of cattle breeding and dairy industries.

Out of 62 insurance companies in Bangladesh, 60 are private companies of which none are involved in livestock insurance. Only a state owned insurance company, SBC (Sadharan Bima Corporation) has since 1980 been providing livestock insurance. It covers only projects financed by BKB (Bangladesh Krishi Bank) and other nationalized Commercial Banks. SBC insured 7.567 dairy animals between 1981 and 2003, indicating only very negligible insurance coverage for livestock. No modifications of the SBC insurance program have been made since 1985 to address the changing scenarios in the dairy and poultry industries.

There are at present none or only very few private sector companies with the skills or funds to initiate livestock insurance. There are no collaborative arrangements between insurance companies and public sector organizations to assist the companies in setting up insurance schemes. Milk Vita and CLDDP have developed a self-insurance scheme for their cooperative members and farmer groups/associations, which appears to be working well, Smallholders may not, however yet fully recognize and appreciate the implications and potential benefits of livestock insurance. Experience suggests that some level of subsidy for smallholder livestock enterprises may be necessary, at least during the initial period.

Policy framework for Increasing Access to Livestock Insurance:

1. In consultation with insurance companies, CBOs and NGOs and other stakeholders, a strategy for expansion of livestock insurance coverage would be developed;
2. A Livestock Insurance Development Fund would be established in scheduled Bank on consultation with Bangladesh Bank,
3. Self-insurance systems for smallholder farmers through community-based livestock development programmes would be promoted;
4. A national database on livestock mortality, disease incidence and productivity of livestock would be developed and maintained at the DLS; and
5. Awareness among smallholders on the benefits of livestock insurance schemes would be raised.

4.10 Institutional Development for Research and Extension

Livestock Research

To carry out livestock research in the public sector BLRI (Bangladesh Livestock Research Institute) was established under a Presidential Ordinance in 1984 as a semi-autonomous body. It is organized into eight research divisions and an administrative division, called the support service division. The research divisions are: (i) Animal Production; (ii) Poultry Production; (iii) Animal Health; (iv) System Research; (v) Socio-economics; (vi) Goat and Sheep Production; (vii) Biotechnology; and (viii) Planning, Training and Technology Demonstration. The 1984 Ordinance was amended in 1996 as an Act in line with the amendment of the Act of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC). The

functions of BLRI are not sharply focused and its structure has a number of deficiencies. There are many important new issues that are not reflected in the functions. Dramatic changes that have taken place in recent years within Bangladesh and internationally (globalization and trade liberalization combined with WTO regulations and OIE requirements), which have changed both domestic and the international market scenarios. In the context of these changes, the functions of BLRI need to be sharpened.

Major deficiencies exist in veterinary research, planning and management, human resource management, and information management. There is no Unit and staff to deal with planning, evaluation and monitoring. Veterinary research is done only on a limited scale under the Animal Health Division, There is no provision of a Director (Research), responsible for research planning, coordinating and monitoring the implementation of research projects; evaluating and reporting research outputs on a regular basis; and maintaining direct contact with DLS and sister research institutions, as well as liaison with other concerned Depertments. There is no management information system (MIS) for research at BLRI and Information management is generally weak.

The shortage of operating funds for research is acute in BLRI. The annual allocation shows a declining trend in real terms. BLRI has been entirely depending on the development budget and contract research grants from BARC (also under development projects) for carrying out research. This has restricted BLRI in developing and undertaking meaningful research programs to support the poverty reduction program of the Government.

BLRI has problems with training of its personnel. There is no provision for staff training or a built-in system of carrier progression within the research divisions like in the research institutes in the crop sector. This has created a high rate of attrition of qualified scientists.

Policy framework for Livestock Research:

1. Research capacity of BLRI headquarters and its Regional Stations would be enhanced to address national priority and untapped potential regional livestock resources;
2. Private and NGO initiatives in livestock research would be encouraged and supported;
2. The mandate, functions and structure of BLRI would be sharpened with a view to enhance the capacity to coordinate, maintain liaison with other concerned Departments; and conduct livestock research for pro-poor sustainable development;
3. Research capacites of BLRI and Universities/ Academic Institutes, would be extended to ensure safe production of animal products and by-products, animal protein supplement, feed additives, premixes, probiotics and mineral and vitamin supplements as inputs for poultry and livestock development;
4. The Act of BLRI would be amended to give greater autonomy to the Management Board and the Institute to bring it at par with the crop research institutes;
5. Enabling environment should be created to develop quality manpower in livestock research to undertake challenges for emerging livestock resource development in the context of global reformation;

6. Service structure and rules of business would be framed for BLRI to improve its management and to provide career development opportunities for talented scientists;
7. Livestock research budget would be increased to 40 to 50 percent of its total annual budget to meet the research operating costs.
9. National Avian Influenza Laboratory established in BLRI will be upgraded to BSL-3.

Livestock Extension

For the extension of livestock services The Directorate of Livestock Services was established in 1960 and renamed as the Department of Livestock Services (DLS) in the late 1980s. The mandate and functions of DLS include all activities related to livestock development and control of livestock diseases. This includes provision of veterinary services, conservation and genetic improvement of livestock and poultry breeds, artificial insemination, development of feeds and fodder for improving livestock nutrition, extension of livestock services, vaccine production, procurement and distribution of drugs and equipments, training, analysis and diagnostic services, collection of data and economic assessment of livestock production and the development of zoo animal and survey of wild life. Since 1960, the mandate and functions, structure, organization and management system of DLS have remained almost unchanged.

DLS is organized into five divisions, headed by five Directors. The five divisions are (i) Animal Health and Administration, (ii) Research, Training and Evaluation, (iii) Extension, (iv) Production and (v) Officers Training Institute. The divisions are functionally split into sections to deal with different subject matters. It has 5 Divisional Livestock Offices, 64 District Livestock Offices and 476 Upazila Livestock Offices. Divisional Offices coordinate and supervise the activities of the District offices and carry out liaison functions with the sister and other related organizations. DLOs (District Livestock Officer) supervise and coordinate the livestock development activities at the Upazila level and maintain liaison with the concerned departments and the district administration. ULOs (Upazila Livestock Officer) are charged with the following functions; (i) awareness building, motivation and technology transfer, (ii) vaccination and prevention of diseases, (iii) collection and documentation, (iv) artificial insemination, (v) reporting, (vi) farmers training, (vii) fodder cultivation, (viii) implementation of special projects, (ix) distribution of micro credit along with execution of PRSP. VS (Veterinary Surgeon) are charged with animal/poultry health management and disease control activities at the upazila level.

Other entities of DLS include a Livestock Research Institute (LRI), a Central Veterinary Hospital, Dhaka Zoo, Rangpur Zoo, 7 Field Disease Investigation Laboratories (FDIL), District veterinary Hospitals, 22 District Artificial Insemination Centers. Livestock Research Institute includes Veterinary Public Health Section, Central Disease Investigation Laboratory, Toxicology Section, Parasitology section, Pathology Section, Animal Rearing Section, Animal Nutrition Section, Quality Control Section and Vaccine Production Sections. DLS has a number of training institutes such as officers training institute (OTI),

Veterinary Training Institute (VTI) and Livestock Training Institute (LTI), but remain grossly underutilized due to lack of funds. DLS also has 35 poultry farms, 4 duck farms, 7 cattle breeding and dairy farms, 1 buffalo breeding farm, 5 goat farms and 1 pig farm. The Director General is the executive head at the top of the line of command, followed by Directors, Deputy Directors, Unit Heads and so on. DLS follows a highly centralized management system.

The structure of DLS offers insufficient focus on the issues that matter most. The functional Divisions are not structured in a logical fashion. Front line services at the upazila level is thin and weak. Load and activities in the extension area at the upazila level increased significantly, but the number of technical manpower and staff is not increased. Recently, with the up gradation of ULOs creates a vacuum in the entry level extension service at the upazila level which hinders extension activities. Recruitment for front line extension service is not possible due to shortage of post in the entry level. District Artificial Insemination Center with well equipped modern laboratory facilities is not available in every district. Sound organizational structures for animal recording, genetic evaluation, conservation & improvement throughout the country is absent. District level mini-laboratory is now out of operation due to shortage of skilled manpower. Country faces acute shortage of feeds and fodder for livestock development, but long term fodder production plan is absent due to lack of proper organizational structure. The Veterinary public health section exists but it is neither equipped nor does it have the funds to deal with disease surveillance and reporting, control of zoonotic diseases, food safety and other public health issues. It does not have a supporting legal framework to implement its mandate. Almost nothing is done on disease surveillance, including trans-boundary diseases.

The major challenges faced by DLS were identified as.
(i) Inappropriate mandate and functions; (ii) Structural and Organizational deficiencies; (iii) Thin and weak frontline services at the upazila; (iv) Weak linkage with research organization including BLRI; (v) Weak management system and MIS (management information system); (vi) Lean recruitment and promotion system; (vii) Shortage of skilled manpower; (viii) Lack of regular skill development training; (ix) Limited budget allocation.
In the context of increasing participation by the private sector and NGOs in livestock development, there is an urgent need to redefine the mandate and functions of DLS in a fashion that will allow it to gradually withdraw from private goods services, engage increasingly in delivery of public goods services, viz. enforcement of laws and regulations, quality control of feeds / drugs / vaccines / semen and breeding materials, extension services, disease investigation and surveillance, veterinary public health, conservation and development of native breeds, policy formulation and strategy development.

Policy frame work of livestock extension :

(1) Private sector, NGOs and CBOs (Community Based Organizations) would be encouraged to provide private goods livestock services viz. veterinary services, vaccination etc.

(2) DLS would be reformed to enhance its role as a provider of public goods services, viz. regulatory measures, quality assurance and control, monitoring function, food safety function, disease surveillance etc.

(3) Front line extension services of DLS would be updated and extended for rapid livestock development and sound service delivery.

(4) Resource allocations to DLS would be increased to make it effective in delivery of public good services.

(5) Autonomous unit/ institute would be established for quality assurance and certification of livestock products, vaccines and biologics, and consumers right protection.

(6) Quality Control of breeding materials would be ensured by extending District AI centre with modern laboratory facilities to all districts.

(7) Long term fodder development programme would be taken throughout the country to minimize the acute shortage of feeds and fodder.

(8) Analytical and diagnostic facility in the district mini-laboratory would be strengthened for full time service with skilled manpower.

(9) DVH would be further extended to UVH (Upazila Veterinary Hospital) to ensure better services.

(10) A special cell in all DVH would ensure round the clock service for emergency purpose.

(11) Retraining program would be developed and implemented to equip DLS staffs with modern knowledge and skills within the frame work of a clearly declined human resource development action plan.

(12) Besides staff training, DLS training institutes would be opened for all eligible candidates from private sector NGOs and CBOs for livestock service extension training.

(12) Extension-research-NGO linkage would be strengthened for field testing and dissemination of livestock technologies.

(13) An MOU has been signed between DLS and BRAC to Provide / extend Artificial Insemination Programme throughout the country .

(14) More Administrative and Financial power has been delegated/ give and to field level Official’s to works smoothly.

(16) The Procurement of Veterinary drugs and surgical instruments has been decentralized to District levels.

5. Implementation strategy of the National Livestock Development Policy.

The implementation strategy would be to provide support that specifically target sector productivity, investment and risks as follows:

(a) Implementations of recommendations in the respective policy framework identified in the National Livestock Development Policy 2007 (section 4.1- 4.10) would be ensured;

(b) Implementation of the national Livestock Development Policy would be realistically Phased out;

(c) Livestock sector should be consider as a thrust sector, because the sector proved to be a useful tool for poverty reduction, income generation and meet up the nutrition deficiency;
(d) Adaptation of locally proven technology would be preferred;
(e) Due consideration would be given for the conservation/ restoration of nature during implementation of the National Livestock Development Policy 2007;
(f) Public investment would be increased for further development of the livestock sector infrastructure which will increase the capacity of public goods and services delivery and promote private investment in the livestock sector;
(g) Public investment would be increased in livestock research for making up to date information on the sector available to the stakeholders and technology development to enhance productivity, income and employment;
(h) An appropriate legal and regulatory frame work would be put in place;
(i) Institutional reforms would be carried out by strengthening manpower and infrastructure of DLS and BLRI;
(i) Good sectoral governance would be more effective, transparent, accountable and mutually supportive;
(j) Market regulatory measures would be taken to shift in relative prices of inputs and outputs to correct market distortions, rationalize the incentive structures for investment and mitigate negative impacts on the sectoral environment.

১৪.২.৭ জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮

বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, বাজার সৃষ্টি, পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে একটি উন্নয়ন-বান্ধব নীতির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে সরকার জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ পোল্ট্রি বলতে বুঝায় পাখি জাতীয় যে সকল প্রজাতি মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে বংশ বৃদ্ধি করে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেমন- হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি ইত্যাদি। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন বলতে পোল্ট্রি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা বা বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে বুঝায়।

১.২ বাংলাদেশের পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হল ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত পারিবারিক পদ্ধতি এবং অন্যটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি। গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৮০ ভাগ বাড়িতে পারিবারিক পদ্ধতিতে হাঁস ও মুরগি পালন করা হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রির জাত উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য (Genetic trait) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ বর্তমানে দেশে মোট পোল্ট্রির সংখ্যা প্রায় ২৪৬ মিলিয়ন। ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় সমান সমান এবং মাংস উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় ৬০:৪০। পোল্ট্রি শিল্পটি কম পুঁজি নির্ভর ও অধিক শ্রমঘন হওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পোল্ট্রিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পোল্ট্রি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি সমান গুরুত্ব বহন করে। সরকারের ভূমিকা মূলতঃ মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকবে। পোল্ট্রি উন্নয়নে বেসরকারি খাত মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং সরকার সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে।

১.৪ বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, বাজার সৃষ্টি, পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে একটি উন্নয়ন-বান্ধব পোল্ট্রি নীতি প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করছে।

২.০ সংজ্ঞাসমূহ

২.১ পারিবারিক পোল্ট্রিঃ পারিবারিক পোল্ট্রি বলতে উন্মুক্ত (Scavenging) বা অর্ধ-উন্মুক্ত (Semi-scavenging) অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমে পালিত পোল্ট্রিকে বুঝায়, যা পরিবারের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.২ বাণিজ্যিক পোল্ট্রিঃ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি বলতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে (Floor) অথবা খাঁচায় (Cage) প্রতিপালিত অধিক উৎপাদনশীল (ডিম ও মাংস) বাণিজ্যিক প্রজাতির পোল্ট্রিকে বুঝায়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১০০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক পোল্ট্রি পালন বাণিজ্যিক পোল্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে।

২.৩ অর্গানিক পোল্ট্রি ঃ খামারে কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, হরমোন, Growth Promoter/Feed additives বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার ব্যতিরেকে ক্লেশ ও পীড়নমুক্ত পরিবেশে জৈব খাদ্যে (Genetically Modified Organism) ব্যতিত প্রতিপালিত খামারের পোল্ট্রিকে অর্গানিক পোল্ট্রি বুঝাবে।

৩.০ জাতীয় পোল্ট্রি নীতির উদ্দেশ্যাবলী

৩.১ উৎপাদনঃ

৩.১.১ প্রাণীজ আমিষের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বিশেষতঃ ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৩.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্মত ডিম, মাংস ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;

৩.১.৩ পর্যায়ক্রমে পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;

৩.১.৪ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রি জাত উন্নয়ন/উদ্ভাবন;

৩.২ উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ

৩.২.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৩.২.২ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলাদের পোল্ট্রি পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুযোগ সৃষ্টি ও পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা;

৩.২.৩ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ সকল বাজারে জীবন্ত মুরগির বিক্রয় স্থলের (Live bird market) জীব নিরাপত্তা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি;

৩.২.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;

৩.২.৫ জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ বান্ধব খামার স্থাপন;

৩.২.৬ পোল্ট্রি খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি;

৩.২.৭ পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৩.৩ সম্প্রসারণঃ

৩.৩.১ পোল্ট্রির বাচ্চা, খাদ্য, ঔষধ ও টিকার মান নিয়ন্ত্রণ;

৩.৩.২ পোল্ট্রি খাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৩.৩.৩ পোল্ট্রি স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;

৩.৩.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;

৩.৩.৫ পোল্ট্রি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান; এবং

৩.৩.৬ পোল্ট্রির উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

৪.০ জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ ও পরিধি

পোল্ট্রি সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বা পোল্ট্রি সম্পর্কীয় ব্যবসার সাথে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির আওতাভূক্ত হবে।

৫.০ পোল্ট্রি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ

৫.১ উৎপাদন

৫.১.১ পোল্ট্রি উৎপাদন;

৫.১.২ পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন;

৫.২ উদ্যোক্তা উন্নয়ন

৫.২.১ দারিদ্র বিমোচন;

৫.২.২ পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা;
৫.২.৩ বিপণন ব্যবস্থাপনা;
৫.২.৪ পোল্ট্রি জাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি;

৫.৩ সম্প্রসারণ
৫.৩.১ পোল্ট্রি চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ;
৫.৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
৫.৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন;
৫.৩.৪ পোল্ট্রি গবেষণা;
৫.৩.৫ রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

৫.৪ মাননিয়ন্ত্রণ
৫.৪.১ পোল্ট্রি বাচ্চা;
৫.৪.২ পোল্ট্রি খাদ্য;
৫.৪.৩ মাংস ও ডিম;
৫.৪.৪ পোল্ট্রি টীকা ও ঔষধ।

৬.০ পোল্ট্রি নীতির বাস্তবায়ন কৌশল

৬.১ পোল্ট্রি উৎপাদন।
৬.১.১ বাণিজ্যিক পোল্ট্রিপালন।
৬.১.১.১ বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলীঃ

ক) বাণিজ্যিক খামার ঘনবসতি এলাকা এবং শহরের বাইরে স্থাপন করতে হবে;

খ) একটি বাণিজ্যিক খামার থেকে আরেকটি খামারের দূরত্ব ন্যূনতম ২০০ মিটার হতে হবে;

গ) ব্রিডিং খামারের পারস্পরিক দূরত্ব ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার হতে হবে;

ঘ) গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) ও প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং উভয় শ্রেণীর খামারের ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) ও প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার স্থাপনের পূর্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) খামার ও হ্যাচারি স্থাপন পরিকল্পনায় উন্নত জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকতে হবে;

চ) খামার ও হ্যাচারি পরিকল্পনায় বর্জ্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণ (disposal) এর ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং

ছ) খামার ও হ্যাচারির জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য অপসারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান থাকতে হবে।

৬.১.২ পারিবারিক পোল্ট্রি পালন

৬.১.২.১ পারিবারিক খামারের উৎপাদনশীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত উপযুক্ত জাতের পোল্ট্রির সঙ্গে শংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীল জাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদান করা হবে;

৬.১.২.২ পোল্ট্রির জীব বৈচিত্র্য রক্ষা, দেশীয় জাতের উন্নয়ন ও বৈরী পরিবেশে পালন উপযোগী জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী জাতের মুরগির কৌলিক গুণাগুণ (Genetick potentiality) সংরক্ষণকরতঃ গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে;

৬.১.২.৩ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রয়োগ উপযোগী পোল্ট্রি পালনের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রদর্শনী (Demonstration) এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে হস্তান্তর/সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬.১.২.৪ সরকারি খামারে উন্নত জাতের হাঁস উৎপাদনের মাধ্যমে খামারিদের মাঝে বিতরণের কার্যক্রম জোরদার করাসহ বেসরকারি খাতে এ ধরনের উদ্যোগকে সহায়কা প্রদান করা হবে;

৬.১.২.৫ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশ্র খামার বিশেষ করে হাঁস মুরগী একসাথে পালন নিরুৎসাহিত করা হবে; এবং

৬.১.২.৬ পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.২ পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি

৬.২.১ ভূট্রা ও সয়াবিন উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬.২.২ পোল্ট্রি ফিডের অন্যতম উপাদন সয়াবিন মিল (Soyabean Meal) এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে দেশে সয়াবিন তৈলবীজ আমদানি ও Soyabean Oil Extraction Mill স্থাপনের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.২.৩ স্থানীয়ভাবে খাদ্য উপাদান থেকে সুলভ মূল্যে পুষ্টিকর, সহজলভ্য ও সুষম পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.২.৪ পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন, চাহিদা ও অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ডাটাবেজের তথ্য বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে। উদ্যোক্তা ও খামারিকে চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হবে;

৬.২.৫ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য বিশ্লেষণ (Feed analysis) সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর অধীন প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগারে পোল্ট্রি খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Nutrition Reference Laboratory হিসেবে কাজ করবে এবং এ জন্য দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.২.৬ অপ্রচলিত খাদ্য উপাদানকে পোল্ট্রি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার যে কোন গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে;

৬.২.৭ রোমন্থক প্রাণীর (Ruminant) খাদ্য হিসেবে হাড়ের গুড়া (Bone meal) ও মিট মিল (Meat meal) এর ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় Bone meal, Meat meal এবং Meat and Bone Meal দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রেটিন কনসেনট্রেট আমদানির ক্ষেত্রে উৎস প্রাণীর নামসহ রপ্তানিকারক দেশের ভেটেরিনারি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ‘উৎপাদিত পণ্য কোন ভাবেই Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) দ্বারা সংক্রামিত নয়” মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে;

৬.২.৮ শুকরের Bone meal এবং Meat meal আমদানি নিষিদ্ধ থাকবে; এবং

৬.২.৯ ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য দিয়ে উৎপাদতি মিট এন্ড বোন মিল/প্রেটিন মিল পোল্ট্রি খাদ্যের উপযোগী নয় বিধায় তা উৎপাদন করা যাবে না।

৭.০ উদ্যোক্তা উন্নয়নঃ পোল্ট্রি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার দারিদ্র বিমোচন, পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনায় প্রণোদনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৭.১ দারিদ্র বিমোচন

৭.১.১ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে পোল্ট্রিকে অন্যতম মাধ্যম (Tool) হিসাবে ব্যবহার করা হবে;

৭.১.২ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে লাগসই ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারের মডেল তৈরীর জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং

৭.১.৩ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি পালনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে।

৭.২ পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা

৭.২.১ পোল্ট্রি খাতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের বর্তমান রেয়াতি হার যৌক্তিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হবে;

৭.২.২ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে বীমা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.৩ পোল্ট্রি উৎপাদনকারী খামারীদের নিকট উপকরণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যাচারি/ব্রিডিং খামার স্থাপন, পোল্ট্রিজাত দ্রব্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ এবং পোল্ট্রি চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি উৎপাদনে ও পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরিতে বেসরকারি উদ্যোক্তাকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.২.৪ বিদ্যমান কর অবকাশের সুবিধা যৌক্তিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৭.২.৫ পোল্ট্রি শিল্পকে প্রাণীজ কৃষি খাত (Animal Agriculture) হিসেবে গণ্য করে সকল ক্ষেত্রে শস্য খাতের (Crop Agriculture) অনুরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৭.৩ বিপণন ব্যবস্থাপনা

৭.৩.১ বিপণনের সুবিধার্থে খামারীদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে;

৭.৩.২ পোল্ট্রি প্রোডাক্ট প্রক্রিয়াজাতকরণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৩.৩ পোল্ট্রি উৎপাদনের উপকরণসহ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টের বর্তমান বাজার মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করবে, এ লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিপণন সহায়তা শাখা (Poultry marketing support service) প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৭.৩.৪ পোল্ট্রি সামগ্রী বিপণনে মধ্যসত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য কৃষি বাজারের অংগ হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রিবাজার অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

৭.৩.৫ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট উপকরণের সঠিক চাহিদা নিরুপণ, বাজার ব্যবস্থার অসংগতিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৩.৬ পোল্ট্রি শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পোল্ট্রি পুষ্টি সামগ্রী উৎপাদন, পোল্ট্রি শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্রের কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত ঔষধের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৩.৭ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্ট জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার জোরদার করা হবে;

৭.৩.৮ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও পোল্ট্রি শিল্পে সংশ্লিষ্ট সমিতির মাধ্যমে মানসম্মত বাচ্চার বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণ খামারীদের অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৩.৯ কাঁচা বাজারের জীব নিরাপত্তা উন্নয়ন, পোল্ট্রি বিপণন, সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে;

৭.৩.১০ পোল্ট্রিজাত পণ্য ও খাবার তৈরীর কারখানা, বিক্রয় কেন্দ্রের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের ভেটেরিনারিয়ান এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মতামত ও স্বাস্থ্যগত সনদ গ্রহণ করতে হবে; এবং

৭.৩.১১ রোগ বিস্তার ও জীব নিরাপত্তার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকায় জীবিত হাঁস-মুরগি বিক্রয় নিরুৎসাহিত করা হবে এবং কোল্ড চেইনের মাধ্যমে ড্রেসড্ পোল্ট্রি বিক্রি উৎসাহিত করা হবে।

৭.৪ পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি

৭.৪.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাত, রপ্তানির বিষয়ে সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করা হবে এবং মানসম্পন্ন পোল্ট্রিজাত সামগ্রী রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.৪.২ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা হবে;

৭.৪.৩ পোল্ট্রি বর্জ্যের জৈবসার এবং পরিবেশ-বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগী হলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৪.৪ রপ্তানি সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনকারীগণ যাতে HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Point) এবং SPS (Sanitary and Phytosanitary) শর্তাদি পূরণ করতে পারে সে জন্য সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

৭.৪.৫ রপ্তানির উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের জন্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। রপ্তানির জন্য Organic পোল্ট্রি ও Low Cholesterol ডিম উৎপাদনে সহায়তা করা হবে; এবং

৭.৪.৬ পোল্ট্রিজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সংগনিরোধ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৮.০ সম্প্রসারণ

৮.১ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালনকে আরো উন্নত ও টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পোল্ট্রি বিষয়ে অধিকতর দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। মাঠ পর্যায়ে পোল্ট্রি স্বাস্থ্যসেবা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠকর্মীসহ কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.২ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্যাকেজ ভিত্তিক কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.৩ দেশব্যাপী প্রতি বছর পোল্ট্রি সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা নেয়া হবে; এবং

৮.১.৪ দেশব্যাপী খামারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শনী মডেল খামার স্থাপন করা হবে।

৮.২ পোল্ট্রি চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

৮.২.১ পোল্ট্রির মানসম্পন্ন ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। ঔষধ ও টিকার মান যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একটি মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৮.২.২ স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত খামারীদের সহায়তাদানের জন্য রোগ নির্ণয় সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। পোল্ট্রি রোগ নির্ণয়ের আধুনিক সুবিধাসহ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার আধুনিকায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে;

৮.২.৩ পোল্ট্রি রোগের ইপিডেমিওলজিক্যাল কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং পোল্ট্রি রোগ সংক্রান্ত একটি ডিজিজ রিপোর্টিং সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। রোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ইপিডেমিওলজি শাখায় সংরক্ষণ করা হবে। এ জন্য উক্ত শাখায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.২.৪ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি রোগের সার্ভিলেন্স জোরদার করা হবে;

৮.২.৫ পোল্ট্রি রোগ দমনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করা হবে। জীব নিরাপত্তা প্রটোকল খামারিদের অবহিত করা হবে;

৮.২.৬ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য রোগ নিরুপণে গবেষণাগার স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে গবেষণাগার স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ লাইসেন্স প্রদান ও বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

৮.২.৭ দেশে পোল্ট্রি ঔষধ ও টিকা উৎপাদন এবং উক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণায় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.২.৮ হাঁস মুরগী, পাখি আমদানির ক্ষেত্রে 'রপ্তানীকারক দেশ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত' মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকতে হবে;

৮.২.৯ টিকাদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে;

৮.২.১০ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয় ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে High Security Poultry Disease Investigation Laboratory স্থাপন করা হবে;

৮.২.১১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে; এবং

৮.২.১২ পোল্ট্রির আন্তঃসীমান্ত (Transboundary) রোগদমনে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

৮.৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৮.৩.১ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ Livestock Training Institute ও Veterinary Training Institute গুলোতে আধুনিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খামারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাসহ আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং

৮.৩.২ বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও খামারীদের মাঝে পোল্ট্রি শিল্পকে অধিকতর লাভজনক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৮.৪ প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

৮.৪.১ পোল্ট্রি শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৪.২ সরকারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের ৬টি ক্ষেত্রে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং এ সকল বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে-

ক) গবেষণা
খ) স্বাস্থ্য সেবা
গ) সম্প্রসারণ
ঘ) প্রশিক্ষণ
ঙ) পরামর্শ ও সেবা প্রদান
চ) তদারকি

৮.৪.৩ পোল্ট্রি সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম উন্নয়ন, সমন্বয় ও সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পোল্ট্রিনীতির সফল বাস্তবায়নসহ সার্বিকভাবে পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি পোল্ট্রি Advisory Committee গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে সরকার, সরকার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত পোল্ট্রি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকবে; এবং

৮.৪.৪ পোল্ট্রি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত জরীপ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৫ পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন

৮.৫.১ পোল্ট্রি গবেষণা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে;

৮.৫.২ পারিবারিক ও বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালনের বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৫.৩ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রি জাত উন্নয়নে/উদ্ভাবনে সরকারি এবং বেসরকারি যে কোন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৫.৪ পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ও গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে; এবং

৮.৫.৫ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড এ্যানিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরিনারি কলেজসমূহ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের গবেষণা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা হবে।

৯.০ মান নিয়ন্ত্রণ

৯.১ পোল্ট্রি বাচ্চা

৯.১.১ খামারিদের নিকট মানসম্মত বাচ্চা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে।

‘এ’ গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য হবে-

১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত,

২) চোখ উজ্জ্বল, নাভী শুকনা এবং

৩) ন্যূনতম ওজন একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৪ গ্রাম ও ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৬ গ্রাম।

‘বি’ গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য হবে-

১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত,

২) চোখ উজ্জ্বল, নাভী শুকনা এবং

৩) ন্যূনতম ওজন একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩১ গ্রাম ও ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম।

গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী ‘এ’ ও ‘বি’ গ্রেডের বাচ্চা বাজারজাত করা যাবে। হ্যাচারি কর্তৃপক্ষ বাচ্চা সরবরাহের সময় প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করবে।

৯.২ পোল্ট্রি খাদ্য

৯.২.১ আদমানিকৃত বা উৎপাদিত পোল্ট্রি খাদ্য, খাদ্য উপাদানের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৯.২.২ পোল্ট্রি খাদ্যে কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

৯.৩ পোল্ট্রি টীকা ও ঔষধ

৯.৩.১ আমদানিকৃত বা উৎপাদিত ইনপুট যেমন ঔষধ, টিকা, রোগ নিরুপণের কিট, এন্টিজেন বা এন্টিবডির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৯.৩.২ মানসম্মত পোল্ট্রি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি খামারে বিভিন্ন ঔষধসহ এন্টিবায়েটিক ও প্রোবায়েটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। ঔষধের রেসিডুয়াল কার্যকারীতা পোল্ট্রিজাত সামগ্রীতে যাতে না থাকে সেই লক্ষ্যে Withdrawal period মেনে চলতে হবে।

১০.০ বিবিধ

১০.১ খামার স্থাপন, রেজিস্ট্রেশন প্রদান, খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পশুরোগ আইন, ২০০৫, উক্ত আইনের অধীন পশুরোগ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৮ এবং মৎস্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ, ২০০৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৪.২.৮ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০

ইহা ২০১০ সনের ২ নং আইন। মৎস্য ও পশুপাখির জন্য মানসম্মত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে এই আইন প্রণীত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ২ নং আইন)

[জানুয়ারি ২৮, ২০১০]

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্যখাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর এবং পশুখাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (২) 'কোম্পানী' অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানী; (৩) 'খামার' অর্থ মৎস্য ও গৃহপালিত পশুর হ্যাচারি, নার্সারি, প্রজনন খামার এবং মৎস্য ও গৃহপালিত পশুর বাণিজ্যিক খামার; (৪) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (৫) 'পশু' অর্থে নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:- (অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী; (আ) পাখি; (ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; (ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং (উ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন প্রাণী; (৬) 'পশুখাদ্য' অর্থ পশুর জীবনধারণ ও অপুষ্টি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা উহার মিশ্রণ; (৭) 'পরিচালক' অর্থ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য; (৮) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898); (৯) 'ব্যক্তি' অর্থে যে কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোন সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (১০) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; (১১) 'ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য' অর্থ কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর উপাদানযুক্ত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যাহা মৎস্য, পশু বা অন্যান্য প্রাণী বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অথবা এমন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যাহা এই আইনের ধারা ১১ এবং ১৩ তে উল্লিখিত বিষয়াদির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে, অথবা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে ভেজাল বা বিষাক্ত বা ক্ষতিকর মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য বা অপদ্রব্য হিসাবে প্রমাণিত; (১২) 'মৎস্য' অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ (cartilaginous and bony fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া জাতীয় (Crustacean), শামুক বা ঝিনুক জাতীয় (Molluscs) জলজ প্রাণী, একাইনোডার্মস্ জাতীয় (Sea Cucumber), ব্যাঙ (Frogs) এবং উহাদের জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণী; (১৩) 'মৎস্যখাদ্য' অর্থ মাছের জীবনধারণ ও অপুষ্টি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে কারখানায় বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বা উহার মিশ্রণ; (১৪) 'মহাপরিচালক' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা, ক্ষেত্রমত, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (১৫) 'মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী' অর্থ নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী, যথা:- (অ) মৎস্য অধিদপ্তর; (আ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (ই) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট

	(বিএসটিআই); (ঈ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর); (উ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট; (ঊ) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট; (ঋ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ; (এ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু চিকিৎসা অনুষদ; (ঐ) স্বীকৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদ; (ও) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ল্যাবরেটরী; এবং (ঔ) সরকার কতৃর্ক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন ল্যাবরেটরী; (১৬) 'লাইসেন্স' অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স; (১৭) 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	৩। (১) মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৎস্যখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কতৃর্পক্ষ হইবেন। (২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পশুখাদ্য নিয়ন্ত্রণ কতৃর্পক্ষ হইবেন।
লাইসেন্স ব্যতীত মৎসখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ	৪। এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন না।
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	৫। এই আইনের অধীন মৎস্যখাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা এবং পশুখাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর কোন কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।
লাইসেন্স প্রদান	৬। (১) এই আইনের অধীন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য ধারা ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হইলে লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ- (ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে ধারা ৮ এর অধীন নির্ধারিত ফি আদায় করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে; অথবা (খ) যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য আবেদনকারীকে সুযোগ প্রদান করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত শর্তাবলী পূরণ করিবার জন্য লাইসেন্সিং কর্তপক্ষ আবেদনকারীকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় প্রদান করিতে পাবিবে; এবং (অ) উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী উল্লিখিত সকল শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন মঞ্জুর করিয়া আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে ; অথবা (আ) উক্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিতে আবেদনকারী ব্যর্থ হইলে আবেদন নামঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে; অথবা (গ) যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, আবেদনকারী নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্যে অধিকাংশ শর্ত পূরণ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং আবেদনকারীকে দফা (খ) এ উল্লিখিত সুযোগ প্রদান করা হইলে উক্ত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট শর্তাবলী পূরণ করিতে সক্ষম হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে

	আবেদনকারীর আবেদন সরাসরি নামঞ্জুর করিয়া ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে। (৩) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকিলে তিনি এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা না হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বের মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলী পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিবে।
লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন	৭। (১) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অনূর্ধব ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফিসহ নবায়নের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী কর্তৃক এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে তাহা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, লাইসেন্স নবায়ন করিবে অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী প্রযোজ্য শর্তাবলী প্রতিপালন করে নাই তবে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনটি নামঞ্জুর করিবেন এবং লিখিতভাবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে অবহিত করিবেন। (৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের আবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে লাইসেন্স গ্রহীতা তাহার কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।
লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি	৮। এই আইনের অধীন প্রদেয় লাইসেন্স এর ফি ও নবায়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি এর হার ধার্য করিতে পারিবে।
লাইসেন্স বাতিল ও স্থগিতকরণ	৯। (১) কোন লাইসেন্স গ্রহীতা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহীতা সরকারের নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আপীল করিতে পারিবে এবং সরকার উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল আদেশ অবহিত হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপীল আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।
আদর্শমাত্রা	১০। (১) সরকার বাণিজ্যিকভিত্তিতে উৎপাদিতব্য মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে বিধি দ্বারা মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের আদর্শমাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য প্রস্তুতকালে উক্ত আদর্শমাত্রা অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে।

	(২) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে ও পরীক্ষায় কোন মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আদর্শমাত্রা না পাওয়া গেলে বা পুষ্টি বিরোধী কোন উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে বা উহাতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের অযোগ্য বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্যের মিশ্রণ পাওয়া গেলে উক্ত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ	১১। (১) আমদানিকৃত ও দেশে উৎপাদিত যে কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজারজাত করিবার যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন উৎপাদক, আমদানিকারক বা বিক্রেতার নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী তে পরীক্ষা করাইতে পারিবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষায় মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ব্যবহারের অনুপযোগী প্রমাণিত হইলে উক্ত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং উহার আমদানীকারক, উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারী এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের যে সকল উপকরণ বিপণন হইয়া থাকে উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন ও বিপণন নিষিদ্ধ	১২। (১) কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা উহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর মাধ্যমে এমন কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন বা বিতরণ করিতে পারিবেনঃ (ক) যাহাতে মানুষ, পশু, মৎস্য বা পরিবেশের জন্য কোন বিষাক্ত বা ক্ষতিকর পদার্থ থাকে; এবং (খ) যাহা আদর্শমাত্রার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। (২) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য মৎস্য ও পশুর খাওয়ার উপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত বাধ্যতামূলকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।
পাত্র ও লেবেলিং	১৩। (১) কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বাজারজাত করা যাইবে না, যদি- (ক) উক্ত খাদ্য অনুমোদিত পাত্র বা প্যাকেটে সংরক্ষিত এবং বায়ুনিরোধ অবস্থায় মোড়কজাত না হয়; এবং (খ) উক্ত পাত্র বা প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লেখ না থাকে, যথাঃ- (১) প্রস্তুত কারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম; (২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর; (৩) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের প্রকৃত ওজন; (৪) বিদ্যমান বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ও পুষ্টি উপাদানের নাম এবং শতকরা হার; (৫) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য চিহ্নিত করার জন্য প্রদেয় লট নম্বর বা অন্যবিধ উপায়; (৬) উৎপাদিত পণ্যের উৎস সনাক্তকরণ কোড; (৭) কোন জাতীয় মৎস্য বা পশুর খাদ্য তাহার উল্লেখ; (৮) উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ।
মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, কীটনাশক, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ	১৪। (১) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।
কারখানা বা সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশের ক্ষমতা	১৫। মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য কারখানা ও উহার প্রাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানায় আনীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যের যে কোন উপাদান ও উপাদানসমূহ মজুদ করিবার স্থান, পরিবহনকারী যে কোন যান, বিক্রয় কেন্দ্র বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্য কোন স্থান বা যানবাহন এবং মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে কোন দলিল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।
ক্ষতিকর ও ভেজাল মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য	১৬। (১) কোন মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ক্ষতিকর ও ভেজাল প্রমাণিত হইলে মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য এবং উহাদের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পণ্য ও যন্ত্রপাতির সমুদয় বা কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

বাজেয়াপ্তকরণ, বিনষ্টকরণ, ইত্যাদি	(২) বাজেয়াপ্ত অস্বাস্থ্যকর বা পঁচা বা দূষিত বা ভেজাল মিশ্রিত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) এ বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এমন স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় বিনষ্ট করিবেন এবং উক্তরূপে বিনষ্টকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	১৭। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এইরুপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার	১৮। (১) মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না। (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক বিচার্য হইবে। (৩) এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।
অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	১৯। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।
দন্ড	২০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদন্ড, বা অনূর্ধ্ব ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা	২১। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২২। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ	২৩। এই আইন কার্যকরী হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই অধ্যাদেশের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (authentic english text) নামে অভিহিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।
হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান	২৪। (১) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশ এর কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.২.৯ পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১

ইহা ২০১১ সনের ১৬ নং আইন। পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে এই আইন প্রণীত হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১

(২০১১ সনের ১৬ নং আইন)

[সেপ্টেম্বর ২০, ২০১১]

পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্র্পকে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রনীত আইন। যেহেতু পশু জবাই ও জনসাধারণের জন্য মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	১। (১) এই আইন পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) 'অফাল'(Offal)অর্থ জবাইকৃত পশুর কারকাস ব্যতীত ভক্ষণযোগ্য ও ভক্ষণঅযোগ্য অংশ,যথাঃ- যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক, মস্তিস্ক, চর্বি, হাড়, নাড়িভূঁড়ি ইত্যাদি; (২) 'উপযুক্ত চিকিৎসক' অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেডিকেল অফিসার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন মেডিকেল অফিসার যিনি Medical and Dental Council Act,1980 এর section 2(b) তে সংজ্ঞায়িত কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত চিকিৎসক; (৩) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; (৪) 'কারকাস' অর্থ জবাইখানা বা অন্য কোন নির্ধারিত স্থানে জবাইকৃত পশুর সম্পূর্ণ রক্ত নি:সৃত (Bleeding)এবং জবাই পরবর্তী প্রস্তুতকৃত (Dressing) দেহ বা দেহের অংশ বিশেষ; (৫) 'কালিং'(Culling) অর্থ প্রজনন, উৎপাদন, চাষাবাদ বা পরিবহন কাজের জন্য উপযুক্ত নহে কিন্তু জবাইয়ের উপযুক্ত এমন পশু বাছাই; (৬) 'জবাই' অর্থ মানুষের ভক্ষণের উদ্দেশ্যে জবাই উপযুক্ত পশুকে ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরিষ্কার ধারালো ছুরি বা চাকু দ্বারা কাটিয়া রক্ত বাহির বা নিঃসরন করিবার পদ্ধতি; (৭) 'জবাই উপযুক্ত পশু' অর্থ ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক ঘোষিত জবাইয়ের উপযুক্ত যে কোন সুস্থ পশু; (৮) 'জবাইখানা' অর্থ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য জবাইপূর্ব পশু পরীক্ষা, পশু জবাই এবং জবাই পরবর্তী কারকাস পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ভবন বা স্থান; (৯) 'নির্ধারিত' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত; (১০) 'নিষিদ্ধ দিবস' অর্থ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত পশু জবাই ও মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ দিবস; (১১) 'পরিবেশন স্থাপনা' অর্থ যে কোন হোটেল, রেস্তোরা, খাওয়ার ঘর, ক্যান্টিন বা অনুরূপ অন্য কোন স্থান, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যাহা জনগণের জন্য বা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের জন্য উন্মুক্ত এবং যেখানে পরিবেশন বা ভক্ষণ করা হয়; (১২) 'পশু' অর্থ নিম্নবর্ণিত সকল ধরণের প্রাণী, যথাঃ- (অ) গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট, অন্য কোন আইনে নিষিদ্ধ না থাকিলে খরগোশ ও হরিণ; (আ) শুকর; (ই) পাখি জাতীয় প্রাণী যথা,

	হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি ইত্যাদি; এবং (ঈ) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট হালাল বা গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন প্রাণী; (১৩) 'বর্জ্য' অর্থ জবাই প্রক্রিয়ার সময় বা অন্য কোনভাবে জবাইখানায় সৃষ্ট বা আনীত দ্রব্যাদি বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন দ্রব্যাদি, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ প্রয়োজন; (১৪) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; (১৫) 'ভক্ষণ অযোগ্য' অর্থ জবাইকৃত পশু বা মাংস পরিদর্শনের পর বা অন্য কোন উপায়ে নির্ধারিত, মানুষের ভক্ষণের অনুপযুক্ত বা ধ্বংস করা প্রয়োজন, এইরূপ কারকাস, মাংস বা অফাল; (১৬) 'ভেটেরিনারি কর্মকর্তা' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner's Ordinance, 1982 (Ordinance NO, XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner; (১৭) 'ভেটেরিনারিয়ান' অর্থ, সিটি কর্পোরেশন বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভায় কর্মরত জবাইযোগ্য পশু বা মাংস পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner's Ordinance, 1982 (Ordinance NO. XXX of 1982) এর section 2 (g) সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner; (১৮) 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (১৯) 'মাংস' অর্থ কোন জবাইখানায় জবাইয়ের উপযুক্ত যে কোন সুস্থ জবাইকৃত পশুর মাংস বা অন্যান্য ভক্ষণযোগ্য অফাল এবং বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গ নিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নম্বর আইন) এর অধীন আমদানিকৃত মাংস; (২০) 'মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা' অর্থ কারকাস হইতে মাংস বা মাংসজাত পণ্য তৈরীর কারখানা; (২১) 'মাংস বিক্রয় স্থাপনা' অর্থ মাংস বিক্রয় করিবার প্রতিষ্ঠান বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয়, এইরূপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থান; (২২) 'সাময়িকভাবে পশু রাখিবার স্থান (Stockyard)' অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত চতুর্দিকে দেয়াল বা বেড়া দ্বারা ঘেরাওকৃত, যেখানে জবাই এর জন্য পশু সাময়িক জড়ো করা হয় বা যেখানে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান পশুর জবাই উপযুক্ততা পরীক্ষা করেন।
জবাইখানার বাহিরে পশু জবাই নিষিদ্ধকরণ	৩। (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রির জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জবাইখানার বাহিরে কোন পশু জবাই করিতে পারিবে না, যথাঃ- (ক) ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর বা অন্য কোন ধর্মীয়, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান; (খ) পারিবারিক চাহিদার ভিত্তিতে পারিবারিক ভোজনের উদ্দেশ্যে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারার দফা (ক) বা (খ) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে জবাইখানার বাহিরে এইরূপ স্থানে ও উপায়ে পশু জবাই করিতে হইবে যাহাতে- (ক) পানি বা পানির উৎস, বায়ু বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদান দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; এবং (খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পশু জবাই ও বর্জ্য অপসারণ করা যায়।
জবাই নিষিদ্ধ পশু	৪। (১) সরকার যে কোন পশু জবাই নিষিদ্ধ করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। (২) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বিধিতে উল্লিখিত জবাই নিষিদ্ধ পশু জবাই করিতে বা জবাই করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনা।
জবাই পূর্ব ও জবাই পরবর্তী পশু ও কারকাস ইত্যাদি, পরীক্ষা	৫। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বাবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পশু জবাই করিতে হইবে। (২) এই আইনের ধারা ১৫ তে বর্ণিত পশু জবাই নিষিদ্ধ দিবস ব্যতীত অন্যান্য দিনে জবাই খানায় জবাইয়ের উদ্দেশ্যে আনীত পশু এবং জবাই পরবর্তী পশু ও কারকাস সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসরণপূর্বক যথাযথভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

জবাই খানার পরিবেশ	৬। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী জবাইখানার পরিবেশ ও মান নির্ধারণ করিতে হইবে।
জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন	৭। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিতে হইবে।
জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স	৮। (১) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা বিধিবদ্ধ সংস্থা ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জবাইখানা বা মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবেন নাঃ তবে, শর্ত থাকে যে, এই আইন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কোন জবাইখানা বা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মাংস বিক্রয় বা মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন বা আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকিলে এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।
লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি, ইত্যাদি	৯। (১) এই আইনের অধীন জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করিবার জন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে আবেদন করিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা লাইসেন্সের জন্য মহাপরিচালকের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে।
লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন	১০। (১) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ১(এক) বৎসর। (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সের মেয়াদ নবায়নের জন্য উহার মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে মহাপরিচালক কর্তৃক ধার্যকৃত নির্ধারিত ফিসসহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স নবায়ন করিবেন।
লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ, ইত্যাদি	১১। এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবেন, যদি লাইসেন্সধারী- (ক) এই আইন বা বিধির কোন বিধান বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিয়া থাকেন; (খ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া থাকেন; এবং (গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স পাইয়া থাকেন।
প্রবেশ, পরিদর্শন, ইত্যাদির ক্ষমতা	১২। (১) মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান তাহাদের স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে সময় সময়, তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও পরিবেশন স্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ান এই আইন অথবা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যতা রহিয়াছে, এইরূপ কার্যক্রম ও অবস্থা পরিলক্ষিত হইলে এই আইন বা বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।
জবাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার কর্মী ও	১৩। পশু জবাই, মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী সংক্রামক অথবা ছোঁয়াচে রোগমুক্ত কিনা, তাহা উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপক বা

মাংস বিক্রেতার স্বাস্থ্য	অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটিরিনারিয়ানকে প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহণ	১৪। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য পরিবহন ও বিপণন করিতে হইবে। (২) মহাপরিচালক অথবা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ভেটেরিনারিয়ানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পশু, মাংস বা মাংসজাত পণ্য পরিবহনের সময় বিধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তবে তিনি বিধি অনুযায়ী উক্ত পশু, মাংস ও মাংসজাত পণ্য বাজেয়াপ্ত, অপসারণ বা ধ্বংস করিতে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে উহা নিস্পত্তি বা বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
পশু জবাই ও মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ দিবস	১৫। সরকার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ করিবার লক্ষ্যে, সপ্তাহের যে কোন দিবসে পশু জবাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিষিদ্ধ দিবসে পশু জবাই বা মাংস বিক্রয় বন্ধের জন্য সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা আদেশ জারী করিতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, মাংস অথবা মাংসজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।
জরুরী জবাই	১৬। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন পশু জরুরী ভিত্তিতে জবাইয়ের প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশু পরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জরুরী জবাইয়ের নির্দেশ দিতে পারিবেন।
ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা	১৭। জবাইকৃত পশু পরীক্ষার পর যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ বা মাংস মানুষের ভক্ষণের জন্য অনুপযুক্ত, তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পূর্ণ কারকাস বা কারকাসের অংশ অথবা মাংস ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষণা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, তিনি ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস অথবা আংশিক কারকাস অথবা মাংসকে বিধি অনুসরণপূর্বক এমনভাবে চিহ্নিত করিবেন, যাহাতে মানব খাদ্য চেইনে (food chain) উহা কোনভাবেই প্রবেশ করিতে না পারে।
ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল অপসারণ বা ধ্বংসের নির্দেশ	১৮। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস বা আংশিক কারকাস বা মাংস বা অফাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ বা ধ্বংসের নির্দেশ দিতে পারিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, ভক্ষণ অযোগ্য ঘোষিত কারকাস অথবা আংশিক কারকাস বা মাংস মানুষের ভক্ষণের জন্য ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানের নিকট প্রতীয়মান হইলে, তিনি উক্ত কারকাস, আংশিক কারকাস বা মাংস যে সকল কাজে ব্যবহার বা স্থানান্তর করিবার উপযুক্ত, তদমর্মে নির্দেশ প্রদানপূর্বক উক্ত কাজে ব্যবহার বা হস্তান্তরের জন্য জবাই খানা হইতে উহা লইয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত কারকাস, আংশিক কারকাস অথবা মাংস যেই কাজের জন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যতিরেকে অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিলে উহা এই আইনের লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে।
ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণের নির্দেশ প্রদান	১৯। ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান কারকাস, আংশিক কারকাস, মাংস, ভক্ষণযোগ্য অফাল বা ভক্ষণ অযোগ্য অফাল বা অন্য কোন অংশ, ব্যবহৃত পানি, বরফ অথবা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত নমুনা সংগ্রহ করিতে অথবা করাইতে পারিবেন এবং উক্ত নমুনা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ও মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবরেটরি বা অনুরূপ কাজের জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিতে বা করাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
জবাইখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২০। (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী জবাইখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে। (২) যদি ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ানের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জবাইখানার কোন পশু বা বস্তু হইতে নি:সৃত বা নির্গত বর্জ্য দ্বারা কোনভাবে কারকাস বা কারকাসের অংশ, মাংস বা অফাল দূষিত বা বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত বর্জ্য অপসারণ বা ধ্বংসের নির্দেশ

	প্রদান করিতে পারিবেন।
মান নির্ধারণ	২১। এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের মান নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে পারিবেন, যথাঃ- (ক) জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও মাংস প্রক্রিয়াজাত কারখানার আকার, সুবিধাদি ও পরিবেশ সংক্রান্ত; (খ) জবাইখানা, মাংস বিক্রয় স্থাপনা ও মাংস প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যবহৃত পানি, বরফ, শীতলীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি; (গ) কারকাস, কারকাসের অংশ, মাংস প্রভৃতিতে জীবাণু, ভারী-ধাতব বস্তু, বিষাক্ত বস্তু, হরমোন, প্রিজারভেটিভ, এন্টিবায়োটিক ইত্যাদির গ্রহণযোগ্য মাত্রা; (ঘ) গবাদিপশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা অন্য কোন আইনে নিষিদ্ধ না থাকিলে খরগোশ ও হরিন ইত্যাদির চামড়া ছাড়ানো এবং সংরক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি; এবং (ঙ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালকের বিবেচনায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম।
পশু বা মাংস বা মাংসজাত দ্রব্যাদি আটক ও অপসারণ করিবার ক্ষমতা	২২। যদি কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা ভেটেরিনারিয়ান তাহার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনকালে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইন বা বিধি ভঙ্গ করিয়া পশু জবাই, জবাইকৃত পশু অথবা পশুর মাংস পরিবহন অথবা মাংস বা মাংসজাত পণ্য বিক্রয় করা বা পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশু অথবা মাংস বা মাংসজাত পণ্য অথবা যানবাহন আটক করিতে পারিবেন অথবা আটক করিবার নির্দেশ দিতে বা বিধি অনুযায়ী অপসারণ করিতে বা করাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
অপরাধ ও বিচার	২৩। (১) যদি কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন এই আইনের অধীন একটি অপরাধ হইবে। (২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে।
দন্ড	২৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে অথবা আদেশ অথবা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন অথবা ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব ১(এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার এবং অনুর্ধ্ব ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (২) একই ব্যক্তি যদি পুনরায় এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) হাজার ও অনুর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
আপীল	২৫। Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে আপীল করা যাইবে।
ক্ষমতা অর্পণ	২৬। মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাহার অধস্তন যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন, তবে সিটি করপোরেশন এলাকায় উহার নিজস্ব ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করিবেন।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	২৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
রহিতকরণ ও হেফাজত	২৮। (১) এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে The Animal Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (E.P. Act VIII of 1957) রহিত হইবে। (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিতকৃত আইনের অধীন কোন কার্য অথবা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিতকৃত আইনের বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

১৪.২.১০ পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ২১ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২৯৭,-আইন/২০১৩।- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ২২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(ক) 'আইন' অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২ নং আইন);

(খ)'আদর্শ মাত্রা' অর্থ পশুর পুষ্টিসাধন এবং স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পশুখাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ, যেমন- আর্দ্রতা, আঁশ, আমিষ, স্নেহ, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ, ইত্যাদির নির্ধারিত মাত্রা;

(গ) 'কারিগরি জনবল' অর্থ পশুপালন বিষয়ে বিএসসিএএইচ (অনার্স)/ এমএস ইন প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে অগ্রাধিকার/ ডিভিএম/ প্রাণিপুষ্টি বিষয়ে কোন স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগ্রী;

(ঘ) 'খাদ্য উপকরণ' অর্থ তফসিল-১ ও তফসিল-২ এ বর্ণিত পশুখাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ, উপকরণের মিশ্রণ ও ফিড এডিটিভস;

(ঙ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(চ)'তৈরী পশুখাদ্য' অর্থ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রস্তুত পশুখাদ্য;

(ছ)'ভেজাল পশুখাদ্য' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১১) এ সংজ্ঞায়িত ভেজাল পশুখাদ্য;

(জ)'ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স' অর্থ পশুখাদ্যে ব্যবহৃত এমন সব ভিটামিন এবং মিনারেল উপাদান যাহা পশুখাদ্যে ভিটামিন ও মিনারেল ঘাটতি দূর করিয়া খাদ্যকে সুষম করিবে এবং পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে;

(ঝ) 'পশু' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত পশু;

(ঞ) 'পশুখাদ্য' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত পশুখাদ্য এবং এই বিধিতে উল্লিখিত ফিড প্রিমিক্স ও ফিড এডিটিভস;

(ট) 'ফরম' অর্থ তফসিল ১১ এ বর্ণিত ফরম-১ হইতে ফরম-১৩;

(ঠ)'ফি' অর্থ তফসিল ১২ এ উল্লেখিত ফি;

(ঢ)'ফিড এডিটিভস' অর্থ পশুখাদ্যের ভৌতিক গুণাবলি ও খাদ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ ও উন্নত করাসহ পশুর ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে মিশ্রিত উপাদানসমূহ;

(ড)'মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৫) এ সংজ্ঞায়িত মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী;

(ণ)'নমুনা' অর্থ খাদ্য ও পুষ্টিমান যাচাই করণের লক্ষ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পশুখাদ্য বা পশুখাদ্য উপকরণ হইতে দৈবচয়ণ পদ্ধতিতে (random sampling) সংগৃহীত পশুখাদ্য ও খাদ্য উপকরণের যুক্তিসংগত পরিমাণ (কমপক্ষে ৫০০ গ্রাম);

(ত)'লাইসেন্স' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১৬) এ সংজ্ঞায়িত লাইসেন্স;

(থ)'লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ধারা ৫ এ উল্লিখিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(দ) 'স্বত্বাধিকারী' অর্থ পশুখাদ্য প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, পশুখাদ্য গুদাম, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, প্রতিষ্ঠান এর মালিক বা তদকর্তৃক মনোনীত বা নিয়োগকৃত কোন প্রতিনিধি;

(ধ)‘স্বাস্থ্যকর পরিবেশ’ অর্থ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণু বা অন্য কোন দ্রব্য বা উপাদান অথবা রুচি বহির্ভূত বস্তুমুক্ত অনুকুল পরিবেশ, যাহা জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় না;

(ন) ‘ক্ষতিকারক দ্রব্য বা উপাদান’ অর্থ পশুখাদ্যে যে সকল উপাদান বিদ্যমান থাকিলে বা যোগ করা হইলে পশুর বিপাকীয় কার্যাবলীতে বিঘ্ন ঘটে বা পশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যহত হয়, উৎপাদন হ্রাস পায়, বিষক্রিয়া হয় এবং পশুর মৃত্যু ঘটিতে পারে;

৩। লাইসেন্স এর জন্য আবেদন পদ্ধতি।-(১) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বিধি ৪ এ উল্লিখিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী ফরম-১, ফরম-২ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৩ এ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স এর জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে তফসিল ১২ এ উল্লিখিত আবেদন ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই পূর্বক তফসিল ৩ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে ফরম-৭ এ তফসিল ১২ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং আবেদনকারী লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করিলে ফরম-৪, ফরম-৫ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৬ এ লাইসেন্স ইস্যু করিবে।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স এর শর্তাবলী পুরণ করিবিার জন্য ফরম ৯ এ অতিরিক্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এবং (গ) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী লাইসেন্সের শর্তবলী পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ফরম-৮ এ আবেদনকারীর আবেদন না মঞ্জুর করিতে পারিবে।

৪। আবেদনকারীর ক্যাটাগরি এবং ফি, ইত্যাদি।- (১) লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি ক্যাটাগরি থাকিবে, যথাঃ-

(ক) ক্যাটাগরি-১ঃ পশুখাদ্য উৎপাদক বা প্রক্রিয়াজাতকারক বা সংরক্ষক ও বাজারজাতকারক;

(খ) ক্যাটাগরি-২ঃ পশুখাদ্য আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা সংরক্ষক বা বাজারজাতকারক; এবং

(গ) ক্যাটাগরি-৩ঃ পশুখাদ্য বিক্রয়কারক, যিনি গড়ে অন্যুন ১০ টন বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ পশুখাদ্য বিক্রয় করেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ক্যাটাগরির আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, নবায়ন ফি ও আপিল ফি এবং লাইসেন্সের মেয়াদ তফসিল ১২ অনুসারে প্রদেয় হইবে।

৫। লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ।- (১) কোন লাইসেন্স গ্রহীতা বিধি ৭ এর বিধান বা, ক্ষেত্রমত, তফসিল ৩ এ উল্লিখিত শর্তাবলী পালন না করিলে উক্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স গ্রহীতাকে ফরম-১০ এ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর লাইসেন্স গ্রহীতা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারণ না দর্শাইলে অথবা প্রদত্ত জবাব লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাব প্রাপ্তির বা জবাব প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রমের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফরম-১১ এ উক্ত লাইসেন্স গ্রহীতার লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

৬। আপীল ও পূনর্বিবেচনা।- (১) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতা তফসিল ১২ এ বর্ণিত আপীল ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ফরম-১২ এ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ অনুযায়ী কোন আবেদনকারী আপীল আদেশ পুর্নবিবচনার জন্য ফরম-১৩ এ আবেদন করিতে পারিবে।

৭। পশুখাদ্যের আদর্শমাত্রা।- তফসিল ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), ৬(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮ ক), ৮(খ), ৮(গ), এ উল্লিখিত আদর্শমাত্রা এবং তফসিল ৯ এ বর্ণিত পশুখাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পশুখাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮। পশুখাদ্য মান যাচাইয়ের লক্ষে নমুনা সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ, ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ এবং ফি পরিশোধ, ইত্যাদি।-
(১) আমদানিকৃত বা দেশে উৎপাদিত যে কোন পশুখাদ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন বা বাজারজাতকরণের যে কোন পর্যায়ে উহার মান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কোন স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে অক্ষত (intact) প্যাকেট বা বস্তা হইতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (random sampling) অন্যুন ৫০০ গ্রাম পশুখাদ্যের অন্যূন ৩ (তিন) টি নমুনা সংগ্রহ করিবে।
(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা প্যাকেটবদ্ধ ও সিলগালা করিয়া প্যাকেটের গায়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ও যাহার তত্বাবধান হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির স্বাক্ষরসহ অন্যূন ৪ (চার) কার্য দিবসের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে এবং অপর ২ (দুই) টি নমুনার মধ্যে ১ (এক) টি নমুনা ককক স্বত্ত্বাধিকারী সংরক্ষণ করিবে এবং অপরটি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।
(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী উপ-বিধি (১) এর অধীন সংগৃহীত নমুনা প্রাপ্তির অন্যূন ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী নির্ধারিত ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।
(৪) মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন স্বত্বাধিকারী সংক্ষুব্ধ হইলে সংগৃহীত নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবে।
(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংগৃহীত নমুনা পুন:পরীক্ষার বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত পশুখাদ্যের সংগৃহীত অন্য একটি নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করিতে পারিবে।
(৬) কোন পশুখাদ্য ২ (দুই) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার পর অসংগতিপূর্ণ বা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদন বা ফলাফল পাওয়া গেলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত পশুখাদ্যের নমুনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তৃতীয় কোন মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করাইতে পারিবে।
(৭) কোন পশুখাদ্য ৩ (তিন) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হইলে যে ২ (দুই) টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলাফল অনুরূপ বা কাছাকাছি হইবে উহার ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত পশুখাদ্যের পুষ্টিমান বিবেচনা করিবে।
(৮) পশুখাদ্য বা পশুখাদ্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত নমুনার সকল প্রয়োজনীয় পরীক্ষা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী বিনামূল্যে সম্পন্ন করিবে।
(৯) পশুখাদ্যের উপকরণের আদর্শমাত্রা বা পুষ্টিমান নির্ণয়ের জন্য তফসিল ৯ এ বর্ণিত নমুনা বিশ্লেষণের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্সিমেট বিশ্লেষণ করা যাইবে যথাঃ- (ক) ক্রুড আমিষঃ জেলডাল পদ্ধতি, জেলটেক পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (খ) ইথার এক্সট্রাকশানঃ সক্সটেক পদ্ধতি, সক্সলেট পদ্ধতি (এন-হেক্সেন) বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (গ) জলীয় অংশঃ হট এয়ার ড্রাইং ওভেন, ভ্যাকুয়াম ড্রাইং ওভেন, টলোইন ডিস্টেলেশন পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (ঘ) এ্যাশ বা ছাইঃ মাফেল ফার্নেস এ বার্ণিত পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; (ঙ) ক্রুড ফাইবারঃ ফাইবার ক্যাপ/ ব্যাগ, ফাইবার টেক, ম্যানুয়েল এক্সট্রাকশন পদ্ধতি বা তফসিল ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অন্য কোন পদ্ধতি; এবং (চ) নাইট্রোজেন ফ্রি এক্সট্রাক্ট ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে;
৯। পাত্র ও লেবেলিং।- আইনের ধারা ১৩ এর বিধান অনুসারে কোন তৈরী পশুখাদ্য বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে পশুখাদ্যের পাত্র বা প্যাকেটে আইনে বর্ণিত বিষয়াবলীর অতিরিক্ত হিসেবে নিম্মবর্ণিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ-
(ক) পশুখাদ্যে আদর্শ মাত্রা অনুযায়ী তৈরি পশুখাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার এবং তফসিল ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৪(ঘ), ৪(ঙ), ৪(চ), ৪(ছ), ৪(জ), ৫(ক), ৫(খ), ৬(ক), ৬(খ), ৭(ক), ৭(খ), ৭(গ), ৭(ঘ), ৮(ক), ৮(খ), ৮(গ), এ

বর্ণিত পুষ্টি উপাদানসমূহের নাম (সমস্ত পুষ্টি উপাদান প্যাকেটের গায়ে লিপিবদ্ধ করা না গেলেও অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে); এবং

(খ)'শুধু মাত্র পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য' শীর্ষক লেবেল।

১০। কারখানা বা সংশ্লিষ্টস্থানে প্রবেশ, ইত্যাদি।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন স্থানে প্রবেশের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে সহযোগীতা প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত এলাকায় প্রবেশ করিবার পূর্বে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, উক্ত পরিদর্শন দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে।

১১। ক্ষতিকর ও ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্টকরণ, শোধন, ইত্যাদি।- (১) আইনের ধারা ১৪ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ পশুখাদ্য তফসিল ১০ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বিনষ্ট বা, ক্ষেত্রমত, শোধন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পশুখাদ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত এন্টিবায়োটিক, কীটনাশক, গ্রোথ হরমোন, ইত্যাদির উপস্থিতি প্রমাণিত হইলে উক্ত পশুখাদ্য প্যাকেট বা বস্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া ধ্বংস বা বিনষ্ট করিতে হইবে।

(৩) পশুখাদ্যে বিনষ্ট করিবার যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট স্বত্ত্বাধিকারীকে বহন করিতে হইবে।

স্থানাভাবে তফসিল ১ হতে ১২ এখানে মূদ্রিত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ মুহিবুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কতৃক মুদ্রিত।
আব্দুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কতৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

১৪.৩ কোড অব ভেটেরিনারি ইথিক্স

কোড অব ভেটেরিনারি ইথিক্স হলো রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনারদের জন্য নীতিমালা। ভেটেরিনারি পেশায় নিয়োজিত সদস্যদের নির্দেশিকা হিসাবে যে সকল নির্দিষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ নীতি প্রণীত হয়েছে তা মেনে চলার মধ্যে পেশার সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। এ সকল নীতির উদ্দেশ্য পেশাকৃত আচরণের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকতর সুদূর প্রসারী। এসব কেবল পেশার সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করে না, বরং প্রয়োজনের সীমাকে ব্যাপক করে তোলে ও সামাজিক মর্যাদাকে মহিমান্বিত করে এবং চর্চিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায়। সংক্ষেপে বরতে গেলে, পেশার নীতিমালা হল পেশাজীবিদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত প্রয়াসের ভিত্তি। এই নীতি পালিত না হওয়া লজ্জাকর ও দুঃখজনক। যিনি তা লঘন করেন তিনি এ পেশার অনুপযুক্ত। এ ধরণের আচরণ সাধারণত অনৈতিক বলে গণ্য করা হয়। তাই সব সময় তা পরিহার করা উচিত। প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে নিজস্ব নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে এক দেশের বিধান অন্য দেশে স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। সুতরাং আমরা যে অবস্থানে ও কালে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করি, তার সাথে সংগতি রেখে এ দেশে ভেটেরিনারিয়ানদের প্রত্যাশিত পেশাগত আচরণের ভিত্তিতে এ নীতি প্রণীত হয়েছে।

১। সাধারণ আচরণ: ক) কোন ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত আচরণ-বৈশিষ্ট্য যেমনটি হয়ে থাকে এ সকল পেশায় নিয়োজিত সদস্যেরও সেরকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকাটাই প্রত্যাশিত। খ) এ পেশার সদস্যের নীতিমালা অনুসারে আচরণ প্রদর্শন করা পবিত্র দায়িত্ব। গ) এ নীতিমালা ভেটেরিনারি পেশার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়নি। পেশাগত জীবন অনেক জটিল। একে নির্দিষ্ট বিধান সমূহের আলোকে বিন্যস্ত করা যায় না। কেননা কেবল বিধান তৈরী করে সেবা

গ্রহনকারী, সহকর্মী ও ভ্রাতৃপ্রতিম নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালন ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতায় সীমা বেঁধে দেয়া যায় না।

২। ভেটেরিনারিয়ানদের ব্যক্তিগত আচরণ ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা: ক) একজন ভেটেরিনারিয়ান শিক্ষিত ও দক্ষ পেশার সদস্য। কাজেই একজন সাধারণ নাগরিকের তুলনায় তাঁর আচরণ একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। খ) কোন সদস্য এমন কোন পেশাগত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ব্যবহার করবেন না, যার যোগ্য তিনি নন। তিনি এমন কোন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বা উপাধি ব্যবহার করবেন না, যে প্রতিষ্ঠানটিকে একই গোত্রভূক্ত সমকালীন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অযোগ্য ঘোষনা করা হয়েছে। গ) কোন সদস্য এ পেশায় নিয়োজিত অন্য সদস্যের পেশাগত মর্যাদার অবমাননা বা ক্ষতি করবেন না অথবা অযৌক্তিকভাবে তাঁর পেশাবৃত্তির ধরণকে নিন্দা করবেন না অথবা তাঁর প্রতি এমন কোন অপ্রত্যাশিত আচরণ করবেন না, যা এ পেশার লোকের জন্য শোভন নয়। ঘ) সকল সদস্য তাদের সেবা গ্রহণকারীর প্রতি অনুসরনীয় বাধ্য বাধ্যকতার নিয়ন্ত্রক বিধি-বিধান মেনে চলবেন। তাঁর দাপ্তরিক আইন কানুন বিচ্যুতিহীনভাবে পালন করবেন এবং তাঁদের কার্য নিয়ন্ত্রক বিধান সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। সেবা গ্রহণকারীর সমস্যার প্রতি সঠিক দৃষ্টি দিয়ে ভেটেরিনারি পেশা সম্বন্ধে ভাল ধারণা সৃষ্টি করবেন। ঙ) সকল সদস্য তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতাকে যত্ন সহকারে ব্যবহার করার প্রতি নিবেদিত হবেন এবং এ পেশার প্রতিনিধি হিসাবে কখনো উপদেশ বা চিকিৎসাকে প্রকৃষ্ট কারণ ছাড়া অস্বীকার করবেন না।

৩। পরামর্শ: ক) যখন কোন সহ-চিকিৎসক অথবা গবেষণাগারে ভেটেরিনারিয়ান বা দাপ্তরিকভাবে নিয়োজিত ভেটেরিনারিয়ানকে চিকিৎসা কার্যরত কোন ভেটেরিনারিয়ান পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানান, তখন চিকিৎসকের সেবা গ্রহণকারী যাতে সমালোচনা করতে না পারে এমনভাবে সতর্কতার সাথে রোগের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন এবং আলোচনা করবেন। খ) যখন কোন ভেটেরিনারিযানকে তাঁর অনুমোদিত দাপ্তরিক কাজের সময় অন্য ভেটেরিনারিয়ানের এলাকায় চিকিৎসার কাজে সাহায্য করতে হয় এবং যদি তা তাঁর দাপ্তরিক কার্য বহির্ভূত হয় তবে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যের বদলে ঐ দায়িত্ব পালন করা বা পরামর্শ দেয়া নীতি বহির্ভূত কাজ হবে। গ) পরামর্শক ও চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত চিকিৎসক পরস্পর সহযোগিতা প্রদান করে এমনভাবে পরামর্শ দেবেন যাতে পশুচিকিৎসা সম্পর্কে সেবা গ্রহণকারীর আস্থা লাভ সুনিশ্চিত হয়। ঘ) গবেষণাগারে ভেটেরিনারিয়ানগণ পরামর্শকের ভূমিকায় এমন আচরণ প্রদর্শণ করবেন, যেমনটি প্রাইভেট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা গণ চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত সহ-চিকিৎসকরা করে থাকেন। ঙ) কোন অবস্থায় একজন পরামর্শক সংশ্লিষ্ট সকলের অনুমতি ছাড়া কোন সমস্যা বা রোগীর দায়িত্ব গ্রহণের দৃষ্টান্ত রাখবেন না। বিশেষতঃ চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত চিকিৎসকের সাথে সুফলভোগীর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে ফয়সালার আগে এরকমটি করা সংগত নয়। চ) কেউ স্বেচ্ছায় তাঁর পেশাগত বিদ্যা বা সেবা কোন হাতুড়ে সংগঠন, দল বা ব্যক্তিকে প্রদান করবেন না। এসব ব্যক্তি বা সংগঠন যে নামে পরিচিত হোন বা যেভাবেই সংগঠিত হয়ে থাকুক না কেন, তাদেরকে পশুর রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা নীতিগর্হিত। বাণিজ্যিক স্বার্থে বা অর্থ উপার্জনের স্বার্থে এ ধরণের আচরণ প্রদর্শন বিশেষভাবে দোষনীয়। এরূপ কাজ পেশাগত নীতি ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। এটি পশুর মালিক ও ভেটেরিনারি পেশা-উভয়ের মংগলের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। মানুষের পশু-যত্নের নীতি এতে লংঘিত হয়। এর ফলে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য বিপজ্জনক অবস্থায় নিপতিত হতে পারে। অতএব এহেন কাজ সুস্থ নীতির পরিপন্থী।

৪। নিবর্তন/চিকিৎসক বদল: ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা সদ্য চিকিৎসিত রুগ্ন পশুর মালিক যদি অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, তাহলে আমন্ত্রিত দ্বিতীয় চিকিৎসক কর্তৃক কতিপয় শর্ত পূরণ না হলে চিকিৎসাদানে সম্মত হওয়া উচিত নয়। যেমন ক) দ্বিতীয় চিকিৎসককে কেবল পরমর্শদাতা বিবেচনা করে ডাকা হয়েছে; খ) পশুর মালিক প্রথম চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র সহ চিকিৎসার জন্যে দ্বিতীয় চিকিৎসকের কাছে এসেছেন; গ) প্রথম চিকিৎসককে পাওয়া যাচ্ছে না বা তিনি কর্মস্থল থেকে দূরে আছেন; ঘ) অথবা এমন প্রমাণ থাকতে হবে যে প্রথম চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসায় বিরত হয়েছেন বা মালিক তাঁকে চিকিৎসা কার্য থেকে অব্যাহিত দিয়েছেন। তিনি যে চিকিৎসা ভার গ্রহণ করেছেন তা দ্বিতীয় চিকিৎসক প্রথম চিকিৎসককে

অবহিত করাবেন বলে প্রত্যাশা করাই সংগত। পূর্বের চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র পর্যালোচনা না করে চিকিৎসা কাজে ব্রতী হওয়া সমীচিন নয়। এটা শুধু পেশাগত সৌজন্য ও শালীনতার ব্যাপার নয়, এটা রোগীর স্বার্থেই কেবল নয়, ভেটেরিনারিয়ানদের দৃষ্টিতে রোগের ইতিহাস ও প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ে অবগত না হয়ে চিকিৎসায় হাত দেওয়া বিপজ্জনকও বটে।

৫। প্রচারণা: ভেটেরিনারিয়ান নিজে বা অন্যকে দিয়ে নিজের সমন্ধে প্রচার চালানো নীতি পরিপন্থী কাজ। তাই যখন কোন খামার বা তালুকের মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা পরিবর্তিত হয়, সেই খামার বা তালুকভুক্ত পশুদের চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন মালিক বা ব্যবস্থাপকের কাছে উক্ত খামারে তাঁর চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রার্থনা করবেন না।

৬। বিজ্ঞাপন: রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সেবা গ্রহণকারীর প্রত্যাশায় বা নাম প্রচারের জন্য পত্রিকায় কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত নয়। তবে তিনি ভেটেরিনারি বিষয়ক সাময়িকীতে নিবদ্ধ প্রকাশ করতে পারবেন, জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে লেখা দিতে পারবেন এবং রেডিও, টিভি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজের পরিচয় দেবেন না। ভেটেরিনারি পেশায় বিশেষজ্ঞ, শল্য চিকিৎসক ইত্যাদি উপাধি ভেটেরিনারি পেশার ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়। পেশাগত সুখ্যাতি অর্জনের বৈধ পদ্ধতি হল কঠোর নৈতিক আচরণ এবং সফল ও দক্ষ চিকিৎসা কাজ সম্পাদন। কাজেই পূর্ব বর্ণিত উপায়ে বা অন্য কোন উপায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পেশাগত খ্যাতি অর্জনের প্রয়াসকে বিজ্ঞাপন প্রদানের সমতুল্য বিবেচনা করা হবে এবং তা অনৈতিক আচরণ হিসাবে গণ্য করা হবে। অবশ্য, নির্দিষ্ট জায়গায় পেশাগত ডিগ্রী বা উপাধি উল্লেখের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

৭। আপত্তিকর বিজ্ঞাপন: ক) সহকর্মীর চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অধিক দক্ষ বলে জাহির করা। খ) রোগারোগ্য স্বতন্ত্র পদ্ধতি ব্যবহারের বিজ্ঞাপন। গ) প্রদত্ত চিকিৎসা কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অংকের অর্থের কথা প্রচার করা। ঘ) অন্যকে দিয়ে নিজের প্রচারের জন্য রোগ বিবরণ পরিবেশন করা। ঙ) হাসপাতাল, অফিস ঘরে ব্যবহৃত জিনিস পত্রে এবং বিশেষ সার্ভিসে বিজ্ঞাপন দেওয়া। চ) নগরে, বাণিজ্যিকে টেলিফোনে ও বহুল প্রচারিত ডাইরেকটরীতে বা ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপিত করা। ছ) ডাইরেকটরীতে কোন রোগের বিশেষজ্ঞ অথবা পশু চিকিৎসার বিশেষ সার্ভিসে দক্ষতার ব্যাপারে বিজ্ঞাপন প্রদান করা।

৮। স্থানীয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রদান: খবরের কাগজে কেবল নাম, উপাধি সাক্ষাতের সময় ও টেলিফোন নাম্বার বিজ্ঞাপিত করা যাবে। সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও এদের প্রতিরোধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশকে উৎসাহ দেওয়া যায় যদি লেখকের উদ্দেশ্যে সৎ হয়ে থাকে। এধরণের নিবন্ধে লেখকের লক্ষ্য হবে, মালিকদের প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করা, নিজের লাভালাভ নয়। সুলিখিত এ ধরণের নিবন্ধ ভেটেরিনারি পেশার মর্যাদা ও ব্যবহারোপযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অথচ এ বিষয়ে পয়সার বিনিময়ে দেওয়া বিজ্ঞাপন ক্ষতিকর। কাজেই তা এ নীতিমালার পরিপন্থী।

৯। ডাক যোগে বিজ্ঞাপন: কতিপয় রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থার ব্যাপারে (টিকা প্রদান/পরজীবি চিকিৎসা ইত্যাদি), সেবা গ্রহণকারীর স্মরণ করিয়ে দিয়ে ডাকযোগে কার্ড বা সার্কুলার পাঠানো সন্দেহের সৃষ্টি করে। একে আপত্তিকর বিজ্ঞাপন হিসাবে গণ্য করা উচিত। পেশাগত মর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে বিশেষ জরুরী অবস্থায় বা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত চিঠি প্রদান, টেলিফোনে যোগাযোগ ইত্যাদি করা যেতে পারে।

১০। ব্যক্তিগত পরিচয় পত্র ও চিঠির প্যাডে বিজ্ঞাপন: ক) এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির চিঠির প্যাডের ভাষা হবে বিনম্র। এতে কেবল নাম, উপাধি, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও সাক্ষাতের সময় উল্লেখ থাকবে। ক) ভেটেরিনারি চিকিৎসার আখ্যা সাম্প্রতিককালে যেরূপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তা মনে রেখে একজন ভেটেরিনারিয়ান তাঁর পরিচয় পত্র ও চিঠির প্যাডে কেবল ক্ষুদ্রপ্রাণী বা হাঁস-মুরগির চিকিৎসা করেন বলে ঘোষনা দিতে পারেন। তবে পরিচয়পত্রে ও তিনি ভেটেরিনারি পেশার রেজিষ্ট্রেশন উল্লেখ করবেন। এর উদ্দেশ্যে হল, রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানদের সদস্য পদ লাভের অযোগ্য অনিয়মিত চিকিৎসক দলের সাথে পার্থক্য বজায় রাখা। গ) অফিস, হাসপাতাল বা চিকিৎসা স্থল পরিবর্তনের খবর চিঠি বা

পরিচয়পত্র ডাকযোগে প্রেরণ অনুমোদন করা যায়। তবে একে দৃষ্টান্ত হিসাবে অযুহাত দেখিয়ে নীতি বিরুদ্ধ কাজ সমর্থন করা যাবে না।

১১.১। বিজ্ঞাপন সাইন বোর্ড: ক) চিকিৎসা লাভে আগ্রহী ব্যক্তিরা যাতে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার কার্যস্থল বিনা কষ্টে সনাক্ত করতে পারেন, সে দিকে চিকিৎসকরা লক্ষ্য রাখবেন। এটি যেন আকর্ষণীয় করে বাণিজ্যিক সাইন বোর্ডের আকারে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে বুঝা না যায়। সাক্ষাৎকারের সময়, প্রয়োজনে চিকিৎসকের টেলিফোন নম্বর বা ক্লিনিক বন্ধ থাকলে চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ বা সাহায্য কিভাবে পাওয়া যাবে ইত্যাদি সাইন বোর্ডে উল্লেখ করা যাবে। এছাড়া অন্য কোন কিছু সাইন বোর্ডে বিজ্ঞাপিত করা যাবে না। সাইন বোর্ডের আকার হবে পরিমিত যাতে কেবল জনগণের সুবিধার্থে তা বিজ্ঞাপিত হয়েছে বুঝা যায়। এটি গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় করে সাইন বোর্ডের আকারে তৈরি করা যাবে না।

১১.২। নাম ফলকের বিজ্ঞাপন: পেশা স্থলের ভবনে অথবা এর কাছে সুবিধা মতো স্থানে একটি নাম ফলক ব্যবহার করা যাবে। এতে নিম্নবর্ণিত বিষয় থাকতে পারে; ক) ভেটেরিনারিয়ানের নাম, যৌথ প্রাকটিস সহচিকিৎসকের নামও থাকতে পারে। খ) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি রেজিস্ট্রেশন খাতায় ভেটেরিনারিয়ানের যোগ্যতা বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তা নাম ফলকে ব্যবহার করা যাবে। গ) নাম ফলক ৩৬"×৩৬" সুন্দর নকশায় করতে হবে যা পেশার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

১২। ঠিকানা পরিবর্তন: স্থানীয় খবরের কাগজে সংক্ষেপে ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ পরিবেশন করা যেতে পারে। সম্মানিত সেবা গ্রহণকারীর অবগতির জন্য বন্ধ খামে ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ পরিবেশন করা যাবে। যে কোন ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয় বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অবশ্যই অবহিত করতে হবে।

১৩। জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা: ক) সহযোগী চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে জরুরী অবস্থায় কাউকে অমন্ত্রণ জানালে, তার উচিত হবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা এবং সহ-চিকিৎসক ফিরে এলে তাঁর কাছে চিকিৎসার ভার প্রত্যার্পণ করা। খ) চিকিৎসাধীন রোগীতে জরুরী আমন্ত্রণ পেলে, অহেতুক দৃষ্টি আকর্ষনের লক্ষ্যে পূর্বে প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন সাধন অনৈতিক কাজ।

১৪। প্রশংসাপত্র: মালিকানা অথবা প্যাটেন্ট দ্রব্যাদি, ঔষধ বা পশু খাদ্য বিক্রির স্বার্থে ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক প্রশংসাপত্র প্রদান পেশা বহির্ভূত কাজ। তবে এ ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত গবেষণাগার থেকে মূল্যায়নের কার্যকারিতা বিষয়ক সনদপত্র দেয়া যেতে পারে।

১৫। গ্যারান্টিসহ রোগারোগ্য: আরোগ্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া অনৈতিক কাজ। রোগ চিকিৎসায় বা রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সন্দেহ উদ্রেককারী দৃষ্টি আকর্ষণ মূলক পদ্ধতি অবলম্বন অথবা অধিক জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য অহংকার করার প্রবনতা পরিত্যাজ্য।

১৬। প্রতারণা: ক) ভেটেরিনারিয়ানদের উপর যে সকল দাপ্তরিক বিধি-বিধান বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে সে সকল বিধান ভংগ করে অসর্তকতার দায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে ভূয়া প্রশাংসাপত্র জারী করা পেশাগত সততার পরিপন্থী। খ) যখন ক্রেতা পশুটির সুস্থতা নিরুপণের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য নেন, তখন বিক্রেতা থেকে কোন ফি গ্রহণ অনৈতিক কাজ। এধরণের ফি গ্রহণ প্রথম দৃষ্টিতে প্রতারণার প্রমান দেয় এবং অন্য দিকে বিক্রয়ের জন্য আনীত পশুটিকে অনৈতিকভাবে অসুস্থ বলার শামিল। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের ভুমিকা হল একজন সৎ রেফারীর।

১৭। অবৈধ চিকিৎসা কার্য: ক) অবৈধ চিকিৎসা কার্যকে সাহায্য করা এ পেশার পরিপন্থী কাজ। খ) পশু চিকিৎসা নিয়ন্ত্রক আইন কানুন ভংগ করে কোথাও অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়াকে এ পেশার কোন সদস্য উৎসাহিত করবেন না বা একে সাহায্য দেবেন না। গ) এ পেশার সদস্যদের দায়িত্ব হল, এ ধরণের অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসা সম্বন্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল বা বাংলাদেশ ভেটেরিনারি এসোসিয়েশনকে অবহিত করা। ঘ) ভেটেরিনারি

সার্জন বা ভেটেরিনারিয়ান তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের পুরো বা আংশিক জনসাধারণের ক্রয় যোগ্য মালামালের বিক্রয় বা বিজ্ঞাপনের কাজে পুনর্মুদ্রন করতে পারবেন না। অবশ্য তিনি জ্ঞান বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন বা বিতরণকারীর কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারবেন।

১৮। ভেটেরিনারিয়ানদের বাধ্যবাধকতা ও বৈধ কাজকর্ম: ভেটেরিনারিয়ানকে প্রথমে একজন সুনাগরিক হতে হবে এবং দেশের কল্যাণের জন্য অগ্রগতি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি এমন কোন কাজ করবেন না যা তাঁর পেশাকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাঁর উপর প্রতিকুল প্রভাব সৃষ্টি করে। তিনি বিশ্বস্ততার সাথে ভেটেরিনারি পেশার স্বার্থ, সম্মান ও মর্যাদাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

১৯। ফি: প্রাণী চিকিৎসার জন্য যে ফি দাবী করা হবে তা কাউন্সিল কর্তৃক প্রতি ৪ বছর অন্তর নির্ধারণ করে দেয়া হবে। যা সরকারি ভেটেরিনারিয়ানদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান/সরকারের/কাউন্সিলের দ্বারা সময় সময় জারীকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুসৃত হবে। অবশ্য, পরামর্শকের ফি প্রদান কাউন্সিল কর্তৃক জারিকৃত ফি সিডিউলের আওতাধীন হবে।

২০। ঝগড়াবিবাদ: ভেটেরিনারিয়ানদের মধ্যে বিবাদ খুবই অবাঞ্ছিত। সম্ভব হলে এ পেশার সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে তা মিটিয়ে ফেলা উচিত। প্রয়োজনে ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

২১। উপাধি ব্যবহার: একজন ভেটেরিনারিয়ান ভেটেরিনারিয়ানদের রেজিস্ট্রেশন খাতায় তাঁর যে উপাধি অন্তর্ভূক্ত নয়, সে উপাধি তার পেশার স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের আইন ১৯৮৬ এর ১৮ ধারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রতি চার বছর অন্তর রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারিয়াদের নাম, ঠিকানা অনুমোদিত যোগ্যতার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

২২। ভেটেরিনারিয়ান কর্তৃক সনদপত্র: ক) প্রত্যয়ন পত্র কতিপয় ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানকে অনুরোধক্রমে বা বাধ্য হয়ে প্রশাসনিক বা আদালতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাঁর পেশাগত ক্ষমতার আওতায়, তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হয়। এ ধরণের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান কালে পশুটিকে সনাক্ত করার উপযোগী সব ধরণের তথ্য প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। খ) অসত্য, বিভ্রান্তিকর অথবা অযথার্থ অথবা ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিনে যাচাই না করে কোনো প্রত্যয়ন-পত্রে স্বাক্ষরদান সংশ্লিষ্ট ভেটেরিনারিয়ান পেশা পরিপন্থী আচরণ হিসাবে বিবেচিত হবে। স্মরণ থাকা উচিত যে, অসম্পূর্ণ, অযথার্থভাবে তথ্যে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ন পত্র বিভ্রান্তিকর। রপ্তানীর সাথে সম্পর্কিত অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ন পত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এ পেশার প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, অসর্তকতাপূর্ণ বা অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যয়নপত্র শুধু তাঁর পেশার খ্যাতির জন্য ক্ষতিকর নয়, সামগ্রিকভাবে তা ভেটেরিনারিয়ানদের প্রদত্ত প্রত্যয়ন-পত্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্নক ভাবে ক্ষতি করে।

২৩। পেশাগত গোপনীয়তা: ভেটেরিনারিয়ান তাঁর চিকিৎসাধীন রোগী সম্বন্ধে সংগৃহীত যে কোন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং তা একমাত্র মালিকেই জানাতে পারবেন। প্রয়োজন হলে মালিকের অনুমতিক্রমে সে সব তথ্য অন্যকে জানাতে পারেন। অবশ্য, পশুরোগ বিধি, অথবা অন্যান্য বিধি বা বিধান অনুসারে অথবা জনস্বার্থে অন্যান্য পশুদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষার্থে বিষয়টি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই।

২৪। প্রমাণসমূহ: পেশাগত কারণে ভেটেরিনারিয়ানকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহবান জানান হলে, চিকিৎসক সুবিচারের দিকে লক্ষ্য রেখে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করবেন। কোন পার্টি যদি চিকিৎসককে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, তখন চিকিৎসক পেশাজীবি হিসাবে আদালতকে সাহায্য করবেন।

২৫। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার্স এ্যাক্ট নং- ১/১৯৮৬: বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার্স এ্যাক্ট নং- ১/১৯৮৬ এর অধীনে রেজিষ্টার্ড প্রত্যেক ভেটেরিনারিয়ানের দায়িত্ব হল, এ বিধি ভংগের কোন দৃষ্টান্ত যদি তাঁর নজরে আসে, তবে তিনি যেন তা ভেটেরিনারি কাউন্সিলের জ্ঞাতার্থে পরিবেশন করেন।

২৬। প্রত্যেক রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার: ক) এ নীতিমালা মেনে চলবেন। খ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে তাদের এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২৭। দন্ডের ভিত্তি: কাউন্সিলের মতে যদি কোন রেজিষ্টার্ড ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার- ক) অসদাচরনের দায়ে দোষী হন। খ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারিয়ে ফেলেন। গ) দূর্নীতি পরায়ন বা যুক্তি সংগত ভাবে দূর্নীতি পরায়ন বলে বিবেচিত হন। ঘ) উপরোক্ত নীতিমালা মেনে চলছেন না বলে প্রমাণিত হন। ঙ) ভেটেরিনারি কোড অব ইথিক্স ভঙ্গের দায়ে দোষী হন।

২৮। দন্ড সমূহ: এই প্রবিধানের অধীন নিম্নরুপ দন্ড সমূহ আরোপ যোগ্য হবে। ক) লঘু দন্ড যেমন তিরস্কার বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভেটেরিনারি প্রাকটিস স্থগিত। খ) গুরু দন্ড যেমন রেজিষ্ট্রেশন বাতিল।

২৯। তদন্ত প্রদ্ধতি: বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্রাকটিশনার্স এ্যাক্ট-১৯৮৬ এর ২২ ধারার বিধান মতে তদন্ত অনুষ্ঠানের পর উপরোক্ত দন্ড আরোপ করা হবে।

কাউন্সিলের আদেশক্রমে
রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, ঢাকা।

15.1 BCS Written Examination Syllabus: Animal Husbandry Part-I; Marks-100

- Contribution of livestock in the farming system of Bangladesh. Classification of common farm and domestic animals with the description of different breeds of cattle, buffalo, goat and sheep.
- Judging of goat and sheep for meat, milk and wool. Judging and selection of cattle and buffalo for productive purposes.
- Chemical composition and microscopic structure of hides, skins and wool. Factors affecting the quality of hides and wool.
- Prospect, potential and constraints of development of meat industry in Bangladesh. Factors affecting the quantity and quality of meat. Marketing of meat and meat products.
- Development of technologies for processing and treatment of animal wastes. Environment pollution through animal wastes.
- Farm planning and evaluation for commercial beef and buffalo production.
- Ruminant and non-ruminant nutrition. Feed nutrients and their utilization in animal body.
- Reduction of methane production by ruminants and improved productivity to dietary manipulation in the rumen.
- Animal feed resources-conventional and unconventional. Nutritional evaluation of feeds. Production and prospect of green forages in the existing crop farming system. Preservation of forages and its feeding to animals. Processing and utilization of feedstuffs and agro-industrial by products as animal feed.
- Nutrient requirement of different types of animals. Formulation of ration for different animals for
- different purposes. Feeding during scarcity periods, like flood, drought etc.
- Factors affecting nutritive value of feedstuffs. Anti-nutritional factors of feedstuffs.
- Prediction of feed intake for livestock. Importance, present status and future scope of fees milling industry in Bangladesh.
- Characteristics of important dairy cattle breeds. Selection of site for dairy farm. Judging and condition scoring of dairy cow. Role of cooperative in dairy development.
- Definition, composition and structure of milk and colostrum. Factors affecting composition of milk.
- Food value, standard, grades and classes of milk. Milk collection, transportation and payment.
- Processing, transport and marketing of milk and milk products. Methods of preservation of milk.
- Factors affecting the success of dairy farm (operating quality and quantity of milk).

- Factors responsible for development of dairy industry in Bangladesh. Problems of dairy industry in Bangladesh and there possible solution. Dairy by-product in Bangladesh. Preparation of butter, ghee, ice-cream.
- Dairy farm planning. Layout and prospects for successful dairy operation. Feeding, housing and management of dairy cows, calves and heifers. Planning for year-round feeds and fodder supply in dairy farm. Record keeping for successful dairy operation.
- Origin, domestication and distribution of different poultry species. Classes, breeds, varieties and strains of chicken and ducks.
- Housing principles of poultry. Poultry feed ingredients, their classification, nutritive value.
- Artificial incubation, fertility and hatchability eggs. Selection of hatching eggs. Economics of hatchery business.
- Production of duck, quail, geese and pigeon. Poultry processing plant.
- Parent stock and commercial layer production. Egg production in small holder farmers condition.
- Marketing of eggs-its problems and solution. Commercial broiler production and management in
- Bangladesh. Importance of poultry and poultry products.
- Poultry farm planning and management. Bio-security in planning and designing of poultry farm.
- Commercial poultry farming on village ames-problem, utility and caution.
- Production and control measures for common poultry disease in Bangladesh.
- Genetics and its contribution to livestock development. Linkage, crossing over and chromosome mappings, immunogenetics, mutation. Genotype-environment interaction and its implication in livestock production Partitioning of causes, phenotypic varition into its components.
- Chemical basis of inheritance, genetic engineering, recombinant DNA technology and its application in livestock.
- Estimation of heritability repeatability and genetic correlation. Estimation of breeding value, transmitting ability, most probable producing ability. Animal selection-aids to selection, selection purpose, selection limit.
- Use of specialized computer programs for solving breeding problems. Genetic diversity, animal genetic resources, out breeding, out crossing, cross breeding, line crossing, and up-grading. Open nucleus Breeding system (ONBS), community breeding programme.
- Portraits of economic importance, selection and breeding plan for the improvement cattle, buffalo, goat sheep and poultry.

15.2 BCS Written Examination Syllabus: Animal Husbandry Part-II; Marks-100

- Importance of livestock in the socio-economic conditions of Bangladesh. Characteristics and constraints of livestock development in Bangladesh. Existing livestock production, marketing and disease prevention situation.
- Livestock development strategies-dairy cattle, beef cattle, buffalo, goat, sheep, chicken, duck etc.
- Animal slaughtering and meat quality aspect-status, problems, prospects.
- Balanced feed-criteria, formulation procedure, problems, prospects and quality control.
- Green feeder- status, ways and means to attain self-sufficiency.
- Livestock development through breeds and breeding-genetic resources, matching genotype, genotype environment interaction, appropriate breeding tools, prevention of genetic crosior. In-situ breeding and conservation programe for valuable native animal genetic resources.
- Major constraints of small holder dairy development in Bangladesh and ways and means to overcome them. Multiple ovulation and embryo transfer (MOET) technology in dairy cattle breeding.
- Production of clean and safe milk and milk products in Bangladesh. Importation of powdered milk causes, risk and ways of minimize it.
- Small holder poultry production- an economic vehicle for rural women's livelihood-problems and prospects causes of poor production of indigenous chicken. Selection and come of hatching eggs.
- Principles of poultry feeding. Factors regulating profit margin from poultry farming.

15.3 BCS Written Examination Syllabus: Veterinary Science Part-I; Marks-100

1. (i) Definition and scope of veterinary science.
   (ii) Horizon of veterinary activities.
   (iii) Contribution of livestock and poultry to national GDP, employment and rehabilitation of distressful women.
2. (i) Important task of animal health and hygiene: general measurement for the prevention and control of infectious diseases, effect of environment on animal health.
   (ii) Digestion and metabolism of carbohydrate, protein and fat in simple and compound stomach animals.
   (iii) Puberty and sexual maturity, factors affecting puberty and sexual maturity in ruminants.
   (iv) Reproductive hormones, estrous cycle, gestation, parturition and lactation.
   (v) Endocrine glands, secretions, functions and regulations.
3. (i) Livestock and poultry industry: programme of a farm activities in relation to each type of herd and flock health management including feeding, breeding,

housing, application of biosecurity and harvesting of animal products and their marketing.
(ii) Formulation and preparation of ration for cattle, sheep, goat and poultry.
(iii) Breeds of animal and poultry and their important characters.
(iv) Animal by-products including hides, skins and leathers, their marketing at home and abroad.

4. (i) Isolation and identification of common bacteria, virus and fungus and collection of samples for bacteriological, virological and mycological examinations.
5. (i) Clinical tests for examination of blood, feces, urine and skin scrapings with their interpretations.
(ii) Principles and interpretations of different tests for liver and kidney functions.
(iii) Interpretation of hemostatic disorders such as coagulation time, bleeding time, prothrombin time and thrombocyte count.
(iv) Techniques of postmortem examination in animals and birds and systematic investigation of infectious, non-infectious diseases and other pathologic disorders.
(v) Methods of collection, preservation, fixation, processing and staining of pathologic specimens including dispatching them to diagnostic laboratory.
6. (i) Clinical Examination of animals.
(ii) Determination of sex and age.
(iii) Clinical diagnosis of diseases.
(iv) Livestock and poultry diseases: Clinical findings, postmortem lesions, diagnosis, treatment, prevention and control of important parasitic (ascariasis, haemonchosis, fascioliasis, babesiosis, coccidiosis), infectious (anthrax, black quarter, hemorrhagic septicemia, tuberculosis, paratuberculosis, enterotoxemia, foot and mouth disease, rabies, PPR, Gumboro disease, Newcastle disease, Marek`s disease, salmonellosis, fowl cholera, colibacillosis, mycoplasmosis), non-infectious including metabolic diseases (milk fever, ketosisc pregnancy toxemia, grass tetany), diseases caused by nutritional (copper, cobalt, iron, zinc) and vitamin (A, D, E,B vitamins) deficiencies.
(v) Important diseases of small animal and zoo animal (hookworm, heartworm, mange, tuberculosis, anthrax, canine distemper, infectious canine hepatitis, psittacosis, amoebiasis) their diagnoses, treatment, prevention and control.
(vi) Diagnosis, treatment, prevention and control of important reproductive diseases (cysts in ovary and mesovarium, pyometra, endometriosis, retained placenta, abortion and stillbirth).
(vii) Uses of antibiotics, anthelmintics, insecticides, steroids and other hormones. Drug withdrawal and residue avoidance.
7. (i) Sampling procedures and use of t & F test for statistical analysis of the result of a scientific experiment.
8. Animal Disease Act and Animal Slaughter Act and their implementation.

9. Importance of Veterinary Public health in Bangladesh and its drawback in comparison to developed countries.
10. Improved Variety feeds and fodder available in the country and their characteristics.

15.4 BCS Written Examination Syllabus: Veterinary Science Part-II; Marks-100

1. (i) The etiology, clinical findings, gross pathological changes, diagnosis, prognosis and treatment of common diseases of digestive, respiratory, cardiovascular, hematological and urogenital, nervous and integumentary systems.
   (ii) Principle of epidemiology, methods of epidemiological investigation, their application in the control of important infectious and non-infectious diseases of domestic animals and poultry.
   (iii) Common frauds practiced in sell of livestock and livestock products.
   (iv) Veterinary ethics and laws. Legislation against animal diseases in Bangladesh.
2. (i) Common characters and pathogenecity of following bacteria : Bacillus, Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus, Eschedrichia, Pseudomonas, Brucella, Salmonella, Actinobacillus, Actionomyces, Shigella, Pasteurella, Listeria, Leptospira, Corynebacterium, Mycobacterium and following fungus: Aspergillus, Blastomyces, Cryptococcus, Histoplasma, Rhinosporidium, Candida, Microsporum, Trichophyton of domestic animals and poultry.
   (ii) Common characters and pathogenecity of following viruses: The viruses of Goat pox, fowl pox, Marek`s disease, malignant catarrhal fever, IBR, infectious canine hepatitis, duck hepatitis, FMD, NCD, PPR, canine distemper, rabies, IBD ofdomestic animals and poultry.
   (iii) Immunity and its classification, types of immune response, cells responsible for immune response, antigen, vaccines, antibody, antibody production and serological test (Rapod plate agglutination test, HA, HI, FAT and ELISA).
3. (i) Principles of sedation, analgesia and premedication, common intravenous and inhalation agents used in anaesthesia.
   (ii) Methods of producing various local and regional anaesthesia, hazards associated with anaesthesia.
   (iii) Operative technique of the common surgical diseases (Bloat, impaction, dystocia, dermoid cyst, cataract, gluocoma, atresia ani, abdominal hernias, phimosis, paraphimosis) including postoperative care.
4. (i) Properties and exposure factors of X-rays.
   (ii) Hazards of radiation and the protective measures.
   (iii) Radio-diagnosis and radio-therapy.
   (iv) Examination of animal for soundness and certificate writing.
5. (i) Diseases and accidents associated with purturition: metritis, utero-vaginal prolapse, downers cow syndrome.
   (ii) Collection and preservation of liquid and frozen semen of bulls and bucks.

(iii) Techniques of artificial insemination (A1) in cows and does, health management of A1 bulls and bucks.
(iv) Venereal and semen borne diseases in ruminants.
(v) Livestock population and cattle breeding policy in Bangladesh.

6. (i) Methods, standardization and evaluation of common drugs used in veterinary practice.
(ii) Poisonous plants (datura, abrus, ricinus, strychnos), mycotoxins (aflatoxins, ergot) and minerals (arsenic, copper, lead, selenium, zinc) concerning the veterinarians.
7. (i) Role of veterinarian in public health.
(ii) Prevention and control of common zoonotic diseases (Anthrax, brucellosis, rabies, hydatidosis, scabies).
(iii) Food borne infections and intoxications.
(iv) Meat inspection and meat borne diseases.
8. Criteria to be followed for establishing a small scale dairy, goat and poultry farm.
9. Role of Drug control Authority and BSTI in Veterinary drug and product control.
10. The quarantine procedures to be followed to prevent disease transmission across the borders.

15.5 Senior Scale Examination Syllabus for BCS (Livestock) Cadre; Marks-100

	Subject	Marks
Group-A	Development Programmes and Departmental Activities	25
Group-B	Veterinary Sciences	30
Group-C	Animal Husbandry	30
Group-D	Basic Knowledge Related to Veterinary Science and Animal Husbandry	15
	Total	**100**

Group-A: Development Programmes and Departmental Activities
This will include the study of the following:

(i) Project identification and preparation. Analytical expression of PP (Project Proforma) and its various components, preparation of model project profile.
(ii) Processing of project documents for approval. Financial limitations of the authorities to approve the scheme, categories thereof.
(iii) Monitoring, reporting and evaluation of the project.
(iv) Methods for calculating Net Present Value (NPV) working out of Economic (EIRR) Internal Rate of Return. Finding out critical path method work (CPM), PERT method (Programme evaluation and Review technique), NET Work analysis, Analysis of the cost and benefit Ratio.

Group-B: Veterinary Science
This includes identification of the economically important animal diseases such as Viral, Bacterial, Parasitical, Nutritional and other common ailments. To find out epidemiological link between diseases, process and pattern, their effects on livestock productivity. Disease control, prevention and eradication. Different types of biological products such as vaccine, sera and their uses and their qualify control. Application of different Acts, Ordinance and Rules related to control of disease, control of slaughter of animals.

Group-C: Animal Husbandry
This includes the following:

(1) Identification of problem of small, medium and large-scale farming and their remedies.
(2) Selection of animals including goat and sheep for genetical improvement of the local breeds for milk, meat and draft power.
(3) Selection of poultry and duck for genetical improvement of the birds through cross-breeding.
(4) Outline of breeding policy in Bangladesh through A.I. for milk, meat and draft power.
(5) Improvement of local feeds and fodders and to establish National Fodder Policy.
(6) Co-operative farming and its importance on the socio-economic conditions of Bangladesh.

Group-D: Basic Knowledge Related to Veterinary Science and Animal Husbandry.

(a) Principle of disease control, keeping quality of vaccine and vaccination programming.
(b) Small-scale dairy/poultry farming in the private sector.
(c) Lists of common diseases of animals and poultry in Bangladesh.
(d) Methods of extension services to private owners for the improvement of livestock wealth, fodder cultivation and disease problems.

এই অধ্যায়ে বিগত প্রায় ৩০ বছরের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ ১৪ টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি ভাগের প্রশ্নের আলোকে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার্থী ছাড়াও যাতে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ এবং ভেটেরিনারি ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি হতে পাশ করা গ্রাজুয়েটদের নিকট এই বইটি গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য প্রশ্নগুলি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়নি। তবে কোন একটি ভাগের সকল প্রশ্ন দেখে নিয়ে এই বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পড়লে প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রশ্নটির গুরুত্ব এবং সম্ভাব্য উত্তরের আকার অনুমান করার সুবিধার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের শেষে পরীক্ষার বছর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের নম্বরমান উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিসিএস লিখিত পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ মোটামুটি একই রকম। উপরন্তু এই বইটি সহজ বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে যাতে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভেটেরিনারি ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি হতে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ এবং প্রাণিসম্পদ ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাগণ প্রতিটি অধ্যায় একবার রিডিং পড়েই পুরো বিষয় আয়ত্ব করতে পারেন। তাই প্রাণিসম্পদে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য, ভেটেরিনারি ও এনিমেল হাজবেন্ড্রি বিষয়ে বিসিএস লিখিত পরীক্ষা এবং ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় ৩য় পত্রের সহায়ক হিসেবে এই বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ১: প্রাণিসম্পদ ও আমরা

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান পাঁচটি প্রকল্পের নাম উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ২.৫।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের রূপরেখা আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৮।
- বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি খাত ও সমবায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১০।
- Livestock Research-এর ক্ষেত্রে BLRI (Bangladesh Livestock Research Institute) এর ভূমিকা কি? আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৭।
- BLRI কি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারছে? আপনার মতামত দিন। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, এ বিষয়ে সুচিন্তিতি মতামত দিন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৮।
- প্রকল্প গ্রহণ করে বিভাগীয় কার্যক্রম গতিশীল করা উচিত না রাজস্ব বাজেটে বিভাগীয় কার্যক্রম বেশি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত- এ সম্পর্কে আপনার যুক্তি/মন্তব্য দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৪।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) কর্তৃক পরিচালিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রমসমূহ উল্লেখপূর্বক দারিদ্র বিমোচনে কার্যক্রমসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ৮।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ‘একজন সুযোগ্য সম্প্রসারণ কর্মী গবেষক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন’। উক্তিটির উপর আপনার সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১৫।
- প্রাণিসম্পদ উপখাতের উন্নয়নের পথে কারিগরি বাধাসমূহ (technical problem) উল্লেখ করুন। সমস্যাসমূহ সমাধানে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১৫।
- শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের পথে বড় ধরণের বাধা। এ বাধা অতিক্রমের জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ১৫।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ৫।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার লাভজনক ও টেকসই (sustainable) করতে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১৫।
- বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা, বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১৫।

- সংক্ষেপে লিখুন- ওআইই (OIE); আফকা (APHCA)। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ৬।
- সংক্ষেপে লিখুন- ওআইই (OIE); আফকা (APHCA)। আগষ্ট ২০০১; নম্বর ৬।
- বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা, বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ওআইই (OIE); আফকা (APHCA)। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ৬।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদানসমূহের বিবরণ দিন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ওআইই (OIE)। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২।
- বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা, সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ আলোকপাত করুন। প্রাণিসম্পদ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পোষাক শিল্পের ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব- মন্তব্য করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ১৫।
- তুলনামূলকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু উন্নয়ন প্রক্রিয়া আশানুরুপ না হওয়ার কারণ কি? উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিতে প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি বিষয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত? ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১০।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। বাংলাদেশের চহিদার তুলনায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী কিনা মন্তব্য করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- তুলনামূলকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু উন্নয়ন প্রক্রিয়া আশানুরুপ নয়। তার কারণ কি? আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৫।
- দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ঘাটতি রয়েছে। দেশের দুধ, মাংস এবং ডিমের অভাব মিটানোর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথা সরকারের হাতে বর্তমানে কি কি পরিকল্পনা এবং প্রকল্প রয়েছে? প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহ কি এই অভাব মিটানোর জন্য যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন? উত্তর না সূচক হলে আপনার মতে কি পরিকল্পনা এবং প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন তা সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ১৫।
- অধিক পরিমানে দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনের পূর্বশর্ত উন্নত জাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তথা সরকার দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়েও আশানুরুপ ফল অর্জন করতে পারেন নি। কি কি প্রধান কারণের জন্য গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন সফল হচ্ছে না তা সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ১৫।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য কি? বর্তমানে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারের হাতে কি কি পরিকল্পনা আছে? ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮; নম্বর ১০।
- বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের লাইভষ্টক সম্প্রসারণের (extension service) ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ২: গবাদিপশুর খামার স্থাপন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর

- টীকা লিখুন- গরু মোটাতাজাকরণ। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৩।
- একজন পরামর্শক হিসেবে পঁচিশটি গাভীর খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে প্রচলিত মহিষের জাতগুলি কি কি? মহিষ পালনে কোন কোন এলাকা উপযোগী, আপনার মতামত দিন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৪।
- মহিষের জাত উন্নয়নে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি কি? আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৪।
- মাংস ও দুধ উৎপাদনে মহিষ পালনের ভূমিকা লিখুন ও সম্ভাব্য করণীয় লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৭।

- ক্ষুদ্র পরিসরে (small scale) গবাদিপশু পালনে বাস্তব সমস্যাগুলি লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৭.৫।
- দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ‘একটি বাড়ী একটি খামার’ প্রকল্পের ধারণাপত্র অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় খামারিদের অনুকরণীয় দুইটি করে গাভী পালনের একটি নমুনা প্রকল্প প্রণয়ন করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ২০।
- ‘পশুসম্পদ’ উন্নয়নে একজন সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা অগ্রগণ্য এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য দিন এবং একজন সম্প্রসারণ কর্মীর কাজ কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে তা উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ৬।
- পঞ্চাশটি গরু মোটাতাজাকরণের জন্য একটি প্রকল্প সার-সংক্ষেপ তৈরি করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়নের সমস্যাগুলো কি কি? একটি সমস্যার সমাধানকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৮।
- সিডর (CIDR) আক্রান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ (একশত) জন কৃষকের জন্য একটি পূনর্বাসন মডেল পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন। (যে-কোন একটি যথা: গাভী পালন/গরু মোটাতাজাকরণ)। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৬।
- আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুগ্ধ খামারিদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা কিভাবে সমাধান করা যায় উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- গবাদিপশু উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। একটি নতুন প্রযুক্তি কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কি কি করণীয় হতে হবে বলে আপনি মনে করেন? প্রযুক্তিটি কৃষকের কাছে পৌঁছানোর কৌশলসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে উদ্ভাবিত পশুসম্পদ বিষয়ক অন্যতম দশটি প্রযুক্তির নাম উল্লেখ করুন। প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১৫।
- আপনার এলাকায় ছাগলে একটি অজানা রোগ দেখা দিয়েছে। উক্ত রোগের কারণ নির্ণয় ও রোগ দমনে সম্প্রসারণ কর্মী/ ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে আপনার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১০।
- দেশে গবাদিপশু উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ৫।
- ক্ষুদ্র পরিসর (small scale) দুগ্ধ খামারের সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। একটি দুগ্ধ খামার উন্নয়নে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১৫।
- দুগ্ধ খামার লাভজনক ও টেকসই করতে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৭।
- ‘গবাদিপশুর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভূমি কর্ষণ ও গাড়ী টানার কাজে পশুশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।’ - বক্তব্যটি সম্পর্কে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৫।
- দেশে প্রাপ্ত সম্ভাবনাময় দেশী ও বিদেশী জাতের গাভীর নাম উল্লেখপূর্বক তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১০।
- মাঠ পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে কোন পাঁচটি প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন। একটি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৫ টি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির নাম লিখুন। প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছান ও টেকসই (sustainable) করার জন্য কি ধরণের সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১৫।
- ৫টি সংকর জাতের গাভীর খামার প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে গবাদিপশু উন্নয়নের প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে এর প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১৫।
- ৫টি সংকর জাতের গাভীর খামার প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১৫।

- গবাদি খামার স্থাপনে বর্তমান স্থবিরতার কারণ উল্লেখ করত এই অবস্থার উত্তরণে বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মী ও এনজিও (NGO) কি অবদান রাখিতে পারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ১৫।
- স্বল্প জমিতে অধিক ফলন (maximum production on minimum land) এর ক্ষেত্রে সমন্বিত খামারের ভূমিকা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দিন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ৩০।
- সমন্বিত খামার আত্মকর্মসংস্থানে যথেষ্ট অবদান রাখিতে পারে। এ ধরণের খামারিদের মৌলিক অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। একটি সমন্বিত খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ (আপনার বিবেচনায়) একটি মডেল উপস্থাপন করুন (যে কোন আকারের)। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ৩০।
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যক্তিমালিকানাধীন গবাদিপশু খামার স্থাপনে সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১৩।
- দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের গবাদিপশুর খামার যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। ১০টি সংকর জাতের গাভীর খামারের প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ৮।
- গো-সম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ মালিকগণ কি কি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন? এ সমস্ত সমস্যার যৌক্তিক সমাধান কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে? ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ৮।
- গবাদিপশুর উপর হাল চাষের 'চাপ' কমানোর জন্য কি কি সম্ভাব্য বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? উক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হলে গো-সম্পদ হতে কিভাবে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা সংক্ষেপে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৩: গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্র ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- একটি ৫০০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য বাৎসরিক roughage এবং concentrate খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৫।
- টীকা লিখুন- Silage. আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৩।
- একটি ৫০০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য কতটুকু Net Energy, Metabolic Energy, Digestible Energy এবং Total Digestible Nutrient প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৫।
- খাদ্য কি? পশুখাদ্যের প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে পশুখাদ্যের অভাব দূর করার পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১০।
- টীকা লিখুন- সবুজ ঘাস সংরক্ষণ; UMB. ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৬।
- মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ঘাস চাষে সমস্যাগুলি নিরূপণে করণীয় আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৭.৫।
- বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গো-খাদ্য সংকট সমাধানে আপনার পরামর্শ উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ৮।
- নেপিয়ার ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি (silage) বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ৭।
- বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল ঘাসের কি কি জাত বিদ্যমান সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঘাস উৎপাদন ও সম্প্রসারণে সমস্যাবলী কি কি। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- বর্ষাকালে অনেক এলাকায় কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে গবাদিপশুকে কচুরীপানা খাওয়ানো হয়। কচুরীপানা খাওয়ানোতে কি কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং উহা কি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে প্রচলিত ঘাসের জাতগুলি কি কি? ঘাষ চাষে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন এবং প্রতিকারের উপায়গুলি লিখুন। কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ২০।
- অপ্রচলিত পশু খাদ্যের বিবরণ দিন। গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- খড় প্রক্রিয়াকরণ ও কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।

- কাঁচা ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন। ট্রিটিক্যালি ঘাসের চাষ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- সাইলেজ কি? সাইলেজের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- খাদ্য সংকট নিরসনে কি কি উন্নতজাতের ঘাস চাষ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। যে কোন একটির চাষ পদ্ধতি ও একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ লিখুন। কাঁচা ঘাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার যুক্তি উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- ‘পশুখাদ্যের অভাব দেশে গবাদিপশু উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়’ উক্তিটির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করুন। পশুখাদ্যের উৎপাদন/প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ১৫।
- পশু খাদ্যের সমস্যা সমাধানে একটি যুগোপযোগী ‘পশুখাদ্য নীতিমালা’ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১০।
- দেশে পশুখাদ্যের অভাব দূর করতে কি ধরণের সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে পশুখাদ্যের অভাব দূরীকরণার্থে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ১০টি উন্নত জাতের ঘাসের নাম, এদের চাষ পদ্ধতি ও একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ২০।
- গবাদিপশু উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব এক জটিল ও অন্যতম অন্তরায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। গো-খাদ্য উৎপাদনে অথবা সংকট নিরসনে আপনার সুপারিশমালা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ১৫।
- গবাদিপশু উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব প্রধান অন্তরায়- ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য করুন। এই অন্তরায় দূরীকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা কি হওয়া উচিত আপনার সুপারিশসহ একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- পশুপাখি পালনে খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্য সমাধানে বিভিন্ন দিকসমূহের বর্ণনা দিন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘাস উৎপাদন নীতিমালা কি হওয়া উচিত বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- গবাদিপশু উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব এক জটিল এবং কঠিন অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে গো-খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পের সফলতা বা ব্যর্থতা সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশের গো-খাদ্য (animal feed and fodder) উন্নয়নে কি কি সমস্যা আছে এবং এর সমাধানকল্পে সরকারের কি কি প্রকল্প আছে? বর্ষ ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৪: গবাদিপশুর বাসস্থান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

- সিডর (CIDR) আক্রান্ত এলাকায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যুতে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তার সামাজিক প্রভাব বর্ণনা করুন এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পশুসম্পদের এই ক্ষতি কমানো সম্ভব হতো তা বিস্তারিত উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৮।
- যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ‘চিকিৎসা প্রদান জরুরী না ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন জরুরী’- যে কোন একটি বিষয়ে আপনার মন্তব্য দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৬।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- আধুনিক কসাইখানা। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৩।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- আধুনিক কসাইখানা। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।

- দুর্যোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহের নিজস্ব গন্ডীর আওতায় করণীয় কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১৫।
- বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ মালিকগণ কিভাবে গো-সম্পদকে রক্ষা করেন? এমন এক পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং দীর্ঘ মেয়াদী কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? এ সম্পদকে রক্ষা করার বিশেষ দিকগুলো আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৫: গবাদিপশুর প্রজনন ও জাত উন্নয়ন

- অধিক দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশে কি ধরণের ব্রিডিং প্ল্যান গ্রহণ করা উচিৎ, যুক্তিসহকারে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১০।
- টীকা লিখুন- Reproductive health Management; ONBS; and Genome Sequencing. আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৯।
- ONBS এবং Progeny Testing কি? ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৫।
- টীকা লিখুন- কৃত্রিম প্রজনন; MOET. ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৬।
- অধিক দুধ উৎপাদনে কোন জাতের গরু/মহিষ পালন করা উচিৎ তা যুক্তিসহ বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ৫।
- আমাদের breeding policy সংক্ষেপে বর্ণনা করে এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- 'আমাদের দেশে মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা অন্যতম' - এই বক্তব্য কি আপনি সমর্থন করেন? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম কি যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন? যুক্তিসহ বক্তব্য দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন নীতিমালা উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। জাত উন্নয়নের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ১৫।
- জাত উন্নয়ন কি? গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদিপশুর জাতসমূহের নাম লিখুন। দেশীয় পশুর জাত সংরক্ষণের গুরুত্বসহ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১৫।
- দুধ ও মাংস উৎপদন বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদ্যমান প্রজনন নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৫।
- দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশে কি ধরণের ব্রিডিং পলিসি থাকা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান প্রজনন নীতিমালা (breeding policy) বর্ণনা করুন। কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি সফল করতে হলে আমাদের কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ২০।
- সংক্ষেপে লিখুন- মোয়েট (MOET)। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ৩।
- সংক্ষেপে লিখুন- মোয়েট (MOET)। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ৩।
- মাঠ পর্যায়ে গভীর হিমায়িত সিমেন পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালী লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১০।
- সংক্ষেপে লিখুন- মোয়েট (MOET); ইপিস্টেসিস (Epistasis)। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ৬।
- বাংলাদেশে গবাদিপশু উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত গো-প্রজনন নীতি এবং প্রজনন কর্মসূচির বর্ণনা দিন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২০।

- গভীর হিমায়িত সিমেন মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালী লিখুন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ১০।
- সংক্ষেপে লিখুন- ফ্রি মার্টিন (Free Martin); ষ্টিল বার্থ (Still Birth); মোয়েট (MOET)। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ৬।
- কৃত্রিম প্রজননের সংজ্ঞা লিখুন। কৃত্রিম প্রজননের মুখ্য সুবিধাগুলি বর্ণনা করুন। গ্রাম পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সারা বছর উহাকে কার্যকর রাখার জন্য আপনার ভূমিকা কি হওয়া উচিত বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ৩০।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর উন্নয়ন করে দুধ, মাংস ও কর্ষণশক্তি বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের কোন নীতিমালা আছে কি? যদি থাকে তা উল্লেখপূর্বক এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ২৫।
- গো-সম্পদের জাত উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কি ধরণের প্রজনন নীতিমালা কার্যকর রয়েছে? সংক্ষেপে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় প্রজনন নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশের পশু প্রজনন নীতি (breeding policy) নিয়ে আলোচনা করুন। কৃত্রিম প্রজনন (AI) সফলকাম হয়েছে কি? উত্তর যদি 'না' হয়, তবে এর কারণগুলি লিখুন। বর্ষ ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৬: গবাদিপশুর রোগব্যাধির চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

- টীকা লিখুন- Transboundary animal diseases and their control; Residual effects of drugs; and Food safety and veterinary public health. আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৯।
- টীকা লিখুন- ডেইরি খামারে ম্যাসটাইটিস রোগ দমন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৩।
- Zoonotic disease কি? পাঁচটি Zoonotic disease-এর নাম লিখুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান গবাদিপশুর একটি ভাইরাস এবং একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১০।
- অপুষ্টিজনিত রোগ কি? অপুষ্টিজনিত যে কোন দুইটি রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১০।
- Contagious disease এবং infectious disease কি? বাংলাদেশে বিদ্যমান যে কোন পাঁচটি infectious disease এর নাম উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৫।
- Zoonotic disease এবং Food-borne disease কি? সাম্প্রতিক সময়ের পাঁচটি আলোচিত Zoonotic disease এর নাম, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১৫।
- টীকা লিখুন- ডেইরি খামারে প্যারাসাইটিক রোগ দমন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৩।
- Foot and Mouth রোগের কারণ কি? এ রোগের লক্ষণগুলি লিখুন। এ রোগের ভাইরাসের type ও sub-type গুলি কি? বাংলাদেশে এ রোগের ভাইরাসগুলির নাম লিখুন। এ রোগের টিকা প্রস্তুত প্রণালী, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ১৫।
- জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস রোগ কি? এ রোগের লক্ষণগুলি কি কি? জলাতঙ্ক রোগের টিকা (vaccine) প্রস্তুত প্রণালী, সংরক্ষণ, ব্যবহার বিধি, টিকার মাত্রা সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ১৫।
- ক্ষুরারোগ (FMD) এর প্রকোপ, বিস্তার, টিকাদান পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ৭।
- ক্ষুরারোগ (FMD) প্রতিরোধকল্পে জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রচারণাপত্র (leaflet) তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ৮।
- বাংলাদেশে বহুল আলোচিত গবাদিপশুর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের প্রকোপ, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ২০।

- তড়কা রোগের প্রকোপ, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। তড়কা রোগে মৃত গবাদিপশুর Post mortem করা কি উচিত? আপনার মতামত যুক্তিসহ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ১০।
- Foot and Mouth Disease এর type ও sub-type গুলি কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার সুপারিশ কি কি? ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ১০।
- ওলানফুলা রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। এ রোগে আক্রান্ত গাভী কি পরবর্তীতে স্বাভাবিক দুধ উৎপাদনে সক্ষম? মন্তব্য করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ১০।
- সোয়াইন ফ্লু কি? বাংলাদেশে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- Zoonotic disease বলতে কোন কোন রোগকে বুঝায়? কোন প্রাণী হতে রোগগুলো ছড়ায় উল্লেখ করুন। এ রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- Foot and Mouth Disease এর type ও sub-type গুলো কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- গবাদিপশুর অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৫।
- Anthrax রোগের প্রতিকারের উপায় কি? ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ২।
- গবাদিপশুতে ম্যাডকাউ ডিজিজ/ক্ষুরারোগ/তড়কা রোগ কেন অধিক হারে অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটায় বলে আপনি মনে করেন? আপনার সমর্থিত রোগটির কারণ, বিস্তার লাভ প্রক্রিয়া, প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও দমন পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- গরুতে ক্ষুরারোগ (FMD) দেখা দিলে কৃষক কি ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা বর্ণনা করুন এবং এ রোগ দমনের উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৬।
- বাংলাদেশের গবাদিপশুতে পাওয়া যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর পাঁচটি রোগের নাম কারণসহ (causal agent) উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে প্রাদুর্ভাব আছে গবাদিপশুর এ ধরণের পাঁচটি করে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী (parasite) জনিত রোগের নাম, কারণ (causal agent), লক্ষণ (signs and symptoms) ও রোগ নির্ণয় পদ্ধতিসহ (diagnosis) বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১৫।
- গবাদিপশুর যে কোন দশটি রোগের নাম কারণ (causal agent) ও লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৫।
- ম্যাড কাউ রোগটি কি? এ রোগের প্রাদুর্ভাব কিভাবে প্রশমিত করা যায়? আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৬।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- ট্রান্সবাউন্ডারি এনিমেল ডিজিজ। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।
- গবাদিপশুর পরজীবী ঘটিত যে কোন পাঁচটি রোগের নাম, কারণ (causal agent) সহ উল্লেখ করুন। পরজীবী রোগ দমনের মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ৮।
- সংক্ষেপে লিখুন- জৈব নিরাপত্তা (biosecurity); ডিজিজ সারভেইল্যান্স (disease surveillance)। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১০।
- অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর দশটি রোগের নাম কারণ (causal agent) ও লক্ষণ (symptoms) সহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে গবাদিপশুর অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ব্যাকটেরিয়া ও পাঁচটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম কারণসহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের ইপিডেমিওলজি (epidemiology) সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং এ রোগ দমন ও নির্মূলে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে গরু-বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর নাম লিখুন এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগটির কারণ, বিস্তার ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ২০।

- বাংলাদেশে গরু-বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর নাম লিখুন এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগটির কারণ, বিস্তার ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে গবাদিপশুর অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক রোগ কোনটি? এই রোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, রোগের কারণ, বিস্তার, চিকিৎসা ও দমন সম্পর্কে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ২০।
- পশুপাখি হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরুপ ১০টি রোগের নাম লিখুন। এর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক রোগটির কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও দমন সম্পর্কে লিখুন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২০।
- কি কি লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে যে গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি পরজীবী (parasite) দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে? কলিজা কৃমি (liver fluke) এর জীবনচক্র সবিস্তারে বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ২৫।
- ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ প্রাণির সাথে আদানিকৃত একটি রোগের বিস্তার ও দমন বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ১৫।
- জুনোটিক (zoonotic) রোগের সাথে অন্যান্য রোগের মৌলিক পার্থক্য কি? বাংলাদেশে কি জুনোটিক রোগ আছে? যে কোন একটি জুনোটিক রোগের বিস্তার প্রণালী আলোচনা পূর্বক দমন/প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ৩০।
- গরু-ছাগলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধির নাম উল্লেখপূর্বক গত ৫ বছরের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত ৪টি রোগের নাম উল্লেখ করুন এবং সেগুলোর প্রতিরোধে কি কি নীতমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১০।
- বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে রোগব্যাধি প্রতিরোধের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলির নাম লিখুন। ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা দমনের কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- ধরুন কোন এক এলাকায় গবাদিপশুর তড়কা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ রোগ দমনে কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করবেন? সংক্ষেপে নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- বিদ্যমান রোগব্যাধি গো-সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অন্যতম প্রধান প্রধান গবাদিপশুর ২টি রোগের নাম লিখুন, যার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া গরীব-ধনী কৃষকের জীবনে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৭।
- গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস রোগের নাম লিখুন এবং একটি রোগের নিবারন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করুন। বর্ষ ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৭: পশুপাখির সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- Disease surveillance কি? আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৫।
- লেয়ার খামারে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১০।
- টীকা লিখুন- ভ্যাকসিনের মান সংরক্ষণ। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৩।
- ভ্যাকসিন কি? ভ্যাকসিনের প্রকারভেদসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ভ্যাকসিন কার্যকর না হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক মাঠপর্যায়ে এর গুণগতমান বজায় রাখার উপায়সমূহ লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১৫।
- টীকা লিখুন- পোল্ট্রি খামারে বায়োসিকিউরিটি। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৩।
- টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৭.৫।
- মুরগির খামার ও দুগ্ধ খামারে (poultry and dairy farm) জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) রক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১৫।
- Biosecurity বলতে কি বুঝায়? রোগ নির্ণয়ে biosecurity এর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।

- একটি রোগের epidemiology তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (points) উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৪।
- রোগ দমনে জৈব নিরাপত্তার (biosecurity) ভূমিকা বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৫।
- রোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী রোগদমন ও প্রতিরোধের মৌলিক উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। কোন এলাকায় গবাদিপশুতে অজানা রোগ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীর তাৎক্ষণিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা করুন। দেশে কোন নতুন রোগ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১৫।
- টিকা কি ও কত প্রকার? দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের টিকার নাম উল্লেখপূর্বক সেগুলির সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করুন। টিকা প্রয়োগের পরেও রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১৫।
- উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও পশুপাখিতে প্রয়োগের পর্যায় পর্যন্ত টিকার গুণাগুণ (quality), নিরাপত্তা (safety) ও কার্যকারিতা (potency) বজায় রাখতে কি ধরণের পদক্ষেপ/সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১৫।
- রোগমুক্ত খামার গড়ে তোলার জন্য জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) বিষয়ক গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। 'খামারে কর্মরত ব্যক্তিবর্গই জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আইন ভঙ্গের মূল হোতা'। এ বক্তব্যের পক্ষে/বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৭।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- টিকা ও বিভিন্ন বায়োলজিক্স এর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- কুল চেইন (cool chain); টিকা (vaccine)। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে সরকারি তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত গবাদিপশুর যে কোন পাঁচটি টিকার নাম সংরক্ষণ তাপমাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা (dose) সহ উল্লেখ করুন। খামারে পিপিআর রোগের টিকা প্রয়োগের পরও উক্ত রোগে ছাগল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৫।
- একটি দুগ্ধ খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৮।
- একটি রোগমুক্ত মুরগির খামার গড়ে তোলার জন্য জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) বিষয়ক গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। খামারে টিকা প্রদান কর্মসূচি জৈবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদক্ষেপ- আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১০।
- কুল চেইন কি? উৎপাদন হতে শুরু করে পশুপাখিতে প্রয়োগ পর্যন্ত সময়ে টিকার গুণাগুণ বজায় রাখতে কি ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১০।
- টিকা কি ও কত প্রকার? প্রকারভেদে টিকার সুবিধা (advantage) ও অসুবিধা (disadvantage) সমূহ বর্ণনা করুন। টিকার গুণাগুণ পরীক্ষার পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। টিকার গুণাগুণ রক্ষা করে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য সতর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- বায়োসিকিউরিটি (biosecurity)। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ৩।
- সংক্ষেপে লিখুন- বায়োসিকিউরিটি (biosecurity)। আগষ্ট ২০০১; নম্বর ৩।
- সংক্ষেপে লিখুন- বায়োসিকিউরিটি (biosecurity)। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ৩।
- সংক্ষেপে লিখুন- বায়োসিকিউরিটি (biosecurity)। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত পশুপাখির বিভিন্ন টিকার নাম লিখুন। টিকা ব্যবহারের ও সংরক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী এবং টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লিখুন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ১০।
- সম্প্রতি অনুপ্রবেশকারী তিনটি গবাদি রোগের নাম উল্লেখপূর্বক গরু-বাছুরের খামারের জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করত গবাদি খামারে রোগব্যাধি দমনে তার ভূমিকা উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ২৫।

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু খামার স্থাপনে রোগব্যাধি প্রতিরোধের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ- কারণসহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ৮।
- পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু আমদানির মাধ্যমে কিছু নতুন রোগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। উক্ত রোগগুলি কি কি? আলোচিত যে কোন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে উহা প্রতিরোধের কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- পশুপাখি আমদানি সুবিধা ও অন্তরায়সমূহ কি কি? পশুপাখির সাথে কি কি রোগ আমদানি হতে পারে সংক্ষেপে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ১৫।
- গো-বসন্ত রোগের দমন ও নির্মূলের সাধারণ নীতি ও পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৭।
- পশুরোগ দমনে এবং নির্মূলে ইপিডেমিওলজিক্যাল ষ্টাডির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ? আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৮।

অধ্যায় ৮: ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন

- টীকা লিখুন- পিপিআর (PPR). আগষ্ট ২০১৬। নম্বর ৩।
- আপনার এলাকায় ছাগল চাষ উন্নয়নের জন্য একটি আদর্শ project profile তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ১২.৫।
- ছাগলের মরণব্যাধি PPR রোগ বলতে কি বুঝায়? এ রোগের প্রকোপ বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। আগষ্ট ২০১১। নম্বর ৮।
- 'ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন কম ঝুঁকিপূর্ণ ও লাভজনক' এই বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত? আপনার মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ৭।
- ছাগল ও ভেড়ার সংক্রামক রোগের নাম উল্লেখ করুন। এসব রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার সুপারিশগুলো পেশ করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- পিপিআর (PPR) আমাদের দেশে কোন ধরণের প্রাণিতে বেশি দেখা যায়। এ রোগের কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। আমাদের দেশে এ রোগের যে প্রতিষেধক টিকা তৈরি হচ্ছে তার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য দিন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- ১০০টি ভেড়া পালনের জন্য ২ বৎসর মেয়াদী একটি প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করুন এবং তার আয়-ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করুন। কোন কারণে প্রকল্পটি লাভবান না হলে তার কারণ ব্যাখ্যা অথবা আপনার মন্তব্য দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৪।
- সিডর (CIDR) আক্রান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ (একশত) জন কৃষকের জন্য একটি পূনর্বাসন মডেল পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন। (যেমন- ছাগল পালন)। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৬।
- 'গরীবের গাভী ছাগল' বলতে কি বুঝায়? ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালন না ছাগল পালন অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন- তা বিশ্লেষণ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- ২০০টি ছাগলের জন্য একটি প্রকল্প সারপত্র তৈরিতে বিবেচ্য অংগসমূহের (components) নাম ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ১০।
- দারিদ্র বিমোচনে পরিচালিত ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচির সফলতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। এ ধরণের প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ৭।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়নে কোন বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে বলে আপনি মনে করেন? ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ৫।
- পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদানের পরেও উক্ত রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাব্য কারণ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে গোট পক্স-এর ইপিডেমিওলজি (causal agent) বর্ণনা করুন। গোট পক্স দমনে একজন ভেটেরিনারিয়ান/প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১০।

- দেশে ছাগল খামার স্থাপনের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের অর্থনৈতিক গুণাগুণ (traits) সমূহ উল্লেখ করুন। উক্ত trait সমূহ অক্ষুন্ন রেখে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়নে দেশে কি ধরণের প্রজনন নীতিমালা (breeding policy) থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ২০।
- খামারে পিপিআর রোগের টিকা প্রয়োগের পরও উক্ত রোগে ছাগল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ৫।
- 'ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন' বিষয়ক জাতীয় কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। আপনার মতে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১৫।
- পিপিআর টিকা প্রদান কর্মসূচিতে অনেকগুলি ছাগল একত্রিত করে টিকা প্রদানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগসহ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মোট পাঁচটি রোগের নাম লিখুন। ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ এবং এ রোগের লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করুন। পিপিআর রোগের ইপিডেমিওলজি (epidemiology) সহ এ রোগ দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১৫।
- ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয় কেন? বাংলাদেশে ছাগল উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সমস্যাবলী বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- দেশী জাতের ৫০টি ছাগলের একটি খামার স্থাপনের পরিকল্পনা আয়-ব্যয় উল্লেখপূর্বক তৈরি করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- পার্বত্য চট্রগ্রামে একটি ছাগলের খামার স্থাপন করতে হলে তার কি কি পূর্বশর্ত প্রয়োজন উল্লেখ করুন এবং ৩০০ ছাগলের একটি খামার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাগল উন্নয়নের সম্ভাবনা কি কি? জাত উন্নয়ন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- ছাগলকে গরীবের সম্পদ বলে কেন? বাংলাদেশের নিজস্ব কোন প্রজাতির ছাগল রয়েছে কি? থাকলে তার নাম কি এবং কয় প্রকারের? বাংলাদেশে ছাগলের ৫টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগ-লক্ষণের নাম লিখুন এবং ভবিষ্যতের ছাগল উন্নয়নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ৯: হাঁস-মুরগি পালন

- একজন পরামর্শক হিসেবে ৫০০টি ব্রয়লার মুরগির খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দিন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১০।
- টীকা লিখুন- বাংলাদেশে হাঁসের রোগ। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ৩।
- রাণীক্ষেত রোগ কি? কি কারণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে? রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলি কি কি? রাণীক্ষেত রোগের টিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে প্রচলিত হাঁসের জাতগুলি কি কি? হাঁস পালনে কোন কোন এলাকা উপযোগী বলে মনে করেন? আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৫।
- ডিম উৎপাদনে কোন জাতের হাঁসের গুরুত্ব অধিক? আপনার মতামত দিন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৫।
- হাঁস পালনে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি লিখুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৫।
- একটি বাণিজ্যিক broiler ও layer খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ পাঁচটি রোগের একটি টিকাদান কর্মসূচি (vaccination schedule) প্রণয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করুন। উল্লেখিত টিকাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১৫।
- Avian Influenza রোগের লক্ষণসমূহ কি কি? আপনার খামার বা বাড়ীকে Avian Influenza (Bird Flu) মুক্ত রাখার একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১৫।

- কিভাবে আপনার খামারের বাড়ীতে পোষা হাঁস-মুরগি বার্ড ফ্লু (Bird Flu) মুক্ত রাখবেন এবং কিভাবে আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা বার্ড ফ্লু (Bird Flu) মুক্ত থাকবে তার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- বার্ড ফ্লু (Bird Flu) রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখপূর্বক উহা বিস্তার পদ্ধতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পোল্ট্রি শিল্পে (poultry industry) বর্তমানে সমস্যাবলী উল্লেখপূর্বক উহা সমাধানকল্পে সরকারের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ২০।
- পোল্ট্রি শিল্পের (poultry industry) বর্তমান সমস্যাগুলি কি এবং তা নিরসনে সরকারের কাছে একটি পরামর্শপত্র তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১৫।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান মুরগির জাতগুলি কি কি? ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে কোন কোন মুরগির জাতের উন্নয়ন প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দুরীকরণের উপায়গুলি আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে প্রচলিত হাঁসের জাতগুলি কি কি? হাঁস পালনের অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে কিভাবে ডিম ও মাংস উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দূরীকরণের উপায়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করুন। তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ২০।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের phylogenetic, epidemiological এবং economic study গ্রহণ করার জন্য একটি গবেষণা রূপরেখা প্রণয়ন করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের type ও sub-type গুলো কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- হাঁস-মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৫।
- Avian Influenza রোগের বিপরীতে টিকা ব্যবহারের পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার মতামত দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৬।
- Gumboro রোগের প্রতিকারের উপায় কি? ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ২।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু কি এবং এর sub-type সমূহের বর্ণনা দিন। কোন sub-type মানুষের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ তা উল্লেখ করুন। এ রোগটি কিভাবে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ প্রদান করুন। রোগটি যেন আক্রান্ত পশুপাখি হতে মানুষে বিস্তার লাভ করতে না পারে তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা ও উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু রোগ দমনে সার্ভিলেন্স ও জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা করুন এবং কোনটিকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তার সপক্ষে আপনার যুক্তি দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ১০।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/ বার্ড ফ্লু কি এবং কতটি sub-type রয়েছে? বাংলাদেশের পোল্ট্রিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়ার পর থেকে এ রোগ দমনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। দেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করা এবং এ রোগের ভাইরাস যাতে মানুষে সংক্রমিত না হয় সে ব্যাপারে কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশের হাঁস-মুরগিতে পাওয়া যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর পাঁচটি রোগের নাম কারণসহ (causal agent) উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৫।

- দেশে বৃহদাকার (large scale) পোল্ট্রি খামার স্থাপনের সম্ভাবনাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। বৃহদাকার পোল্ট্রি খামারের সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে পোল্ট্রি উন্নয়ন ক্ষেত্রে কি ধরণের অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে সম্প্রসারণ কর্মী, খামারি ও বিজ্ঞানীবৃন্দের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১০।
- বার্ড ফ্লু রোগের লক্ষণ কি? বাংলাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কি? কি কি সাবধানতা অবলম্বন করলে এর প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৮।
- মুরগির যে কোন পাঁচটি রোগের নাম, কারণ (epidemiology) ও লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। মুরগির খামারে রোগ দমন ও প্রতিকারে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১০।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- H_5N_1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাঁস-মুরগির জাতসমূহের নাম লিখুন। দেশীয় হাঁস-মুরগির জাত সংরক্ষণের গুরুত্বসহ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১৫।
- ‘দেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিক মুরগির জাত উদ্ভাবনের কোন যৌক্তিকতা নেই’- এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন। ‘গ্রামীণ পোল্ট্রি’ উপযোগী মুরগির একটি জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা রূপরেখা কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১৫।
- হাঁস-মুরগির পরজীবী ঘটিত যে কোন পাঁচটি রোগের নাম, কারণ (causal agent) সহ উল্লেখ করুন। পরজীবী রোগ দমনের মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ৭।
- সংক্ষেপে লিখুন- বার্ড ফ্লু (bird flue)। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ৫।
- হাঁস-মুরগির যে কোন পাঁচটি ক্ষতিকর রোগের নাম লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। মুরগির রাণীক্ষেত রোগের ইপিডেমিওলজি বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং এ রোগ দমনের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে হাঁস-মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ব্যাকটেরিয়া ও পাঁচটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম কারণসহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ৫।
- ‘পোল্ট্রি শিল্পে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা’ বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন। এ অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ক্যানিবালিজম (cannibalism)। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ৩।
- সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১৫।
- লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির টিকাদানের নির্ঘন্ট লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১০।
- সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ক্যানিবালিজম (cannibalism)। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ৩।
- মুরগির ভিটামিনের অভাবজনিত রোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১০।
- সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২০।
- লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির টিকাদানের নির্ঘন্ট লিখুন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১০।
- সম্প্রতি অনুপ্রবেশকারী ২টি (দুইটি) হাঁস-মুরগির রোগের নাম উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ৫।
- কি কি লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে যে হাঁস-মুরগি পরজীবী (parasite) দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে? ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ৫।
- বণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি খামার স্থাপনে রোগব্যাধি প্রতিরোধের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ- কারণসহ বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ৭।

- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যক্তিমালিকানাধীন হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১২।
- হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধির নাম উল্লেখপূর্বক গত ৫ বছরের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত ২টি রোগের নাম উল্লেখ করুন এবং সেগুলোর প্রতিরোধে কি কি নীতমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১৫।
- হাঁস-মুরগি উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ মালিকগণ কি কি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন? এ সমস্ত সমস্যার যৌক্তিক সমাধান কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে? ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ৭।
- হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে রোগব্যাধিজনিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ অপরিহার্য। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বর্ণনা করত তাহা দূরীকরণের সম্ভাব্যতা প্রণয়ন করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- হাঁস-মুরগি দ্রুত বংশ বৃদ্ধিজনিত গৃহপালিত পাখি। এর উন্নয়নের সম্ভাবনা অধিকতর থাকা সত্বেও কেন এ শিল্পটি বাংলাদেশে গড়ে উঠছে না? এর উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সুপারিশমালা বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের হাঁস-মুরগির খামার যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। ২০০ টি উন্নত জাতের মুরগির খামারের প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ৭।
- বিদ্যমান রোগব্যাধি হাঁস-মুরগি সংরক্ষণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অন্যতম প্রধান প্রধান হাঁস-মুরগির ২টি রোগের নাম লিখুন, যার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া গরীব-ধনী কৃষকের জীবনে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৮।
- বাংলাদেশে মুরগি খামার (poultry farm) তৈরি করতে কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে? ছোট একটি খামার তৈরির রুপরেখা (outline) দিন? বর্ষ ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ১০: জীববৈচিত্র্য ও আমাদের প্রাণিসম্পদ

- টীকা লিখুন- Companion animals and their health management. আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৩।

অধ্যায় ১১: গবাদিপশু ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

- বাংলাদেশে বর্তমানে দুধ, ডিম এবং মাংসের চাহিদা ও সরবরাহ উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে দুধের চাহিদা পূরণে সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে Milk Vita-এর অবদান আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ৭।
- আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ৬।
- ‘বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মালিকানাধীন দুগ্ধ খামারের চেয়ে সমবায় পদ্ধতির দুগ্ধ খামার বেশি কার্যকর’- এই উক্তিটির পক্ষে/বিপক্ষে আপনার মতামত দিন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ১০।
- দুধের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণে কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ? আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ৫।
- গুড়ো দুধে মেলামিন সমস্যা সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করছেন? দেশের অভ্যন্তরে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপনার সুপারিশসমূহ কি কি? ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে আমাদের করণীয় কি কি? ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষুদ্র পরিসর (small scale) দুগ্ধ খামারের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ৯।
- বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে দুগ্ধ খামার স্থাপনের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১০।

- বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলগুলোর নাম লিখুন এবং এদের উদ্ভব কিভাবে হল তা বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলগুলোর নাম লিখুন এবং এদের উদ্ভব কিভাবে হল তা বর্ণনা করুন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে পশু ও পশুজাত পণ্যের বিশেষ করিয়া দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করুন। বেসরকারি উদ্যোগে কিভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব সুপারিশসহ বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে বর্তমানে গরুর দুধের সংকট আছে- এর সমাধানকল্পে অল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

অধ্যায় ১২: প্রাণিসম্পদ উপজাত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ১৩: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

- 'প্রকল্প চক্র' বলতে কি বুঝায়? আদর্শ প্রকল্প তৈরির ধাপসমূহ আলোচনা করুন। প্রকল্প অনুমোদনে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১২.৫।
- প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ন (evaluation) বলতে কি বুঝায় আলোচনা করুন। প্রকল্প মনিটরিং কেন গুরুত্বপূর্ণ? প্রকল্প মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১০।
- Cost Benefit Ratio কি? Critical Path Method (CPM) বর্ণনা করুন। PERT (Programme Evaluation and Review Technique) method কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১৬; নম্বর ১২.৫।
- প্রকল্প চক্রের ধাপসমূহ উল্লেখ করুন। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। আদর্শ প্রকল্প প্রোফর্মা (Project Proforma)-র উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১২.৫।
- T.A প্রকল্প এবং Investment প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য কি? কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ দিন। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে যথাসময়ে এ ধরণের প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া ও পর্যায়সমূহের বিবরণ উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১২.৫।
- Net Present Value কি? প্রকল্প monitoring এবং evaluation কি? আলোচনা করুন। Cost Benefit Ratio কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১৬; নম্বর ১২.৫।
- PERT method (Programme Evaluation and Review Technique) NET Work Analysis বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৬।
- Cost and Benefit Ratio বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। একটি সফল প্রকল্পের ক্ষেত্রে CB ratio এর মান কত হবে? আগষ্ট ২০১৩; নম্বর ৬.৫।
- একটি প্রকল্প দলিলে কি কি অংশ থাকে? আপনার এলাকায় ছাগল উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (concept paper) তৈরি করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ২০।
- একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদ্ধতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপ বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- Net Present Value (NPV) এবং Economic Internal Rate of Return (EIRR) কিভাবে নির্ণয় করা হয়? বিবরণ দিন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট তৈরির জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করুন। ৫ (পাঁচ) বছর পর কিভাবে প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয় তা আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ২০।

- Monitoring (পরিবীক্ষণ) ও evaluation (মূল্যায়ন) এর মধ্যে পার্থক্য কি কি? একটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে monitoring ও evaluation এর গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০১০; নম্বর ২০।
- প্রকল্পের যথাযথ নির্বাচন ও প্রণয়নে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন? প্রকল্পের সফলতার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ৬।
- প্রকল্প মূল্যায়নের ধাপগুলো বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৬।
- Net Present Value (NPV) নির্ণয়ের পদ্ধতি একটি উদহরণসহ বিধৃত করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ৬।
- সিডর আক্রান্ত এলাকায় পশুসম্পদের পুনর্বাসনকল্পে একটি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ তৈরি করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৯; নম্বর ১০।
- প্রকল্প বলতে কি বুঝায়? ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৪।
- প্রকল্প প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৪।
- প্রকল্প গ্রহণের ধাপগুলি বর্ণনা করুন। আপনার বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণে কোন ধাপটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা যুক্তিসহ উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৮; নম্বর ৪।
- প্রকল্প বলতে কি বুঝায়? আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ৫।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- Economic Internal Rate of Return (EIRR) নির্ণয়; Critical Path Method (CPM) কি? Cost and Benefit Ratio (CBR) নির্ণয়; প্রকল্প পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation); প্রকল্প সারপত্র। আগষ্ট ২০০৭; নম্বর ১০।
- প্রকল্প কি? আর্থিক সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের বর্ণনা প্রদানসহ প্রকল্প অনুমোদনের ধাপসমূহ আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- প্রকল্প সারপত্র; পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। ফেব্রুয়ারি ২০০৭; নম্বর ১০।
- পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়নের (evaluation) সংজ্ঞা লিখুন। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১৩।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:- সারথী প্রকল্প (pilot project); ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ণ (EIRR); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। আগষ্ট ২০০৬; নম্বর ১০।
- প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। আর্থিক বিবেচনায় (Financial limitations) অনুযায়ী প্রকল্প কত প্রকার তা বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- প্রকল্প মূল্যায়ন (evaluation); সারথী প্রকল্প (pilot project); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) নির্ণয় পদ্ধতি; PERT মেথড। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ১০।
- প্রকল্প কি? একটি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ণ (EIRR); প্রকল্প সারপত্র (PCP); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। আগষ্ট ২০০৫; নম্বর ১০।
- প্রকল্প কি? প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ (প্রকল্প চক্র) সম্পর্কে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- সারথী প্রকল্প (pilot project); পরিবীক্ষণ (monitoring); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)। ফেব্রুয়ারি ২০০৫; নম্বর ১০।
- পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation) বলতে কি বুঝায়? প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১৫।

- সংক্ষেপে লিখুন- প্রকল্প সারপত্র; ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন (EIRR); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)। আগষ্ট ২০০৪; নম্বর ১০।
- প্রকল্প কি? একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যে সমস্ত বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- প্রকল্প মনিটরিং; নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); PERT মেথড; কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। ফেব্রুয়ারি ২০০৪; নম্বর ১০।
- প্রকল্প সারপত্র কি? প্রকল্প সারপত্র প্রণয়নে বিবিচ্য অংগ (component) সমূহের নাম ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১৫।
- সংক্ষেপে লিখুন- ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন (EIRR); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। ফেব্রুয়ারি ২০০৩; নম্বর ১০।
- প্রকল্প এপ্রাইজাল (project appraisal) ও প্রকল্প মূল্যায়নের (project evaluation) মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকল্প পরিবীক্ষণের (monitoring) মূল নির্দেশকসমূহ লিখুন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১৫।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং একনেক (ECNEC) এর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০২; নম্বর ১০।
- প্রকল্প এপ্রাইজাল (project appraisal) ও প্রকল্প মূল্যায়নের (project evaluation) মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকল্প পরিবীক্ষণের (monitoring) মূল নির্দেশকসমূহ লিখুন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১৫।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং একনেক (ECNEC) এর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। অগষ্ট ২০০১; নম্বর ১০।
- একটি প্রকল্প সারপত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ এবং আকারভেদে প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়গুলোর বর্ণনা দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১৫।
- একটি 'সি' ক্যাটেগরি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিবরণ দিন। ফেব্রুয়ারি ২০০১; নম্বর ১০।
- বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ২০।
- একটি 'ক' শ্রেণীর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতার বিবরণ দিন। আগষ্ট ২০০০; নম্বর ৫।
- প্রকল্পের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস কি কি ভাবে হইয়া থাকে এবং প্রকল্পভেদে প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ১০।
- ইআইআরআর (EIRR) বলিতে কি বুঝায়? All-in All-out নিয়মে ৫০০ (পাঁচশত) মুরগির একটি ব্রয়লার খামারের ইআইআরআর (EIRR) বাহির করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; নম্বর ১৫।
- প্রকল্প বুলতে কি বুঝায়? প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাস কি কি ভাবে হইয়া থাকে সংক্ষেপে লিখুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ১০।
- স্থানীয় এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যগুলি কি? একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭; নম্বর ১৫।
- গবেষণা প্রকল্প তৈরিতে কি কি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ১০।
- CMP ও PERT সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং ও মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯৬; নম্বর ১৫।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়মিত পরিদর্শন, মানটরিং এবং মূল্যায়নের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫; নম্বর ১৫।
- CPM ও PERT পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১০।

- প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর গুলির নাম লিখুন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জটিলতম সমস্যাটির (আপনার মতে) উপর একটি প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ২৫।
- গবেষণা পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির নাম লিখুন। গবেষণা প্রকল্প তৈরিতে কি কি বিষয় বিবেচনায় আনা আবশ্যক? ফেব্রুয়ারি ১৯৯২; নম্বর ২৫।
- প্রকল্প তৈরির পর সার্বিক বাস্তবায়নে প্রকল্প কাজের উপর নিয়মিত পরিদর্শন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কতটুকু ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে লিখুন। আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ১৫।
- পরিকল্পনা প্রণয়নে (project preparation) কি কি উপাদান দরকার? পরিকল্পনার রেখাচিত্রের (project profile) একটি ছাঁচ (model) তৈরি করুন। বর্ষ ১৯৮৮; নম্বর ১৫।
- উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি বিষয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত? আগষ্ট ১৯৮৮; নম্বর ৫।

অধ্যায় ১৪: প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা

- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলী কি কি এবং উক্ত নীতিমালার বিশেষ ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১০
- উক্ত নীতিমালায় dairy and poultry development-এর ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সমস্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন। আগষ্ট ২০১১; নম্বর ১০
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা কোন সালে প্রণীত ও গৃহীত হয় এবং নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলি কি কি? জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালায় চিহ্নিত বিশেষ ক্ষেত্রগুলির (critical areas) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। আগষ্ট ২০১০; নম্বর ২০।
- বাংলাদেশে 'পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা' কি? আগষ্ট ২০০৯; নম্বর ২।
- সংক্ষেপে বর্ণনা করুন- পশুরোগ আইন, ২০০৫। ফেব্রুয়ারি ২০০৬; নম্বর ৫।
- বাংলাদেশে রোগ দমন ও প্রতিরোধের জন্য প্রাণিরোগ নীতিমালা নামে কোন নীতিমালা আছে কিনা? নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কি কি দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১০।
- এ্যানিম্যাল কোয়ারেনটাইন এ্যাক্ট বলতে কি বুঝায়? আমাদের দেশের প্রক্ষাপটে এই এ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? দেশের কোথায় কোথায় এ ক্যাম্প স্থাপন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন তা যুক্তিসহ উল্লেখ করুন। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; নম্বর ১৫।
- আমদানি নীতিমালায় পশুপাখির বীজ ও খাদ্য অবাধ হওয়া প্রয়োজন। এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আপনার ব্যক্তিগত মতামত বর্ণনা করুন। আগষ্ট ১৯৯২; নম্বর ১৫।
- বাংলাদেশে পশুরোগ নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত আইনসমূহের তালিকা দিন। সুনিয়ন্ত্রিত পশুরোগ আইন প্রণয়নে কি কি বিষয় বিবেচনা করা দরকার? ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮; নম্বর ১৫।

সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নপত্র

এই অংশে ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের বিগত প্রায় ৩০ বছরের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষার প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ হুবহু সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২০
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) প্রকল্পচক্র বলতে কী বুঝায়? ২.৫
(খ) মডেল প্রজেক্ট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৫
(গ) প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধাপগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন। ৫
২। (ক) প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী? ২.৫
(খ) সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখপূর্বক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণের ধাপগুলো বর্ণনা করুন। ৫
(গ) Net Present Value (NPV) বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৫
৩। (ক) পিপিআর ২০০৮ এর আলোকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করুন। ২.৫
(খ) EOI এর পদ্ধতিগত শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করুন। ৫
(গ) PCR এর নিয়ম, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীসমূহ বর্ণনা করুন। ৫

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪। (ক) প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত এ দেশে প্রচলিত আইন ও কাজ সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। ৫
(খ) পশুখাদ্য আইন, ২০১০ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১০
৫। (ক) বিদেশে মাংস রপ্তানির অন্তরায়সমূহ কী কী? কিভাবে তা দূর করা যায়? ৫
(খ) বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্রয়লার মুরগির একটি ভাইরাসজনিত এবং একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের কারণ, লক্ষণ, বিস্তার (চিকিৎসা) ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করুন। ১০
৬। সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (যে কোন তিনটি): ১৫
(ক) Nutritional disorder; (খ) Unsafe food; (গ) Unconventional feed; (ঘ) Biosecurity in broiler farm; (ঙ) Culling of hen

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৭। (ক) মোটাতাজাকরণের জন্য কী ধরনের গরু নির্বাচন করা উচিত? ৫
(খ) গরু মোটাতাজাকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। এদের একটি আদর্শ খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করুন। ১০
৮। (ক) ছাগল পালনের ক্ষেত্রে খামারিরা কী কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তা বর্ণনা করুন। ৫
(খ) ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংসের গুণাগুণ বর্ণনা করুন। ৫
(গ) SDGs এর কোন Goal টি প্রাণিসম্পদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তা বর্ণনা করুন। ৫
৯। (ক) গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের একটি খাদ্য তালিক তৈরি করুন। ৮
(খ) **Embryo Transfer** পদ্ধতির মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বর্ণনা করুন। ৭

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) Multiple Ovulation Embryo Transfer (MOET) Technology; (খ) Metabolic Diseases of Cattle; (গ) Public Private Partnership (PPP); (ঘ) BLRI; (ঙ) ILRI; (চ) UMB; (ছ) Feed Conversion Ratio. ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১৯
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘন্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) প্রকল্প বলতে কী বুঝায় বর্ণনা করুন। ২.৫

(খ) Project Appraisal Report (PAR) এবং Project Completion Report (PCR) এর সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন । ৫

(গ) প্রজেক্ট প্রফর্মা (PP) এর কম্পোনেন্টগুলো কী কী? প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের আর্থিক সীমাবদ্বতাসমূহ আলোচনা করুন। ৫

২। (ক) Implementation (বাস্তবায়ন), Monitoring (পরিবীক্ষণ) Evaluation (মূল্যায়ন) এর মধ্যে পার্থক্যগুলো লিপিবদ্ব করুন। ৬

(খ) একটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে Implementation, Monitoring ও Evaluation এর গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৬.৫

৩। (ক) Cost & Benefit Ratio কী বর্ণনা করুন। ৩.৫

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (যে কোনো তিনটি): ৯

(i) Economic Internal Rate of Return (EIRR); (ii) Development Project Proposal (DPP)
(iii) Project Concept Paper (PCP); (iv) Expression of Interest (EoI)

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪। (ক) গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগির ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের পৃথক তালিকা তৈরি করুন (বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন রোগসমূহ উল্লেখ করতে হবে)। ১০

(খ) লেয়ার মুরগির Vaccination Schedule তৈরি করুন। ৫

৫। (ক) প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত এদেশে প্রচলিত আইন ও অধ্যাদেশগুলোর একটি তালিকা প্রস্তত করুন। ৫

(খ) Zoonotic disease কী? Zoonotic রোগ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫

(গ) Transboundry Animal Disease গুলো কী কী? এ রোগগুলো প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫

৬। সংক্ষেপে বর্ণনা করুন: ১৫

a) Emerging and reemerging diseases; b) Antimicrobial Resistance (AMR); c) Animal Quarantine; d) Biosecurity in smallholder layer farms; e) Disease surveillance

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৭। Food safety বলতে কী বুঝায় আলোচনা করুন। প্রাণিসম্পদ হতে প্রাপ্ত মানুষের জন্য বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাত করার সময় কিভাবে অনিরাপদ (unsafe) খাদ্যে পরিণত হয় তা বর্ণনা করুন। প্রাণিসম্পদ হতে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ১৫

৮। (ক) বিদেশ হতে গুড়া দুধ আমদানির ফলে এদেশে দুধ উৎপাদন কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বর্ণনা করুন। ৫

(খ) ডেইরি খামারগুলোকে আরো লাভজনক করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? ৫

(গ) অধিক উৎপাদনশীল দুধের গাভীর একটি খাদ্য তালিক প্রস্তত করুন। ৫

৯। (ক) এদেশের দুগ্ধ শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় ফার্মিং- এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন। ৫

(খ) AI এর মাধ্যমে এদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্রিডিং পলিসিসমূহ বর্ণনা করুন। ৫

(গ) দেশীয় ভেড়ার মাংসের গুণাগুণ বর্ণনা করুন। ৫

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) Cool chain for Vaccine; (খ) ONBS; (গ) MOET; (ঘ) Repeat Breeding Syndrome; (ঙ) Companion Animal; (চ) Toxin Binder; **(ছ) SDGs for Livestock Sector.** ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১৮
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) উন্নয়ন প্রকল্প বলতে কি বুঝায়? উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন। ৭.৫
(খ) আদর্শ প্রকল্প প্রফর্মার (Project Proforma) উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ৫
২। (ক) Net Present Value কি? ২.৫
(খ) Cost Benefit Ratio কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫
(গ) একটি আদর্শ প্রকল্পের অর্থনৈতিক দিকগুলো আলোচনা করুন। ৫
৩। (ক) Model Project বলতে কি বুঝায়? ২.৫
(খ) একটি প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন দিকগুলোয় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে তা আলোচনা করুন। ৫
(গ) বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন। ৫

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪। (ক) পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৭.৫
(খ) হাওর এলাকয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কি কি প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়? এ সকল প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা সম্ভব আলোচনা করুন। ৭.৫
৫। (ক) খামারের মুরগিকে ভ্যাকসিন করার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়? ৫
(খ) নিজস্ব খামারের একটি ভ্যাকসিনিশন কর্মসূচি তৈরি করুন। ১০
৬। (ক) গবাদিপশু ও পাখির Infectious disease ও Contagious disease এর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। ৫
(খ) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গরুর একটি ভাইরাসজনিত এবং একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের কারণ, লক্ষণ, বিস্তারের প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করুন। ১০

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৭। (ক) এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে Co-operative farming এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ১০
(খ) Transboundary animal disease বলতে কি বুঝায়? এ রোগের একটি তালিকা তৈরি করুন। ৫
৮। (ক) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্রিডিং পলিসি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫
(খ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে AI ও Embryo Transfer (ET) পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা করুন। ET পদ্ধতির মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে ব্যাখা করুন। ১০
৯। (ক) এদেশের প্রাপ্ত Conventional ও Unconventional প্রাণিখাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করুন। ২.৫
(খ) সাইলেজ (Silage) তৈরির মূলনীতি বর্ণনা করুন। ৫
(গ) গাভীর একটি খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। ৭.৫

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) **Family Poultry**; (খ) **Drug Residue**; (গ) **Nutritional deficiency disease in livestocks**; (ঘ) **DNBS**; (ঙ) **Genome Sequencing**; (চ) **Feed additives**; (ছ) **Virus and Bacteria.** ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) প্রকল্প কি? উন্নয়ন প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মধ্যকার পার্থক্যগুলি লিখুন। ৫

(খ) Project documents বলতে কি বুঝায়? ২.৫

(গ) Project documents অনুমোদনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৫

২। (ক) Cost Benefit Ratio নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ২.৫

(খ) Economic Internal Rate of Return (EIRR) সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ৫

(গ) Program Evaluation and Review Technique (PERT) কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫

৩। (ক) পরিবীক্ষণ (Monitoring) ও মূল্যায়ন (Evaluation) কি? এদের মধ্যে পার্থ্যগুলি বর্ণনা করুন। ৫

(খ) একটি প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি কি ধাপ বিবেচনা করা যায় লিপিবদ্ধ করুন। ৪

(গ) দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩.৫

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪। (ক) 'পশুরোগ আইন ২০০৫' এর আলোকে সংক্রামিত এলাকার পশুকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথকীকরণ ও চিকিৎসা প্রদানের ধারাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৭.৫

(খ) পশুরোগ আইনটি প্রয়োগের বাধাসমূহ এবং সেগুলি সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ৭.৫

৫। বাংলাদেশে মুরগিতে দেখা যায় এমন পাঁচটি জীবাণুঘটিত রোগের নাম, কারণ (Causal agents), লক্ষণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে লিখুন। ১৫

৬। (ক) টিকা (Vaccine) ও Sera এর সংজ্ঞা লিখুন এবং এদের ব্যবহার কেন প্রয়োজন বর্ণনা করুন। ৭

(খ) রোগ বিস্তারের ধরন অনুযায়ী কখন একটি রোগকে Epidemic, Endemic এবং Sporadic বলা যায় উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন। ৮

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৭। (ক) বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্প উন্নয়নের সমস্যা এবং সেগুলি দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন। ৮

(খ) 'পশু খাদ্যের অভাব দেশে গাবদিপশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়'- এ বক্তব্যের যথার্থতা এবং এ সমস্যা দূরীকরণে গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৭

৮। (ক) মোটাতাজাকরণের জন্য কি ধরনের গরু নির্বাচন করা উচিত আলোচনা করুন। ৫

(খ) গরু মোটাতাজাকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন এবং এদের জন্য একটি আদর্শ খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করুন। ১০

৯। (ক) একটি লেয়ার মুরগির খামারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৭

(খ) বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন হাঁসের জাতগুলির নাম উল্লেখ করুন। এর মধ্যে কোন জাতের হাঁস ডিম ও মাংস উৎপাদনে পালন করা লাভজনক সে বিষয়ে আলোচনা করুন। ৪

(গ) ডিমের খাদ্যমান বর্ণনা করুন। ৪

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) Residual effect of drugs and insecticides; (খ) Probiotics; (গ) Biosecurity; (ঘ) Silage and hay; (ঙ) Zoonotic diseases; (চ) Hybrid vigour; (ছ) Urea treated straw. ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১৭
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	নম্বর
১। (ক) উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?	২.৫
(খ) একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তাসহ প্রকল্প তৈরির ধাপসমূহ আলোচনা করুন।	৫
(গ) আদর্শ প্রকল্প প্রোফর্মার (Project Proforma) উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।	৫
২। (ক) Net Present Value (NPV) কি?	২.৫
(খ) Critical Path Method (CPM) কি? বর্ণনা করুন।	৫
(গ) Cost Benefit Ratio কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।	৫
৩। (ক) T.A. প্রকল্প ও Investment প্রকল্প এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।	২.৫
(খ) Project Monitoring এবং Project Evaluation এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।	৫
(গ) একটি আদর্শ প্রকল্পের জন্য কি কি বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক দিকগুলি (EIR) বিবেচনা করা হয় আলোচনা করুন।	৫
খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	
৪। **(ক) বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে- বর্ণনা করুন?**	৭.৫
(খ) হাওড় এলাকায় সাম্প্রতিক অকাল বন্যায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে- বর্ণনা করুন। দীর্ঘমেয়াদে এ সকল ক্ষতি প্রশমনের উপায়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।	৭.৫
৫ (ক) Infectious এবং contagious disease এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন। Nutritional disease কি?	৫
(খ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ Broiler এর একটি ভাইরাসজনিত এবং একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের কারণ, লক্ষণ, বিস্তারের প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করুন।	১০
৬। (ক) ভ্যাকসিন কি? ভ্যাকসিন এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।	৫
(খ) ভ্যাকসিন কার্যকর না হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক মাঠ পর্যায়ে এর মান বজায় রাখার উপায় বর্ণনা করুন।	১০
গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	
৭। (ক) বাংলাদেশে বর্তমানে ডিম, দুধ এবং মাংসের চাহিদা ও সরবরাহ উল্লেখ করুন।	৫
(খ) বাংলাদেশে দুগ্ধ শিল্প উন্নয়নে 'Cooperative' এর গুরুত্ব উদাহরণসহ আলোচনা করুন।	১০
৮। (ক) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে বাংলাদেশের Breeding Policy সম্পর্কে আলোচনা করুন।	৬
(খ) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে Artificial Insemination (AI) এবং Embryo Transfer পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা করুন। Embryo Transfer পদ্ধতির মাধ্যমে জাত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি কি ধরনের সমস্যা হতে পারে- ব্যাখ্যা করুন।	৯
৯। (ক) Conventional ও Unconventional পশুখাদ্য কি? গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের খাদ্য তালিকা তৈরি করুন।	৭
(খ) একজন পরামর্শক হিসেবে ৫০টি গাভী সম্বলিত একটি দুগ্ধ খামারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বর্ণনা করুন।	৮
ঘ গ্রুপ	
১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) ONBS; (খ) Silage; (গ) Drug resistance; (ঘ) Transboundary Animal Disease; (ঙ) PPR; (চ) BSE; (ছ) Genome Sequencing.	৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) প্রকল্পের সংজ্ঞা লিখুন। ২.৫

(খ) প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যাবলীসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ৫

(গ) প্রকল্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। ৫

২। (ক) প্রকল্পের সারপত্র বলতে কি বুঝায়? ২.৫

(খ) প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৫

(গ) মনিটরিং কি? প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫

৩। সংক্ষেপে বর্ণনা করুনঃ

(ক) Critical Path Method (CPM) ৩

(খ) NPV ৩.৫

(গ) EIRR ৩

(ঘ) Cost Benefit Ratio ৩

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪। (ক) Transboundary Animal Disease কি? ৫

(খ) গবাদিপশুতে তড়কা, ক্ষুরারোগ এবং জলাতঙ্ক রোগের মধ্যে কোনটি অধিক হারে অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটায়? বর্ণিত রোগগুলোর যে কোন একটির কারণ, লক্ষণ, বিস্তারলাভ প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করুন। ১০

৫ (ক) উদাহরণসহ Contagious এবং Infectious Disease এর তুলনামূলক বর্ণনা দিন ৫

(খ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ কি? এ রোগের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন এবং এ রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন। ১০

৬। (ক) Residual Effect of Drugs কি? এর থেকে পরিত্রাণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন। ৭

(খ) পরজীবী কি এবং কত প্রকার? একটি মুরগির খামারে পরজীবীঘটিত রোগ দমনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৮

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৭। (ক) 'Prevention is better than cure' উক্তিটির যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। ৫

(খ) বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট উন্নয়ন হলেও গবেষণালব্ধ technology সমূহ কেন খামারিদের কাছে যাচ্ছে না সে বিষয়ে আলোচনা করুন। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা আলোচনা করুন। ১০

৮। (ক) অপ্রচলিত পশুখাদ্যের বিবরণ দিন। গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। ৮

(খ) কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ ও খড় প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন। ৭

৯। (ক) ONBS কি? ৫

(খ) একজন পরামর্শক হিসেবে ৫০০টি গাভীর খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দিন। ১০

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) Feed Conversion Ratio (FCR); (খ) Zoonotic Disease; (গ) Food Safety and Food Security; (ঘ) Total Digestible Nutrient (TDN); (ঙ) Artificial Insemination; (চ) MOET; (ছ) Food borne disease. ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১৬
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	নম্বর
১। (ক) ‘প্রকল্প চক্র’ বলতে কি বুঝায়?	২.৫
(খ) আদর্শ প্রকল্প তৈরির ধাপসমূহ আলোচনা করুন।	৫
(গ) প্রকল্প অনুমোদনে অর্থনৈতিক সীমাব্ধতা বর্ণনা করুন।	৫
২। (ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান পাঁচটি প্রকল্পের নাম উল্লেখ করুন।	২.৫
(খ) প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ন (evaluation) বলতে কি বুঝায় আলোচনা করুন। প্রকল্প মনিটরিং কেন গুরুত্বপূর্ণ? প্রকল্প মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।	১০
৩। (ক) Cost Benefit Ratio কি?	২.৫
(খ) Critical Path Method (CPM) বর্ণনা করুন।	৫
(গ) PERT (Programme Evaluation and Review Technique) method কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।	৫
খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	
৪। (ক) Zoonotic disease কি? পাঁচটি Zoonotic disease-এর নাম লিখুন।	৫
(খ) বাংলাদেশে বিদ্যমান গবাদিপশুর একটি ভাইরাস এবং একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ, সম্ভাব্য চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১০
৫ (ক) Disease surveillance কি? (খ) লেয়ার খামারে জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১৫
৬। টীকা লিখুন (তিনটি):- (ক) Reproductive health Management; (খ) Residual effects of drugs; (গ) Food safety and veterinary public health; (ঘ) Transboundary animal diseases and their control; (ঙ) Companion animals and their health management.	৩×৩
গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)	
৭। (ক) বাংলাদেশে বর্তমানে দুধ, ডিম এবং মাংসের চাহিদা ও সরবরাহ উল্লেখ করুন।	৫
(খ) অধিক দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশে কি ধরণের ব্রিডিং প্ল্যান গ্রহণ করা উচিৎ, যুক্তিসহকারে আলোচনা করুন।	১০
৮। (ক) একটি ৫০০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য বাৎসরিক roughage এবং concentrate খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করুন। (খ) একজন পরামর্শক হিসেবে ৫০০টি ব্রয়লার মুরগির খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের বর্ণনা দিন।	১৫
৯। (ক) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের রূপরেখা আলোচনা করুন। (খ) বাংলাদেশে দুধের চাহিদা পূরণে সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে Milk Vita-এর অবদান আলোচনা করুন।	১৫
ঘ গ্রুপ	
১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) ভ্যাকসিনের মান সংরক্ষণ; (খ) ডেইরি খামারে ম্যাসটাইটিস রোগ দমন; (গ) পিপিআর (PPR); (ঘ) গরু মোটাতাজাকরণ; (ঙ) ONBS; (চ) Genome Sequencing; (ছ) Silage.	৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০
নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন) নম্বর

১। (ক) প্রকল্প চক্রের ধাপসমূহ উল্লেখ করুন। ২.৫

(খ) প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। ৬

(গ) আদর্শ প্রকল্প প্রোফর্মা (Project Proforma)-র উপাদানসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ৪

২। (ক) T.A প্রকল্প এবং Investment প্রকল্পের মধ্যে পার্থক্য কি? ২.৫

(খ) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ দিন। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির সুবিধার্থে যথাসময়ে এ ধরণের প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া ও পর্যায়সমূহের বিবরণ উল্লেখ করুন। ১০

৩। (ক) Net Present Value কি? ২.৫

(খ) প্রকল্প monitoring এবং evaluation কি? আলোচনা করুন। ৫

(গ) Cost Benefit Ratio কি? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৫

খ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

১। (ক) অপুষ্টিজনিত রোগ কি? অপুষ্টিজনিত যে কোন দুইটি রোগের নাম, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

(খ) Contagious disease এবং infectious disease কি? বাংলাদেশে বিদ্যমান যে কোন পাঁচটি infectious disease এর নাম উল্লেখ করুন। ৫

২ (ক) Zoonotic disease এবং Food-borne disease কি? ৫

(খ) সাম্প্রতিক সময়ের পাঁচটি আলোচিত zoonotic disease এর নাম, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

৩। (ক) ভ্যাকসিন কি? ভ্যাকসিনের প্রকারভেদসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ৫

(খ) ভ্যাকসিন কার্যকর না হওয়ার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক মাঠপর্যায়ে এর গুণগতমান বজায় রাখার উপায়সমূহ লিখুন। ১০

গ গ্রুপ (যে কোন দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন)

১। (ক) ONBS এবং Progeny Testing কি? ৫

(খ) বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি খাত ও সমবায়ের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

২। (ক) একটি ৫০০ কেজি ওজনের দুগ্ধবতী গাভীর জন্য কতটুকু Net Energy, Metabolic Energy, Digestible Energy এবং Total Digestible Nutrient প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। ৫

(খ) একজন পরামর্শক হিসেবে পঁচিশটি গাভীর খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিন। ১০

৩। (ক) খাদ্য কি? পশুখাদ্যের প্রকারভেদসমূহ উল্লেখ করুন। ৫

(খ) বাংলাদেশে পশুখাদ্যের অভাব দূর করার পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

ঘ গ্রুপ

১০। টীকা লিখুন (যে কোন পাঁচটি):- (ক) কৃত্রিম প্রজনন; (খ) সবুজ ঘাস সংরক্ষণ; (গ) পোল্ট্রি খামারে বায়োসিকিউরিটি; (ঘ) ডেইরি খামারে প্যারাসাইটিক রোগ দমন; (ঙ) বাংলাদেশে হাঁসের রোগ; (চ) UMB; (ছ) MOET. ৩×৫

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১৩
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; বিষয় কোড ৮৭০; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং এবং ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

ক গ্রুপ - উন্নয়ন কার্যাবলী ও বিভাগীয় কার্যক্রম - মান ১২.৫ × ২ = ২৫ নম্বর

১। আপনার এলাকায় ছাগল চাষ উন্নয়নের জন্য একটি আদর্শ project profile তৈরি করুন। ১২.৫

২। (ক) PERT method (Programme Evaluation and Review Technique) NET Work Analysis বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। ৬

(খ) Cost and Benefit Ratio বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। একটি সফল প্রকল্পের ক্ষেত্রে CB ratio এর মান কত হবে? ৬.৫

খ গ্রুপ - ভেটেরিনারি চিকিৎসা বিজ্ঞান (যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) - মান ১৫×২ = ৩০

৩। (ক) রাণীক্ষেত রোগ কি? কি কারণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে? ৩

(খ) রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণগুলি কি কি? ৩

(গ) রাণীক্ষেত রোগের টিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি লিখুন। ৯

৪ (ক) Foot and Mouth রোগের কারণ কি? এ রোগের লক্ষণগুলি লিখুন। ৩

(খ) এ রোগের ভাইরাসের type ও sub-type গুলি কি? বাংলাদেশে এ রোগের ভাইরাসগুলির নাম লিখুন। ৩

(গ) এ রোগের টিকা প্রস্তুত প্রণালী, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিধি লিখুন। ৯

৫। (ক) জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস রোগ কি? এ রোগের লক্ষণগুলি কি কি? ৩

(খ) জলাতঙ্ক রোগের টিকা (vaccine) প্রস্তুত প্রণালী, সংরক্ষণ, ব্যবহার বিধি, টিকার মাত্রা সংক্ষেপে লিখুন। ১২

গ গ্রুপ - পশুপালন (যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) - মান ১৫×২ = ৩০

৬। (ক) বাংলাদেশে প্রচলিত মহিষের জাতগুলি কি কি? মহিষ পালনে কোন কোন এলাকা উপযোগী, আপনার মতামত দিন। ৪

(খ) মহিষের জাত উন্নয়নে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি কি? ৪

(গ) মাংস ও দুধ উৎপাদনে মহিষ পালনের ভূমিকা লিখুন ও সম্ভাব্য করণীয় লিখুন। ৭

৭। (ক) বাংলাদেশে প্রচলিত হাঁসের জাতগুলি কি কি? হাঁস পালনে কোন কোন এলাকা উপযোগী বলে মনে করেন? ৫

(খ) ডিম উৎপাদনে কোন জাতের হাঁসের গুরুত্ব অধিক? আপনার মতামত দিন। ৫

(গ) হাঁস পালনে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি লিখুন। ৫

৮। (ক) Livestock Research-এর ক্ষেত্রে BLRI (Bangladesh Livestock Research Institute) এর ভূমিকা কি? ৭

(খ) BLRI কি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারছে? আপনার মতামত দিন। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা থাকলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দিন। ৮

ঘ গ্রুপ - ভেটেরিনারি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পশুপালনের মৌলিক বিষয়সমূহ (যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

৯। টিকা ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলী লিখুন। ৭.৫

১০। ক্ষুদ্র পরিসরে (small scale) গবাদিপশু পালনে বাস্তব সমস্যাগুলি লিখুন। ৭.৫

১১। মাঠ পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ঘাস চাষে সমস্যাগুলি নিরূপণে করণীয় আলোচনা করুন। ৭.৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১১
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ ও ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের **যে কোন চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।**

	নম্বর
১। (ক) জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলি কি কি এবং উক্ত নীতিমালার বিশেষ ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করুন।	১০
(খ) উক্ত নীতিমালায় dairy and poultry development এর ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সমস্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১০
২। একটি প্রকল্প দলিলে কি কি অংশ থাকে? আপনার এলাকায় ছাগল উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের সারসংক্ষেপ (concept paper) তৈরি করুন।	২০
৩। Avian Influenza রোগের লক্ষণসমূহ কি কি? আপনার খামার বা বাড়ীকে Avian Influenza (Bird Flu) মুক্ত রাখার একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা তৈরি করুন।	১৫
৪। (ক) ক্ষুরারোগ (FMD) এর প্রকোপ, বিস্তার, টিকাদান পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।	৭
(খ) ক্ষুরারোগ (FMD) প্রতিরোধকল্পে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রচারণাপত্র (leaflet) তৈরি করুন।	৮
৫। একটি বাণিজ্যিক broiler ও layer খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ পাঁচটি রোগের একটি টিকাদান কর্মসূচি (vaccination schedule) প্রণয়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করুন। উল্লেখিত টিকাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা উল্লেখ করুন।	১৫
৬। (ক) ছাগলের মরণব্যাধি PPR রোগ বলতে কি বুঝায়? এ রোগের প্রকোপ বিস্তার ও প্রতিরোধ **সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।**	৮
(খ) 'ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন কম ঝুঁকিপূর্ণ ও লাভজনক' এই বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত? আপনার মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করুন।	৭
৭। মুরগির খামার ও দুগ্ধ খামারে (poultry and dairy farm) জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) রক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করুন।	১৫
৮। পোল্ট্রি শিল্পের (poultry industry) বর্তমান সমস্যাগুলি কি এবং তা নিরসনে সরকারের কাছে একটি পরামর্শপত্র তৈরি করুন।	১৫
৯। (ক) বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গো-খাদ্য সংকট সমাধানে আপনার পরামর্শ উল্লেখ করুন।	৮
(খ) নেপিয়ার ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি (silage) বর্ণনা করুন।	৭

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০১০
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়–৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান–১০০; পাস নম্বর–৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

	নম্বর
১। জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা কোন্ সালে প্রণীত ও গৃহীত হয় এবং নীতিমালার উদ্দেশ্যাবলি কি কি? জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালায় চিহ্নিত বিশেষ ক্ষেত্রগুলির (critical areas) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।	২০
২। (ক) একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের পদ্ধতি ও বিভিন্ন পদক্ষেপ বর্ণনা করুন।	১০
(খ) Net Present Value (NPV) এবং Economic Internal Rate of Return (EIRR) কিভাবে	১০

নির্ণয় করা হয়? বিবরণ দিন।

৩। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্পের ধারণাপত্র অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় খামারিদের অনুকরণীয় দুইটি করে গাভী পালনের একটি নমুনা প্রকল্প প্রণয়ন করুন। ২০

৪। (ক) কিভাবে আপনার খামারের বাড়ীতে পোষা হাঁস-মুরগী বার্ড ফ্লু (Bird Flu) মুক্ত রাখবেন এবং কিভাবে আপনি ও আপনার পরিবারের সদস্যরা বার্ড ফ্লু (Bird Flu) মুক্ত থাকবে তার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা তৈরি করুন। ১০

(খ) বার্ড ফ্লু (Bird Flu) রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখপূর্বক উহা বিস্তার পদ্ধতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করুন। ১০

৫। বাংলাদেশে বহুল আলোচিত গবাদিপশুর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের প্রকোপ, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন। ২০

৬। (ক) বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল ঘাসের কি কি জাত বিদ্যমান সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ঘাস উৎপাদন ও সম্প্রসারণে সমস্যাবলি কি কি। ১০

(খ) বর্ষাকালে অনেক এলাকায় কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসাবে গবাদিপশুকে কচুরীপানা খাওয়ানো হয়। কচুরীপানা খাওয়ানোতে কি কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং উহা কি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। ১০

৭। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পোল্ট্রি শিল্পে (Poultry Industry) বর্তমানে সমস্যাবলি উল্লেখপূর্বক উহা সমাধানকল্পে সরকারের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ক একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করুন। ২০

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১০
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

১। বাংলাদেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট তৈরির জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করুন। ৫ (পাঁচ) বছর পর কিভাবে প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয় তা আলোচনা করুন। ২০

২। Monitoring (পরিবীক্ষণ) ও evaluation (মূল্যায়ন) এর মধ্যে পার্থক্য কি কি? একটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে monitoring ও evaluation এর গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করুন। ২০

৩। (ক) তড়কা রোগের প্রকোপ, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। তড়কা রোগে মৃত গবাদিপশুর Post mortem করা কি উচিত? আপনার মতামত যুক্তিসহ দিন। ১০

(খ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, আলোচনা করুন। ১০

৪। বাংলাদেশে বিদ্যমান মুরগির জাতগুলি কি কি? ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে কোন কোন মুরগির জাতের উন্নয়ন প্রয়োজন এবং সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দুরীকরণের উপায়গুলি আলোচনা করুন। ২০

৫। (ক) Foot and Mouth Disease এর type ও sub-type গুলি কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার সুপারিশ কি কি? ১০

(খ) ওলানফুলা রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। এ রোগে আক্রান্ত গাভী কি পরবর্তীতে স্বাভাবিক দুধ উৎপাদনে সক্ষম? মন্তব্য করুন। ১০

৬। বাংলাদেশে প্রচলিত হাঁসের জাতগুলি কি কি? হাঁস পালনের অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করে কিভাবে ডিম ও মাংস উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দূরীকরণের উপায়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করুন। তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর প্রক্রিয়াটি বিস্তারিত উল্লেখ করুন। ২০

৭। বাংলাদেশে প্রচলিত ঘাসের জাতগুলি কি কি? ঘাষ চাষে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করুন এবং প্রতিকারের উপায়গুলি লিখুন। কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন। ২০

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০৯
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

১। (ক) বাংলাদেশে 'পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা' কি? আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? ৮

(খ) 'পশুসম্পদ' উন্নয়নে একজন সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা অগ্রগণ্য এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য দিন এবং একজন সম্প্রসারণ কর্মীর কাজ কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে তা উল্লেখ করুন। ৬

(গ) প্রকল্পের যথাযথ নির্বাচন ও প্রণয়নে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন? প্রকল্পের সফলতার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৬

২। (ক) সোয়াইন ফ্লু কি? বাংলাদেশে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? ১০

(খ) পঞ্চাশটি গরু মোটাতাজাকরণের জন্য একটি প্রকল্প সার-সংক্ষেপ তৈরি করুন। ১০

৩। (ক) Zoonotic disease বলতে কোন কোন রোগকে বুঝায়? কোন প্রাণী হতে রোগগুলো ছড়ায় উল্লেখ করুন। এ রোগগুলো নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? ১০

(খ) Foot and Mouth Disease এর type ও sub-type গুলো কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন। ১০

৪। (ক) ছাগল ও ভেড়ার সংক্রামক রোগের নাম উল্লেখ করুন। এসব রোগ নিয়ন্ত্রণে আপনার সুপারিশগুলো পেশ করুন। ১০

(খ) Biosecurity বলতে কি বুঝায়? রোগ নির্ণয়ে Biosecurity এর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। ১০

৫। (ক) 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি মালিকানাধীন দুগ্ধ খামারের চেয়ে সমবায় পদ্ধতির দুগ্ধ খামার বেশি কার্যকর'- এই উক্তিটির পক্ষে/বিপক্ষে আপনার মতামত দিন। ১০

(খ) দুধের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণে কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ? অধিক দুধ উৎপাদনে কোন জাতের গরু/মহিষ পালন করা উচিৎ তা যুক্তিসহ বর্ণনা করুন। ১০

৬। (ক) অপ্রচলিত পশু খাদ্যের বিবরণ দিন। গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। ১০

(খ) খড় প্রক্রিয়াকরণ ও কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ১০

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

১। (ক) বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়নের সমস্যাগুলো কি কি? একটি সমস্যার সমাধানকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। ৮

(খ) প্রকল্প মূল্যায়নের ধাপগুলো বর্ণনা করুন। ৬

(গ) Net Present Value (NPV) নির্ণয়ের পদ্ধতি একটি উদহরণসহ বিধৃত করুন। ৬

২। (ক) গুড়ো দুধে মেলামিন সমস্যা সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পোষণ করছেন? দেশের অভ্যন্তরে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপনার সুপারিশসমূহ কি কি? ১০

(খ) সিডর আক্রান্ত এলাকায় পশুসম্পদের পুনর্বাসনকল্পে একটি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ তৈরি করুন। ১০

৩। (ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের phylogenetic, epidemiological এবং economic study গ্রহণ করার জন্য একটি গবেষণা রূপরেখা প্রণয়ন করুন। ১০

(খ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের type ও sub-type গুলো কি কি? এ রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১০

৪। (ক) গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। ১০

(খ) Anthrax ও Gumboro রোগের প্রতিকারের উপায় কি? Avian Influenza রোগের বিপরীতে টিকা ব্যবহারের পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার মতামত দিন। ১০

৫। (ক) দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে আমাদের করণীয় কি কি? ১০

(খ) আমাদের breeding policy সংক্ষেপে বর্ণনা করে এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ১০

৬। (ক) কাঁচা ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন। ট্রিটিক্যালি ঘাসের চাষ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন। ১০

(খ) সাইলেজ কি? সাইলেজের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করুন। ১০

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ২নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

১। (ক) প্রকল্প বলতে কি বুঝায়? ৪

(খ) প্রকল্প প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যগুলি বিস্তারিত বর্ণনা করুন। ৪

(গ) প্রকল্প গ্রহণের ধাপগুলি বর্ণনা করুন। আপনার বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণে কোন ধাপটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা যুক্তিসহ উল্লেখ করুন। ৪

(ঘ) ১০০টি ভেড়া পালনের জন্য ২ বৎসর মেয়াদী একটি প্রকল্প দলিল প্রস্তুত করুন এবং তার আয়-ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করুন। কোন কারণে প্রকল্পটি লাভবান না হলে তার কারণ ব্যাখ্যা অথবা আপনার মন্তব্য দিন। ৪

(ঙ) প্রকল্প গ্রহণ করে বিভাগীয় কার্যক্রম গতিশীল করা উচিত না রাজস্ব বাজেটে বিভাগীয় কার্যক্রম বেশি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত- এ সম্পর্কে আপনার যুক্তি/মন্তব্য দিন। ৪

২। (ক) সিডর (CIDR) আক্রান্ত এলাকায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যুতে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তার সামাজিক প্রভাব বর্ণনা করুন এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে পশুসম্পদের এই ক্ষতি কমানো সম্ভব হতো তা বিস্তারিত উল্লেখ করুন। ৮

(খ) সিডর (CIDR) আক্রান্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ (একশত) জন কৃষকের জন্য একটি পূনর্বাসন মডেল পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন। (যে-কোন একটি যথা: গাভী পালন/ছাগল পালন/গরু মোটাতাজাকরণ)। ৬

(গ) যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর 'চিকিৎসা প্রদান জরুরী না ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন জরুরী' - যে কোন একটি বিষয়ে আপনার মন্তব্য দিন। ৬

৩। (ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু কি এবং এর sub-type সমূহের বর্ণনা দিন। কোন sub-type মানুষের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ তা উল্লেখ করুন। এ রোগটি কিভাবে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ প্রদান করুন। রোগটি যেন আক্রান্ত পশুপাখি হতে মানুষে বিস্তার লাভ করতে না পারে তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা ও উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ১০

(খ) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু রোগ দমনে সার্ভিলেন্স ও জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের বিভিন্ন উপায়গুলি বর্ণনা করুন এবং কোনটিকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তার সপক্ষে আপনার যুক্তি দিন। ১০

৪। (ক) গবাদিপশুতে ম্যাডকাউ ডিজিজ/ক্ষুরারোগ/তড়কা রোগ কেন অধিক হারে অর্থনৈতিক ক্ষতি ঘটায় বলে আপনি মনে করেন? আপনার সমর্থিত রোগটির কারণ, বিস্তার লাভ প্রক্রিয়া, প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও দমন পদ্ধতি উল্লেখ করুন। ১০

(খ) পিপিআর (PPR) আমাদের দেশে কোন ধরণের প্রাণিতে বেশি দেখা যায়। এ রোগের কারণ ও প্রতিরোধ ১০

ব্যবস্থা উল্লেখ করুন। আমাদের দেশে এ রোগের যে প্রতিষেধক টিকা তৈরি হচ্ছে তার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য দিন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

৫। (ক) 'আমাদের দেশে মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা অন্যতম' - এই বক্তব্য কি আপনি সমর্থন করেন? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম কি যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন? যুক্তিসহ বক্তব্য দিন। ১০

(খ) আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদ কার্যক্রমে নিয়োজিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুগ্ধ খামারিদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা কিভাবে সমাধান করা যায় উল্লেখ করুন। ১০

৬। (ক) 'গরীবের গাভী ছাগল' বলতে কি বুঝায়? ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। দারিদ্র্য বিমোচনে ভেড়া পালন না ছাগল পালন অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন- তা বিশ্লেষণ করুন। ১০

(খ) খাদ্য সংকট নিরসনে কি কি উন্নতজাতের ঘাস চাষ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন। যে কোন একটির চাষ পদ্ধতি ও একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ লিখুন। কাঁচা ঘাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার যুক্তি উল্লেখ করুন। ১০

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০৭
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১। (ক) প্রকল্প বলতে কি বুঝায়? ২০০টি ছাগলের জন্য একটি প্রকল্প সারপত্র তৈরিতে বিবেচ্য অংগসমূহের (components) নাম ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:- (i) Economic Internal Rate of Return (EIRR) নির্ণয়; (ii) Critical Path Method (CPM) কি? (iii) Cost and Benefit Ratio (CBR) নির্ণয়; (iv) প্রকল্প পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation); (v) প্রকল্প সারপত্র। ১০

২। (ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/ বার্ড ফ্লু কি এবং কতটি sub-type রয়েছে? বাংলাদেশের পোল্ট্রিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেয়ার পর থেকে এ রোগ দমনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। দেশ থেকে এ রোগ নির্মূল করা এবং এ রোগের ভাইরাস যাতে মানুষে সংক্রমিত না হয় সে ব্যাপারে কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ২০

(খ) একটি রোগের epidemiology তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (points) উল্লেখ করুন। গরুতে ক্ষুরারোগ (FMD) দেখা দিলে কৃষক কি ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা বর্ণনা করুন এবং এ রোগ দমনের উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। ১০

৩। (ক) বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন নীতিমালা উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন। জাত উন্নয়নের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। ১৫

(খ) 'পশুখাদ্যের অভাব দেশে গবাদিপশু উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়' উক্তিটির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করুন। পশুখাদ্যের উৎপাদন/প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করুন। ১৫

৪। বাংলাদেশের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিতে পাওয়া যায় এমন গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর পাঁচটি রোগের নাম কারণসহ (causal agent) উল্লেখ করুন। রোগ দমনে জৈব নিরাপত্তার (biosecurity) ভূমিকা বর্ণনা করুন। ১৫

৫। গবাদিপশু উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। একটি নতুন প্রযুক্তি কৃষকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কি কি করণীয় হতে হবে বলে আপনি মনে করেন? প্রযুক্তিটি কৃষকের কাছে পৌঁছানোর কৌশলসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) প্রকল্প কি? আর্থিক সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের বর্ণনা প্রদানসহ প্রকল্প অনুমোদনের ধাপসমূহ আলোচনা করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:- প্রকল্প সারপত্র; পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। ১০

২। (ক) বাংলাদেশে প্রাদুর্ভাব আছে গবাদিপশুর এ ধরণের পাঁচটি করে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী (parasite) জনিত রোগের নাম, কারণ (causal agent), লক্ষণ (signs & symptoms) ও রোগ নির্ণয় পদ্ধতিসহ (diagnosis) বর্ণনা করুন। ১৫

(খ) টিকা কি ও কত প্রকার? দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের টিকার নাম উল্লেখপূর্বক সেগুলির সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করুন। টিকা প্রয়োগের পরেও রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। ১৫

৩। (ক) দেশে বৃহদাকার (large scale) পোল্ট্রি খামার স্থাপনের সম্ভাবনাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। বৃহদাকার পোল্ট্রি খামারের সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে পোল্ট্রি উন্নয়ন ক্ষেত্রে কি ধরণের অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ১৫

(খ) জাত উন্নয়ন কি? গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়নে কোন বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে বলে আপনি মনে করেন? ১৫

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) কর্তৃক পরিচালিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রমসমূহ উল্লেখপূর্বক দারিদ্র বিমোচনে কার্যক্রমসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। দারিদ্র বিমোচনে পরিচালিত ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচির সফলতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। এ ধরণের প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ১৫

৫। রোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী রোগদমন ও প্রতিরোধের মৌলিক উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। কোন এলাকায় গবাদিপশুতে অজানা রোগ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীর তাৎক্ষণিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা করুন। দেশে কোন নূতন রোগ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০৬
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়নের (evaluation) সংজ্ঞা লিখুন। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন। ১৩

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:- i) সারথী প্রকল্প (pilot project); ii) ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ণ (EIRR); iii) ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); iv) কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR); v) আধুনিক কসাইখানা। ১২

২। (ক) গবাদিপশুর যে কোন দশটি রোগের নাম কারণ (causal agent) ও লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। ১৫

বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধে সম্প্রসারণ কর্মী, খামারি ও বিজ্ঞানীবৃন্দের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) বার্ড ফ্লু রোগের লক্ষণ কি? বাংলাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কি? কি কি সাবধানতা অবলম্বন করলে এর প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? ৮

(গ) রোগমুক্ত খামার গড়ে তোলার জন্য জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) বিষয়ক গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। 'খামারে কর্মরত ব্যক্তিবর্গই জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা আইন ভঙ্গের মূল হোতা'। এ বক্তব্যের পক্ষে/বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। ৭

৩। (ক) প্রাণিসম্পদ উপখাতের উন্নয়নের পথে কারিগরি বাধাসমূহ (technical problem) উল্লেখ করুন। সমস্যাসমূহ সমাধানে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ১৫

(খ) আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে ক্ষুদ্রপরিসর দুগ্ধ খামারের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৯

(গ) ম্যাড কাউ রোগটি কি? এ রোগের প্রাদুর্ভাব কিভাবে প্রশমিত করা যায়? ৬

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। 'একজন সুযোগ্য সম্প্রসারণ কর্মী গবেষক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত সমস্যার উপর গষেণা কার্যক্রম হাতে নিতে বিশষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন'। উক্তিটির উপর আপনার সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করুন। ১৫

৫। উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও পশুপাখিতে প্রয়োগের পর্যায় পর্যন্ত টিকার গুণাগুণ (quality), নিরাপত্তা (safety) ও কার্যকারিতা (potency) বজায় রাখতে কি ধরণের পদক্ষেপ/সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১। (ক) প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। আর্থিক বিবেচনায় (Financial limitations) অনুযায়ী প্রকল্প কত প্রকার তা বর্ণনা করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:- (i) প্রকল্প মূল্যায়ন (evaluation); (ii) সারথী প্রকল্প (pilot project); (iii) নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) নির্ণয় পদ্ধতি; (iv) PERT মেথড; ১০

২। (ক) মুরগির যে কোন পাঁচটি রোগের নাম, কারণ (epidemiology) ও লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। মুরগির খামারে রোগ দমন ও প্রতিকারে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

(খ) সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (যে কোন চারটি):- (১) আধুনিক কসাইখানা; (২) টিকা ও বিভিন্ন বায়োলজিক্স এর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি; (৩) ট্রান্সবাউন্ডারি এনিমেল ডিজিজ; (৪) পশুরোগ আইন, ২০০৫; (৫) H_5N_1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। ২০

৩। বাংলাদেশে প্রাপ্ত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাতসমূহের নাম লিখুন। দেশীয় পশু-পাখির জাত সংরক্ষণের গুরুত্বসহ সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৩০

৪। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত পশুসম্পদ বিষয়ক অন্যতম দশটি প্রযুক্তির নাম উল্লেখ করুন। প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

৫। আপনার এলাকায় ছাগলে একটি অজানা রোগ দেখা দিয়েছে। উক্ত রোগের কারণ নির্ণয় ও রোগ দমনে সম্প্রসারণ কর্মী/ ভেটেরিনারিয়ান হিসেবে আপনার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন। পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদানের পরেও উক্ত রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাব্য কারণ লিপিবদ্ধ করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০৫
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১। (ক) প্রকল্প কি? একটি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ণ (EIRR); প্রকল্প সারপত্র (PCP); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)। ১০

২। (ক) বাংলাদেশে গোট পক্স-এর ইপিডেমিওলজি (causal agent) বর্ণনা করুন। গোট পক্স দমনে একজন ভেটেরিনারিয়ান/প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

(খ) সংক্ষেপে লিখুন (যে কোন চারটি):- (১) জৈব নিরাপত্তা (biosecurity); (২) ডিজিজ সারভেইল্যান্স (disease surveillance); (৩) বার্ড ফ্লু (bird flue); (৪) কুল চেইন (cool chain); (৫) টিকা (vaccine)। ২০

৩। (ক) 'দেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিক মুরগির জাত উদ্ভাবনের কোন যৌক্তিকতা নেই'- এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন। 'গ্রামীণ পোল্ট্রি' উপযোগী মুরগির একটি জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা রূপরেখা কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ১৫

(খ) দেশে গবাদিপশু উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। পশু খাদ্যের সমস্যা সমাধানে একটি যুগোপযোগী 'পশুখাদ্য নীতিমালা' প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। ১৫

৪। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পরজীবী ঘটিত যে কোন দশটি রোগের নাম, কারণ (causal agent) সহ উল্লেখ করুন। পরজীবী রোগ দমনের মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা করুন। ১৫

৫। ক্ষুদ্র পরিসর (small scale) দুগ্ধ খামারের সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। একটি দুগ্ধ খামার উন্নয়নে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) প্রকল্প কি? প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ (প্রকল্পচক্র) সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- সারথী প্রকল্প (pilot project); পরিবীক্ষণ (monitoring); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)। ১০

২। (ক) অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর দশটি রোগের নাম কারণ (causal agent) ও লক্ষণসহ লিপিবদ্ধ করুন। ২০

(খ) বাংলাদেশে সরকারী তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত গবাদিপশুর যে কোন পাঁচটি টিকার নাম সংরক্ষণ তাপমাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও মাত্রা (dose) সহ উল্লেখ করুন। খামারে পিপিআর রোগের টিকা প্রয়োগের পরও উক্ত রোগে ছাগল আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০

৩। (ক) দেশে ছাগল খামার স্থাপনের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের অর্থনৈতিক গুণাগুণ (traits) সমূহ উল্লেখ করুন। উক্ত trait সমূহ অক্ষুন্ন রেখে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়নে দেশে কি ধরণের প্রজনন নীতিমালা (breeding policy) থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ২০

(খ) দুধ ও মাংস উৎপদন বৃদ্ধির জন্য দেশে বিদ্যমান প্রজনন নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করুন। 'গবাদিপশুর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভূমি কর্ষণ ও গাড়ী টানার কাজে পশুশক্তির ব্যবহার বন্ধ করা উচিত'- বক্তব্যটি সম্পর্কে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন। ১০

৪। একটি দুগ্ধ খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণের মৌলিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। দুগ্ধ খামার লাভজনক ও টেকসই করতে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

৫। শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের পথে বড় ধরণের বাধা। এ বাধা অতিক্রমের জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০৪
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) পরিবীক্ষণ (monitoring) ও মূল্যায়ন (evaluation) বলতে কি বুঝায়? প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ধাপ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- প্রকল্প সারপত্র; ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন (EIRR); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)। ১০

২। (ক) হাঁস-মুরগির যে কোন পাঁচটি ক্ষতিকর রোগের নাম লক্ষণসহ উল্লেখ করুন। মুরগির রাণীক্ষেত রোগের ইপিডেমিওলজি বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং এ রোগ দমনের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন। ২০

(খ) একটি রোগমুক্ত মুরগির খামার গড়ে তোলার জন্য জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) বিষয়ক গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। খামারে টিকা প্রদান কর্মসূচি জৈবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদক্ষেপ- আলোচনা করুন। ১০

৩। (ক) বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশে কি ধরণের ব্রিডিং পলিসি থাকা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। ২০

(খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন। দেশে পশু খাদ্যের অভার দূর করতে কি ধরণের সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? ১০

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার লাভজনক ও টেকসই (sustainable) করতে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

৫। কুল চেইন কি? উৎপাদন হতে শুরু করে পশুপাখিতে প্রয়োগ পর্যন্ত সময়ে টিকার গুণাগুণ বজায় রাখতে কি ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন? পিপিআর টিকা প্রদান কর্মসূচিতে অনেকগুলি ছাগল একত্রিত করে টিকা প্রদানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। (ক) প্রকল্প কি? একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যে সমস্ত বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১৫
(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- প্রকল্প মনিটরিং; নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); PERT মেথড; কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)।	১০
২। (ক) বাংলাদেশে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি ব্যাকটেরিয়া ও পাঁচটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম কারণসহ লিপিবদ্ধ করুন।	১০
(খ) বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের ইপিডেমিওলজি (epidemiology) সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং এ রোগ দমন ও নির্মূলে করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ করুন।	২০
৩। (ক) বাংলাদেশে দুগ্ধ খামার স্থাপনের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং দেশে প্রাপ্ত সম্ভাবনাময় দেশী ও বিদেশী জাতের গাভীর নাম উল্লেখপূর্বক তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।	২০
(খ) বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।	১০
৪। 'ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন' বিষয়ক জাতীয় কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। আপনার মতে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন।	১৫
৫। মাঠ পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত পশুসম্পদ বিষয়ক যে কোন পাঁচটি প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন। একটি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করুন।	১৫

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৩নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। (ক) প্রকল্প সারপত্র কি? প্রকল্প সারপত্র প্রণয়নে বিবিচ্য অংগ (component) সমূহের নাম ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।	১৫
(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন (EIRR); নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV); ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড (CPM); কস্ট বেনিফিট রেশিও (CBR)।	১০
২। (ক) বাংলাদেশে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগসহ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মোট পাঁচটি রোগের নাম	১৫

লিখুন। ছাগলের পিপিআর রোগের কারণ এবং এ রোগের লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করুন। পিপিআর রোগের ইপিডেমিওলজি (epidemiology) সহ এ রোগ দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

(খ) টিকা কি ও কত প্রকার? প্রকারভেদে টিকার সুবিধা (advantage) ও অসুবিধা (disadvantage) সমূহ বর্ণনা করুন। টিকার গুণাগুণ পরীক্ষার পদক্ষেপসমূহ লিপিবদ্ধ করুন। টিকার গুণাগুণ রক্ষা করে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য সতর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

৩। (ক) বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান প্রজনন নীতিমালা (breeding policy) বর্ণনা করুন। কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি সফল করতে হলে আমাদের কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন। ২০

(খ) বাংলাদেশে পশুখাদ্যের অভাব দূরীকরণার্থে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ১০

৪। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৫ টি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির নাম লিখুন। প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছান ও টেকসই (sustainable) করার জন্য কি ধরণের সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

৫। 'পোল্ট্রি শিল্পে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা' বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন। এ অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০২
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ৫নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন দু'টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) প্রকল্প এপ্রাইজাল (project appraisal) ও প্রকল্প মূল্যায়নের (project evaluation) মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকল্প পরিবীক্ষণের (monitoring) মূল নির্দেশকসমূহ লিখুন। ১৫

(খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং একনেক (ECNEC) এর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। ১০

২। (ক) বাংলাদেশে গরু-বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর নাম লিখুন এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগটির কারণ, বিস্তার ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ২০

(খ) লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির টিকাদানের নির্ঘন্ট লিখুন। ১০

৩। (ক) ৫টি সংকর জাতের গাভীর খামার প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- ক্যানিবালিজম (cannibalism); মোয়েট (MOET); বায়োসিকিউরিটি (bio-security); ওআইই (OIE); আফকা (APHCA)। ১৫

৪। (ক) সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ১৫

(খ) বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলগুলোর নাম লিখুন এবং এদের উদ্ভব কিভাবে হল তা বর্ণনা করুন। ১৫

৫। বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা, বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, অগষ্ট ২০০১
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ৫নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন দু'টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) প্রকল্প এপ্রাইজাল (project appraisal) ও প্রকল্প মূল্যায়নের (project evaluation) মধ্যে পার্থক্য কি? প্রকল্প পরিবীক্ষণের (monitoring) মূল নির্দেশকসমূহ লিখুন। ১৫

(খ) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং একনেক (ECNEC) এর কার্যাবলীর বিবরণ দিন। ১০

২। (ক) বাংলাদেশে গরু-বাছুরের মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর নাম লিখুন এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগটির কারণ, বিস্তার ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ২০

(খ) লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির টিকাদানের নির্ঘন্ট লিখুন। ১০

৩। (ক) ৫টি সংকর জাতের গাভীর খামার প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন:- ক্যানিবালিজম (Cannibalism); মোয়েট (MOET); বায়োসিকিউরিটি (bio-security); ওআইই (OIE); আফকা (APHCA)। ১৫

৪। (ক) সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন। ১৫

(খ) বাংলাদেশের দুগ্ধ পকেট অঞ্চলগুলোর নাম লিখুন এবং এদের উদ্ভব কিভাবে হল তা বর্ণনা করুন। ১৫

৫। বেসরকারি পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা, বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রসারণ পদ্ধতি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০০১
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং ও ৫নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন দু'টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) একটি প্রকল্প সারপত্র তৈরির বিভিন্ন ধাপ এবং আকারভেদে প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়গুলোর বর্ণনা দিন। ১৫

(খ) একটি 'সি' ক্যাটেগরি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিবরণ দিন। ১০

২। (ক) বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ১০টি উন্নত জাতের ঘাসের নাম, এদের চাষ পদ্ধতি ও একরপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ লিখুন। ২০

(খ) মাঠ পর্যায়ে গভীর হিমায়িত সিমেন পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রণালী লিখুন। ১০

৩। (ক) বাংলাদেশে গবাদিপশুর অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক রোগ কোনটি? এই রোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, রোগের কারণ, বিস্তার, চিকিৎসা ও দমন সম্পর্কে লিখুন। ২০

(খ) মুরগির ভিটামিনের অভাবজনিত রোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ১০

৪। (ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহের নিজস্ব গন্ডীর আওতায় করণীয় কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা দিন। ১৫

(খ) সংক্ষেপে লিখুন- বায়োসিকিউরিটি (biosecurity); মোয়েট (MOET); ওআইই (OIE); ইপিস্টেসিস (epistasis); আফকা (APHCA)। ১৫

৫। বাংলাদেশে গবাদিপশু উন্নয়নের প্রধান প্রধান অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে এর প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ২০০০
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং এবং ৫নং প্রশ্নসহ অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন দু'টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। (ক) বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।	২০
(খ) একটি 'ক' শ্রেণীর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতার বিবরণ দিন।	৫
২। (ক) পশুপাখি হতে মানুষে সংক্রমিত হয় এরুপ ১০টি রোগের নাম লিখুন। এর মধ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক রোগটির কারণ, বিস্তার, লক্ষণ ও দমন সম্পর্কে লিখুন।	২০
(খ) বাংলাদেশে উৎপাদিত পশুপাখির বিভিন্ন টিকার নাম লিখুন। টিকা ব্যবহারের ও সংরক্ষণের সাধারণ নিয়মাবলী এবং টিকার কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ লিখুন।	১০
৩। (ক) বাংলাদেশে গবাদিপশু উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত গো-প্রজনন নীতি এবং প্রজনন কর্মসূচির বর্ণনা দিন।	২০
(খ) গভীর হিমায়িত সিমেন মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারপ্রণালী লিখুন।	১০
৪। (ক) সংক্ষেপে লিখুন:- ফ্রি মার্টিন (Freemartin); ষ্টিল বার্থ (stillbirth); মোয়েট (MOET); বায়োসিকিউরিটি (biosecurity); ওআইই (OIE)	১০
(খ) সপ্তাহে ৫০০টি ব্রয়লার উৎপাদনের একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ দিন।	২০
৫। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদানসমূহের বিবরণ দিন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করুন।	১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। (ক) প্রকল্পের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস কি কি ভাবে হইয়া থাকে এবং প্রকল্পভেদে প্রকল্প পরিচালকের আর্থিক ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখুন।	১০
(খ) ইআইআরআর (EIRR) বলিতে কি বুঝায়? All-in All-out নিয়মে ৫০০ (পাঁচ শত) মুরগির একটি ব্রয়লার খামারের ইআইআরআর (EIRR) বাহির করুন।	১৫
২। সম্প্রতি অনুপ্রবেশকারী ৫টি (পাঁচ) গবাদি ও হাঁস-মুরগির রোগের নাম উল্লেখপূর্বক গরু-বাছুরের খামারের জৈবনিরাপত্তা (biosecurity) ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করত গবাদি খামারে রোগ ব্যাধি দমনে তার ভূমিকা উল্লেখ করুন।	৩০
৩। স্বল্প জমিতে অধিক ফলন (maximum production on minimum land) এর ক্ষেত্রে সমন্বিত খামারের ভূমিকা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দিন।	৩০
৪। গবাদি খামার স্থাপনে বর্তমান স্থবিরতার কারণ উল্লেখ করত এই অবস্থার উত্তরণে বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মী ও এনজিও (NGO) কি অবদান রাখিতে পারে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।	১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) প্রকল্প বুলতে কি বুঝায়? প্রকল্পের শ্রেণীবিন্যাস কি কি ভাবে হইয়া থাকে সংক্ষেপে লিখুন। ১০

(খ) স্থানীয় এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যগুলি কি? একটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়া লেখ-চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করুন। ১৫

২। কি কি লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে যে গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগি পরজীবি (parasite) দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে? কলিজা কৃমি (liver fluke) এর জীবনচক্র সবিস্তারে বর্ণনা করুন। ৩০

অথবা, পশুপাখি আমদানি সুবিধা ও অন্তরায়সমূহ কি কি? পশুপাখির সাথে কি কি রোগ আমদানী হতে পারে সংক্ষেপে লিখুন। ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ প্রাণির সাথে আদানিকৃত একটি রোগের বিস্তার ও দমন বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। সমন্বিত খামার আত্মকর্মসংস্থানে যথেষ্ট অবদান রাখিতে পারে। এ ধরণের খামারিদের মৌলিক অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। একটি সমন্বিত খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ (আপনার বিবেচনায়) একটি মডেল উপস্থাপন করুন (যে কোন আকারের)। ৩০

৪। বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা, সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ আলোকপাত করুন। প্রাণিসম্পদ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পোষাক শিল্পের ন্যায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব- মন্তব্য করুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ১৯৯৬
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। (ক) গবেষণা প্রকল্প তৈরিতে কি কি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১০

(খ) CMP ও PERT সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন। প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং ও মূল্যায়নের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ১৫

২। জুনোটিক (zoonotic) রোগের সাথে অন্যান্য রোগের মৌলিক পার্থক্য কি? বাংলাদেশে কি জুনোটিক রোগ আছে? যে কোন একটি জুনোটিক রোগের বিস্তার প্রণালী আলোচনা পূর্বক দমন/প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করুন। ৩০

৩। কৃত্রিম প্রজননের সংজ্ঞা লিখুন। কৃত্রিম প্রজননের মুখ্য সুবিধাগুলি বর্ণনা করুন। গ্রাম পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং সারা বৎসর উহাকে কার্যকর রাখার জন্য আপনার ভূমিকা কি হওয়া উচিত বর্ণনা করুন। ৩০

৪। গবাদিপশুর উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব এক জটিল ও অন্যতম অন্তরায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। গো-খাদ্য উৎপাদনে অথবা সংকট নিরসনে আপনার সুপারিশমালা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করুন। ১৫

অথবা, বাংলাদেশে পশু ও পশুজাত পণ্যের বিশেষ করিয়া দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করুন। বেসরকারি উদ্যোগে কিভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব সুপারিশসহ বর্ণনা করুন।

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্যঃ- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। তুলনামূলকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু উন্নয়ন প্রক্রিয়া আশানুরুপ না হওয়ার কারণ কি? উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিতে প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি বিষয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত? প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়মিত পরিদর্শন, মানটরিং এবং মূল্যায়নের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ২৫

২। (ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামার স্থাপনে রোগব্যাধি প্রতিরোধের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ-কারণসহ বর্ণনা করুন। ১৫

(খ) পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু আমদানির মাধ্যমে কিছু নতুন রোগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। উক্ত রোগগুলি কি কি? আলোচিত যে কোন একটি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে উহা প্রতিরোধের কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১৫

৩। (ক) ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয় কেন? বাংলাদেশে ছাগল উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সমস্যাবলী বর্ণনা করুন। ১৫

(খ) দেশী জাতের ৫০টি ছাগলের একটি খামার স্থাপনের পরিকল্পনা আয়-ব্যয় উল্লেখপূর্বক তৈরি করুন। ১৫

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। বাংলাদেশের চহিদার তুলনায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী কিনা মন্তব্য করুন। ১৫

অথবা, পশুসম্পদ উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব প্রধান অন্তরায়- ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য করুন। এই অন্তরায় দূরীকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা কি হওয়া উচিত আপনার সুপারিশসহ একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন।

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্যঃ- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নসহ যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকল প্রশ্নের মান সমান।

নম্বর

১। (ক) পার্বত্য চট্রগ্রামে একটি ছাগলের খামার স্থাপন করতে হলে তার কি কি পূর্বশর্ত প্রয়োজন উল্লেখ করুন এবং ৩০০ ছাগলের একটি খামার স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি করুন। ১৫

(খ) CPM ও PERT পদ্ধতি বলতে কি বুঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। ১০

২। হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক ব্যাধির নাম উল্লেখপূর্বক গত ৫ বছরের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত ৪টি রোগের নাম উল্লেখ করুন এবং সেগুলোর প্রতিরোধে কি কি নীতমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন বর্ণনা দিন। ২৫

৩। (ক) বাংলাদেশে রোগ দমন ও প্রতিরোধের জন্য পশুরোগ নীতিমালা নামে কোন নীতিমালা আছে কিনা? নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কি কি দায়িত্ব থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন। ১০

(খ) এনিম্যাল কোয়ারেনটাইন এ্যাক্ট বলতে কি বুঝায়? আমাদের দেশের প্রক্ষাপটে এই এ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? দেশের কোথায় কোথায় এ ক্যাম্প স্থাপন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন তা যুক্তিসহ উল্লেখ করুন। ১৫

৪। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যক্তিমালিকানাধীন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ২৫

৫। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর উন্নয়ন করে দুধ, মাংস ও কর্ষনশক্তি বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের কোন নীতিমালা আছে কি? যদি থাকে তা উল্লেখপূর্বক এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। ২৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ১৯৯২
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন পাঁচটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর গুলির নাম লিখুন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে জটিলতম সমস্যাটির (আপনার মতে) উপর একটি প্রকল্প কনসেপ্ট পেপার তৈরি করুন।	২৫
২। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। ১০টি সংকর জাতের গাভী ও ২০০ টি উন্নত জাতের মুরগির খামারের প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাহা প্রমাণ করুন।	১৫
৩। বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে রোগব্যাধি প্রতিরোধের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলির নাম লিখুন। ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা দমনের কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন।	১৫
৪। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ছাগল উন্নয়নের সম্ভাবনা কি কি? জাত উন্নয়ন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তার বর্ণনা দিন।	১৫
৫। হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে রোগ ব্যাধিজনিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ অপরিহার্য। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বর্ণনা করত তাহা দূরীকরণের সম্ভাব্যতা প্রণয়ন করুন।	১৫
৬। পশুপাখি পালনে খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। এই সমস্য সমাধানে বিভিন্ন দিকসমূহের বর্ণনা দিন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঘাস উৎপাদন নীতিমালা কি হওয়া উচিত বর্ণনা করুন।	১৫
৭। আমদানি নীতিমালায় পশুপাখির বীজ ও খাদ্য অবাধ হওয়া প্রয়োজন। এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আপনার ব্যক্তিগত মতামত বর্ণনা করুন।	১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন পাঁচটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

	নম্বর
১। গবেষণা পদ্ধতি এবং পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির নাম লিখুন। গবেষণা প্রকল্প তৈরিতে কি কি বিষয় বিবেচনায় আনা আবশ্যক?	২৫
২। গো-সম্পদ ও হাঁস-মুরগি উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ মালিকগণ কি কি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন? এ সমস্ত সমস্যার যৌক্তিক সমাধান কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে?	১৫
৩। ধরুন কোন এক এলাকায় গবাদিপশুর তড়কা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ রোগ দমনে কি কি নীতিমালা ও ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করবেন? সংক্ষেপে নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন।	১৫
৪। গো-সম্পদের জাত উন্নয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কি ধরণের প্রজনন নীতিমালা কার্যকর রয়েছে? সংক্ষেপে পশুপালন বিভাগীয় প্রজনন নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করুন।	১৫
৫। গবাদিপশুর উপর হাল চাষের 'চাপ' কমানোর জন্য কি কি সম্ভাব্য বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে? উক্ত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হলে গো-সম্পদ হতে কিভাবে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা সংক্ষেপে লিখুন।	১৫
৬। হাঁস-মুরগি দ্রুত বংশ বৃদ্ধিজনিত গৃহপালিত পাখি। এর উন্নয়নের সম্ভাবনা অধিকতর থাকা সত্বেও কেন এ শিল্পটি বাংলাদেশে গড়ে উঠছে না? এর উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সুপারিশমালা বর্ণনা করুন।	১৫
৭। বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে প্রাণিসম্পদ মালিকগণ কিভাবে গো-সম্পদকে রক্ষা করেন? এমন এক পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং দীর্ঘমেয়াদী কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? এ সম্পদকে রক্ষা করার বিশেষ দিকগুলো আলোচনা করুন।	১৫

বিসিএস ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, আগষ্ট ১৯৮৮
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা
পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্যঃ- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোন পাঁচটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। তুলনামূলকভাবে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু উন্নয়ন প্রক্রিয়া আশানুরুপ নয়। তার কারণ কি? উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়ন করার জন্য কি কি বিষয় প্রাধান্য পাওয়া উচিত? প্রকল্প তৈরির পর সার্বিক বাস্তবায়নে প্রকল্প কাজের উপর নিয়মিত পরিদর্শন, মনিটরিং এবং মূল্যায়ন কতটুকু ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে লিখুন। ২৫

২। পশুরোগ দমনে এবং নির্মূলে ইপিডেমিওলজিক্যাল ষ্টাডির ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ? গো-বসন্ত রোগের দমন ও নির্মূলের সাধারন নীতি ও পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে লিখুন। ১৫

৩। বিদ্যমান পশুরোগ হাঁস-মুরগি ও গো-সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অন্যতম প্রধান প্রধান হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর ৪টি রোগের নাম লিখুন, যার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া গরীব-ধনী কৃষকের জীবনে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১৫

৪। দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ঘাটতি রয়েছে। দেশের দুধ, মাংস এবং ডিমের অভাব মিটানোর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথা সরকারের হাতে বর্তমানে কি কি পরিকল্পনা এবং প্রকল্প রয়েছে? প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহ কি এই অভাব মিটানোর জন্য যথেষ্ট বলে আপনি মনে করেন? উত্তর না সূচক হলে আপনার মতে কি পরিকল্পনা এবং প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন তা সংক্ষেপে লিখুন। ১৫

৫। ছাগলকে গরীবের সম্পদ বলে কেন? বাংলাদেশের নিজস্ব কোন প্রজাতির ছাগল রয়েছে কি? থাকলে তার নাম কি এবং কয় প্রকারের? বাংলাদেশে ছাগলের ৫টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগ-লক্ষণের নাম লিখুন এবং ভবিষ্যতের ছাগল উন্নয়নের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। ১৫

৬। অধিক পরিমানে দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনের পূর্বশর্ত উন্নত জাতের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তথা সরকার দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়েও আশানুরুপ ফল অর্জন করতে পারেন নি। কি কি প্রধান কারনের জন্য গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগি খামার স্থাপন সফল হচ্ছে না তা সংক্ষেপে লিখুন। ১৫

৭। গবাদিপশুর উন্নয়নে গো-খাদ্যের অভাব এক জটিল এবং কঠিন অন্তরায় হিসাবে কাজ করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে গো-খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পের সফলতা বা ব্যর্থতা সংক্ষেপে লিখুন। ১৫

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮
বিসিএস (লাইভষ্টক) ক্যাডারের কাজকর্ম সম্পর্কিত বিষয়াদি
তৃতীয় পত্র; নির্ধারিত সময়-৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান-১০০; পাস নম্বর-৫০

দ্রষ্টব্য:- ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজীতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য কি? বর্তমানে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সরকারের হাতে কি কি পরিকল্পনা আছে? পরিকল্পনা প্রণয়নে (project preparation) কি কি উপাদান দরকার? পরিকল্পনার রেখাচিত্রের (project profile) একটি ছাঁচ (model) তৈরি করুন। ২৫

২। গবাদিপশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস রোগের নাম লিখুন এবং একটি রোগের নিবারন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা করুন। ১৫

৩। বাংলাদেশে পশুরোগ নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত আইনসমূহের তালিকা দিন। সুনিয়ন্ত্রিত পশুরোগ আইন প্রণয়নে কি কি বিষয় বিবেচনা করা দরকার? ১৫

৪। বাংলাদেশে বর্তমানে গরুর দুধের সংকট আছে- এর সমাধানকল্পে অল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করুন। ১৫

৫। বাংলাদেশের পশু প্রজনন নীতি (breeding policy) নিয়ে আলোচনা করুন। কৃত্রিম প্রজনন (AI) সফলকাম হয়েছে কি? উত্তর যদি 'না' হয়, তবে এর কারণগুলি লিখুন। ১৫

অথবা, বাংলাদেশের গো-খাদ্য (animal feed and fodder) উন্নয়নে কি কি সমস্যা আছে এবং এর সমাধানকল্পে সরকারের কি কি প্রকল্প আছে?

৬। বাংলাদেশে মুরগি খামার (poultry farm) তৈরি করতে কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে? ছোট একটি খামার তৈরির রুপরেখা (outline) দিন? অথবা, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের লাইভষ্টক সম্প্রসারণের (extension service) ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ১৫

পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সসমূহ

বাংলা নিবন্ধ ও বইসমূহ:

ফৌজদার এসকে ২০১০, খাদ্যমান এবং উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গো-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ, মাসিক খামার, অক্টোবর ২০১০ সংখ্যা।

বেলাল হোসেন এম ২০১২, কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

মোস্তফা হাসান এবং আবুল হোসেন এম ১৯৯৯, পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা এম, রুহুল আমিন এম, সোহরাব হোসেন এম এবং শরিফুল হক এম ২০১০, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

হোসেন মো, ১৯৯৪, ব্যবহারিক পোল্ট্রি বিজ্ঞান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আব্দুল হক এম, জিনাত আলী শে এবং আমিনুর রহমান আনম ২০১১, গবাদিপশু পালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আইনুল হক এম, আজিজুল হক ঢালী এম, রুহুল আমীন এম রফিকুল ইসলাম এম এবং আমজাদ হোসেন ভূঞা এম ২০১০, বীফ ব্রিড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

আইনুল হক এম, কামাল একেএম, আমজাদ হোসেন ভূঞা এম এবং লিয়াকত আলী এম ২০১০, মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

আখতার হোসেন এম, আমিনুর রহমান আনম এবং সাব্বির আহমেদ ২০১১, গবাদিপশুর রোগ ও প্রতিরোধ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আমিনুর রহমান আনম এবং মোস্তাফিজুর রহমান এম ২০১১, পোল্ট্রির রোগ ও প্রতিরোধ, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

ইমদাদুল হক কাএম ২০০৩, ট্রেনিং ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

ইমাম এসএম, ১৯৮৭, উচ্চতর পশু বিজ্ঞান, লিরিক এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ।

ইসলাম উদ্দিন মালিক ১৯৯৭, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ফাত্তাহ কাআ ২০০০, লেয়ার মুরগি খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক, জাতীয় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

ফাত্তাহ কাআ ২০০০, ব্রয়লার মুরগি খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক, জাতীয় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

ফাত্তাহ কাআ ২০০০, বকনা খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক, জাতীয় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

ফাত্তাহ কাআ ২০০০, হাঁস খামার স্থাপন হ্যান্ড বুক, জাতীয় প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

বুলবুল এসএম, ওয়াহিদ এমএ, আবিদুর রেজা এবং আব্দুর রহমান এম ২০১১, পোল্ট্রিপালন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বুলবুল এসএম, ওয়াহিদ এমএ, আবিদুর রেজা, আব্দুর রহমান এম এবং মোর্শেদুর রহমান এম ২০১১, কৃত্রিম প্রজনন ও খামার স্থাপন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

এইসি ২০০৮, কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জন্য সংগঠন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষক ম্যানুয়েল, এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন কমপোনেন্ট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

এমএইচ মিয়া ১৯৮৬, দুগ্ধ বিজ্ঞান, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী।

মকবুলার রহমান এম ২০০১, বাণিজ্যিক মুরগি উৎপাদন প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক, পোল্ট্রি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

মজিদ এমএ ১৯৯৫, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান আ ও চৌধুরী এক ২০০০, পশুখাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, অংশীদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

রহমান সেলিম ডিডি, বন্যপ্রাণী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি-২০০৯

রশিদ এম ২০০৩, মৌলিক পুষ্টি পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

লথিফ মো আ, ১৯৯৪, ব্রয়লার উৎপাদন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শাহ্‌জাহান এম ২০০৮, পশুপাখির রোগ প্রতিষেধক টিকা উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার নির্দেশিকা, পশুপাখির টিকা, ঔষধ, প্রজনন সামগ্রী ও পশুখাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সালেউদ্দিন খান এম ২০০৭, কমিউনিটি এক্সটেনশন ওয়ার্কার (সিইডব্লিউ) প্রশিক্ষণ সহায়িকা, দ্বিতীয় অংশিদারিত্বমূলক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, রংপুর

সাইফুল ইসলাম এবিএম ২০১১, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট ফর লাইভস্টক (সিল) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রশিক্ষণ মডিউল, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট: প্রাণিসম্পদ অঙ্গ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সামাদ এম, আমজাদ হোসেন ভূঞা এম এবং বজলুর রহমান এম ২০১৪, বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সামাদ এমএ ১৯৯৩, পোল্ট্রি পালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, লিরিক এপিক প্রকাশনী, ময়মনসিংহ।

সামাদ এমএ ২০০১, পশুপালন ও চিকিৎসাবিদ্যা, লেপ পাবলিকেশন, ময়মনসিংহ।

সামাদ এমএ ২০০২, লাভজনক পশুপাখি পালন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, লেপ প্রকাশনা, ময়মনসিংহ।

সালাম এমএ ২০০২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়িকা, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, নশরৎপুর, গাইবান্ধা।

জব্বার এমএ ১৯৯০, বাংলাদেশে পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতি ও কৌশল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

জাহাঙ্গীর আলম এবং মফিজুল ইসলাম এম ২০০৮, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

বিএলআরআই ২০০৪, ভেড়া পালন ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

বিএলআরআই ২০০৮, পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

ডিএলএস ১৯৯৮, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশঃ ক্রমবিকাশ ও কার্যক্রম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

ডিএলএস ২০০৭, লাগসই প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পশুপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা।

তালুকদার সাইফুল ইসলাম এবং মকবুলার রহমান ২০০০, কৃত্রিম প্রজনন নির্দেশিকা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

সরদার মোঃ জালাল উদ্দিন ২০০৯, লাভজনক পশু পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

English Articles and Books:

Ahmed AR, Islam SS, Khanam N and Ashraf A 2004: Genetic and phenotypic parameters of milk production traits of crossbred cattle in a selected farm of Bangladesh. Journal of Biological Sciences 4, 452-455.

Ahmed F, Al-Amin AQ, Alam GM and Hassan CH 2012: Climate change concern to cattle feed in Bangladesh. Journal of Animal and Veterinary Advances 11, 1946-1953.

Alam MGS, Rahman MA, Khatun M and Ahmed JU 2009: Feed supplementation and weight change, milk yield and post-partum oestrus in Desi cows. Bangladesh Veterinarian 26, 39-47.

Alam MGS, Ul-Azam MS and Khan MJ 2006: Supplementation with urea and molasses and body weight, milk yield and onset of ovarian cyclicity in cows. Journal of Reproduction and Development 52, 529-535.

Alam MM, Sarder MJU, Ferdousi Z and Rahman MM 2008: Productive and reproductive performance of dairy cattle in Char areas of Bangladesh. Bangladesh Veterinarian 25, 68-74.

Al-Amin M and Nahar A 2007: Productive and reproductive performance of non-descript (local) and crossbred dairy cows in Costal area of Bangladesh. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 2, 46-49.

Al-Amin M, Nahar A, Bhuiyan AKFH and Faruque MO 2007: On-farm characterization and present status of North Bengal Grey (NBG) cattle in Bangladesh. AGRI 40, 55-64.

Alim MA, Islam MK, Karim MJ and Mondal MMH 2004: Fascioliasis and Biliary Amphistomiasis in Buffaloes in Bangladesh. Bangladesh Veterinary Journal 38, 1-10.

Al-Mamun M, Akbar MA and Shahjalal M 2002: Rice straw, its quality and quantity as affected by storage systems in Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition 1, 153-155.

Anon B 1994: Modern Packaging Encyclopedia, Megraw Hill Co. New York.

Aten A, Innes RF and Knew E 1995: Flaying and Curing of Hides and Skins as a Rural Industry, 3rd Edition FAO. Rome, Itali.

Azad MAK, Hasanuzzaman M, Miah G and Roy BK 2002: Milk production trend of Milk Vita throughout the year. Pakistan Journal of Nutrition 1, 236-240.

Azizunnesa, Sutradhar BC, Hasanuzzaman M, Azad MAK and Kumar S 2008: Management vs productive and reproductive performances of dairy farm. Pakistan Journal of Nutrition 7, 408-411.

Banerjee GC 1985: A text book of Animal Husbandry. Sixth Edition. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. 66 Janapath, New Delhi-110001.

Banerjee GC 1991: A Textbook of Animal Husbandry. 7th edition, Oxford and IBH, New Delhi.

Barua P 2006: Analytical documentation of the artificial insemination programme of BRAC. Research and Evaluation Division of BRAC, Mohakhali, Dhaka.

Baum WC 1968: The Project Cycle. Finance and Development, Volume 15, No 4.

Begum N, Khan MJ and Islam KMS 2000: Feeding rations containing roadside grass, maize silage or water hyacinth in bull calves. Pakistan Journal of Biological Sciences 3, 1730-1732.

Bendezu P 1969: Liver fluke in humans. Veterinary Record 85, 532-533.

Beresford OD 1976: A case of fascioliasis in man. Veterinary Record 98, 15.

Bhatia BB, Upadhaya DS and Juyal PD 1989: Epidemiology of Fasciola gigantica in buffloes, goats and sheep in Tara region of Uttar Pradesh. Journal of Veterinary Parasitology 3: 25-29

Bhullar MS, Tiwana MS and Saini AL 1986: A dentition study on the eruption of deciduous and permanent incisors teeth in buffaloes. Indian Veterinary Journal 63, 1028-1030.

Cawdery MJH 1976: The effects of fascioliasis on ewe fertility. British Veterinary Journal 132, 568-575.

Chadha and Skylark 1989: Managing Projects in Bangladesh; University Press Limited; Second revised edition, page 78.

Chenost M and Kayonli C 1997: Roughage utilization in warm climates. FAO Annual Production and Health Paper.

Chowdhury R, Haque MN, Islam KMS and Khaleduzzaman ABM 2009: A review on antibiotics in an animal feed. Bangladesh Journal of Animal Sciences 38, 22-32.

Chowdhury S, Hossain MA, Barua SR and Islam S 2006: Occurrence of common blood parasites of cattle in Sirajgonj Sadar area of Bangladesh. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine. 4, 143-145.

Ensminger ME 1969: Animal Science. 6th edn, The Interstate Printersand Pub. Inc., Illinois, USA.

Gani MO, Amin MM, Alam MGS, Kayesh MEH, Karim MR, Samad MA and Islam MR 2008: Bacterial flora associated with repeat breeding and uterine infections in dairy cows. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 6, 79-86.

Ghosh AK and Maharjan KL 2001: Impact of dairy cooperative on rural income generation in Bangladesh. Journal of International Development and Cooperation 8, 91-105.

Ghosh AK and Maharjan KL 2002: Milk marketing channels in Bangladesh: A case study of three villages from three districts. Journal of International Development and Cooperation 8, 87-101.

Ghosh RK 1998: Primary Veterinary Anatomy. 2nd edn., Current Books International, Calcutta.

Gibbons WJ 1966: Clinical Diagnoses of Diseases of Large Animals. Lea and Febiger, Philadelphia.

Halder SR and Barua P 2003: Dairy production, consumption and marketing in Bangladesh. Research and Evaluation Division of BRAC, Mohakhali, Dhaka.

Hamid MA and Hossain KM 2014: Role of private sector in the development of dairy industry in Bangladesh. Livestock Research and Rural Development 26, 10.

Haque MN, Aziz SA, Chanda SS, Hossain MI and Baset MA 2002: A study of the milking and reproductive performances of indigenous cattle at urban area of Bangladesh. Pakistan Journal of Biological Sciences 5, 97-100.

Haque SAMA 2007: Improved market access and smallholder dairy farmer participation for sustainable dairy development. Bangladesh Milk Producers’ Cooperative Union Limited (Milk Vita), Dhaka, Bangladesh.

Health E and Olusanya S 1988: Anatomy and Physiology of Tropical Livestock. 1st Pub., ELBS, UK.

Heuser F 1955: Feeding Poultry, Second Edition, John Wieley & Sons. IWE New Yourk.

Hoque MA, Salim HM, Debnath GK, Rahman MA and Saifuddin AKH 2003: A study to evaluate the artificial insemination success rate in cattle population based on three years record among different sub-centers of Chittagong and Cox's Bazar district of Bangladesh. Pakistan Journal of Biological Sciences 6, 105-111.

Hoque MS and Samad MA 1996: Prevalence of clinical diseases in dairy crossbred cows and calves in the urban areas in Dhaka. Bangladesh Veterinary Journal 30, 118-129.

Hoque MS and Samad MA 1997: Present status of clinical diseases of goats in the urban areas in Dhaka. Bangladesh Veterinary Journal 31, 35-40.

Hossain MJ and Hassan MF 2013: Forecasting of milk, meat and egg production in Bangladesh. Research Journal of Animal, Veterinary and Fishery Sciences 1, 7-13.

Hossain MM, Alam MM, Rashid MM, Asaduzzaman M and Rahman M 2005: Small scale dairy farming practice in a selective area of Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition 4: 215-221.

Hossain ZMA, Hossain SMJ, Rashid MM, Sultana N and Ali MH 2004: Study on the present management condition of private dairy farm at Rangpur Sadar thana in Bangladesh. Journal of Biological Sciences 4, 185-188.

Hossen MF, Siddque MAB, Hamid MA, Rahman MM and Moni MIZ 2012: Study on the problems and prospects of Sonali poultry farming in different village levels of Joypurhat district in Bangladesh. Bangladesh Research Publications Journal 6, 330-337.

Howlader MMR, Chowdhury SMZH, Taimur HJFA and Jahna S 1990: Fluke infestations of cattle in some selected villages of Bangladesh. Bangladesh Veterinarian 7, 45-47.

Huq AKM, Hossain MI and Uddin M 1997: Pathological investigation of liver of the slaughtered buffaloes in Dhaka City Corporation. Bangladesh Veterinary Journal 31, 61-69.

Huque KS and Sarker NR 2014: Feeds and feeding of livestock in Bangladesh: performance, constraints and options forward. Bangladesh Journal of Animal Science 43, 1-10.

Huque QME and Stem C 1993: Livestock Feeds of Bangladesh: Availability and Nutrient Composition. Bangladesh Agricultural Research Council, Farmgate, Dhaka.

IAEA 2006: Improving animal productivity by supplementary feeding of multinutrient blocks, controlling internal parasites and enhancing utilization of alternate feed resources. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Vienna, Austria.

IAEA 2007: Improving the reproductive management of dairy cattle subjected to artificial insemination. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Vienna, Austria.

ILRI 1999: Increasing livestock productivity in mixed crop-livestock systems in South Asia. Proceedings of Planning Workshop of Regional Stakeholders, Patancheru, India.

Islam MA 2014: Zoonoses in Bangladesh: the role of veterinarian in public health. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 12, 93-98.

Islam MH, Hashem MA, Hossain MM, Islam MS, Rana MS and Habibullah M 2012: Present status on the use of anabolic steroids and feed additives in small scale cattle fattening in Bangladesh. Progressive Agriculture 23, 1-13.

Islam MK, Uddin MF and Alam MM 2014: Challenges and prospects of poultry industry in Bangladesh. European Journal of Business Management 6, 116-127.

Islam MM, Siddiqui MAR, Haque MA, Baki MA, Majumder S, Parrish JJ and Shamsuddin M 2007: Screening some major communicable diseases of AI bulls in Bangladesh. Livestock Research for Rural Development 19, 6.

Janeway CA and Travers P 1997: Immunology. 3rd edn. Chuechill Livingstone, Edinburgh, UK.

Kamal MM, Opsomer G, Parveen N, Momont HW and Shamsuddin M 2013: Comparative efficacy of the synchrony programmes in subestrus crossbred cows at smallholder farms in Bangladesh. Journal of Applied Animal Research 41, 448-454.

Kamal MM, Rahman MS and Shohag AS 2011: Postpartum Anoestrus in Water Buffaloes: Bangladesh Perspective. LAP Lambert Academic Publishing, Berlin, Germany.

Kendall EA 1988: The role of Veterinarian in the future. Australian Veterinary Journal 65: 54-61.

Khalid SMA, Amin MR, Mostofa M, Hossain MJ and Azad MAK 2004: Effect of Vermic against gastro-intestinal nematodes in sheep. Journal of Biological Sciences 4, 720-724.

Khan MJ, Peters KJ and Uddin MM 2009: Feeding strategy for improving dairy cattle productivity in smallholder farm in Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 38, 67-85.

Khan MS, Bashar MK, Akbar MA and Huque KS 2014: Feeding practices and compositional verification of the constituents of growth promoters for cattle fattening in Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 43, 142-146.

Lederman E, Khan SU, Luby S, Zhao H, Braden Z, Gao J, Karem K, Damon I, Reynolds M and Li Y 2014: Zoonotic parapoxviruses detected in symptomatic cattle in Bangladesh. BMC Research Notes 7, 816.

Mannual for Animal Health Auxiliary Personnel 1983: Food and Agriculture Organization of United Nations.

Martin SW, Meek AH and Willeberg P 1994: Veterinary Epidemiology, Iowa State University Press, Ames, USA.

Mazed MA, Islam MS, Rahman MM, Islam MA and Kadir MA 2004: Effect of Urea Molasses Multinutrient Block on the reproductive performance of indigenous cows under the village condition of Bangladesh. Pakistan Journal of Biological Sciences 7, 1257-1261.

Miah AG, Ali ML, Salma U, Khan MAS and Islam MN 2000: Effect of pre and postpartum supplementation of cows with Urea Molasses Multinutrient Blocks on the performance of their calves. Pakistan Journal of Biological Sciences 3, 1092-1093.

Miah AG, Salma U and Hossain MM 2004: Factors influencing conception rate of local and crossbred cows in Bangladesh. International Journal of Agriculture and Biology 6, 797-801.

Mondal MMH, Islam MK, Hur J, Lee JH and Baek BK 2000: Examination of gastrointestinal helminth in livestock grazing in grassland of Bangladesh. Korean Journal of Parasitoloty 38,187-190.

Morrow DA 1986: Current Therapy in Theriogenology. 2nd edn, WB Saunders and Co., USA.

Nahar A, Al-Amin M, Wadud A, Monir MM and Khan MAS 2007: Effect of partial green grass over dry feeding on the productive performance of early lactating crossbred cows in Bangladesh. International Journal of Dairy Science 2, 73-78.

Nedelea A, Grosu V and Shamsuddoha M 2009: Dairy farming - an alternative income generating activity. Bulletin UASVM Horticulture 66, 352-355.

Nielsen JJ and Preston TR 1981: The integrated family farm system for agriculture, livestock and energy production. 'Action programme for a pilot study to establish an integrated family farm unit at Bangladesh Agricultural Research Institute.' Bangladesh Agricultural Research Council Dhaka, page 58.

Owens JM 1977: Liver fluke infection in horses and bovines. Equine Veterinary Journal 9, 29-31.

Panda PC 1990: Post harvest technology. Poultry Processing Pashudhan 5 (1); 16-18.

Panda PC 1995: Text book on egg and poultry Technology, First Edition. Vikash Publishing House. Pvt. Ltd, 576, Masjid Road, Jangpura, New Dhlhi.

Pariza KF, Bari ASM, Bari FY, Alam MGS and Noor M 2009: Clinico-pathological profiles of sub-fertility in Zebu Cows. Bangladesh Veterinarian 26, 1-7.

Pervage S, Hassan MR, Ershaduzzaman M and Khandoker MAMY 2009: Preservation of liquid semen and artificial insemination in native sheep. Journal of Bangladesh Agricultural University 7, 305-308.

PRAN 2007: The development of dairy industry in Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.

Qadir ANMA 1976: Epidemiology and control of fascioliasis in sheep and goats. Bangladesh Journal of Animal Science 10, 5-8.

Qadir ANMA 1980: A preliminary study on the prevalence and distribution of fresh water gastropod snails in the Bangladesh Agricultural University Campus. Bangladesh Veterinary Journal 14, 5-8.

Quayum MA and Ali AM 2012: Adoption and diffusion of power tillers in Bangladesh. Bangladesh Journal of Agricultural Research 37, 307-325.

Rabbani MS, Alam MM, Ali MY, Rahman SMR and Saha BK 2004: Participation of rural people in dairy enterprise in a selected area of Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition 3, 29-34.

Rabby TG, Fredericks LJ and Alam GM 2013: Livestock husbandry strategy in alleviating poverty in the haor area of Bangladesh. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 8, 41-52.

Radostits OM, Blood DC and Gay CC1994: Veterinary Medicine. 8th edn, Bailliere and Tindall, London.

Rahman MA, Alam AMMN and Shahjalal M 2009: Supplementation of Urea-Molasses-Straw based diet with different levels of concentrate for fattening of emaciated bulls. Pakistan Journal of Biological Sciences 12, 1-6.

Rahman MM and Haque MN 2001: Productive and reproductive performances of native cows under farm conditions. OnLine Journal of Biological Sciences 1, 1085-1087.

Rahman MM, Mahmud MAA, Baset MA, Mahfuz SU, Mehraj H and Uddin AFMJ 2014: Milk nutritional composition in relation to cow genotype and location of Bangladesh. International Journal of Business, Social and Scientific Research 1, 155-160.

Rahman MS, Miah MAM, Moniruzzaman and Hossain S 2011: Impact of farm mechanization on labour use for wheat cultivation in Northern Bangladesh. Journal of Animal and Plant Sciences 21, 589-594.

Rahman MS, Shohag AS, Kamal MM, Parveen M and Shamsuddin M 2012: Application of ultrasonography to investigate postpartum anestrus in Water Buffaloes. Reproductive Developmental Biology 36,103-108.

Ranjhn SK 1993: Animal Nutrition and Feeding Practices, Fourth Revised Edition. Vikash Publishing House Pvt. Ltd. 576, Masjid Road, Jangpura, New Delhi-110014.

Rashid MM, Roy BC, Asaduzzaman M and Alam MM 2007: Study of the dairy cattle management systems at farmer's level in Jessore district of Bangladesh. Pakistan Journal of Nutrition 6, 155-158.

Rckles NH, Combs WB and May H 1997: Milk and Milk Products. Fourth Edition. Tita Mcgraw-hill publishing company Ltd. Bombay.

Roess AA, Winch PJ, Ali NA, Akhter A, Afroz D, Arifeen SE and Darmstadt GL 2013: Animal husbandry practices in rural Bangladesh: potential risk factors for antimicrobial drug resistance and emerging diseases. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 89, 965-970.

Rosenberger G 1979: Clinical Examination Cattle. Verlag Paul Parey, Germany.

Ross JG 1968: The life span of Fasciola hepatica in cattle. Veterinary Record 82, 587-589.

Saadullah M 2012: Buffalo production and constraints in Bangladesh. Journal of Animal and Plant Sciences 22, 221-224.

Salisbury D and Sainbury P 1979: Livestock Health and Housing. 2nd edn, ELBS, London.

Samad MA 2011: Public health threat caused by zoonotic diseases in Bangladesh. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 9, 95-120.

Sarder MJU 2006: A comparative study on reproductive performance of crossbred dairy cows at greater Rajshahi district. Journal of Animal and Veterinary Advances 5, 679-685.

Sarder MJU 2007: Environment related variations in the semen characteristics of bulls used for artificial insemination programme in Bangladesh. University Journal Zoology of Rajshahi University 26, 81-88.

Sarder SA, Ehsan MA, Anower AKMM, Rahman MM and Islam MA 2006: Incidence of liver flukes and gastro-intestinal parasites in cattle. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 4, 39-42.

Sastry NSR and Thomas CK 1976: Farm Animal Management. 1st Pub., Vikas Pub. House Pvt Ltd., New Delhi.

Schiere JB and Ibrahim MNM 1989: Feeding of Urea-ammonia Treated Rice Straw. 1st Pub., Pudoc Wageningen, Netherlands.

SCN 2000: The 4th Report on The World Nutrition Situation. United Nations Administrative Committee on Coordination. International Food Policy Research Institute. Washington, DC 20006-1002, USA.

Sen BK 2014: Veterinary industry in Bangladesh: present status and future potential. Dhaka University Journal of Marketing 15, 327-342.

Shamsuddin M 1995: Fertility trend and status of oestrus detection in the bovine under farm conditions in Bangladesh. Bangladesh Veterinary Journal 29, 9-16.

Shamsuddin M, Alam MM, Hossein MS, Goodger WJ, Bari FY, Ahmed TU, Hossain MM and Khan AHMSI 2007: Participatory rural appraisal to identify needs and prospects of small-scale market-oriented dairy industries in Bangladesh. Tropical Animal Health and Production 39, 567-581.

Shamsuddin M, Bhuiyan MMU, Chanda PK, Alam MGS and Galloway D 2006a: Radioimmunoassay of milk progesterone as a tool for fertility control in smallholder dairy farms. Tropical Animal Health and Production 38, 85-92.

Shamsuddin M, Bhuiyan MMU, Sikder TK, Sugulle AH, Chanda PK, Alam MGS and Galloway D 2001: Constraints limiting the efficiency of artificial insemination of cattle in Bangladesh. In Radioimmunoassay and Related Techniques to Improve Artificial Insemination Programmes for Cattle Reared under Tropical and Sub-tropical Conditions, IAEA-TECDOC-1220, IAEA, Vienna, pp 9-27.

Shamsuddin M, Goodger WJ, Hossein MS, Azizunnesa, Bennett T and Nordlund K 2006b: A survey to identify economic opportunities for smallholder dairy farms in Bangladesh. Tropical Animal Health and Production 38, 131-140.

Shamsuddin M, Hoque MM, Kamal MM, Rahman MM, Goodger WJ, Momont H, Frank G and Akhteruzzaman M 2010:. Productivity veterinary services and milk marketing through communities increase milk production and farmers income. In the proceedings of ‘International Symposium on Sustainable Animal Production in theTropics: Farming in a Changing World’, 14-18 November 2010, Guadeloupe, France. Advances in Animal Biosciences 1, 516-517.

Shamsuddin M, Hossein MS, Siddiqui MAR and Khan AHMSI 2005: Use of dye deposition in cows’ excised genital tract to evaluate inseminators’ and refreshment training to improve their skill. Korean Journal of Embryo Transfer 20, 157-162.

Siddiqui MAR, Das ZC, Bhattacharjee J, Rahman MM, Islam MM, Haque MA, Parrish JJ and Shamsuddin M 2013: Factors affecting the first service conception rate of cows in smallholder dairy farms in Bangladesh. Reproduction in Domestic Animals 48, 500-505.

Simaraks S 1994: The roles and responsibilities of researcher, extension worker and farmer in livestock production in Laos PDR. In: Proceedings of a training/workshop held on 10-13 May 1994 at Nam Suang Livestock Adaptive Research and Extension Division, Vientiane,

Laos, 55–61. A report of FAO project TCP/RAS/2361 - Regional Tropical Pasture/Forage Devlt.

Singh KS and Panda B 1992: Poultry Nutrition. Kalyani Publishers 171. Rajinder Nagar.

Soulsby EJL 1982: Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th edn. ELBS Bailliere Tindall, London.

Sugulle AH, Bhuiyan MMU and Shamsuddin M 2006: Breeding soundness of bulls and the quality of their frozen semen used in cattle artificial insemination in Bangladesh. Livestock Research and Rural Development 18, 4.

Sukumar D 1997: Outlines of Dairy Technology. 1st Edition. Oxford University Press. Calcutta, Chennai, Mumbai.

Tahir MI, Khalique A, Pasha TN and Bhatti JA 2002: Comparative evaluation of maize bran, wheat bran and rice bran on milk production of Holstein Friesian cattle. International Journal of Agriculture and Biology 4, 559-560.

Talukder MAS, Khandoker MAMY, Rahman MGM, Islam MR and Khan MAA 2005: Reproductive problems of cows at Bangladesh Agricultural University dairy farm and possible remedies. Pakistan Journal of Biological Sciences 8, 1561-1567.

Thomas DGM 1983: Animal Husbandry. 3rd edn, Bailliere Tindall, London.

Thrushfied M 2000: Veterinary Epidemiology, Blackwell Sci. Ltd., UK.

Trizard IR 1996: Veterinary Immunology. 5th edn., WB Saunders Co., Philadelphia.

Uddin MM, Huylenbroeck GV, Hagedorn K, Sultana MN and Peters KJ 2010: Institutional and organizational issues in livestock services delivery in Bangladesh. Quarterly Journal of International Agriculture 49, 111-125.

Uddin MM, Sultana MN, Huylenbroek GV and Peters KJ 2014: Artificial insemination services under different institutional framework in Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 43, 166-174.

Uddin MM, Sultana MN, Ndambi OA, Hemme T and Peters KJ 2010: A farm economic analysis in different dairy production systems in Bangladesh. Livestock Research and Rural Development 22, 7.

Udo HMJ, Hermans C and Dawood F 1992: Seasonality of cattle feed resources in Pabna, Bangladesh. Tropical Animal Health and Production 24, 50-56.

Urquhart GH, Armour J, Duncan JL, Dunn AM and Jennings FW 1996: Veterinary Parasitology. 2nd edn., Blackwell Science Ltd., UK.

Verma SP and Agarwal VK 1998: Genetics 1st edn. 1975 (reprint 1998). S. Chand & Co. Ltd., New Delhi.

White S 1999: Women’s employment in the agro and food processing sector: South Asia and East Africa. Report of Aga Khan Foundation, Canada.

ড. মোঃ মোস্তফা কামাল, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

লেখকের অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

Books and Theses

1. **Kamal MM**. 2015. Pranisampad O Unnayan (Livestock and Development). First Edition. Bangla Prokashon, Saghata, Gaibandha.
2. **Kamal MM**. 2014. Clinical Management of Postpartum Anoestrous Cows using Ultrasonography. PhD Dissertation, Department of Surgery and Obstetrics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh.
3. **Kamal MM**, Rahman MS and Shohag AB. 2011. Postpartum Anestrus in Water Buffaloes: Bangladesh Perspective. LAP LAMBERT Academic Publishing, USA.
4. **Kamal MM**. 1999. Investigation on Microflora of the Uterine Discharge in Repeat Breeding Cows. MS Thesis, Department of Microbiology and Hygiene, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh.

Articles - A1 (articles published in international journals)

1. **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Vandaele L, Opsomer G. 2016. Environmental and maternal factors associated with gross placental morphology in dairy cattle. Reproduction in Domestic Animals (accepted).
2. Opsomer G, Van Eetvelde M, **Kamal MM** and Van Soom A. 2017. Epidemiological evidence for metabolic programming in dairy cattle. Reproduction, Fertility and Development 29: 52–57 DOI: http://dx.doi.org/10.1071/RD16410
3. Van Eetvelde M, **Kamal MM**, Hostens M, Vandaele L, Fiems LO and Opsomer G. 2016. Evidence for placental compensation in cattle. Animal 10 (8): 1342-1350 DOI: 10.1017/S1751731116000318
4. **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Bogaert H, Hostens M, Vandaele L, M Shamsuddin and Opsomer G. 2015. Environmental factors and dam characteristics associated with insulin sensitivity and insulin secretion in newborn Holstein calves. Animal 9 (9): 1490-1499 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1751731115000701
5. **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Depreester E, Hostens M, Vandaele L and Opsomer G. 2014. Age at calving in heifers and level of milk production during gestation in cows are associated with the birth size of Holstein calves. Journal of Dairy Science 97 (9): 5448-5458 DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2014-7898
6. Depreester E, **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Hostens M, Opsomer G. 2014. Maternal and environmental factors associated with the birth weight of Holstein calves. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 83 (1): 3-13 URL: http://vdt.ugent.be/sites/default/files/artikel01.pdf
7. **Kamal MM**, Bhuiyan MMU, Parveen N, Momont HW and Shamsuddin M. 2014. Risk Factors for postpartum anestrus in crossbred cows in Bangladesh. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 38 (2): 151-156 DOI: http://dx.doi.org/10.3906/vet-1303-74
8. Rahman MB, **Kamal MM**, Rijsselaere T, Vandaele L, Shamsuddin M and Van Soom A. 2014. Altered chromatin condensation of heat-stressed spermatozoa

perturbs the dynamics of DNA methylation reprogramming in the paternal genome after in vitro fertilisation in cattle. Reproduction, Fertility and Development 26 (8): 1107-1116 DOI: http://dx.doi.org/10.1071/RD13218

9. **Kamal MM**, Opsomer G, Parveen N, Momont HW and Shamsuddin M. 2013. Comparative efficacy of the synchrony programmes in subestrus crossbred cows at smallholder farms in Bangladesh. Journal of Applied Animal Research 41 (4): 448-454 DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09712119.2013.792736
10. Rahman MS, Shohag AB, **Kamal MM**, Bari FY and Shamsuddin M (2012). Preovulatory follicular and subsequent luteal size influence pregnancy success in Water buffaloes. Journal of Reproduction and Development 58 (2): 219-222. DOI: http://dx.doi.org/10.1262/jrd.11-111T

Articles - A2 (articles published in widely circulated scholarly or scientific journals)

1. Van Soom A, Vandaele L, Goossens K, Heras S, Wydooghe E, Rahman MB, **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Opsomer G, Peelman L. 2013. Epigenetics and the periconception environment in ruminants. Proceedings of the Belgian Royal Academies of Medicine 2: 1-13.
2. **Kamal MM**, Rahman MM, Momont HW and Shamsuddin M. 2012. Underlying disorders of postpartum anoestrus and effectiveness of their treatments in crossbred dairy cows. Asian Journal of Animal Sciences 6(3): 132-139. DOI: http://dx.doi.org/10.3923/ajas.2012.132.139
3. Rahman MS, Shogag AS, **Kamal MM**, Parveen N and Shamsuddin M. 2012. Application of ultrasonography to investigate postpartum anestrus in Water Buffaloes. Reproductive Developmental Biology 36 (2): 103-108.
4. **Kamal MM.** 2010. A review on cattle reproduction in Bangladesh. International Journal of Dairy Science 5 (4): 245-252. DOI: http://dx.doi.org/10.3923/ijds.2010.245.252

Articles- A3 (articles published in national journals with peer review)

1. Pradhan MGA, Rahman MS, Kwon WS, Mishra D, **Kamal MM**, Bhuiyan MMU and Shamsuddin M. 2013. Duration of preservation affect the quality of chilled Black Bengal buck semen. Journal of Embryo Transfer 28 (2): 113-119. DOI: http://dx.doi.org/10.12750/JET.2013.28.2.113
2. Hoque MN, Talukder AK, **Kamal MM**, Jha AK, Bari FY and Shamsuddin M. 2011. Ovulation synchronization in Water Buffaloes guided by milk progesterone ELISA. Journal of Embryo Transfer 26 (2): 105-109.
3. Akter T, **Kamal MM**, Talukder AK, Akter Z, Bari FY and Shamsuddin M. 2011. Postpartum ovarian cyclicity of zebu cows in Bangladesh. VetScan 6 (1): Article 85. URL: http://www.vetscan.co.in/v6n1/85-Postpartum-Ovarian-Cyclicity-Zebu-Cows-Bangladesh.htm
4. Jha AK, Hoque MN, **Kamal MM**, Rahman MM, Bhuiyan MMU and Shamsuddin M. 2010. Prevalence of mastitis and efficacy of different treatment regimens on

clinical mastitis in cows. SAARC Journal of Agriculture 8(1): 79-89.URL: http://www.saarcagri.org/images/abook_file/sja_v_8_i_1.pdf

5. Akter Z, Talukder AK, Akter T, Kabir MS, **Kamal MM**, BariFY and Shamsuddin M. 2010. Ultrasonographic examination of ovarian cyclicity in zebu cows of Bangladesh. Vet Scan 5 (2). Article 65. URL:http://www.vetscan.co.in/v5n2/65-usg-study-ovary-cow.htm
6. **Kamal MM**, Iqbal DMH and Khaleduzzaman ABM. 2009. Supplementation of maize-based concentrates and milk production in indigenous cows. Bangladesh Veterinarian 26 (2): 48-53. URL: http://journals.sfu.ca/bd/index.php/BVET/article/view/4950/3960
7. Rahman MA, Bhuiyan MMU, **Kamal MM** and Shamsuddin M. 2009. Prevalence and risk factors of mastitis in dairy cows. The Bangladesh Veterinarian 26 (2): 54-60. URL: http://journals.sfu.ca/bd/index.php/BVET/article/view/4951/3961
8. Uddin MA, **Kamal MM** and Haque ME. 2009. Epidemiological study of udder and teat diseases in dairy cows. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine 7 (2): 332-340. URL: http://www.banglajol.info/index.php/BJVM/article/view/6000/4701
9. Trisha AA, Mostofa M, Bhuyan AAM, Islam MS and **Kamal MM.** 2009. Efficacy of Raanivet in the immune response against Newcastle disease. International Journal of BioResearch 6 (1): 83-86. URL: http://www.inri-net.org/arcive.html
10. Alam MGS, **KamalMM** and Amin MM. 2007. Bacteria and fungi in uterine infections in cows. The Bangladesh Veterinarian 24 (1): 1-12
11. Parveen N, **Kamal MM**, Saha S and Choudhury KA. 2002. Characterization and antibiogram of *Staphylococcus aureus* isolated from market meat and food handlers. Indian Journal of Animal Sciences 72 (2): 195-196
12. Parveen N, **Kamal MM**, Saha S and Choudhury KA. 2001. Characterization and antibiogram of *Staphylococcus aureus* Isolated from mastitic milk. Bangladesh Veterinary Journal 35 (1-2): 29-33
13. **Kamal MM**, Parveen N, Saha S and Amin MM. 2001. Bacteriological study on uterine discharge in repeat breeder cows. Bangladesh Veterinary Journal 35 (1-2): 49-52
14. Parveen N, **Kamal MM**, Choudhury KA and Saha S. 2000. Studies on pathogenicity of *Staphylococcusaureus* isolated from dermatitis lesions of cattle. Bangladesh Veterinary Journal 34 (1-2): 17-21
15. **Kamal MM**, Parveen N, Amin MM and Alam MGS. 1999. Mycoflora in the uterine exudate of repeat breeder cows. Bangladesh Veterinary Journal 33 (3-4): 83-86

Abstracts published in international conferences (oral or poster presentation):

1. **Kamal MM**, Rahman MB, De Koster J, Van Eetvelde M, Van Soom A and Opsomer G. Chromatin of germinal vesicle is hypomethylated in fat cows compared to cows of moderate body condition. Proceeding of the 1st General Meeting of Epiconcept, Antalya, Turkey 24th-25th April 2013, page 119
2. Rahman MB, **Kamal MM**, Rijsselaere T, Vandaele L, Shamsuddin M and Van Soom A. 2013. Altered chromatin conformation in bovine spermatozoa perturbs

dynamic DNA methylation in the male pronucleus after fertilization in vitro. Proceedings of the 39th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS), Hannover, Germany, 19-22 January 2013. Reproduction, Fertility and Development 25 (1): 150. URL: http://www.publish.csiro.au/paper/RDv25n1Ab6.htm

3. **Kamal MM**, Opsomer G, Parveen N, Momont HW and Shamsuddin M. 2012.Body condition, suckling and calving season influence the prevalence of true anoestrus in postpartum crossbred cows in Bangladesh. Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, 26-30 November 2012, Thammasat University, Rangsit Campus, Bangkok, Thailand. pp 270.
4. **Kamal MM**, Opsomer G, Parveen N, Momont HW and Shamsuddin M. 2012. Farmers' skill and linkage to milk market influence the prevalence of anoestrus in postpartum crossbred cows in Bangladesh. Proceedings of the 15th AAAP Animal Science Congress, 26-30 November 2012, Thammasat University, Rangsit Campus, Bangkok, Thailand. pp914.
5. **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Opsomer G. 2012. Time of conception during lactation in Holstein cows influences the basal metabolic parameters and pancreatic β-cell function of the newborn calves. Proceeding of the 28th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 7-8 September 2012, Saint Malo, France. pp 166.
6. Van Eetvelde M, **Kamal MM**, FiemsLO, OpsomerG. 2012. Pancreatic β-cell function of a newborn Belgian Blue calf is influenced by its birth weight and parity of the dam. Proceeding of the 28th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 7-8 September 2012, Saint Malo, France. pp 222.
7. **Kamal MM**, Van Eetvelde M, Vandaele L, Opsomer G. 2012. Pancreatic β-cell function is positively correlated with the size of newborn Holstein calves. Proceeding of the 16th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Reproduction in Domestic Animals 47 (5): 91.
8. Van Eetvelde M, **Kamal MM**, Fiems LO, Opsomer G. 2012. Pancreatic β-cell function differs between Belgian Blue and Holstein calves. Proceeding of the 16th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Reproduction in Domestic Animals 47 (5): 112.
9. Opsomer G, **Kamal MM**, Van EetveldeM, VandaeleL, Hostens M. 2012. Placental development in Holstein cattle is correlated with dam characteristics and β-cell function of the newborn calf. Proceeding of the 16th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Reproduction in Domestic Animals 47 (5): 69.
10. Shamsuddin M, Hoque MM, **Kamal MM**, Rahman MM, Goodger WJ, Momont H, Frank G and Akhteruzzaman M. 2010. Productivity veterinary services and milk marketing through communities increase milk production and farmers income. In the proceedings of 'International Symposium on Sustainable Animal Production in the Tropics: Farming in a Changing World', 14-18 November 2010, Guadeloupe, France. Advances in Animal Biosciences 1 (2): 516-517 URL: http://journals.cambridge.org/abstract_S2040470010001317

11. **Kamal MM**, Rahman MM, Momont HW and Shamsuddin M. 2010. Double insemination with intrauterine antibiotic improves conception in repeat breeding dairy cattle. International Dairy Conference 2010, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 03-05 April 2010. pp 56
12. Rahman MM, **Kamal MM**, Jha AK, Hoque MN, Shamsuddin M and Bhuiyan MMU. 2010. Management and effective treatment of postpartum anoestrus cows guided by ultrasonography. International Dairy Conference 2010, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 03-05 April 2010. pp 55-56
13. Hoque MN, **Kamal MM**, Rahman MM and Shamsuddin M. 2010. Evaluation of ovulation synchronization protocols for timed insemination in water buffaloes (Bubalis bubalis). International Dairy Conference 2010, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh, 03-05 April 2010. pp 55
14. **Kamal MM**, Amin MM and Alam MGS. 1999. Microflora of the Uterine Discharge in Repeat Breeding Cows. International Conference on Sustainable Animal Production, Health and Environment: Future Challenges, CCS Haryana Agricultural University, Hisar-125 004, India. 24-27 November 1999. pp 136

Abstracts <u>published in national conferences (oral or poster presentation):</u>

1. **Kamal MM**, Rahman MB, De Koster J, Van Eetvelde M, Van Soom A, Opsomer G. 2013. The chromatin of the germinal vesicle is hypomethylated in fat cows compared to cows of moderate body condition. VFS meeting ‘Voorjaarsvergadering’ Zebrastraat 32 Ghent on 17 May 2013 as oral presentation.
2. **Kamal MM**, Momont HW, Opsomer G and Shamsuddin M. 2011. The importance of interactions among animal, herd and managerial factors on postpartum anestrus in crossbred dairy cows. Proceedings of the Vet2011 Celebration in Bangladesh, BAU, Mymensingh, 09-10 Feb 2011, pp 53
3. Islam MT, Rahman MM, **Kamal MM**, Haque MM and Shamsuddin M. 2011. Community-based productivity veterinary services for sustainable development of dairying in Bangladesh- Satkhira and Sirajgonj experience. Proceedings of the Vet2011 Celebration in Bangladesh, BAU, Mymensingh, 09-10 Feb 2011, pp 58
4. **Kamal MM**, Rahman MM, Jha AK and Shamsuddin M. 2010. Prevalence of postpartum anoestrus and effectiveness of its treatment in crossbred cows. Sixteenth Annual Scientific Conference, Shilpachariya Zainul Abedin Auditorium, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, Bangladesh. 6-7 February 2010. pp 39-40

<u>Magazine Publications</u>

1. **কামাল এমএম**। জুন-জুলাই ২০১৬। বাংলাদেশে দুধ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করণীয়। খামার ২২ (৩-৪): ২২-২৪।
2. **কামাল এমএম**। মে ২০১৬। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সম্ভাবনাময় শিক্ষা ও কর্মকাঠামো। খামার ২২ (২): ২১-২৮।
3. **কামাল এমএম**। আগষ্ট ২০১৫। গরু মোটাতাজাকরণে স্টেরয়েড ব্যবহার প্রসংগ এবং আমাদের করণীয়। খামার ২১ (৫): ৬-১২।
4. **Kamal MM.** 2002. Pathogenesis of Mycoplasmosis in Poultry. SIAC Newsletter 12(4): 4-6

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’

‘বাছুরের সঠিক যত্ন নিলে; অধিক দুধের গাভী মিলে’

‘আজকের বাছুরই আগামী দিনের গাভী’

‘ভাল ষাঁড়ের বীজের অনেক গুণ; দুধ ও মাংস উৎপাদন বাড়ায় বহুগুণ’

‘গাভী দিবে বাচ্চা প্রতি বছরে একটা’

‘আপনি যদি গাভী পালেন; দুধ, মাংস, জ্বালানী পাবেন’

‘যদি সুস্থ জীবন চান; প্রতিদিন দুধ খান’

‘সন্তানের বুদ্ধি বল স্বাস্থ্য চান; নিজের গাভীর দুধ খাওয়ান’

‘কাঁচা ঘাস বেশি দিলে; অধিক দুধ, মাংস মিলে’

‘নিয়মিত টিকা দিন; প্রাণী রাখুন রোগহীন’

‘সুস্থ সবল প্রাণী চান; কৃমিনাশক নিয়মিত খাওয়ান’

‘যদি সুষম খাবার চান; প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ খান’

‘ভাল ষাঁড়ের বীজের এক ফোঁটা; পুষ্টি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা’

‘অধিক দুধ, মাংস চান; গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করান’

প্রাণিসম্পদ ও উন্নয়ন

(তৃতীয় সংস্করণ)

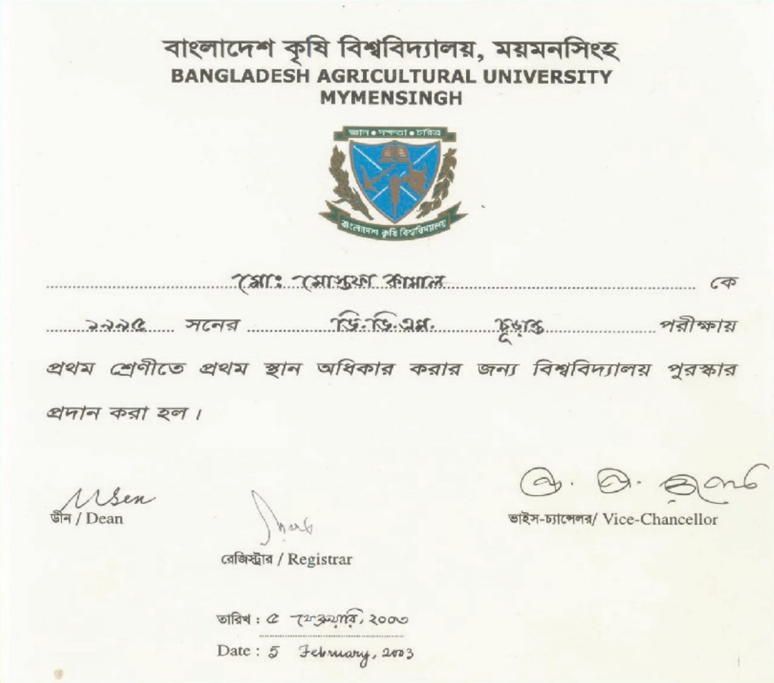

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY
MYMENSINGH

মো: মোস্তফা কামাল কে ১৯৯৫ সনের ডি.ভি.এম. চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার প্রদান করা হল।

ডীন / Dean

রেজিস্ট্রার / Registrar

ভাইস-চ্যান্সেলর/ Vice-Chancellor

তারিখ : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

Date : 5 February, 2003

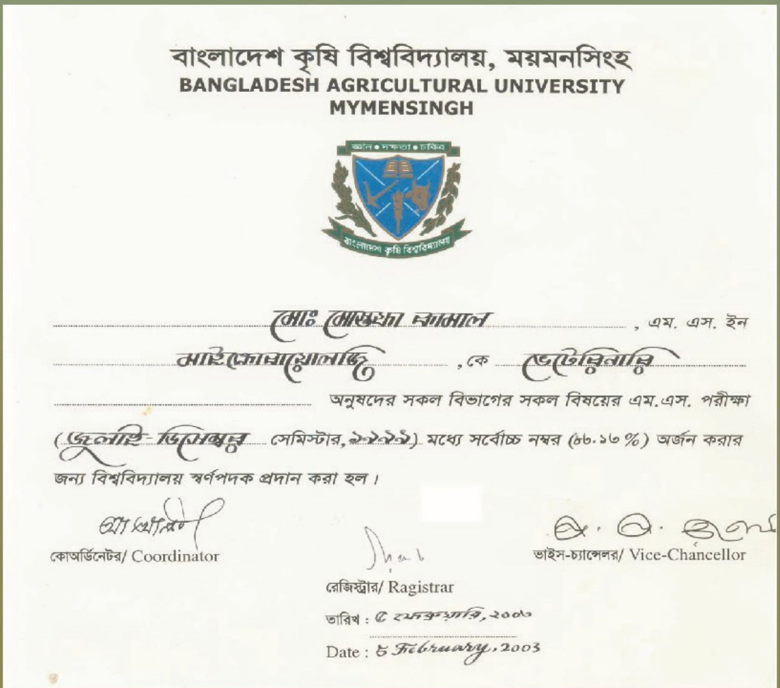

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY
MYMENSINGH

মোঃ মোস্তফা কামাল, এম. এস. ইন মাইক্রোবায়োলজি, কে ভেটেরিনারি অনুষদের সকল বিভাগের সকল বিষয়ের এম.এস. পরীক্ষা (জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টার, ১৯৯৯) মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর (৮৬.১৩%) অর্জন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক প্রদান করা হল।

কোঅর্ডিনেটর/ Coordinator

রেজিস্ট্রার/ Ragistrar

ভাইস-চ্যান্সেলর/ Vice-Chancellor

তারিখ : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

Date : 5 February, 2003